দর্শনের ইতিকাহিনী

দর্শনের ইতি কাহিনী

উইল ডুরাণ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উইল ডুরান্ট

দর্শনের ইতিকাহিনী

আবুল ফজল
অনূদিত

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাএ/ ১০৭৫
মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ২২৫০

প্রকাশকাল ঃ কার্তিক, ১৩৮৭
[নভেম্বর, ১৯৮০]

পাণ্ডুলিপি
অনুবাদ বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রচ্ছদ ঃ সৈয়দ আমির হোসেন

মুদ্রণ ঃ বাংলা একাডেমী প্রেস

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

DARSHANER ITIKAHINI: Bengali translation of Will Durant's STORY OF PHILOSOPHY by Abul Fazal. Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh, 1980. Price: Taka 50·00 only.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক সাঈদুর রহমান
বন্ধুবরেষু
দর্শন যাঁর প্রিয়তম বিস্ময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা	...	১
প্রথম অধ্যায় : প্লেটো	...	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : এরিস্টোটল ও গ্রীক বিজ্ঞান		৭৫
তৃতীয় অধ্যায় : ফ্রান্সিস বেকন	...	১২৮
চতুর্থ অধ্যায় : স্পিনোজা	...	১৮৫
পঞ্চম অধ্যায় : ভল্টেয়ার ও ফরাসী জ্ঞানসাধনা	...	২৪৫
ষষ্ঠ অধ্যায় : ইমানুয়েল কান্ট এবং আদর্শবাদ	...	৩১৫
সপ্তম অধ্যায় : শোপেনহাওয়ার	...	৩৬৯
অষ্টম অধ্যায় : হার্বার্ট স্পেন্সার	...	৪২৫
নবম অধ্যায় : ফ্রেড্রিক নীটশে	...	৪৮১
দশম অধ্যায় : বার্গসঁ ক্রোচে আর বার্ট্রাণ্ড রাসেল	...	৫৩৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

॥ ১ ॥

'দর্শনের ইতিকাহিনীর' নতুন সংস্করণের এ সুযোগে বইটির রূপ-রেখা আর অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন আমার প্রকাশক। এ সুযোগের জন্য আমি আনন্দিত। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও জনসাধারণ যে দরাজ ঔদার্য্যের সঙ্গে বইটি গ্রহণ করেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

লক্ষ কন্ঠের দাবীর ফলেই এ 'রূপরেখার' জন্ম। মানবীয় জ্ঞানের পরিধি এখন সাধ্যাতীতভাবেই গেছে বেড়ে। প্রতিটি বিজ্ঞান জন্ম দিয়েছে আরো ডজন খানেকের—তার একটা থেকে আর একটা সূক্ষ্মতর। দূরবীক্ষণ যন্ত্র এত সব গ্রহ-নক্ষত্র আর সে সবের গতি-বিধির এত সব খবর জানিয়ে দিয়েছে যে, তার নাম আর সংখ্যা মনে রাখাই এক অসম্ভব ব্যাপার। আগে যেখানে মানুষ হাজারের কথা বলতো, ভূতত্ত্ব এখন সেখানে কথা বলে লক্ষ বছরের হিসেবে। পদার্থ-বিদ্যা অণুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে বিশ্ব আর জীব-বিদ্যা খুঁজে পেয়েছে সামান্য কোষের মধ্যে আস্ত দুনিয়া। শারীরবিদ্যা আবিষ্কার করেছে প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অফুরন্ত রহস্য আর মনস্তত্ত্ব করেছে প্রতিস্বপ্নে। জীবোৎপত্তি-বিজ্ঞান পুনর্গঠন করেছে মানুষের অজ্ঞাত প্রাচীনতা—পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করেছে কত সব ভূ-গর্ভে প্রোথিত নগরী আর বিস্মৃত রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষ। ইতিহাস প্রমাণ করেছে সব ইতিহাসই ভুল আর এঁকেছে এমন একটা পট যার সামগ্রিক রূপ একমাত্র স্পেংগ্লার বা এডওয়ার্ড মেয়ারই ধারণা করতে সক্ষম। শাস্ত্র পড়েছে ভেঙ্গে, রাজনৈতিক মতবাদে দেখা দিয়েছে ফাটল। বিচিত্র সব আবিষ্কার জীবনে আর যুদ্ধে নিয়ে এসেছে অসম্ভব জটিলতা। অর্থনীতি বহু সরকারেরই ঘটিয়েছে পতন—পৃথিবীকে দিয়েছে নতুন উদ্দীপনা। যে দর্শন পৃথিবীর একটা সুষমা-মণ্ডিত রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরতে আর যা কিছু শুভ তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণীয় করে তুলতে সব বিজ্ঞানকেই লাগাতো কাজে, সে দর্শনও আজ সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ। সত্যের সব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দর্শন আজ পলাতক, দুষ্প্রবেশ্য অলিতে-গলিতে গিয়ে লুক্কায়িত আর জীবনের সব সমস্যা আর দায়িত্ব থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এক ভীরু নিরাপত্তায়। মানব-বিদ্যা আজ মানব-মনের চেয়েও হয়ে উঠেছে বড়।

এখন বেঁচে আছে শুধু বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ—'সামান্য' সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান 'অসামান্য'। আর আছেন ভাববাদী দার্শনিক যিনি 'অসামান্য' সম্বন্ধে জানেন অতি সামান্যই। নিজের কল্প-দৃষ্টি থেকে সমস্ত বিশ্বকে বাইরে রাখার মতলবে এসব বিশেষজ্ঞরা নিজেদের বেঁধে রাখেন এক ক্ষুদ্র গণ্ডীতে—এভাবে তাঁরা হারিয়ে বসেন পরিপ্রেক্ষিত। ফলে, বোধ-শক্তির স্থান দখল করে ঘটনার বাস্তবতা। এ কারণে বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত বিদ্যা এঁদের মনে সঞ্চারিত করে না কোন জ্ঞান। প্রতিটি বিজ্ঞান, দর্শনের প্রতি শাখা আজ এমন সব পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করে বসেছে যে, তা একমাত্র ঐসবের গোঁড়া ভক্তদেরই বোধগম্য। পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই তারা ব্যর্থ হচ্ছে সমসাময়িক শিক্ষিতদের সে জ্ঞান পরিবেশনে। বিদ্যা আর জীবনের মাঝখানে ফাঁক ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। এখন শাসকরা বুঝতে পারে না চিন্তাবিদ্‌দের—যারা চায় জানতে তারা বুঝতে পারে না যারা জানে তাদের। অগাধ পাণ্ডিত্যের মাঝখানে বেড়ে চলেছে সাধারণ অজ্ঞতা আর এদের নির্বাচিত প্রতি-নিধিরাই এখন শাসন করছে বিশ্বের মহানগরীগুলো। বিজ্ঞানের অপূর্ব উন্নতি আর প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রতিদিন নতুন নতুন ধর্মমতের হচ্ছে জন্ম, পুরাতন মৃত কুসংস্কারগুলি আবার দিচ্ছে মাথা চাড়া। এখন সাধারণ মানুষের উভয়-সঙ্কট—তারা বাধ্য হচ্ছে বিজ্ঞান-পূজারীদের অবোধ্য হতাশা আর শাস্ত্র পুরোহিতদের অবিশ্বাস্য আশাবাদের কোন একটাকে বেছে নিতে। এ অবস্থায় বৃত্তিজীবী শিক্ষকদের সুস্পষ্ট কর্তব্য হচ্ছে—জাতি এবং বিশেষজ্ঞের মধ্যে সমঝোতা সাধন, বিশেষজ্ঞের ভাষা আয়ত্ত করে বিদ্যা আর প্রয়োজনের মাঝখানের বেড়া ভেঙ্গে পরিচিত পুরোনো পরিভাষায় নতুন সত্যকে সব শিক্ষিতজনের বোধগম্য করে তোলা। কারণ, জ্ঞান যদি সহজ সঞ্চরণ বা যোগাযোগের সাধ্যাতীত হয় তা হলে তার অবরোহন ঘটবে দুর্বোধ্য পাণ্ডিত্যে এবং দুর্বল কর্তৃত্ব স্বীকৃতিতে তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবজাতি পা দিয়ে বসবে ধর্মের আর এক নতুন যুগে। সম্ভ্রানজনক দূরত্বে থেকে পূজা করবে এ নতুন পুরোহিতদের। শিক্ষার উপর সভ্যতার ভিৎ পত্তনের যে আশা করা গিয়েছিল তা সরে যাবে আরো দূরে। তখন জগৎসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন দ্রুত বর্দ্ধিত পারিভাষিক পাণ্ডিত্যের অনিশ্চয়তার উপরই তাকে অর্থাৎ সভ্যতাকে দিতে হবে ছেড়ে —এ পাণ্ডিত্য হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধ; একচেটিয়া আর কিছুটা বৈরাগ্যবাদীও। এ কারণেই জেমস্ হারভে রবিন্সন এখন এসব বাধা দূর করে আধুনিক জ্ঞানকে মানবিক করার আহ্বান জানালেন তখন সারা বিশ্ব তাঁকে করলো অভিনন্দিত এবং তাঁর আহ্বানকে জানালো স্বাগতম।

॥ ২ ॥

বিদ্যাকে মানবিক করার প্রথম 'রূপরেখা' হচ্ছে প্লেটোর Dialogues বা কথোপকথন। সম্ভবতঃ পণ্ডিতদের জানা আছে এ মহাজ্ঞানী দু'ধরনের রচনা লিখে গেছেন ; প্রথমটি—তাঁর একাডেমির ছাত্রদের জন্য পরিভাষায়, দ্বিতীয়টি সাধারণ এথেন্সবাসীদের দর্শনের 'প্রীতিকর আনন্দের' দিকে আকর্ষণের জন্য পরিভাষা-বর্জিত সহজ কথোপকথনের ভাষায়। দর্শনকে সাহিত্য, নাটক আর সুললিত রচনা-রীতি করে তোলাকে তিনি কখনো দর্শনের অপমান মনে করেন নি এবং বোধগম্য ভাষায় সমসাময়িক নীতি আর রাষ্ট্রের সমস্যা আলোচনায় এবং তার প্রয়োগে দর্শনের কিছুমাত্র সম্মান হানি ঘটে, তা তিনি মনে করতেন না। ইতিহাসের পরিহাসই বলতে হবে তাঁর পারিভাষিক লেখাগুলো গেছে হারিয়ে—বেঁচে আছে জনপ্রিয় লেখাগুলোই শুধু ; আর এ সবই দর্শনের ক্ষেত্রে প্লেটোকে দিয়েছে নাম, যশ, খ্যাতি।

আমাদের যুগে 'রূপ রখা' আঁকার সূচনা এইচ্. জি. ওয়েলস্ থেকেই। ঐতিহাসিকরা ওয়েল্সের 'The outline of History বা ইতিহাসের রূপ-রেখা নিয়ে ধাঁধাঁয় পড়েছিলেন —অধ্যাপক শাপিরো (Schapiro)-ও ওটাকে ভুলে ভর্তি আর 'উদার শিক্ষা' বলে দিয়েছিলেন মত। যে কোন বিরাট পরিধিতে লেখা বইতে ভুলত্রুটী ঘটা স্বাভাবিক কিন্তু একক মনের পক্ষে এ যে এক প্রেরণাদায়িনী বিস্ময়কর কীর্তি তাতে সন্দেহ নেই। ওয়েল্সের সাংবাদিক প্রতিভা বিশ্ব-ইতিহাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাকে আন্তর্জাতিক শান্তিমুখী করে তুলেছে এবং 'শিক্ষা আর ধ্বংসের প্রতিযোগীতায়' তার ভূমিকাকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। কেউই ধ্বংস চায় না—তাই সবাই ওয়েলসের বইটা কিনেছে সাগ্রহে। তাঁর হাতে ইতিহাস হয়েছে জনপ্রিয় কিন্তু ঐতিহাসিকরা হয়েছেন আতঙ্কিত। এখন ওয়েল্‌সের মতো আকর্ষণীয় করে লিখতে তাঁরাও হয়েছেন বাধ্য।

আশ্চর্য, দু'জন সত্য সত্যই তা করেছেন। চিকাগো এবং মিশরের অধ্যাপক ব্রেস্‌টেড্‌ (Breasted) একটি পুরোনো গ্রন্থকে নতুন করে লিখে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন—অধ্যাপক রবিনসনও তাই করেছেন। এক উদ্যোগী প্রকাশক তাঁদের রচনাকে দু'খণ্ডে গেঁথে 'মানব মনের অভিযান' এ আকর্ষণীয় শিরোনামায় করেছেন প্রকাশ—এটি একটি উত্তম 'রূপরেখা',—ভাষ্যের এক চমৎকার নিদর্শন, জার্মেন পাণ্ডিত্যের মতো প্রামাণ্য আর গ'লদের মতো স্পষ্ট। আজ পর্য্যন্ত ওদের ক্ষেত্রে ওরা অতুলনীয়।

ইত্যবসরে হেনড্রিক উইলেম্‌ ভ্যন্‌ লূন (Hendrik Willem Van Loon) এক হাতে কলম অন্য হাতে পেন্সিল আর চোখে হাসির ঝিলিক নিয়ে ঐ একই ক্ষেত্রে করেছেন বিচরণ। নিজের সম্মান সম্বন্ধে তাঁর কোন মাথা ব্যথা ছিল না—কৌতুকবোধ ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। হাসতে হাসতে অতিক্রম করেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী, হাসি আর চিত্র দিয়ে প্রকাশ করেছেন শিক্ষণীয়কে। প্রবীণরা ছেলেদের নাম করে তাঁর বই The story of mankind বা মানবজাতির ইতিকথা কিনেছেন কিন্তু পড়েছেন নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে। পৃথিবী যেন অত্যন্ত 'অসম্মানজনকভাবেই' ইতিহাস সম্বন্ধে হয়ে যাচ্ছে ওয়াকিবহাল।

সাধারণ মানুষকে যা খেতে দেওয়া হয় তাতেই পায় তাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি। আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ নরনারী আছে যারা কলেজে ঢোকার সুযোগ পায় না কিন্তু এরা ইতিহাস আর বিজ্ঞানের খবরাখবরের জন্য তৃষিত। যারা কলেজে ঢোকে, পরিমিত হলেও তাদের জ্ঞান-তৃষ্ণাও কম নয়। যখন জন মেকি (John Macy) 'বিশ্ব সাহিত্যের গল্প' প্রকাশ করলেন তখন হাজার হাজার পাঠক একটি আকর্ষণীয় ও চমৎকার প্রকাশনা বলে ওটাকে করলো অভিনন্দিত। 'The story of philosophy' বা দর্শনের ইতিকথা যখন বের হলো তখন এ কৌতূহলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরঙ্গে তারও লাভ হলো অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা। সত্যি সত্যি দর্শনও জীবন-মৃত্যুরই ব্যাপার আর তা যে এমন আকর্ষণীয় হতে পারে তা দেখে পাঠকরা রীতিমতো বিস্মিত। তারা বন্ধুদের কাছে গল্প করতে লাগলো—দেখতে দেখতে এ বইর তারিফ করা আর কেনা একটা যেন সখ হয়ে দাঁড়ালো—সময় সময় অনেকে পড়তেও লাগল অথচ এ বই লেখা হয়েছিল পরিমিত সংখ্যক পাঠকের জন্য। বইটার এমন সাফল্য ঘটল যে কোন গ্রন্থকারই এমন সাফল্যের মুখ দ্বিতীয়বার দেখার আশা করতে পারে না।

এবার শুরু হলো প্লাবন। এক 'রূপরেখার' পেছনে আর এক 'রূপরেখা', বের হতে লাগলো, এক 'ইতিকথার' পর আর এক 'ইতিকথা'। শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, আইন—সবেরই ইতিবৃত্তকার গেল জুটে। বেকারের (Bekker) তুচ্ছ এক রচনা এরকম অতি-লোভের ফলে The story of religion বা ধর্মের ইতিকথায় হলো রূপান্তরিত। এক গ্রন্থকার ত এক খণ্ডে সমস্ত জ্ঞানের 'রূপরেখাই' এঁকে বসলেন—ফলে ওয়েলস্, বন্‌লুন, মেকি, স্লোসন, ব্রেষ্টেড্ ও অন্যান্যরা সব ফালতু বা বেদরকারী হয়ে পড়লেন। জনসাধারণের জ্ঞান-তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটলো তাড়াতাড়ি। এসব তড়িৎ-গতিতে লেখা হালকা বই সম্বন্ধে সমালোচক আর অধ্যাপকরা আপত্তি তুল্লেন। ভিতরে ভিতরে শুরু হলো বিরুদ্ধতা এবং তার শিকার হলো আদি থেকে শেষতম 'রূপরেখা'। এ অভিযানের দ্রুতগতির মতো ফ্যাশন্ বা রেওয়াজেরও বদল ঘটলো দ্রুত। জ্ঞানকে মানবীয় করার সপক্ষে কেউ আর একটি কথা বলতেও করল না সাহস। 'রূপরেখাকে' নিন্দা করাই যেন সমালোচক খ্যাতির এক সহজ পথ হয়ে দাঁড়াল। সহজবোধ্য যে কোন অ-ঔপন্যাসিক রচনা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আত্মম্ভরিতার সঙ্গে কথা বলা যেন একটা রীতি হয়ে গেলো। সাহিত্যে শুরু হলো উন্নাসিকতা।

॥ ৩ ॥

অপ্রিয় হলেও অনেক সমালোচনাই সত্য। 'দর্শনের ইতিকথায়' ত্রুটি ছিল, এখনো আছে। প্রথমত এটা অসম্পূর্ণ। মধ্যযুগের দার্শনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডিত্যের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি অমার্জনীয়—তবে যে ব্যক্তি কলেজে এবং আলোচনা-ক্ষেত্রে এ নিয়ে বহু যন্ত্রণা ভোগ করেছে আর পরে আপত্তি জানিয়ে এসেছে যে, এসব খাঁটি দর্শন নয়, ছদ্মবেশী ধর্ম-শাস্ত্র মাত্র—তার কাছে এ অনুপস্থিতি ক্ষমার্হ বলেই মনে হবে। এটা সত্য যে আকারের দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও দর্শনের অধিকাংশ ইতিহাসে দার্শনিক মতামতের যে প্রকাশ দেখা যায় তার চেয়ে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে এসব দার্শনিকদের কারো কারো বেলায় (যেমন —শোপেনহার, নীট্‌শে, স্পেন্সার, ভল্টেয়ার)। তাই এ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই খোলাখুলি বলে দেওয়া হয়েছে :

'এ বই দর্শনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। কয়েকটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে ভাববাদী দর্শনকে মানবীয় জ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসারই এ শুধু প্রচেষ্টা। যাঁদের নির্বাচন করা হয়েছে যথোপযুক্ত স্থান দিয়ে তাঁদেরে জীবন্ত করে তোলার জন্যই কিছু কিছু অপ্রধান চরিত্রকে বাধ দেওয়া হয়েছে।' (পাঠকদের প্রতি)

তা সত্ত্বেও অপূর্ণতা রয়ে গেছে। সমালোচকদের যদিও নজরে পড়েনি—সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়েছে চীন ও হিন্দু দর্শনকে বাদ দেওয়া। দর্শনের 'ইতিকথা' হলেও, যার সূচনা সক্রেটিস থেকে, তাতে লাওজে (Lao-tze), কনফুসিয়াস (Confucius), মেনসিয়াস (Mencius), চোয়াং-জে (Chwang-tze), বুদ্ধ, শঙ্কর না থাকা সর্বজন স্বীকৃত অপূর্ণতা বই কি।[১] Story বা 'ইতিকথা' শব্দটির বহু অপব্যবহার ঘটেছে—এখানে শব্দটি নির্বাচন করা হয়েছে প্রথমতঃ এ কারণে যে, শুধু বিশিষ্ট দার্শনিকদের ইতিবৃত্তই এখানে স্থান পাবে, দ্বিতীয়তঃ চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ ইতিহাসের যে কোন ঘটনার থেকে কিছুমাত্র কম চাঞ্চল্যকর নয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কিছুটা অবহেলা করার জন্য সাফাই গাওয়ার দরকার নেই। ঐ অপ্রীতিকর বিষয়কে কান্ট-অধ্যায়ে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। সেখানে পাঠক বোধির বহু ধাঁধাঁরই সাক্ষাৎ পাবেন। এর দুর্বোধ্যতায় তরুণ পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই খুশী হবেন। (যাই হোক মিড্‌ওয়েষ্ট (Midwest) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এ খবরটুকু

১ সভ্যতার ইতিহাস—প্রথম খণ্ডে এ ত্রুটি খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিয়েছেন—গত পনর বছর ধরে তিনি কান্ট্ পড়াচ্ছেন কিন্তু আমার এ প্রাথমিক অধ্যায়টি পড়ার আগ্ পর্যন্ত তিনি কান্টের কোন অর্থই বুঝতে পারেন নি।) দর্শনের বহু সমস্যার মধ্যে বিদ্যা-অর্জনের পদ্ধতির স্বভাবও যে এক সমস্যা মাত্র, এ গ্রন্থ তারও এক কঠোর পথ নির্দেশক। এ একটি মাত্র বিষয়ে পণ্ডিত আর জার্মেনদের অত বেশী প্রাচুর্য বর্ষণ অনাবশ্যক। দর্শনের অধোগতির জন্য তাঁদের এ আতিশয্যই বেশী করে দায়ী। নৈতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক আর ধর্মীয় দর্শনকে বাদ দিয়ে অতি-পাণ্ডিত্যের বিকৃতির কাছে ফরাশীরা কখনো নতি স্বীকার করেনি। এমনকি এখন জার্মেনরাও ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে বলে মনে হয়। কায়সারলিঙের (Kayserling) কথা শুনুনঃ "জ্ঞানের সমন্বয়ে বিজ্ঞানের পূর্ণতাই খাঁটি দর্শন...জ্ঞান-বিজ্ঞান, আত্মরূপ চর্চা, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা।" (সত্যই রসায়ণ অথবা শারীর-বিচ্ছেদ বিদ্যার মতো ঐসবও বিজ্ঞানেরই শাখা।) "কিন্তু জীবন্ত সমন্বয়ের এ যদি পরিণতি হয়, তা হলে নিশ্চয়ই এ এক নির্জলা পাপ।" (Creative understanding, New York, P. 125) জার্মেনের মুখে এ কথা যেন দানিয়েলেরই বিচারাসন গ্রহণ! স্পেঙ্লার, কন্ফুসিয়াস পর্যন্ত সব প্রাচীন চীন দার্শনিকদের বলেছেনঃ তাঁরা "পিথাগোরাস (Pythagoras), পারমেনেডিস্ (Parmenides), আর হবস্ (Hobbos) এবং লিব্নিট্জের (Leibnitz) মতো রাজনীতিবিদ্, শাসক আর আইন-প্রণেতা ছিলেন। তাঁরা এমন গোঁড়া দার্শনিক ছিলেন যে—বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জ্ঞানকেই তাঁরা মনে করতেন পাণ্ডিত্য।" (Decline of the West Vol. I. P. 42) নিঃসন্দেহে জ্ঞান-বিজ্ঞান এখন জার্মেনীতে মৃত্যুমুখীন এবং গণতন্ত্রের উপযুক্ত প্রতিদান হিসেবে আমেরিকায় তা আমাদের রফ্তানী করা উচিত।

চীন দার্শনিকদের অতি-জ্ঞানের প্রতি শুধু যে একটা অনীহা ছিল তা নয়, দীর্ঘায়িত পরা-বিজ্ঞানের প্রতি ছিল ওদের গল্প-সুলভ অবজ্ঞা। কোন তরুণ পরা-বিজ্ঞানীই কনফুসিয়াসকে দার্শনিক বলে স্বীকার করবে না, কারণ তিনি পরা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই বলেননি—জ্ঞান -চর্চা সম্বন্ধে বলেছেন আরো কম। স্পেন্সার আর কঁতের মতো তিনি প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন—তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল সব সময় নীতি আর রাষ্ট্র। সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ে 'নিন্দার' কথা হচ্ছে যে তিনি অবিসংবাদিত রূপে সহজবোধ্য ছিলেন আর দার্শনিকের জন্য ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক! আমরা 'আধুনিকরা' দর্শনের ব্যাপারে ফাঁকা শব্দাড়ম্বরে এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, যখন শব্দারম্বর ছাড়া দর্শন পরিবেশন করা হয় তখন আমরা তাকে যেন চিনতেই পারি না। দুর্বোধ্যতা-বিরোধীদের এভাবেই দিতে হচ্ছে খেশারত!

এ 'ইতিকাহিনী'তে কিছু রসবোধের আমদানী করা হয়েছে কারণ, আনন্দ-হীন নিরস পাণ্ডিত্য শুধু যে বিজ্ঞতার খেলাপ তা নয় বরং যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে যে রস-বোধের জন্য তার সঙ্গে দর্শনের রয়েছে নিকট আত্মীয়তা—'এরা একে অপরের আত্মাস্বরূপ।' পণ্ডিতদের যেন এটা পছন্দ নয়---বইতে হাসি দেখলেই তাঁরা সবচেয়ে বেশী দুঃখিত হন। তাঁরা মনে করেন রস-বোধের খ্যাতি রাজনীতিবিদ আর দার্শনিকদের জন্য এক সর্বনাশা ব্যাপার। জার্মেনি আন্‌জেল্‌মেন্সের গল্পের জন্য শফেনহাওয়ারকে ক্ষমা করতে পারে নি—শুধু ফ্রান্সই ভল্টেয়ারের ব্যঙ্গ এবং মেধার পেছনে যে গভীরতা—তাকে জানিয়েছিল স্বীকৃতি।

আমার বিশ্বাস এ বই কাকেও রাতারাতি দার্শনিক করে তুলবে এমন ধারণা কোন পাঠকের মনেই সঞ্চারিত হবে না অথবা দার্শনিকদের রচনা পাঠের আনন্দ বা কাষ্ট থেকে তাঁরা অব্যাহতি পেয়ে গেলেন তেমন বিশ্বাসও কারো মনে জাগবে না। আল্লাহ্ জানেন জ্ঞানের পথে কোন 'রাস্তা-সংক্ষেপ' নেই। চল্লিশ বছর সন্ধানের পরও দেখা যায় সত্য' এখনো অবগুণ্ঠিত, নিজেকে ও যতটুকু দেখায় তাও অতৃপ্তিকর। এ 'ইতি-কাহিনী' দর্শনের প্রতিভূ কিছুতেই নয় বরং দর্শনের এ এক ভূমিকা আর দর্শনের প্রতি আমন্ত্রণ মাত্র। বই শেষ হওয়ার পরেও যাতে দার্শনিকদের জানার আগ্রহ দীর্ঘায়ু হয়, সে উদ্দেশ্যে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বার বার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে মূল রচনার দিকে এবং এক অধ্যয়ন যে যথেষ্ট নয় এ সম্পর্কেও বার বার উচচারণ করা হয়েছে সতর্কবাণী।

"স্পিনোজাকে শুধু পড়লে চলবে না, তাঁকে অধ্যয়ন করতে হবে। ইউক্লিডের প্রতি যেভাবে অগ্রসর হও তাঁর প্রতিও সেভাবে হতে হবে অগ্রসর—বুঝতে হবে বিষয়-বিরাগী ভাস্করের মতো সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রয়োজনীয়কে খুঁদে ফেলে একজন মানুষ তাঁর সারা জীবনের চিন্তাকে মাত্র দু'শ পৃষ্ঠার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মনে করবেন না শুধু দ্রুত চোখ বুলিয়েই তার মর্মে প্রবেশ সহজ হবে। সবটা বই এক-বারে পড়ে ফেলবেন না—পড়বেন একটু একটু করে বহুবারে। পড়া শেষ হওয়ার পর মনে করবেন—সবেমাত্র বুঝতে শুরু করেছেন। তারপর পড়ুন কিছু ভাষ্য আর ব্যাখ্যা। পড়ুন পুল্লোকের (Pollock) Spinoza বা মার্টিনোর (Martineow) Study of Spinoza অথবা দুই-ই। শেষে Ethics-টা আবার পড়ুন—দেখবেন মনে হবে যেন একটা নতুন বই পড়ছেন। যখন ওটা দ্বিতীয়বার শেষ করবেন তখন আপনি হয়ে যাবেন চির-দর্শন-প্রেমিক।'

জেনে সুখী হলাম এ 'ইতিহকাহিনী' প্রকাশের পর থেকে দর্শনের সুপ্রতিষ্ঠিত মূল্যবান গ্রন্থগুলোর (Classics) বিক্রয় গড়পড়তা প্রায় দু'শ গুণ বেড়ে গেছে। বহু প্রকাশক নতুন নতুন সংস্করণ বের করেছেন। বিশেষতঃ প্লেটো, স্পিনোজা, ভলেটয়ার, শপেনহওয়ার আর নিটসের। নিউইয়র্ক পাব্লিক লাইব্রেরীর এক কর্মচারী (যিনি নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক) লিখেছেন :

'দর্শনের ইতিকাহিনী' প্রকাশের পর থেকে দর্শনের ক্লাসিক্স্ গ্রন্থগুলোর চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং শাখা পাঠাগারগুলোতে ক্রমশঃ তার সংখ্যাও অনেক বাড়ানো হয়েছে। আগে দর্শনের সদ্য প্রকাশিত বই খুব অল্প সংখ্যকই কেনা হতো কিন্তু গত দু'তিন বছর ধরে চাহিদা বৃদ্ধির আশায় দর্শনের পঠিতব্য নতুন বই প্রচুর কেনা হচ্ছে আর সত্য সত্যই চাহিদাও গেছে বেড়ে আর তা বেড়েছে দ্রুত।'

অতএব জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। যে সব ঈর্ষাতুর নিজেদের জ্ঞানকে পৃথিবী থেকে আলাদা করে শুধু নিজেদের মধ্যে রুদ্ধ করে রাখতে চায় আর তাদের এ গণ্ডীবদ্ধতা আর বর্বর পরিভাষার জন্য যদি মানুষ—যে শিক্ষাটুকু তাঁরা নিজেরা দিতে পারতেন, তার সন্ধানে সস্তা-হালকা বই, বক্তৃতা বা বয়স্ক শিক্ষার দিকে ছুটে যায় তা হলে তার জন্য তাঁরাই দায়ী ও দোষী। যে সব অবিশেষজ্ঞরা জীবনের প্রতি ভালোবাসার তাগিদে জ্ঞানকে মানবীয় করে তুলছেন তাঁদের প্রতি ঐ সব লোকের অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদী বিশেষজ্ঞদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ওঁদের শিক্ষা এবং জ্ঞানকেই ত অবিশেষজ্ঞরা জন-চিত্তে ছড়িয়ে দেওয়ার সহায়তা করছেন। উভয় শ্রেণীর শিক্ষকই পরস্পরকে সহায়তা করতে পারেন---সাবধানী পাণ্ডিতেরা পারেন আমাদের উৎসাহকে নির্ভুলতায় সীমিত রাখতে আর উৎসাহীরা শিথিল পাণ্ডিত্যে করতে পারেন সঞ্চারিত কিছু রক্ত আর উষ্ণতা। আমরা উভয়ে মিলে আমেরিকায় এমন পাঠক ও শ্রোতা গড়ে তুলতে পারি যারা প্রতিভার কথা শুনতে তথা প্রতিভা সৃষ্টিতে হবে উৎসুক ও প্রস্তুত। আমরা কেউই পরিপূর্ণ শিক্ষক নই--কিন্তু শিক্ষাকে কিছুটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা নিশ্চয়ই ক্ষমা দাবী করতে পারি এবং আমাদের সাধ্যানুসারে তা আমরা করছিও।

এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। আমাদের অবসর গ্রহণের পর এবার দক্ষতর অভিনেতাদের ঘটবে আবির্ভাব।

AMARBOI.COM

পাঠকের প্রতি

এ গ্রন্থ দর্শনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। কয়েকটি খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের চারপাশে ভাববাদী দর্শনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে জ্ঞানকে মানবীয় করারই শুধু চেষ্টা করা হয়েছে এ বইতে। যাঁদের বাছাই করা হয়েছে অধিকতর স্থান দিয়ে, তাঁদেরে জীবন্ত করে তোলার জন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রধানদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে অর্ধ-পৌরাণিক সক্রেটিস পূর্ববর্তীদের, বৈরাগ্যবাদী, সুখ বাদী, মধ্য-যুগীয় দার্শনিক আর জ্ঞান-বাদীদের আলোচনা রয়ে গেছে অপূর্ণাঙ্গ। লেখকের বিশ্বাস জ্ঞানবিজ্ঞান আধুনিক দর্শনকে শুধু হরণ করে নি, তাকে প্রায় নিয়ে এসেছে ধ্বংসের কাছাকাছি। আপাততঃ লেখক আশা করছেন জ্ঞান-পদ্ধতির অধ্যয়ন যে মনঃস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানেরই কাজ এটা স্বীকৃতি পাবে এবং দর্শন যে সব অভিজ্ঞতার সমন্বয়-মূলক ব্যাখ্যা আর তা যে অভিজ্ঞতার ধরন-ধারন আর পদ্ধতির বিশ্লেষণী বর্ণনা মাত্র নয় তা পুনরায় বোধগম্য হয়ে উঠবে। বিশ্লেষণ বিজ্ঞানেরই কাজ—তার ফলে আমরা লাভ করে থাকি জ্ঞান। দর্শন-জ্ঞান জাগ্রত বিবেকেরই সম্পদ বা সমন্বয়।

একটি অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকৃতি জানাচ্ছি---আল্‌ডেন ফ্রিমেন লেখককে শিক্ষা আর ভ্রমণের সুযোগ দিয়েছেন, দিয়েছেন মহৎ ও জ্ঞান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দীপিত জীবনের প্রেরণা। আশা করি এ মহৎ বন্ধুটি এ পৃষ্ঠাগুলোতে-- যদিও নৈমিত্তিক ও অসম্পূর্ণ, এমন কিছু খুঁজে পাবেন যা তাঁর বিশ্বাস আর বদান্যতার একেবারে অনুপযুক্ত নয়।

---উইল ডুরান্ট

নিউইয়র্ক. ১৯২৬

দর্শনের ব্যবহার সম্পর্কে ভূমিকা

জীবন ধারণের কর্কশ ও নীরস দৈহিক প্রয়োজন যদি চিন্তার উচচ মার্গ থেকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম আর লাভ-লোকসানের হাটে টেনে না আনে তা হলে প্রত্যেক ছাত্রই অনুভব করতে পারে যে দর্শনে রয়েছে এক নির্মল আনন্দ, এমন কি পরা-বিজ্ঞানের মরীচিকায়ও আছে আকর্ষণ। জীবনের জুন মাসে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে এমন সোনালী দিনের কথা আমাদের অনেকের মনে আছে যখন প্লেটোর মতো আমাদেরও মনে হতো দর্শন এক 'প্রিয় আনন্দ'। তখন মাংসের দাবী আর লালসা এবং সংসারের আবর্জনা থেকে বিনম্রা অধরা 'সত্যকে' মনে হতো অধিকতর গৌরবজনক। জ্ঞানের প্রতি প্রথম জীবনের সে আত্মনিবেদনের তৃষিত রেশ সব সময় আমাদের মধ্যে কিছুটা থেকে যায়। ব্রাউনিঙের মতো আমরাও অনুভব করি—"জীবনের অর্থ আছে, আর তাকে খোঁজাই আমার অন্ন-জল"। আমাদের জীবনের অনেক কিছুই অর্থহীন, ব্যর্থতা আর আত্ম-অস্বীকৃতির দ্বিধা, আমাদের অন্তরে আর বাইরে যে নৈরাজ্য তার সঙ্গে আমাদের করতে হয় সংগ্রাম। তা সত্ত্বেও আমরা সব সময় বিশ্বাস করি আমাদের ভিতর এমন কিছু আছে যা বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ---নিজের আত্মার গহনে প্রবেশ করতে পারলেই এটা সহজবোধ্য হয় আর আমরা পারি করতে শুধু নিজের আত্মারই ব্যাখ্যা। আমরা বুঝতে চাই, "আমরা যা এবং যে কিছুর সম্পর্কেই আসি না কেন চাই প্রতিনিয়ত সব কিছুকে আলোকজ্জ্বল ও দীপ্ত করে তুলতে---আমাদের কাছে ইহাই জীবন"[১]। The Brothers Karmazov উপন্যাসের মিতায়ার মতো---"আমরা লাখের ভিখারী নই—কিন্তু চাই আমাদের

১ Nietzsche, The Joyful wisdom. pref.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নের জবাব''। দৈনন্দিনের আবর্ত থেকে নিজেদের টেনে তোলার জন্য আমরা চাই ঘটনা-প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিত আর মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরতে। অনতিবিলম্বে ছোট যে ছোট আর বড় যে বড় তা আমরা চাই জানতে। "চিরন্তনের আলোয়" যা যে রকম দেখাবে তাকে আমরা এখনি চাই দেখতে। যা অনিবার্য তাকে হাসিমুখে বরণ করার পাঠ আমরা চাই নিতে—আসন্ন মৃত্যুর সামনেও চাই হাসতে। আমরা পূর্ণ হতে চাই—আমাদের বাসনা-কামনাকে সঙ্গতি দিয়ে, সমালোচনা করে আমাদের মানসিক শক্তিসমূহকে দিতে চাই একটা সামঞ্জস্য। কারণ নীতি আর রাজনীতির ক্ষেত্রে সমন্বিত শক্তিই হচ্ছে শেষ কথা— ন্যায়শাস্ত্র আর পরা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই। থরো (Thoreau) বলেছেন "দার্শনিক হতে হলে শুধু সূক্ষ্ম চিন্তা থাকলে বা একটা সংস্থা কি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেই চলে না---জ্ঞানকে এমন ভালোবাসা চাই যেন তার নির্দেশে সরল, স্বাধীন, উদার ও বিশ্বস্ত জীবন যাপন করা সম্ভব।" এটা নিশ্চিত যে জ্ঞান আয়ত্ত হলে বাকি সব কিছুই যোগ হবে আমাদের জীবনের সঙ্গে এসে। বেকনের (Bacon) সতর্কবাণী "সর্বাগ্রে মনের জন্য যা ভালো তার সন্ধান করো—বাদবাকি হয় তোমার করায়ত্ত হবে না হয় তার অভাবই বোধ করবে না তুমি[১]।" সত্য আমাদের ধনী করবে না কিন্তু করবে মুক্ত।

কোন কোন অকরুণ পাঠক হয়ত এখানে বাধা দিয়ে বলবেন—দাবার মতো দর্শনও অপ্রয়োজনীয়, অজ্ঞতার মতই দুর্বোধ্য আর আধেয় বস্তুর মতই স্থিতিশীল। সিসারো (cicero) বলেছেন "দার্শনিকদের বইতে যা দেখতে পাওয়া যায় তার থেকে আজগুবী আর কিছুই নেই"। কোন কোন দার্শনিকের একমাত্র সাধারণ বুদ্ধি ছাড়া আর সব রকম জ্ঞান যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। অনেক দার্শনিক-আকাশ-বিহারের কারণ কল্পনার এ সূক্ষ্ম হাওয়া! আমাদের সংকল্প, আমাদের এ ভ্রমণে আমরা শুধু আলোর বন্দরেই নোঙর ফেলবো, পরা-বিজ্ঞানের ঘোলা স্রোত থেকে থাকবো দূরে আর দূরে থাকবো শাস্ত্রীয় বিবাদের 'বহু নিনাদিত' সমুদ্র থেকে। দর্শন কি সত্যই স্থিতিশীল? বিজ্ঞান সব সময় গতিশীল আর মনে হয় দর্শন সব সময় স্থানচ্যুত। এর কারণ দর্শনকে ভালোমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, শৃঙ্খলা-স্বাধীনতা ইত্যাদির মতো কঠিন বিপজ্জনক সমস্যাই

১ De Angmentis Scientiarum, VIII, 2

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হয় আলোচনা যা এখনো হয়নি বিজ্ঞানের আঁওতাভুক্ত। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যে সবের ত্বরিত সিদ্ধান্ত সম্ভব তাকেই বলা হয় বিজ্ঞান। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই দর্শনে শুরু আর শিল্পে শেষ। কল্পনা থেকে তার উৎপত্তি আর আয়ত্তের দিকে তার গতি। দর্শন হচ্ছে (পরা-বিজ্ঞানের মতো) অজানার অথবা (নীতি বা রাজনৈতিক দর্শনের মতো) যা সঠিক ভাবে জানা নেই তার ব্যাখ্যা। সত্যের অবরোধে এ হচ্ছে সম্মুখ-পরিখা। বিজ্ঞান হচ্ছে অধিকৃত এলাকা। যার পেছনে রয়েছে এমন সব নিরাপদ স্থান যেখানে জ্ঞান এবং শিল্প আমাদের সামনে অসম্পূর্ণ হলেও এক মনোরম বিশ্বই গড়ে তোলে। দর্শন যেন স্থির আর কিং-কর্তব্যবিমূঢ়; কারণ সে তার জয়ের ফল তার বিজ্ঞান-কন্যাদের দেয় ছেড়ে আর নিজে পা বাড়ায় বুকে এক ঐশী-অসন্তোষ নিয়ে অনাবিষ্কৃত আর অনিশ্চিতের দিকে।

আমরা কি অধিকতর যান্ত্রিক হবো? বিজ্ঞান বিশ্লেষণী আর দর্শন সমন্বয়ী ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান চায় সমগ্রকে অংশে বিভক্ত করতে, অবয়বকে অঙ্গে আর অজানাকে জানাতে। বস্তুর আদর্শায়িত সম্ভাবনা ও মূল্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন খবরই নেয় না—সন্ধান নেয় না তার সামগ্রিক ও চরম গুরুত্ব সম্বন্ধে। বর্তমান অবস্থা আর ক্রিয়া নিয়েই সে সন্তুষ্ট—এখন যে অবস্থায় আছে তার স্বভাব আর পদ্ধতির উপরই তার সংকীর্ণ-দৃষ্টি ঘন-নিবদ্ধ। টুর্গেনিভের কবিতায় যেমন বৈজ্ঞানিকের কাছেও তেমনি প্রকৃতি নিরপেক্ষ। কীট বিশেষের পা আর সৃষ্টিশীল প্রতিভার চাঞ্চল্য তার কাছে এক, উভয়ের প্রতি সে সম কৌতূহলী। কিন্তু দার্শনিক শুধু বাস্তব ঘটনা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সম্পর্কও সে নিতে চায় যাচাই করে—এভাবে সে জানতে চায় তার অর্থ আর মূল্য। সে চায় সব কিছুকে এক সমন্বয়ী ব্যাখ্যায় মিলাতে। যে বিরাট বিশ্ব-ঘড়িটাকে কৌতূহলী বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ দ্বিধা-বিভক্ত করেছে, দার্শনিক তাকে জোড়া দিয়ে যা ছিল তার চেয়েও উত্তম করে চায় গড়তে। বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিয়েছে কি করে আরোগ্য করতে হয় আর কি করে করতে হয় হত্যা—খুচরোভাবে সে মৃত্যু-হার কমায় বটে কিন্তু পরে পাইকারীভাবে যুদ্ধে আমাদের করে হত্যা। একমাত্র সবরকম অভিজ্ঞতার আলোকে সমন্বিত জ্ঞানই আমাদের নির্দেশ দিতে পারে কখন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার আরোগ্যের আর কখন দরকার হত্যার। পদ্ধতির অধ্যয়ন আর উপায় উদ্ভাবনই বিজ্ঞান—সমালোচনা আর সমন্বয়েরই ফলশ্রুতি দর্শন। যেহেতু আজকের দিনে উপায় এবং যন্ত্রপাতি এত বহু গুণিত হয়েছে যে আমাদের আদর্শ আর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা আর সমন্বয় এক রকম সাধ্যাতীত বল্লেই হয়। আমাদের জীবন আজ এক অর্থহীন তর্জনগর্জন আর শব্দাড়ম্বরে পরিণত। ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্ক হীন ঘটনার কিই বা মূল্য—উদ্দেশ্য আর সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া তা তো অপূর্ণাঙ্গই। দর্শন-হীন বিজ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিতে আর মূল্যায়ণ-বর্জিত বাস্তব আমাদের ধ্বংস আর নৈরাশ্যের হাত থেকে পারবে না বাঁচাতে। বিজ্ঞান আমাদের বিদ্যা দিতে পারে কিন্তু একমাত্র দর্শনই দিতে পারে বিবেকী-জ্ঞান।

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে দর্শন অধ্যয়ন আর তার আলোচনা পাঁচটি ক্ষেত্রকে বুঝিয়ে থাকে: ন্যায় বা যুক্তি-বিদ্যা, রুচিতত্ত্ব, নীতি, রাজনীতি আর পরা-বিজ্ঞান। চিন্তা আর অনুসন্ধানে আদর্শ পদ্ধতির অধ্যয়নেরই নাম লজিক বা যুক্তিবিদ্যা। পর্যবেক্ষণ আর অন্তদর্শন, অনুমান আর কার্য-কারণ, কল্পনা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ আর সমন্বয়—এসব মানবীয় কার্যাবলীকে যুক্তি-বিদ্যা বুঝাতে আর পরিচালিত করতে করে চেষ্টা। আমাদের অনেকের পক্ষেই এসব নীরস অধ্যয়ন, তবুও চিন্তার ইতিহাসে এ এক বিরাট ব্যাপার যে মানুষ চিন্তা আর অনুসন্ধানের পদ্ধতিতে করেছে অনেক উন্নতি, হয়েছে অনেক দূর অগ্রসর।

আদর্শ রূপ-কল্প আর সৌন্দর্যের অধ্যয়নই রুচিতত্ত্ব—এটি শিল্পের তথা আর্টের দর্শন। আদর্শ আচার ব্যবহারেরই নাম নীতি। সক্রেটিসের মতে সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে ভালো-মন্দের জ্ঞান, জীবন-প্রজ্ঞার জ্ঞান। আদর্শ সামাজিক সংঘটন অধ্যয়নেরই নাম রাজনীতি (পদ অধিকার আর রক্ষার শিল্প বা বিজ্ঞান এটা নয়, যদিও কেউ কেউ তা মনে করে থাকে)—রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, নারী-অধিকারবাদ এসব হচ্ছে রাজনৈতিক দর্শনের নাটকীয় চরিত্র। সব শেষে পরা-বিজ্ঞান (অন্যান্য দর্শনের ন্যায় আদর্শের আলোয় বাস্তবকে সমন্বিত করার চেষ্টা এর নয় বলে এটা নিয়ে এত বিপদ)—এর উদ্দেশ্য সব কিছুর 'চরম সত্য' অধ্যয়ন, "জড়" (তত্ত্ব-বিদ্যা) আর "মনের" (দার্শনিক মনোবিদ্যা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরম ও সত্যকার স্বভাব জানা এবং জ্ঞান আর উপলব্ধির পদ্ধতিতে "জড়" আর "মনের" পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন।

এসবই হচ্ছে দর্শনের অঙ্গ কিন্তু বিচ্ছিন্নতার ফলে তার সৌন্দর্য এবং আনন্দ দুই-ই গেছে নষ্ট হয়ে। আমরা এখানে সঙ্কুচিত, বিমূর্ত আর মামুলী দর্শনের সন্ধান করব না বরং প্রতিভার জাগ্রত রূপাচ্ছাদনেই নেব তার খোঁজ। আমরা শুধু দর্শনকে অধ্যয়ন করব না, অধ্যয়ন করব দার্শনিককেও, চিন্তার সন্ত আর শহীদদের সঙ্গে আমরা কাটাবো সময় যেন তাঁদের উজ্জ্বল প্রাণ-শিখা আমাদের চার দিকে হয় প্রতিফলিত আর লিউনার্ডোর (Leonardo) মতো আমরাও যাতে "বুঝতে পারার আনন্দই যে সব চেয়ে মহত্তম আনন্দ" তা উপলব্ধি করতে পারি। যথাযথভাবে গ্রহণ করলে এঁদের প্রত্যেকের থেকেই আমরা কিছু না কিছু শিখতে পারবো! ইমার্সন (Emerson) জিজ্ঞাসা করেছেন— "সত্যকার জ্ঞানীর রহস্য তুমি জানো কি? প্রত্যেক মানুষের কাছে এমন কিছু আছে যা আমি শিখতে পারি এবং সেখানে আমি তার শিষ্য।" নিজেদের গর্ব-বোধকে আঘাত না করেও ইতিহাসের মহা-মনাদের প্রতি আমরা এ দৃষ্টিতে তাকাতে পারি। ইমার্সনের অন্য কথাটায়ও আমরা এ ভেবে আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারি যে আজ প্রতিভাবানেরা আমাদের যে সব কথা বলছেন আমাদের দূর যৌবনকালে আমরাও তো অবিকল এমন কথাই ভেবেছিলাম! তার ক্ষীণ স্মৃতি এখনো মনে পড়ছে। তবে তা প্রকাশের ভাষা বা সাহস আমাদের ছিল না। সত্যই আমাদের যতটুকু শোনার কান আর দিল আছে মহা-মনারা ততটুকুই আমাদের বলতে পারেন--দিতে পারেন—তাঁদের মধ্যে যা পুষ্পিত হয়েছে তার অন্তত কিছুটা শিকড় আমাদের মধ্যে থাকা চাই। তাঁদের যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতা আমাদেরও ছিল কিন্তু সে অভিজ্ঞতার নির্যাস আর সূক্ষ্ম অর্থ নিঃশেষে পান করি নি আমরা—করিনি শোষণ। আমাদের চতুর্দিকে যে সত্য গুঞ্জরিত হচ্ছিল তার সুর শোনার মতো তীব্র অনুভূতি আমাদের ছিল না, প্রতিভাবানেরা সে সুর আর পরিমণ্ডলের যে সংগীত তা শুনতে পান। দর্শনকে যে পিথাগোরাস্ উচ্চতম সংগীত বলেছেন তার মর্ম একমাত্র প্রতিভাবানেরাই পারেন বুঝতে।

এঁদের সাময়িক ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা করে চলুন আমরা এঁদের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনি এবং এঁরা যা সাগ্রহে শিখাতে চেয়েছেন, সাগ্রহে তা শিখি। বৃদ্ধ সক্রেটিস ক্রিটোকে বলেছিলেন, "যুক্তিবাদী বিবেচকের মতো দর্শনের কথা ভাবো, দর্শনের শিক্ষকরা ভালো কি মন্দতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ভালোভাবে, সঠিকভাবে দর্শনকে পরীক্ষা করে দেখো—যদি তা মন্দ হয় তা হলে সব মানুষকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে করো চেষ্টা। কিন্তু আমি যা মনে করি দর্শন যদি তা হয় তা হলে সানন্দে তার অনুসরণ করো, করো তার সেবা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

প্লেটো

১ প্লেটো প্রসঙ্গ

য়ুরোপের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন গ্রীস যেন এক কংকাল হাতের বাঁকা আঙুলগুলো ভূমধ্য-সাগরের দিকে দিয়েছে প্রসারিত করে। তার দক্ষিণে রয়েছে বিরাট ক্রীট দ্বীপ—খ্রীস্ট-জন্মের হাজার বছর আগে ঐ বাড়ানো আঙুল দিয়ে গ্রীস যেন ওখান থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সভ্যতা আর সংস্কৃতির সূচনা। পূর্ব দিকে, ইজিয়ান সাগরের ওপারে রয়েছে এসিয়া মাইনর—আজ শান্ত এবং নির্লিপ্ত বটে কিন্তু প্লেটো-পূর্ব যুগে ছিল শিল্প, বাণিজ্য ও নবতর পরিকল্পনায় কর্ম-চঞ্চল। পশ্চিমে আয়োনিয়ান সাগরের ওপারে ইটালী যেন সমুদ্রের দিকে হেলিয়ে-পড়া এক স্তম্ভ; আর আছে সিসিলি এবং স্পেন—ঐ সময় এ দুই ছিল গ্রীসের সমৃদ্ধিশীল উপনিবেশ। সব শেষে আছে 'হারকিউলিস-স্তম্ভ' (যাকে আমরা জিব্রালটার বলি) যার দুর্গম পথে প্রবেশ করতে সে যুগের অনেক নাবিকেরই সাহসে কুলাতো না। উত্তরে আছে ঐ সব এলেকা যাকে তখন থেসালী, এপিরাস আর মেসেডোনিয়া বলা হতো—যার অধিবাসীরা ছিল আধা-বর্বর আর অশিক্ষিত ও অদমিত—ঐ এলেকা থেকে অথবা তার ভিতর দিয়ে দলে দলে পরাক্রমশীলরা এসে হোমারীয় আর পেরিক্লিয় গ্রীসের প্রতিভাকে করেছে লালিত।

মানচিত্রের দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখুন—দেখবেন তীরে তীরে কত ফাঁক, কত মালভূমি, সর্বত্র আবর্ত, উপসাগর আর সমুদ্রের অনুপ্রবেশ। সমস্ত স্থলভূমিই যেন পাহাড়-পর্বতে ধাক্কা খাচ্ছে আর হচ্ছে আলোড়িত। স্থল আর সমুদ্রের প্রাকৃতিক বাধা গ্রীসকে নানা খণ্ডে করেছে বিভক্ত—তখন ভ্রমণ এবং সংযোগ রাখা এখনকার তুলনায় ছিল অনেক কঠিন। ফলে প্রত্যেকটা উপত্যকা ছিল অর্থনীতিতে, শাসন ব্যবস্থায়, প্রতিষ্ঠান ও সংস্কার, উপভাষায়, ধর্ম আর সংস্কৃতিতে স্বাধীন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটায় ছিল একটা কি দু'টা নগর আর তার চারপাশে দূরবর্তী পর্বত-ঢালুতে কৃষি-ভূমি। এরকমই ছিল ইউরিয়া, লখ্‌রিস্, এটোলিয়া, পনিস, বোয়েটিয়া, একায়া, আর্গলিস, এলিস্, আর্কেডিয়া, মেসেনিয়া আর লেকনিয়া তাদের স্পার্টা, আর এটিকা তার এথেন্স্ নিয়ে।

মানচিত্রের দিকে শেষবারের মতো আর একবার তাকিয়ে দেখুন—নিরীক্ষণ করুন এথেন্সের অবস্থান। ওটার অবস্থান গ্রীসের সব বড় বড় নগরের দূরতম পূর্ব-প্রান্তে। ঐ অনুকূল দ্বার-পথে গ্রীকরা সহজেই পারতো কর্মব্যস্ত এসিয়া মাইনরের শহরগুলোতে ঢুকে পড়তে আর ঐ পথেই ঐ সব বয়োজ্যষ্ঠ নগরগুলো সংস্কৃতি আর বিলাস-দ্রব্য পাঠাতো কিশোর গ্রীসকে। গ্রীসের পিরাউস্ (Piraeus) ছিল তখন চমৎকার বন্দর—সমুদ্রের তাণ্ডব থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য পোত ওখানে নিতো আশ্রয়। সামুদ্রিক পোত-বাহিনীও ছিল ওর বিরাট। খ্রীস্ট-পূর্ব ৪৯০-৪৭০-এ স্পার্টা আর এথেন্স্ নিজেদের পারস্পরিক ঈর্ষা- বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে, দেরিয়াস্ আর জার এক্সেসের নেতৃত্বে পারস্যবাসীরা গ্রীসকে যে এসিয়-সাম্রাজ্যের উপনিবেশ বানাতে চেয়েছিল তার করেছিল মুকাবিলা। এ জরাগ্রস্ত প্রাচ্যের বিরুদ্ধে তরুণ ইউরোপের এ সংগ্রামে স্পার্টা জুগিয়েছিল সৈন্যবাহিনী আর এথেন্স্ নৌ-বাহিনী। যুদ্ধ শেষে স্পার্টা তার সৈন্যবাহিনী দিলো ভেঙ্গে এবং এ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি যে অর্থনৈতিক সংকট, স্পার্টা হলো তার শিকার। অন্যদিকে এথেন্স্ তার নৌ-বাহিনীকে বাণিজ্য-তরিতে পরিণত করে হয়ে উঠলো প্রাচীন পৃথিবীর সেরা বাণিজ্য নগরগুলোর অন্যতম। স্পার্টা হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন আর স্থিতিশীল কৃষি-ভিত্তিক, অন্যদিকে এথেন্স্ এমন এক কর্ম-ব্যস্ত বাজার আর বন্দর হয়ে উঠলো যে সেখানে এসে মিলিত হলো নানা দেশের নানা জাতের বিচিত্র ধর্ম-মত আর বিভিন্ন আচারের মানুষ—এ সংযোগ আর প্রতিযোগিতার ফলে জন্ম নিল তুলনা-মূলক আলোচনা, বিশ্লেষণ আর চিন্তা-চর্চা।

যেখানে ঘটে এমন বিচিত্র সংযোগ স্বভাবতঃই সেখানে ঐতিহ্য এবং নির্বিচার মতবাদ (Dogma) শিথিল হয়ে আসে—যেখানে সহস্র ধর্ম-বিশ্বাস, সেখানে সব ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতিই সংশয় জাগা স্বাভাবিক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় ব্যবসায়ীরাই আদি সংশয়বাদী—অতি-দেখার ফলে অতি-বিশ্বাস তাদের মনে পায় না স্থান। ব্যবসায়ীদের সাধারণ স্বভাব সব মানুষকে হয় বোকা না হয় প্রতারক শ্রেণীভুক্ত করা—ফলে সব ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা ওদের মনের হয়ে পড়ে এক স্বাভাবিক প্রবণতা। এভাবে তারাও ক্রমশঃ বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে সহায়তা করে—অঙ্কের জন্ম হয়েছে লেনদেনের জটিলতা থেকে আর জ্যোতিষের জন্ম ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক নৌ-চালনার দুঃসাহস থেকে। সম্পদ-বৃদ্ধি নিয়ে এলো অবসর আর নিরাপত্তা যা গবেষণা আর কল্পনার প্রাথমিক শর্ত। মানুষ এখন আর নক্ষত্রের কাছে সমুদ্র-পথের নির্দেশ চায় না—চায় বিশ্ব-রহস্যেরও উত্তর। প্রথম যুগের গ্রীক দার্শনিকরা ছিলেন জ্যোতির্বিদ। এরিস্টোটেল বলেছেন[১]: "পারস্য যুদ্ধের পর নিজেদের কৃতিত্বের গৌরবে মানুষ আরো বহুদূর এগিয়ে গেলো। সব জ্ঞান করায়ত্ত করে অধ্যয়নের আরো বিস্তৃততর ক্ষেত্রের সন্ধানে হলো রত।" আগে যে সব ঘটনা আর তার গতিধারাকে অলৌকিক শক্তি আর অপৌরুষের ক্ষমতার কাজ বলে মনে করা হতো এখন মানুষ তার প্রাকৃতিক ব্যাখ্যায় দুঃসাহসী হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে যাদু আর ধর্মাচারের স্থান গ্রহণ করলো বিজ্ঞান তার কর্তৃত্ব--- এভাবে হলো শুরু দর্শনের।

AMARBOI.COM

দর্শন প্রথমে ছিল শারীরিক বা বাহ্যিক। তার দৃষ্টি ছিল বস্তুজগতের দিকে, জিজ্ঞাস্য ছিল বস্তুর চরম আর ন্যূনতম উপকরণ কি। এর স্বাভাবিক পরিণতি ঘটলো ডিমোক্রিটাসের (Democritus–460-360 B. C) বস্তুবাদে—"অণু আর স্থান ছাড়া বস্তুতে আর কিছুই নেই।" গ্রীক চিন্তার তখন এ ছিল প্রধান ধারা। প্লেটোর সময় এ ধারা কিছুটা চাপা পড়ে। কিন্তু ইপিকুরাসে (Epicurus—342-270 B.C) আবার পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং লুক্রেটিয়াসের (Lucretius—98-55 B.C.) সময়ে তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত উচচ কন্ঠ। তবে ভ্রাম্যমাণ জ্ঞান-শিক্ষক তথা সপিস্টদের (Sophists) সময় থেকেই গ্রীক দর্শন তার বিশিষ্টতা আর সাফল্য করে অর্জন—এঁরা বাইরে বস্তু-জগতের দিকে না তাকিয়ে তাকাতেন নিজেদের অন্তরের দিকে। রত হলেন এবার নিজেদের চিন্তা আর স্বভাবের অধ্যয়নে। এঁরা ছিলেন সব

১ Politics, 1341

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিমান (যেমন Gorgias আর Hippias), অনেকে ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞান-গভীর (যেমন Protagoras আর Prodicus) আমাদের মন ও স্বভাব-দর্শনে প্রায় এমন কোন সমস্যা বা ধারা ছিল না যা তাঁরা উপলব্ধি করেননি বা করেননি আলোচনা। প্রতি ব্যাপারেই তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, ধর্ম আর রাজনীতির নিষেধের সম্মুখীন হয়েছেন নির্ভয়ে। সব ধর্ম-বিশ্বাস আর অনুষ্ঠানকে টেনে এনেছেন যুক্তির বিচারাসনের সামনে। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন দুই দলে বিভক্ত: একদল, রুশোর মতো বলতো: প্রকৃতি ভালো, সভ্যতা মন্দ, স্বভাবে সব মানুষ সমান, শ্রেণী-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানই অসাম্যের জন্য দায়ী আর আইন হচ্ছে দুর্বলকে বেঁধে রাখা আর শাসন করার জন্য সবলের উদ্ভাবন। অন্য দল, নীট্‌শের মতো দাবী করতো: প্রকৃতির ভালো-মন্দের কোন ক্ষমতাই নেই, স্বভাবে সব মানুষই অসমান, সবলকে বাধা দেওয়া আর সীমিত করে রাখার মতলবে দুর্বলেরাই নীতি-কথার করেছে আবিষ্কার ক্ষমতা হচ্ছে চরম পুণ্য আর মানুষের চরম কাম্য আর সব রকম শাসনতন্ত্রের মধ্যে অভিজাততন্ত্র হচ্ছে সব চেয়ে বিজ্ঞ আর স্বাভাবিক।

গণতন্ত্রের উপর এ আক্রমণ এথেন্সে স্বল্প-সংখ্যক ধনীর আবির্ভাবেরই পরিচায়ক—এঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন শ্রেণী-তান্ত্রিক বা Oligarchical বলে আর গণতন্ত্রকে অযোগ্য, বাজে বলে করতেন নিন্দা। আসলে নিন্দা করার মতো কোন গণতন্ত্রই ছিল না, কারণ এথেন্সের চার লক্ষ অধিবাসীর আড়াই লক্ষই ছিল দাস—ওদের কোন রকম রাজনৈতিক অধিকারই ছিল না, বাকি দেড়লক্ষ স্বাধীন নাগরিকের অতি অল্পসংখ্যকই, যে সাধারণ পরিষদে রাষ্ট্রের নীতি নির্দ্ধারিত হতো তাতে হাজির হতেন। তবুও যেটুকু গণতন্ত্র ওদের ছিল, অন্যত্র তাও ছিল বিরল। সাধারণ পরিষদই ছিল সর্বময় কর্তা, উচচতম প্রশাসনিক সংস্থার সদস্য ছিল হাজারের উর্ধে (ঘুষ মহার্ঘ করার উদ্দেশ্যে), এঁরা নির্বাচিত হতেন সমস্ত নাগরিকদের তালিকা থেকে বর্ণানুক্রমে। এর থেকে অধিকতর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। যদিও বিরুদ্ধবাদীরা পোষণ করতেন এর বিপরীত মত। খ্রীস্ট-পূর্ব ৪৩০—৪০০ পর্যন্ত এক-জীবন ধরে যে মহাযুদ্ধ (Peloponnesian War) সংঘটিত হয়েছিল তাতে স্পার্টার সামরিক শক্তি এথেন্সের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌ-শক্তিকে দেয় হারিয়ে, যুদ্ধকালীন অযোগ্যতার দোহাই দিয়ে এথেন্সের শ্রেণী-তান্ত্রিক দলের নেতা ক্রিটিয়াস গণতন্ত্র ত্যাগ করার সুপারিশ করেন এবং গোপনে স্পার্টার অভিজাততন্ত্রের করতে থাকেন প্রশংসা। শ্রেণী-তান্ত্রিক অনেক নেতাকে পাঠানো হলো নির্বাসনে কিন্তু এথেন্স্ যখন আত্মসমর্পণ করলো তখন স্পার্টা এ শর্ত আরোপ করল যে নির্বাসিত অভিজাতদের আনতে হবে ফিরিয়ে। কিন্তু ফিরে আসতে না আসতেই, ক্রিটিয়াসের নেতৃত্বে তারা, সর্বনাশা যুদ্ধের সময় যে 'গণতান্ত্রিক' দল দেশ শাসন করছিল তাদের বিরুদ্ধে এক ধনিক বিপ্লবের করলো সূচনা। কিন্তু বিপ্লব সফল হলো না—ক্রিটিয়াস যুদ্ধ ক্ষেত্রে হলো নিহত।

ক্রিটিয়াস ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য আর প্লেটোর চাচা।

২ সক্রেটিস

প্রাচীন ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষের অংশ হিসেবে যে আবক্ষ-মূর্তি আমরা পেয়েছি তা দেখে বিচার করলেও সক্রেটিসকে সুপুরুষ কিছুতেই বলা যায় না। এমন কি একজন দার্শনিক থেকেও যেন তিনি ছিলেন শ্রীহীন। টেকো মাথা, বৃহৎ গোলাকার মুখ, গভীর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি চোখ, প্রসস্ত, বিকশিত নাক—সব মিলে যেন বহু দার্শনিক আলোচনারই এক নিখুঁত সাক্ষ্য। সব চেয়ে প্রথিতযশা দার্শনিকের চেয়ে মনে হয় ওটা যেন কোন দ্বার রক্ষকেরই মূর্তি। কিন্তু একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখলে নীরস পাথরের ভিতর দিয়েও দেখতে পাওয়া যাবে মানবীয় সহৃদয়তা আর সারল্যের কিছুটা পরিচয়—যার জন্য এ সাদাসিদে চিন্তাবিদ্‌টি হতে পেরেছিলেন এথেন্সের সর্বোত্তম তরুণদের প্রিয় শিক্ষক। তাঁর সম্বন্ধে আমরা কতই না কম জানি তবুও তাঁকে আমরা জানি অভিজাত প্লেটো অথবা গম্ভীর-প্রকৃতির পণ্ডিত এরিস্টোটল্ থেকে অধিকতর অন্তরঙ্গভাবে। দু'হাজার তিন শত বছর পেরিয়ে আমরা যেন এখনো তাঁর শ্রীহীন মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। পরণে একই কুঞ্চিত কাপড়, ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন বাজারের ভিতর দিয়ে, রাজনীতির কলকোলাহল থেকে দূরে—মন্দিরের কোন ছায়া-ঘন কোণে ডেকে নিচ্ছেন তরুণ আর বিদ্বানদের, নিজের চার দিকে বসিয়ে জানতে চাচ্ছেন তাদের মনের কথা।

এসব বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত তরুণরা তাঁর চার পাশে জড়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে তাঁকে ইউরোপীয় দর্শন সৃষ্টিতে করতো সহায়তা। প্লেটো আর আলকিবিয়াডিসের (Alcibiades) মতো ধনী যুবকেরাও ওখানে বসে এথেনীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর ব্যঙ্গ-মিশ্রিত বিশ্লেষণ উপভোগ করত, এন্টিস্থেনিসের (Antisthenes) মতো সমাজতান্ত্রিকও হতো উপস্থিত আর পছন্দ করতো দারিদ্র্যের প্রতি তাঁর উপেক্ষা আর ওটাকে ওরা করে তুলতো ধর্মীয় বিশ্বাস। এরিস্টিপাসের (Aristipus) মতো এক-আধ জন নৈরাজ্যবাদীও হতো উপস্থিত—তারা এমন এক পৃথিবীর আশা করতো যেখানে কেউ দাস কেউ প্রভু থাকবে না। সবাই সক্রেটিসের মত হবে নির্লিপ্ত-দুশ্চিন্তা-মুক্ত।

আজ মানব সমাজকে যেসব সমস্যা আলোড়িত করে তুলেছে যা নিয়ে তরুণদের তর্কের নেই শেষ, সেদিনের বিতর্ককারী চিন্তাবিদ ক্ষুদ্র দলটিকেও তা ভাবিত ও আলোড়িত করে তুলেছিল—গুরুর মতো তারাও বিশ্বাস করতো আলোচনা ছাড়া জীবনটাই ব্যর্থ। উপস্থিত থাকতো সামাজিক চিন্তার সব দলেরই প্রতিনিধি। মনে হয় সব রকম সামাজিক চিন্তার উৎসও ছিল ওটা অর্থাৎ সক্রেটিসের আলোচনা সভা।

প্রায় কেউই জানতো না গুরু কিভাবে করেন জীবন যাপন। তিনি কোন কাজ করতেন না—ভাবতেন না আগামী দিনের কথা। শিষ্যরা খেতে বল্লেই তিনি গিয়ে হাজির হতেন। নিশ্চই ওরাও তাঁর সঙ্গ পছন্দ করতো। তাঁর সর্ব-অবয়বে শারীরিক সমৃদ্ধির পরিচয়ের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু ঘরে ছিল না তাঁর তেমন সমাদর—কারণ, স্ত্রী আর সন্তানদের তিনি করতেন কিছুটা অবহেলা। তাঁর স্ত্রীর (Xanthippe) ধারণা—তিনি এক অপদার্থ নিষ্কর্মা, রুটির পরিবর্তে নিয়ে আসেন পরিবারের জন্য দুর্ণাম। তাঁর মতো তাঁর স্ত্রীও আলাপ করতে ভালো বাসতেন—মনে হয় তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতেও কিছু আলাপ-আলোচনা করতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় প্লেটো তা লিপিবদ্ধ করেন নি। স্ত্রীও তাঁকে যে ভালোবাসতেন না তা নয়—সত্তর বছর বয়সে হলেও তাঁর মৃত্যুতে তিনিও নিশ্চয়ই হয়েছিলেন দুঃখিত।

শিষ্যরা সক্রেটিসকে এত বেশী শ্রদ্ধা করতো কেন? সম্ভবতঃ একাধারে তিনি খাঁটি মানুষ আর দার্শনিক ছিলেন বলেই। একবার যুদ্ধে নিজের জানের উপর ঝুঁকি নিয়ে তিনি আলকিবিয়াডিসের (Alcibiades)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। ভদ্রলোকের মতো তিনি নির্ভয়ে আর মাত্রা না ছাড়িয়ে খেতে পারতেন মদ। নিঃসন্দেহে জ্ঞানের বিনিময়ের জন্যই শিষ্যরা তাঁকে বেশী পছন্দ করতো। জ্ঞানের দাবী তাঁর ছিল না—বলতেন তিনি শুধু জ্ঞানের অনুরাগী, সন্ধানী মাত্র। জ্ঞানের পথে পেশাদার তিনি নন্—শুধু সৌখিন অনুশীলনকারী। কথিত আছে ডেল্‌পির (Delpi) ভবিষ্যৎবানীও নাকি তাঁকে গ্রীসের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলে ঘোষণা করে অসাধারণ সু-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। একথা শুনে সক্রেটিস নাকি বলেছিলেন—'অজ্ঞতা' থেকে তাঁর দর্শনের সূচনা এ শুধু তারই স্বীকৃতি। তাঁর কথা : "আমি শুধু এটুকু জানি যে, আমি কিছুই জানি না।" যখন মানুষ সন্দেহ করতে শেখে—বিশেষ করে নিজের সযত্ন লালিত বিশ্বাস সম্বন্ধে, নির্বিচার ধর্মমত আর স্বতসিদ্ধ ব্যাপারে তখনই দর্শনের শুরু। কে জানে কি করে এসব সযত্ন পোষিত বিশ্বাস আমাদের মধ্যে এমন অবিচলিত ও স্থির প্রতীতি হয়ে দাঁড়ালো? হয়তো কোন গোপন ইচ্ছাই অজ্ঞাতে দিয়েছে এর জন্য, দিয়েছে বাসনা-কামনাকে চিন্তার আচ্ছাদন। মন যদি ফিরে না তাকায় আর না দেখে পরীক্ষা করে, তা হলে সত্যিকার দর্শনের জন্মই হতে পারে না। সক্রেটিস বলেছেন,—"নিজেকে জানো"।

AMARBOI.COM

তাঁর আগেও অবশ্য দার্শনিক ছিলেন—যেমন থেইলস্ (Thales) আর হিরক্লিটাসের (Heraclitus) মতো শক্তিমান, পারমেনিডাস (Parmenides) আর ইলিয়ার জেনোর (Zeno of Elea) মতো সূক্ষ্ম অনুভূতিহশীল, পিথাগোরাস (Pythagoras) আর এমপিডগলস (Empedocles)-এর মতো দ্রষ্টা—কিন্তু এঁদের অধিকাংশই ছিলেন বহির্জাগতিক দার্শনিক, তাঁরা শুধু চাইতেন বাহ্যিক বস্তুর স্বভাব জানতে, জানতে চাইতেন বস্তু আর পরিমাপ্য জগতের উপকরণ আর বিধি-বিধান।

সক্রেটিস বলতেন এসবই ভালো—তবে দার্শনিকের জন্য গাছ-পাথর থেকেও, এমনকি আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র থেকেও অসীম যোগ্যতর আলোচ্য বিষয় আছে—তা হচ্ছে মানুষের মন। মানুষ কি এবং মানুষ কি হতে পারে?

তাই তিনি অগ্রসর হলেন মানুষের অন্তর রাজ্যে উঁকি মারতে। প্রশ্ন করতে লাগলেন মানুষের স্থির-বিশ্বাস সম্বন্ধে, মানুষের সামনে তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরলেন কল্পিত ধারণা। মানুষ যখন সহজেই ন্যায়ের কথা বলতো তখন তিনি শান্তভাবে প্রশ্ন করতেন: ওটা কি, ওর কি অর্থ? এসব বিমূর্ত শব্দ দিয়ে এত সহজে যে জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সমাধান করছ, তার কতটুকু অর্থ তুমি বোঝ, বল? সম্মান, পুণ্য, নীতি আর স্বদেশ-প্রেম কথাগুলোর কি অর্থ? তোমার নিজের সম্বন্ধেই বা তুমি কতটুকু জান? এসব নৈতিক আর মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নের আলোচনা সক্রেটিসের ছিল অত্যন্ত প্রিয়। নির্ভুল সংজ্ঞা, পরিচ্ছন্ন চিন্তা আর সঠিক বিশ্লেষণ, যাকে বলা হতো চিন্তার 'সক্রেটিস পদ্ধতি'—যাঁরা এর ভুক্তভোগী তাঁদের কেউ কেউ আপত্তি জানাতো: তিনি যতখানি প্রশ্ন করেন সে পরিমাণে দেন না উত্তর, ফলে মানুষের মনে আগের চেয়েও বেশী জটিল আবর্তের হতো সৃষ্টি। যাই হোক দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদান—আমাদের দু'টি জটিলতম সমস্যার তিনি দিয়ে গেছেন সুনির্দিষ্ট উত্তর। সমস্যা দু'টি হচ্ছে: পুণ্যের অর্থ কি? সর্বোত্তম রাষ্ট্র কোন্‌টা?

সে যুগের এথেন্সের তরুণদের সামনে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই ছিল না। এক সময় দেবতা আর অলিম্পাস-বাসিনী দেবীদের উপর এসব তরুণের যে বিশ্বাস ছিল সোফিষ্টরা অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতেরা তাও দিয়েছেন ভেঙ্গে—এসব সর্বত্র গামী অসংখ্য দেবদেবীর ভয়-সঞ্জাত যে নীতি-বোধ, সঙ্গে সঙ্গে তাও ভেঙ্গে চুরমার। লোকের এখন ধারণা—আইনের আওতায় থেকে মানুষের ইচ্ছামতো যা তা করতে না পারার পেছনে কোন যুক্তি নেই। বিভক্ত ব্যক্তিত্বের ফলে এথেনীয় চরিত্রে দেখা দিলো দুর্বলতা—তাই অবশেষে এথেন্স্‌ কঠোর-প্রকৃতির স্পার্টানদের শিকারে হলো পরিণত। আর রাষ্ট্রের অবস্থা? জনতা চালিত আর আবেগ-জর্জরিত গণতন্ত্রের চেয়ে আজগুবী আর কি হতে পারে? বিতর্ক সভার দ্বারা শাসিত সরকার, অতি নিম্নমানের মাপ-দণ্ডে সেনাপতিদের নির্বাচন, নিয়োগ, বরখাস্ত, ফাঁসি, সরল-বিশ্বাসী কৃষক আর ব্যবসায়ীদের দ্বারা বর্ণানুসারে নির্বিচারে দেশের সর্বোচচ আইনসভার নির্বাচন। এ রকম অবস্থায় এথেন্সে স্বাভাবিক আর নতুন নীতিবোধের বিকাশ কি করে সম্ভব আর রাষ্ট্রকেও কি করে যাবে বাঁচানো?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই সক্রেটিসের একই সঙ্গে লাভ হয়েছে মৃত্যু আর অমরতা। পুরোনো বহু দেব-বাদী ও ধর্ম-বিশ্বাসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠার করতেন চেষ্টা, তা হলে বয়োবৃদ্ধরা তাঁকে নিশ্চয়ই সম্মান করতো—সম্মান করতো যদি তিনি তাঁর অনুবর্তী মুক্ত আত্মা তরুণদলকে মন্দিরে আর পুণ্য-তীর্থে নিয়ে ওদের পিতৃ-পুরুষের পায়ে দিতেন উৎসর্গ। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন ওটা হবে হতাশা আর আত্মহত্যার পথ—'কবরের উপর দিয়ে' অগ্রগমন নয়, হবে কবরের ভিতর পশ্চাদাপশরণ। তাঁর মনে তাঁর নিজস্ব এক ধর্ম বিশ্বাস ছিল—তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সবিনয়ে আশা করতেন, মৃত্যু তাঁকে কখনো সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে না।'[১] তবে তিনি বিশ্বাস করতেন অনির্দিষ্ট ধর্ম-শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে কোন স্থিতিশীল নীতি আর তার বিধি-বিধান পারে না গড়ে উঠতে। অবশ্য যদি কেউ সম্পূর্ণ শাস্ত্র-নিরপেক্ষ এক নীতি-বোধ গড়ে তুলতে পারেন—যা আস্তিক আর নাস্তিক উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য, তা হলে শাস্ত্রের আগমন নির্গমনে স্বেচ্ছাচারী নাগরিকদের যে নীতির বাঁধনে বেঁধে সুখী সমাজে পরিণত করা হয়েছে তাকে শিথিল করতে পারবে না। ধরুন, 'ভালো' অর্থে যদি 'বুদ্ধিমান' আর 'পুণ্য' অর্থে যদি 'জ্ঞান' বুঝায়—যদি মানুষকে তাদের সত্যিকার স্বার্থ সম্বন্ধে করে তোলা যায় সচেতন, দেখিয়ে দেওয়া যায় তাদের কর্ম বিশেষের ভবিষ্যৎ পরিণতি, সমালোচনার সাহায্যে পরস্পরবিরোধী বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ধার করে উদ্দেশ্য ও সৃষ্টিশীল পথে যায় সমন্বিত করা, তা হলে শিক্ষিত ও মার্জিতদের মনে একটা নীতি-বোধ জাগিয়ে তোলা সম্ভব—যার জন্য অশিক্ষিতরা বাহ্যিক শাসন আর উপদেশের উপর করে থাকে নির্ভর। সম্ভবতঃ সব রকম পাপই ভুল, খণ্ডিত-দৃষ্টি আর নির্বুদ্ধিতারই ফল। অজ্ঞ লোকের মতো বুদ্ধিমানদেরও নিষ্ঠুর অসামাজিক প্রবৃত্তি থাকতে পারে কিন্তু সে জানে নিজেকে সংযত করতে—পশুত্বের অনুকরণ তার দ্বারা কম হওয়াই সম্ভব। বুদ্ধি-শাসিত সমাজে, ব্যক্তির স্বাধীনতা যেটুকু সীমিত তার চেয়ে তাকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয় ফিরিয়ে। ব্যক্তির সুখ-সুবিধা অনেকখানি সামাজিক ও অনুগত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। শান্তি, শৃঙ্খলা আর শুভবুদ্ধির জন্য দৃষ্টির স্বচ্ছতা অত্যাবশ্যক।

---

১ **ভল্টেয়ার লিখেছিলেন দুই এথেন্সবাসী নাকি সক্রেটিস সম্বন্ধে আলাপ করছিলেন আর বলছিলেন "যে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সে নাস্তিক"।** P. Dictionary

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সরকারই যদি বিশৃঙ্খল আর অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে, কোন উপকার না করেই চায় শুধু শাসন করতে, পরিচালিত না করে চায় লোককে হুকুমে চালাতে। —এরকম রাষ্ট্রের অধীন লোককে আমরা কি করে বলি তোমরা আইন মেনে চলো, নিজের ভালোর চেয়ে সমষ্টির ভালো দেখো ? যে রাষ্ট্র মানুষের যোগ্যতাকে অবিশ্বাস করে, জ্ঞানের চেয়ে সংখ্যাকে দেয় বেশী গুরুত্ব তেমন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি কোন আলকিবিয়াডিস্ (Alcibiades) দাঁড়ায় তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। যেখানে চিন্তা-চর্চার বালাই নেই স্বভাবতঃই সেখানে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করবেই। জনতার স্বভাবই হলো দ্রুত-নির্বুদ্ধিতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর তার জন্য নিঃসঙ্গ অবসরে করা অনুতাপ। শুধু সংখ্যাই মানুষকে জ্ঞান দান করবে এমন বিশ্বাস কি এক হীন কুসংস্কার নয় ? একক ও বিচ্ছিন্ন মানুষের চেয়ে জনতা যে অধিকতর নির্বোধ, নিষ্ঠুর ও নির্মম তা কি এক সার্বজনীন অভিজ্ঞতা নয় ? এমন বাকবাগীশদের দ্বারা শাসিত হওয়া কি মানুষের জন্য লজ্জার বিষয় নয়, যারা "কেউ হাত দিয়ে বন্ধ করার আগ্ পর্যন্ত আঘাত-করা তাম্র-পাত্র যেমন একটানা শব্দ করতে থাকে—তেমনি করতেই থাকে শুধু বুলিবাজি ?"[১] সত্যই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খুব বিচক্ষণ মানুষেরই প্রয়োজন—এ কাজের জন্য সর্বোত্তম-মনাদের অবিচলিত মনোযোগ অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞ লোকদের দ্বারা পরিচালিত না হলে সমাজ কি করে রক্ষা পেতে পারে : কি করে পারে শক্তিশালী হতে ?

অভিজাত-তান্ত্রিক এসব নির্দেশের প্রতি এথেন্সের জনপ্রিয় দলগুলির প্রতিক্রিয়া কল্পনা করে দেখুন—যখন যুদ্ধের খাতিরে সব সমালোচনা বন্ধ থাকা প্রয়োজন আর যখন সংখ্যালঘু ধনী আর শিক্ষিতরা লিপ্ত বিপ্লবের ষড়যন্ত্রে ! গণতন্ত্রীদের নেতা এনিটাসের (Anytus) ভাবটা একবার বিবেচনা করে দেখুন—ওঁর ছেলে সক্রেটিসের শিষ্য আর পিতার মুখের উপর পিতৃপুরুষের দেবতাদের প্রতি হাসছিল সে বিদ্রূপের হাসি ! পুণ্যের পুরোনো ধারণার পরিবর্তে আপাতঃ সুন্দর

১ Plato's Protagoras, Sect. 329

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসামাজিক বুদ্ধিকে স্থান দিলে যে পরিণতি সম্ভব এরিস্টোফেনিস্ (Aristophenee) কি তাঁর ভবিষ্যৎবাণী করেন নি?১

তারপর শুরু হলো বিপ্লব—বিপ্লবের পক্ষে-বিপক্ষে মানুষ মৃত্যুপণ করে করলো লড়াই। গণতন্ত্রের জয়ের সঙ্গে সক্রেটিসের ভাগ্যও হলো নিরূপিত। তিনি নিজে যতই শান্তিবাদী হোন না কিন্তু তিনি ছিলেন বিপ্লবীদলের বুদ্ধিজীবী নেতা—ছিলেন ঘৃণিত অভিজাত-দর্শনের উৎস। তর্ক করে করে তরুণদের মন করে দিতেন বিকৃত। এনিটাস (Anytus) আর মেলিটাস (Malitus) দাবী করলেন: সক্রেটিসের মৃত্যুই শ্রেয়।

অবশিষ্ট কাহিনী পৃথিবীর অজানা নয়। কারণ প্লেটো কাব্যের চেয়েও মনোরম গদ্যে তা করেছেন বর্ণনা। আমরা নিজেরাও সুযোগ পেয়েছি সে সহজ সরল অথচ দুঃসাহসিক 'ক্ষমা' বা আত্মপক্ষ সমর্থন পাঠ করার—যাতে দর্শনের প্রথম শহীদ স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন আর অধিকার ঘোষণা করেছেন এবং রাষ্ট্রের জন্য তা যে কত মূল্যবান তা করেছেন ব্যক্ত। আর যে জনতাকে তিনি সব সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন তার কাছে ক্ষমা চাইতে করেছেন অস্বীকার। তাঁকে ক্ষমা করার ক্ষমতা তাদের ছিল কিন্তু আবেদন করতে তিনি করেছেন ঘৃণা। বিচারকরা যে তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন তাতেই সূচিত তাঁর মত-বাদের প্রতি এক বিশেষ সমর্থন। কিন্তু ক্রুদ্ধ জনতা তাঁর মৃত্যু-দণ্ডেরই দিলেন রায়। তিনি কি দেবতাদের অস্বীকার করেন নি? মানুষ

১ (খ্রীস্ট-পূর্ব ৪২৩) The Clouds নামক নাটকে এরিস্টোফেনিস সক্রোটিস আর তাঁর 'চিন্তার দোকান' নিয়ে অনেক রহস্য করেছেন—এখানে নাকি কেউ ভুল পথে থাকলেও তিনি যে সত্য পথে আছেন তা প্রমাণ করার শিক্ষাই হয় দেওয়া। প্রত্যেক ঋণই শোধ দেওয়া উচিত—এ কারণে ঐ বইর এক চরিত্র ফিডিপ্পিডিন (Phidiporidn) তার বাপকে ধরে মার দিতো, বাপও তাকে মারতো এ অজুহাতে। এ ব্যঙ্গ সৎ চিন্তা প্রণোদিত বলেই মনে হয় কারণ এরিস্টোফেনিসকে প্রায়ই সক্রোটিসের সংসর্গ দেখা যেতো—আর উভয়ে ছিলেন গণতন্ত্র বিরোধী। প্লেটো বইটি পড়ার জন্য ডায়োনিসাসকে (Dionysius) সুপারিশ করেছিলেন। বইটি সক্রোটিসের বিচারের ২৪ বছর আগে বেরিয়েছিল তাই মনে হয় তাঁর প্রতি যে নির্মম দণ্ডাদেশ তার জন্য এ বই তেমন দায়ী নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে গতিতে শিখতে পারে তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে যে শিখাতে চায় তার উপর অভিশাপ। জনতার এ প্রশ্ন আর এ সিদ্ধান্ত। তাই তাদের হুকুম তাঁকে হেমলক নামক বিষ পান করতে হবে। তাঁর বন্ধুরা জেলে এসে তাঁকে সহজে পলায়নের সুযোগ করে দিলেন। জেল আর স্বাধীনতার পথে যেসব কর্মচারী আর কারা-রক্ষরা বাধাস্বরূপ ছিলো তাঁর বন্ধুরা তাদের সবাইকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে ফেল্লেন। কিন্তু তিনি হলেন অসম্মত--ঐভাবে মুক্ত হতে করলেন অস্বীকার। তখন তাঁর বয়স সত্তর (খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৯৯)—হয়ত মনে করলেন মৃত্যুর সময় তাঁর হয়েছে আর মৃত্যুর এমন উপযুক্ত সুযোগ হয়ত পাবেন না আর। শোকার্ত বন্ধুদের বল্লেন—"আনন্দ কর আর বল সবাইকে তোমরা শুধু আমার দেহটাকেই সমাধিস্থ করছ"। বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অনুপম অনুচ্ছেদে প্লেটো বলেছেন: "এ কয়টি কথা বলার পর, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ক্রিটোকে সঙ্গে করে গোসলখানায় গিয়ে ঢুকলেন। ঢোকার সময় ক্রিটো আমাদের বল্লেন অপেক্ষা কর। আমরা অপেক্ষা করে রইলাম—ভাবতে লাগলাম, আলাপ করতে লাগলাম আমাদের দুঃখ সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন আমাদের পিতার মতো, সেভাবে শোকাভিভূত হলাম আমরা, এখন থেকে আমাদের বাকী জীবন কাটবে এতিমের মতো...... ভিতরে তাঁর অনেকক্ষণ কাটলো, সূর্য প্রায় অস্ত গমনোন্মুখ। এবার তিনি বাইরে এসে আমাদের মধ্যে আবার আসন গ্রহণ করলেন......কিন্তু বিশেষ কিছু বল্লেন না। তখুনি কারা-অধ্যক্ষ ঢুকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো: "এ কারাগারে যারাই এসেছে তাদের মধ্যে, হে সক্রেটিস, তোমাকে আমি সবচেয়ে মহৎ আর সবচেয়ে ভদ্র বলেই জানি। সরকারী হুকুম তামিল করতে গিয়ে আমি যখন অন্য দণ্ডিতদের বিষ-পানের নির্দেশ দিই তখন তারা রেগে আমাকে অভিশাপ দেয়, তুমিও সেরকম করবে তা আমি মনে করি না। আমি জানি তুমি আমার উপর রাগ করবে না—কারণ,তুমি জানো, আমি নই অন্যেরাই এর জন্য দায়ী। বিদায় শুভ হোক, যা অনিবার্য; সানন্দে তা সহ্য কর—আমার উপর কি হুকুম তা তোমার অজানা নয়। কথা কয়টি বলে অশ্রু-প্লাবিত চোখে সে ফিরে দাঁড়ালো এবং বেরিয়ে গেলো।

সক্রেটিস তার দিকে তাকিয়ে বল্লেন: "প্রত্যুত্তরে আমিও তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ কামনা করি—তুমি যা বলেছ সে মতই করব আমি"। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বল্লেন: "কি চমৎকার মানুষ! জেলে আসার পর থেকে লোকটি আমাকে প্রায় দেখতে আসতো আর এখন দেখো তার কি গভীর শোক আমার জন্য। ক্রিটো, ওর কথা মতোই আমরা কাজ করব—বিষ-পাত্র যদি তৈয়ের হয়ে থাকে নিয়ে আসতে বলো আর তৈয়ের না হলে পরিচারককে তৈয়ের করতে বলে দাও।"

ক্রিটো বল্লেন: "এখনো পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য দেখা যাচ্ছে। অনেকে (অর্থাৎ দণ্ডিতদের) এর অনেক পরেও বিষ পান করে। দণ্ড ঘোষিত হওয়ার পর কেউ কেউ খানা-পিনা করে ফূর্তিতে মত্ত হয়ে ওঠে। কাজেই তাড়াহুড়া করার কিছুই নেই। এখনো সময় আছে।"

সক্রেটিস্ বল্লেন: "ক্রিটো, তুমি যাদের কথা বল্লে তারা ঠিকই করে—কারণ তাদের বিশ্বাস বিলম্বে তারা লাভবান হয় কিন্তু আমি যখন বিলম্বে পান (বিষ) করলে আমার কোন ফায়দা হবে এ বিশ্বাস করি না তখন আমার বেলায় আমার সিদ্ধান্তই ঠিক—যে জীবন ইতিমধ্যে নিঃশেষিত তাকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি, সেত শুধু নিজেকে নিজের কাছে হাস্যাস্পদ করা। মেহেরবানী করে আমি যা বলছি তাই করো—প্রত্যাখ্যান করো না আমার কথা।"

একথা শোনার পর ক্রিটো চাকরকে ইশারা করলেন। চাকরটা ভিতরে ঢুকলো। অল্পক্ষণ পরে কারা-রক্ষককে সঙ্গে নিয়ে বিষপাত্র হাতে সে ফিরে এলো। সক্রেটিস কারা-রক্ষককে বল্লেন: "বন্ধু, তুমি এসব ব্যাপারে পারদর্শী, কিভাবে অগ্রসর হতে হবে আমাকে বলে দাও।" লোকটি বল্লে: "(পান করার পর) তুমি শুধু ঘরময় পায়চারি করতে থাকবে, পা যখন ভারী হয়ে আসবে তখন শুয়ে পড়বে—বিষের ক্রিয়া এবার শুরু হবে।" এ সময় ও বিষ-পাত্রটি সক্রেটিসের হাতে তুলে দিলে—নির্ভয়ে, কিছুমাত্র বিবর্ণ না হয়ে, স্বাভাবিক পূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত সহজ বিনয়ের সাথে সক্রেটিস পাত্রটি গ্রহণ করলেন এবং বল্লেন: "কি বল, এ পাত্রের কিছু পানীয় দিয়ে কোন দেবতার তর্পণ করলে কেমন হয়? করব, না কি করব না?" লোকটি উত্তরে বল্লে: "সক্রেটিস্, যতটুকু প্রয়োজন আমরা শুধু ততটুকুই প্রস্তুত করে থাকি।" সক্রেটিস বল্লেন: "বুঝতে পেরেছি। তবুও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ জগৎ থেকে অন্য জগতে আমার ভ্রমণটা যাতে সুখের ও শান্তির হয় সে জন্য দেবতাদের কাছে আমার প্রার্থনা করা উচিত"এবং আমি তা করব—আমার এ প্রার্থনা, এ প্রাথনাটুকু যেন কবুল হয়।" তারপর পান-পাত্রটি ঠোঁটে লাগিয়ে বিষটা সানন্দে পান করে ফেল্লেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনেকে আমাদের শোক দমন করে রেখে-ছিলাম, কিন্তু যখন তাঁকে পান করতে দেখলাম আর দেখলাম পানপাত্র নিঃশেষিত তখন আমরা আর কিছুতেই নিজেদের দমন করে রাখতে পারলাম না। বিপরীত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার নিজের চোখও হয়ে গেল অশ্রু-প্লাবিত—লুকোবার জন্য মুখ ঢাকলাম এবং লুকিয়ে লুকিয়েই কাঁদলাম। আমার কান্না তাঁর জন্য নয়—এমন মূল্যবান সঙ্গীকে যে হারালাম সামনের সে দুর্দিন স্মরণ করেই আমার কান্না। শুধু আমি নই, ক্রিটো যখন নিজের অশ্রু আর সংবরণ করতে পারলো না তখন উঠে দূরে সরে গেলো, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। হঠাৎ এসময় এপোলোডোরাস (Apollodoras) যিনি সারাক্ষণ ধরে কাঁদছিলেন হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন যে, আমরা সবাই ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেলাম। শুধু সক্রেটিসই রইলেন শান্ত, নির্বিকার—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "কিসের জন্য এমন অদ্ভুত কান্না? যাতে এভাবে শান্তি ভঙ্গ করতে না পারে তাই তো মেয়েদের আমি আগে সরিয়ে দিয়েছি—আমি শুনেছি পুরুষের শান্তির সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করা উচিত। কাজেই শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারন করো।" তাঁর এ কথা শুনে আমরা লজ্জিত হলাম এবং কান্না থামালাম। তিনি পায়চারি করতে লাগলেন—পরে বল্লেন তাঁর পা অচল হয়ে আসছে। নির্দেশ মতো এবার তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। যে লোকটি তাঁর হাতে বিষ-পাত্র দিয়েছিল সে এবার বার বার তাঁর পায়ের দিকে তাকাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর লোকটি তাঁর পায়ের পাতায় জোরে চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো তিনি কিছু অনুভব করতে পারছেন কিনা। তিনি বল্লেন, "না।" তার পর তাঁর পা—ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে চাপ দিয়ে আমাদের দেখালো তাঁর দেহ ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারপর সক্রেটিস নিজেও হাত দিয়ে অনুভব করে বল্লেন: "বিষটা হৃদ্‌পিণ্ডে পৌঁছলেই সব শেষ হয়ে যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর কোমরের দিক ঠাণ্ডা হয়ে এলো—(মুখটা তিনি ঢেকে রেখেছিলেন) এবার আবরণ-মুক্ত করে বল্লেন—এটিই তাঁর শেষ কথা : "ক্রিটো, এস্কেলেপিয়াস্ (Asclepius) আমার কাছে একটি মোরগ পাবে, তুমি মনে করে আমার এ ঋণটা শোধ করবে ত?" ক্রিটো বল্লেন : "ঋণটা শোধ করা হবে। আর কিছু বলার আছে?" এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর মিল্ল না—দু'এক মিনিটের মধ্যে একটা নড়েওঠার শব্দ শুধু শোনা গেল। পরিচারক তাঁর মুখাবরণ উন্মোচন করলো —দেখা গেল তাঁর চক্ষু স্থির, অকম্পিত। ক্রিটো এবার তাঁর চোখের পাতা আর মুখ বন্ধ করে দিলো।

যে বন্ধুকে আমি আমার পরিচিতদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ, সবচেয়ে ন্যায়বান আর সর্বোত্তম মানুষ বলেই অভিহিত করতাম তাঁর জীবনাবসান এভাবেই ঘটলো!"

৩ প্লেটোর প্রস্তুতি

AMARBOI.COM

সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্লেটোর জীবনের গতিই গেল বদলে। আরাম-ঐশ্বর্য্যের ভিতরই তিনি মানুষ—সুশ্রী ও বলিষ্ঠ-দেহ তরুণ। চওড়া-স্কন্ধের জন্যই নাকি তাঁকে ডাকা হতো প্লেটো বলে—সৈনিক হিসেবেও ছিলেন কৃতী আর ইস্থমিয়ান (Isthmia) ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দু-দু'বার পেয়েছেন বিজয়ীর পুরস্কার। এভাবে যাঁদের কৈশোর কাটে তাঁদের থেকে সাধারণতঃ ঘটে না দার্শনিকের আবির্ভাব। কিন্তু প্লেটোর সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মন সক্রেটিসের 'কথোপকথন'-ক্রীড়ায় পেলেন অসীম আনন্দ। সক্রেটিসের তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে স্থিতিশীল নির্বিচার বিশ্বাস আর কল্প-রূপকে জর্জরিত হতে দেখে তিনি পুলকিত হয়ে উঠতেন। কঠিন মল্ল-যুদ্ধে যে একাগ্রতা নিয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন সে একাগ্রতা নিয়ে এ ক্রীড়ায়ও হলেন শরিক এবং 'হুল ফুটানো মক্ষীকার (সক্রেটিস এ বলে নিজের পরিচয় দিতেন) পরিচালনায়, তর্ক-বিতর্কের সীমা পার হয়ে সযত্ন বিশ্লেষণ আর অর্থ-পূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে তার ঘটলো উত্তরণ। হয়ে পড়লেন জ্ঞান এবং তাঁর শিক্ষা-গুরু উভয়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি প্রায় বলতেন : "বর্বর না হয়ে আমি যে গ্রীক, দাস না হয়ে আমি যে স্বাধীন আর নারী না হয়ে আমি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ হয়ে জন্মেছি তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—তার চেয়েও বেশী ধন্যবাদ এ কারণে যে আমি জন্মেছি সক্রেটিসের যুগে।"

গুরু সক্রেটিসের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আটাশ—এক শান্ত নির্বিরোধ জীবনের অমন নির্মম অবসান শিষ্যের চিন্তার প্রতি স্তরেই রেখে গেছে দাগ। ফলে জন্ম ও বংশের কৌলিন্য আভিজাত্যকে ছাড়িয়ে তাঁর মনে জনতা আর গণতন্ত্রের প্রতি এক দারুণ ঘৃণার হয়েছিল সঞ্চার। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে উত্তম আর বিজ্ঞদের শাসন কায়েম করার এক অনমনীয় সংকল্প তিনি করলেন গ্রহণ। কি করে বিজ্ঞ আর উত্তমদের খুঁজে বার করে শাসন-ভার নেওয়ার জন্য রাজি করান যায় এখন থেকে এ হলো তাঁর সর্ব-ক্ষণের ভাবনা।

সক্রেটিসকে তিনি বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন—একারণে গণতান্ত্রিক নেতারা এবার তাঁকেও করতে লাগলেন সন্দেহ। বন্ধুরা বল্লেন এথেন্স তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়—আর পৃথিবী দেখার এই এক স্বর্ণ সুযোগ। কাজেই সে বছর খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৯৯-তে তিনি যাত্রা করলেন বিদেশ ভ্রমণে।

তিনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন সুনিশ্চিতভাবে তা আমরা বলতে পারি না—কর্তৃপক্ষের অবিরাম চেষ্টা ছিল তাঁর পথানুসরণের। মনে হয় তিনি প্রথমে মিশর গিয়েছিলেন—সেখানকার পুরোহিত-শাসকদের মুখে গ্রীস যে একটা স্থিতিশীল ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি-হীন শিশু-রাষ্ট্র মাত্র, এসব নীল-নদীয় নৃ-সিংহ-মূর্তি-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে পাত্তা পাওয়ারই যোগ্য নয় একথা শুনে তিনি অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু অবাক হওয়াটা শিক্ষার পথে প্রধান পদক্ষেপ—এ পণ্ডিত শ্রেণী একটা অচল কৃষি-ভিত্তিক জাতিকে শুধু শাস্ত্র দিয়ে শাসন করছিলেন এ স্মৃতি তাঁর মনে সব সময় ছিল জাগ্রত আর তাঁকে দিয়েছিল তাঁর ইউটোপিয়া (Utopia) রচনায় প্রেরণা। মিশর থেকে এবার তিনি যাত্রা করলেন সিসিলি—তারপর ইটালি—সেখানে তিনি স্বনামখ্যাত পিথাগোরাস্ প্রতিষ্ঠিত স্কুল বা দলে কিছুদিনের জন্য দিয়েছিলেন যোগ। তাঁর সূক্ষ্ম মনে এ ক্ষুদ্র দলটি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যেভাবে সরল জীবনযাপন করতো আর চর্চা করতো আইন-শৃঙ্খলা আর পাণ্ডিত্য তাও করেছিল রেখাপাত। জ্ঞানের প্রতি তীর্থে বসে, সব উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করে আর প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসকে যাচাই করে তিনি সুদীর্ঘ বারো বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটিয়ে দিলেন দেশ-দেশান্তরে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি জুডিয়াতেও (gudea) গিয়েছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক নবীদের ঐতিহ্য তাঁর মনকে করেছিল প্রভাবিত—এমন কি গঙ্গা-তীর পর্যন্তও নাকি তিনি এসেছিলেন এবং পরিচিত হয়েছিলেন হিন্দু-মরমবাদের সঙ্গে। এসব বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য আমাদের জানা নেই।

খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৮৭-তে তিনি ফিরে আসেন এথেন্সে। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। বহু দেশের জ্ঞান আর বিচিত্র জাতের মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর মন এখন পরিপক্ক। যৌবনের উষ্ণতা এখন কিছুটা মন্দীভূত কিন্তু চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বুঝতে পেরেছেন সব চরমই অর্ধ-সত্য, প্রতি সমস্যারই আছে নানাদিক, যথাযথ বন্টনের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সত্যের চেহারা। জ্ঞান এবং শিল্প-বোধ এ দুই-ই তাঁর ছিল—একই আত্মায় কবি আর দার্শনিক একই সঙ্গে বসতি করেছিল এ একবারের মতোই এবং নিজের জন্য প্রকাশের এমন এক মাধ্যম তিনি সৃষ্টি করেছিলেন যাতে সত্য এবং সৌন্দর্য যুগপৎ নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় করতে সক্ষম আর পায় যথাযথ স্থান। এরি নাম—'কথোপকথন'। ইতিপূর্বে, এমন কি পরেও দর্শনকে এমন চমৎকার সাজে আর দেখা যায় নি। এমনকি অনুবাদেও এ রচনাশৈলী উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, মুখর ও উৎফুল্ল। তাঁর অন্যতম অনুরাগী শেলী বলেছেন: "প্লেটোতে সমন্বয় ঘটেছে ঘনিষ্ঠ আর সূক্ষ্ম যুক্তিবাদের সঙ্গে দৈব-বাণীর কবিত্বময় দীপ্তি—তাঁর যুগের ঐশ্বর্য-গরিমা আর সুসংগতি গলে যে অপ্রতিরোধ্য সাংগীতিক উপলব্ধির স্রোতে পরিণত হয়েছে তা এক রুদ্ধ-নিশ্বাস দ্রুতগতিতে আমাদেরে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।" এ তরুণ দার্শনিক যে নাটক দিয়ে রচনা শুরু করেছেন তা অকারণ নয়। তাঁর রচনা, দর্শন, কবিতা, বিজ্ঞান আর শিল্পের এক অদ্ভুত মিশ্রণের ফলে পাঠকের মনে এমন নেশার সৃষ্টি করে যে, তাঁকে বুঝে ওঠাই কঠিন হয়ে পড়ে।

কিভাবে এবং কথপোকথনের কোন চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখক কথা বলছেন অনেক সময় তাও ধরা যায় না—বুঝতে পারা যায় না তিনি আক্ষরিক না আলঙ্কারিক ভাষায় বলছেন কথা—কৌতুক করছেন না কথা বলছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। সময় সময় তাঁর শ্লেষ, কৌতুক আর উপকথা প্রীতি আমাদের হতবুদ্ধি করে ছাড়ে। গল্পচ্ছলে ছাড়া তিনি

৩—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন শিক্ষাই দেন নি—একথা জোর করে বলা যায়। তিনি তাঁর প্রোটেগোরাসদের (Protagoras) জিজ্ঞাসা করতেন: "বল তোমাদের কাছে আমি তরুণের প্রতি এক বয়োবৃদ্ধের নীতি গল্পের মতো করে না উপকথায় আলাপ করব?" বলা হয়েছে প্লেটো এসব কথোপকথন লিখেছিলেন তাঁর কালের সাধারণ পাঠকশ্রেণীর জন্য। আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিতে, ভালো-মন্দ দু'দিক বিশদভাবে আলোচনা করে বিষয়ের ক্রম-বিকাশ সাধন করা হতো—গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলোর পুনরাবৃত্তির দ্বারা (আজ তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হলেও) তখনকার যে সব মানুষের কাছে দর্শন অতিরিক্ত বিলাসের মতো ছিলো তাদের নিশ্চয়ই তা বোধগম্য হতো। জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে যাদের পড়তে হতো দ্রুত ধাবমান মানুষের মতো। এসব কথোপকথনে তাই আমরা দেখতে পাই এমন অনেক কিছু যা আমোদজনক আর রূপক—অনেক কিছুই যারা প্লেটো-যুগের সমাজ আর সাহিত্যের খুঁটিনাটি খবর সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয় তাদের কাছে থেকে যায় দুর্বোধ্য। আজ যা আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক ও খেয়ালী মনে হচ্ছে তাই হয়তো দর্শনে অনভিজ্ঞদের কাছে গুরুপাক চিন্তাকে স্বাদে গন্ধে সহজপাচ্য করে তুলেছিল।

স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে সব গুণাবলীকে প্লেটো নিন্দা করতেন তাঁর মধ্যেও তা প্রচুর বিদ্যমান ছিল। তিনি কবি আর কবি-রচিত উপকথাকে খুবই গাল দিতেন কিন্তু নিজে কবিদের আর একটি, আর উপকথার শত শত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এগিয়ে যেতেন। তিনি পুরোহিতদের নিন্দা করতেন। (যারা ঘুরে ঘুরে মানুষকে নরকের ভয় দেখায় আর কিছু প্রাপ্তির বিনিময়ে তার থেকে মুক্তির দেয় আশ্বাস—(The republic পৃঃ ৩৬৪) কিন্তু নিজে ছিলেন পুরোহিত, শাস্ত্রবিদ্, প্রচারক, অতি-নীতিবাদী—চরম রক্ষণশীলের মতো শিল্পকে করতেন নিন্দা আর গর্বিতের জন্য করতেন নরকাগ্নির ব্যবস্থা। শেক্সপিয়রের মতো মনে করতেন: "তুলনা করা ব্যাপারটি বড় পিচ্ছিল"। কিন্তু তাঁর নিজেরই পতন ঘটতো একটার পর আর একটায়—আর একবার, তারপর আর একবার। তিনি সপিষ্ট তথা ভ্রাম্যমাণ বুদ্ধিবাদীদের কথা সর্বস্ব ঝগড়াটে বলে নিন্দা করতেন কিন্তু তিনি নিজে যুক্তিবাদকে আনাড়ী ছাত্রের মতো কোপ মারতে করতেননা দ্বিধা। ফেগোয়েট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Faguaet) তাঁকে ব্যঙ্গ করেছেন এভাবে ঃ "খণ্ডের চেয়ে অখণ্ড বড় নয় কি ? নিশ্চয়ই। এবং খণ্ড কি অখণ্ডের চেয় কম নয় ? হাঁ...তা হলে দার্শনিকদেরই কি রাষ্ট্র শাসন করা উচিত নয় ? — ওটা কি এটা খুবই পরিষ্কার—চলো ওটা আবার পুনরাবর্তন করা যাক।"

তাঁর সম্বন্ধে এ নিন্দাটুকুই আমরা করতে পারি—এ করার পরও স্বীকার করতে হবে Dialogues বা প্লেটোর 'কথোপকথন' পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ। এর শ্রেষ্ঠাংশ 'The Republic' হচ্ছে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ রচনা—প্লেটো যাকে রূপান্তরিত করেছেন গ্রন্থে। এখানে আমরা পরিচয় পাই তাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান, ধর্ম-তত্ত্ব, নীতি-বোধ, মনস্তত্ত্ব, পাণ্ডিত্য, রাজনীতি আর শিল্প সম্বন্ধে তাঁর মতামতের। এখানে আমরা আধুনিকতা আর হাল সমস্যারও ধূমায়িত আভাস দেখতে পাই। সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, নারী সমস্যা, গর্ভ-নিরোধ, বংশ-উন্নতি, নীট্শীয় নীতি আর আভিজাত্য সমস্যা,। রুশোর ইচ্ছা-মতো শিক্ষা আর প্রকৃতি-প্রত্যাবর্তন, বার্গসঁর পরম তৃষা' আর ফ্রয়ডীয় মনো-বিশ্লেষণ সবই আছে এখানে। শিক্ষিতজনের জন্য এ গ্রন্থ এক অসামান্য ভোজ—গৃহ-কর্তা যা পরিবেশন করেছেন অকৃপণ হস্তে। ইমার্সনের ভাষায় ঃ "প্লেটোই দর্শন আর দর্শনই প্লেটো" এবং ওমর কোরান সম্বন্ধে যা বলেছেন তিনি তা The Republic' সম্বন্ধেও করেছেন প্রয়োগ ঃ "লাইব্রেরী-গুলি জ্বালিয়ে ফেলো, কারণ তার সব গুণ বা মূল্য এ বইতেই আছে।"[১] চলুন 'The Republic' বইটা অধ্যয়ন করা যাক।

৪. নৈতিক সমস্যা

আলোচনা চলছিল ধনী অভিজাত সেপেলাসের (Cephalus) গৃহে। দলে আছেন প্লেটোর দুই ভাই গ্লেক'ন (glaucon) আর এডেমেন্টাস (Adeimantus)—এবং বুদ্ধিবাদী থ্রেসিমেকাস (Thrasymachus), যে সামান্যে উত্তেজিত হয়ে পড়তো আর ছিল বেজায় কটুভাষী। 'কথোপকথনে' প্লেটোর মুখপাত্র হয়েছেন সক্রেটিস্—সক্রেটিস সেপেলাসকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ধন-সম্পদ থেকে সবচেয়ে বেশী ফায়দা তুমি কি পেয়েছ বলে মনে কর ?"

---

১. Representative men P 41

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেপেলাস উত্তরে বল্লেন : ধন সম্পদ তাঁকে উদার, সৎ আর ন্যায়বান হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। সক্রেটিস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্যের সঙ্গে ফের জিজ্ঞাসা করলেন—ন্যায়বিচার অর্থে তুমি কি মনে কর ? এ বলে দার্শনিক তর্ক-যুদ্ধের সব কুকুরগুলিকে এবার দিলেন ছেড়ে। কারণ সংজ্ঞা নিরূপনের চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই এবং মানসিক দক্ষতা আর পরিচ্ছন্নতার এ এক কঠোর পরীক্ষা। যে সংজ্ঞাই দেওয়া হয় সক্রেটিস সে সবকে একটার পর একটা ধূলিস্মাৎ করে ছাড়েন। অবশেষে অপেক্ষাকৃত কম ধৈর্যশীল থ্রেসিমেকাস চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন : "সক্রেটিস, তোমাকে কি বোকামীতে পেয়েছে ? এমন আহাম্মকের মতো একের পায়ে অন্যের মাথা নত করা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো কেন ? ন্যায় বিচার কাকে বলে তা জানাই যদি উদ্দেশ্য, প্রশ্ন না করে তুমি নিজে উত্তর দিলেই তো পারো •••শুধু অন্যের মত খণ্ডন করেই গর্ব-বোধ করো না। কারণ বহু লোক আছে যারা উত্তর দিতে পারে না কিন্তু পারে প্রশ্ন করতে।" (৩৩৬)

সক্রেটিস্ দমলেন না—উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করেই চল্লেন। মিনিট-খানেক এভাবে এড়িয়ে গিয়ে শেষে তিনি অসতর্ক থ্রেসিমেকাসকেই সংজ্ঞা দানে উসকাতে সক্ষম হলেন :

ক্রুদ্ধ বুদ্ধিবাদী (থ্রেসিমেকাস) বল্লেন : "শোন তবে—আমি ঘোষণা করছি শক্তিই ন্যায় আর অধিকার এবং শক্তিমানের স্বার্থই হচ্ছে ন্যায়-বিচার। বিভিন্ন রাষ্ট্র তা গণতন্ত্র কি অভিজাততন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র যাই হোক তারা নিজ নিজ স্বার্থেই রচনা করে আইন, আইনগুলো এভাবে রচিত হয়েছে যাতে ওদের স্বার্থই হয় রক্ষিত আর এ আইনগুলোই 'ন্যায় বিচারের' নামে তারা প্রজাদের উপর চালায় এবং কেউ এ আইন লঙ্ঘন করলে 'অপরাধের' নামে ওকে দিয়ে থাকে শাস্তি —ব্যাপক অর্থেই আমি 'অপরাধ' শব্দটার ব্যবহার করছি। আমার কথার অর্থ স্বৈরতন্ত্রে সবচেয়ে প্রকট—যেখানে ছলে-বলে-কৌশলে অন্যের সম্পত্তি খুচরোভাবে নয় পাইকারী ভাবেই নেওয়া হয় কেড়ে। এভাবে কেউ যদি নাগরিকদের অর্থ কেড়ে নিয়ে ওদেরে দাসে পরিণত করে তাকে লোকে চোর-জোচ্চোর না বলে বরং বলে বড্ড সুখী আর ভাগ্যবান মানুষ। যারা অন্যায়কে নিন্দা করে অন্যায়ের প্রতি তাদের নিজেদের যে কিছুমাত্র অনীহা আছে তা নয়—তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারআশঙ্কায় তা করে থাকে।" (৩৩৮-৪৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ মতবাদের সঙ্গে আজকের দিনে নীট্শের নাম জড়িত। "যে সব ক্ষীণ-প্রাণ দুর্বলেরা নিজেদেরে সাধু মনে করে তাদের কথা স্মরণ করে আমি বহুবার হেসেছি কারণ তারা যে সাধু তার কারণ তাদের থাবা খোঁড়া।"[১] কথাটার সংক্ষিপ্ত সার দিয়েছেন স্টেরনার (Stirner) এভাবে: "এক থলে অধিকারের চেয়ে এক মুষ্টি ক্ষমতা অনেক বেশী মূল্যবান।" গর্জিয়াস্ (Gorgias : 483) নামক অন্য একটা কথোপ-কথনে স্বয়ং প্লেটো এ মতবাদটা যেভাবে বর্ণনা করেছেন দর্শনের ইতিহাসে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বর্ণনা নাই বল্লেই চলে। ওখানে বুদ্ধিবাদী কলিকল্স্ (Collicles) নীতি কথাকে এ বলে নিন্দা করেছেন যে ওটা বের করা হয়েছে শক্তিমানের শক্তিকে কিছুটা খর্ব করে নিরপেক্ষ করে তোলার জন্যই।

"তারা নিজেদের স্বার্থেই করে থাকে প্রশংসা আর নিন্দা। তারা বলে অসাধুতা লজ্জাকর আর অন্যায়: অসাধুতা মানে নিজের প্রতিবেশী থেকে বেশী পাওয়ার ইচ্ছা। নিজেদের হীনাবস্থা সম্বন্ধে সচেতন বলে সমতা অর্জন করতে পারলেই ওরা খুশী। কিন্তু যদি এমন কোন শক্তিমানের আবির্ভাব ঘটে (অতি-মানবের আবির্ভাব) যে নিজের ক্ষমতা বলে এসবকে ভেঙ্গে চুরমার করে বেরিয়ে পড়বে—আমাদের সব রীতি-নীতি, আইনকানুন আর সবরকম মোহ আর যাদু, যা প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ স্বরূপ তা সব সে মাড়িয়ে তচ্নচ্ করে দেবে! যে সত্যি সত্যি বাঁচতে চায় তার উচিত নিজের বাসনা-কামনাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া। কিন্তু পূর্ণ পরিণতির পর সে সবকে দমন করার আর সব ইচ্ছার তৃপ্তি সাধনের সাহস আর বুদ্ধি তার থাকা চাই। এটাকেই আমি স্বাভাবিক ন্যায় বিচার আর মহত্ত্ব বলে স্বীকার করি। কিন্তু অনেকে তা করতে পারে না। ফলে তারা সক্ষমদের নিন্দা করে বেড়ায়। তারা নিন্দার আড়ালে ঢাকতে চায় নিজেদের অক্ষমতাকে—ফলে বলে বেড়ায় ওরা অসংযত আর হীন...। মহত্ত্বর স্বভাবকে ওরা দাস করে রাখে আর স্রেফ নিজেরা ভীরু বলেই ন্যায় বিচারের করে তা'রীফ়।"

এরকম ন্যায় বিচার ভৃত্যের নীতি-জ্ঞানের পরিচায়ক অন্য মানুষের

---

১. Thus Spake Zarathustra, p. 166

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়—এর নাম দাস-নীতিবোধ, বীরনীতি-বোধ এ নয়। মানুষের সত্যিকার গুণ হচ্ছে সাহস আর বুদ্ধি।

সম্ভবতঃ এ সুকঠিন 'নীতিহীনতা' থেকেই এথেনীয় বৈদেশিক নীতিতে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ঘটে আর দুর্বলতর রাষ্ট্রগুলোর প্রতি নির্মম ব্যবহারেরও বোধ করি এ-ই কারণ। তুসিডিডিটেস্ (Thusydites) পেরিক্লেসের (Pericles) যে দৈববাণী জুগিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে: "তোমার সাম্রাজ্য প্রজাদের সদ্ইচ্ছার উপর নয় তোমার শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত"। ঐ একই ঐতিহাসিক এথেনীয় রাষ্ট্র দূতেরা স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মেলোদের কিভাবে বাধ্য করেছিল তার বর্ণনাও দিয়েছেন: "আমাদের মতো তোমরাও ভালোভাবেই জানো দুনিয়া যেভাবে চলছে তাতে অধিকার বা ন্যায়ের কথা শুধু সম-ক্ষমতাসীনদের বেলাতেই খাটে। শক্তিমানেরা যা খুশী তাই করে আর দুর্বলেরা যা কষ্ট ভোগ করার তা করবেই।"

এখানে আমরা নীতি-জ্ঞানের মূল সমস্যারই সম্মুখীন—নৈতিক ব্যবহারের যা আসল প্রশ্ন। ন্যায়-বিচার কি? আমরা কি সততার সন্ধান করব না ক্ষমতার? সৎ হওয়া ভালো না শক্তিমান হওয়া?

সক্রেটিস তথা প্লেটো কি করে এ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন? প্রথমে দিকে তিনি এর মুখোমুখীই হন নি। তিনি বলেছিলেন সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্ভরশীল ব্যক্তি-সম্পর্কই ন্যায়-বিচার—তা হলেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের গুণ হিসেবে না দেখে সমাজ-গঠনের অঙ্গ হিসেবে তার অধ্যয়ন হবে সহজতর। তাঁর বক্তব্য: ন্যায়শীল রাষ্ট্রের ধারণা করতে পারলেই ন্যায়বান ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়াও হবে সহজ। তাঁর এ যুক্তির সমর্থনে প্লেটোর সাফাই হচ্ছে—কারো দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করতে আমরা যেমন প্রথমে বড় হরফ, ক্রমে ক্ষুদ্রতর হরফ পড়তে দিই, তেমনি ন্যায় বিচারের বেলায়ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষুদ্র পরিধি থেকে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় পরিধিতে যাচাই করাই সহজতর। আমরা যেন প্রতারিত না হই—প্রকৃতপক্ষে গুরুজি দুই কেতাবকে একই সঙ্গে বেঁধেছেন আর যুক্তিকে ব্যবহার করেছেন জোড়ন হিসেবে। তিনি শুধু যে ব্যক্তিগত নীতিকথাই আলোচনা করতে চেয়েছেন তা নয়—সামাজিক আর রাজনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যাও তাঁর আলোচ্য ছিল। তাঁর আস্তিনের ভিতর ইউটোপিয়া বা 'সব পেয়েছির দেশ' একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলই এবং মনে মনে তা প্রকাশের সংকল্পও করেছিলেন তিনি। অপ্রাসঙ্গিকতা তাঁর গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়েছে এবং তাতেই আছে সার-কথা—এইটুকু মনে রাখলে মনে আর কোন অভিযোগ থাকে না।

৫. রাজনৈতিক সমস্যা

প্লেটো বলেছেন: মানুষ সরল হলে বিচারও সরল হবে। এক বিপ্লবী সাম্যবাদই যথেষ্ট। মুহূর্তের জন্য তিনি যেন তাঁর কল্পনার) পাখায় ভর করলেন:

"প্রথমে বিবেচনা করে দেখা যাক ওদের (সরল মানুষের জীবন কেমন হবে···ওরা কি শস্য উৎপাদন করবে, না মদ, কাপড়, জুতো তৈয়রী করবে না বানাবে না নিজেদের জন্য ঘরবাড়ী? গরমের সময় তারা খালি গা আর খালি পায়ে করবে কাজ আর শীতের সময় করবে প্রয়োজনীয় জামা-জুতু পরে। গম, যব খেয়ে তারা জীবন ধারণ করবে—আটা করবে, ময়দা মাখবে, চমৎকার রুটি আর পুডিং করবে, মাদুরে অথবা পরিচ্ছন্ন পাতায় তা করবে পরিবেশন, সবুজ বিছানায় বা কুঞ্জবনে দেহটা দেবে এলিয়ে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভোজ লাগাবে, পান করবে নিজেদের তৈয়রী মদ। মাথায় পরবে ফুলের মালা, ঠোঁটে করবে দেবতার প্রশংসা। তারা বাস করবে এক সুখী সমাজে—শুধু নজর রাখবে পরিবারগুলো যেন সম্বলের সীমা ছাড়িয়ে না যায়। দারিদ্র্য আর যুদ্ধের প্রতি তারা রাখবে সতর্ক নজর·· অবশ্য নুন, জলপাই, পনির, পিঁয়াজ, বাঁধাকপি এবং আরো সব দেশীয় শাক-সব্জি যা সিদ্ধ করা যায় তাও তারা সানন্দে খাবে। আমরা তাদের খাওয়ার পর কিছু ফল ভক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে পারি। যেমন—ডুমুর, মটর, শীমের দানা, সবুজ জাম ইত্যাদি যা তারা আগুনে সেঁকে নেবে। পান করবে তারা পরিমিত বোধের সঙ্গে। এরকম খাদ্য খেয়ে বেশ শান্তিতে তারা পরিণত বৃদ্ধকাল পর্যন্ত থাকবে বেঁচে এ আশাই করা যায় আর নিজেদের পরে এ জীবনের উত্তরাধিকার দিয়ে যাবে নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে।" (২৭৩)

জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (সম্ভবতঃ শিশু-হত্যার দ্বারা:), নিরামিষ-ভক্ষণ, 'প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া' ইত্যাদি জীবনের আদিম সারল্য—হিব্রু পুরান-বর্ণিত স্বর্গোদ্যানে দেখা যায় যার চিত্র এ বর্ণনায় তারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আভাস লক্ষ্য গোচর। সবটা মিলিয়ে 'মনুষ্যদ্বেষী' ডায়োজেনেসের (Diogenes) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়--যিনি বলতেন: "জন্তু জানোয়ার হয়ে জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গেই আমাদের বাস করা উচিত—তারা কত শান্ত এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ।" সময় সময় প্লেটোকে আমাদের সেন্ট্ সাইমন, ফোরিয়ার, উইলিয়াম মরিসন আর টলস্টয়ের শ্রেণীভুক্ত করতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু এসব শান্তিবাদীদের তুলনায় তিনি কিছুটা বেশী সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি যে সহজ স্বর্গের বর্ণনা দিয়েছেন তা বাস্তবায়িত হয় না কেন? এসব ইউটোপিয়া বা 'সব পেয়েছির দেশ' মানচিত্রে দেখা দেয় না কেন? এসব প্রশ্ন তিনি শান্তভাবে এড়িয়ে যেতেন।

তাঁর উত্তর ছিল: লোভ আর বিলাসের জন্যই তা হচ্ছে না। সরল জীবনে মানুষ সন্তুষ্ট নয়—তারা অধিকার প্রবণ। উচচাভিলাসী, প্রতিযোগিতাশীল আর ঈর্ষাপরায়ণ। তারা যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না—যা তাদের নেই অনতিবিলম্বে তার জন্য হয়ে ওঠে লালায়িত। যা অন্যের তা পাওয়ার জন্যই তাদের বাসনা হয়ে ওঠে অদম্য। ফলে একদল অন্যদলের এলেকায় অনধিকার প্রবেশ করে বসে। শুরু হয় ভূমি-সম্পদের জন্য দলীয় প্রতিযোগিতা—তার পরেই যুদ্ধ। বাণিজ্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে নতুন শ্রেণী-বিভাগ। "প্রত্যেক নগরেই রয়েছে দু'টি নগর—এক গরীবের দ্বিতীয় ধনীর আর এরা পরস্পর সংগ্রাম--রত। প্রতি অংশে বা শ্রেণীতে আছে ক্ষুদ্রতর অংশ বা উপশ্রেণী—এদের একই রাষ্ট্র মনে করা হলে ভয়ানক ভুল করা হবে।" (৪২৩) ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে—তারা অর্থ আর অর্থের বিশিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা পেতে চায় সামাজিক পদমর্যাদা: "তারা নিজেদের স্ত্রীর জন্য খরচ করে প্রচুর" (৫৪৮)। ধন-বন্টনের এ পরিবর্তনে রাজনৈতিক পটেও নিয়ে আসে পরিবর্তন। বণিকদের অর্থ যখন উপচে-পড়ে জমিদার বা ভূমি -মালিকদের হাতে গিয়ে পৌঁছে তখন অভিজাত-তন্ত্র ধনী স্বৈরতন্ত্রের রূপ নেয়—তখন রাষ্ট্র শাসিত হয় ধনী বণিক আর বেকারদের দ্বারা। রাষ্ট্র-বিদ্যা—যা ছিল সামাজিক শক্তির সমন্বয় আর ক্রমোন্নতির পথে সমঝোতা তা এখন পরিণত হলো রাজনীতিতে আর রাজনীতি মানে দলীয় সুযোগ-সুবিধা আর ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব সরকারই ধ্বংস হয় মৌলিক নীতিতে বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে। ক্ষমতাকে অতি সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমিত করার ফলেই অভিজাততন্ত্র ডেকে আনে নিজের পতন। অত্যন্ত অসতর্কভাবে আশু ধন-লাভের কাড়াকাড়িতে ধ্বংস হয়েছে ধনিক-তন্ত্রের শ্রেণীশাসন। উভয় ক্ষেত্রে ফলশ্রুতি—বিপ্লব। মনে হয় বটে খুব সামান্য ও তুচ্ছ কারণেই বিপ্লব ঘটেছে, সূচনার কারণ সামান্য হতে পারে কিন্তু তার পেছনের গুরুতর ও বহুদিনের সঞ্চিত অপরাধ যে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। উপেক্ষিত রোগের ফলে দেহ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সামান্য ঠাণ্ডাও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় (৫৫৬)। "এবার গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে, দরিদ্রেরা তাদের শত্রুদের হারিয়ে দেয়, কাকেও করে হত্যা, কাকেও পাঠায় নির্বাসনে এবং সবাইকে দেয় ক্ষমতা আর আজাদীর সমান ভাগ।" (৫৫৭)।

কিন্তু গণতন্ত্রের বাড়াবাড়িও গণতন্ত্রকে করে ধ্বংস। গণতন্ত্রের মৌল নীতি হলো সকলকে ক্ষমতা লাভে আর রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণে সমান সুযোগ দেওয়া। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে: এ এক চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু সর্বোত্তম ও বিজ্ঞ শাসক নির্বাচন আর ন্যায়সঙ্গত আইন প্রণয়নের উপযোগী শিক্ষা জনসাধারণের নেই বলে তারও ধ্বংস অনিবার্য (৫৮৮)। "জনসাধারণের কোন বোধ-শক্তি নেই, শাসকরা দয়া করে ওদের যা বলে তাই ওরা পুনরাবৃত্তি করে" (Protagoras, ৩১৭)। কোন মতবাদ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের জন্য চাই শুধু প্রশংসার ব্যবস্থা অথবা কোন জনপ্রিয় নাটকের মাধ্যম, তার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ (নিঃসন্দেহে এরিস্টোফেনিসের প্রতি ইংগিৎ—যিনি তাঁর মিলনাত্মক নাটকে আক্রমণ চালিয়েছেন সব রকম নতুন ভাব ও মতবাদের প্রতি)। রাষ্ট্র-রূপ পোত চালানোর জন্য জনতা-শাসন এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। বক্তৃতার ঝড় এ সমুদ্রের জলে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর জাহাজকে নিয়ে যায় বিপথে। এরকম গণতন্ত্রের শেষ ফল নির্যাতন আর স্বেচ্ছাচারিতা। জনতা বড্ড বেশী তোষামোদ-প্রিয় আর বডড বেশী "মধু-তৃষিত"।

অবশেষে সবচেয়ে অবিবেচক আর ধূর্ত তোষামোদকারী নিজেকে "জনগণের ত্রাণ কর্তা" বলে পরিচয় দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয়ে বসে। (তুলনীয়: রোমের ইতিহাস।) যে জনগণ সহজে প্রতারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় তাদের খেয়াল-খুশীর উপর রাষ্ট্রীয় কর্মচারী নির্বাচনের ভার দেওয়ার কথা চিন্তা করে প্লেটো বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যেতেন। গণতান্ত্রিক মঞ্চের আড়াল থেকে যে ধন-লোভী সুযোগ-সন্ধানী ছায়াবিহারী শ্রেণী-স্বার্থবাদীরা তাদের স্বার্থের সূতো টানে তাদের হাতে এ ভার দেওয়ার কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। প্লেটোর আপত্তি: "জুতো সেলাইর মতো সাধারণ কাজেও আমরা ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করে থাকি কিন্তু রাজনীতির বেলায় আমরা ধরে নিই, যে ভোট সংগ্রহ করতে পারে সেই রাষ্ট্র বা নগর শাসনের যোগ্য। অসুস্থ হলে আমরা সবচেয়ে দক্ষ, যোগ্য ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারকেই ডাকি——ডাকি না সবচেয়ে সুদর্শন বা সুবক্তাকে। তা' হলে সমগ্র রাষ্ট্র-দেহ যদি রুগ্ন হয় আমাদের কি উচিত নয়, বিজ্ঞতম আর সর্বোত্তমদের পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ? রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সমস্যা হলো: প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে অযোগ্যতা আর দুর্নীতি নিবারণের উপায় উদ্ভাবন আর সার্বজনীন কল্যাণ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র শাসনের জন্য যোগ্যতমের নির্বাচন আর তাদের গড়ে তোলা।

AMARBOI.COM

৬. মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা

রাজনৈতিক এসব সমস্যার পেছনে রয়েছে—মানব-স্বভাব। রাজ-নীতি বুঝতে হলে, দুঃখের বিষয় হলেও মনস্তত্ত্ব আমাদের বুঝতেই হবে। "যেমন লোক, তেমন রাষ্ট্র" (৫৭৫) "মানব-চরিত্রের পরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও পরিবর্তন ঘটে···মানুষের ভিতর যে মানব-স্বভাব রয়েছে তার থেকেই ঘটে রাষ্ট্রের উৎপত্তি", (৫৪৪) নাগরিকরা যেরকম রাষ্ট্রও সেরকম। কাজেই মানুষ ভালো না হলে রাষ্ট্র ভালো হওয়ার আশা করা অনুচিত। ঐ না হওয়া পর্যন্ত যত রদবদলই করা হোক না কেন আসল বা মৌল ব্যাপারে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। "মানুষ কি চমৎকার! প্রয়োগ করতেই আছে ঔষধ অথচ দিন দিনই বাড়ছে রোগ, হচ্ছে জটিলতর। আর ভাবছে কারো বাৎলানো দৈব-ঔষধে তারা হয়ে যাবে নীরোগ। কিন্তু ভালো না হয়ে তাদের অবস্থা যাচ্ছে আরো খারাপের দিকে! এ যেন এক খেলা, চেষ্টা করছে আইন প্রণয়নে, কল্পনা করছে সংস্কারের সাহায্যে তারা মানুষের অসাধুতা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদমাইসীকে করে দিতে পারবে খতম। তারা বুঝতেই পারছে না আসলে এ শুধু বহুশীর্ষ সর্পের মাথা লক্ষ্য করে কোপ দেওয়া শুধু মাত্র ”। (৪২৫)

যে মানুষ নিয়ে রাষ্ট্র-দর্শনের কাজ, সে মানুষকেই একবার পরীক্ষা করে দেখো।

প্লেটোর মতে মানব ব্যবহার তিনটা স্রোতে প্রবাহিত: ইচ্ছা, আবেগ আর জ্ঞান। কামনা, ক্ষুধা, সহজাত প্রবৃত্তি, অনুভূতি এসব এক। আবেগ, তেজ, উচ্চাশা, সাহস এসব এক। জ্ঞান, চিন্তা, মনীষা, যুক্তি—এগুলো অন্য। কটিদেশ হলো কামনা-কেন্দ্র—ওটা শক্তির এক উপচে-পড়া আধার। প্রধানতঃ যৌন-সম্পর্কিত। আবেগের বসতি কেন্দ্র হলো হৃদয়—রক্তের স্রোত আর গতিতে তার পরিচয়, ওটা কামনা আর অভিজ্ঞতার আঙ্গিক প্রতিধ্বনি। জ্ঞানের বসতি-কেন্দ্র হলো মস্তিষ্ক—ওটা কামনার চক্ষু এবং হৃদয়ের চালক হতেও সক্ষম।

এসব গুণ ও শক্তি সব মানুষেই বিদ্যমান তবে বিভিন্ন অনুপাতে। কোন কোন মানুষ যেন বাসনারই প্রতিমূর্তি, চঞ্চল আর অধিকার-প্রবণ, এরা পার্থিব সম্পদ সন্ধানে মগ্ন আর ঝগড়াটে, এরা জ্বলতে থাকে লোক দেখানো বিলাস-সামগ্রীর লোভের আগুনে, সব সময় হারিয়ে যাওয়া লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে এরা মনে করে প্রাপ্ত-লাভকে অকিঞ্চিৎকর: এসব লোকেরাই করে ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্তৃত্ব আর করে তার গতি নিয়ন্ত্রণ। অনুভূতি আর সাহসের প্রতিভূ এমন আরো লোক আছে—যারা কি জন্য সংগ্রাম, সে নিয়ে মাথা ঘামায় না, ওদের লক্ষ্য শুধু জয়, ‘জয়ের জন্যই জয়’, তারা কলহপ্রিয় বটে কিন্তু তেমন অধিকার-সচেতন নয়। সঞ্চয়ের চেয়েও ক্ষমতা নিয়েই তাদের গৌরব—গুদামের চেয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই বেশী তাদের আনন্দ: এদের নিয়েই গঠিত হয় বিশ্বের সৈন্য আর নৌ-বাহিনী। অবশিষ্ট অল্প-সংখ্যক আনন্দ পায় কাম্য ধ্যানে আর জ্ঞানে--যারা সম্পদ বা জয় কামনা করে না, জ্ঞানই যাদের একমাত্র কাম্য, যারা হাট-বাজারের কলকোলাহল আর রণক্ষেত্র ছেড়ে আশ্রয় নেয় নির্জন শান্তিতে, যেখানে তারা সুযোগ পাবে পরিচ্ছন্ন চিন্তার। এদের ইচ্ছা আগুন নয় বরং আলো, ক্ষমতা নয়, সত্যই এদের আশ্রয়। এরাই জ্ঞানী—এক পাশে আছে পড়ে, পৃথিবী এদেরে লাগায় না কোন কাজে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন সক্রিয় ব্যক্তিগত কর্মের পেছনে থাকে কামনা—যে কামনা আবেগে উষ্ণ আর জ্ঞান-পরিচালিত। তেমনি খাঁটি রাষ্ট্রে শিল্প-শক্তি উৎপাদন করবে কিন্তু শাসন-ভার গ্রহণ করবে না, সৈন্য-বাহিনী দেশ-রক্ষার দায়িত্ব নেবে কিন্তু নেবে না দেশের শাসন ভার। জ্ঞান, বিজ্ঞান আর দর্শনের শক্তিকে (অর্থাৎ ঐসবের সাধকদের) লালন করতে হবে, করতে হবে রক্ষা—তারাই দেশকে করবে শাসন। বিশৃঙ্খল কামনার মতো, জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত না হলে জাতিও হয়ে পড়ে এক ছত্র-ভঙ্গ জনতা। কামনার পক্ষে যেমন জ্ঞানের আলো অত্যাবশ্যক তেমনি জাতিরও দরকার দার্শনিকের পরিচালনা। "অর্থ-লোভী বণিকেরা শাসক হলেই ধ্বংস দেখা দেয়" (৪৩৪) অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ্য তখন সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করে তাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই উৎপাদনকারীর যোগ্যতম স্থান)—আর যোদ্ধার যুদ্ধ ক্ষেত্র। শাসন ক্ষেত্রে উভয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এদের অদক্ষ হাতে পড়ে রাষ্ট্র-বিদ্যার ভরা-ডুবি ঘটে রাজনীতিতে। কারণ রাষ্ট্র-বিদ্যা একাধারে বিজ্ঞান আর শিল্প, দীর্ঘদিন এর মধ্যে থাকা চাই আর চাই দীর্ঘ প্রস্তুতি। জাতিকে পরিচালনার জন্য দার্শনিক-রাজাই যোগ্যতম। "যতদিন না দার্শনিকরা রাজা হচ্ছেন অথবা এখনকার রাজা ও রাজপুত্ররা দর্শনের শক্তি আর মর্ম আয়ত্ত না করছেন, এবং জ্ঞান আর রাজনৈতিক নেতৃত্ব একই ব্যক্তিতে মিলিত না হচ্ছে ততদিন রাষ্ট্র বা মানব জাতি কারো দুঃখের অবসান নেই।" (৪৭৩)

প্লেটো-চিন্তার এই সার-কথা।

৭. মনস্তাত্ত্বিক সমাধান

তা হলে কি করা যায়?

আমরা এ ভাবেই শুরু করব: "দশ বছরের বেশী যাদের বয়স হয়েছে তাদের সবাইকে গ্রাম-দেশে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা সব শিশুদের দায়িত্ব নেবো—এভাবে তাদেরে রক্ষা করব মা-বাপের বদ্ অভ্যাস থেকে" (৫৪০)। পদে পদে বয়স্কদের দ্বারা যাদের স্খলন ঘটে সে সব তরুণদের নিয়ে আমরা কখনো পারবো না 'য়ূটোপিয়া' গড়ে তুলতে। যতদূর সম্ভব পরিষ্কার স্লেট নিয়েই আমাদের করতে হবে শুরু। কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদগ্ধ সম্রাট হয়তো তাঁর রাজ্যের কোন অংশবিশেষে এভাবে শুরু করার অধিকার আমাদের দিতেও পারেন। (পরে দেখতে পাবো, এক রাজা এ অধিকার দিয়েছিলেনও)। যে কোন অবস্থায়, প্রত্যেক শিশুকে গোড়া থেকেই সম-ভাবে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে, কেউ বলতে পারে না কোথায় মনীষা বা প্রতিভার আলো হবে বিকীর্ণ। আমরা নিরপেক্ষভাবে তার খোঁজ করব সব স্তরে আর সব জাতের মধ্যে। এ পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে সার্বজনীন শিক্ষা।

প্রথম দশ বছর প্রধানতঃ শরীর-চর্চাই হবে প্রধান শিক্ষণীয়—প্রত্যেক স্কুলেই থাকবে ব্যায়ামাগার আর খেলার মাঠ, খেলাধূলাই হবে একমাত্র পাঠ্য-সূচী। এ দশ বছরে শরীর এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে 'ঔষধ-পত্র হয়ে পড়বে অনাবশ্যক।" ঔষধের কেন প্রয়োজন? কারণ মানুষ আলস্য আর বিলাসে নিজেদের করে তোলে এক একটা জল আর বাতাসের ডোবা, ফলে দেখা দেয় পেট ফাঁফা, কফ-শ্লেষ্মা—একি অত্যন্ত লজ্জার কথা নয়? আমাদের বর্তমান চিকিৎসা প্রণালীকে বলা যায় রোগ-শিক্ষা——আরোগ্যের চেয়ে রোগটাকেই এ দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। এ হচ্ছে অলস-ধনীদের নির্বুদ্ধিতার পরিণাম। "যখন কোন সুতার মিস্ত্রী অসুখে পড়ে তখন সে ডাক্তারের কাছে কড়া আর দ্রুত আরোগ্য করে দাবী—যেমন বমন-উদ্রেক ঔষধ, জোলাপ, দগ্ধ-লোহার ছ্যাঁকা বা ছুরির সাহায্য। যদি তাকে বলা হয়, খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করো, মাথায় পটি বাঁধো। কাপড় জড়াও বা ঐরকম কিছু করো—তৎক্ষণাৎ সে উত্তর দেয়: আমার অমন রোগের অবসর কোথায়? নিজের পেশা ছেড়ে স্রেফ রোগের সেবা করে জীবন কাটানোর কোন মানেই হয় না। এ ধরনের ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে সে এবার নিজের প্রতি দিনকার খাবার খেতে থাকে। এ অবস্থায় হয় সে ভালো হয়ে নিজের পেশা নিয়ে বেঁচে থাকে আর না হয় স্বাস্থ্য হারিয়ে মৃত্যুবরণ করে জীবনের দেনা-পাওনা শেষ করে বসে" (৪০৫-৬); রুগ্ন আর পঙ্গু নিয়ে জাতি গড়তে আমরা চাই না—তাই আমাদের য়ূটোপিয়ার সূচনা মানব-দেহে।

কিন্তু খেলোয়ার আর ব্যায়ামবীররাও এক পেশে—এক দেশদর্শী। "অমিত-সাহসী কোমল-স্বভাব আমরা কোথায় পাবো? এরা যেন পরস্পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধী।" (৩৭৫) শুধু পুরস্কারবিজয়ী আর ভার- উত্তোলনকারী জাতি হতে আমরা চাই না। হয়ত সংগীত আমাদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম—সংগীত মানবাত্মাকে দেয় ছন্দ আর সংগতি এমন কি দিয়ে থাকে স্বভাবে ন্যায়-প্রবণতা, কারণ "ছন্দ, মিলে যার মন গঠিত সে কি অন্যায় করতে পারে? ছন্দ এবং মিল মানব মনের গোপন কন্দরে প্রবেশ করে, প্রতি কর্মকে সূক্ষ্ম আর আত্মাকে শালীন করে তোলে। গ্লোকন (Glaucon), সংগীত শিক্ষা যে এত জোরদার এ কি তার কারণ নয়?" (৪০১) সংগীত চরিত্র গঠনে সহায়তা করে—এ কারণে সামাজিক আর রাজনৈতিক বিষয়েও তার ভূমিকা বেশ সক্রিয়। "ডেমন (Damon) বলে, আর আমি তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—সংগীতে পরিবর্তন ঘটলে, রাষ্ট্রের মৌলিক আইনগুলিও তার সাথে সাথে হয় পরিবর্তিত।"[১]

সংগীত মানুষের চরিত্র আর অনুভূতিকে মার্জিত করে বলেই যে মূল্যবান তা নয়—স্বাস্থ্য রক্ষা আর উদ্ধারেও তা করে সহায়তা। এমন কোন কোন রোগ আছে যার চিকিৎসা মনের মাধ্যমেই করতে হয়। এ কারণেই করিবেন্ট পুরোহিতেরা মূর্ছা-রোগিণীদের চিকিৎসা করতেন উদাত্ত বাঁশী বাজিয়ে—বাঁশীর সুরে উত্তেজিত হয়ে নাচতে নাচতে চরম ক্লান্তিতে ওরা পড়ে যেতো আর সঙ্গে সঙ্গে পড়তো ঘুমিয়ে জেগে ওঠার পর দেখা যেতো ওরা হয়ে গেছে সুস্থ-রোগমুক্ত। এভাবে মানব-চিন্তার অবচেতন রহস্য-লোকে প্রবেশ করে সংগীত একটা সান্ত্বনার প্রলেপ দেয় বুলিয়ে। অনুভূতি আর স্বভাবের এ অতল-তলেই প্রতিভার শিকড় হয়ে থাকে যারা। "খুব সচেতন অবস্থায় সত্যকার অনুপ্রেরণা লাভ ঘটে না—বরং তার সন্ধান মেলে যখন ঘুমে, রোগে বা স্মৃতি-ভ্রংশে মননশীলতার শক্তি থাকে শৃঙ্খলিত তখনই"—নবী বা প্রতিভাবান আর পাগল সমগোত্রীয়।

প্লেটো-মানসে "মনো-বিশ্লেষণের" পূর্বাভাস যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তা অভাবিত ও বিস্ময়কর! আমাদের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব

১, তুলনীয় : Daniel O, Connled-এর মন্তব্য **"আমাকে কোন জাতির সংগীত রচনার ভার দাও- তা হলে আইন কে রচনা করলো তানিয়ে আমার দুশ্চিন্তা থাকবে না।"**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে জটিল আর বিরক্তিকর তাঁর মতে তার কারণ আমরা সাধারণতঃ মানুষের মনের বিচিত্র ক্ষুধা আর সহজাত প্রবৃত্তির করিনা যথাযথ অধ্যয়ন. এ সব সূক্ষ্ম ও অ-ধরা অবস্থার কিছু কিছু ইংগিত স্বপ্নে পাওয়া যেতে পারে।

"কোন কোন অনাবশ্যক আনন্দ আর প্রবৃত্তিকে বে-আইনী মনে করা হয়—প্রায় সব মানুষেরই এসব আছে তবে কেউ কেউ এসবকে যুক্তি আর আইনের সীমায় রাখতে পারে দমিত, সংযত। আর প্রাধান্য দিতে পারে উন্নত ও মহৎ প্রবৃত্তিকে। এরা পূর্বোক্তগুলিকে হয় পুরো-পুরি দমিয়ে রাখে না হয় কমিয়ে রাখে শক্তি আর সংখ্যায়—অন্যদিকে কারো কারো মধ্যে দেখা যায় এ সব প্রবৃত্তি প্রবল এবং প্রচুর। আমি বিশেষ করে ঐসব প্রবৃত্তির কথাই বলছি—যেগুলি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে, যুক্তি আর সংযম শক্তি ঘুমিয়ে পড়ার পর ওঠে জেগে। আমাদের স্বভাবে যে বন্য পশুটা আছে, যে মদ-মাংস ভক্ষণ করে নগ্নভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় আর ইচ্ছা মতো করে ভূরি-ভোজন—যতই লজ্জাকর আর অস্বাভাবিক হোক না কেন তারপক্ষে যে কোন অপরাধ করা বা বোকামীর পরিচয় দেওয়া সম্ভব। এরকম স্বভাবের পক্ষে ব্যভিচার অথবা মাতৃ-পিতৃ-হত্যাও সহজ। কিন্তু যে মানুষের নাড়ী সুস্থ আর সংযত---স্বাভাবিক শান্তির সঙ্গে যে ঘুমুতে পারে---যে নিজের ক্ষুধা বা বাসনা কামনাকে যেমন রাখে না উপোসী তেমনি যায়ও না মাত্রা ছাড়িয়ে—শুধু দিয়ে থাকে ঘুম পাড়াবার উপযোগী খোরাক। এরকম লোকের পক্ষে বে-আইনী কল্পনা আর খাম-খেয়ালীপনার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আমাদের সবাইর মধ্যে এমন কি নেহায়েৎ সজ্জনদের মধ্যেও এক একটি সুপ্ত বন্য-পশু রয়েছে যা ঘুমের সময় আসে বেরিয়ে (৫৭১-৭২)।"

সংগীত আর ছন্দ মানুষের দেহ-মনকে দেয় স্বাস্থ্য আর সুষমা কিন্তু অতিরিক্ত ব্যায়ামের মতো অতিরিক্ত সংগীতও ক্ষতিকর। শুধু ক্রীড়াবিদ হওয়া মানে প্রায় পশু হয়ে যাওয়া—শুধু সংগীতজ্ঞ হওয়াও "যা শ্রেয় তার চেয়ে বেশী কোমল আর তরল হয়ে পড়া" (৪১০)। চাই দু'য়ের সমন্বয়। ষোলর পর ব্যক্তিগত সংগীত-চর্চা ছেড়ে দেওয়াই ভালো, সংঘবদ্ধ খেলার মতো। ঐকতান বা মিলিত সংগীত অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা জীবন ধরেই চলতে পারে। সংগীত শুধু সংগীতেই আবদ্ধ থাকবে না, সময় সময় গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞানের মতো অনাকর্ষণীয় ক্ষেত্রেও সংগীতের করতে হবে ব্যবহার। এ সমস্ত কঠিন বিষয়কেও তরুণদের কাছে ছন্দ আর মনোরম সংগীতে সহজবোধ্য আর আকর্ষণীয় করে না তোলার কোন কারণ নেই। তবুও উচিত নয় এসব বিষয় অনিচ্ছুক মনে চাপিয়ে দেওয়া।

"শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শৈশবেই মনের সামনে তুলে ধরা উচিত কিন্তু জোর জবরদস্তি করে নয়। জ্ঞানার্জনের সময় স্বাধীন মানুষেরও স্বাধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়। ---জোর জবরদস্তি করে শেখানো জ্ঞান মনের উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম। কাজেই জোর করো না—বরং শৈশব শিক্ষাকে করে তোল আনন্দের বস্তু। এতেই শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা তুমি বুঝতে পারবে ভালো করে।"

এভাবে স্বাধীনতার মধ্যে যাদের মন আর মুক্ত মাঠে সব রকম খেলা-ধূলার ভিতর দেহ মজবুতভাবে গড়ে ওঠে তাদের নিয়ে আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রের মনস্তাত্ত্বিক আর শারীরিক বুনিয়াদ এমন উদার হবে যে তাতে সব রকম উন্নয়ন আর সম্ভাবনা হবে সহজ। কিন্তু একটা নৈতিক বুনিয়াদ চাই। চাই সমাজের সকলের মধ্যে ঐক্য—জানা চাই তারা একে অপরের অংশ, পরস্পরের প্রতি সুযোগ-সুবিধার দায়িত্ব রয়েছে, থাকা চাই এ বোধ, তবে মানুষ স্বভাবতঃই অর্জন-ইচ্ছু, ঈর্ষাপরায়ণ, কোন্দল-প্রিয় আর ইন্দ্রিয়সুখান্বেষী—এ অবস্থায় কি করে তাদেরে সদ্-ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা যায়? সব সময় পুলিশের ডাণ্ডা দেখিয়ে? এটা একদিকে যেমন পশু-সুলভ অন্যদিকে ব্যয়সাপেক্ষ আর বিরক্তিকর। এর থেকে উত্তম উপায় আছে—অলৌকিক শক্তির। নির্দেশিত নৈতিক-বোধ সঞ্চারিত করা। এ জন্যে ধর্ম একটা আমাদের চাই-ই।

প্লেটোর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়া কোন জাতিই বড় হতে পারে না। শুধু প্রাকৃতিক শক্তি বা 'প্রথম কারণ' বা 'পরমা শক্তি'—কোন ব্যক্তি-রূপ নয় বলে তা কোন রকম আশা, ভক্তি বা উৎসর্গের প্রেরণা সঞ্চার করে না মনে। তা দুঃখীকে সান্ত্বনা বা ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে সাহস দিতেও অক্ষম। কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের পক্ষে তা সম্ভব—স্বার্থান্বেষীর মনের লোভ আর লালসাকে কিছুটা সংযত করার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় বা প্রেরণা সঞ্চার করতে এ ঈশ্বর পারেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত অমরতায় বিশ্বাসের যোগ ঘটলে আরো ভালো : আর এক জীবনের আশ্বাসে মৃত্যু-ভয় হয় দূর। প্রিয়-বিয়োগও হয় সহনীয়। বিশ্বাস—আমাদের হাতে একই সঙ্গে এ দুই অস্ত্রই দেয় তুলে। অবশ্য স্বীকার্য যে সব বিশ্বাসই প্রমাণ বহির্ভূত, হয়তো ঈশ্বর আমাদের আশা-ভালোবাসারই এক কল্প-মূর্তি, আত্মাও হয়তো বাঁশীর সুরের মতোই; যা বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গেই পায় লয় —তা হলেও (পেস্‌কেলের মতো এ হচ্ছে তাঁর যুক্তি) বিশ্বাসে কোন ক্ষতি ত নেই বরং তা আমাদের ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের করবে অসীম মঙ্গল।

সরল শিশুদের সব কিছু বুঝাতে গেলে তাদের নিয়ে আমরা অনেক বিপদে পড়ব। ওদের বয়স যখন কুড়ি হয় তখন সমস্যা বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ে---সম-শিক্ষায় এতকাল তারা যা শিখেছে এবার শুরু হয় তার পরীক্ষা আর যাচাই। এখন এ সবেরই সন্মুখীন হতে হবে। এবার শুরু হবে নির্দয় নিড়ানো। আমরা যাকে বলতে পারি—"মহা বর্জন"। এ শুধু শিক্ষাগত পরীক্ষা নয় : এ পরীক্ষা শিক্ষাগত এবং ব্যবহারিক দু'ক্ষেত্রেই "বিধান মতো দুঃখ, শ্রম আর দ্বন্দ্বও থাকবে" (৪১৩)। সব রকম যোগ্যতারই প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ যেমন দেওয়া হবে তেমনি সব রকম বোকামী বা অযোগ্যতাকেও করা হবে অনাবৃত। যারা অকৃতকার্য হবে তাদেরে নিয়োগ করা হবে জাতির অর্থনৈতিক কাজে---তারাই হবে ব্যবসায়ী, কেরাণী, কারখানা-শ্রমিক আর কৃষক। পরীক্ষাটা হবে নিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক---কে কৃষক আর কে দার্শনিক হবে তা একচেটিয়া সুযোগ বা আত্মীয়-প্রীতির দ্বারা হবে না নির্ধারিত। গণতন্ত্রের চেয়েও গণতান্ত্রিক মতেই হবে এ নির্বাচন।

যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদেরে আরো দশ বছর ধরে দেহ, মন ও চরিত্রের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তারপর হতে হবে আর একটা কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন। এ পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হবে তারা হবে রাষ্ট্রের সহকারী বা প্রশাসনিক কর্মচারী এবং সামরিক অফিস্যার! এ বর্জন নীতিকে সফল করে তোলার জন্য অপরিহার্য---যারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তাদেরে নিজ নিজ ভাগ্য ভদ্র আর শান্ত মনে গ্রহণে রাজি করানো। প্রথম পরীক্ষায় অনির্বাচিত বিরাট দল, দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষায় অনির্বাচিত দল সংখ্যায় অল্প হলেও তারা অধিকতর দক্ষ ও শক্তিশালী—এ দু'দল মিলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যাতে আমাদের য়ুটোপিয়াকে ধ্বংস করে স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত করতে না পারে তার উপায় কি করে করা যায়? তারা যাতে ঐভাবে পৃথিবীটাকে শক্তি আর সংখ্যার শাসন-কেন্দ্র করে না তুলতে পারে তার কি ব্যবস্থা অর্থাৎ কিভাবে তাতে বাধা দেওয়া সম্ভব? নকল গণতন্ত্রের আর এক রুগ্ন প্রহসন না আবার অভিনীত হয়! এ অবস্থায় ধর্ম এবং বিশ্বাসই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এসব অসন্তুষ্ট তরুণদের বলতে হবে এ শ্রেণী-বিভাগ আল্লার ইচ্ছাতেই হয়েছে এবং এ রদ হওয়ার নয় কিছুতেই, তারা চোখের জলের নহর বইয়ে দিলেও এর এক অক্ষরও বদলাবে না। শোনাবো ওদেরে ধাতব-বস্তুর উপকথা:

"নাগরিকগণ, তোমরা পরস্পর ভাই বটে তবু আল্লাহ্ তোমাদেরে বিভিন্ন রকম করে তৈয়রী করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কর্তৃত্বের অধিকারী—এরা সোনার তৈয়ারী তাই এরা সবচয়ে সম্মানের পাত্র। রূপোর তৈয়রীরা হয়েছে সহকারী প্রশাসক। আর যাদেরে তিনি লোহা আর তামা দিয়ে তৈয়রী করেছেন তারা হয়েছে কৃষক আর কারিগর। আর সাধারণতঃ গোষ্ঠী রক্ষিত হয় সন্তান-সন্ততির দ্বারা। কিন্তু যেহেতু সবাইর মূল বা উৎস একই পরিবার—সোনালী পিতা-মাতাও রৌপ্য পুত্র পেতে পারে আর রৌপ্য পিতা-মাতাও পেতে পারে সোনালী পুত্র। আর আল্লাহ্ বলেছেন: যদি সোনালী বা রূপালী পিতা-মাতার কোন সন্তানে তামা কি লোহার মিশ্রণ ঘটে তা হলে প্রাকৃতিক নিয়মে অবস্থার রদবদল ঘটে। তাই কোন শাসকের সন্তান যদি কৃষক বা কারিগর হয় এ পদাবনতির জন্য সন্তানের উপর রাগ করা অনুচিত। তেমনি কেউ কেউ আবার কারিগর শ্রেণী থেকে সম্মানের আসনে উন্নীত হয়ে শাসক বা সহকারী প্রশাসকও হতে পারে। এক দৈব-বাণীর বক্তব্য: যদি তামা বা লৌহ-জাত মানুষ কোন রাষ্ট্রের শাসক হয় তা হলে সে রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য্য (৪১৫)"। সম্ভবত এ শাহী উপকথার দৌলতে আমাদের পরিকল্পনার অগ্রগতি সাধনে আমরা মোটামুটি জন-সমর্থন পেয়ে যাবো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু একের পর এক এ নির্বাচনী তরঙ্গ যারা পার হয়ে এলো সে ভাগ্যবানদের অবস্থা কি হবে?

এদেরেই দেওয়া হবে দর্শন-শিক্ষা। এখন তাদের বয়স ত্রিশ। খুব অল্প বয়সে "প্রিয়-আনন্দের স্বাদ পেতে ওদের দেওয়া উচিত নয়-—কারণ তরুণেরা মুখে দর্শনের প্রথম স্বাদ পেলেই তর্কে ওঠে মেতে, কুকুর ছানারা যেমন কেউ কাছে গেলেই ছুটে আসে কামড়াতে, আনন্দ পায় আঁচড়াতে, এরাও আমোদ পেয়ে থাকে প্রতিবাদে আর পরস্পরের মতামত খণ্ডনে" (৫৩)। এ 'প্রিয় আনন্দ স্বরূপ দর্শনের প্রধানতঃ দুই কাজ: চিন্তায় স্বচ্ছতা, যার নাম পরাবিজ্ঞান আর বিজ্ঞতার সঙ্গে শাসন, যার নাম রাজনীতি। কাজেই আমাদের 'সর্বোত্তম' তরুণদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে স্পষ্ট ও স্বচ্ছতার সঙ্গে চিন্তা করা। তাই সে উদ্দেশ্যে ভাব বা মতবাদের যা সত্যকার বিধান তা তাদের করতে হবে অধ্যয়ন।

কিন্তু প্লেটোর কবিতা আর কল্পনার চাকচিক্য এ ভাব বা মতবাদের বিশ্বাসকে করে তুলেছে বেশ ঝাঁপসা আর দুর্বোধ্য—আধুনিক শিক্ষার্থীর কাছে এ এক হতাশাব্যঞ্জক গোলকধাঁধা এবং বহু চালুনী ছাঁকায়ও যারা টিকে গেছে তাদের জন্যও এ এক কঠিনতম পরীক্ষা। কোন কিছুর ভাব (Idea) তাঁর শ্রেণীর 'সাধারণ ভাব' অনুসারেই হওয়া সম্ভব (জন, ডিক বা হ্যরির ভাব-কল্প—মানুষ) অথবা যে আইন বা আইনসমূহের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত তাও হতে পারে (জনের ভাব-কল্প তার সব ব্যবহারের "প্রাকৃতিক আইনে" ও রূপান্তরিত করা যায়) অথবা তা একটা পূর্ণাঙ্গ উদ্দেশ্য আর আদর্শও হতে পারে যাতে সে বা তার শ্রেণী হতে চায় উন্নীত (জনের ভাব-য়ুটোপিয়ার-জন)। খুব সম্ভব ভাব, আইন আর আদর্শের সমন্বয়েরই নাম ভাব-কল্প। বাহ্যিক দৃশ্য আর যে বিশেষ অবস্থা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর তা উন্নয়নের সাধারণীকরণ ও নিয়মমাফিক নির্দেশ হতে পারে—যা সচেতন উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না কিন্তু চিন্তা আর যুক্তিতে উপলব্ধ। এ সব ভাব, বিধি ও আদর্শ অধিকতর স্থায়ী তাই অধিকতর 'বাস্তব' বিশেষতঃ যে সব বিষয় ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধির সাহায্যে আমরা ধারণা ও অনুমান করে থাকি তার তুলনায় অধিকতর বাস্তব ও সত্য। টম, ডিক্, হ্যরি থেকে মানুষ অনেক বেশী স্থায়ী। হাতের পেন্সিলটা দিয়ে আমি একটা বৃত্ত আঁকতে পারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার রবার দিয়ে এ মুহূর্তে ফেলতে পারি মুছে। কিন্তু বৃত্তের ধারণা থেকে যায় চিরকাল। এ গাছটা খাড়া আছে, ঐ গাছটা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু যে নিয়মে কোন্ দেহ পড়বে, কখন এবং কিভাবে পড়বে তা নির্দ্ধারণ করে, তার আদিও নেই অন্তও নেই—তা এখনো যেমন আছে, চিরকাল সেভাবে থাকবে। যেমন স্পিনোজা বলেছেন যেমন আছে ইন্দ্রিয়-উপলব্ধ জগৎ তেমনি আছে চিন্তার দ্বারা অনুমিত আইনের জগৎ। উল্টো চতুষ্কোণ বিধি বা আইন আমরা না দেখলেও তা আছে এবং সর্বত্র আছে—সৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে থেকেই আছে আর বস্তু জগৎ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ওটা থাকবে।,

এ যে একটা পোল—ইন্দ্রিয় উপলব্ধি করছে কনক্রীট আর শত শত টন লোহা কিন্তু গণিতজ্ঞ মনের চোখে দেখছে ইঞ্জিনিয়ারিং আর কারিগরি বিদ্যার সূক্ষ্ম ও দুঃসাহসিক কলাকৌশল, যার ফলে বিরাট বস্তু স্তূপকে দেওয়া হয়েছে তার সাম্য। ধীর ভাবছে যে নিয়মে এ পোল নির্মিত সব পোলই সে নিয়মে নির্মিত হওয়া উচিত। এ গণিতজ্ঞ কবি হলে যে নিয়ম পোলটাকে ধারণ করে আছে তাও তিনি দেখতে পারবেন—বুঝতে পারবেন এমনি নিয়ম ভঙ্গ হলে পোলটাও ভেঙ্গে পড়বে নদী-গর্ভে। এ নিয়মই ঈশ্বর যাঁর হাতের তালুতে ধরা আছে এ পোল। এরিস্টটলও প্রায় এ ধরনের কথাই ইংগিৎ করেছেন—পিথাগোয়াস শেখাতে চেয়েছেন এ পৃথিবীটাই সংখ্যা (মানে গাণিতিক স্থিতিশীলতা আর নিয়মানুবর্তিতা দ্বারাই পৃথিবী শাসিত) পিথাগোরাস এখানে সংখ্যা' দিয়ে যা বুঝাতে চেয়েছেন আইডিয়া বা ভাব-কল্পের দ্বারা প্লেটোও তাই চেয়েছেন বুঝাতে। প্লুটারস্ (Plutarch) বলেছেন প্লেটোর মতে "ঈশ্বর অনবরত জ্যামিতিই করে চলেছেন"—একই ভাবকে স্পিনোজা প্রকাশ করেছেন এভাবে—গঠন এবং পরিচালনার যে বৈশ্বিক নীতি আর ঈশ্বর এক এবং একই সত্য। প্লেটোর এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কাছেও দর্শনের অনিবার্য প্রস্তাবনা হচ্ছে অঙ্ক আর তা তার উচ্চতমরূপ। তাঁর একাডেমীর দরজায় প্লেটো এ কথাগুলো উৎকীর্ণ করে রেখেছিলেন ; "জ্যামিতি-জ্ঞান যার নেই সে যেন এখানে প্রবেশ না করে।"

এ সব ভাব-কল্প, সাধারণীকরণ, নিয়মানুবর্তিতা আর আদর্শ ছাড়া পৃথিবীটা আমাদের কাছে নব-জাতকের প্রথম-দেখা বস্তুর মতই মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো—কতকগুলি এলোমেলো অর্থহীন বস্তু-পুঞ্জের বিশেষ অনুভূতিই মাত্র। বস্তুকে শ্রেণী-বিভক্ত আর সাধারণী করে আর সে সবের অস্তিত্বের নিয়ম, উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য সন্ধান করেই তবে তাকে করা যায় অর্থপূর্ণ। ভাব-কল্প ছাড়া পৃথিবীটা পুস্তক-তালিকা বা ক্যাটালগ-বিচ্যুত কতকগুলি গ্রন্থ শিরোনাম মাত্র—ক্রমিক শ্রেণী আর উদ্দেশ্য অনুসারে এ একই গ্রন্থগুলি যখন তালিকাবদ্ধ হয় তখনই তা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাইরের সূর্যকরোজ্জ্বল বাস্তবের তুলনায় (ভাব-কল্পহীন পৃথিবী) ঐ যেন গুহা-অভ্যন্তরের ছায়া—ঐ সব কপট আর অবিশ্বাস্য ছায়াগুলি প্রতিফলিত হয় মানুষের অন্তরেও (৫১৪)। তাই ভাবানুসন্ধানই উচচ-শিক্ষার মর্ম কথা। সন্ধান করতে হবে সব কিছুর সাধারণ ধর্ম, কার্য্য-কারণের নিয়ম আর উন্নয়নের আদর্শ। প্রত্যেক বস্তুর পেছনে—তাদের সম্পর্ক, অর্থ, আকৃতি, কার্য্য-বিধি, যে আদর্শ আর যে ভূমিকা তার করতে হবে আবিষ্কার। উদ্দেশ্য আর বিধি অনুসারে আমাদের ইন্দ্রিয়-লব্ধ অভিজ্ঞতাকে আমাদের করতে হবে শ্রেণীবদ্ধ ও সমন্বিত। এ শক্তির অভাবেই তারতম্য ঘটে সীজার আর অথর্বের মনে।

পাঁচ বছর ধরে ভাব-কল্পের গূঢ় নীতিতে শিক্ষা পেয়ে। ইন্দ্রিয় উপলব্ধির দুরূহ আবর্তে ঘুরে কার্য্য-কারণের বিশেষ কলা-কৌশল আর ভাবাদর্শের সম্ভাব্যতা করতে হবে অধ্যয়ন। পাঁচ বছর ধরে শিক্ষার পর তবে মানুষের ব্যবহার আর রাষ্ট্র-পরিচালনা সম্বন্ধে এসব নীতির প্রয়োগ সম্ভব। শৈশব থেকে শুরু করে যৌবন পেরিয়ে পঁয়ত্রিশ বছরের প্রবীণতায় পৌঁছা পর্য্যন্ত এ দীর্ঘ প্রস্তুতি চলবে। এ পরিপূর্ণ প্রস্তুতেরাই এবার রাজকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্রের সর্বোচচ কর্তব্য করবে পালন. এরাই কি হবে দার্শনিক শাসক আর মানবজাতির মুক্তিদাতা ?

হায়! এখনো তেমন শাসকের দেখা মেলেনি। তাদের শিক্ষা এখনো অসমাপ্ত। আসলে এসবই ত কেতাবী শিক্ষা। আরো কিছু চাই। এসব পি. এস. ডি বা দর্শনের ডক্টরদের এখন দর্শনের উচচমার্গ ছেড়ে সংসারী মানুষ আর তার নিত্য-প্রয়োজনের গুহায় করতে হবে প্রবেশ। বাস্তবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া সাধারণীকরণ আর বিমূর্ত চিন্তা অর্থহীন। কোন রকম পক্ষপাত আশা না করেই আমাদের এ সব ছাত্ররা সংসারে প্রবেশ করুক—প্রতিযোগিতা করুক ব্যবসায়ীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে, সুযোগসন্ধানী শক্ত-মাথাওয়ালা ব্যক্তিদের সঙ্গে, ধূর্ত আর বলিষ্ঠ-দেহীদের সঙ্গে—এভাবে বেচা-কেনার সংগ্রাম ক্ষেত্রেই তাঁরা বিশ্বগ্রন্থ থেকেই গ্রহণ করবে পাঠ। রূঢ় সংসারের আঘাতে তাদের হাতের আঙুল আর দার্শনিক পদ-যুগল হবে ক্ষত-বিক্ষত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা করবে রোজগার নিজের রুটি-মাখন। এ নির্মম আর কঠোরতম শেষ পরীক্ষা চলবে দীর্ঘ পনর বছর ধরে। আমাদের এ সব পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতদের অনেকে এ ভাবের চাপে ভেঙ্গে পড়বে এবং বর্জনের এ শেষ তরঙ্গাঘাতে যাবে তলিয়ে। যারা টিকে থাকবে—তারা এখন ক্ষত-বিক্ষত—আর বয়সও হয়েছে পঞ্চাশ আর হয়েছে শান্ত-মিতাচারী ও স্বাবলম্বী। জীবনের নির্মম আঘাতে এদের মন থেকে পাণ্ডিত্যের অহমিকা তিরোহিত। যে সব জ্ঞান—ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি আর সংগ্রাম সম্মিলিতভাবে দিতে পারে, সে জ্ঞানের অস্ত্রে এখন এরা সুসজ্জিত। অব-শেষে স্বাভাবিক নিয়মে এরাই হবে রাষ্ট্রের শাসক ও পরিচালক।

AMARBOI.COM

৮. রাজনৈতিক সমাধান

স্বাভাবিক নিয়মের অর্থ—ভোটের শঠতার আশ্রয় না নিয়ে সমাধান। গণতন্ত্র মানে পুরোপুরিভাবে সকলের সম-সুযোগ, বিশেষতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে টম, ডিক্, হ্যারির পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা দখলের নাম গণতন্ত্র নয়। অবশ্য প্রশাসনিক কাজে যোগ্যতা অর্জনের সমান সুযোগ সকলকেই দিতে হবে। তবে যারা নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছে এবং সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে যোগ্যতার পরিচয়-পত্র হাতে এসেছে বেরিয়ে, তাদেরই শুধু দেওয়া হবে শাসন-দায়িত্ব। ভোটের সাহায্যে অথবা গণতন্ত্রের অজুহাতে অদৃশ্য হাতের গোপন ষড়-যন্ত্রের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্মচারী নিয়োগ করা উচিত নয়। মৌলিক গণতন্ত্রের নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতায় যারা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছে উচিত শুধু তাদেরই নিয়াগ করা। বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত না হলে কাকেও কোন পদ দেওয়া উচিত নয়। উচিত নয় যে নিম্নপদে যোগ্যতার পরিচয় দেয়নি তাকে কোন উচ্চতরপদে বসানো।

এই কি অভিজাততন্ত্র? শব্দ শুনে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, শব্দ ত শুধু সংকেত—বাস্তব-ফল ভালো হলেই হলো: শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অর্থ নিরূপক—তার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। অত্যন্ত বেওকুপ আর রাজনীতিবিদদের কাছেই শব্দ মানে টাকা। আমরা চাই সর্বোত্তমদের দ্বারা শাসিত হতে—এরই নাম আভিজাত্য। কারলাইলের মতো আমরাও কি সর্বোত্তমদের দ্বারা শাসিত হওয়ার আকাঙ্খা করিনি, করিনি প্রার্থনা? কিন্তু অবস্থা গতিকে আভিজাত্যকে আমরা উত্তরাধিকার মনে করতে শুরু করেছি—এটা মনে রাখা উচিত প্লেটোর আভিজাত্য এ নয়। এটাকে বড় জোর গণতান্ত্রিক আভিজাত্য বলা যায়। এখানে ষড়যন্ত্রকারী মনোনয়ন-দাতাগোষ্ঠী যাদেরে মনোয়ন দেয় তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত মন্দের ভালোটাকে অন্ধভাবে নির্বাচিত করার পরিবর্তে নিজেরা প্রত্যেকেই প্রার্থী হতে পারে আর এ 'শিক্ষিত নির্বাচনে' প্রত্যেকেরই প্রশাসনিক পদে নির্বাচিত হওয়ার রয়েছে সমান-সুযোগ ও সম্ভাবনা। এখানে কোন বর্ণভেদ নেই। পদ বা সুযোগের নেই উত্তরাধিকার, নিঃস্বের ঘরে জন্মালেও প্রতিভার পথে কোন বাধা ঘটে না, রাজপুত্রকেও শুরু করতে হয় একই স্তর থেকে এবং সেও পায় সমান ব্যবহার আর সমান সুযোগ—যেমন পায় জুতা ব্রাসকারীর ছেলে। রাজার ছেলে যদি বোকা হয় তা হলে সেও প্রথম পৌঁছেই কাটা পড়বে আর জুতা-ব্রাসকারীর ছেলে যদি দিতে পারে যোগ্যতার পরিচয় তা হলে দেশের শাসক হতে তারও কোন বাধা নেই। প্রতিভার জন্য যেখানেই হোক তার উন্নতির পথ রাখতে হবে খোলা। এ হচ্ছে পাঠশালার বা শিক্ষার গণতন্ত্র—ভোট-কেন্দ্রের থেকে এ শতগুণ সৎ ও কার্যকরী।

তাই "শাসকদের উচিত অন্য সব কিছু এক পাশে সরিয়ে রেখে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা রক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করা—এ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্য কিছুতে নিজেদের জড়িত না করে এটাকেই নিজেদের পেশা করে তোলা" (৩৯৫)। একাধারে তারাই হবে আইন পরিষদ, আইন প্রয়োগ-কর্তা আর বিচারালয়—অবস্থার পরিবর্তনেও আইন যেন তাদেরে কোন অনড় বিশ্বাসে বেঁধে না রাখে। পূর্ব নজিরের শেকলে বাঁধা না থেকে রাষ্ট্রীয় অভিভাবকদের শাসন হবে নমনীয়—'অবস্থা মতো ব্যবস্থা' গ্রহণের সাক্ষাৎ বিজ্ঞতা।

কথা হচ্ছে পঞ্চাশ বছরের মানুষের পক্ষে নমনীয় বিজ্ঞতা সম্ভব কিনা? নিয়ম-বাঁধা কাজের চাপে তাদের মন কি জমাট বেঁধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়নি? এডেইমেন্টাস (Adeimentus) আপত্তি জানালো—বল্লে: দার্শনিকরা সব বোকা আর পাজি—তাদের উপর শাসন-ভার দিলে তারা হয় বোকার মতো, নয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থে, না হয় এ উভয় মতোই করবে শাসন। "যে দর্শন-উপাসকরা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যৌবনে অধ্যয়ন করে না—পরিণত বয়সে করে তার অনুসরণ। এদের অধিকাংশই এক অদ্ভুত জীব হয়ে গড়ে ওঠে, পাক্কা বদমাইস যে হয় তা না হয় নাই বল্লাম। এদের মধ্যে যাদের শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, তুমি যে বিদ্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে বিদ্যার অনুশীলন করে তারা হয়ে পড়ে সংসার-জীবনের অনুপযুক্ত" (৪৮৭)। পুরো চশমা-পরা কোন কোন আধুনিক দার্শনিক সম্বন্ধে এ বর্ণনা খাটে বই কি কিন্তু প্লেটোর উত্তর হচ্ছে এ বিপদ সম্বন্ধে তিনি সজাগ বলেই তিনি তাঁর দার্শনিকদের কেতাবী পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পাঠও দিয়েছেন: ফলে তারা শুধু চিন্তা জগতের মানুষ না হয়ে কর্ম-জগতেরও মানুষ হবে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর কঠোর পরীক্ষার ফলে তারা উচ্চতর আদর্শ আর ভদ্র মেজাজেও পাকা-পোক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। প্লেটোর কাছে দর্শন হচ্ছে সক্রিয় সংস্কৃতি আর কর্ম-ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের সমন্বয়। তিনি জীবন-বিচ্ছিন্ন অবাস্তব পরা-তত্ত্ববিদ গড়তে চাননি: "প্লেটো এমন এক মানুষ যে তাঁর সঙ্গে কান্টের কোন সাদৃশ্যই নেই—এটা (সসম্মানে বলা যায়) তাঁর এক বিশেষ গুণ।"[১]

অযোগ্যতা সম্বন্ধে এ বলা গেল: শাসকদের মধ্যে কোন এক রকম সাম্যবাদের ব্যবস্থা করে শঠতার বিরুদ্ধে হয়তো সতর্কতা এক্তেয়ার করা যায়:

প্রথমতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাঁরা কেউ কোন সম্পত্তি রাখতে পারবে না। এমন কোন ব্যক্তিগত বাড়ীও তারা রাখতে পারবে না যাতে তালা-চাবি লাগিয়ে অন্যের ইচ্ছামতো প্রবেশে বাধা ঘটানো সম্ভব। মিতাচারী শিক্ষিত বীর যোদ্ধাদের যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন এদের জন্যও বরাদ্দ করা হবে ততটুকু মাত্র, তাদের রাজি থাকতে হবে শুধু বছরের খরচ পরিমাণ মাইনে নিতে, তার থেকে একটুও বেশী না। শিবিরবাসী সৈনিকদের মতো তাদের এক সঙ্গে থাকতে হবে। খেতেও হবে সাধারণ ভোজনশালায়। তাদেরে বলে দেওয়া হবে

১. Faguet, p. 10.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনা রূপা ত তোমরা আল্লার থেকেই পেয়েছ—তোমাদের ভেতরই তো রয়েছে ঐশ্বরিক ধাতু। কাজেই সোনা নামে অভিহিত ঐ পার্থিব আবর্জনার কোন প্রয়োজনই তোমাদের নেই। আর যা ঐশ্বরিক তার সঙ্গে দুনিয়ায়ী আবর্জনা মিশিয়ে তাকে যেন কলুষিত করা না হয়—কারণ এ সাধারণ ধাতুগুলি যত সব না-পাক কর্মের উৎস আর তাদের ভিতর যা আছে তা হচ্ছে নিষ্কলুষ। নাগরিকদের মধ্যে একমাত্র তারা যেন হাত না লাগায় সোনা রূপায়, একই ছাদের নীচেও (অর্থাৎ সোনা-রূপার মালিক ও ধনীদের সঙ্গে) যেন বাস না করে, না যেন পরে সোনা রূপা, পান ও যেন না করে ঐ সবে নির্মিত পাত্র থেকে। এতেই নিহিত তাদের শুধু নয় রাষ্ট্রেরও মুক্তি। কিন্তু তারা যদি নিজস্ব ঘরবাড়ী, জমিজমা আর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে পড়ে তা হলে রাষ্ট্র-পরিচালকের পরিবর্তে তারাও হয়ে পড়বে গৃহী আর চাষী অন্য নাগরিকদের সহায়ক না হয়ে হয়ে পড়বে শত্রু আর উৎপীড়ক, হয়ে পড়বে ঘৃণ্য ও ঘৃণাকারী, ষড়যন্ত্রকারী আর ষড়যন্ত্রের শিকার। বহিঃশত্রুর চেয়েও অন্তর শত্রুর ভয়েই কাটবে তাদের জীবন ফলে তাদের নিজের আর রাষ্ট্রের ধ্বংসের মুহূর্ত হবে ত্বরান্বিত (৪.১৬-১৭)।

এ ব্যবস্থাও সফল না হয়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠারই সম্ভাবনা বেশী। কারণ সমস্ত সমাজের কল্যাণের পরিবর্তে এরা নিজেদের অর্থাৎ শাসক গোষ্ঠীর সমৃদ্ধিই চাইবে বেশী করে। কারণ তারা থাকবে অভাব-মুক্ত, আর্থিক দুশ্চিন্তার কোন রকম ক্ষত-চিহ্ন আর বলি-রেখা ছাড়াই এরা পেয়ে যাবে যা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় আর যা কিছু ভদ্র জীবনের উপযোগী। ফলে তারা ধন-লিপ্সা আর হীন দুরাশা থেকেও যাবে বেঁচে—যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সব সময় তাদের করায়ত্ত, তার অতিরিক্ত নয়। তাদের অবস্থা হবে ঐসব চিকিৎসকের মতো যারা জাতিকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে কিন্তু নিজেরা থাকে সে নির্দেশের ব্যতিক্রম। সাধুদের মতো তারা এক সঙ্গে বাস করবে, সরল জীবনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিকের মতো এক সঙ্গে একই ঘরে ঘুমাবে। পিথাগোরাস বলতেন: "বন্ধুদের সব জিনিষে সমানাধিকার থাকবে" (৮০৭ বিধান)। কাজেই প্রশাসকদের সব ক্ষমতাকে করে দেওয়া হবে বন্ধ্যা আর তাকে করা হবে নির্বিষ। সম্মান আর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেবা-বোধই হবে তাদের চরম পুরস্কার। তারা সব এমন লোক যারা গোড়া থেকেই স্বেচ্ছায় এরকম সীমিত পার্থিব জীবন বরণ করে নিয়েছে এবং তারাই কঠোর শিক্ষা-পর্বের পর "আর্থিক মানুষ" বা মোটা মাইনের পদ-সন্ধানী রাজনৈতিকের জীবনের চেয়ে এ জীবনের সুনামকে অধিকতর মূল্যবান মনে করার পাঠ করেছে গ্রহণ। এদের আবির্ভাবে রাজনীতির দলীয় কোন্দলের ঘটবে অবসান।

কিন্তু এ ব্যাপারে এদের বিবিরা কি বলবেন? তাঁরা কি বিলাস আর ভোগ্য সামগ্রী পরিহার করতে রাজি হবেন? নাকি প্রশাসকদের কোন বিবিই থাকবে না? শুধু বস্তুতে নয় স্ত্রীলোকের ব্যাপারেও বোধ করি চলবে সাম্যবাদ। নিজের ব্যাপারে যেমন পারিবারিক ব্যাপারেও ওদের কোন নিজস্বতা থাকবে না—তারা সীমিত হয়ে থাকবে না বিরক্তিকর স্বামীর ব্যস্ত অর্জন-প্রিয়তায়। কোন স্ত্রী-লোকের প্রতি নয় সমাজের প্রতিই তাদের আনুগত্য। এখন সন্তান-সন্ততিও সুনির্দিষ্টভাবে, সুস্পষ্টভাবে তাদের নয়—প্রশাসকদের সব সন্তান-সন্ততিকেই জন্ম-মুহূর্তে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে এবং যৌথভাবে করা হবে পালন আর ওদের বিশেষ মাতৃত্ব-পিতৃত্ব হারিয়ে যাবে এ আবর্তে (৪৬০) সব প্রশাসক-জননীই সব প্রশাসক-সন্তানের যত্ন নেবে। সীমিত পরিধিতে হলেও এভাবে মানব-ভ্রাতৃত্ব স্রেফ কথা থেকে হবে বাস্তবে রূপায়িত—প্রত্যেক ছেলেই হবে অন্য ছেলের ভাই, প্রত্যেক মেয়ে হবে বোন, প্রত্যেক পুরুষ হবে পিতা আর প্রত্যেক নারী এক একটি মা।

কিন্তু এ সব মেয়েরা কোত্থেকে আসবে? অবশ্য প্রশাসকরা শৈল্পিক আর সামরিক শ্রেণী থেকে কিছু কিছু মেয়েকে যে বিয়ে করে আনবে তাতে সন্দেহ নেই আবার প্রশাসনিক শ্রেণীর কিছু সংখ্যক মেয়ে নিজস্ব অধিকারেও আসবে। কারণ এখানে নারী-পুরুষ কোন ভেদ থাকবে না—শিক্ষার ক্ষেত্রেও একেবারেই থাকবে না, মননশীলতার ক্ষেত্রে মেয়েরা ও ছেলেদের সমান সুযোগই পাবে আর সুযোগ পাবে এমনকি রাষ্ট্রের সর্বোউচ্চ আসনে বসারও। কিন্তু শিষ্য গ্লাউকন (Gloucon) যখন আপত্তি জানিয়ে বল্লেন—পরীক্ষা পাশ করার পর যদি মেয়েদেরকে এ ভাবে যে কোন রাষ্ট্রীয় পদে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় তা হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রমবিভাগ নীতিকেই করা হবে লঙ্ঘন তখন তাকে এ কড়া জবাবই শুনতে হলো : শ্রম বিভাগ নারী-পুরুষ হিসেবে হবে না, হবে প্রবণতা আর যোগ্যতানুসারে, যদি কোন মেয়ে রাষ্ট্রীয় শাসনের যোগ্যতা দেখাতে পারে তাকে শাসন করতে দাও আর যদি কোন পুরুষ শুধু বাসন-পেয়ালা মাঝতেই যোগ্যতা দেখায়—আল্লাহ্ তাকে যে কাজের উপযোগী করে গড়েছেন তাকে তাই সমাধা করতে দেওয়াই উচিত।

একই সমাজভুক্ত স্ত্রী মানে যথেচ্ছ সঙ্গম বুঝায় না বরং প্রজনন-সংক্রান্ত সব সম্পর্কের ব্যাপারে কঠোর জন্ম-বৈজ্ঞানিক তদারক করা হবে। এখান থেকেই পশুপ্রজনন যুক্তির শুরু : যদি নির্বাচনের সাহায্যে সর্বোত্তম দিয়ে প্রজননের ফলে উচচ ও আকাঙ্খিত মানের পশু জন্ম সম্ভব, সে একই নীতি মানুষের প্রজননের ব্যাপারে কেন প্রয়োগ করা যাবে না (৪৫৯)? শিশুকে শুধু উপযুক্ত শিক্ষা দিলেই হবে না তার জন্মও সুনির্বাচিত সুস্থ পিতামাতার দ্বারা যথাযথভাবে হওয়া চাই। "শিক্ষার শুরু হওয়া চাই জন্মের আগে।" পূর্ণ স্বাস্থ্যবান না হলে কোন পুরুষ বা নারী যেন সন্তানের জন্ম না দেয়—বর-কনে প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য-সার্টিফিকেট প্রয়োজন। পুরুষেরা সন্তান জন্ম দিতে পারবে ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে আর মেয়েরা কুড়ি পার হলে আর চল্লিশের নীচে থাকা পর্য্যন্ত। পঁয়ত্রিশ বছরেও যারা বিয়ে করবে না তাদের উপর করধার্য্য করা হবে। রাষ্ট্রীয় অনুমতিহীন সঙ্গমের ফলে যদি কোন সন্তান হয় অথবা হয় বিকলাঙ্গ সে সব শিশুকে অনাবৃত রেখে মরে যেতে দেওয়াই উচিত। উপরে প্রজননের যে বয়ঃসীমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার আগে বা পরে অবাধ সঙ্গম চলতে পারে তবে গর্ভপাত করাবে এ শর্তে। "এ রকম সঙ্গমের ফলে যদি গর্ভ হয় সে গর্ভের ভ্রূণ যাতে কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর আলো দেখতে না পায়—এ কঠোর আদেশের সঙ্গেই আমরা উভয় পক্ষকে এ অনুমতিটুকু দিচ্ছি। তাদের জানা উচিত এমন সন্তানের যদি জন্ম হয় তাকে প্রতিপালন করা যাবে না, কাজেই উপরের নির্দেশ মতোই তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (৪৬১।") আত্মীয়-বিয়ে নিষিদ্ধ কারণ তাতে অবক্ষয় ঘটে (৩১০)। "উত্তমের সঙ্গে উত্তমের মিলনই বাঞ্ছনীয় আর তা যতবার সম্ভব—আর নিকৃষ্টের সঙ্গে হওয়া উচিত নিকৃষ্টের কিন্তু প্রতিপালন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে প্রথমোক্ত শ্রেণী থেকে জাত সন্তানকে---অন্য শ্রেণীর নয়। জাতির চরমোৎকর্ষ বজায় রাখার এ হচ্ছে একমাত্র উপায়। অন্যান্য সম্মান আর পারিতোষিক ছাড়াও আমাদের বীর্যবান উৎকৃষ্ট তরুণদের বিচিত্র সঙ্গিণী গ্রহণের অধিকতর সুযোগ দিতে হবে—এমন পিতাদের যত বেশী সম্ভব পুত্র লাভ বাঞ্ছনীয়" (৪৫৯-৬০)।

আমাদের উন্নত প্রজনন সমিতিকে শুধু যে ভিতরের রোগ আর অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হবে তা নয় তাকে রক্ষা করতে হবে বহিঃশত্রুর হাত থেকেও। প্রয়োজন মতো, সাফল্যজনক যুদ্ধের জন্যও আমাদের তৈয়রী থাকতে হবে। আমাদের আদর্শ সমাজ শান্তিবাদী হবে তাতে সন্দেহ নেই। জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হবে জীবিকার সংস্থান অনুসারে। কিন্তু যে সব প্রতিবেশী রাষ্ট্র এভাবে শাসিত হয় না, আমাদের য়ুটোপিয়ার মতো যেখানে সুশৃঙ্খল উন্নয়ন ঘটেনি তারা আমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে পারে, পারে লুন্ঠন উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালাতে। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নেহাৎ দায়ে পড়ে আমাদের একটা মধ্যবর্তী শ্রেণী রাখতে হবে, রাখতে হবে প্রচুর সুশিক্ষিত সৈন্য, যারা প্রশাসকদের মতো সরল আর কঠোর জীবন যাপন করবে—জনসাধারণ "যারা তাদের রক্ষক আর জনক" যে সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত উপকরণ সরবরাহ করবে তা নিয়েই ওদের করতে হবে জীবনধারণ। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ পরিহারের সব রকম সতর্কতা করতে হবে গ্রহণ। যুদ্ধের প্রথম কারণ অপরিমিত জন সংখ্যা বৃদ্ধি (৩৭৩), দ্বিতীয় কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য, অনিবার্য্য বিরোধ যার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের একটা রূপই হলো প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য: "শান্তি শুধু একটি নাম মাত্র"। কাজেই আমাদের আদর্শ রাষ্ট্র দেশের কিছুটা অভ্যন্তরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত—তা হলে বৈদেশিক বাণিজ্যের চরম উন্নয়ন থেকে তা নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারবে। "সমুদ্র দেশকে পণ্যদ্রব্য, টাকা-রোজগার আর দর কষাকষিতে ভরে তোলে—আর তা কি বৈদেশিক কি আভ্যন্তরিক সব সম্পর্কের বেলায় মানুষের মনে করে থাকে অর্থ-লিপ্সা আর অবিশ্বাসের সৃষ্টি।" বৈদেশিক বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হয় বৃহৎ নৌ-বাহিনীর আর নৌ-বাহিনী সামরিকতার মতই নিন্দনীয়। "যুদ্ধ সব সময় কয়েকজনের দোষেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে আর অনেকেই তখন জোটে বন্ধু হিসেবে" (৪৭১)। যে সব যুদ্ধ সব সময় ঘটে তার মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে—গৃহ-যুদ্ধ—গ্রীকের বিরুদ্ধে গ্রীকের যুদ্ধ। পাছে একদিন "সমস্ত গ্রীক জাতিকে না বর্বরদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হতে হয়" সে কারণে সমস্ত গ্রীকদের এক ঐক্যবদ্ধ সম্মিলীত হেলেনীয় জাতি সংঘ গঠন করা উচিত। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রের শীর্ষ দেশে থাকবে স্বল্প-সংখ্যক প্রশাসক—তার রক্ষার জন্য থাকবে বিপুল সৈন্যবাহিনী আর "সহকারিরা" এবং ব্যবসায়ী, শিল্পী আর কৃষক সমাজের প্রশস্ত বুনিয়াদের উপর হবে তার প্রতিষ্ঠা। এই শেষ বা অর্থনৈতিক শ্রেণীরই থাকবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সঙ্গিনী আর পরিবার। কিন্তু অতিরিক্ত ধন বা দারিদ্র্য নিবারণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে প্রশাসকরা। সাধারণ নাগরিকের গড়পড়তা আয় থেকে কারো আয় যদি চারগুণ বেশী হয় তা হলে তাকে অতিরিক্ত আয়টা রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করতে হবে। খুব সম্ভব সুদ নিষিদ্ধ হবে আর সীমিত হবে মুনাফা। অর্থনৈতিক শ্রেণীর জন্য নেহাৎ অবাস্তব হবে প্রশাসক-শ্রেণীর সাম্যবাদ। এ শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপার্জন আর প্রতিযোগিতার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি—অবশ্য এদের মধ্যে যে সব মহৎ-মনা আছে তারা অর্জনের এ সংগ্রামী প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত থাকবে কিন্তু অধিকাংশই হবে তার শিকার। তারা সাধুতা বা সম্মানের জন্য কিছুমাত্র তৃষিত নয়—তৃষিত অসীম আর বহুগুণিত সঞ্চয়ের জন্য। এভাবে যারা স্রেফ টাকার পেছনে আত্মমগ্ন তারা রাষ্ট্র শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনা নির্ভর করছে এ আশার উপর যে, যদি প্রশাসকরা ভালোভাবে শাসন করে আর নিজেরা যাপন করে সরলজীবন তা হলে আর্থিক ক্ষেত্রের লোকেরা শাসনকার্যে তাদেরে একচেটিয়া অধিকার দিতে আপত্তি করবে না, অবশ্য ওদেরও যদি দেয় ভোগ-বিলাসের একচেটিয়া সুযোগ। সংক্ষেপে, আদর্শ সমাজ হচ্ছে ওটি যে সমাজে প্রতি শ্রেণী ও শ্রেণীর প্রতি অংশ নিজের স্বভাব ও প্রবণতা অনুসারে উত্তমভাবে কাজে খাটাতে পারে নিজের শক্তি—যেখানে কোন শ্রেণী বা ব্যক্তি অন্যের কাজে কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করে না বরং পৃথকভাবে এক উপযুক্ত ও সমন্বিত সমগ্রকে বাস্তবায়িত করার জন্য পরস্পর সকলে সহযোগিতা করে (৪৩৩-৩৪)। এ হচ্ছে ন্যায়শীল আদর্শ রাষ্ট্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. নৈতিক সমাধান

রাজনৈতিক অপ্রাসঙ্গিকতার এখানেই শেষ হলো। ন্যায়-বিচার কি? এ প্রশ্ন নিয়েই আমাদের শুরু---এখন তার উত্তর সন্ধানে আমরা প্রস্তুত। পৃথিবীতে তিনটি জিনিসই মূল্যবান: ন্যায়বিচার, সৌন্দর্য আর সত্য। সম্ভবতঃ এর কোনটার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। প্লেটোর চারশত বছর পরে জুডিয়ার এক রোমান কর্মাধ্যক্ষ অত্যন্ত হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "সত্য কি?" দার্শনিকরা আজো তার উত্তর দেন নি, সৌন্দর্য কি তাও আমাদের বলেন নি। কিন্তু ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে প্লেটো একটা সংজ্ঞা দেওয়ার দুঃসাহস করেছেন। তিনি বলেছেন: "ন্যায়বিচার হচ্ছে নিজের যা পাওনা তা পাওয়া আর নিজের যা করণীয় তা করা।" (৪৩৩)

এও কিন্তু খুব আশাপ্রদ শুনাচ্ছে না। এতখানি প্রতীক্ষার পর আমরা কিছুটা নির্ভুল তথ্যের প্রকাশ আশা করেছিলাম। এ সংজ্ঞার মানে কি? এর সরলার্থ হচ্ছে যে যা উৎপন্ন করবে সে পরিমাণই সে পাবে আর যে কাজের সে সব চেয়ে যোগ্য সে কাজই করবে। যথা-স্থানে থাকা, যথাসাধ্য করা, যে পরিমাণ গ্রহণ সে পরিমাণ প্রদান---এ হচ্ছে ন্যায়বান বা ন্যায়শীলের লক্ষণ। কাজেই ন্যায়বানের সমাজ হবে সমন্বিত আর যোগ্য—কারণ প্রত্যেক কিছুই থাকবে যথাস্থানে, অর্কেস্ট্রার প্রতি অংশের মতো সব কিছুই করে যাবে নিজ নিজ কর্তব্য। গ্রহনক্ষত্র যে সুসমন্বিত সম্পর্কের দ্বারা পরস্পর বিধৃত আর সুশৃঙ্খলভাবে গতিশীল (পিথাগোরাস হয়ত বলবেন সাংগীতিক নিয়মে) সমাজে ন্যায়-বিচারও তাই। অর্থাৎ ন্যায় বিচারের ফলেই সমাজ থাকে সুস-মন্বিত আর গতিশীল। এ রকম সুসংবদ্ধ সমাজই টিকে থাকার যোগ্য এবং এ ন্যায় বিচারও লাভ করে এক রকম ডারুনীয় অনুমোদন। মানুষ নিজের স্বাভাবিক স্থান থেকে বিচ্যুত হলে—যদি ব্যবসায়ী রাষ্ট্র-বিদ্যাকে অধীন করে রাখে অথবা সৈনিক যদি রাজাসন দখল করে বসে, তখন বিভিন্ন অংশের সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায়, শিথিল হয়ে পড়ে সন্ধি-স্থল বা জোরা, ফলে সমাজে ভাঙ্গন ধরে আর সমাজ হয়ে যায় বিলুপ্ত। ন্যায় বিচার মানে সক্রিয় সমন্বয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি-জীবনেও সক্রিয় সমন্বয় হচ্ছে ন্যায়-বিচার---মানুষের সব কিছুর পারস্পরিক সমন্বয়ে কাজ চলতে থাকা, সবাই নিজ নিজ উপযুক্ত স্থানে থেকে সম্মিলিত সহযোগিতার দ্বারা ব্যক্তি-ব্যবহারকে রূপ দেওয়া। প্রতিটি মানুষ এক একটি পৃথিবী অথবা বাসনা-কামনা, আবেগ আর মতাদর্শের এক এক বিশৃঙ্খল-মূর্তি। এ সবকে দিতে হবে সংগতি---তাহলেই ব্যক্তি বাঁচবে আর হবে সফল। কিন্তু যদি ব্যক্তি তার যথার্থ স্থান আর কর্ম হারিয়ে বসে। যদি (ধর্মান্ধের মতো) আবেগই তার কাজের আলো আর উত্তাপ হয়ে পড়ে অথবা (যেমন বুদ্ধিজীবীদের ঘটে) চিন্তা যদি একই সঙ্গে উত্তাপ আর আলো হয়ে বসে তা হলে ব্যক্তি-চরিত্রে ভাঙ্গন ধরে এবং অনিবার্য রাত্রির মতো পতন আসে ঘনিয়ে। ন্যায়-বিচার হচ্ছে--শৃঙ্খলা আর সৌন্দর্য্য এবং আত্মার অংশ। শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্য যেমন, আত্মার পক্ষে এগুলিও তাই। পাপ মানেই গরমিল—মানুষে আর প্রকৃতিতে, মানুষে আর মানুষে, ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের।

শুধু থ্রেসিমেকাস আর কেলিক্লসের প্রতি নয় তাবৎ নীট্‌শীয় –মতবাদীদের প্রতি প্লেটোর চিরকালের উত্তর হচ্ছে: নিছক শক্তির নাম ন্যায়-বিচার নয়—সমন্বয়িত শক্তিই ন্যায়-বিচার—মানুষ এবং তার বাসনা-কামনা যখন সুশৃঙ্খলভাবে বুদ্ধি আর সংঘঠনে রূপান্তরিত হয় তখনই দেখা দেয় ন্যায়বোধ। সবলের অধিকার প্রতিষ্ঠার নামও ন্যায়-বিচার নয়--ন্যায় বিচার অর্থ সমগ্রের সক্রিয় সমন্বয়। ব্যক্তি বিশেষ নিজের শক্তি ও স্বভাবের অনুকূল পরিবেশ ছেড়ে সাময়িকভাবে কিছু সুযোগসুবিধার অধিকারী হলেও হতে পারে---কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণা অমোঘ নিয়তির হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই। বৃত্ত-চ্যুত গ্রহের পেছনে ক্রুদ্ধ নিয়তির পশ্চাদ-ধাবনের কথা এনাক্সাগোরাস (Anaxagoras) যে ভাবে বলেছেন মানুষের বেলায়ও তাই ঘটবে। বস্তু-প্রকৃতির হাতের ভয়াবহ দণ্ড অবাধ্য যন্ত্রটাকে বিতাড়িত করে আবার ওর স্বাভাবিক ও যথাযথ স্থানে আসবে নিয়ে। কর্সিকার ছোট্ট সৈন্যাধ্যক্ষটি প্রাচীন রাজতন্ত্রের যোগ্য জাঁকজমকপূর্ণ একনায়কত্বের দ্বারা সারা ইউরোপকে শাসন করবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু তার পরিণতি সমুদ্রবেষ্টিত গুহায় বন্দী-জীবন। তখনই তিনিও যে "বস্তু-প্রকৃতির দাস" অনুতপ্তচিত্তে এ সত্য আবিষ্কার করতে হন সক্ষম। অবিচার চাপা থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা কোন অদ্ভুত উপলব্ধি নয়। বরং দার্শনিক মতামতে হঠাৎ কোন নতুনত্বের আমদানি আর তার স্ফীতি দেখলেই কিছুটা সংশয়ী হওয়া ভালো। (সুন্দরী রমণীর মতো) সত্যেরও অহরহ বস্ত্র-বদল ঘটে কিন্তু অনবরত অভ্যাসের আড়ালে তাঁর আসল রূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। নৈতিক ব্যাপারে চমক লাগানো নতুনত্ব আশা করা উচিত নয়। এ পথে বুদ্ধিবাদী আর নাট্‌শীয়দের চমৎকার অভিযান সত্ত্বেও সব নৈতিক উপলব্ধির কেন্দ্র-বিন্দু হলো সামগ্রিক ভালো—সর্ব অবয়বের কল্যাণ। সংযোগ, পারস্পরিক নির্ভরতা আর সংঘটনেই নৈতিকতার শুরু—সমাজ জীবনে ব্যক্তির কিছুটা স্বাধীকার সাধারণ বিধানের জন্য ছেড়ে দিতে হয়, শেষকালে আচার-ব্যবহারের সাধারণ মানটাই শ্রেণী বা সমাজের জন্য শ্রেয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতি তা করবেই আর প্রকৃতির সিদ্ধান্তই সব সময় চরম। দল বিশেষ তার ক্ষমতা ও ঐক্য আর একই উদ্দেশ্যে সকলে সহযোগিতা করতে পারার শক্তি দিয়েই প্রতিযোগিতায় বা সংগ্রামে অন্য দলের উপর জয়ী হয়ে থাকে। তা হলে যে যা সব চেয়ে ভালো করতে পারে প্রত্যেককে তা করার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর সহ-যোগিতা আর কি হতে পারে? প্রত্যেক জীবন্ত সমাজে এ রকম সংঘঠনই চাই। যিশুখ্রীস্ট বলেছেন: দুর্বলের প্রতি দয়া করাই নীতি, নীট্‌শের মতে: শক্তিমানের সাহসই নীতি আর প্লেটো বলেন: সমগ্রের সঙ্গে সক্রিয় সমন্বয়েরই নাম নীতি। সম্ভবত এ তিন মতবাদের সমন্বয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ নীতি দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু কোনটা আসল বা মৌলিক সে বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ থেকে যায় না কি?

১০. সমালোচনা

এখন এ য়ূটোপিয়া সম্বন্ধে আমাদের কি বক্তব্য? এর বাস্তবায়ন কি সম্ভব? যদি তা না হয়, তার কি এমন কোন সম্ভাব্য দিক আছে যা আমরা আধুনিক কালে করতে পারি গ্রহণ? কোথাও তার কিছুটাও কি কখনো বাস্তবায়িত হয়েছে?

অন্ততঃ শেষ প্রশ্নটার উত্তর প্লেটোর সপক্ষে দেওয়া যায়। আমাদের দার্শনিকটি যেভাবে কল্পনা করেছেন প্রায় তার অনুরূপভাবে প্রায় হাজার বছর ধরে য়ূরোপ এক শ্রেণীর শাসক দ্বারা হয়েছে শাসিত। মধ্যযুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রীস্টীয় জগতের জনসাধারণকে শ্রমিক, সৈনিক আর পুরোহিত এ তিন শ্রেণীতে ভাগ করার ছিল রেওয়াজ। শেষোক্ত শ্রেণী, সংখ্যায় অল্প হলেও, সংস্কৃতির সব সুযোগ-সুবিধা আর উপকরণ একচেটিয়া করে রেখেছিল আর অসীম প্রভুত্বে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্ধাংশকে করেছিল শাসন। প্লেটোর শাসক বা অভিভাবকদের মতো এসব পুরোহিতরাও নির্বাচিত হতো না ভোটে বরং শাসন আর শাস্ত্রীয় বিদ্যায় পারদর্শিতা এবং ধ্যান আর সারল্যের জন্যই হতো (তার সঙ্গে এটুকুও হয়ত যোগ করা যায়) তাদের যে সব আত্মীয়ের গির্জা আর রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে যোগ ছিল কিছুটা তাদের প্রভাবেও তাদের শাসনকালের শেষ ভাগে, প্লেটো যতটুকু চেয়েছিলেন, পারিবারিক ঝঞ্চাট ব্যাপারে তারা তার চেয়েও ছিল মুক্ত—মনে হয় প্রজনন ব্যাপারে 'অভিভাকদের' যেটুকু স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল তারা ততটুকুও ভোগ করত না। পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাবের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোই ছিল কৌমার্য্য। একদিকে তারা পারিবারিক সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে ছিল মুক্ত, অন্যদিকে রক্ত মাংসের দাবীও তারা উপেক্ষা করতে পারতো বলে পাপীরা তাদেরে দেখতো প্রায় অতি-মানবীয় সম্ভ্রমের চোখে। তাই সাগ্রহে এদের কাছে জীবনের খাতা খুলে দিয়ে স্বীকারুক্তি করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতো না। ক্যাথলিক রাজনীতির অনেক কিছুর উৎপত্তি, প্লেটোর "রাজকীয় মিথ্যা" থেকে অথবা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। স্বর্গ নরক, প্রেতলোক ইত্যাদির মধ্যযুগীয় ধারণার উৎস সহজে, 'রিপাব্লিকের' শেষ খণ্ডে সন্ধান করা যায়, বিশ্বতত্ত্বের মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যের আবির্ভাব টিমাউস্ (Timaus) থেকে, বাস্তব সম্বন্ধে মতবাদও (সাধারণ ভাবের তন্ময় বাস্তবতা) প্লেটোর ভাব-কল্প মতবাদেরই ব্যাখ্যা, এমন কি শিক্ষার যে 'চতুর্বর্গ, (অঙ্ক, জ্যামিতি, জ্যোতিষ আর সংগীত) তারও পাঠ্যসূচী তৈয়রী হতো প্লেটোর রেখা-চিত্র অনুসরণে। কোন রকম শক্তির আশ্রয় না নিয়ে এই নীতিগুলোর সাহায্যেই তখন য়ুরোপ হতো শাসিত। জনসাধারণ সাগ্রহে এ শাসন মেনে নিয়ে প্রায় হাজার বছর ধরে এক রকম প্রাচুর্য্যের মধ্যেই তাদের শাসকদের প্রতিপালন করে এসেছে এবং শাসন ব্যাপারে নিজেদের বক্তব্য শোনাবার কোনরকম দাবীও করেনি তারা। এ আনুগত্য শুধু সাধারণ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—বণিক, সৈনিক,

৫—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামন্ত আর বেসামরিক শক্তি সবাই ছিল রোমের কাছেনত-জানু। এরকম অভিজাততন্ত্র কম রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়—সম্ভবতঃ এমন চমৎকার শক্তিশালী সংগঠন পৃথিবীতে আর দেখাই যায়নি, যে জেস্যুইটরা (Jesuits) এক সময় প্রাগোয় (Praguay) রাজত্ব করেছিল তারা প্রায় আধা প্লেটোনীয় 'অভিভাবক' ছিলো---বর্বর অধ্যুষিত দেশে শুধু জ্ঞান আর দক্ষতার শক্তি দিয়েই তারা চালিয়েছিল তাদের পৌরহিত-তন্ত্র। ১৯১৭-র নবেম্বর বিপ্লবের পর কিছুকালের জন্য রুশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি যে শাসন চালিয়েছিল তাও বিস্ময়করভাবে 'রিপাব্লিকের' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছোট্টদল, ধর্মীয় বিশ্বাসের নিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ, গোঁড়ামী আর বহিষ্কারের অস্ত্র হাতে, অতি মিতাচারীর মতো জীবন যাপন করে—যে কোন ভক্ত সন্তের মতো উদ্দেশ্যের প্রতি কঠোর একাগ্র-তায় তারা অর্ধেক য়ুরোপকে করেছিল শাসন। এসব নজিরই প্রমাণ করে সীমিত এলেকায়, কিছুটা রদবদল করে নিলে প্লেটোর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব—বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সময় এসবের যে বাস্তব ও ব্যবহারিক রূপ দেখেছিলেন তা থেকেই তিনি পেয়েছেন তাঁর এ পরিকল্পনা-কল্পনার ইংগিৎ। মিশরের ধর্মতন্ত্র তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এখানে তিনি দেখেছিলেন এক ক্ষুদ্র পুরোহিত-শ্রেণী শাসিত এক মহৎ ও প্রাচীন সভ্যতা। তুলনায় এথেনীয় প্রতিনিধি-সভা যে কত অযোগ্য, উৎপীড়ক আর কোন্দল-প্রিয় তাও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। প্লেটো বুঝতে পারছিলেন মিশরীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও উচচাঙ্গের। ইটালীতে তিনি পিথাগোরীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিছুকাল ছিলেন---ওরা ছিল নিরা-মিষাশী আর সাম্যবাদী, যে গ্রীক উপনিবেশে তারা বাস করতো সেটা তারাই শাসন করেছিল বহু বংশ ধরে। স্পার্টায় তিনি দেখেছেন একটি ক্ষুদ্র শাসক গোষ্ঠি বিজিতদের মাঝখানে কি কঠোর আর সরল জীবন যাপন করছেন—খাওয়াদাওয়া করছে এক সঙ্গে, সুপ্রজনন উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ করছে সঙ্গম আর বীর ও সাহসীদের দিচ্ছেন বহু-স্ত্রী ভোগের সুযোগ। নিঃসন্দেহে তিনি য়ুরিপিডেসের (Euripedes) স্ত্রী-সাম্যবাদের কথা শুনেছেন, শুনেছেন দাস-মুক্তি আর হেলেনীয় সঙঘ গঠন করে গ্রীক-জগতে শান্তি স্থাপনের দাবীর কথা। যাদেরে এখন সক্রেটিস-বামপন্থী বলা হয়, তাদের মধ্যে যে সব মনুষ্য-দ্বেষীরা শক্তিশালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাদের কাকে কাকেও তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। মোটকথা প্লেটো ভালো করেই অনুভব করেছিলেন যে বাস্তব অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন তাতে তেমন অসম্ভব কোন পরিকল্পনা তিনি পেশ করছেন না।

তবুও এরিস্টটলের যুগ থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত অনেক সমালোচকই 'রিপাব্লিকে' আপত্তি আর সন্দেহ পোষণের কারণ খুঁজে পেয়েছেন। স্টেগিরার অধিবাসীটি (অর্থাৎ এরিস্টোটেল) মানব-বিদ্বেষী-সুলভ সংক্ষেপে বলেছেন: "যুগে যুগে এরকম এবং আরো অনেক কিছু বহুবার আবিষ্কৃত হয়েছে।" যে সমাজে সব মানুষ ভাই ভাই তেমন একটা সমাজের পরিকল্পনা মনোরম বই কি—কিন্তু আমাদের সমসাময়িক সব পুরুষের বেলায় এটা প্রয়োগ করতে গেলে তার ভিতর-কার বৈশিষ্ট্য আর উষ্ণতা দুই-ই জালো হয়ে যাবে। সম্পত্তির সম-অধিকারের বেলায়ও তাই ঘটবে—তাতেও আসবে দায়িত্বের শৈথিল্য। সবাই যদি হয় সব জিনিষের মালিক তা হলে কেউই কোন জিনিসের নেবে না যত্ন। শেষকালে এ প্রধান রক্ষণশীলের যুক্তি হলো—সাম্যবাদ মানুষকে এক অসহ্য ও অবিচ্ছিন্ন সংযোগে নিক্ষেপ করবে, থাকবে না কোন আড়াল বা ব্যক্তিত্ব। তখন মনে হবে ধৈর্য আর সহযোগিতা স্রেফ মুষ্টিমেয় সাধু-সন্তদেরই গুণ। "সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত গুণের উপর জোর দেওয়া উচিত নয়—উচিত নয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধু বিশেষ অবস্থা আর স্বভাবের অনুকূল করা। বেশীর ভাগ মানুষ যে জীবনের ভাগী হতে পারে আমরা তেমন জীবনকে স্বাগত জানাবো আর স্বাগত জানাবো সে শাসন ব্যবস্থাকে যা সাধারণভাবে সব রাষ্ট্রই বাস্তবায়িত করতে সক্ষম।"

এ হচ্ছে প্লেটোর সর্ব প্রধান শিষ্যের মনোভাব। পরবর্তী সমালোচকরাও এ ধারারই অনুসারী। বলা হয়েছে, এক-পত্নীক বিয়ের সঙ্গে যে নৈতিক বোধ জড়িয়ে আছে আর দীর্ঘকাল ধরে তার পেছনে যেসব রীতি-রেওয়াজ জড়ো হয়েছে প্লেটো সে সবকে তেমন আমল দেননি—মানুষ সমভাবে বন্টিত স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে এ কথা ভাবতে গিয়ে তিনি মানুষের অধিকার-চেতনা-জাত ঈর্ষাকেও দেননি আমল। আর আমল দেননি মায়েদের স্বাভাবিক মাতৃত্ববোধকে—হৃদয়হীন একাকারিত্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে সহজে রাজি হবে এ কথা মনে করে। সর্বোপরি তিনি ভুলে গেলেন যে পরিবারের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বোধের সূতীকাগার আর যে মনস্তাত্ত্বিক বুনিয়াদের উপর তিনি তাঁর রাষ্ট্রকে দাঁড় করাতে চান তার মূল উৎস সে সহযোগিতা আর সাম্যবাদী আচার ব্যবহার তাকেই তিনি ধ্বংস করে দিচ্ছেন। এক অতুলনীয় বাক-বৈদগ্ধ দিয়ে এভাবে তিনি যে শাখায় বসেছেন তাকেই ফেলেছেন কেটে।

এ সব সমালোচনার সহজ উত্তর—তাঁরা আঘাত হানছেন এক অলীক মূর্তির প্রতি। প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনায় সংখ্যাগুরু জনতার কোন স্থান নেই—তাঁর শাসক গোষ্ঠীর জন্য যে আত্মত্যাগের কথা তিনি বলেছেন তা শুধু অল্প সংখ্যকের দ্বারাই সম্ভব এ কথা তো তিনি পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন। শুধু 'অভিভাবকরাই পরস্পরকে ভাই বা বোন বলবে—তারাই শুধু হবে না সোনা কি সম্পত্তির মালিক। বাদ বাকি বৃহত্তর জনসাধারণ যা কিছু সম্মানজনক, যেমন—সম্পত্তি, অর্থ, বিলাস, প্রতিযোগিতা আরও যা তারা নিজস্ব হিসেবে রাখতে চায় তা রাখতে কোন আপত্তি নেই। এক পত্নীক বিয়েতে যদি তাদের চলে তা তারা করতে পারবে—তার থেকে আর পারিবারিক জীবন থেকে যে নীতি-বোধের উৎপত্তি তাও অব্যাহত থাকবে। পিতারা খুশী মতো রাখতে পারবে স্ত্রী আর মায়েরা চরম বিরক্তিকর হলেও রাখতে পারবে সন্তানদের নিজের কাছে। প্রেম ও সম্মানবোধের মতো অভিভাবকদের অন্য প্রয়োজন অত বেশী সাম্যবাদী প্রকৃতির হবে না—দয়া নয় আত্ম-গরিমাই তাদেরে রাখবে স্থির ও দৃঢ় নিবদ্ধ। মাতৃত্ববোধ সম্বন্ধে বলা যায়—শিশুর জন্মের অথবা বেড়ে ওঠার আগে তা তেমন সবল থাকে না। অধিকাংশ মায়েরা সন্তানের জন্মে খুব যে খুশী হয় তা নয় বরং নেহাৎ দায়ে পড়েই মেনে নেয় শুধু। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বিকাশ-সাপেক্ষ ব্যাপার, তা মুহূর্তের অলৌকিকতা নয়। সন্তানের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের ভিতরেই সন্তান-স্নেহেরও ঘটে বিকাশ। সন্তান যখন মাতৃত্বের পরিপূর্ণ শিল্পমূর্তি গ্রহণ করে তখনই তার প্রতি স্নেহ মাতৃ-হৃদয়ের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য আপত্তি যা তোলা হয়েছে তা অনেকখানি অর্থনৈতিক—মনস্তাত্ত্বিক নয়। যুক্তি খাড়া করা হয়েছে—প্লেটো তাঁর প্রজাতন্ত্রে প্রত্যেকটা নগরকে দু'টো নগরে ভাগ করেছেন—তারপর আবার করেছেন এক এক নগরকে তিন অংশে বিভক্ত। উত্তরে বলা যায়—প্রথম ভাগটার কারণ অর্থনৈতিক সংঘর্ষ। প্লেটোর রাষ্ট্রে অভিভাবক আর সহকারীদের বিশেষভাবে সোনা আর সম্পদের প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকার দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। জিজ্ঞাসা করা হয় অভিভাবকদের দেওয়া হয়েছে ক্ষমতা অথচ দেওয়া হয়নি দায়িত্ব—এতে কি অত্যাচার প্রশ্রয় পাবে না? উত্তর: মোটেও না। কারণ তাদের শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণ-অধিকার থাকবে কিন্তু সম্পদ বা অর্থনৈতিক কোন ক্ষমতাই থাকবে না। অভিভাবকদের শাসন ব্যবস্থায় আর্থিক-শ্রেণী যদি অসন্তুষ্ট হয় তা হলে পার্লিয়ামেন্ট বা রাষ্ট্র-পরিষদ যেমন বাজেট পাশ করতে অস্বীকার করে প্রশাসকদের দমন করে তেমনি এরাও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারবে (অর্থাৎ এভাবে অভিভাবকদের রাখতে পারবেন কাবু করে)। বেশ, যদি তাই হয়, অর্থনৈতিক শক্তি ছাড়া শুধু রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে অভিভাবকরা তাদের শাসন কায়েম রাখবে কি করে? হ্যারিংটন, মার্ক্স আর অন্যান্যরা কি দেখাননি—রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতারই প্রতিফলন? আর রাজনৈতিক অধীন প্রজা-শ্রেণীর হাতে যদি অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব চলে যায়, যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেলায় হয়েছিল, তা হলে কি রাজনৈতিক ক্ষমতাসীনদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে না?

এ আপত্তিটা মৌলিক এবং মারাত্মকও। উত্তরে বলা যায়: রোমান ক্যাথলিক গির্জার যে শক্তি একদিন কেনোশায় (দক্ষিণ ইটালীর একটি জেলা) রাজাদের পর্যন্ত নতজানু করেছিল, সূচনায় তার ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নয় বরং ছিল নির্বিচার ও অনড় ধর্মবিশ্বাস। য়ুরোপের কৃষি-ভিত্তিক অবস্থা ও গির্জার এ সুদীর্ঘ প্রভুত্বের কারণ হতে পারে। কারণ কৃষি-ভিত্তিক সমাজ প্রকৃতির খেয়াল-খুশীর কাছে এত বেশী অসহায় যে স্বভাবতঃই তারা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে—প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তারা হয়ে পড়ে ভীত। আর ভয়ের পরিণতি উপাসনা। যখন শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটলো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবির্ভাব হলো নতুন মানুষ আর নতুন মনের—যারা অধিকতর বাস্তববাদী আর পার্থিব। এ নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হতেই গির্জা-শক্তি শুরু করল ভেঙ্গে পড়তে। রাজনৈতিক শক্তিকে বার বার আসতে হয় অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে সমঝোতায়। প্লেটোর অভিভাবকদের অর্থনৈতিক ব্যাপারে যদি আর্থিক শ্রেণীর উপর নির্ভর করতে হয় তা হলে অনতিবিলম্বে তারা ঐ শ্রেণীর অধীন প্রশাসকে হবে পরিণত, এমনকি সামরিক শক্তির কারসাজিতেও এ অনিবার্য্য পরিণাম থেকে পাওয়া যাবে না অব্যাহতি। যেমন রাশিয়াও বৈপ্লবিক শক্তি, যে কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, খাদ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা মানে জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা—তাদের মধ্যে সম্পত্তি-অর্জনেচ্ছু ব্যক্তিত্বের বিকাশ রোধ করতে পারেনি। তবে প্লেটোর সপক্ষে এটুকু মাত্র বলার থাকে: অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব যাদের হাতে রয়েছে রাজনৈতিক নীতিও তারাই নির্ধারণ করুক কিন্তু এ নীতিগুলিকে কাজে পরিণত করবে এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারীরাই। যাঁরা বাণিজ্য আর উৎপাদনকেন্দ্র থেকে হঠাৎ রাজনীতিক্ষেত্রে ছিট্‌কে এসে পড়েছে, পায়নি শাসনকার্য্য পরিচালনায় কোনরকম শিক্ষা-দীক্ষা তারা যেন এখানে নাক না গলায়।

প্লেটোর উপরোল্লেখিত পরিকল্পনার বড় ক্রটী হচ্ছে—রদবদল আর পরিবর্তনের যাকে হিরাক্লিটীয় (Heracleitean) বোধ বলা হয় তার অভাব। পৃথিবীর এ চলচ্চিত্রকে এক স্থির আর অনড় ছবি করে তুলতে তিনি যেন বেজায় ব্যস্ত। যে কোন ভীরু দার্শনিকের মতো তিনি একান্তভাবে ভালোবাসতেন শৃঙ্খলা—এথেন্সের গণতান্ত্রিক কল-কোলাহলে ব্যক্তির মূল্যবোধ যেভাবে উপেক্ষিত তা দেখে তিনি হয়ে পড়েছিলেন শঙ্কিত। কীট-তত্ত্ব বিশারদ যেমন মাছির শ্রেণী বিভাগ করে তিনিও তেমনি করেছিলেন মানুষের শ্রেণীবিভাগ। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে পুরোহিত-সুলভ বাক্-বিস্তারেও তাঁর আপত্তি ছিল না। তাঁর রাষ্ট্র অচল, স্থির—যা সহজে পরিণত হতে পারে এক বুড়ো অর্থব সমাজে, যে সমাজ নবাবিষ্কার আর পরিবর্তন-বিরোধী, অচল-অনড়, অশীতিবয়স্কদের দ্বারা হবে শাসিত। ওটা হবে ললিত-কলা বর্জ্জিত বিজ্ঞান—হবে বিজ্ঞানমনাদের মতো শুধু শৃঙ্খলারই ভক্ত। এমন স্বাধীনতা শিল্পের আত্মাকেই করবে অবহেলা। ওটা সৌন্দর্য-নামের পূজারী বটে কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে বা তার নির্দেশ দিতে সক্ষম সে শিল্পীদের পাঠাবে নির্বাসনে। ওটাও একটা স্পার্টা বা প্রাসিয়াই হবে—হবে না আদর্শ রাষ্ট্র।

অকপটে এ সব অত্যাবশ্যক কথা লেখার পর প্লেটোর শক্তি আর উপলব্ধির গভীরতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই শুধু থাকে বাকি। আসলে তাঁর কথা ঠিক নয় কি? এ পৃথিবী বিজ্ঞতমদের দ্বারাই শাসিত হওয়া উচিত। তাঁর চিন্তাকে আমাদের সীমা আর সময়ের উপযোগী করে নেওয়া সে ত আমাদেরই কর্তব্য। গণতন্ত্রকে আজ আমাদের মেনে নিতেই হবে কিন্তু প্লেটোর প্রস্তাব মতো নির্বাচক মণ্ডলীকে আমরা সীমিত করতে পারবো না। তবে পদ বা ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে আমরা বাধা প্রয়োগ করতে পারি—এভাবে গণতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্রের যে সংমিশ্রণ যা সম্ভবত প্লেটোর মনে ছিল, তাকে আমরা করতে পারি বাস্তবায়িত। চিকিৎসকদের মতো রাজনীতিবিদ্‌দেরও বিশেষ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা গ্রহণ উচিত—হয়তো তাঁর এ নীতিও আমরা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করতে পারি। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খুলতে পারি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর প্রশাসনিক শিক্ষার বিভাগও। এসব বিভাগ যখন পুরোপুরি চালু হবে তখন এসব বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রেজুয়েট ছাড়া অন্য কাকেও কোন রাজনৈতিক পদে মনোয়ন দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। যারা যে পদের শিক্ষা পেয়েছে তাদের প্রত্যেককেই আমরা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য মনে করবো—এভাবে মনোয়ন দেওয়ার যে জটিল পদ্ধতি আর যা হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের দুর্নীতি-কেন্দ্র, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আমরা সক্ষম হবো। যারা যোগ্য আর যথাযথ শিক্ষা পেয়েছে সে রকম প্রার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচক মণ্ডলী যাকে খুশী পারবে নির্বাচিত করতে। এভাবে গণতান্ত্রিক বাছাই বা নির্বাচন হবে এখন থেকে অনেক বেশী প্রসারিত—অন্তত কয়েক বছর পরে পরে এখন যে মঞ্চাভিনয় হয় তার অবসান ঘটবে। প্রশাসনিক বিদ্যায় গ্রেজুয়েটদের মধ্যে শাসন-সংক্রান্ত পদকে সীমাবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে একটি সংশোধনী যোগ করলেই এ পদ্ধতি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে—আর তা হচ্ছে: পিতামাতার সামর্থ্য অসামর্থ্য নির্বিশেষে নর-নারী সকলের জন্য সম-শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা—বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা আর রাজনৈতিক অগ্রগতির বেলায়ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাথমিক স্কুল থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত যারা কোন নির্দিষ্ট মানের যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম তাদের পিতামাতার যদি এসব সন্তানদের আরো উচ্চতর শিক্ষা দেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য না থাকে তা হলে দেশের মিউনিসিপালিটি, কাউন্টি আর রাষ্ট্রের উচিত এদের যথাযোগ্য বৃত্তি দেওয়া—আর এ করা কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নয়। তা হলেই গণতন্ত্র হবে সার্থক-নামা।

পরিশেষে প্লেটোর প্রতি সুবিচারের খাতিরে একথা যোগ করতে হয় যে, তিনি নিজেও বুঝতেন তাঁর য়ুটোপিয়ার বাস্তবায়ন খুব সহজ-সাধ্য নয়। তিনি বলেছেন—তিনি যে আদর্শের বর্ণনা করেছেন তা আয়ত্ত করা খুবই কঠিন ব্যাপার কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-মনের আশা আকাঙ্খার ছবি এভাবে তুলে ধরার মূল্য ও নেহাৎ কম নয়। মানুষের গুরুত্বও তো এখানে যে মানুষ শ্রেষ্ঠতর পৃথিবীর কল্পনা করতে পারে এবং সংকল্প করতে পারে অন্তত তার কিছুটা অংশকে বাস্তবায়িত করার। মানুষই এক মাত্র প্রাণী যে য়ূটোপিয়ার স্বপ্ন দেখে। "আমরা সামনের দিকে তাকাই, তাকাই পেছনের দিকে এবং যা পাইনি তা পাওয়ার জন্য হই ব্যাকুল।" এর সবই ব্যর্থ নয়: বহু স্বপ্নই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেয়ে হাঁটতে শুরু করেছে অথবা পাখা গজিয়ে শুরু করেছে উড়তে—যেমন মানুষের উড়তে পারার স্বপ্ন দেখেছিল গ্রীক উপকথার ইকেরাস (Icarus)। যাই হোক আমরা যদি একটা ছবি ও আঁকি তাও আমাদের গতিবিধি আর কাজকর্মের আদর্শও লক্ষ্য হতে পারে—অবশ্য যদি আমাদের অনেকে সে ছবিটার দিকে ফিরে তাকাই আর অনুসরণ করি তার রশ্মি-রেখা। তা হলে একদিন মানচিত্রে য়ূটোপিয়ারও হয়ে যাবে স্থান। ইত্যবসরে "আকাশে এমন একটা নগরের রূপ-রেখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার ইচ্ছা সে তা দেখতে পারে। দেখে, নিজেকে সেভাবে করতে পারে পরিচালিত। পৃথিবীতে ওরকম কোন নগর আছে কি না, আদৌ কোন দিন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এসব কথা না ভেবে অন্য কিছুর নয় সে নগরের (অর্থাৎ য়ূটোপিয়ার) বিধি-বিধান মতোই কাজ করে যেতে পারে (৫৯২)।" সজ্জনেরা ত্রুটিপূর্ণ রাষ্ট্রেও প্রয়োগ করেন ত্রুটিহীন আইন।

যাই হোক তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার যখন সুযোগ এলো প্লেটো অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সে ঝুঁকি নিতে গেলেন এগিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৮৭-তে সিলির রাজধানী উন্নত ও সমৃদ্ধিশীল সাইরাকিউসের শাসনকর্তা ডায়োনিসিয়াস (Dionysius) যখন এসে তাঁর রাজ্যটাকে য়ূটোপিয়া' বানিয়ে দেওয়ার জন্য প্লেটোকে আমন্ত্রণ জানালেন তখন দার্শনিক-প্রবর হয়তো ভাবলেন একটা জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার চেয়ে, রাজা হলেও একটা ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা অনেক সহজ হবে। এ ভেবে তিনি রাজি হলেন। কিন্তু ডায়োনিসিয়াস তখন দেখলেন এ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে তাঁর আর রাজা থাকা চলবে না, হতে হবে তাঁকেও দার্শনিক। তখন তিনি কেটে পড়লেন। ফলে দার্শনিকে আর রাজায় শুরু হলো তিক্ত-বিরোধ। রাজার রাজত্বে রাজার সঙ্গে দার্শনিক এঁটে উঠবেন কি করে? কথিত আছে প্লেটোকে বিক্রয় করে দেওয়া হয় দাস-বাজারে এবং পরে তাঁকে উদ্ধার করেন তাঁর বন্ধু ও শিষ্য এন্নিকেরিস্ (Anniceris)। কিন্তু তাঁর এথেনীয় বন্ধু ও শিষ্যগণ যখন উদ্ধার টাকা ফেরৎ দিতে চাইল তখন এন্নিকেরিস্ টাকা নিতে অস্বীকার করে বল্লেন: তাঁদেরই শুধু একা দর্শনকে সাহায্য করার সৌভাগ্য হবে কেন?

প্লেটোর শেষ রচনা বিধিবিধানে (Laws) আশাভঙ্গ-জনিত যে রক্ষণ-শীলতা দেখা যায় তা তাঁর এ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিও হতে পারে।

তবুও মনে হয় তাঁর শেষ বয়স এক রকম সুখেই কেটেছিল। তাঁর শিষ্যরা ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে আর তাদের সাফল্য সর্বত্র তাঁকেও করে তুলেছিল সম্মানিত। তাঁর একাডেমিতে তিনি ছিলেন বেশ শান্তিতে—ছাত্রদের একদল থেকে অন্য দলে যাতায়াত করতেন। ওদের কাজ দিতেন, সমাধানের জন্য দিতেন সমস্যা। ঐ নিয়ে তারা গবেষণা করতো এবং তিনি ঘুরে এলে তাঁর কাছে দিতে হতো উত্তর—দিতে হতো নিজ নিজ কাজের বিবরণ। লা রসেফৌকল্ড্ (La Rochefouauld) বলেছেন: "খুব কম লোকই বুড়ো হতে জানে"। প্লেটো কিন্তু জানতেন: তিনি লিখতেন সলোনের (Solon) মতো আর শিক্ষা দিতেন সক্রেটিসের মতো, উৎসুক তরুণদের পরিচালিত করতেন আর সঙ্গী-সাথীদের মননশীল অনুরাগকে নিতেন খুঁজে। তিনি যেরকম তাঁর ছাত্রদের ভালোবাসতেন তারাও তাঁকে সে রকম ভালোবাসতো। তিনি ছিলেন তাদের একাধারে বন্ধু, দার্শনিক আর পথ-প্রদর্শক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বিয়ের ভোজে শরিক হওয়ার জন্য তাঁর এক ছাত্র তাঁকেও দাওয়াৎ করেছেন। তখন তিনি অশীতি বৎসরের পরিপূর্ণ মানুষ—তবুও সকলের সঙ্গে মিলে বেশ করে ফূর্তি করলেন। হাসি-উল্লাসের ভিতর দিয়ে অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর বৃদ্ধ দার্শনিক ঘরের এক নিভৃত কোণে আশ্রয় নিলেন একটু বিশ্রামের আশায়—একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য বসলেন একটি চেয়ারে। ভোজ শেষে ভোর বেলা ক্লান্ত ফূর্তি-বাজরা তাঁকে জাগাতে এসে দেখলেন রাত্রির নীরব শান্তিতে নিঃশব্দে তাঁর মুহূর্তের ঘুম অনন্ত ঘুমে হয়েছে পরিনত। সমস্ত এথেন্স্ কবর পর্য্যন্ত তাঁর শবানুগমন করেছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

এরিস্টোটল্ ও গ্রীক বিজ্ঞান

॥ ১ ॥

ঐতিহাসিক পটভূমি

এথেন্স্ থেকে প্রায় দু'শ মাইল উত্তরে, মেসেডোনিয়ার অন্তর্গত স্টেগিরা নগরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-তে এরিস্টোটলের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন আলেকজেণ্ডারের পিতামহ, মেসেডোনিয়ারাজ এরিমন্টাসের (Amyntas) বন্ধু আর চিকিৎসক। মনে হয় এরিস্টোটল নিজেও ছিলেন চিকিৎসক—ধন্বন্তরি মণ্ডলীর একজন। পরবর্তী যুগের অনেক দার্শনিক যেমন একটা 'পবিত্র' 'আবহাওয়ার মধ্যে হয়েছিলেন লালিত, তেমনি এরিস্টোটল হয়েছেন ঔষধগন্ধী আবহাওয়ায়। মনকে বিজ্ঞান-মুখী করে গড়ে তোলার সব রকম সুযোগ ও উৎসাহ তিনি পেয়েছেন। নিয়েছেন বিজ্ঞানের জনক হওয়ার সব রকম প্রস্তুতি।

তাঁর যৌবনকাল সম্বন্ধে নানা গল্পই প্রচলিত আছে। কেউ বলেছেন ফূর্তি করে তিনি পৈত্রিক-সম্পত্তি সবই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, নেহাৎ অভাবে পড়ে যোগ দিয়েছিলেন সৈন্য দলে, ফিরে এসে স্টেগিরায় শুরু করেন ডাক্তারী, আর ত্রিশ বৎসর বয়সে এথেন্সে গিয়ে প্লেটোর কাছে শুরু করেন দর্শন-অধ্যয়ন। আর এক কাহিনীতে বলা হয়েছে আঠারো বছর বয়সেই তিনি এথেন্স্ গিয়ে দর্শন-গুরুর অভিভাবকত্বে নিজেকে দিয়েছিলেন সোপর্দ করে। এ কাহিনীতেও তিনি যে কিছুটা অসংযত বেপরওয়া জীবনযাপন করতেন তার আভাস রয়েছে। শুচীবায়ুগ্রস্ত পাঠক উভয় গল্প থেকে এ সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দার্শনিক প্রবর একাডেমির শান্ত পরিবেশেই নোঙর ফেলেছিলেন নিজের জীবন-তরীর।

প্লেটোর কাছে কেউ বলেন তিনি আট বছর, কেউ বলেন কুড়ি বছর ধরে করেছেন অধ্যয়ন। এরিস্টোটলের অনুধ্যানে প্লেটো-চিন্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা দেখে প্লেটো-বিরোধীরাও অনুমান করেন তাঁর অধ্যয়নকাল আরো দীর্ঘতরই হবে। কল্পনার চোখে দেখলে মনে হয় এ বছরগুলি ছিল অত্যন্ত সুখের : গ্রীক প্রণয়ী-যুগলের মতো এক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র এক অদ্বিতীয় শিক্ষকের পরিচালনায় দর্শনের উদ্যানে পায়চারি করছেন! দু'জনই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু কু-খ্যাতি আছে যে, দুই প্রতিভার মিলন ডিনেমাইটের সঙ্গে আগুনের সংযোগের মতই। দু'জনের বয়সের মধ্যে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর ব্যবধান—কি করে বয়সের দূরত্ব দূর করে দুই বিরুদ্ধ আত্মায় সেতুবন্ধন সম্ভব হয়েছিল তা বুঝে ওঠা মুস্কিল। যে উত্তর দেশকে প্রায় বর্বর মনে করা হতো সেখান থেকে আগত এ অদ্ভুত ছাত্রটির শ্রেষ্ঠত্বকে প্লেটো স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। একবার নাকি বলেছিলেন এ ছাত্রটি হচ্ছে তাঁর একাডেমীর 'মনীষা' অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধার ব্যক্তি-মূর্তি।

বই সংগ্রহ ব্যাপারে—(সে অ-মুদ্রণ যুগে বই মানে পাণ্ডুলিপি) এরিস্টোটল প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। ইউরিপিডেসের (Euripides) পরে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি লাইব্রেরী বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর বহু অবদানের একটি হচ্ছে লাইব্রেরীতে শ্রেণী ভাগ করে বই সাজানোর নীতির প্রবর্তন। প্লেটো এ কারণেই বোধ করি এরিস্টোটলের বাড়ীকে বলতেন—'পাঠক-গৃহ'। এ হচ্ছে এরিস্টোটলের প্রতি সবচেয়ে আন্তরিক প্রশংসা। কিন্তু দুষ্টলোকেরা এমন কথাও প্রচার করেছেন যে, গুরু বেশ চালাকির সাথে শিষ্যের অতিমাত্রায় কেতাবিয়ানার প্রতি এভাবে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপই হেনেছেন। প্লেটোর শেষ জীবনে মনে হয় উভয়ের আরো কিছু বিশ্বাসযোগ্য ঝগড়ার উৎপত্তি হয়েছিল। দর্শনের অনুরাগ আর সুযোগ প্রত্যাশায় আমাদের উচ্চাভিলাসী তরুণটির মনে তাঁর 'আধ্যাত্মিক পিতার' বিরুদ্ধে এক রকম 'এডিপাস বিকৃতি'ই যেন গড়ে উঠেছিল—ফলে তিনি ইংগিৎ করতে লাগলেন প্লেটোর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও মৃত্যু ঘটবে না। আর এদিকে বৃদ্ধ গুরু শিষ্যকে তুলনা করতে লাগলেন অশ্ব শাবকের সঙ্গে যে অশ্বশাবক দুধ খেয়ে খেয়ে মাকে অস্থিসার করে দিয়ে শেষে লাথি ছুঁড়তে থাকে। সুপণ্ডিত জেল্লার (Zeller) যিনি তাঁর গ্রন্থে এরিস্টোটলকে শ্রদ্ধা আর সম্মানের প্রায় নির্বান-লোকেই তুলে ধরেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের এসব গল্পে কান না দিতে দিয়েছেন উপদেশ কিন্তু আমরা এটুকু অন্তত অনুমান করতে পারি যে যেখানে আজো ধূঁয়া দেখা যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই এককালে আগুন ছিল।

এ এথেনীয় যুগের অন্য কয়েকটি ঘটনা আরো সমস্যা-সংকুল। কয়েকজন জীবনীকার বলেছেন আইসোক্রেটেসের (Isocrates) সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতলবে এরিস্টোটল এক 'বাগমীতার স্কুল' ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর এ স্কুলে তিনি ধনী হারমিয়াসকেও পেয়েছিলেন ছাত্র হিসেবে। অল্পকালের মধ্যেই হারমিয়াস এক নায়ক হয়ে বসেন এটারনিয়াস নামক নগর-রাষ্ট্রের। এ সু-উচচ আসনে বসেই তিনি এরিস্টোটলকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানালেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৪-শে নিজের বোনকে (মতান্তরে ভাই-ঝি বা ভাগ্নি) বিয়ে দিয়ে পূর্ব অনুগ্রহের জন্য গুরুকে পুরস্কৃত করলেন। কেউ কেউ এটাকে একটা গ্রীক রেওয়াজ পালন বলেই সন্দেহ করতে পারেন কিন্তু ঐতিহাসিকরা আমাদের দ্রুত আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন যে, প্রতিভা সত্ত্বেও এরিস্টোটল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সুখে জীবন যাপন করেছেন এবং অত্যন্ত প্রীতি-সূচক ভাষায় স্ত্রীর উল্লেখ করেছেন তাঁর উইলে। এর ঠিক এক বছর পরেই মেসোডন—রাজ ফিলিপ (Philip) পেল্লায় (pella) তাঁর দরবারে এরিস্টোটলকে ডেকে পাঠালেন তাঁর পুত্র আলেকজেণ্ডারের শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য। বিশ্বের ভবিষ্যৎ অধিপতির শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য সে যুগের সর্বপ্রধান রাজা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সন্ধান করতে গিয়ে এরিস্টোটলকেই নির্বাচন করলেন—বলতেই হবে এটা আমাদের দার্শনিকের ক্রমবর্ধমান খ্যাতিরই স্বীকৃতি।

AMARBOI.COM

ছেলের জন্য ফিলিপের মনে অসীম পরিকল্পনা ছিল তাই তাঁর সংকল্প সুশিক্ষার সব সুযোগই তিনি ছেলেকে দেবেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫৬য় থ্রেস্ জয় করার ফলে তিনি ওখানকার সব সোনার খনির মালিক হলেন—লরিয়ামের (Laurium) ক্রমে ক্ষীয়মান রূপার খনি থেকে এথেন্স্ তখন যা পাচ্ছিল তিনি তার দশগুণ পেতে লাগলেন এ মূল্যবান খনিজ সম্পদ থেকে। তাঁর প্রজারা ছিল একই সঙ্গে সবল কৃষক ও দারুণ যোদ্ধা—এখনো তারা হয়নি নাগরিক পাপ আর বিলাসিতার শিকার। এখানেই যেন এক সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির উদ্ভব যা শত নগর-রাষ্ট্রকে বশী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূত করে গ্রীকের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করতে সক্ষম। সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য গ্রীসের মনীষা আর শিল্পকে লালিত করেছে তার প্রতি ফিলিপের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না—তাঁর ধারণা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মূলেও এ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বোধ। নগর-রাষ্ট্রের ছোট ছোট রাজধানীগুলিতে তিনি প্রেরণা দায়িনী সংস্কৃতি বা অনতিক্রম্য কোন শিল্প দেখতে পাননি—দেখেছেন শুধু বাণিজ্যিক দুর্নীতি আর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দেখেছেন অতৃপ্ত বণিক আর বেঙ্কারেরা কিভাবে জাতির মূল সম্বলকে আত্মসাত করছে, অযোগ্য রাজনীতিবিদ্ আর চতুরঙ্গ বক্তারা কিভাবে কর্ম-ব্যস্ত জনসাধারণকে বিপথে চালিয়ে নানা ষড়যন্ত্র আর যুদ্ধের পথে নিয়ে যাচ্ছে—বিরোধের ফলে শ্রেণী হচ্ছে খণ্ডিত আর পরিণত হচ্ছে অসাড় জড় সম্প্রদায়ে। ফিলিপ বল্লেন: এ তো জাতি নয়—দাস আর প্রতিভাবানের ব্যক্তিগত পঙ্ক-ডোবামাত্র, এ বিশৃঙ্খলার মাঝে তিনি শৃঙ্খলা আনবেন এবং সমগ্র গ্রীসকে তিনি বিশ্বের রাজনৈতিক ভিত্তি আর কেন্দ্র-বিন্দু হিসেবে শক্তিশালী আর ঐক্যবদ্ধ করে তুলবেন—এ তার সংকল্প। যৌবনকালে থিবিতে (Thebes) তিনি মহান ইপামিনন্ডাসের (Epaminondas) অধীনে সামরিক কৌশল আর বেসামরিক সংস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন—সে শিক্ষাকে তিনি এখন সাহস আর তাঁর অসীম উচ্চাশার সাহায্যে আরো বাড়িয়ে তুল্লেন। খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৩৮ শে কেরোনিয়ায় তিনি এথেনিয়দের হারিয়ে দিয়ে অবশেষে গ্রীসকে ঐক্যবদ্ধ করলেন কিন্তু শৃঙ্খলের সাহায্যে। এ বিজয় গৌরবের উপর দাঁড়িয়ে তিনি এবং তাঁর পুত্র কি করে পৃথিবীকে এক করে তার অধিপতি হবেন যখন সে পরিকল্পনায় রত তখন হঠাৎ এক আততায়ীর হাতে ঘটলো তাঁর মৃত্যু।

এরিস্টোটল যখন এলেন তখন আলেকজেণ্ডার তের বছরের এক বেপরওয়া তরুণ; আবেগপ্রবণ, রগ-চটা, পানাসক্ত। অবাধ্য ঘোড়াকে পোষ মানানোই ছিল তখন তার প্রধান সখ। এ স্ফুটোন্মুখ আগ্নেয়-গিরিকে শান্ত করার জন্য দার্শনিকের প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হলো না। আলেকজেণ্ডারকে নিয়ে এরিস্টোটলের সাফল্যের চেয়ে বুসেফেলাস (Bucephalus) নামক বিখ্যাত যুদ্ধাশ্বকে নিয়ে আলেকজেণ্ডারের সাফল্য ছিল অনেক বেশী। প্লুটারক্ (Plutarch) বলেছেন: "কিছুদিনের জন্য আলেকজেণ্ডার এরিস্টোটলকে প্রায় পিতার মতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করতেন আর ভালোও বাসতেন ঐরকম। বলতেন: একজন আমাকে দিয়েছেন জীবন আর অন্যজন শিখিয়েছেন বাঁচার শিল্প।" (একটি চমৎকার গ্রীক প্রবাদে আছে: "জীবন প্রকৃতির দান কিন্তু সুন্দরভাবে জীবন যাপন হচ্ছে জ্ঞানের উপহার")। এরিস্টোটলকে এক পত্রে আলেকজেণ্ডার লিখেছিলেন: "ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের চেয়ে বরং যা মঙ্গলকর তার জ্ঞান আহরণেই আমি কৃতিত্ব দেখাবো।" কিন্তু এ বোধ হয় রাজকীয় যৌবনেরই এক অভিব্যক্তি: আসলে দর্শনের উৎসাহী শিক্ষানবিশের অন্তরালে এক বর্বর-রাজকন্যা আর এক অসংযত রাজার অগ্নি-তেজ পুত্রই বিরাজ করতো। যুক্তির কোমল-মধুর বাধা পৈত্রিক রক্তের দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিকে রুখে রাখতে পারে না। দু'বছর পরে আলেকজেণ্ডার দর্শন ছেড়ে সিংহাসনারোহন করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে আরোহন করলেন বিশ্বজয়ের যজ্ঞাশ্বে। ইতিহাসের কোন বাধা নেই চিন্তা করতে (যদিও এ সব সুখকর চিন্তায় সন্দেহ করাই উচিত) যেহেতু চিন্তার ইতিহাসে তাঁর শিক্ষা-গুরু ছিলেন সবচেয়ে সমন্বয়ী ভাবুক। আলেকজেণ্ডার তাঁর ঐক্যসাধনের প্রেরণা ও শক্তি হয়ত তাঁর থেকেই আহরণ করেছিলেন। শিষ্যের পক্ষে রাজনীতি-ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা আর গুরুর পক্ষে-দর্শনের ক্ষেত্রে তা করা এক মহৎ ও মহাকাব্যিক কাজেরই দুই বিপরীত দিক। দুই বিশৃঙ্খল জগতকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নিলেন মেসেডোনিয়ার দুই মহান সন্তান।

এসিয়া বিজয়ে যখন আলেকজেণ্ডার বের হলেন তখন তিনি পেছনে রেখে গেলেন গ্রীক নগরগুলিতে তাঁর অনুকূল গভর্নমেন্ট কিন্তু তীব্র প্রতিকূল জনসমষ্টি। একজন বিশ্ববিজয়ী প্রতিভাদীপ্ত স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে হলেও যে এথেন্সের পেছনে স্বাধীনতা আর সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে তার পক্ষে অধীনতা অসহ্য। আর যে মেসেডোনীয় দলের হাতে নগরগুলোর শাসন-ভার রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আইন পরিষদে ডিমস্তেনিসের বাগ্মীতা সব সময় রেখে দিয়েছিল অনির্বাণ। আর এক দফা দেশ ভ্রমণের পর খ্রীস্ট পূর্ব ৩৩৪-এ তিনি যখন এথেন্সে ফিরে এলেন তখন তিনি স্বভাবতই মেসেডোনীয় দলের' সঙ্গেই যোগ দিলেন এবং আলেকজেণ্ডারের ঐক্যবদ্ধ শাসনের প্রতি তাঁর যে সমর্থন রয়েছে তা গোপন রাখার কোন চেষ্টাই করলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। জীবনের শেষ বারো বছর ধরে কল্পনা আর গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি একের পর এক যে ভাবে সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাঁর নিজস্ব চিন্তা-কেন্দ্র বা স্কুল গঠনে যে অসীম কর্ম-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন আর বিচিত্র জ্ঞান-সম্পদকে যে ভাবে সমন্বিত করেছেন ইতিপূর্বে একক মনের পক্ষে তা কোনদিন সম্ভব হয়নি—এ সব কথা মনে রেখেও একথা বলা যায় তিনি যে পথ গ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ দলীয় রাজনীতিতে যোগদান) তা শান্তি আর সত্যানুসন্ধানের সুনিশ্চিত পথ নয়, যে কোন মুহূর্তে রাজনৈতিক আকাশে পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং শান্তিময় দার্শনিক জীবনে নিয়ে আসতে পারে ঝড়ঝঞ্ঝা-তুফান। এ অবস্থা ও পটভূমি মনে রাখলে আমরা এরিস্টোটলের রাজনৈতিক দর্শন আর তাঁর বিয়োগান্ত পরিণতির কারণ বুঝতে পারবো।

॥ ২ ॥

এরিস্টোটল যা করেছেন

AMARBOI.COM

এথেন্সের মতো সমৃদ্ধ নগরেও রাজারও যিনি রাজা তাঁর মতো শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রপাওয়া তেমন কিছু কঠিন নয়। তিপ্পান্ন বছর বয়সে এরিস্টোটল যখন তাঁর স্কুল লাইসিয়াম (Lyceum) প্রতিষ্ঠা করেন তখন এত ছাত্র এসে জুটল যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাতে জটিল আইন কানুন রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ছাত্ররা নিজেরাই তৈয়রী করল নিয়মকানুন এবং প্রতি দশদিন অন্তর তারাই তাদের মধ্য থেকে এক জনকে নির্বাচিত করতো স্কুল তদারকের জন্য। কিন্তু স্কুলটা যে খুব একটা কঠোরতার ক্ষেত্র ছিল তা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং ইতিহাসের পাতা ডিঙিয়ে যে ছবিটা আমরা পেয়েছি তাতে দেখতে পাই গুরুর সঙ্গে বসে ছাত্ররাও খাচ্ছে একই সঙ্গে একই খাবার আর লাইসিয়াম (যার থেকে তাঁর স্কুলের নাম করণ) ক্রীড়া-ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে ওয়াক (Waik) নামক রাস্তায় পায়চারি করতে করতে ছাত্ররা নিচ্ছে গুরু থেকে পাঠ।

তাঁর স্কুল কিন্তু প্লেটোর স্কুলের অনুলিপি বা নকল ছিল না। প্লেটোর একাডেমিতে প্রধান্য ছিল অঙ্ক, কল্পনামূলক রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শনের আর লাইসিয়ামে প্রবণতা ছিল জীব বিদ্যা আর প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিকে। কথিত আছে আলেকজেণ্ডার নাকি তাঁর শিকারী, শিকার-রক্ষক, মালি আর জেলেদের বলে দিয়েছিলেন, জীববিদ্যা আর উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধীয় যা কিছু এরিস্টোটলের দরকার তা যেন তারা ওঁকে সরবরাহ করেন। প্রাচীন যুগের লেখকরা বলেছেন তাঁর অধীনে প্রায় হাজার লোক ছিল, যারা গ্রীস আর এসিয়ার সর্বত্র ঘুরে তাঁর সব দেশের জীব-জন্তু আর উদ্ভিজ্জের নমুনা সংগ্রহ করতো। এভাবে সংগৃহীত উপকরণ-সম্পদ দিয়ে তিনি এক অপূর্ব ও বিরাট জীব-উদ্যান গড়ে তুলেছিলেন। নিঃসন্দেহে এ সংগ্রহ তাঁর বিজ্ঞান আর দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল।

এ সবের খরচ নির্বাহের অর্থ এরিস্টোটল কোথায় পেলেন? এ সময় তাঁর নিজের আয়ও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল আর বিয়েও করে-ছিলেন গ্রীসের সে যুগের জন-জীবনে সব চেয়ে প্রতাপশালী ঘরে। এথেনিয়াস (Athenaeus) বলেছেন (হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জিত করেই) এরিস্টোটলকে জীব-বিদ্যার উপকরণ আর গবেষণার জন্য আলেকজেণ্ডার আটশ' টেলেন্ট (বর্তমানের হিসেবে প্রায় ৪০,০০,০০০ ডলার) দিয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন এরিস্টোটলের পরামর্শানু-সারেই নীল-নদীর উৎস আর তাতে যে মাঝে মাঝে প্লাবণ হয় তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আলেকজেণ্ডার এক ব্যয়-বহুল অভিযান পাঠিয়ে-ছিলেন। এরিস্টোটলের পক্ষে ১৫৮টা রাজনৈতিক সংস্কার সংহিতা রচনাই ত ইংগিৎ দেয় যে তাঁর অধীনে এক দল সম্পাদক ও সহকারী ছিলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসে সাধারণ অর্থ-ভাণ্ডার থেকে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য দরাজ সাহায্যের এ বোধ করি প্রথম দৃষ্টান্ত। এ অনুপাতে আধুনিক রাষ্ট্রগুলিও যদি দরাজভাবে গবেষণায় সাহায্য করতেন কত রকম জ্ঞানই না আমরা আয়ত্ত করতে সক্ষম হতাম! সুযোগ-সুবিধা অপরিমিত ছিল বটে কিন্তু সে সঙ্গে হাতিয়ার প্রকরণের মারত্মক অপ্রতু-লতার কথা স্মরণ না রাখলে এরিস্টোটলের প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি "ঘড়ি ছাড়া সময় নির্ধারণ করতে, থারমমিটার ছাড়া উত্তাপ মাপতে, দূরবীক্ষণ ছাড়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ আর বেরোমিটার ছাড়া আবহাওয়া পরীক্ষা করতে বাধ্য ছিলেন . . আজ আমাদের যত সব গাণিতিক, দৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আর ব্যবহারিক উপকরণ রয়েছে তার মধ্যে রেখা-

৬—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টানার রুল আর বৃত্ত-টানার কম্পাস ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না---ছিল হয়ত আরো কয়েকটা যন্ত্রের অপূর্ণাঙ্গ প্রতিভূ মাত্র। রাসায়ণিক বিশ্লেষণ, নির্ভুল মাপ ও ওজন আর পদার্থ বিজ্ঞানে গণিতের সার্বিক প্রয়োগ ইত্যাদি সবই ত অজানা ছিল সেদিন জড়ের আকর্ষণ শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ বিধি, বৈদ্যুতিক রহস্য বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণ অবস্থা, বায়ুর চাপ ও তার প্রতিক্রিয়া , আলো, উত্তাপ ও দহন-ক্রিয়ার স্বভাব ইত্যাদি, সংক্ষেপে যে সবের উপর আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মতামত প্রতিষ্ঠিত তার কিছুই ত তখন আবিষ্কৃত হয় নি।"[১]

আবিষ্কারই রচনা করে ইতিহাস: দৃষ্টান্ত—একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে এরিস্টোটলের জ্যোতিষ হয়ে পড়েছে ছেলে মানুষী কল্পনা-জাল, এক অনুবীক্ষণের অভাবে তাঁর জীব-বিদ্যা হয়ে পড়েছে লক্ষ্যহীন আর বিপথগামী। অন্যদিকে অতুলনীয় সাফল্য সত্ত্বেও গ্রীস সত্য সত্যই অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে শুধু শিল্প ও কারিগরী আবিষ্কারের ব্যাপারে। শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি গ্রীক বিতৃষ্ণা এক মাত্র নিস্পৃহ দাসদের ছাড়া আর সবাইকে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটতে দেয়নি—যন্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ শুধু যে কর্ম-প্রেরণা জোগায় তা না, ওর ফলে যন্ত্রের ত্রুটী-বিচ্যুতিও জানা যায়, জানা যায় তার সম্ভাব্যতা। কারিগরি আবিষ্কার যাদের দ্বারা সম্ভব ছিল, তাদের কোন স্বার্থ ওতে ছিল না—হতো-ধনা ওদের কিছুমাত্র পার্থিব লাভ। হয়ত দাম সস্তা ও সহজলভ্য ছিল বলেই আবিষ্কার রয়ে গেছে পেছনে পড়ে—যন্ত্রের চেয়ে পেশী ছিল তখনও সস্তা। যখন গ্রীক বাণিজ্য ভূমধ্য সাগর দখল করেছে আর গ্রীক দর্শন করেছে ভূমধ্য-সাগরীয় মন, তখনও গ্রীক বিজ্ঞান ইতস্তত-মনা আর গ্রীক শিল্পের অবস্থা ছিল হাজার বছর আগে ক্নোসাস, টিরিন্‌স্ আর মাইসিনে গ্রীক আক্রমনের সময় এজিয়েন (Afgean) শিল্পের যে অবস্থা ছিল অবিকল তাই। বোধ করি এ কারণেই এরিস্টোটল কদাচিৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলেছেন—কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতিই ত তখন আবিষ্কৃত হয়নি। তিনি বড় জোর অবিরাম ও সার্বিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাই শুধু করতে পারতেন। তবুও তিনি এবং তাঁর সহকারিরা যে বিপুল তথ্যরাজি

১. Zeller.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রহ করেছেন তা দিয়েই হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ভিৎ-রচনা এবং দু'হাজার বছর ধরে জ্ঞানের পাঠ্য হিসেবে তাই হয়েছে ব্যবহৃত। মানুষের কর্ম-শক্তির এ এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। এরিস্টোটল লিখেছেন শত শত রচনা। প্রাচীন গ্রন্থকারদের কেউ কেউ বলেছেন তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চার শ', আবার কেউ কেউ বলেছেন হাজার। তাঁর রচনার একটা অংশই মাত্র রক্ষিত হয়েছে তবুও তা-ই একটা লাইব্রেরীর সমতুল্য। সবটার পরিধি আর বিরাটত্ব ভাবতেই ত অবাক লাগে। প্রথমে লজিক বা যুক্তি-বিদ্যা সম্বন্ধীয় রচনাগুলো রয়েছে, যেমন, "শ্রেণী বিভাগ', 'বিষয়-বস্তু', 'পূর্বতন ধারণা', 'পরবর্তী বিশ্লেষণ', 'প্রস্তাবনা' এবং 'বুদ্ধিবাদী খণ্ডন' এ সব রচনা পরে সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়েছে, এরিস্টোটলের অর্গানন (Organon)-এ সাধারণ শিরোনামায়—অর্থাৎ নির্ভুল চিন্তার অঙ্গ বা উপায় এনামে। দ্বিতীয়তঃ রয়েছে তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনা, যেমন, 'পদার্থ বিদ্যা', 'আকাশমার্গে', 'বিকাশ ও অবক্ষয়', 'আবহাওয়া বিজ্ঞান', 'প্রাকৃতিক ইতিহাস', 'আত্মা সম্বন্ধে', 'জীব-জন্তুর অঙ্গ', 'জীব-জন্তুর গতিবিধি' এবং 'জীব-প্রজনন'। তৃতীয়ত আছে —সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে রচনা, যেমন, 'অলঙ্কার' আর 'কাব্যশাস্ত্র'। চতুর্থতঃ আছে পুরোপুরি দার্শনিক রচনাবলী যেমন, 'নীতি-বিদ্যা', 'রাজনীতি' আর 'পরাবিদ্যা'।

এ যেন গ্রীসের এন্‌সাইকলোপিডিয়া বৃটেনিকা অর্থাৎ বিশ্বকোষ। পৃথিবীতে হেন বস্তু নেই যা এখানে স্থান পায়নি। এ কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে অন্যান্য দার্শনিকদের তুলনায় তাঁর রচনায় অনেক বেশী ভুল ও অসম্ভব কথা স্থান পেয়েছে। তবুও তাঁর রচনায় জ্ঞান ও মতের যে সমন্বয় ঘটেছে স্পেনসারের যুগ পর্য্যন্ত তার দ্বিতীয় নজির নেই—শেষোক্ত যুগে যা হয়েছে তাতে এরিস্টোটলের রচনার অর্ধেক ঐশ্বর্য্যেরও পরিচয় নেই। এরিস্টোটলের বিশ্ববিজয় আলেকজেণ্ডারের উগ্র ও নির্মম বিজয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। যদি দর্শনের উদ্দেশ্য হয় সমন্বয় সন্ধান তা হলে বিংশ শতাব্দী তাঁকে যে 'দার্শনিকটি' (The Philosopher) বলে অভিহিত করেছেন তা যথার্থই হয়েছে। একমাত্র তিনিই এ নামের সম্পূর্ণ যোগ্য।

এরকম বিজ্ঞানমুখী মনে কবিত্বের কিছুটা অভাব ঘটা খুবই স্বাভাবিক। নাট্যকার দার্শনিক প্লেটোর রচনায় যে সাহিত্যিক দীপ্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যায় এরিস্টোটলের কাছে তা আশা করা সঙ্গত নয়। দর্শনকে কল্পনা আর উপকথায় মিশিয়ে অস্পষ্ট ও ঝাঁপসা করে একটা বড় রকমের সাহিত্য তিনি আমাদের দেননি সত্য কিন্তু তিনি আমাদের দিয়েছেন সন্নিবিষ্ট, বিমূর্ত আর পারিভাষিক বিজ্ঞান। আমাদের জন্য তাঁর কাছে যাওয়ার কোন মানে হয় না। প্লেটোর মতো সাহিত্যের সংজ্ঞা না দিয়ে তিনি দর্শন আর বিজ্ঞানের পরিভাষা গড়ে তুলেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত পরিভাষা ছাড়া আজো আমরা প্রায় কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধেই আলোচনা করতে পারি না, আমাদের কথার প্রতি স্তরে তারা যেন কঠিন হয়ে বিরাজ করছে: বৃত্তি, মধ্যমান, সূত্র (এরিস্টোটল—পরিভাষায় যার অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান যুক্তি), শ্রেণী-ভাগ, শক্তি, ঘটিত কর্ম, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, নীতি, রূপ (Form)—এ সব যা দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তা সবই তাঁরই মনের টাকশালে হয়েছে নির্মিত। মনে হয় সুখপাঠ্য 'কথোপকথন' থেকে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ-রচনা দর্শনের অগ্রগতির পথে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। যে বিজ্ঞান দর্শনের ভিৎ আর মেরুদণ্ড—একটা কঠোর আর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আর প্রকাশ-মাধ্যম ছাড়া তার উন্নতি সম্ভব নয়। প্লেটোর মতো এরিস্টোটলও সাহিত্যিক 'কথোপকথন' লিখেছেন—তাও নাকি অনুরূপ প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু প্লেটোর বৈজ্ঞানিক রচনার মতো এরিস্টোটলের সাহিত্যিক রচনাগুলোও হারিয়ে গেছে। তাঁদের যা শ্রেষ্ঠ কাল হয়ত তাই রেখেছেন বাঁচিয়ে।

হয়তো এমনও হতে পারে এরিস্টোটলের রচনা নামে যা পরিচিত তা তাঁর রচনা নয়—নিরলঙ্কার ভাষায় সংক্ষেপে তিনি যে সব কথা বলেছেন বা নোট দিয়েছেন তাঁর ছাত্র আর অনুবর্তীরা সে সবকেই—অন্তত তার বেশীর ভাগকে ভাষায় সজ্জিত ও ভূষিত করেছেন। মনে হয় এরিস্টোটল তাঁর জীবদ্দশায় কেবলমাত্র যুক্তি-বিদ্যা আর অলঙ্কার সম্বন্ধীয় রচনা ছাড়া অন্য কোন পারিভাষিক রচনা প্রকাশ করেননি। বর্তমানে তাঁর 'যুক্তি-বিদ্যাকে' যেভাবে পাওয়া যায় তা পরবর্তী সম্পাদনা, কিন্তু, 'পরাবিজ্ঞান' আর 'রাজনীতি' সম্বন্ধে তিনি নিজে যে নোট রেখে গেছেন মনে হয় তা সেভাবেই সংকলিত হয়েছে, তাতে কোন রকম রদবদল বা সংযোজন করা হয়নি। এরিস্টোটলের লেখায় স্টাইল বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনা-শৈলীর যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়—তার জোরে যারা তাঁকে সব রচনার সাক্ষাৎ প্রণেতা বলে দাবী করেন, তাও মনে হয় তাঁর শিষ্যদের সম্মিলিত সম্পাদনারই ফল। এ ব্যাপারে যে প্রচণ্ড, প্রায় মহাকাব্যিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে ব্যস্ত পাঠকের সে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই—সাধারণ পাঠক ওর উত্তর সন্ধানেও নয় উৎসুক। আমরা অন্তত এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে এরিস্টোটলের নামে যে সব বই চলছে সে সবের তিনি 'আধ্যাত্মিক প্রণেতা'—কোন কোন ক্ষেত্রে হাতটা অন্যের হাত হতে পারে কিন্তু হৃদয় আর মস্তিষ্ক যে তাঁরই তাতে সন্দেহ নেই।

॥ ৩ ॥

লজিক বা যুক্তিবিদ্যার বুনিয়াদ

এরিস্টোটলের প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে পূর্বসূরী ছাড়াই নিজের কঠোর ও একক চিন্তার দ্বারা তিনি লজিক নামক এক নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছেন। রেনান (Renan) বলেছেন: "পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যেমন গ্রীক শৃঙ্খলার শাসনাধীনে আসেনি তার শিক্ষাই বিকৃত" কিন্তু এ কথা সত্য যে এরিস্টোটল চিন্তার শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা করে দেখার কঠোর পদ্ধতি সরবরাহ করার আগ্ পর্যন্ত গ্রীক-চিন্তা নিজেই ছিল বিশৃঙ্খল ও অসংযত। এমনকি প্লেটোও ছিলেন অসংযত ও বিশৃঙ্খল—তাঁর মন প্রায় উপকথার মেঘে পড়তো ঢাকা আর অতিমাত্রায় সৌন্দর্যের অবগুন্ঠনে তিনি সত্যের মুখ রাখতেন ঢেকে। আমরা দেখতে পাবো এরিস্টোটল নিজেও নিজের নীতি বহুবার করেছেন ভঙ্গ —তবে তখন ছিলেন তিনি তাঁর অতীতের সৃষ্টি—তাঁর নিজের চিন্তা যে ভবিষ্যত গড়ে তুলবে তার নয়। এরিস্টোটলের পরে গ্রীসের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে হেলেনীয় মন ও চরিত্র খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল কিন্তু প্রায় হাজার বছর ধরে বর্বরতার অন্ধকারে থাকার পর যখন নতুন প্রজনন, চিন্তা আর কল্পনার অবসর ও শক্তি খুঁজে পেল তখন বোয়েথিয়াস্ (Boethus 470—525 A,C.) অনুদিত এরিস্টোটলের যুক্তি-বিদ্যার 'অর্গাননই (Organon)' মধ্যযুগীয় চিন্তাকে দিয়েছিল রূপ—যদিও নানা বাঁধা-ধরা বিশ্বাসে কিছুটা বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল তবুও পণ্ডিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শনের এ কঠোর জননীই কিশোর য়ূরোপের মনমানসকে যুক্তি ও সূক্ষ্মতায় দিয়েছিল দীক্ষা, গড়ে তুলেছিল আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষা এবং মনের সেই প্রবীণতার করেছিল ভিৎ রচনা যা তার জন্ম-মুহূর্তের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে হয়েছিল উর্ধ্বগামী।

লজিক বা যুক্তি-বিদ্যা হচ্ছে বিশুদ্ধ চিন্তার পদ্ধতি আর কলা-কৌশল। প্রত্যেক বিজ্ঞান প্রত্যেক শৃঙ্খলা আর শিল্পের এ হচ্ছে পদ্ধতি এমন কি সংগীতের বেলায়ও। লজিক বা যুক্তিবিদ্যাকে এ কারণে বিজ্ঞান বলা যায় যে, এর অনেকখানিকে পদার্থবিদ্যা আর জ্যামিতির মতো নিয়ম-কানুনের শৃঙ্খলে বাঁধা যায় আর যে কোন স্বাভাবিক মানুষকে যায় শেখানো। আবার এটা শিল্প এ কারণে যে অভ্যাসের ফলে লজিক চিন্তায় নিয়ে আসে অচেতন ও ত্বড়িত নির্ভুলতা যেমন দীর্ঘ-অভ্যস্ত পিয়ানো বাদকের পক্ষে সংগতি খুঁজে পেতে দরকারই হয় না কোন রকম সচেতন প্রচেষ্টার। লজিক নীরস বটে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংজ্ঞার জন্য সক্রেটিসের উন্মত্ত তাগাদায় এ নতুন বিজ্ঞানের কিছুটা ইসারা পাওয়া যায় আর প্লেটো যে সব ধারণাকে মার্জিত করতে চাইতেন তাতেও নির্দেশ করে এ ইংগিৎ। পূর্বসূরীদের এ সব উৎস থেকেই যে তাঁর লজিক রসদ সংগ্রহ করেছে তাঁর ক্ষুদ্র নিবন্ধ 'সংজ্ঞাসমূহে' তার যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। ভল্টেয়ার বলেছেন: "আমার সঙ্গে যদি আলাপ-আলোচনা করতে-চাও আগে তোমার শর্তাবলী বলো।" বিরুদ্ধবাদীরা যদি নিজ নিজ শর্ত বা উদ্দেশ্য আগে বলতো কত তর্ক-বিতর্কই না একটা অনুচ্ছেদে সংক্ষেপিত হয়ে যেতো! সব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সব দরকারী শর্ত বা উদ্দেশ্যকে কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর বিচার করে দেখা লজিকের প্রথম ও শেষ কথা এবং ঐ হচ্ছে লজিকের হৃদয় ও আত্মা। এ অবশ্য কঠিন কাজ আর মনেরও হয় কঠোর পরীক্ষা। তবে একবার যদি এ আয়ত্ত করা যায়—তবে অর্ধেক কাজ ফতে।

কোন উদ্দেশ্য বা শর্তের কিভাবে দেওয়া হবে সংজ্ঞা? এরিস্টোটলের মতে প্রত্যেক সু-সংজ্ঞারই দু'টি অংশ আছে আর তা আছে দুই শক্ত পায়ের উপর দাঁড়িয়ে। প্রথমে আলোচ্য বস্তুটাকে এমন একটা শ্রেণী বা গোষ্ঠিতে ফেলতে হবে যার সাধারণ লক্ষণ ওর মধ্যেও বিদ্যমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন মানুষ—মানুষ সর্বাগ্রে একটা জন্তু বই তো নয়। দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে তার শ্রেণীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়। তাই এরিস্টোটলীর নিয়ম বা পদ্ধতিতে মানুষ হচ্ছে যুক্তিবাদী জন্তু। এ হচ্ছে তার "সুনির্দিষ্ট পার্থক্য"—এ কারণেই অন্যান্য জীব-জন্তুর তুলনায় মানুষ যুক্তিবাদী (এ থেকেই এক চমৎকার উপকথার উৎপত্তি)। এরিস্টোটল কোন বস্তুবিশেষকে তার শ্রেণী-সমুদ্রে নিক্ষেপ করে যখন ওটাকে আবার তুলে নেন তখন ওর গা থেকে ওর শ্রেণীর সব সাধারণ লক্ষণ ও পরিচয় খসে পড়ে। কিন্তু আরো সব সদৃশ অথচ পৃথক বস্তুর সঙ্গে নৈকট্যের ফলে তার ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টতা পায় আরো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রূপ।

এ তো গেলো যুক্তি-বিদ্যার পেছনের সারির কথা কিন্তু যে ভয়ানক প্রশ্ন নিয়ে এরিস্টোটল প্লেটোর সঙ্গে মহা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন তা হচ্ছে 'সার্বজনীনতা' (Universal)। যে যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি এবং যা সমগ্র মধ্যযুগীয় য়ূরোপকে 'বাস্তববাদী' আর 'নামবাদী' এই দুই দলে সংগ্রাম-মুখর করে তুলেছিল সে সংগ্রামের সূচনাও এ নিয়েই এরিস্টোটলের মতে যে কোন সাধারণ নাম যা শ্রেণীর সবার উপর প্রযোজ্যতাই সার্বজনীন: যেমন, জীব-জন্তু, মানুষ, বই-পুস্তক, গাছ-গাছড়া সবই সার্বজনীন নাম। কিন্তু এসব সার্বজনীন হলো মন্ময় (Subjective) ধারণা; স্পর্শনীয় তন্ময় (Objective) বাস্তবতা নয়। তারা শুধু নাম, বস্তু নয়। যা কিছুর অস্তিত্ব আমাদের বাইরে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও বিশিষ্ট জগতের বস্তু, তা সাধারণও নয়, নয় সার্বজনীনও। মানুষ, গাছ-গাছড়া বা জীব-জন্তুর অস্তিত্ব আছে কিন্তু কল্পনায় ছাড়া সাধারণ কি সার্বজনীন মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই। ঐ হচ্ছে এক মানসিক বিমূর্ত রূপ, বহির্জগতে তার কোন বাস্তব উপস্থিতিই অনুপস্থিত এরিস্টোটল মনে করতেন প্লেটো 'সার্বজনীনতার' তন্ময় অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্লেটো সত্য সত্যই বলেছিলেনও ব্যক্তির চেয়ে, 'সার্বজনীন'ই অধিকতর মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ ও অতুলনীয়ভাবে দীর্ঘস্থায়ী। অবিরাম তরঙ্গ লহরীর মধ্যে ব্যক্তি ত ক্ষুদ্র এক ঢেউ মাত্র: ব্যক্তি আসে আর যায় কিন্তু মানুষ (অর্থাৎ সার্বজনীন মানুষ) চির. বিদ্যমান। এরিস্টোটলের মন ছিল কঠোর বাস্তববাদী—উইলিয়াম জেমসের ভাষায় কোমলতা বর্জিত শক্ত মন। প্লেটোর 'বাস্তববাদে' তিনি পণ্ডিতি আহম্মকি আর অশেষ এক মরমী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদের মূল দেখতে পেয়েছিলেন আর আদি তার্কিকের সব শক্তি আর উত্তেজনার সাথেই সে সবকে তিনি আক্রমণ করেছিলেন। ব্রুটাস যেমন সীজারকে কম ভালোবাসতো না কিন্তু অধিক ভালোবাসতো রোমকে, তেমনি এরিস্টোটলও বলতো : "প্লেটো প্রিয় কিন্তু সত্য প্রিয়তর।"

(নীট্সের মতো) কোন বিরুদ্ধ সমালোচক হয়ত বলতে পারেন এরিস্টোটল নিজে প্লেটোর কাছে খুব যে ঋণী সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই ওর সমালোচনায় তিনি অত কঠোর ছিলেন : কেউই খাতকের কাছে কৃতী পুরুষ বলে স্বীকৃতি পায় না! তবুও বলতে হবে এরিস্টোটলের দৃষ্টিভংগী ছিল সুস্থ, আজকের দিনে বাস্তববাদী বল্লে আমরা যা বুঝি তিনি প্রায় তাই ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল তন্ময় (Objective) বর্তমান নিয়ে আর প্লেটোর ছিল মন্ময় (Subjective) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। সক্রেটিস-প্লেটো সংজ্ঞা দাবীতে বস্তু আর ঘটনা ছাড়িয়ে শুধু ভাব আর মতামতেরই প্রাধান্য ছিল—ফলে বিশিষ্ট থেকে সাধারণী করণের দিকে আর বিজ্ঞান থেকে পণ্ডিতির দিকেই প্রবণতা বড় হয়ে উঠেছিল। শেষে প্লেটো সাধারণীকরণে এত বেশী মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে ঐ পদ্ধতি তিনি তাঁর 'বিশিষ্ট'-কে নির্ধারণ করতেও শুরু করে দিলেন এবং ভাবের প্রতি এত বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে ভাব বা আইডিয়ার সাহায্যে তিনি ঘটনার ও নির্বাচন আর সংজ্ঞা দিতে লাগলেন। এরিস্টোটল প্রচারণা শুরু করলেন বস্তুতে ফিরে যাওয়ার জন্য, "প্রকৃতির অম্লান মুখ" ও বাস্তবের দিকে—শক্ত জমাট 'বিশেষ' আর রক্ত মাংসের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর ছিল এক প্রবল আকর্ষণ। কিন্তু প্লেটো সাধারণ আর সার্বজনীনকে এত বেশী ভালোবাসতেন যে তাঁর রিপাব্লিকে (Republic) পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের বেদিমূলে ব্যক্তিকে করেছেন উৎসর্গ।

ইতিহাসের সনাতন রহস্যের মতোই আমাদের তরুণ যোদ্ধা ও গুরুর অনেকগুণ আয়ত্ত করে তা দিয়েই গুরুকে করেছেন ঘায়েল। যা কিছুকে আমরা নিন্দা করি তার অনেক কিছু আমাদের নিজেদের ভাণ্ডারেও মওজুদ থাকে। যেমন শুধু সমকক্ষদের মধ্যেই লাভজনক প্রতিযোগিতা চলে তেমনি বিবাদও চলে সমানে সমানে। বহু তীব্রতম সংঘর্ষের মূলে দেখা গেছে মত-বিশ্বাস আর উদ্দেশ্যে সামান্য তারতম্য। ক্রুসেডের বীর যোদ্ধারা সালাহুদ্দীনের মধ্যে এমন এক ভদ্রজনকে পেয়ে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন যার সঙ্গে আপোষে ঝগড়া করা যায় কিন্তু খ্রীস্টিয় য়ূরোপ যখন বিভিন্ন কলহ-রত শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়লো তখন শিষ্টতম শত্রুরও তাতে রইল না স্থান। প্লেটোর অনেক কিছুই তাঁর মধ্যে ছিল বলেই এরিস্টোটল প্লেটোর প্রতি অত বেশী নির্মম ছিলেন। আপাত সুন্দর কোন মতবাদের জন্য সাধারণ সব ঘটনাকে উপেক্ষা করে তিনিও বিমূর্ততা ও সাধারণী করণের ভক্ত হয়ে পড়তেন—দিব্য ভাবের সন্ধানের জন্য তাঁর দার্শনিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তাঁকে অবিরাম চালাতে হয়েছে সংগ্রাম। এর প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় দর্শনের ক্ষেত্রে এরিস্টোটলের সব চেয়ে বিশিষ্ট ও মৌলিক অবদান—সাইলোগিজম মতবাদ (Syllogion—ন্যায়, অনুমান বাক্য)। সাইলোগিজম হচ্ছে—তিন প্রতিজ্ঞার তৃতীয়টি (সিদ্ধান্ত) অন্য দুই মেনে নেওয়া সত্যের ('প্রধান ও 'অপ্রধান' প্রতিজ্ঞা) অনুগামী হওয়া। উদাহরণতঃ মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী: সক্রেটিস একজন মানুষ, অতএব সক্রেটিস যুক্তিবাদী প্রাণী। গণিতজ্ঞরা মুহূর্তে দেখতে পাবেন দুই সমকক্ষ বস্তু একে অন্যের সমান ও প্রতিজ্ঞার সঙ্গে উক্ত সাইলোগিজম বা অনুমান বাক্যের সাদৃশ্য রয়েছে। যদি ক, খ হয় আর গ যদি ক হয় তা হলে গ ও খ এক। গণিতের দৃষ্টান্তের বেলায় যেমন সিদ্ধান্তে পেঁাচানো গেছে সাধারণ বর্ণ ক কে উভয় প্রতিজ্ঞা থেকে বাতিল করে দিয়ে তেমনি আমাদের অনুমান বাক্যের বেলায় ও দুই প্রতিজ্ঞা থেকে সাধারণ শব্দ 'মানুষ'কে বাতিল করে দিয়ে যা বাকি থাকে তাদের সংযুক্ত করে নেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। পিরহোর (Pyrrho) যুগ থেক স্টুয়ার্ট মিল (Stuart Mill) পর্য্যন্ত যুক্তিবাদীরা যে ত্রুটির উল্লেখ করছেন তা হচ্ছে এ যে অনুমান বাক্যের যা প্রধান প্রতিজ্ঞা—যা প্রমাণ-সাপেক্ষ তাকেই স্বতসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। কারণ যদি সক্রেটিস যুক্তিবাদী না হন (তিনি যে মানুষ সে বিষয়ে ত কারো প্রশ্নই নেই) তা হলে মানুষ যে যুক্তিবাদী জীব তা সার্বজনীন সত্য নয়। এরিস্টোটল হয়ত এভাবেই উত্তর দেন, যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে তার শ্রেণীর ("সক্রেটিস একজন মানুষ") অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ দেখতে পাওয়া যায়, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে তার শ্রেণীর ("যুক্তি বাদিতা") অন্যতর বৈশিষ্ট্যজনক গুণগুলোও যে রয়েছে তা ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু চিন্তা আর ব্যাখ্যার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইলোগিজম বা অনুমান-বাক্যকে সত্য-আবিষ্কারের যথাযথ যন্ত্র বলে মনে হয় না।

অর্গাননের (Organon) অন্যান্য বিষয়ের মতো এ সবেরও মূল্য আছে বই কি: "চিন্তাগত নিষ্ঠা ও সমতা রক্ষার সব নিয়ম-কানুনই এরিস্টোটল আবিষ্কার করেছেন। করেছেন প্রণয়ন আর রচনা করেছেন তর্ক-শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের সব রকম কৌশল—এ জন্য যে কঠোর পরিশ্রম তিনি করেছেন তা সব প্রশংসার অতীত। পরবর্তী যুগের মননশীলতাকে উদ্দীপিত করে তুলতে তাঁর এ পরিশ্রম যতখানি সহায়তা করেছে এতখানি পরিশ্রম একক অন্য কোন লেখকই করেন নি" (বেন—Benn)। কিন্তু লজিক বা যুক্তিশাস্ত্রকে কেউই খুব উচচস্বরে তুলতে পারেননি' নির্ভুল যুক্তির পথপ্রদর্শক আদব-কায়দা শিক্ষার পুস্তিকার মতই উৎসাহ-উদ্রেক মাত্র, প্রয়োজনের সময় ওটাকে ব্যবহার করা যায় বটে কিন্তু ওটা আমাদের দেয় না কোন মহত্ত্বের প্রেরণা। মনে হয় না খুব দুঃসাহসী দার্শনিক ও কুঞ্জবনে বসে কখনো লজিক-সংগীত গেয়ে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠবেন। বর্ণ-হীন নিরপেক্ষতার জন্য যারা দণ্ডিত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে ভার্জিল যেমন দান্তেকে বলেছিলেন: "এদের সম্বন্ধে আমাদের আর ভাববার দরকার নেই, এক নজর দেখে নিয়ে এগিয়ে যাও"—লজিকের প্রতিও মানুষের এ মনোভাব।

॥ ৪ ॥

বিজ্ঞান সংখ্যা

ক: এরিস্টোটল পূর্ববর্তী গ্রীক বিজ্ঞান

রেনান (Renam) বলেছেন: "মানব জাতিকে সক্রেটিস দিয়েছেন দর্শন আর এরিষ্টোটল দিয়েছেন বিজ্ঞান। তাঁদের আগেও দর্শন এবং বিজ্ঞান দুই-ই ছিল কিন্তু সক্রেটিস আর এরিস্টোটল থেকেই শুরু হয়েছে দর্শন আর বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি। আর সব কিছু গড়ে উঠেছে তাঁদের রচিত বুনিয়াদের উপর।" এরিস্টোটলের আগে বিজ্ঞান ছিল ভ্রূণাবস্থায়: তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছে তার জন্ম।

গ্রীক সভ্যতার আগেও বিজ্ঞান-প্রচেষ্টা যে হয়নি তা নয় কিন্তু সে সবের কিলাকার চিত্র-ধর্মী বর্ণের দুর্বোধ্যতা ভেদ করে তাদের চিন্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতটুকু নাগাল আমরা পাই তাতে বুঝতে পারি তাদের বিজ্ঞান আর ধর্মে কোন বেশকম ছিল না। অর্থাৎ পূর্ব-হেলেনীয় যুগের লোকেরা প্রকৃতির সব রহস্যকেই কোন এক অলৌকিক হাতের কারসাজি বলেই ব্যাখ্যা করতো: সর্বত্রই যেন বিরাজ করতো দেব-দেবী। বস্তুত আয়োনীয় (jonian) গ্রীকরাই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক, জটিলতা ও রহস্যময় ঘটনার একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিতে সাহস করে: তারা পদার্থ বিজ্ঞানেই খুঁজেছে ঘটনাবিশেষের প্রাকৃতিক কারণ আর দর্শনে খুঁজেছে সমগ্রের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব। "দর্শনের জনক" থেইল্‌স্ (Thales—640—550B.C.) প্রধানতঃ জ্যোতিষী ছিলেন, তিনি সূর্য্য আর নক্ষত্র-মণ্ডলীকে (যে সবকে লোকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতো) নিছক অগ্নি-গোলক বলে অভিহিত করে মাইলেটাসবাসীকে (Miletus) অবাক করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্র এনেক্সিমেন্ডার (Anaximander—610—540B.C.) যিনি ভূগোল আর জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় চার্ট নির্মাণে ছিলেন প্রথম গ্রীক—বিশ্বাস করতেন অবিভক্ত বস্তুপুঞ্জ থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি আর সব কিছুই গড়ে উঠেছে বিপরীত বস্তুর পৃথকীকরণের ফলে। আর অসংখ্যাতীত বিশ্বের লয় আর বিবর্তনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঘটে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি—ভিতরের তাড়নার ভার-সাম্যের ফলেই পৃথিবী স্থির হয়ে আছে শূন্যে। আমাদের সব গ্রহ-ই একদা তরল ছিল, সূর্যোত্তাপেই শুকিয়ে গেছে, জীবনের প্রথম আবির্ভাব সমুদ্রে, জল তলায় পৌঁছার ফলেই তারা তাড়িত হয়েছে ডাঙ্গার দিকে। এসব পরিত্যক্ত ঝাঁক-ছাড়া প্রাণীদের কেউ কেউ অভ্যস্ত হয়েছে বাতাসে নিশ্বাস নিতে—এভাবে এরাই হয়েছে পরবর্তী স্থল-প্রাণীদের পূর্ব-পুরুষ। মানুষ এখন যা হয়েছে গোড়া থেকে সেরকম থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, এখনকার মতো প্রথম আবির্ভাবের সময়ও যদি নব-জাত মানব-শিশু এমন অসহায় থাকতো, আর এত দীর্ঘ শৈশব কৈশোরের যদি প্রয়োজন হতো তা হলে তার বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এনেক্সিমেনিস্ (Anaximenes) নামে আর একজন মাইলেটাসবাসী বলেছেন আদিম অবস্থায় সব জিনিষই তরল অবস্থায় ছিল, ক্রমশঃ ঘন হতে হতে বাতাস, মেঘ, জল, মাটি, পাথর হয়েছে। বাষ্প, তরল আর জমাট—বস্তুর এ তিন রূপ ঘনীভূত হওয়ারই ক্রমিক স্তর। উত্তাপ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈত্য—তরল আর জমাট অবস্থারই নাম মাত্র। মূলে যে পৃথিবী তরল ছিল তা ঘনীভূত হওয়ার ফলেই ঘটে ভূমিকম্প। প্রাণ আর আত্মা একই—এ জীবনদায়িনী সম্প্রসারণশীল শক্তি সর্বত্র সব জিনিষেই বিদ্যমান। পেরিক্লিস-গুরু এনাক্সাগোরাস (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০—৪২৮) মনে হয় সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যাই দিয়েছেন—উদ্ভিদ আর মৎস্যের শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সামনের দুই অঙ্গ (অর্থাৎ হাত) যখন বিচরণশীল কর্তব্য (অর্থাৎ হাঁটা-চলা) থেকে অব্যাহতি পেলো তখন তার ব্যবহার—কৌশলের শক্তি দিয়েই তিনি মানুষের বুদ্ধির ব্যাখ্যা করেছেন। ধীরে ধীরে এ মানুষের মধ্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞান রূপ নিয়েছে।

হেরাক্লিটাস (Heraclitus—530—479 B.C.) যিনি তাঁর ধন-সম্পদ আর তার দুশ্চিন্তা পেছনে ফেলে দারিদ্র্য আর অধ্যয়ন জীবন যাপনের জন্য এফিসাসের (Ephesus) এক মন্দির বারান্দার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন—তিনি বিজ্ঞানকে জ্যোতিষ থেকে নিয়ে আসেন পার্থিবের এলেকায়। তিনি বলেছেন প্রত্যেক বস্তু শুধু যে চির প্রবাহমান তা নয় পরিবর্তনশীলও, এমন কি স্থিরতম বস্তুর মধ্যেও রয়েছে এক অদৃশ্য প্রবাহ আর গতি। নৈসর্গিক ব্যাপার চক্রাকারেই আবর্তিত হয়—প্রত্যেকটির অগ্নিতেই শুরু আর অগ্নিতেই শেষ (শেষ বিচার আর নরকের খ্রীস্টীয় আর বৈরাগ্যবাদী বিশ্বাসের এক উৎস হচ্ছে এটি)। হেরাক্লিটাসের মতে: "সংগ্রামেই সব জিনিষের উৎপত্তি আর লয়···যুদ্ধ হচ্ছে সকলের জনক আর সকলের রাজা: কাকেও তিনি দেবতা বানাচ্ছেন, কাকেও মানুষ, কাকেও বা স্বাধীন, কাকেও বা দাস।" যেখানে সংগ্রাম নেই সেখানেই অবক্ষয়: "মিশ্রিত জিনিষ না ঝাঁকালেই পঁচতে শুরু করে"। এ পরিবর্তন, সংগ্রাম আর নির্বাচন-প্রবাহে একটি জিনিষই শুধু স্থির—তা হচ্ছে আইন বা বিধি।" এ আইন বা শৃঙ্খলা যা সবাইর জন্য আর সব কিছুর জন্য সমান—তা কোন দেবতা বা মানুষে গড়েনি কিন্তু এ চিরকাল ধরে ছিল, আছে এবং থাকবে।" বিবর্তনের ধারণাকে এম্পেডোকল্স্ (Empedocles) আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর মত পরিকল্পনার ফলে নয় বরং নির্বাচনের ফলেই ঘটে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি। নানাভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মিলিয়ে দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতি গঠন ব্যাপারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন—যেখানে মিলন পরিবেশিক প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় তা টিকে যায় আর করে স্থায়ীত্ব লাভ কিন্তু মিলন ব্যর্থ হলে গঠন যন্ত্রও হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গঠণযন্ত্র অধিকতর নিবিড় আর সাফল্যের সাথে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়-ই। অবশেষে লিউসিপাস (Leucipus) আর ডেমোক্রিটাস (Democritus—460—360 B.C.) দুই গুরু আর শিষ্য—থ্রেসের অন্তর্গত আবডেরায় (Abdera) এরিস্টোটল—পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের শেষ স্তর—জড়বাদী, পূর্ব-নির্ধারিত পরমাণু-বাদের কথা বলে গেছেন। লিউসিপাস বলেছেন: "প্রয়োজনই সব কিছুকে চালিত করে"।

ডেমোক্রিটাস বলেছেন: "বাস্তবিকপক্ষে, শুধু শূণ্যতা আর পরমাণুই আছে।" বস্তু থেকে পরমাণুর বিতাড়ন বা স্ফূরণ ঘটে বলেই আমাদের বোধ-ইন্দ্রিয়ে তার উপলব্ধি ঘটে। সংখ্যাতীত জগৎ রয়েছে, আছে, থাকবেও; মুহূর্তে মুহূর্তে গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ ঘটছে, ঘটছে ধ্বংস এবং নির্বাচিত সম-আকার ও সম-অবয়ন পরমাণুর সমাহারের ফলে এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন বিশ্বের। কোন পরিকল্পনা নেই: বিশ্ব হচ্ছে একটা যন্ত্র।

এরিস্টোটল—পূর্ববর্তী গ্রীক বিজ্ঞানের এ হচ্ছে এক অ-গভীর ও নির্বিচার সংক্ষিপ্ত-সার। বিজ্ঞানের এ সব অগ্র-পথিকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতির যে সংকীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন সে কথা স্মরণ রেখে তাঁদের বিষয়বস্তুর স্থূলতাকে আমরা সহজে ক্ষমা করতে পারি। এ চমৎকার সূচনার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দাসত্বের দুঃস্বপ্নে বাঁধা গ্রীক-শিল্পের অচলাবস্থা এবং এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনে দ্রুত জটিলতা-বৃদ্ধি পণ্ডিতদের এবং সক্রেটিস আর প্লেটোকেও ব্যবহারিক ও শারীর-বিদ্যার গবেষণার পথ থেকে নীতি আর রাজনৈতিক মতবাদের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এরিস্টোটলের পক্ষে এটি অন্যতম গৌরবের কথা যে—তিনি এতখানি উদার ও সাহসী ছিলেন যে গ্রীক চিন্তার, ব্যবহারিক ও নৈতিক এ দু'ধারাকে তিনি মিলাতে ও পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সক্ষম হয়েছিলেন গুরুকে ছাড়িয়ে গিয়ে সক্রেটিস-পূর্ববর্তী গ্রীক-বিজ্ঞানের সূত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধান করতে আর তাঁদের কাজকে দৃঢ় সংকল্প আর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা একত্রীত করে এক চমৎকার সংঘবদ্ধ বিজ্ঞানে সফল করে তুলতে।

খ. প্রকৃতি-বিজ্ঞান এরিস্টোটল

আমরা যদি কালানুক্রমে—তাঁর 'পদার্থ বিদ্যা' দিয়ে আরম্ভ করি তা হলে হতাশ হবো। কারণ আসলে এটি হচ্ছে 'পরা বিজ্ঞান' সম্বন্ধীয় রচনা—বস্তু, গতি, স্থান, কাল, অসীমতা, কারণ এবং অন্যান্য "চরম ধারণার"র এক দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা। ডেমোক্রিটাসের "শূণ্যতা" সম্বন্ধে এক আক্রমণাত্মক কিন্তু সতেজ অনুচ্ছেদ আছে ওতে। এরিস্টোটলের বক্তব্য: প্রকৃতিতে কোনরকম শূণ্যতাই থাকতে পারে না। কারণ শূণ্যতায় সব কিছুই ঘটবে সমান গতিতে কিন্তু এ সম্ভব নয় বলে, "কল্পিত শূণ্যতায় দেখা যাবে কিছুই নেই" —এ একই সঙ্গে এরিস্টোটলের বিরল পরিহাস, অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তের প্রতি আসক্তি আর দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তীদের নস্যাৎ করার প্রবণতারই দৃষ্টান্ত। এ প্রায় তাঁর এক অভ্যাসই ছিলো যে কোন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় পূর্ববর্তীদের অবদানের ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে ভূমিকা পত্তন আর সে সব অবদানকে প্রতিবাদ করে বাতিল করে দেওয়া। বেকন বলেছেন: "এরিস্টোটল ওসমানীয়দের মতো মনে করতেন সব ভাইকে হত্যা না করলে তিনি নিরাপদে রাজত্ব করতে পারবেন না।" কিন্তু সক্রেটিস পূববর্তী চিন্তার বহু রকম জ্ঞানের জন্য আমরা তাঁর এ ভ্রাতৃ-হত্যা রূপ পাগলামির কাছে বহুলভাবে ঋণী।

পূর্বোল্লেখিত কারণে এরিস্টোটলের জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁর পূববর্তীদের ছাড়িয়ে মোটেও এগিয়ে যেতে পারেনি। সূর্য্যই বিশ্ব-নিয়মের কেন্দ্র পিতাগোরাসের এ মত তিনি মানেন নি—সে সম্মান তিনি পৃথিবীকেই দিয়েছেন। কিন্তু আব-হাওয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ক্ষুদ্র রচনায় পর্য্য-বেক্ষণের এক চমৎকার পরিচয় রয়েছে, এমনকি তাঁর কল্প-রূপেও রয়েছে উজ্জ্বল অগ্নি-শিখা। তাঁর মতে এ এক চক্রাকারে আবর্তিত জগৎ: চিরকাল ধরে সূর্য্য সমুদ্রকে বাষ্পে পরিণত করছে, নদ-নদী আর ঝর্ণা-ধারাকে ফেলেছে শুকিয়ে, অবশেষে অসীম সমুদ্রকে পরিণত করছে রিক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তর-স্তুপে। তারপর শুরু হয় উল্টো যাত্রা: উত্থিত বাষ্প রাশি একত্রিত হয়ে মেঘের রূপ নিয়ে ঝরে পড়ে নদী আর সমুদ্রকে আবার তোলে ভরে। অলক্ষ্যে অথচ সক্রিয়ভাবে সর্বত্র একটা পরিবর্তন চলতে থাকে। মিশরকে বলা হয় "নীল নদীর সৃষ্টি"—কারণ তার হাজার হাজার বছরের সঞ্চয় থেকেই ওটা গড়ে উঠেছে। কোথাও সমুদ্র হয়ত স্থলে ঢুকে পড়েছে অন্যত্র ভীরু পায়ে ধীরে ধীরে স্থলই যেন চেয়েছে সমুদ্রে ঢুকে পড়তে। নূতন মহাদেশ আর নূতন সমুদ্রের হয় এভাবে উৎপত্তি—পুরাতন মহাদেশ আর পুরাতন সমুদ্র যায় হারিয়ে। এভাবে সৃষ্টি আর ধ্বংসের মহা সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে পৃথিবীর চেহারাই অনবরত হচ্ছে পরিবর্তিত। সময় সময় এসব বিরাট পরিবর্তন আকস্মিক-ভাবেও ঘটে—ফলে সভ্যতার এমন কি জীবনেরও ভূ-তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বুনিয়াদগুলোও হয়ে যায় ধ্বংস। এ সব মহা-বিনাশ মাঝে মাঝে পৃথিবীকে একদম রিক্ত করে ছাড়ে আর মানুষকে আবার নিয়ে যায় তার আদিম অবস্থায়—সিসিপাসের (Sisyphus) মতো সভ্যতা বার বারই চরম শিখরে পৌঁছে আবার বর্বরতার অতল তলে আসে নেমে—তখন আবার শুরু হয় তার ঊর্ধ্বারোহন। তাই সভ্যতার পর সভ্যতায় দেখা যায় এ "সনাতন প্রত্যাবর্তন" দেখা যায় সে রকম গবেষণা, সন্ধান, আবিষ্কার চলছে কিন্তু ধীরে ধীরে আবার নেমে আসছে অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক স্তূপীকৃত অন্ধকার যুগ"। আবার চাকা ঘুরে শুরু হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিল্পের নবজন্ম। অবশ্য এ হয়ত সত্য যে প্রাচীন সংস্কৃতির কিছু কিছু জনপ্রিয় উপকথার ক্ষীণ ঐতিহ্য পরেও বেঁচে থাকে। তাই মানুষের ইতিহাস এক নিরানন্দময় চক্রাবতন—কারণ সে এখনো হতে পারেনি যে পৃথিবীতে সে বাস করছে তার অধিকর্তা।

গ. জীববিদ্যার ভিৎ-রচনা

তাঁর সু-বৃহৎ পশু-উদ্যানে পায়চারি করতে করতেই এরিস্টোটলের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে এ সংখ্যাতীত বিচিত্র জীবগুলোকে যদি একটানা সাজানো যায় তা হলে দেখা যাবে একটার সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র এত ক্ষীণ যে পরবর্তীর সঙ্গে তার পার্থক্যই মালুম করা যায় না। প্রত্যেক ব্যাপারেই—দৈহিক গঠন, জীবনযাত্রা প্রণালী, প্রজনন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালন-পালন অথবা অনুভব-অনুভূতি সব কিছুতেই নিম্নতম থেকে উচচ-তম পর্য্যন্ত ক্রম অগ্রগতিতে পার্থক্য খুব সামান্যই। নিম্নতম স্তরে "মৃত" থেকে জীবিতকে পৃথক করে নেওয়া কদাচিৎ সম্ভব হয়—"প্রকৃতি জড়পদার্থ থেকে জীব-রাজ্যে পৌঁছার পথটাকে এত ক্রমিক ও সূক্ষ্ম করেছে যে উভয়কে পৃথক করে দেখার সীমা-রেখা প্রায় অদৃশ্য ও সন্দেহজনক বল্লেই চলে"—মনে হয় প্রাণ-হীন পদার্থেও কিছুটা প্রাণ নিহিত আছে। আবার এমন কিছু শ্রেণীর জিনিষও আছে যেসবকে না উদ্ভিদ বলা যায়, না প্রাণী। নিম্নতম স্তরের কোন কোন জীবে সাদৃশ এত বেশী যে এদের যথাযথ বংশ ও শ্রেণী নির্দেশ করাই অসম্ভব। তাই প্রত্যেক স্তরের জীবে কাজ এবং রূপের বিচিত্র যেমন বিশিষ্ট তেমনি ক্রমিক ধারাবাহিকতা আর ব্যবধান ও কম বিশিষ্ট নয়। কিন্তু দৈহিক গঠনের এ হতবুদ্ধি বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর: তা হচ্ছে জীবন ধীরে ধীরে শক্তি আর জটিলতার মধ্যে বেড়ে উঠেছে, গঠন-বৈচিত্র্য আর দৈহিক গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরও ঘটেছে ক্রমোন্নতি—ধীরে ধীরে কর্ম-সাধনে এসেছে বিশিষ্টতা এবং ক্রমে ক্রমে দৈহিক নিয়ন্ত্রণ হয়েছে কেন্দ্রীভূত। আস্তে আস্তে প্রাণ-শক্তি (Life) নিজেই স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক গড়ে নিয়েছে এবং মন নিজের পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশকে আয়ত্ত করতে এগিয়ে গেছে দৃঢ় পদক্ষেপে।

এটি আশ্চর্য যে এতসব শ্রেণী-বিভাগ ও সাদৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠা সত্ত্বেও বিবর্তনবাদের কথা এরিস্টোটলের মনে জাগেনি।' '—সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর জীবের মূলে যোগ্যতমের বেঁচে থাকা বা বংশ রক্ষা'—এম্পেডেকেল্স্ (Empedocles)-এর এ মতবাদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন আর এনেক্সাগোরাস (Anaxagoras) যে বলেছেন মানুষ যে বুদ্ধিমান হয়েছে তা গতিশীলতার ফল নয় বরং দু'খানা হাতের বিচিত্র প্রয়োগেরই ফল—এও তিনি মানেন নি। বরং এরিস্টোটল বিপরীত বিশ্বাসই করতেন, তাঁর মতে মানুষ বুদ্ধিমান বলেই হাতের এত সব ব্যবহার সে জেনেছে। জীব-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে যতখানি ভুল করা সম্ভব এরিস্টোটল তা সবই করেছেন। যেমন, তাঁর বিশ্বাস প্রজন-নের ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা হলো শুধু ক্ষীপ্রতা আর উত্তেজনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোগানো। এটা তাঁর মনে জাগেনি যে (যা এখন প্রজনন-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে আমরা জেনেছি) শুক্রের প্রধান কাজ গর্ভ-সঞ্চার নয় বরং ভ্রূণে পুরুষ-পক্ষের বংশানুক্রমিক গুণ জোগানো আর পিতৃ-মাতৃকুল দুই ধারার মিশ্রণে এক পৃথক সবল শিশুতে পরিণত করা। তাঁর সময় শব-ব্যবচ্ছেদ ছিল না বলে তিনি শারীর ব্যাপারেই ভুল করেছেন বেশী। তিনি মাংসপেশী সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না---এমন কি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন না, স্নায়ু থেকে শিরাকেও তিনি আলাদা ভাবেন নি, তাঁর ধারণা ছিল মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে রক্তকে ঠাণ্ডা রাখা আর তাঁর বিশ্বাস--অবশ্য তা ক্ষমার্হ, পুরুষের মাথার খুলিতে মেয়েদের তুলনায় বেশী জোড়া রয়েছে। আর এও তিনি বিশ্বাস করতেন পুরুষের দুই পাশে আটখানা করে পাঁজরের হাড় আছে কিন্তু অত্যন্ত অবিশ্বাস্য আর হয়তো ক্ষমার অযোগ্য—তিনি বিশ্বাস করতেন পুরুষের চেয়ে মেয়েদের দাঁত সংখ্যায় কম! অথচ মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রীতিকর।

তবুও জীব-বিজ্ঞানে তাঁর আগেও পরে আর কোন গ্রীকই এতখানি সার্বিক অগ্রগতির পরিচয় দিতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন গঠনের দিক দিয়ে পাখী আর সরীসৃপ খুব নিকট-সম্পর্কীয় আর বানর হচ্ছে চতুষ্পদ আর মানুষের মধ্য-সংযোগ। একবার ত দুঃসাহস করে তিনি বলেই ফেলেছিলেনঃ মানুষ চতুষ্পদ-শ্রেণীর বাচ্চা-প্রসবকারী (আমাদের "ম্যামেল" বা স্তন্যপায়ী) এক গোষ্ঠিরই অন্তর্গত। তিনি বলেছেন--শৈশবে পশুর আর মানুষের আত্মায় কোন বেশকমই থাকে না। খাদ্যই জীবনযাত্রা প্রণালী নির্ধারণ করে, এ মন্তব্যও অর্থ-পূর্ণঃ "কারণ কোন কোন পশু যূথচারী আর অন্যগুলি নিঃসঙ্গ---তারা নিজেদের পছন্দ মতো খাদ্য সংগ্রহের সুবিধা মতোই জীবন-যাপন করে।" ভন্ বেয়ারের (Von Baer) বিখ্যাত আইন—সাধারণ জাতিগত বৈশিষ্ট্য (যেমন—চোখ, কান) বিকাশশীল প্রাণীতে তার নিজ শ্রেণীর বিশিষ্ট লক্ষণের অথবা ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের (যেমন চোখের রঙ) আগেই যে দেখা দেয় তার পূর্বাভাস ও তাঁর মনে জেগেছিল। দু'হাজার বছর ডিঙ্গিয়ে স্পেন্সারের (Spencer) জন্মের মতো নির্বাচনেও যে বিপরীত বৈচিত্র্য ঘটে এ মতের আর তার সামান্যীকরণের আভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মনেও জেগেছিল অর্থাৎ যে শ্রেণী বা ব্যক্তি যত বেশী উন্নত ও বিশিষ্ট হবে সে অনুপাতে তার সন্তান-জন্মও যাবে কমে। তিনি এও লক্ষ্য করেছেন, আর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন— কোন বিশেষ বৈচিত্র্য (যেমন প্রতিভা) মিশ্রণে জলো হয়ে আসে আর পরবর্তী প্রজননে যায় হারিয়ে। তাঁর জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মতামত, পরবর্তী বিজ্ঞানীদের দ্বারা সাময়িকভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেও আধুনিক বিজ্ঞানীরা তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন—যেমন মাছ যে নীড় বাঁধে আর হাঙ্গর যে তার গর্ভ-ফুল নিয়ে গর্ব করে বেড়ায় দৃষ্টান্ত হিসেবে এ সব উল্লেখ করা যায়।

সর্বশেষে ভ্রূণতত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বিজ্ঞান হিসেবে। তিনি লিখেছেন: "যিনি কোন কিছুকে গোড়া থেকে বড় হতে দেখেন তার সম্বন্ধে তাঁর মতামতই চমৎকার ও পূর্ণাঙ্গ বলে মানতে হবে।" তা দেওয়ার বিভিন্ন অবস্থায় মুরগীর ডিম ভেঙ্গে দেখে—শ্রেষ্ঠতম গ্রীক-চিকিৎসক হিপোক্রেটেস্ (Hippocrates—b460 B.C) পরীক্ষা ক্ষেত্রে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর এ পরীক্ষার ফলাফল প্রয়োগ করেছেন তাঁর "শিশুর আদিম অবস্থা" নামক রচনায়। এরিস্টোটল এ ধারা অনুসরণ করে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাতে বাচচা মুরগীর যে বর্ণনা দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন তা দেখে এযুগের ভ্রূণ-তত্ত্ব-বিশারদরাও প্রশংসামুখর হয়ে ওঠেন। মনে হয় প্রজনন সম্বন্ধেও তিনি কিছু পরীক্ষা চালিয়েছিলেন কারণ তিনি শিশু কোন্ লিঙ্গের হবে তার সঙ্গে পিতার অণ্ড-কোষ বিশেষের শুক্রের সম্বন্ধ রয়েছে বলে যে মতবাদ তাকে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন—একজন পুরুষের ডান অণ্ড-কোষ বেঁধে রেখে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল কিন্তু তাতেও সন্তান সম-লিঙ্গের হয় নি, বিপরীত লিঙ্গেরই হয়েছিল। বংশগতির আধুনিক বহু সমস্যারও তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন। এলিসের (Elis) একটি মেয়ে একটি নিগ্রোকে বিয়ে করেছিল—সন্তানগুলি সব হয়েছিল সাদা কিন্তু পরবর্তী প্রজননে পুনরাবির্ভাব ঘটলো নিগ্রোবর্ণের। এরিস্টোটলের প্রশ্ন: মধ্যবর্তী প্রজননে কৃষ্ণত্ব কোথায় লুকিয়েছিল? তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর গ্রেগর মেণ্ডলের (Gregor Mendel—1822—1882) যুগান্তকারী পরীক্ষার ব্যবধান মাত্র একটি পদক্ষেপের। কথায় বলে—কি প্রশ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে তা জানাই অর্ধেক জানা। সত্যই, জীব-বিদ্যা সম্পর্কীয় এসব রচনায় ভুলভ্রান্তিসত্ত্বেও একক মানুষের দ্বারা এ হচ্ছে বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি-স্তম্ভ। এরিস্টোটলের পূর্বে, আমরা যতদূর জানি, জীব-বিদ্যার কিছুটা বিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কিছুই হয় নি—এ কথা মনে রাখলে তাঁর সাফল্য একটা জীবনের জন্য যে যথেষ্ট এবং তাতেই যে তিনি অমর হয়ে থাকতেন তা সহজেই উপলব্ধ হয়। কিন্তু এরিস্টোটল ত সবে মাত্র শুরু করেছেন।

॥ ৫ ॥

পরা বিজ্ঞান আর ঈশ্বরের স্বরূপ

AMARBOI.COM

জীব-বিজ্ঞান থেকেই তাঁর পরা বিজ্ঞানের উৎপত্তি। বিশ্বের প্রত্যেক কিছুই যা আছে তার থেকে আরো বড় হওয়ার এক অন্তর্নিহিত তাগাদায় সব সময় গতিশীল। পদার্থ বা কাঁচামাল থেকেই সব কিছুর রূপ (form) বা বাস্তবতা গড়ে ওঠে। এ রূপ বা বাস্তবতাই আবার পদার্থ বা জড় বস্তু হয়ে উচ্চতর রূপের উৎপত্তি ঘটায়। কাজেই শিশু যদি পদার্থ হয় মানুষ হচ্ছে রূপ। আবার শিশু হচ্ছে রূপ আর ভ্রূণ হচ্ছে জড় বা পদার্থ আর ভ্রূণ রূপ হলে ডিম্বাণু হচ্ছে তার পদার্থ। এভাবে পেছনে যেতে যেতে আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছি যখন পদার্থের কোন সুস্পষ্ট রূপ উপলব্ধি করতেই আমরা অক্ষম। কিন্তু রূপহীন পদার্থের কোন অস্তিত্বই নেই কারণ সব কিছুরই একটা রূপ আছে। ব্যাপক অর্থে সব পদার্থেরই রূপগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে—রূপ হচ্ছে বাস্তবায়ন, পদার্থের একেবারে তৈরী বাস্তব বা সত্য অবস্থা। পদার্থ বাধা জন্মায়, রূপ গড়ে তোলে। রূপ (form) বলতে শুধু আকার বুঝায় না বরং অবয়বিত করার শক্তিকেই বুঝায়—যে অন্তর্নিহিত প্রয়োজন আর তাগাদা পদার্থকে সুনির্দিষ্ট অবয়ব আর উদ্দেশ্যে রূপায়িত করে তোলে—এ হচ্ছে পদার্থের সম্ভাবনা-শক্তিরই বাস্তব-পরিণতি। প্রত্যেক কিছুর মধ্যে করার, হওয়ার অথবা গড়ে ওঠার যে শক্তিসমূহ রয়েছে এ হচ্ছে তারই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগফল। রূপের দ্বারা পদার্থকে জয় করার নামই প্রকৃতি—এভাবেই ঘটে জীবনের অবিরাম অগ্রগতি আর জয়।

বিশ্বে সব কিছুই স্বাভাবিক গতিতে একটা পরিণতিতে গিয়ে পেঁৗছে। যে সব বিচিত্র কারণ ঘটনা বিশেষকে নির্ধারণ করে তার মধ্যে প্রধান ও চরম হলো যা উদ্দেশ্যের নিয়ামক—ঐটির ভূমিকাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পদার্থের নিষ্ক্রিয়তার ফলে উদ্দেশ্য গঠনের শক্তি-সমূহ যদি বাধা পায় তা হলেই মাত্র স্বভাবে দেখা দেয় ভুলক্রটি ও ব্যর্থতা—ফলে গর্ভপাত আর বিকট জন্ম জীবনের সৌন্দর্য্যকে করে বিনষ্ট। বিকাশ বিশৃঙ্খল বা আকস্মিক ব্যাপার নয় (না হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রায় সর্বজনীন আবির্ভাব ও সংক্রমণ কি করে ব্যাখ্যা করা যায় ?) প্রত্যেক কিছুই তার স্বভাব, গঠন ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের দ্বারা ভিতর থেকেই একটা কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত হয়। মুরগির ডিমটা ভিতরেই এভাবে গঠিত ও পরিকল্পিত যে তার থেকে হাঁসের বাচচা বের হবে না, হবে মুরগির ছানা। আমের আঁটি থেকে আম গাছই হয় কখনো কাঁঠাল গাছ হয় না। পার্থিব গঠন ও ঘটনাকে কোন বহিঃশক্তিই সাধিত করছে এ বিশ্বাস অবশ্য এরিস্টোটলের নয়—বরং তাঁর বিশ্বাস সব পরিকল্পনাই আভ্যন্তরিক ব্যাপার এবং বস্তুবিশেষের কাজ আর ধরনধারণ থেকেই ঘটে তার উৎপত্তি। "এরিস্টোটল দৈব বিধান আর প্রাকৃতিক কার্যকারণকে একই মনে করতেন।"

তবুও ঈশ্বর একজন আছেন। তবে মানুষের কৈশোরিক কল্পনা যে এক সরল আর মানব-সদৃশ দেবতার ধারণা করেছে এ তা নয়। গতি সম্বন্ধে যে সুপ্রাচীন ধাঁধা এরিস্টোটল তা দিয়েই সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা—গতির শুরু কিভাবে ? পদার্থকে যেমন তিনি আদিহীন মনে করেন গতিকে কিন্তু তা মনে করেন না। পদার্থ চিরন্তন হতে পারে কারণ রূপ বা আকার-প্রকারের অসীম ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই শুধু তাতে নিহিত কিন্তু কখন এবং কিভাবে গতি-শক্তি ও গঠন-ক্রিয়ার যে বিপুল নিয়ম-পদ্ধতি শুরু হবে যা অবশেষে বিচিত্র ও অগণিত রূপে ও আকারে এ বিস্তীর্ণ পৃথিবীটাকে ভরে তুলবে ? এরিস্টোটলের মতে গতিরও একটা উৎস আছে নিশ্চয়ই। আর আমরা যদি আমাদের সব সমস্যাকে একের পর এক পেছনের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেলে দিয়ে অশেষ পশ্চাৎ প্রত্যাবর্তনের নিরানন্দের মধ্যে নিজেদের নিক্ষেপ করতে না চাই তা হলে এক অবিচলিত গতিশীল শক্তির উপর--যা যা অ-দেহী, অবিভাজ্য, স্থান-হীন, লিঙ্গ-হীন, প্রবৃত্তি-মুক্ত, অপরিবর্তনীয়, পূর্ণ ও চিরন্তন—তাতে বিশ্বাস আমাদের ন্যস্ত করতেই হবে। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না, তিনি বিশ্বকে দেন গতি এবং তা তিনি যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা দেন না, দেন পৃথিবীর সমস্ত কার্য-কলাপের সার্বিক উদ্দেশ্যের দ্বারা। "ঈশ্বর পৃথিবীকে গতিশীলতা দেন যেমন প্রিয়তমা দেন প্রিয়-তমকে"। তিনিই প্রকৃতির চূড়ান্ত কারণ, তিনিই বস্তুর উদ্দেশ্য ও গতি আর পৃথিবীর রূপ বা অবয়ব, তার জীবনের নীতি, শক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির যোগফল, তার বিকাশের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তার সামগ্রিক আভ্যন্তরিক প্রেরণার উৎসাহ-দায়িনী শক্তি। তিনি এক নির্মল শক্তি: তিনিই কর্তা, তিনিই কর্ম। সম্ভবতঃ আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান ও দর্শনের রহস্যময় "শক্তিই" তিনি। চুম্বক-শক্তিসম্পন্ন তেমন কোন মানুষ তিনি নন্।

তবুও, তাঁর স্বাভাবিক অস্থির বিশ্বাসের জন্যই তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর হচ্ছেন এক আত্ম-সচেতন শক্তি'। তবে কিছুটা রহস্যময় শক্তি, কারণ এরিস্টোটলের ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না, তাঁর কোন আগ্রহ নেই, কোন ইচ্ছা নেই, নেই কোন উদ্দেশ্য: তাঁর কাজ এতই পবিত্র যে সে জন্য তিনি কোন কাজই করেন না। বস্তুর সার বা মূল বিষয়ে চিন্তা করাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র করণীয়। যেহেতু তিনি নিজেই সব কিছুর সার, সব রূপের রূপ অতএব তাঁর একমাত্র করণীয় হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে বসে বসে চিন্তা করা। বেচারা এরিস্টোটলীয় ঈশ্বর: তিনি এক নিষ্কর্মা বাদশাহ! "রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না।" ইংরেজরা যে এরিস্টোটলের ভক্ত তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই---সম্ভবতঃ তাদের রাজাদের থেকেই এরিস্টোটল তাঁর ঈশ্বরের আদর্শ গ্রহণ করেছেন, অথবা হয়ত তাঁর নিজের থেকেই গ্রহণ করেছেন সে আদর্শ। আমাদের দার্শনিক প্রবর চিন্তার প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে তিনি তাঁর ঈশ্বর উপলব্ধিকেও চিন্তার পায়ে বিসর্জন দিয়ে বসে-ছিলেন। তাঁর ঈশ্বরও তাঁর মতোই খাঁটি এরিস্টোটলীয়, সব রকম রোমাঞ্চ-মুক্ত, সব সংগ্রাম আর দুঃখ কষ্টের জগৎ থেকে দূরে গজ-দন্ত মিনারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রিত—প্লেটোর রাজ-দার্শনিক থেকেও এক জগৎ দূরে, দূরে যিহুবার রক্ত-মাংসের কঠোর বাস্তবতা থেকে অথবা খ্রীস্টিয় ঈশ্বরের ভদ্র ও করুণার্থী পিতৃত্ব থেকেও।

৬. মনোবিদ্যা ও শিল্পের প্রকৃতি

এরিস্টোটলের মনোবিদ্যাও অনুরূপ দুর্বোধ্যতা ও অস্থিরতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক চমৎকার অনুচ্ছেদ তাতে আছে, অভ্যাসের শক্তির উপর দেওয়া হয়েছে জোর—অভ্যাসকে 'দ্বিতীয় স্বভাব' বলে এ সর্বপ্রথম অভিহিত করা হলো। যদিও তেমন বিকাশ সাধন করা হয়নি—সংযোগ-সহযোগিতার নিয়মগুলো এখানেই একটা নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে। কিন্তু দার্শনিক-মনোবিদ্যার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—ইচ্ছার স্বাধীনতা আর আত্মার অমরতাকে এক অস্পষ্টতা আর সন্দেহের আঁধারে দেওয়া হয়েছে ছেড়ে।

এরিস্টোটল মাঝে মাঝে নির্দিষ্টবাদীর মতই কথা বলে বসেন: "আমরা যা তার থেকে ভিন্নতর হওয়ার সরাসরি ইচ্ছা আমরা করতেই পারি না" কিন্তু এদিকে নির্দিষ্টবাদিতার বিরুদ্ধে তিনি তর্ক করতেও থাকেন—যে পরিবেশ আমাদের গড়ে তোলে তা নির্বাচন করে আমরা কি হবো তাও নির্বাচন করতে পারি। কাজেই নিজেদের বন্ধু, বই-পুস্তক, পেশা ও আমোদ বেছে নিয়ে আমরা আমাদের চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম—এদিক থেকে বিচার করলে আমরা স্বাধীন। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট-বাদীদের যে উত্তর: আমাদের প্রাক্তন চরিত্রই এ সব গঠনমূলক নির্বা-চনগুলিকে নির্ধারণ করে থাকে তা বোধ হয় প্রত্যাশা করেন নি। পরিশেষে বলেছেন এ সব করে থাকে ত অ-নির্বাচিত বংশগতি আর পরি-বেশ। তিনি জোর দিয়ে বলতেন আমরা যে সব সময় যে কোন বিষয়ে নিন্দা-প্রশংসা করে থাকি তাতে স্বাধীন ইচ্ছা আর নৈতিক দায়িত্বেরই ত রয়েছে পূর্বাভাস। তাঁর ধারণায় এ কথা আসেনি যে এ রকম অনুমানে থেকে নির্দিষ্টবাদীরা ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁচতে পারে—পরবর্তী কার্য-কলাপের নির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্যই নিন্দা-প্রশংসাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরিস্টোটলের আত্মাতত্ত্বের সূচনা এক চমৎকার সংজ্ঞায়। আত্মা হলো সব জীবের সামগ্রিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিধান—তার সব শক্তি আর পদ্ধতির সমাহার। উদ্ভিদে আত্মা শুধুই পুষ্টিকারক আর প্রজনন-শক্তি, জন্তু জানোয়ারে চৈতন্য আর গতি শক্তি আর মানবে তা যুক্তি আর চিন্তা শক্তি। আত্মা দৈহিক শক্তির সমাহার বলে দেহ ছাড়া তা বাঁচতেই অক্ষম। এ দুই যেন মোম আর মোমের আকার। কল্পনায় ছাড়া ওদের বিচ্ছেদ অসম্ভব—বাস্তবে ওরা একই পূর্ণাঙ্গ গঠন। ভেনাসের প্রতিমূর্তিগুলিকে খাড়া রাখার জন্য তাতে যেমন ডায়েডেলাস (Daedalus) পারা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন; আত্মাকে কিন্তু সেভাবে দেহে ঢুকিয়ে দেয়া হয় নি। ব্যক্তিগত বা বিশেষ আত্মা একমাত্র নিজ শরীরেই পারে অবস্থান করতে। তা হলেও ডিমোক্রিটাস (Democritus) যেমন মনে করতেন, আত্মা তেমন কোন পদার্থ নয়, সম্পূর্ণভাবে তার মৃত্যুও ঘটে না। মানবাত্মার বিবেচনা-শক্তির একটা অংশ অকর্মক, স্মৃতির সঙ্গে তা জড়িত, যে দেহে স্মৃতি বিধৃত সে দেহের সঙ্গে সঙ্গে তারও ঘটে মৃত্যু। কিন্তু "সক্রিয় বিবেচনা বা যুক্তি" যা চিন্তার অনাবিল শক্তি---তা স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্করহিত বলে তার কোন অবক্ষয় নেই। এ সক্রিয় যুক্তিই সর্বজনীন—মানুষের ব্যক্তিগত সত্ত্বা থেকে পৃথক। সাময়িক স্নেহ-ভালবাসা আর বাসনা কামনা নিয়ে যে ব্যক্তিত্ব তা বেঁচে থাকে না কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক আর বিমূর্ত রূপে মনই শুধু বেঁচে থাকে। আত্মাকে অমরতা দেওয়ার জন্যই এরিস্টোটল আত্মাকে ধ্বংস করে বলেন: 'অমর আত্মা হচ্ছে "নির্মল চিন্তা"—যাতে লাগেনি বাস্তবের মলিন স্পর্শ।' অবিকল এরিস্টোটলীয় ঈশ্বর যেমন এক নির্মল সক্রিয়তা অথচ কর্মের স্পর্শে অমলিন। এ রকম ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে যাঁর ইচ্ছা তিনি সান্ত্বনা পেতে পারেন। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হতে হয় এভাবে পরা-বিজ্ঞানের কেক্ একই সঙ্গে খেয়ে আর নিজের হাতে রেখে দিয়ে এরিস্টোটল মেসেডোনীয়-বিরোধী হেমলক-বিষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কল্পনার এক সূক্ষ্মজাল বিস্তার করেন নি ত?

মনোবিদ্যার অধিকতর নিরাপদ ক্ষেত্রেই এরিস্টোটল লিখে গেছেন অধিকতর মৌলিকতা আর বস্তু-নিষ্ঠার সঙ্গে। শিল্প ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় নন্দন তত্ত্ব অধ্যয়ন প্রায় তাঁরই আবিষ্কৃত। এরিস্টোটল বলেছেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগধর্মী প্রকাশের আকাঙক্ষা আর গঠন-উন্মুখতাই হচ্ছে শৈল্পিক সৃষ্টির উৎস। বাস্তবের অনুকরণই প্রধানতঃ শিল্পের আঙ্গিক বা রূপ— এ যেন প্রকৃতির সামনে একটা দর্পণ স্থাপন। অনুকরণে মানুষ আনন্দ পেয়ে থাকে—যে আনন্দ নিম্নতর জন্তু জানোয়ারে অনুপস্থিত। তবুও বস্তুর বহিরঙ্গ প্রকাশ শিল্পের উদ্দেশ্য নয়---শিল্পের উদ্দেশ্য বস্তু-বিশ্বের মর্মার্থ সন্ধান। কারণ বাইরের হাবভাব আর খুঁটিনাটি নয়, ভিতরটাই ঐ সবের বাস্তবতা। ট্রোজান মহিলাদের বাস্তব অশ্রুপাতের চেয়ে হয়তো ইডিপাস্ রেক্সের সংযত পরিমিতিবোধেই রয়েছে অধিকতর মানব-সত্য।

মহত্তম শিল্পের আবেদন শুধু বুদ্ধিতে নয়, অনুভূতিতেও (যেমন শিল্পীর আবেদন শুধু সুর বা সঙ্গতির জন্য নয় তার গঠন ও বিকাশের জন্যও), মানসিক আনন্দ হচ্ছে মানুষের জন্য সর্বোত্তম আনন্দ। কাজেই শিল্পকে আঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টি রাখতেই হবে—সর্বোপরি ঐক্য ও সঙ্গতির প্রতি---এ হচ্ছে যে কোন শিল্পের গঠন ও রূপের মেরুদণ্ড। উদাহরণতঃ নাটকের সম্বন্ধে বলা যায়, নাটকের ক্রিয়ায় সঙ্গতি থাকা চাই---যে উপ-কাহিনী জটিলতা সৃষ্টি করে তা আমদানি করা উচিত নয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন ঘটনা নিয়ে এসে নাটকের গতি ব্যাহত করাও সঙ্গত নয়। কিন্তু সর্বোপরি শিল্পের কাজ হলো আবর্জনা-মুক্ত করা—নির্মল করা : সামাজিক বাধা বিঘ্নের চাপে যে সব আবেগ-অনুভূতি আমাদের মধ্যে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে, যে কোন মুহূর্তে যা অসামাজিক ও ধ্বংসকর কাজে রূপ নিতে সক্ষম তা নির্দোষ নাটকীয় উত্তেজনার মাধ্যমে বেরিয়ে গিয়ে মনের সমতা বিধান সাধন করে। তাই বিয়োগান্ত নাটক : "শঙ্কা আর করুণার পথে এ সব আবেগকে নির্গমনের সুযোগ করে দেয়।" বিয়োগান্ত নাটকের আরো কোন কোন দিক (যেমন নীতি ও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ) এরিস্টোটলের নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর আবর্জনা-নিষ্কাসন-মত প্রকাশ করে শিল্পের যে একটা অতিন্দ্রীয় শক্তি রয়েছে তার উপলব্ধির পথে তিনি এক অপরিসীম সম্ভাবনার ইংগিত দিয়ে গেছেন। কল্পরাজ্যের সর্বত্র তাঁর প্রবেশ যে সহজসাধ্য ছিল আর যাতেই তিনি হাত ঠেকিয়েছেন তাকেই যে বিভূষিত করে তুলতে পারতেন এ তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. নীতি আর সুখের প্রকৃতি

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই এরিস্টোটলের মানসিক বিকাশ হতে লাগলো আর তরুণেরা এসে শিক্ষা আর নিজেদের গড়ে তোলার জন্য তাঁর কাছে ভিড় করতে শুরু করলো ততই তাঁর মন বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ছেড়ে স্বভাব ও চরিত্রের বৃহত্তর ও অস্পষ্ট সমস্যাবলীর দিকে পড়লো ঝুঁকে। তিনি এখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন ব্যবহারিক জগতের সব প্রশ্নের শেষ প্রশ্ন হলো—উত্তম জীবন কোন্‌টি? —জীবনের চরম ভালোই বা কি? পুণ্য কি? —কিভাবে আমরা সুখ আর পরিপূর্ণতা খুঁজে পাবো?

নীতির ব্যাপারে তিনি বাস্তববাদী ও সরল। তাঁর বিজ্ঞান-শিক্ষা তাঁকে অতিমানবীয় আদর্শ প্রচার আর চরম উৎকর্ষের উপদেশ বিতরণ থেকে বিরত রেখেছিল। সান্তায়না (Santayana) বলেছেন: "এরিস্টোটলের মানব স্বভাবের ধারণা ও উপলব্ধি অত্যন্ত খাঁটি, প্রত্যেক আদর্শেরই একটি প্রাকৃতিক ভিত্তি রয়েছে আর যা কিছুই প্রাকৃতিক তাই আদর্শায়িত বিকাশ"। এরিস্টোটল গোড়াতেই খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন যে জীবনের উদ্দেশ্য ভালোর জন্যই ভালো তা নয় বরং সুখই জীবনের উদ্দেশ্য। "কারণ অন্য কিছুর জন্য নয়—সুখের জন্যই আমরা সুখ চাই, আমরা যে সম্মান, আনন্দ, মনীষা ইত্যাদি চাই তার কারণ আমাদের বিশ্বাস ঐ সবের মারফত আমরা সুখী হবো।" তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সুখকে চরম ভালো বলে অভিহিত করা সে ত এক স্বতঃসিদ্ধ কথা কিন্তু সুখের প্রকৃতি আর তাকে পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণাই অত্যধিক প্রয়োজনীয়। তাঁর আশা অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কোথায়, এ প্রশ্নের সাহায্যেই তিনি সে উপায়ের সন্ধান পাবেন এবং ধরে নিয়েছেন মানুষের যে বিশেষ মানবীয় গুণ তার সক্রিয়তার উপরই নির্ভর করছে সুখ। এখন দেখা যাচ্ছে—চিন্তা শক্তিই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বিশেষ ও শ্রেষ্ঠতম গুণ। এখানেই মানুষের প্রাধান্য আর এ দিয়েই সে অন্য প্রাণীদের উপর চালায় শাসন। যখন দেখা যাচ্ছে এ শক্তির বিকাশের ফলেই তার প্রাধান্য ও প্রভুত্ব তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজেই আমরা ধরে নিতে পারি, এ শক্তি বা বৃত্তির বিকাশই তাকে অর্থাৎ মানুষকে দেবে সুখ আর পূর্ণতা।

কয়েকটি শারীরিক প্রয়োজনকে বাদ দিলে, সুখের প্রধান সর্ত হলো---যুক্তিবাদ---যা মানুষের বিশেষ শক্তি ও গৌরব। পুণ্য বা যোগ্যতা নির্ভর করে পরিচ্ছন্ন বিচার-বুদ্ধি, আত্মসংযম, কামনার সামঞ্জস্য আর উপায়ের শৈল্পিক গুণের উপর — ওটা সরল-মনা মানুষের আয়ত্তাধীন বা নির্দোষ অভিপ্রায়েরও ফল নয় বরং পরিপূর্ণভাবে বিকশিত মানুষের অভিজ্ঞতারই নাম ওটা। তারও আয়ত্তের পথ ও উপায় আছে, যা জানা থাকলে বাধা ও বিলম্বের হাত থেকে বাঁচা যায়: ঐ হচ্ছে মধ্যপথ---সোনালী মধ্য-বিন্দু। প্রত্যেক চারিত্রিক গুণকে তিন স্তরে সাজানো যায়---প্রথম স্তর চরম অতিরিক্ততা আর শেষ স্তর পাপ আর মধ্যম স্তর হলো গুণ, পুণ্য বা শক্তি যাই বলা হোক। কাজেই ভীরুতা আর অদম্যতার মাঝা পথেরই নাম সাহস, কৃপণতা আর অমিতব্যয়িতার মাঝা পথের নাম ঔদার্য, কুঁড়েমি আর লোভের মাঝা পথের নাম উচচাশা, হীনতাবোধ ও অহঙ্কারের মাঝাপথের নাম বিনয়, গোপনতা আর বাক্-প্রিয়তার মাঝাপথের নাম সততা, বিষণ্নতা আর ভাঁড়ামির মাঝা পথের নাম রসিকতা, কলহ-প্রিয়তা আর তোষামোদের মাঝাপথের নাম বন্ধুত্ব, হেমলেটের দ্বিধা আর কুইক্‌সোর অস্থিরতার মাঝা-পথের নাম আত্মসংযম। কাজেই নীতি আর স্বভাবের ক্ষেত্রে যা 'খাঁটি বা ঠিক' তার সঙ্গে গাণিতিক বা কারিগরি 'খাঁটি বা ঠিকে'র কোন পার্থক্য নেই---এর অর্থ শুদ্ধ, যোগ্য, যার থেকে পাওয়া যায় সর্বোত্তম ফল।

যাকে আমরা সোনালী মধ্য-বিন্দু বলেছি তা কিন্তু গণিতের মধ্যবিন্দু নয়, কারণ গণিতে যেভাবে দুই চরমকে নির্ভুল হিসেবের আওতায় নিয়ে এসে তার গড় বের করা সম্ভব তা নীতি বা স্বভাবের বেলায় সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি ঘটনার আনুষঙ্গিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এ সোনালী-বিন্দুর পরিবর্তন ঘটে---পরিণত আর নমনীয় যুক্তির কাছেই তা শুধু ধরা দেয়। অভ্যাস আর শিক্ষার দ্বারাই শুধু গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন সম্ভব। আমাদের গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলেই যে আমরা যথাযথ আচরণ করি তা নয় বরং যথাযথ আচরণ করেছি বলেই এ সব আমাদের আয়ত্ত হয়েছে: "কর্মের ভিতর দিয়েই মানুষের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সব গুণের সমাবেশ ঘটে"—আমরা যা বার বার করি তারই ফল আমরা। কাজেই শ্রেষ্ঠত্ব কর্ম বিশেষের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। "পরিপূর্ণ জীবনে আত্মার সুষ্ঠুভাবে কাজ করাই হচ্ছে মানুষের জন্য ভালো···একটি বাবুই পাখী বা একটি মনোরম দিন যেমন বসন্তের সূচনা করে না তেমনি একটা দিন বা একটা সংক্ষিপ্ত কাল কোন মানুষকেই ধন্য আর সুখী করতে পারে না"।

যৌবনকালটাই বাড়াবাড়ির সময়ঃ "তরুণরা যখন কোন দোষ করে তখন তা এ বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জণেরই ফল"। যৌবনের (এমন কি অনেক বয়স্কেরও) মস্ত বড় সমস্যা এক বাড়াবাড়ি থেকে যেন বিপরীত আর এক বাড়াবাড়িতে পা দিয়ে না বসে। কারণ 'বেশী সংশোধন' বা অন্য যে কারণেই হোক, সাধারণত এক চরম অন্য চরমে গিয়ে পোঁচেঃ "কপটতার স্বভাবই হলো অতিমাত্রায় বাদ প্রতিবাদ করা আর নম্রতার বিচরণ-ভূমি হলো অহঙ্কারের তুঙ্গ-শৃঙ্গ। যারা সচেতনভাবেই কোন কিছুর চরমে আছে তারা মধ্য পথের পরিবর্তে বিপরীত চরমকেই কাম্য গুণ মনে করে বসে। সময় বিশেষে এতে অবশ্য সুফল ঘটে—কারণ এক চরমে গিয়ে আমরা যে ভুল করেছি তা যদি বুঝতে পেরে অন্য চরমের দিকে পা বাড়াই মধ্য পথে আমরা পোঁচে যেতেও পারি. . . যেমন মানুষ বাঁকা কাঠকে সোজা করবার সময় করে"। কিন্তু অচেতন চরমপন্থীরা মধ্য পথকে মনে করে মহা পাপঃ "তারা মধ্য পন্থীদের একে অন্যের দিকে ঠেলে দেয়, ভীরুরা সাহসী লোককে বলে অদম্য, বে-পরওয়া আর বে-পরওয়ারা ওদের বলে ভীরু—অন্য ব্যাপারেও এ চলছে"। তাই আধুনিক রাজনীতিতেও দেখা যায় 'উদারনৈতিক'-দের বলা হয় 'রক্ষণশীল' আর 'প্রজাতন্ত্রী'—আর একথা বলছে স্বয়ং প্রজাতন্ত্রী আর রক্ষণশীলরাই।

দেখা যাচ্ছে এ মধ্য-বিন্দু তত্ত্ব সব রকম গ্রীক-দর্শনেই এক বিশেষ দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলার মূলে সক্রিয়। প্লেটো যখন সমন্বিত কাজকে গুণ বলে অভিহিত করেছেন তখন তাঁর মনেও এ ধারণা ছিল আর সক্রেটিস যখন জ্ঞান আর গুণকে একাত্ম করে দেখেছেন তখন তাঁরও মনে তাই ছিল। সপ্ত জ্ঞানী যখন ডেলফির এপোলো মন্দির-গাত্রে "কোন বাড়াবাড়ি নয়" এ কথাটা ক্ষোদিত করেন তখন থেকেই এ ঐতিহ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠা। সম্ভবত, যেমন নীটসের ধারণা নিজেদের অস্থির-চিত্ততা আর বিনাশ-প্রবৃত্তিকে দমিত রাখার জন্যই হয়তো গ্রীকরা এসব করেছেন। এতে গ্রীকদের—প্রবৃত্তি নিজে তেমন দোষের নয়, বরং পাপ আর পুণ্যের এ হচ্ছে কাঁচা মাল, বাড়াবাড়ি আর অপরিমিতিতে একের জন্য আর সংযম আর সঙ্গতিতে অন্যের, এ বিশ্বাস ও ধারণাকেই প্রতিফলিত করেছে।

কিন্তু আমাদের বাস্তববাদী দার্শনিকটির মতে সোনালী মধ্য-বিন্দুতেও সুখের সব রহস্য নিহিত নেই। কিছুটা পার্থিব সম্পদেরও প্রয়োজন আছে: দারিদ্র্য মানুষকে কৃপণ আর লোভী করে তোলে। সম্পদ দুশ্চিন্তা আর লোভের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে এমন একটা স্বাধীনতা দেয় যা অভিজাত-সুলভ আরাম আর সৌন্দর্যের উৎস। সুখের বাহ্যিক সহায়কদের মধ্যে মহত্তম হচ্ছে বন্ধুত্ব—সত্যই অসুখী-জনের চেয়ে সুখীজনেরই বন্ধুত্বের প্রয়োজন বেশী। কারণ ভাগাভাগি করে ভোগ করলে সুখ হয় বহুগুণীত। সুবিচারের চেয়েও এর গুরুত্ব বেশী, কারণ "মানুষ যখন পরস্পরের বন্ধু হয়ে পড়ে, তখন বিচার হয়ে পড়ে অনাবশ্যক কিন্তু মানুষ ন্যায়বান হলেও বন্ধুত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না—তখনো তা এক বিশেষ নেয়ামৎ।" "বন্ধু হচ্ছে দুই দেহে এক আত্মা।" তথাপি বন্ধুত্ব মানে বুঝতে হবে কয়েকজন বন্ধু, বেশী নয়, "যার অনেক বন্ধু কেউই তার বন্ধু নয়", এবং "যাকে পরিপূর্ণ বন্ধুত্ব বলে সে ভাবে বহুজনের বন্ধু হওয়াই অসম্ভব"। মুহূর্তের তীব্রতার চেয়ে সু-বন্ধুত্বের জন্য প্রয়োজন স্থায়ীত্ব এবং এর জন্য চাই চারিত্রিক দৃঢ়তা। বিচিত্র-বর্ণ বন্ধুত্বের বিনাশের জন্য অস্থির চরিত্রই দায়ী। বন্ধুত্বের জন্য সমতা প্রয়োজন—কৃতজ্ঞতা বন্ধুত্বের বড় পিচ্ছিল ভিৎ। "উপকারীরা সাধারণত যে বস্তু দিয়ে দয়া করেছে তার জন্যই বন্ধুত্ববোধ করে থাকে, ব্যক্তির জন্য নয়। এসব ব্যাপারে একজন ঋণ-দাতা আর একজন ঋণী: সাধারণত এ বোধই অনেককে তৃপ্তি দিয়ে থাকে. . . ঋণীরা চায় ঋণ-দাতারা তাদের পথ থেকে সরে থাকুক অন্যদিকে মহাজনেরা চায় যে খাতকেরা বেঁচে থাকুক।" এরিস্টোটল কিন্তু এ ব্যাখ্যা মানেন না—তাঁর বিশ্বাস উপকারীর সহৃদয়তার কারণ সন্ধান করতে হবে শিল্পীর নিজ শিল্প-কর্মের প্রতি যে ভালোবাসা তার মধ্যে অথবা সন্তানের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের ভালোবাসায়। আমরা যা নিজেরা তৈরী করি, তাকেই আমরা ভালোবাসি।

যদিও সুখের জন্য বাহ্যিক সামগ্রী আর সম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে তবুও তার মূল থেকে যায় আমাদের মনে—পূর্ণ জ্ঞান আর আত্মার পরিচ্ছন্নতায়। বস্তুত ইন্দ্রিয়-সুখ খাঁটি সুখ নয়ঃ ঐ-পথ বৃত্তাকার। যেমন সক্রেটিস সুখবাদীদের স্থূল মতামতকে বলেছেন-আমরা পাঁচড়া হওয়ার জন্যই চুলকাই আর পাঁচড়া চাই চুলকাবার জন্যই! রাজনৈতিক জীবনও সুখের পথ নয়, কারণ ঐ পথে চলতে হয় জনসাধারণের খেয়াল-খুশী মতই আর জনতার মতো অমন অস্থিরমতি দ্বিতীয় কিছু নেই। না, মনের আনন্দই আসল আনন্দ—সত্যের সন্ধান আর সত্যকে পাওয়া থেকে যে আনন্দ একমাত্র সে আনন্দের উপরই রাখতে পারি আমরা আস্থা। "মননশীলতার নিজের গণ্ডীর বাইরে কোন মতলব নেই এবং অধিকতর মননশীল কাজের যে আনন্দ মানুষ তা নিজের মধ্যেই পেয়ে থাকে—আর আত্ম-সম্পূর্ণতা, শ্রান্তিহীনতা এবং বিশ্রাম শক্তি যখন এরই (অর্থাৎ মননশীলের) আয়ত্তে তখন নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ সুখও এ কাজেই (মননশীলতায়) নিহিত।"

তবে এরিস্টোটলের আদর্শ-মানব পরাবিজ্ঞানী নন্। 'খুব কম জিনিষের প্রতি তাঁর আসক্তি বলে তিনি বিনা প্রয়োজনে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েন না কিন্তু সংকটের সময় দ্বিধা করেন না জীবন দিতেও। কারণ তিনি জানেন কোন কোন অবস্থায় বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। তিনি মানুষের উপকার করতে উৎসুক কিন্তু নিজে উপকার গ্রহণ করতে করেন লজ্জাবোধ। উপকার করা শ্রেষ্ঠত্বের আর উপকার গ্রহণ করা বশ্যতার পরিচায়ক। জন-সমক্ষে (ক্ষমতা) প্রদর্শনে তিনি কোন ভূমিকা নেন না—তাঁর পছন্দ-অপছন্দও খোলাখুলি, তাঁর কথা এবং কাজে নেই কোন গোপনীয়তা. . . কারণ মানুষ ও বস্তুর প্রতি তাঁর একটা তাচ্ছিল্য রয়েছে, তাঁর চোখে কিছুই মহান নয় বলে তিনি কখনো প্রশংসায় হন না পঞ্চ-মুখ। নেহাৎ বন্ধু ছাড়া পারেন না কারো সঙ্গে সৌজন্যের সঙ্গে বাস করতে—বেশী সৌজন্য দাসত্বের লক্ষণ। •••কারো প্রতি তাঁর ঈর্ষা নেই, কেউ আঘাত করলেও সে কথা ভুলে যান, যান এড়িয়ে. . . তিনি খুব বাক-প্রিয় নন- - - কেউ তাঁর প্রশংসা করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনা অথবা অন্যদের নিন্দা করা উচিত—এসব নিয়ে তিনি কখনো মাথা ঘামান না। তিনি অন্যদের, এমন কি তাঁর শত্রুদেরও নিন্দা করেন না। তিনি শান্ত-স্বভাব, তাঁর স্বর গম্ভীর, তিনি সংযত-বাক, তাঁর প্রয়োজন সীমিত বলে তাঁর তাড়াহুড়া করারও পড়ে না দরকার। তাঁর ধারণা কোন কিছুই তেমন জরুরি বা অপরিহার্য নয়—তাই কোন কিছুর জন্যই তিনি হয়ে ওঠেন না প্রচণ্ড। উদ্বেগের জন্যই মানুষের কন্ঠস্বরে আসে কর্কশতা আর পদক্ষেপে দেখা দেয় ক্ষীপ্রতা. . . . তিনি জীবনের দুর্ঘটনাকে শালীনতা আর আত্মমর্যাদার সঙ্গেই করেন সহ্য, কৌশলী সৈন্যাধ্যক্ষ যেমন তাঁর পরিমিত সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রের সব চেয়ে অনুকূল স্থানে করেন জমায়েত তিনিও তেমনি অবস্থানুযায়ী গ্রহণ করেন সর্বোত্তম ব্যবস্থা। . . . তিনিই তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আনন্দ পান নিজের ব্যক্তিগত জীবনে। আর মনে করেন পরম শত্রু অমন লোককে যার নেই কোন গুণ বা যোগ্যতা আর যিনি নিঃসঙ্গতাকে করেন ভয়!'

এ হচ্ছে এরিস্টোটলের আদর্শ-মানব।

AMARBOI.COM

৮. রাজনীতি

ক : সাম্যবাদ আর রক্ষণশীলতা

এ রকম আভিজাতিক নীতির পরিণতি স্বভাবতই কঠোর আভিজাতিক রাজনীতি। একজন সম্রাটের শিক্ষক আর রাজকুমারীর স্বামীর কাছ থেকে জনসাধারণের প্রতি, এমন কি বণিক-বুর্জোয়াদের প্রতিও হয়তো খুব বেশী আকর্ষণ আশা করা যায় না: যেখানে আমাদের ধনভাণ্ডার আমাদের দর্শনেরও অবস্থান সেখানে। অধিকন্তু এথেনীয় গণতন্ত্রের বিশৃঙ্খল ও ধ্বংসকর পরিণতি দেখেই এরিস্টোটল সত্য সত্যই রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিলেন—খাঁটি পণ্ডিতের মতো তিনি চেয়েছিলেন শান্তি, নিরাপত্তা আর শৃঙ্খলা। তাঁর বিশ্বাস এখন রাজনৈতিক বাড়াবাড়ির সময় নয়। আমূল পরিবর্তন নিরাপত্তার জন্য এক বিলাস ছাড়া কিছুই নয়—যে জিনিষ আমাদের নিরাপদ-আয়ত্তে তারই শুধু আমরা পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধন করতে সক্ষম। এরিস্টোটল বলেছেন ঃ" "হালকাভাবে আইন কানুনের পরিবর্তন সাধন অত্যন্ত ক্ষতিকর, সামান্য সামান্য ফায়দার জন্য পরিবর্তন সাধন না করে কোন আইন বা শাসকে যদি ত্রুটি লক্ষিত হয় তা হলে সে সম্পর্কে দার্শনিক সহিষ্ণুতা এক্তেয়ার করাই সমীচীন। পরিবর্তনের ফলে যে উপকার হবে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে যদি নাগরিকরা অবাধ্য হতে শেখে।" আইন মেনে চলার অভ্যাস তথা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকখানি রেওয়াজের উপর নির্ভরশীল ঃ "পুরাতন আইন বাদ দিয়ে হালকাভাবে নতুন আইনের প্রবর্তন করলে যে কোন আইনের আসল উদ্দেশ্যকেই দুর্বল করে দেয়া হয়।" যুগের অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা উচিত নয়। সত্যই, এ অগণিত বৎসরে, 'এ সবের' মধ্যে কোন ভালো থাকলে তা অনাবিষ্কৃত থাকতো না।"

"এ সবের" মানে প্লেটোর সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র। এরিস্টোটলের সংগ্রাম এক দিকে প্লেটোর সর্বজনীন বাস্তবের বিরুদ্ধে অন্যদিকে তাঁর রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিপক্ষে। ওস্তাদের আঁকা ছবিতে তিনি অনেক কালো দাগ খুঁজে পেয়েছেন। প্লেটো তাঁর আভভাবক—দার্শনিকদের জন্য যে শিবির-জীবনের অবিরাম সংযোগের ব্যবস্থা করেছেন তা এরিস্টোটলের মনঃপূত ছিল না। এরিস্টোটল যদিও রক্ষণশীল ছিলেন তবুও কিন্তু তিনি সামাজিক যোগ্যতা ও ক্ষমতার চেয়ে ব্যক্তিগত গুণ, ব্যক্তিগত আড়াল অর্থাৎ অব্রু (Privacy) ও স্বাধীনতাকে অধিকতর মূল্যবান মনে করতেন। তিনি নিজের সমসাময়িক সবাইকে ভাই বা বোন আর বয়স্কদের পিতা বা মাতা বলতে রাজি নন্ ঃ সবাই ভাই মানে কেউ-ই ভাই নয়। তিনি মনে করেন ঃ "প্লেটোর নির্দেশানুসারে কারো পুত্র হওয়ার চেয়ে কারো সত্যিকার চাচাতো-মামাতো ভাই হওয়া অনেক ভালো।" যে রাষ্ট্রে স্ত্রী আর সন্তান সর্ব-সাধারণের সেখানে "ভালোবাসা জলীয় হতে বাধ্য. . . যে দুটি গুণ মানুষের শ্রদ্ধা এবং স্নেহকে জাগিয়ে তোলে—তা হচ্ছে বস্তুবিশেষ তোমারই নিজস্ব হওয়া চাই আর সে বোধই তোমার মনে আন্তরিক ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে, প্লেটোকল্পিত রাষ্ট্রে এর কোনটাই টিকে থাকতে পারে না।"

হয়তো অস্পষ্ট অতীতে সাম্যবাদী সমাজের অস্তিত্ব ছিল—যখন পরিবার ছিল একমাত্র রাষ্ট্র আর গো-চারণ আর ভূমি কর্ষণ ছিল একমাত্র জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু "অধিকতর বিভক্ত সামাজিক অবস্থায়" যখন অসম গুরুত্বপূর্ণ কাজে শ্রম বিভাগ মানুষের স্বাভাবিক অসাম্যকে বড় ও সুষ্ঠুতর করে তোলে তখন সাম্যবাদ ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য কারণ ওখানে যোগ্যতর শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের যথাযথ কোন ব্যবস্থাই নেই। কঠোর পরিশ্রমের জন্য লাভের প্রেরণা অত্যাবশ্যক আর মালিকানার প্রেরণা চাই যথাযথ শ্রম, কর্ষণ ও যত্নের জন্য। সব জিনিষের সবাই মালিক হলে কেউই কোন-টার যত্ন নেবে না।" "বেশীর ভাগ মানুষ যার মালিক সব চেয়ে কম নজর দেওয়া হয় তার প্রতি। প্রত্যেকে নিজের জিনিষের কথাই বেশী করে ভাবে—কদাচিৎ ভাবে জন-স্বার্থের কথা।" এবং "এক সঙ্গে বাস করায় বা সকলের সঙ্গে এক জিনিষ পাওয়ায়, বিশেষ করে এজমালী ভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ায় সব সময় রয়েছে বিপদ। সহ-ভ্রমণকারী-দের অংশীদারী (বিপজ্জনক সাম্যবাদী বিয়ের কথা নাই বা বল্লাম) এ বিষয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—দেখা যায় তারা পথেই ঝগড়া বাধিয়ে বসে আর তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই করে কলহ-বিবাদ।"

"মানুষ সহজেই য়ুটোপিয়া বা 'সব পেয়েছির দেশে' বিশ্বাস করে বসে আর অতি সহজে তাদের মনে এ বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে কোন এক আশ্চর্য উপায়ে সব মানুষ পরস্পর ভাই হয়ে যাবে, বিশেষত যখন কেউ বর্তমান দুর্নীতিকে নিন্দা করতে থাকে. . . আর বলে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার জন্যই এসব হচ্ছে। কিন্তু এ সবের মূল অন্যত্র—অর্থাৎ মানব-মনের পাপ-প্রবৃত্তিই এ সবের উৎস।" রাষ্ট্র বিজ্ঞান ত আর মানুষ তৈরী করতে পারে না কিন্তু মানুষের যা স্বভাব সে অনু-সারেই তাকে গ্রহণ করা উচিত।

মানব-স্বভাব, গড়-পড়তা মানুষ দেবতার চেয়ে পশুরই অধিকতর নিকটবর্তী। অধিকাংশ মানুষ স্বভাবতই বোকা আর কুঁড়ে—যে কোন ব্যবস্থায় এরা নিচের দিকেই ডুবতে থাকবে, রাষ্ট্রীয় ভাতা দিয়ে এদের সাহায্য করা মানে "ফুটা কলসিতে পানি ভরা"। এ সব লোককে রাজনৈতিক শাসনে রেখে শিল্প-গঠনে পরিচালিত করা উচিত—ওদের সম্মতিতে সম্ভব হলে ভালো। প্রয়োজন হলে ওদের বিনা সম্মতিতেই করতে হবে। "জন্ম-মুহূর্তেই মানুষ চিহ্নিত হয় কে হবে আদেশ পালক আর কে হবে আদেশ দাতা।" যে মনের চক্ষে দেখতে পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-ই কর্তা বা প্রভু হওয়ার যোগ্য আর যে শুধু গতর খাটাতেই জানে সে স্বভাবতই দাস।" মনের পক্ষে শরীর যেমন প্রভুর পক্ষে দাসও তেমন। শরীরের যেমন মনের আয়ত্তে থাকা উচিত তেমনি—"সব নিম্নদরের মানুষেরও একজন প্রভুর দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত।" "দাস হলো জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন হাতিয়ার আর হাতিয়ার হলো প্রাণ-হীন দাস। হঠাৎ আমাদের কঠিন-হৃদয় দার্শনিকটির মানসে যেন শিল্প-বিপ্লবের সম্ভাবনা ক্ষীণ রশ্মি-রেখার মত প্রতিফলিত হয়েছিল—তাই এক উৎসুক আশা নিয়েই তিনি মুহূর্তের জন্য লিখে বসেছিলেন: "যদি প্রত্যেকটা যন্ত্র নিজ নিজ কাজ করে যায়—অন্যের আদেশ মেনে বা অনুমান করে নিয়ে···যদি মাকু কাপড় বুনে চলে বা বীণা যদি বাদ্য-দণ্ডের স্পর্শেই বাজতে থাকে (তাঁতী বা বাদকের পরিচালন ছাড়াই) তা হলে প্রধান কর্ম-কর্তার কোন সহকারীরই প্রয়োজন হবে না, প্রভুরও লাগবে না দাস।"

এ দর্শনে শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি গ্রীক-অনীহার পরিচয় রয়েছে। আজকের মতো সেদিন এথেন্সে এ সব কাজ এমন জটিল রূপ নেয়নি, তখন নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ চালিত কাজ থেকে কোন কোন শারীরিক পরিশ্রম-জাত শিল্প-ব্যবসায় চালাতে অনেক বেশী বুদ্ধির দরকার হতো। এমন কি কলেজ-অধ্যাপকও (সঙ্কট বিশেষে) যন্ত্র-যানের কারিগরকেও ভাবতেন দেবতা। তখন শারীরিক শ্রমকে শুধু শারীরিক শ্রমই মনে করা হতো আর দর্শনের উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে এরিষ্টোটল তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো আর মনে করতো যে সব লোক মনের অধিকারী নয়, যারা শুধু দাস হওয়া আর দাসত্বেরই উপযোগী ঐ কাজ (অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম) তাদেরই উপযুক্ত। তাঁর বিশ্বাস শারীরিক পরিশ্রম মানুষের মনকে করে দেয় নিস্তেজ আর নিকৃষ্ট। রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য এ মনের না থাকে সময় না থাকে শক্তি। যাদের কিছুটা অবসর আছে সরকার পরিচালনায় তাদেরই কিছু বক্তব্য থাকা উচিত—এরিস্টোটলের কাছে এ ছিল যুক্তিসঙ্গত। "সর্বোত্তম রাষ্ট্র কখনো কারিগরদের নাগরিকত্ব দেবে না। ....থিবিতে একটা আইন ছিল দশ বছর আগে যে ব্যবসায় থেকে অবসর নেয়নি তাকে কোন পদে নিয়োগ করাই হবে না।" এরিস্টোটল বণিক আর অর্থবানদের পর্য্যন্ত দাস বলে অভিহিত করেছেন।

৮—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খুচরো ব্যবসা অস্বাভাবিক....এ হচ্ছে একে অন্য থেকে লাভ করারই একটা ফন্দি। এ ধরনের বিনিময়ের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে—সুদী কারবার, যাতে টাকা দিয়েই করা হয় টাকা লাভ, টাকার এ স্বাভাবিক প্রয়োগ বা ব্যবহার নয়। বিনিময়ের মাধ্যমই টাকার উদ্দেশ্য—সুদের জননী হওয়া নয়। সুদ মানে টাকা থেকেই টাকার জন্মদান.... লাভ করার সব চেয়ে অস্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে এটা।" অর্থ যেন প্রসব না করে। "অর্থনীতির আলোচনা দর্শনের পক্ষে অন্যায় বা অযোগ্য কাজ নয় তবে আর্থিক ব্যাপারে বা অর্থোপার্জনে মগ্ন হওয়া স্বাধীন মানুষের পক্ষে অনুপযুক্ত।"

খ. বিয়ে আর শিক্ষা

মনিবের কাছে দাস, মস্তিষ্ক-জীবির কাছে দৈহিক শ্রম আর (সুসভ্য) গ্রীকের কাছে বর্বর যেমন, পুরুষের কাছে নারীও তেমন। নারী হচ্ছে অসম্পূর্ণ মানুষ—ওদের রেখে দেওয়া হয়েছে বিকাশের নিম্ন ধাপে। স্বভাবতই পুরুষ শ্রেষ্ঠ, নারী নিকৃষ্ট—একজন শাসন করে অন্যজন হয় শাসিত—প্রয়োজনবশতই এ নীতি সব মানবজাতির বেলাতেই প্রযোজ্য। মেয়েদের ইচ্ছা-শক্তিও দুর্বল। ফলে চারিত্রিক স্বাধীনতা বা স্বাধীন পদের তারা অযোগ্য। তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শান্ত গৃহ-জীবন, সেখানে বাহ্যিক ব্যাপারে পুরুষ তার উপর কর্তৃত্ব করলেও গার্হস্থ্য ব্যাপারে সে-ই হতে পারে কর্ত্রী। প্লেটোর 'প্রজাতন্ত্রে' যেমন মেয়েদের করা হয়েছে পুরুষের মত তেমন করা উচিত নয়---বরং (মেয়ে পুরুষে) অনৈক্যকে আরো বাড়ানো উচিত: পৃথকের মতো আকর্ষণীয় আর কি আছে?" "সক্রেটিস যেভাবে মনে করতেন পুরুষ আর মেয়ের সাহস সমান, আসলে তা কিন্তু সত্য নয়। পুরুষের সাহসের পরিচয় আদেশ-দানে আর মেয়েদের সাহসের পরিচয় আদেশ পালনে....যেমন কবি বলেছেন: 'চুপ থাকা মেয়েদেরই গৌরব'।

এরিস্টোটল বোধ করি মনে করেছিলেন মেয়েদের এ আদর্শ দাসত্ব পুরুষের জন্য হবে এক গৌরবজনক কীর্তি—জিহ্বার চেয়ে হাতের রাজ-দণ্ডের উপরই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। মনে হয় পুরুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিধাদানের জন্যই তিনি সাঁইত্রিশ বছরের কাছাকাছি সময়ে বিয়ে করার দিয়েছেন পরামর্শ আর বলেছেন বিয়ে করতে কুড়ি বছরের কাছাকাছি কোন মেয়েকে। কুড়ির কাছাকাছি মেয়ে সাধারণ ধারণায় ত্রিশ বছুরী পুরুষের সমকক্ষ তাই বোধ করি তাঁর বিশ্বাস সাঁইত্রিশ বছরের সুদক্ষ যোদ্ধা নিশ্চয়ই কুড়ি বছুরী মেয়েকে রাখতে পারবে শায়েস্তা। বিয়ের এ গাণিতিক হিসেবের দিকে এরিস্টোটলের আকর্ষণের কারণ বোধ হয় এ যে এ সব দম্পতির প্রজনন ক্ষমতা আর প্রবৃত্তি প্রায় একই সময়ে শেষ হয়ে যাবে। "যদি পুরুষ বা স্ত্রী একজনের প্রজনন ক্ষমতা থাকে আর অন্যের তা হয়ে যায় খতম তা হলে কলহ-বিবাদ অনিবার্য। যখন পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা সাধারণত সত্তরে আর মেয়েদের পঞ্চাশে সীমিত তখন বিয়ের সময় এ সম্পর্কে বয়সের সমতা বিধান উচিত। অল্প বয়সে নারী পুরুষের মিলন সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর: পশুদের মধ্যে দেখা গেছে অল্প বয়স্কদের শাবক আকারে ছোট ও অবিকশিত হয়ে থাকে আর হয়ে থাকে প্রায় মেয়ে।" প্রেমের চেয়ে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনেক বেশী। অধিকন্তু "তাড়াতাড়ি বিয়ে না করলে মেজাজটাও থাকে সংযত, অল্প বয়সে বিয়ে হলে মেয়েরা হয়ে পড়ে বড় অসংযত আর দেহ-মনের গঠনের সময় বিয়ে করে বসলে পুরুষের দৈহিক বিকাশ পায় বাধা।"

যৌবনের খেয়াল খুশীর উপর এ সব ব্যাপার ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়——এ সব রাষ্ট্রের পর্য্যবেক্ষণ ও শাসনাধীন থাকা চাই। রাষ্ট্রই মেয়ে-পুরুষের বিয়ের সর্ব-নিম্ন বয়স, গর্ভসঞ্চারের সর্বোত্তম মৌসুম আর জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করে দেবে—দেওয়া উচিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার যদি অত্যন্ত বেড়ে যায় তা হলে নিষ্ঠুর শিশু-হত্যার বদলে গর্ভপাতের ব্যবস্থা করা ভালো। তবে "জীবন ও চেতনা সঞ্চারের আগেই গর্ভপাত করা সঙ্গত"। অবস্থা ও সম্পদ অনুসারে সব রাষ্ট্রেরই একটা আদর্শ জনসংখ্যা আছে। "যে রাষ্ট্রে জনসংখ্যা অত্যন্ত কম সে রাষ্ট্র কখনো স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না আর জনসংখ্যা যদি মাত্রা-ধিক হয় তা হলে তা রাষ্ট্র না হয়ে হয়ে পড়ে জাতি তখন শাসন-তান্ত্রিক সরকার গঠনই হয়ে পড়ে অসম্ভব—অসম্ভব হয়ে পড়ে জাতীয় আর রাজনৈতিক ঐক্য। দশ হাজারের বেশী লোক-সংখ্যা না হওয়াই ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাও রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত।" সরকার যে রকম শিক্ষা ব্যবস্থাও তার অনুরূপ হলেই শাসনতন্ত্র স্থায়ীত্ব লাভের আনুকূল্য পেয়ে থাকে ....নাগরিকরা যেরকম সরকারের অধীনে বাস করে তার অনুরূপ করেই তাদের গড়ে তোলা চাই।" রাষ্ট্র শাসিত শিক্ষার দ্বারা আমরা মানুষকে শিল্প ও ব্যবসায় থেকে কৃষ্টির দিকে ফেরাতে পারি আর মানুষকে আমরা এভাবে শিক্ষা দিতে পারি যাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রেখেও তার সম্পত্তি দিয়ে সে কিছুটা হিসেব করে জন-কল্যাণ সাধন করতে পারে। "যারা সৎলোক, সম্পত্তির ব্যাপারে 'বন্ধুদের সব জিনিষে সম অধিকার' এ প্রবাদ বাক্য তারা মেনে চলতে সক্ষম।" যাই হোক, সর্বোপরি তরুণ নাগরিকদের আইনের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দিতেই হবে; তা ছাড়া কোন রাষ্ট্রই চলতে পারে না।" এ এক চমৎকার কথা 'যে কখনো আদেশ পালনের শিক্ষা পায়নি সে ভালো সৈন্যাধৈক্ষ্য হতে পারে না কখনো। সৎ-নাগরিক দুই-ই করতে সক্ষম।" এক মাত্র রাষ্ট্রীয় পরিচালিত শিক্ষালয়গুলিই বিচিত্র নৃতাত্বিক গোষ্ঠির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। রাষ্ট্র এক বহুধা ব্যাপার। শিক্ষার দ্বারাই তাকে একই সমাজ ও ঐক্যে মেলাতে হবে। তরুণদের এও শেখানো উচিত, রাষ্ট্র হচ্ছে এক বিরাট নেয়ামৎ, আইন তাকে দিয়ে থাকে স্বাধীনতা আর সামাজিক সংগঠনে নিরাপত্তা। অনেক সময় এসব থেকে যায় অনুপলব্ধ।" নিখুঁত বা পূর্ণতা-প্রাপ্ত মানুষ হচ্ছে সর্বোত্তম জীব কিন্তু যখন সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে তখন তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর হতে পারে না। কারণ সশস্ত্র অন্যায় অত্যন্ত বিপজ্জনক—মানুষ জন্য থেকেই বুদ্ধি আর চারিত্রিক গুণের দ্বারা সুসজ্জিত যা জঘন্যতম উদ্দেশ্যেও করা যায় প্রয়োগ। তাই শুভ-বুদ্ধি-বিবর্জিত মানুষ হচ্ছে এক না-পাক বন্য পশু—পেটুকতা আর লালসায় ভরতি।" একমাত্র সামাজিক শাসনই তাকে করে তুলতে পারে সৎ। কথার ভিতর দিয়েই গড়ে ওঠে সমাজ আর সমাজের ভিতর দিয়ে বুদ্ধি, বুদ্ধির দ্বারা শৃঙ্খলা আর শৃঙ্খলাই গড়ে তোলে সভ্যতা। এ রকম সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রই ব্যক্তির সামনে সহস্র সুযোগ আর বিকাশের পথ দেয় খুলে। যা নিঃসঙ্গ জীবন কখনো দিতে পারে না। "তাই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হলে হয় পশু না হয় হতে হবে দেবতা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বিপ্লব সব সময় এক নির্বুদ্ধিতা : কিছু ভালো করলেও করে অনেক বেশী মন্দ, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিশৃঙ্খলা। যে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংঘটনের উপর প্রত্যেকটা রাজনৈতিক সুফল নির্ভর করে বিপ্লবের ফলে তাই ভেঙে পড়ে। বৈপ্লবিক সংস্কারের প্রত্যক্ষ পরিণাম হয়ত কিছুটা স্বাস্থ্যকর আর তা হিসেব করে দেখা যায় গণে কিন্তু অপ্রত্যক্ষ পরিণাম যা সাধারণতঃ হিসাব করা যায় না তা প্রায় ধ্বংসকর হয়ে থাকে। "যারা মাত্র দু'চারটি কারণ বিবেচনা করে দেখে তাদের পক্ষে রায় দেওয়াটা খুব সহজ।" সামান্যই যাদের ভাবতে হয় তারাই ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারে—নিয়ে থাকে। "খুব তাড়াতাড়ি আশা করে বলে তরুণরা সহজে হয় প্রতারিত।" দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসকে দমন করতে গেলে সংস্কার-পন্থী সরকারেরই ঘটে পতন কারণ পুরোনো অভ্যাস লোকের মনে দীর্ঘ-কাল বেঁচে থাকে। আইনের মতো চরিত্রের বদল অত সহজ সাধ্য নয়। সমাজের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যদি বাঁচিয়ে রাখা যায় তবেই শাসন-তন্ত্র লাভ করতে পারে স্থায়ীত্ব। যে শাসক বিপ্লব পরিহার করতে চায় তার উচিত চরম দারিদ্র্য আর চরম সম্পদ সঞ্চিত হতে না দেওয়া—"প্রায়ই যুদ্ধের ফলেই এ অবস্থা ঘটে থাকে"। জন-সংখ্যা অতিরিক্ত ও বিপজ্জনক-ভাবে ঘন হলে তাঁর উচিত ইংরেজদের মতো ঔপনিবেশিকতাকে উৎ-সাহিত করে একটা নির্গমনের পথ করে দেওয়া আর উচিত ধর্মকে লালন করা আর তার চর্চায় দেওয়া উৎসাহ। বিশেষ করে স্বৈরতন্ত্রী শাসকের পক্ষে—"তিনি যে দেব-পূজায় খুব আন্তরিক তা দেখানো দরকার কারণ জনসাধারণ যদি বুঝতে পারে তাদের শাসকটি খুব ধার্মিক আর দেব-ভক্ত তা হলে তাঁর হাতের অবিচার-উৎপীড়নকেও ওরা তেমন গ্রাহ্য করে না এবং এমন শাসকের বিরুদ্ধে চায় না লিপ্ত হতে কোন রকম ষড়যন্ত্রে—কারণ তাদের বিশ্বাস স্বয়ং দেবতারাই ওঁর পক্ষ হয়ে লড়বেন।"

গ. গণতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্র

ধর্ম, শিক্ষা আর পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রণের যে সব কথা উপরে বলা হলো তাতে প্রচলিত সব রকম সরকারেরই উদ্দেশ্য সফল হবে। সব সরকারই ভাল-মন্দের সংমিশ্রণ—বিভিন্ন অবস্থার প্রয়োজনেই এ সব গৃহীত হয়েছে। মত হিসেবে বলা যেতে পারে এক সর্বোত্তম-জনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে সব রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে দেওয়াই হচ্ছে আদর্শ সরকার। হোমার অতি সত্যকথাই বলেছেন: "বহুজনের শাসন অত্যন্ত মন্দ—একজনকেই তোমাদের শাসক বা প্রভু কর।" এ রকম লোকের হাতে আইন গণ্ডী না হয়ে হবে যন্ত্র বা হাতিয়ার: "কারণ যোগ্যতার খ্যাতি যাদের আছে আইন তাদের জন্য নয়—তারা নিজেরাই ত আইন।" এ সব লোকের জন্য আইন তৈয়ার করতে গেলে হাস্যাস্পদ হতে হয়: তারা হয়ত এন্টিস্থেনিসের গল্পের পশু-সভায় খরগোস যখন তারস্বরে সবার জন্য সম-অধিকারের দাবী জানাচ্ছিল তখন তাকে লক্ষ্য করে সিংহ যেমন বলেছিল: "তোমার নখর কোথায়?" তেমন একটা বিদ্রূপ বান হেনে বসবে!

অতি-ক্ষমতা আর অতি-সৎগুণ সহযোগী নয় বলে বাস্তবে রাজতন্ত্র হচ্ছে সব চেয়ে নিকৃষ্ট। তাই সর্বোত্তম রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে অভিজাততন্ত্র—যোগ্য ও ওয়াকিবহাল কয়েকজনের শাসন। জ্ঞানী আর যোগ্য লোকদের জন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রধান বিষয়গুলি খাস রেখে দিয়ে অধিকাংশের হাতে সরকার চালাবার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না কারণ গভর্ণমেন্ট্ বা সরকার অত্যন্ত জটিল ব্যাপার।

"যেমন চিকিৎসকের বিচার চিকিৎসকের দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয় তেমনি জনসাধারণেরও বিচারের ভার শ্রেষ্ঠ বা অভিজাত শ্রেণীর হাতে থাকাই উচিত—এ নীতি কি নির্বাচনের ব্যাপারেও প্রয়োগ করা যায় না? যারা জ্ঞানী বা জানেশোনে একমাত্র তারাই সঠিক নির্বাচনে সক্ষম: যেমন জ্যামিতির ব্যাপারে জ্যামিতিবিদ্ আর নৌ-চালনার ব্যাপারে নাবিকই মতামত দেওয়ার যথার্থ অধিকারী....কাজেই ম্যাজিষ্ট্রেট বা শাসক নির্বাচন অথবা তাদের তদারকের ভার বহুজনের উপর ন্যস্ত করা সঙ্গত নয়।"

বংশানুক্রমিক অভিজাততন্ত্রের বিপদ হলো তার কোন স্থায়ী অর্থনৈতিক ভিৎ নেই: 'হঠাৎ নবাবের' আবির্ভাব এক চিরকেলে ব্যাপার। আজ হোক কাল হোক তখন রাজনৈতিক পদ যে বেশী মূল্য দিতে সক্ষম তার হাতে চলে যাবেই। "সত্যই এ এক দুঃখের বিষয় আর নিন্দনীয় যে সর্বোচ্চ পদগুলিও কেনা যায়। যে আইন এ রকম নীতিকে সমর্থন করে বলতেই হবে সে আইন যোগ্যতার চেয়ে ধনকেই দিয়ে থাকে বেশী মূল্য—এরকম অবস্থায় সমস্ত রাষ্ট্র হয়ে পড়ে অর্থগৃধ্নু। কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখনই রাষ্ট্রের সব প্রধানরা কোন কিছুকে সম্মানজনক ভাবতে শুরু করে তখন জনসাধারণও তাদেরই অনুকরণ করে থাকে"। (আধুনিক সমাজ-মনস্তত্ত্বের "সম্মান-অনুকরণ" তুঃ) এবং "যেখানে যোগ্যতা প্রথম স্থান পায় না সেখানে খাঁটি অভিজাততন্ত্রের কোন স্থান নেই।"

গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে সচরাচর ধনীকবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ফলে। "ধন-লিপ্সার ফলে শাসক-শ্রেণী সংখ্যায় কমতে শুরু করে (মার্ক্সের "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি" তুঃ) এবং ফলে জনতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর শেষে শাসক গোষ্ঠীকে ঘায়েল করে তারা প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র।" "দরিদ্রের এ শাসনে" কিছু সুবিধা আছে বই কি। "জনতা ব্যক্তিগত-ভাবে যারা বিজ্ঞ তাদের তুলনায় সুবিচারক না হতে পারে কিন্তু সমষ্টি-গতভাবে এরাও ওদের মতই ভালো। অধিকন্তু এমন কিছু শিল্পীও আছেন যাঁদের শিল্প-কর্মের বিচার অ-শিল্পীরাই তাঁদের চেয়ে ভালো করতে পারেন---যেমন কোন ঘর সম্বন্ধে যে ঘর তৈরী করেছে তার চেয়ে বরং যে ঐ ঘরটা ব্যবহার করছে বা যে ওর মালিক সে-ই ভালো বিচার করতে পারবে। ....বাবুর্চির চেয়ে অতিথিই তো ভোজের যোগ্যতর বিচারক।" "অল্প-সংখ্যকের চেয়ে বহু সংখ্যক অনেক বেশী দুর্নীতি-মুক্ত, তারা প্রায় জলের মতই—বেশী জলের তুলনায় অল্প জল অতি সহজে হয়ে পড়ে কলুষিত। ব্যক্তি বিশেষকে যে কোন সময় ক্রোধ বা কোন প্রবৃত্তির তাড়নায় পেয়ে বসতে পারে তখন স্বভাবতই তার বিচার কলুষিত হতে বাধ্য কিন্তু এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে বহু-সংখ্যক লোক একই সঙ্গে প্রবৃত্তির শিকার হবে আর একই মুহূর্তে করে বসবে ভুল"।

তবুও বলতে হবে গণতন্ত্রের চেয়ে অভিজাততন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। কারণ ঐক্য বা সমতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণার উপরই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা: "যারা এক বিষয়ে সমান (যেমন আইনের ব্যাপারে) তারা সব ব্যাপারে সমান এ ভুল ধারণা থেকেই তার উৎপত্তি: মানুষ যখন সমান স্বাধীন —তখন তাদের দাবী হচ্ছে মানুষ সম্পূর্ণভাবে এক ও সমকক্ষ।" ফলে সংখ্যার কাছে এভাবে যোগ্যতাকে দেওয়া হয় বলি। আর সংখ্যার ব্যাপারে ফাঁকি ত চলেই। কারণ সাধারণ মানুষকে সহজেই নেওয়া যায় বিপথে আর ওদের মতামতও ক্ষণভঙ্গুর---তাই ভোট-পত্র বুদ্ধিমানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত। আমাদের জন্য দরকার এ দুয়ের মিলন—অভিজাততন্ত্র আর গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ।

শাসনতান্ত্রিক সরকারে এ শুভমিলন সম্ভব। এটিই যে সর্বোত্তম সরকারের কল্পনা তা নয়—এতে শিক্ষাগত আভিজাত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু এ হচ্ছে সম্ভাব্য সব চেয়ে উত্তম রাষ্ট্র। "আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি অধিকাংশ রাষ্ট্রের জন্য সর্বোত্তম শাসনতন্ত্র কি হতে পারে, অধিকাংশ মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবনই বা কি? কোন বিষয়েই এমন কোন মান নির্ধারণ উচিত নয়। যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, শিক্ষাকে অবস্থা আর স্বভাবের অনুগৃহীত করে না তোলাই ভালো—তবুও আদর্শ রাষ্ট্র আশা হয়েই থাকবে। তা সত্ত্বেও মনে এমন জীবনের ধারণা রাখতে হবে যাতে অধিকাংশ মানুষ অংশ গ্রহণে সক্ষম আর রাখতে হবে এমন সরকারের ধারণা যা সাধারণভাবে প্রায় সব রাষ্ট্রই পারে গ্রহণ করতে।" "শুধু করতে হবে সাধারণভাবে প্রযোজ্য এমন একটা নীতি দিয়েই: "রাষ্ট্রের যে অংশ সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিশ্বাসী অন্য অংশগুলির তুলনায় তাকে তুলতে হবে শক্তিশালী করে।" কিন্তু শক্তি শুধু সংখ্যায়, শুধু সম্পদে বা সামরিক কি রাজনৈতিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না বরং নির্ভর করে এসবের সমন্বিত শক্তির উপর—তাই 'স্বাধীনতা, সম্পদ, সংস্কৃতি, জন্মগত আভিজাত্য এবং সংখ্যাধিক্যকেও বিবেচনায় আনতে হবে—এসবের উপরও রাখতে হবে নজর। এখন কথা হচ্ছে আমাদের শাসনতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থনের জন্য আমরা 'আর্থিক' সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোথায় পাবো? মনে হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীই উত্তম ক্ষেত্র: শাসনতান্ত্রিক সরকার যেমন অভিজাততন্ত্র আর গণতন্ত্রের মধ্য-পন্থা, তেমনি এভাবে এখানে আমরা পাবো সোনালী মধ্য-বিন্দু। সব পদ যদি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে তা হলে আমাদের এ রাষ্ট্র যথেষ্ট গণতান্ত্রিক হবে আর যারা শিক্ষার সব পথ অতিক্রম করে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েছে তাদের ছাড়া এসব পদ যদি অন্যদের নিষিদ্ধ করা হয় তা হলে এ রাষ্ট্র হবে যথেষ্ট অভিজাততান্ত্রিক। আমাদের চিরন্তন রাজনৈতিক সমস্যার প্রতি আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকেই তাকাই না কেন ফিরে ফিরে আমরা একই সিদ্ধান্তেই পৌঁছবো: কোন্ উদ্দেশ্য অনুসরণ করা হবে তা সমাজ বা জাতিকেই ঠিক করতে হবে কিন্তু বিশেষজ্ঞরাই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচন আর প্রয়োগ করবেন (উদ্দেশ্য হাসিলের) উপায়গুলি। নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রসারতা থাকা চাই কিন্তু পদগুলি কঠোরভাবে খাস রাখতে হবে যারা যোগ্যতা-সজ্জিত আর যাদের ভালো করে ঝেড়ে-বেছে নেওয়া হয়েছে শুধু তাদের জন্যই।

৯. সমালোচনা

এ দর্শন সম্বন্ধে আমরা কি বলতে পারি? বোধ হয় উল্লসিত হওয়ার মতো কিছু নয়। এরিস্টোটল সম্বন্ধে খুব উৎসাহী হওয়া কঠিন কারণ তাঁর নিজের পক্ষেও কোন ব্যাপারে উল্লসিত হওয়া সহজ ছিল না। আর একথাও স্মরণীয় যে, "তুমি যদি আমাকে কাঁদাতে চাও তবে নিজে কাঁদো" (হোরেস-Horace)। তাঁর আদর্শই ছিল—কোন কিছুর প্রশংসা না করা বা দেখে বিস্মিত না হওয়া। তাই আমরাও তাঁর বেলায় তাঁর এ নীতি ভঙ্গ করতে ইতস্তত করছি। তাঁর মধ্যে প্লেটোর মতো সংস্কার-উদ্দীপনা অনুপস্থিত—মানবতার প্রতি যে ক্রুদ্ধ ভালোবাসার ফলে মহা আদর্শবাদী (প্লেটো) মানুষকে পর্যন্ত দোষারোপ করতে ছাড়েন নি (তাও তাঁতে দেখা যায় নি)। তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি গুরুর দুঃসাহসিক মৌলিকতা, উচ্চ কল্পনা বা ভ্রান্ত বিশ্বাসের দরাজ ক্ষমতা। তবুও প্লেটোকে অধ্যয়নের পর এরিস্টোটলের শান্ত সংশয়বাদের চেয়ে আমাদের জন্য আরামদায়ক আর কিছুই হতে পারে না।

তাঁর সঙ্গে আমাদের মতভেদ কোথায় তা সংক্ষেপে বলা যাক। লজিক বা যুক্তিবিদ্যার উপর তাঁর অতখানি জোর দেওয়ায় গোড়াতেই আমরা কিছুটা বিব্রত বোধ করি। অনুমান-বাক্যকে তিনি যুক্তির পথে এক বর্ণনা বলেই মনে করেন অথচ এটি শুধু অন্যকে নিজের মতে আনয়নের যুক্তি-নির্মাণেরই একটা বর্ণনা দিয়ে থাকে। তাঁর ধারণা প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তার আর সিদ্ধান্তের অন্বেষণ শুরু অথচ আনুমানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত চিন্তার শুরু এবং তাকে সমর্থনের অন্বেষণ চলে তখন থেকেই আর তা সুষ্ঠুভাবে চলে কোন বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা নিরীক্ষার বিচ্ছিন্ন ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়। এটা ভুলে গেলে বোকামি হবে যে দু'হাজার বছরে এরিস্টোটলের লজিক বা যুক্তিবিদ্যার অতি সামান্য প্রাসঙ্গিকেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু বদল ঘটেছে—ওকাম (Occam), বেকন (Bacon), ওয়েওয়েল (Whewell), মিল (Mill) এবং আরো শত শত পণ্ডিত তাঁর সূর্যে কিছু দাগেরই মাত্র পেয়েছেন সন্ধান। এরিষ্টোটল চিন্তার ক্ষেত্রে যে নতুন শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে তার অত্যাবশ্যক ধারা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা মানব-মনের চিরস্থায়ী কীর্তি হয়েই থাকবে।

সফল কল্প-রূপ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবে এরিস্টোটলের প্রকৃতিবিজ্ঞান ও অজীর্ণ পর্যবেক্ষণ আর বস্তুস্তূপ হয়েই রয়ে গেছে। তাঁর বিশেষ অবদান হচ্ছে সংগ্রহ আর শ্রেণী-বিভাগ তালিকা—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি শ্রেণী-ভাগ চালিয়েছেন আর করেছেন তালিকা প্রস্তুত। এসব পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি পরা-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আসক্তিও চলেছে সামনে: প্রতিটি বিজ্ঞানেই নাক গলিয়েছেন তিনি এবং প্রলুব্ধ হয়েছেন অসম্ভব সব পূর্বানুমানে। এখানেই গ্রীক মনের মস্ত বড় ত্রুটি—এমন কিছুমাত্র সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। অভাব ছিল ঐতিহ্যকে সীমিত ও দৃঢ় করার শিক্ষার—এমন যথেচ্ছ বিচরণ করতো যতসব অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আর ঝাঁপ দিয়ে পড়তো যে কোন মতামত ও সিদ্ধান্তে। তাই গ্রীক দর্শন সক্ষম হয়েছিল এমন সমুত্তীর্ণ শৃঙ্গে আরোহণ করতে অথচ তখন গ্রীক বিজ্ঞান খোঁড়াচ্ছিল পেছনে। এ যুগে আমাদের বিপদ হচ্ছে এর বিপরীত: বিষুবিয়সের লাভার মতই এখন চারদিক থেকে শুধু আনুমানিক সিদ্ধান্ত তালিকার স্রোত আমাদের উপর এসে পড়ছে—অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা স্রোতে পড়ে আমাদের নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ। ঐক্য ও সমন্বয়ী সাধনী চিন্তা ও দর্শনের অভাবে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের বিশৃঙ্খল ও বহু গুণিত তথ্য ভারে আমাদের মন এখন ভারাক্রান্ত। এখন যতদূর সম্ভব আমরা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন।

এরিস্টোটলের নীতি (Ethics) হচ্ছে তাঁর যুক্তি বিদ্যারই এক শাখা আদর্শ জীবন (তাঁর কাছে) খাঁটি অনুমান বাক্যের মতই। উন্নতির কোন প্রেরণা না দিয়ে তিনি দিয়েছেন আমাদের পরিমিতি বোধের এক হাত-বই। একজন প্রাচীন সমালোচক তাঁকে 'পরিমিতি-বোধের' বাড়াবাড়ি বলে উল্লেখ করেছেন। কোন চরমপন্থী হয়ত বলবেন এথিক্স্ বা নীতিমালা হচ্ছে তাবৎ সাহিত্যে অসার উক্তির এক শ্রেষ্ঠ সংকলন আর ইংরেজ বিদ্বেষী এ ভেবে সান্ত্বনা পাবে যে ইংরেজরা নাবালক অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের সাবালক বয়সের সাম্রাজ্যবাদী পাপের জন্য আগাম যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করে থাকে কারণ অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজে নীতিমালার (Ethics) প্রত্যেকটা শব্দ পড়তে তাদেরে বাধ্য করা হয়। আর আমরা এর (এথিক্সের) শুষ্ক পৃষ্ঠাগুলির সঙ্গে আরো কিছু সবুজ 'ঘাসের পাতা' (Leaves of grass) মিশাতে চাই তা হলে এরিস্টোটলের মননশীল আনন্দের সঙ্গে আমরা হুইটমেনের সুখদায়ক ইন্দ্রিয়জ আনন্দেরও কিছু আস্বাদ পাবো। বৃটিশ অভিজাতদের অব্যক্ত সুগঠন, কঠিন সর্বাঙ্গীন যোগ্যতা আর বর্ণহীন গুণরাজি এরিস্টটলীয় অপরিমিত পরিমিতি-বোধের ফল কিনা ভেবে দেখতে ইচ্ছা হয়। ম্যাথুআর্নল্ড বলেছেন, তার সময় অক্সফোর্ড শিক্ষকরা এরিস্টোটলের এথিক্স্‌কে একদম নির্ভুল বলেই মনে করতেন। তিন শ' বছর ধরে এ বই আর 'রাজনীতি' (Politics) বৃটিশ শাসক শ্রেণীর মনের খোরাক জুগিয়ে এসেছে, গড়ে তুলেছে তাদের মন। বোধ হয় এ কারণে বিরাট ও মহৎ কীর্তি অর্জন তাদের পক্ষে হয়েছে সম্ভব এবং এও সুনিশ্চিত যে এর ফলেই তারা হয়েছে এক সুকঠিন আর শীতল যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু এ সবের (অর্থাৎ এরিস্টোটলীয় শিক্ষার) পরিবর্তে এ বিরাট সাম্রাজ্যের কর্তারা যদি প্লেটোর রিপাব্লিকে'র সুপবিত্র উৎসাহ আর গঠনমূলক সত্যাগ্রহের দ্বারা লালিত হতেন তা হলে ফলাফল কি রকম হতো ?

আসল কথা এরিস্টোটলও পুরোপুরি গ্রীক নন্—এথেন্সে আসার আগেই তাঁর সবকিছু স্থির আর গঠিত হয়ে গেছে। তাঁর মধ্যে এথেনীয় কিছুই ছিল না—অতি ব্যস্ত আর অতি উৎসাহ যা এথেন্সকে করে তুলেছিল রাজনৈতিক উত্তেজনাস্থল এবং পরে যা তাকে সমন্বয়ী স্বেচ্ছাচারী হতে করেছিল সহায়তা, এরিস্টোটলে তা ছিল অনুপস্থিত। বাড়াবাড়ি না করার দৈব-বাণী তিনি পুরোপুরিই উপলব্ধি করেছিলেন—চরম বাড়াবাড়িকে ছাঁটাই করে ফেলতে গিয়ে তিনি এত বেশী ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন যে শেষে তাতে আর কিছুই বাকী থাকতো না। বিশৃঙ্খলাকে তিনি এত বেশী ভয় করতেন যে দাসত্বকে ভয় করতেও যেতেন ভুলে। অনির্দিষ্ট পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি এত বেশী ভীরু ছিলেন যে তিনি যে রকম পরিবর্তন হীনতা চাইতেন তাকে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থা বল্লেই চলে। রক্ষণশীলদের যে বিশ্বাস সব স্থায়ী পরিবর্তনই ক্রমান্বয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে আর চরম পরিবর্তনবাদীদের যে ধারণা কোন পরিবর্তনহীনতাই স্থায়ী নয়—হিরাক্লিটদের (ব্যাপক অর্থে স্পার্টার অভিজাত শ্রেণী) এ বোধটুকুও যেন তাঁর ছিল না। তিনি ভুলে গেছেন যে প্লেটোর সাম্যবাদের উদ্দেশ্য সর্বোত্তম। নিস্বার্থ আর নির্লোভ অল্প-সংখ্যক নাগরিকমাত্র। তিনি অবশ্য ভিন্ন পথে প্লেটো নির্দেশিত ফলাফলে এসেই পৌঁছেন যখন বলেন সম্পদ ব্যক্তিগত হলেও যতদূর সম্ভব তাকে সাধারণ কল্যাণে করতে হবে ব্যবহার। তিনি দেখতে পান নি (হয়ত অত অল্প বয়সে তাঁর থেকে ওটা আশা করাও যায় না) যে উৎপাদন-যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত মালি-কানা তখনই সম্ভব, যখন এগুলি সরল আর ব্যক্তিগত ক্রয়-ক্ষমতার নাগালের মধ্যে থাকে কিন্তু যখন এসবের ব্যয় আর জটিলতা পায় বৃদ্ধি তখন তা এক বিপজ্জনক কেন্দ্রীভুত শক্তি আর মালিকানায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং পরিণামে সৃষ্টি হয় এক কৃত্রিম আর বিনাশী অসমতা।

এরিস্টোটলের একক মন পৃথিবীতে যে অত্যদ্ভূত ও প্রভাবশীল চিন্তা-ধারা রেখে গেছে তার কোন তুলনা নেই—তাঁর এ অবদানের তুলনায় আমাদের এ সমালোচনা অতি তুচ্ছ ও অপ্রধান। অন্য কোন চিন্তাবিদ পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে এতখানি অবদান রেখে গেছেন কিনা সন্দেহ। পরবর্তী প্রত্যেক যুগ এরিস্টোটলের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে আর সত্যকে দেখার জন্য ভর করেছে তাঁর কাঁধের উপর। তাঁর কাছ থেকেই বৈজ্ঞানিক প্রেরণা পেয়েছে আলেকজেন্দ্রিয়ার চমৎকার ও বিচিত্র সংস্কৃতি। মধ্যযুগের বর্বরদের জীবনে শৃঙ্খলা আর চিন্তায় নিষ্ঠা এনে ওদের মন গড়ে তুলতে তাঁর অর্গানন (Organon) নিয়েছিল কেন্দ্র-ভূমিকা।। পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁর অন্যান্য লেখাগুলি নেষ্টোরীয় খ্রীষ্টান পণ্ডিতরা সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিল—তার থেকে দশম শতাব্দীতে অনুদিত হয় আরবী আর হিব্রু ভাষায় আবার তার থেকে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ভাষান্ত-রিত হয় ল্যাটিনে। আবেলার্ডে (Abelard) মধ্যযুগীয় ধর্ম ভিত্তিক যে পাণ্ডিত্যের সূচনা তাই থোমাস একিনাসের (Thomas Aquinas) বিশ্বকোষিক সমাপ্তির দিকে নিয়েছে মোড়। ধর্ম যোদ্ধারা (crusaders নিয়ে এসেছিলেন এরিস্টোটলের মূল গ্রন্থের আরো অনেকগুলি নির্ভুল গ্রীক কপি। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কিরা যখন কনস্‌পান্টিনোপোল অবরোধ করে তখন গ্রীক পণ্ডিতেরা পালিয়ে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলো এরিস্টোটলীয় সম্পদ। ধর্মের ব্যাপারে বাইবেল যেমন তেমনি ইউরোপীয় দর্শনের বেলায় এরিস্টোটল রচনাবলী হলো তেমনএক নির্ভুল পাঠ্য—যাতে রয়েছে সব সমস্যার সমাধান ।। ১২১৫ খ্রীস্টাব্দে পোপের প্রতিনিধি প্যারিসে তাঁর রচনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শিক্ষকদের করেছিলেন বারণ। ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নবম জর্জ তাঁর রচনার বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য নিয়োগ করেছিলেন এক কমিশন আর ১২৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যেক খৃস্টীয় স্কুলে তাঁর রচনা পড়ানো করা হলো বাধ্যতামূলক তাঁর মতামত থেকে এতটুকুন এদিক ওদিক হলেই ধর্ম-যাজকরা দিতে লাগলেন শাস্তি। চসার বর্ণনা করেছেন তাঁর এক ছাত্র এ কারণে খুব খুশী যে :

তার বিছানায় এরিস্টোটল আর তাঁর দর্শন সম্বন্ধে
কালো আর লাল কাপড়ে মোড়া রয়েছে কুড়িটি বই।

আর দান্তে নরকের প্রথম বৃত্তেই বলেছেন :

দার্শনিক পরিবারের মাঝখানেই আমি গুরুকে (অর্থাৎ এরিস্টোটলকে) দেখলাম
সবাই তাঁকে প্রশংসা করছেন, সবাই জানাচ্ছেন শ্রদ্ধা।
প্লেটোকেও সেখানে দেখলাম আর দেখলাম
সক্রেটিস অন্য সবাইর চেয়ে বেশী করে
দাঁড়িয়েছেন তাঁর গা ঘেঁষে।

হাজার বছর ধরে স্টেগিরার (এরিস্টোটলের জন্মস্থান) এ সন্তানটিকে লোকে কিভাবে সম্মান জানিয়ে এসেছে তার কিছুটা আভাস রয়েছে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিতে। নতুন নতুন যন্ত্রাবিষ্কার, পর্যবেক্ষণের স্তূপীকৃত জ্ঞান আর সহিষ্ণু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানের পুর্নগঠন সাধন পর্যন্ত বিজ্ঞানের রাজ্যে এরিস্টোটল ছিলেন একচ্ছত্র। ওকাম (Occam) রেমাস (Ramus) থেকে রোজার (Roger) আর ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের হাতে অপরিহার্য সব যন্ত্রপাতি এসে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর একাধিপত্যের ঘটেছে অবসান। মানবজাতির মনীষার উপর এত দীর্ঘকাল ধরে অন্য কোন একক মন শাসন চালাতে পারেনি।

১. শেষ জীবন আর মৃত্যু

ইত্যবসরে আমাদের দার্শনিকের জীবনে দেখা দিয়েছে এমন সব জটিলতা যার সমাধান তাঁর সাধ্যাতীত। এরিস্টোটলের ক্যালিস্থেনিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামে এক ভাইপো আলেকজেণ্ডারকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে অস্বীকার করায় রাজা তাঁকে দিয়েছেন ফাঁসি। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতেই আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে এরিস্টোটলের বেধে গেল খিটিমিটি। এরিস্টোটলের প্রতিবাদের জবাবে রাজা জানিয়ে ছিলেন—এমন কি দার্শনিককে ফাঁসি দেওয়াও তাঁর সার্বভৌমত্বের এক্তেয়ারভুক্ত। অথচ সে সময় এথেনীয়দের বিরুদ্ধে তিনি আলেকজেণ্ডারকে করছিলেন সমর্থন। তিনি নগর-ভিত্তিক স্বদেশ প্রেমের চেয়ে গ্রীক ঐক্যকেই অধিকতর কাম্য মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভুত্ব আর তুচ্ছ বিবাদের অবসান হলেই বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির বিকাশ হবে সহজ। গ্যেটে যেমন নেপোলিয়নকে এখণ্ড-বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল পৃথিবীর এক দার্শনিক ঐক্য সাধক মনে করতেন এরিস্টোটলও তাই ভাবতেন আলেকজেণ্ডারকে। স্বাধীনতার জন্য ক্ষুব্ধ এথেনবাসীরা এরিস্টোটলের বিরুদ্ধে গরজাতে লাগলো এবং আলেকজেণ্ডার যখন এ বিরুদ্ধ নগরের মাঝখানে দার্শনিকের এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করলেন তখন তাদের অসন্তোষ হয়ে উঠল অধিকতর তীব্র। এথিক্স্ বা তাঁর নীতি পড়ে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয় এ গোলমাল আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর এক বিপরীত মূর্তিই আমরা দেখতে পাই—এখানে আমরা তাঁকে মোটেও ঠাণ্ডা আর অমানুষিকভাবে শান্ত মূর্তিতে পাই না বরং দেখতে পাই তাঁর এক যোদ্ধমূর্তি, চারদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও তিনি তাঁর টিটানিক কাজ করে চলেছেন। একাডেমিতে যারা প্লেটোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তারা আর ডিমস্তেনিসের ঝাঁঝালো বক্তৃতার শ্রোতারা এবার তাঁর বিরুদ্ধে লিপ্ত হলো ষড়যন্ত্রে—তারা দাবী জানালো তাঁর মৃত্যু অথবা নির্বাসন।

এ সময় হঠাৎ (খ্রীস্টপূর্ব ৩২৩শে) আলেকজেণ্ডারের হলো মৃত্যু। এক স্বাদেশিক আনন্দে এথেন্স হয়ে উঠলো উন্মত্ত—মেসেডোনীয় দল হলো ক্ষমতাচ্যুত। ঘোষিত হলো এথেনীয় স্বাধীনতা। আলেকজেণ্ডারের স্থলাভিষিক্ত আর এরিস্টোটলের অন্তরঙ্গ বন্ধু এন্টিপেটার (Antipater) বিদ্রোহী নগরের উপর এক অভিযান চালালেন বটে কিন্তু মেসেডোনীয় দলের অধিকাংশই যুদ্ধ না করে গেলো পালিয়ে। ইউরিমেডন (Eurymadon) নামে এক প্রধান পুরোহিত এরিস্টোটলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো যে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন—উপাসনা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ বা বলি দেওয়ায় কোন ফায়দা নেই। এরিস্টোটল দেখলেন যারা সক্রেটিসকে হত্যা করেছিলেন তাদের চেয়েও অনেক বেশী শক্র-ভাবাপন্ন এক উত্তেজিত জনতা আর জুরির উপরই নির্ভর করছে তাঁর ভাগ্য। বিজ্ঞের মতো তিনি এবার নগর ত্যাগ করলেন—যাওয়ার সময় শুধু বল্লেন: দর্শনের বিরুদ্ধে পাপ করার দ্বিতীয় সুযোগ তিনি এথেন্সকে দেবেন না। এটা কিছুমাত্র ভীরুতার লক্ষণ নয় কারণ এথেন্সে সব সময় অভিযুক্তের স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণ করার রেওয়াজ ও অধিকার ছিল। চেলচিসে (Chalcis) পৌঁছার পরই এরিস্টোটল অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডায়োজিনিস লায়েরটিয়াস্ (Diogenes Laertius) বলেছেন—সবকিছু তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে দেখে বৃদ্ধ দার্শনিক অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন এবং হেমলক পান করে বসলেন আত্মহত্যা করে। তবে এ কথা সত্য যে তাঁর এ রোগ আর সারেনি—এথেন্স ছেড়ে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃসঙ্গ এরিস্টোটলের ঘটে মৃত্যু (খৃঃ পূঃ ৩২২)।

সে একই বছর আর একই বাষট্টি বছর বয়সে আলেকজেণ্ডারের প্রধানতম শক্র ডিমস্তেনিস্ ও করলেন বিষ পান। মাত্র বারো মাসের মধ্যে গ্রীস তার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা আর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিককে হারালো। উদীয়মান রোমান সূর্যের প্রভাতী আলোয় গ্রীসের গৌরব এখন হয়ে উঠলো ম্লান। তবে রোমের যা ঐশ্বর্য-আরম্ভর তা হচ্ছে ক্ষমতার জৌলুস—চিন্তার আলোকবর্তিকা নয়। একদিন সে জৌলুসও ক্ষয় হয়ে এলো—ক্ষুদ্র বাতিটি প্রায় নিবেই গেলো। প্রায় হাজার বছর ধরে ইউরোপের মুখের উপর ঝুলে রইল অন্ধকার। সারা পৃথিবী প্রতীক্ষা-উন্মুখ দর্শনের পুনরাবির্ভাবের আশায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

ফ্রান্সিস্ বেকন

১. এরিস্টোটল থেকে রেনেসাঁ

খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে স্পার্টা যখন এথেন্সকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে পরাজিত করে তখনই রাজনৈতিক-ক্ষমতা গ্রীক-দর্শন-শিল্পের জননীর হাত থেকে খসে পড়ে আর এথেনীয় মনে শক্তি-মত্তা আর স্বাধীনতার ঘটে অবক্ষয়। খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৯৯-তে যখন সক্রেটিসকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেয়া হয়; ধরতে গেলে তখনই তাঁর সঙ্গে এথেন্স আত্মারও ঘটে মৃত্যু—শুধু কিছুটা মাত্র অবশিষ্ট রইল তাঁর দাম্ভিক শিষ্য প্লেটোতে। খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৮৮তে মেসেডনিয়া রাজ ফিলিপ্ যখন চায়রোনিয়াতে (Chaironia) এথেনীয়দের পরাজিত করেন আর ঠিক তার তিন বৎসর পরে আলেকজেণ্ডার যখন মহানগরী থিবীস্‌কে করেন ধূলিসাৎ তখনকার গ্রীক গীতি কবি পিণ্ডারের বাড়ীটা রেহাই দিলেও চিন্তায় আর রাষ্ট্র পরিচালনায় এথেনীয় স্বাধীনতার চিরসমাধি ঠেকানো গেলো না। গ্রীক দর্শনের উপর মেসেডনিয়া বাসী এরিস্টোটলের কর্তৃত্ব উত্তরাঞ্চলের অধিকতর নবীন আর সতেজ জাতির নিকট গ্রীসের রাজনৈতিক অধীনতারই ত প্রতিফলন।

খ্রীস্ট-পূর্ব ৩২৩শে আলেকজেণ্ডারের মৃত্যুতে এ অবক্ষয়ের গতি হলো আরো দ্রুত। এরিস্টোটলের সব রকম শিক্ষা সত্ত্বেও বালক সম্রাট যদিও প্রায় বর্বরই থেকে গিয়েছিল তবুও সমৃদ্ধ গ্রীক সংস্কৃতিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন আর স্বপ্ন দেখতেন তাঁর বিজয় বাহিনীর পেছনে পেছনে এ সংস্কৃতিকেও ছড়িয়ে দেবেন প্রাচ্যে। গ্রীক বাণিজ্যের বিকাশ আর সমগ্র এশিয়া মাইনরে গ্রীক ব্যবসা-কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি এ এলাকাকে হেলেনীয় সাম্রাজ্যের এক ঐক্যবদ্ধ অংশে পরিণত করতে অর্থনৈতিক ভিৎ রচনা করেছে। আলেকজেণ্ডার আশা করেছিলেন এসব কর্ম-ব্যস্ত স্থান থেকেই গ্রীক চিন্তা আর গ্রীক-পণ্য আলো ছড়াবে আর ওড়াবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজয় পতাকা। কিন্তু তিনি প্রাচ্য মনের জড়তা আর প্রতিরোধ ক্ষমতার ভুল মূল্যায়ন করেছিলেন—মোটেও গুরুত্ব দেননি প্রাচ্য সংস্কৃতির বিরাট গভীরতাকেও। অত্যন্ত অপরিমেয়, বহু-বিস্তৃত আর প্রায় পূজ্য ঐতিহ্যের গভীরে যে সভ্যতার শিকড় প্রোথিত তার উপর গ্রীকের অপরিপক্ক ও অস্থির সভ্যতা আরোপ করতে পারা সম্ভব, এ মনে করা এ শুধু তারুণ্যেরই এক খেয়ালমাত্র! পরিমাণে এশিয়া এত বড় যে তার কাছে গ্রীসের গুণ সমুদ্রে বারিবিন্দু। এমন কি বিজয় মুহূর্তে আলেকজেণ্ডার নিজেও প্রাচ্য-আত্মার কাছে হয়েছেন পরাজিত (বহু রমণীর মধ্যে) তিনি দেরিয়াসের কন্যাকেও বিবাহ করেন আর গ্রহণ করেন ইরানীয় রাজমুকুট আর রাষ্ট্রীয় পোষাক। রাজার ঐশ্বরিক অধিকার সম্বন্ধে যে প্রাচ্য ধারণা য়ূরোপে তিনিই তা প্রবর্তন করেন—অবশেষে সংশয়বাদী গ্রীসকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে তিনি নিজেকে দেবতা বলেই ঘোষণা করে বসলেন। গ্রীস বিদ্রূপের হাসি হাসলো আর আলেকজেণ্ডার পানাতিশয্যে বরণ করলেন মৃত্যু।

ক্লান্ত-দেহ গ্রীক প্রভুর দেহে এশীয়-আত্মার যে সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশ—তার পেছনে পেছনে তরুণ বিজেতা যোগাযোগের যে সব পথঘাট খুলে দিয়েছিলেন, তার ভিতর দিয়ে প্রাচ্য ধর্মমত ও বিশ্বাস দ্রুত জোয়ারের জলের মতই যেন ঢুকে পড়লো গ্রীসে। বাঁধ ভেঙ্গে প্রাচ্য-চিন্তা-সমুদ্র যেন এবার কিশোর য়ূরোপীয় মনের নিম্নভূমিকে করে দিলে প্লাবিত। হেল্লাজের অধিকতর গরীবদের মধ্যে যে একরকম অতিন্দ্রীয় আর কুসংস্কারী বিশ্বাস শিকড় গেড়েছিল তা এখন আরো সবল হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আর প্রাচ্যসুলভ বৈরাগ্য আর আত্মসমর্পণ হতাশ ও ক্ষয়িত গ্রীসে পেলো অনুকূল ক্ষেত্র। অসংখ্য প্রাচ্য অনুপ্রবেশের মধ্যে ফিনিসীয় বণিক জেনোর (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩১০) বিষয় বৈরাগী দর্শন অন্যতম যা তিনি এথেন্সে প্রচার করেছিলেন। বিষয় বৈরাগ্য আর সুখান্বেষণতত্ত্ব হচ্ছে ঔদাসিন্যের সঙ্গে পরাজয় বরণ করে নেওয়া আর সুখের কোলে বসে পরাজয়ের গ্লানিকে ভুলে থাকার চেষ্টা। এসব মতামতের সাহায্যে অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে বা দাসত্বে বাঁধা থেকেও সুখী হওয়া যায়। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীতে শোপেন হাওয়ারের নৈরাশ্যবাদী প্রাচ্যবৈরাগ্য আর রেনার হতাশ সুখ-বাদ বিচূর্ণ বিপ্লব আর ভগ্ন ফ্রান্সেরই যেন প্রতীক।

৯—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব স্বাভাবিক বিপরীত নৈতিক মতবাদ গ্রীসের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। এসবের সন্ধান মেলে বিষণ্ণ হেরাক্লিটাস আর "হাস্যরত দার্শনিক" ডেমোক্রিটাসে। এমন কি দেখা যায় সক্রেটিসের শিষ্যরাও এন্টিস্থেনিস (Antisthenes) আর এরিস্টিপাসের (Aristippus) নেতৃত্বে দুই দলে ভাগ হয়ে পড়েছিল একদল উচ্ছ্বসিত ছিল বৈরাগ্যে, অন্যদল আনন্দে বা সুখে। তবুও এসব চিন্তাধারাকে প্রায় বৈদেশিকই মনে করা হতো—সাম্রাজ্যিক এ এথেন্স সব দিকে কানই দেয় নি। কিন্তু গ্রীস যখন চায়রনিয়ায় রক্তপাত আর থীবিকে ভস্মে পরিণত হতে দেখলো তখনই তারা ডায়োজিনেসের কথায় কান দিল আর যখন এথেন্সের গৌরব-সূর্য অস্তমিত তখনই তা হলো জেনো আর এপিকিউরাসের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

জেনো (Zeno) তাঁর বৈরাগ্যবাদ দর্শনকে এমন এক প্রাক্তন সিদ্ধান্তের উপর গড়ে তুলেছিলেন যে পরবর্তী সংশয়বাদী চিরিসিপাস (chryrippus) প্রাচ্য অদৃষ্টবাদের সঙ্গে তাঁর কোন তারতম্যই খুঁজে পাননি। জেনো দাসত্বে বিশ্বাস করতেন না। একবার কোন এক অপ-রাধের জন্য তিনি যখন তাঁর এক দাসকে মার দিচ্ছিলেন তখন দাসটি সবিনয়ে এ বলে শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেলো যে, আমার প্রভুর দর্শন অনুসারে আমি যে এ অপরাধ করবো তা ত' চিরকাল থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। উত্তরে সাধুর সব রকম শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জেনোও বল্লেন: সে দর্শন অনুসারেই আমি যে তোমাকে মার লাগাবো তাও তখন থেকে সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। শোপেন হাওয়ার যেমন বিশ্বাস করতেন বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার সংগ্রামের কোন মানে হয় না তেমনি সংশয়বাদিরাও বলতেন—যে জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম এত অসম আর পরাজয় অনিবার্য, সে জীবনের প্রতি দার্শনিক উপেক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার। জয় যদি অসম্ভব বিবেচিত হয় তবে তাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করাই উচিত। কামনার সঙ্গে প্রাপ্তির সমকক্ষতার মধ্যে শান্তি নেই বরং শান্তি আছে প্রাপ্তির স্তরে কামনাকে নিয়ে আসায়। রোমান সংশয়বাদী সেনেকা (Seneca) বলেছেন: "তোমার যা আছে তা যদি তোমার কাছে অপ্রতুল মনে হয় তা হলে সমস্ত পৃথিবী হাতের মুঠোয় ফেলেও তোমার দুঃখ ঘুচবে না।"

এ সবের একটা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া যেন সার্বিক দাবী হয়ে উঠেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এপিকিউরাস যদিও জীবনে নিজেও জেনোর মতই বৈরাগ্যবাদী ছিলেন তবুও এ দাবী যেন তিনিই পূরণ করলেন। ফেনেলন (Fenelon) বলেছেন: "এপিকিউরাস এক মনোরম উদ্যান কিনে নিয়ে নিজেই ওটার কর্ষণ শুরু করেছিলেন। সেখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের স্কুল, নিজের ছাত্রদের নিয়ে সেখানেই অত্যন্ত শান্তি ও নির্ভাবনায় যাপন করতেন জীবন—হাঁটিতে হাঁটিতে, কাজ করতে করতেই ছাত্রদের দিতেন শিক্ষা........তিনি ভদ্র আর সকলের প্রতি ছিলেন অমায়িক। তিনি মনে করতেন দর্শনে মনোনিবেশের চেয়ে মহত্তর কিছুই নেই।" বৈরাগ্য সম্বন্ধে গোড়া থেকে এ ছিল তাঁর বিশ্বাস—তিনি মনে করতেন সুখ, ইন্দ্রিয়জ সুখ বলে কোন কথা নয়; সব সুখই জীবনের ও কর্মের একমাত্র সহজবোধ্য ও স্বাভাবিক লক্ষ্য ও আদর্শ। "প্রকৃতি সব জীবকেই অন্য সব ভালোর চেয়ে নিজের ভালোকে ভালো মনে করার দিকেই নিয়ে যায়"—এমন কি বৈরাগ্যবাদী ও বৈরাগ্যের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম আনন্দ পেয়ে থাকে। "আমরা সুখ পরিহার করব না, তবে নির্বাচন করব।" তাই এপিকিউরাস নিজে (প্রচলিত অর্থে) এপিকিউরীয়ান বা সুখবাদী নন্, তিনি ইন্দ্রিয় সুখের চেয়ে মানসিক সুখেরই করেছেন জয় ঘোষণা। তাঁর মতে সুখের উদ্দেশ্য আত্মার শান্তি আর তৃপ্তি—তাই যে সুখ অন্তরকে উত্তেজিত ও বিচলিত করে তার বিরুদ্ধে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু তাঁর শেষ কথা হচ্ছে প্রচলিত অর্থে তিনি সুখ-সন্ধানী নন, তিনি চান শান্তি, স্বস্তি, মানসিক স্থিরতা, মনের নির্ভরতা কিন্তু এসবই ত জেনোর বৈরাগ্যবাদের প্রায় ধার-ঘেঁষা।

খ্রীস্ট-পূর্ব ১৪৬শে রোমানেরা হেল্লাজ (Hellas) লুন্ঠন করতে এসে দর্শনের ক্ষেত্রে তারা এ দুই বিপরীত মতাবলম্বীদের দেখতে পেয়েছিল—তাদের না ছিল অবসর না ছিল মনে কল্পনা-জাল বিস্তার করার মতো সূক্ষ্মতা, তারা অন্যান্য লুণ্ঠিত বস্তুর সঙ্গে এ সব দর্শনকেও নিয়ে এসেছিল রোমে। বড় বড় সাংগঠনিকরা আর অনিবার্যভাবে দাসেরা ত বটেই, কিছুটা বৈরাগ্যবাদী মনোভাবের হয়ে থাকে: খুব তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীলের পক্ষে প্রভু বা দাস হওয়া বেশ কঠিন। তাই রোমের যে দর্শন তা অনেকখানি জেনোর দর্শনেরই অনুরূপ—সে মার্কাস অরেলিয়াসের (Marcus Aurelius) মতো রাজা বা এপিকৃটেটাসের (Epictetus)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো দাসই হোক। এমন কি লুক্রেটিয়াসও সুখ-বাদ সম্বন্ধে কথা বলতেন সংসার বিরাগীর মতো (যেমন হেনের (Heine) ইংরেজ ও সুখের কথা বলতো দুঃখের সঙ্গে) আর তাঁর এ কঠোর সুখবাদের উপসংহার ঘটেছে আত্মহত্যায়। এপিকিউরাসের অনুকরণে তিনি তাঁর "বস্তুর স্বভাব সম্বন্ধে" নামক মহাকাব্যে সূক্ষ্ম প্রশংসার সাহায্যে সুখের করেছেন নিন্দা। তিনি প্রায় সীজার আর পম্পের (Pompay) সমসাময়িক, ভয় আর বিশৃঙ্খলার মধ্যেই কাটিয়েছেন জীবন। তাঁর অস্থির কলম সব সময় নিরুপদ্রব শান্তির প্রার্থনাই লিখে গেছেন। তিনি ছিলেন কিছুটা ভীরু-আত্মা আর তাঁর যৌবনকাল কেটেছে ধর্মীয় ভয়ের অন্ধকারেই, তাঁর সম্বন্ধে এমন একটা ধারণাই হয়ে থাকে; কারণ তিনি অনবরতই তাঁর পাঠকদের শুনিয়েছেন এখানে ছাড়া অন্য কোথাও নরক নেই আর এপিকিউরাসের উদ্যানের মেঘলোকবাসী ভদ্রজন যারা মানবীয় ব্যাপারে কোন অনধিকার চর্চাই করে না, তারা ছাড়া অন্য কোন দেবতাই নেই।

রোমের অধিবাসীদের মনে তখন স্বর্গ নরকের ধারণা ক্রমবর্ধমান, এ অবস্থায় তিনি করেছিলেন নির্মম জড়বাদের সপক্ষে প্রচার। দেহের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা আর মনের উৎপত্তি। দেহের বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও বাড়তি, রোগের সঙ্গে সঙ্গে রোগ আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও মৃত্যু। পরমাণু স্থান আর নিয়ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই আর সর্বত্র আইনেরও আইন হলো বিবর্তন আর বিলয়।

'কোন কিছুই নেই স্থির, সব চলেছে বয়ে।
খণ্ডের সঙ্গে ঘটে খণ্ডের মিলন এভাবে গড়ে ওঠে বস্তু,
আমরা তখন পাই ওদের পরিচয় আর তখনই দিই নাম।
ক্রমে ক্রমে তারা গলতে থাকে তখন থাকে না আর
আমাদের পরিচিত বস্তু।
পরমাণু থেকে বর্তুলাকার, সূর্যমণ্ডলীকে আমি দেখি
পড়ছে ধীরে অথবা দ্রুত—
দেখি বিধান বা পদ্ধতিসমূহ নিচ্ছে নিজ নিজ রূপ,
এসব বিধান আর সূর্যমণ্ডলীও ধীরে ধীরে
সনাতন বিলুপ্তির পথেই হবে তাড়িত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে পৃথিবী। তোমার সাম্রাজ্য, স্থল-ভূমি আর সমুদ্র—
তোমার তারকা আর যতসব নক্ষত্রপুঞ্জ, যা এভাবে
তাড়িত হয়েই হয়েছে বর্তুলাকার আর ওরা যাবেও
এভাবে শেষ হয়ে।
এসবের মতো তুমিও ঘন্টায় ঘন্টায় যাচ্ছো হয়ে বিলোপ।
কিছুই স্থির থাকে না। তোমার সমুদ্রগুলোও ডুবে যাবে
কোমল অন্ধকারে, ঐ চন্দ্রালোকিত বালুকারাশিও
থাকবে না স্বস্থানে—
সে যায়গায় শ্বেত শষ্যের কর্তৃত স্তূপ নিয়ে দেখা দেবে
অন্য সমুদ্র, অন্য সাগর।

(জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে লুক্রেটিয়াসের মতামতকে এ ভাবে সংক্ষেপ করেছেন মেল্লক (Mallock)।

জ্যোতিষ্কলোকের বিবর্তন আর বিলয়ের সঙ্গে জীবের উৎপত্তি আর বিলুপ্তির কথা যোগ করা যেতে পারে।

'প্রাচীন পৃথিবী বহুরকম বিকটাকারের জন্ম দিতে চেয়েছে—চেয়েছে অদ্ভুত দৃশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করতে......কোন কোনটা পদহীন, কোন কোনটা হস্তহীন, কোনটারি বা মুখ নেই আবার কোনটার নেই চোখ.... এরকম আরো কত বিকটাকারের সৃষ্টিই না পৃথিবী চেয়েছে করতে কিন্তু সবই ব্যর্থ। কারণ প্রকৃতিই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আরোপ করেছে নিষেধ—তারা পারেনি বয়সের কাম্য পুষ্পে পৌঁছতে, পায়নি খাদ্য, পারেনি বিবাহে মিলতে......এ ভাবে খুব সম্ভব বহু জীব গোষ্ঠীর ঘটেছে বিলুপ্তি তারা সন্তান জন্মাতে পারেনি আর রাখতে পারেনি বংশের ধারাবাহিকতা। কারণ আজও যারা বেঁচে আছে, দেখতে পাবে তাদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই সূচনা থেকে রক্ষা পেয়েছে হয় কৌশল না হয় সাহস আর না হয় গতির সাহায্যে। প্রকৃতি যাদেরে এসব অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে নি তারা সহজে অপরের শিকার ও লুটের মালে হয়েছে পরিণত। অবশেষে এভাবে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই তারা হয়ে গেছে লুপ্ত।

ব্যক্তির মত জাতিও ধীরে ধীরে হয় বর্ধিত আর বরণ করে সুনিশ্চিত মৃত্যু : কোন কোন জাতি বুড়ো হয়ে পড়ে কোন কোন জাতি বা হয়ে যায় ক্ষয়—জীবিত সব কিছুর বংশগতিতে পরিবর্তন ঘটে অল্প সময়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে এবং দৌড়-প্রতিযোগিদের মতো তারাও জীবনের গতি তুলে দেয় অপরের হাতে। যুদ্ধ আর অনিবার্য মৃত্যুর বেলায় সবচেয়ে বিজ্ঞতা হচ্ছে: "সবকিছুর প্রতি নির্লিপ্ত শান্ত চিত্তে তাকানো।" এখানে স্পষ্টত পুরোনো পৌত্তলিক জীবনবাদী আনন্দ নিশ্চিহ্ন আর প্রায় বৈদেশিক ভাব-ধারার স্পর্শ ঘটেছে যেন এক ভাঙ্গা বীণায়। এমন নির্লিপ্ত ও প্রকাণ্ড নৈরাশ্যবাদীকে 'সুখবাদী' নাম দেওয়া পরিহাস-প্রিয় ইতিহাসের চরম কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ যদি এপিকিউরাস অনুবর্তীদের মনোভাব হয় তা হলে অরেলিয়াস বা এপিরটেটাসের মতো সুপরিচিত সংশয়বাদীদের উল্লসিত আশাবাদ সম্বন্ধে একবার কল্পনা করে দেখা যেতে পারে। সম্রাটের 'ধ্যান-চিন্তা' যদি না হয় তা হলে দাসদের 'বিতর্ক' তথা Dissertations-এর মতো নৈরাশ্যজনক এমন নিদর্শন কোন সাহিত্যেই বোধ করি নেই, "তোমার পছন্দ মতো কোন কিছু ঘটুক তা চেয়ো না বরং যা যে রকম ঘটে সে ভাবেই ঘটুক তাই চাও, তা হলেই হবে তোমার সমৃদ্ধি।" অবশ্যই এভাবে ভবিষ্যতকে নিজের হুকুমে চালিয়ে বনা যায় বিশ্ব-সম্রাট। কথিত আছে এপিকটেটাসের প্রভু তাঁর প্রতি অবিরত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন--একদিন সময় কাটাবার জন্যই প্রভু এপিকটেটাসের পা ধরে মোচড়াতে লাগলেন। এপিকটেটাস অতি শান্তস্বরে বল্লেন: "এভাবে মোচড়াতে থাকলে আপনি আমার পাটাই ভেঙ্গে ফেলবেন।" তাতেও প্রভু ক্ষান্ত হলেন না, অবশেষে পা ভেঙ্গেই গেলো। তখন এপিক্‌টেটাস মৃদুস্বরে বল্লেন: "আমি কি আগেই বলিনি আপনি আমার পাটাই ভেঙ্গে ফেলবেন?" তবুও এ দর্শনে ডস্টভয়স্কির শান্তিবাদীদের স্থির সাহসের মতো কিছুটা মিস্টিক মাহাত্ম্য হয়তো রয়েছে। "কখনো বলো না এ জিনিসটা আমি হারিয়েছি, বলবে ওটা আমি ফেরৎ দিয়েছি। তোমার বাচ্চাটার কি মৃত্যু হয়েছে?—না, ওকে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। তোমার স্ত্রীর কি মৃত্যু হয়েছে? না, সে ফেরৎ গেছে। তুমি কি তোমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছ? ওটাকেও কি ফেরৎ দেওয়া হয় নি?" এসব কথায় আমরা যেন খ্রীস্টীয় ধর্ম আর তার নির্ভিক শহীদদের আভাস পাই। বস্তুত মনে হয় খ্রীস্টীয় আত্ম ত্যাগের নীতিবোধ, প্রায় সাম্যবাদী ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত খ্রীস্টীয় রাজনৈতিক আদর্শ এবং পরিণামে সারা বিশ্ব যে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে পরকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধে এ সব খ্রীস্টীয় ধর্মমত আর সংশয়বাদীদের টুকরো টুকরো মতামত একইভাবে স্রোতের যেন ভাসমান অংশ। গ্রেসো-রোমান আত্মার পৌত্ত-লিকতা এপিক্‌টেটাসে যেন হারিয়ে গিয়েছিল আর নতুন বিশ্বাস গ্রহণের জন্য তা ছিল প্রস্তুত। তাঁর বই আদি খ্রীষ্টিয় গির্জা ধর্মীয় পাঠ্য-গ্রন্থ হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। এসব বিতর্ক বা Dissartations আর অরেলিয়াসের ধ্যান চিন্তা বা Meditation-এর পরের পদক্ষেপ হলো The Imitations of Christ বা যিশুর পথানুসরণ। (৮এর পৃষ্ঠায় দর্শনের সমগোত্র সহযোগীদের তালিকা দ্রষ্টব্য)। ইত্যবসরে ইতিহাসের পটভূমি বদলে গিয়ে নতুন সব দৃশ্য দেখা দিচ্ছিল। লুক্রেটিয়াস এক চমৎকার অনুচ্ছেদে রোমান রাষ্ট্রে ভূমির উর্বরা শক্তি কমে যাওয়ার ফলে কিভাবে কৃষির পতন ঘটেছে তা বর্ণনা করেছেন। কারণ যাই হোক রোম যে এখন দরিদ্র হয়ে পড়েছে, তার সব সংগঠন যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আর ক্ষমতা গৌরব যে ক্ষয় হয়ে গিয়ে এক ঔদাসিন্যে পরিণত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সব রকম জৌলুস হারিয়ে নগরগুলো হয়ে পড়েছে নিষ্প্রভ আভ্যন্তরীণ গ্রামের মতো, বে-মেরামতে রাস্তাগুলো হয়ে গেছে নষ্ট, তাতে নেই আগের মতো বেচা-কেনার কর্ম-চাঞ্চল্য। সীমান্তের পরপার থেকে অশিক্ষিত অথচ তেজিয়ান জার্মেনরা দলে দলে এসে অল্পসংখ্যক রোমান শিক্ষিত পরিবারদের জন্য সংখ্যার বৃদ্ধিকে দিলে হারিয়ে—পৌত্তলিক সংস্কৃতি নতি স্বীকার করলো প্রাচ্য ধর্ম-মতের কাছে এবং প্রায় অলক্ষ্যেই সাম্রাজ্য চলে গেলো পোপের হাতে।

বিগত শতাব্দীগুলোতে যে গীর্জাকে সম্রাটেরাই প্রতিপালন করে এসেছেন এখন সে গির্জাই ধীরে ধীরে সম্রাটদের সব ক্ষমতা কুক্ষীগত করে দ্রুত বেড়ে উঠলো সংখ্যায়, ক্ষমতা এবং প্রভাবের পরিধিতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তা প্রায় তৃতীয়াংশ য়ুরোপের মালিক হয়ে বসলো আর ধনী দরিদ্রের বদান্যতায় তার ভাণ্ডার হয়ে উঠলো স্ফীত। প্রায় হাজার বছর ধরে এভাবে একটা মহাদেশের সব জাতিকে এক বৈচিত্রহীন ধর্ম মতের মায়াজালে তা ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল—তার আগে বা পরে কখনো কোন সংগঠন এত বহু বিস্তৃত ও এত শান্তিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু গির্জা বা চার্চ ভাবলো এ ঐক্য বজায় রাখতে হলে কালের ক্ষয় ও পরিবর্তনের অতীত এক সাধারণ অলৌকিক ধর্ম বিশ্বাস চাই, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলেই মধ্যযুগের য়ূরোপের কিশোর মনে জড়িয়ে দেওয়া হলো সুনির্দিষ্ট ও অনড় ধর্ম বিশ্বাসের (dogma) এক খোলস। এ খোলসের সংকীর্ণতার মধ্যে থেকেই মধ্যযুগীয় পণ্ডিতি দর্শনকে বিশ্বাস থেকে যুক্তিতে আবার যুক্তি থেকে বিশ্বাসে আনা-গোনা করতে হয়েছে—সে এক সমালোচনা-হীন পূর্ব নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছার হতবুদ্ধিজনক চক্রাবর্তন শুধু। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব ও য়ূহুদীদের দ্বারা এরিস্টোটলের অনুবাদের ফলে সারা খ্রীস্টীয় জগৎ চমকিত ও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে কিন্তু গির্জাশক্তি তখনো এরিস্টোটলকে ও থোমাস্ একিনাস (Thomas Aquinas) ও অন্যান্যদের সহায়তায় মধ্যযুগীয় ধর্ম-শাস্ত্রে রূপান্তরিত করতে সক্ষম ছিল। ফলে জ্ঞানের পরিবর্তে লাভ হলো বুদ্ধির সূক্ষ্মতা। বেকনের ভাষায়: "বুদ্ধি আর মানুষের মন যখন পদার্থের উপর কাজ করে, উপাদান অনুসারেই তার কাজ হতে থাকে এবং তাতেই তার সীমা কিন্তু নিজের উপরই যখন ওটা কাজ করতে শুরু করে, যেমন মাকড়শা তার জাল বোনে, তখন তার আর শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না—সত্যই তাতে বিদ্যার এক মাকড়সার জালই বোনা হয় যার সূতার সূক্ষ্মতা আর কারুকার্য প্রশংসনীয় বটে কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না, নাগাল পাওয়া যায় না কোন সার-বস্তুর।" সহসা বা বিলম্বে য়ূরোপের মেধা এ খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বেই।

সহস্র বছরের কর্ষণের ফলে জমি আবার পুষ্পিত হয়ে উঠেছে: উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত দ্রব্যের ব্যবসা হয়ে পড়েছে আবশ্যিক—ব্যবসার আড়াআড়ি তথা লেন দেনের পথেই গড়ে ওঠে বড় বড় নগর। তখন মানুষ সংস্কৃতি আর সভ্যতা পুনর্গঠনে পরস্পর করে সহযোগিতা। ধর্ম-যুদ্ধ (The Crusade) খুলে দিলে প্রাচ্যের দ্বার—বৈরাগ্য আর অনড় বিশ্বাসকে প্রায় খতম করে দিলে বিলাস আর ধর্ম-বিরুদ্ধ মতামত স্রোতের মতো ঢুকে পড়ে। এতদিন দামী চামড়ায় লেখা হতো বলে লেখাপড়া শুধু পুরোহিতদের মধ্যেই ছিল সীমিত এখন মিসর থেকে সস্তা কাগজ এসে তার অবসান ঘটালো। মুদ্রণ শিল্প এত দিন ছিল সস্তা মাধ্যমের প্রতীক্ষায়, মুক্ত বিস্ফোরকের মত এবার তা যেন ফেটে পড়লো এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দিলে তার ধ্বংসকর আর স্বচ্ছ প্রভাব। দুঃসাহসী নাবিকরা এখন কম্পাসের সাহায্যে দুর্গম সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক অজ্ঞতাই করে দিলে দূর, দূরবীক্ষণের সাহায্যে ধৈর্যশীল পর্যবেক্ষকরা অনড় বিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়ে মানুষের জন্য জয় করে আনলে আকাশ সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান। এখানে সেখানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আশ্রমে, দেবালয়ে আর নির্জন বিশ্রাম স্থানে তর্ক ছেড়ে মানুষ এখন প্রবৃত্ত হলো সন্ধানে। ভুল পথে হলেও স্থূল ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে চেষ্টা করার আল-কেমিই ত কালক্রমে রসায়ন-বিজ্ঞানে হয়েছে রূপান্তরিত, নক্ষত্রবিদ্যার অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে জ্যোতিষ-বিজ্ঞান আর সবাক পশু-পাখীর গল্প থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে জীববিদ্যা। এ জাগরণের শুরু রোজার বেকন থেকে (Roger Becon মৃত্যু ১২৯৪), তা বাড়তে থাকে অসীম প্রতিভাবান লিওনার্ডো (Leonardo ১৪৫২–১৫১৯–) থেকে এবং তা পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে কোপারনিকাস (১৪৭৩–১৫৪৩) আর গেলেলিয়োর (১৫৬৪–১৬৪২) জ্যোর্তিবিজ্ঞানে, চুম্বক আর বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গিলবার্টের (১৫৪৪—১৬০৩) গবেষণায়, ভেসেলিয়াসের (Vesalius ১৫১৪—১৫৬৪) শারীর অবস্থান (Anatomy আর হার্ভের (Harvey ১৫৭৮—১৬৫৭) রক্ত চলাচল সম্বন্ধে গবেষণায়। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভয় এলো কমে, অজ্ঞাতকে পূজা করার চেয়ে তাকে জয় করার চিন্তাই এখন বেশী করে জাগলো মানুষের মনে। প্রত্যেকটা মহৎ প্রেরণাই নব বিশ্বাসে হয়ে উঠলো উদ্দীপিত, ভেঙ্গে পড়লো সব রকম বাধা বন্ধন—মানুষ যে কত কি করতে পারে তার আর কোন সীমারেখা রইল না এখন। "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরীগুলী এখন স্বর্গীয় দেহের মতো বিশ্বের চারদিকে দেবে পাড়ি–এ হচ্ছে আমাদের যুগের সবচেয়ে বড় আনন্দ। সত্য সত্যই যেন এ যুগ বলতে পারে 'আরো দূরে'—প্রাচীনদের 'আর যেয়ো না'র পরিবর্তে এ যেন হয় এ যুগের মটো বা আদর্শ" (বেকন)। এ ছিল অর্জন, আশা ও শক্তি মত্তার যুগ, প্রতিক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল নতুন সূচনা আর উদ্যম। যুগ যেন প্রতীক্ষা করছিল এক কন্ঠস্বরের—তার আশা ও সংকল্পকে যে আত্মা দিতে পারে সমন্বয়িত রূপ তেমন এক আত্মার। তিনিই ফ্রান্সিস বেকন "বর্তমান যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী মনের অধিকারী, যিনি এক ঘন্টা বাজিয়েই যেন সমস্ত বুদ্ধি আর মেধাকে সম্মিলিত করে তুল্লেন" (E. J. Pane)। তিনি ঘোষণা করলেন য়ূরোপের এখন বয়স হয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. ফ্রান্সিস বেকনের রাজনৈতিক জীবন

পিতা স্যার নিকোলাস বেকনের লণ্ডন বাসস্থান ইয়র্ক হাউসে, ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী বেকন জন্মগ্রহণ করেন। স্যার নিকোলাস এলিজাবেথের প্রথম বিশ বৎসর রাজত্বকালে রাজকীয় বড় সীলের (great seal) রক্ষক ছিলেন। মেকলে লিখেছেন "পুত্রের খ্যাতি পিতার খ্যাতিকে ছায়াচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু স্যার নিকোলাসও অসাধারণ লোক ছিলেন।" ঠিকই মনে করা হয়, প্রতিভা হচ্ছে এক চূড়া, যাকে গড়ে তোলে পরিবার মেধাবীদের মধ্যস্থতায়, আবার প্রতিভার সন্তান-সন্ততিরাও মেধাবীদের মাধ্যমে পরিণত হয় মাঝারি মানুষে। তখনকার ইংলণ্ডের অন্যতম প্রতাপশালী, রাণী এলিজাবেথের প্রধান কোষাধ্যক্ষ স্যার উইলিয়াম সিসিল তথা লর্ড বার্গলের (Burghley শ্যালিকা লেডি এনি কুক ছিলেন বেকনের মা। তাঁর বাবা (অর্থাৎ বেকনের মাতামহ) ছিলেন রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের প্রধান শিক্ষক—বেকনের মাও ছিলেন ভাষাবিদ আর শাস্ত্রজ্ঞ আর অবলীলাক্রমে পাদ্রিদের সঙ্গে গ্রীক ভাষায় করতেন পত্রালাপ। তিনি নিজেই পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং পুত্রকে শিক্ষাদান ব্যাপারে কোন কষ্টকেই মনে করতেন না কষ্ট বলে।

কিন্তু বেকন-প্রতিভার আসল ধাত্রী ছিল এলিজাবেথীয় ইংলেণ্ড—আধুনিক জাতিসমূহের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতির স্বর্ণ-যুগ। আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা বাণিজ্য এখন ভূমধ্যসাগর থেকে পরিচালিত হলো আটলান্টিকের দিকে—উন্নত হয়ে উঠলো স্পেন, ফ্রান্স, হোলাণ্ড আর ইংলেণ্ড প্রভৃতি আটলান্টিক সাগরীয় দেশসমূহ। এতকাল অর্ধেক যূরোপের প্রাচ্য-দেশীয় বানিজ্যের লেন-দেন আর যাতায়াতের বন্দর হিসেবে বাণিজ্যিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইটালীর যে প্রাধান্য ছিল তা এখন এসব দেশের হাতে গেলো চলে। এ পরিবর্তেনের ফলে রেনেসাঁস অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ ও ফ্লোরেন্স, রোম, মিলান আর ভেনিস থেকে মাদ্রিদ, প্যারিস, আমাস্টরডাম এবং লণ্ডনে হলো স্থানান্তরিত। ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে স্পেনীয় নৌ-বাহিনীর ধ্বংসের পর, ইংলণ্ডের বাণিজ্য সব সমুদ্রেই পড়লো ছড়িয়ে আভ্যন্তরিণ শিল্পোন্নতিতে তার শহরগুলো হলো উজ্জীবিত, তার নাবিকরা সারা গোলার্ধে চক্কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে লাগলো আর তার নৌ-চালকরা জয় করলো আমেরিকা। তার সাহিত্য পুষ্পিত হয়ে উঠলো স্পেন্সারের কাব্য আর সীড্নির গদ্যে—তার রঙ্গ মঞ্চ প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠলো শেক্সপিয়র আর মার্লোর নাটকে। বেন জনসন আর আরো শত শত লেখনীর ফলে। এমন যুগে এবং এমন দেশে যার মনে কণা মাত্রও অঙ্কুর রয়েছে সে পুষ্পিত না হয়ে পারে না।

বারো বছর বয়সে বেকনকে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পাঠানো হয়। ওখানে তিনি তিন বছর ছিলেন—অবশেষে ওখানকার পাঠ্য আর পঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিরক্ত হয়ে ত্যাগ করেন ঐ কলেজ। ফিরে আসেন পাকা-পোক্ত এরিস্টোটল মতবিরোধী হয়ে—সংকল্প করলেন দর্শনকে এবার আরো উর্বর পথে নিয়ে যাবেন, নিছক পাণ্ডিত্য তর্ক-বিতর্কের হাত থেকে উদ্ধার করে দর্শনকে ফেরাবেন মানব-কল্যাণ বৃদ্ধি আর তার উজ্জ্বল্য সাধনের দিকে। যদিও বেকন তখন ষোল বছরের বালক মাত্র, তবুও ফ্রান্সে ইংলণ্ডের রাজ-দূতের অফিসে তাঁকে দেওয়া হলো এক চাকুরি—লাভ-লোকসান সম্বন্ধে বহু বিবেচনার পর চাকুরি তিনি গ্রহণ করলেন। দার্শনিক থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত হওয়ার এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'প্রকৃতির ব্যাখ্যা' (The Interpretation of Nature) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনা করেছেন। এ এক অপরিহার্য অনুচ্ছেদ: 'আমি বিশ্বাস করি মানব জাতির সেবার জন্যই আমার জন্ম, তাই কোন্ কর্তব্য সাধন করলে সর্বসাধারণের মঙ্গল হবে তাই আমার বিবেচ্য, জল বায়ুর মতো তা যেন সকলের করায়ত্ত হয় আর তার উপর যেন সকলের সব অধিকার বর্তে। তাই আমার আত্মজিজ্ঞাসা: কিসে মানব জাতির সবচেয়ে ভালো হবে আর কি কাজের উপযোগী করে প্রকৃতি আমাকে তৈয়ের করেছে? কিন্তু সন্ধান করে পেলাম—নানা কলা-শিল্পের সন্ধান আর বিকাশ, আর নানা আবিষ্কার যা মানুষের জীবনে নিয়ে আসে সভ্যতা, এসবের চেয়ে মূল্যবান কোন কাজই নেই। তদুপরি যদি কেউ এটুকুও সাফল্য অর্জন করে—যত প্রয়োজনীয়ই হোক কোন একটা বিশেষ আবিষ্কার সাধন না করে, একটা জ্যোতিষ্ককেও যদি ও প্রজ্জ্বলিত করতে পারে যা প্রথম উদয়ে মানুষের বর্তমান আবিষ্কারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমা-সরহদকে হয়তো সামান্যই আলোকিত করতে সক্ষম কিন্তু পরে যখন আরো উপরে উঠবে তখন আনাচে কানাচের সব অন্ধকার দূর করে সর্বত্র আলোকোজ্জ্বল করে তুলবে—মনে হয় এমন আবিষ্কারককে সারা বিশ্বের উপর মানুষের সত্যকার সাম্রাজ্য বিস্তারকারী বলে অভিহিত করা উচিত--তিনি মানব স্বাধীনতার ধ্বজাধারী এবং যে অত্যাবশ্যকের শৃঙ্খলে মানুষ এখন বাঁধা তিনি গণ্য হবেন তার নির্মূলকারী বলে। এ ছাড়া আমি আমার নিজের স্বভাবেই দেখতে পাই সত্য-সন্ধানের একটি বিশেষ প্রবণতা। এ জন্য যে অত্যাবশ্যক সার্বিক গুণের দরকার অর্থাৎ একই সঙ্গে সাদৃশ্য ধরতে পারা আর ধৈর্য ও একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে সূক্ষ্ম পার্থক্যের ছায়াটুকুও অনুধাবন করতে সক্ষম হওয়া, তাও আমার রয়েছে। গবেষণার উদগ্র বাসনা, ত্বরিত সিদ্ধান্তে না পৌঁচার ধৈর্য, আনন্দের সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করতে পারা, সতর্কতার সঙ্গে কোন বিষয়ে সম্মত হওয়া, সাগ্রহে ভুল ধারণা সংশোধন করে নেওয়া আর সাবধানী পরিশ্রমের দ্বারা নিজের চিন্তাকে সাজাতে পারা—এসব আবশ্যকীয় গুণও আমার রয়েছে। নতুনত্বের কোন মোহ আমার নেই, তেমনি নেই পুরাতত্ত্বের প্রতি অন্ধ অনুরাগ। সব রকমের প্রতারণাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। এসব কারণে আমি মনে করি আমার স্বভাব আর প্রকৃতির সঙ্গে সত্যের কিছুটা আত্মীয়তা আর সম্পর্ক আছেই।

কিন্তু আমার জন্ম আর যেভাবে আমি লালিত পালিত হয়েছি, পেয়েছি শিক্ষা তার নির্দেশ হচ্ছে রাজনীতির, দর্শনের নয়। শৈশব থেকে আমার মন হয়েছে রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিত—তরুণদের যেমন হয়ে থাকে মাঝে মাঝে অন্যের মতামতে আমার মনও হয়ে থাকে বিচলিত। আমারও মনে হয় দেশের প্রতি আমারও বিশেষ কর্তব্য রয়েছে, যার স্থান জীবনের আরো বহুবিধ কর্তব্যের উপর। অবশেষে আমার ধারণা যদি রাষ্ট্রের কোন সম্মানজনক পদে আমি অধিষ্ঠিত হই তা হলে আমার উদ্দিষ্ট কর্ম-সাধনে আমি হয়ত প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আর সাহায্য আরো সহজেই পেয়ে যাবো। এ উদ্দেশ্যেই আমি গ্রহণ করলাম রাজনীতি।'

স্যার নিকোলাস বেকন হঠাৎ মারা গেলেন ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর ইচ্ছা ছিল ফ্রান্সিসকোর জন্য একটা জমিদারির ব্যবস্থা করে যাবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মৃত্যু বাধ সাধলো। তরুণ কূটনীতিবিদ ইংলণ্ডে দ্রুত ফিরে এসে দেখলেন আঠারো বছর বয়সে এখন তিনি শুধু পিতৃহীন নন। কপর্দক হীনও। যুগের বিলাস-জীবনে তিনি অভ্যস্ত এখন বাধ্য হয়ে সাদাসিধা জীবন যাপন করতে রীতিমতো কষ্ট হতে লাগলো তাঁর। আইনের ব্যবসা শুরু করলেন আর আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর প্রভাবশীল আত্মীয়দের কাছে বিনীত অনুরোধ জানালেন তাঁকে কোন রাজনৈতিক পদে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর রচনার সৌন্দর্য, বলিষ্ঠতা আর তাঁর প্রমাণিত যোগ্যতা সত্ত্বেও এসব অনুনয় বিনয়পত্রে কোন ফলই হলো না। হয়তো বেকন নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র খাটো ধারণা না করে ঐ সব পদ তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য বলেই মনে করে নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর নিকট আত্মীয় লর্ড বারগ্লে কোন ফলপ্রসূ সাড়াই দিলেন না। হয়তো এসব চিঠিতে মহামান্য লর্ডের প্রতি তাঁর অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আনুগত্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল। প্রেম আর রাজনীতিতে সব উজার করে দিয়ে ফেলা উচিত নয়—সব সময় দেবে কিন্তু কোন সময় সবটুকু দেবে না। কৃতজ্ঞতা লালিত হয় প্রতীক্ষার দ্বারা।

কেউ তাঁকে উপরে তুলে ধরেনি তবুও পরিমাণে বেকন উপরে উঠে ছিলেন কিন্তু প্রতি পদক্ষেপের জন্য দিতে হয়েছে বহু বছর। ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পার্লিয়ামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন টাউনটন (Taunton) থেকে—তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তারা বার বারই তাঁকে নির্বাচিত করেছিল। বিতর্কে তাঁর ভাষণ হতো সংক্ষিপ্ত অথচ স্বচ্ছ—তিনি ছিলেন বাগ্মিতাহীন বাগ্মী। বেন জনসন বলেছেন: "তাঁর মতো কারো বক্তৃতা এত সুন্দর, স্বচ্ছ, এত সংহত ও অর্থবহ ছিল না, তাঁর বক্তৃতায় স্থান পেত না কোন ফাঁকা বুলি বা অলস উক্তি। তাঁর বক্তৃতার সর্বত্র ফুটে উঠতো তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের শালীনতা। তাঁর বক্তৃতার সময় শ্রোতারা চেপে রাখতো কাশি তাকাতো না এদিক ওদিক। বক্তৃতায় যেন চালাতেন কর্তৃত্ব........শ্রোতাদের ভালোবাসা ছিল তাঁর করায়ত্ত। শ্রোতাদের একমাত্র ভয় পাছে তিনি না বক্তৃতা শেষ করে বসেন।" সত্যই ঈর্ষা করার মতো বক্তা বটে।

একজন শক্তিশালী বন্ধু—এসেক্সের আর্ল (Earl of Essex) যিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন রাণী এলিজাবেথের নিষ্ফল প্রেমের এবং সে কারণে পরে ঘৃণার পাত্র। বেকনের প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে উঠলেন। হয়তো তাঁর জন্য কোন রাজনৈতিক পদ জোগাড় করতে না পারার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে টুইকেনহেমে এক চমৎকার জমিদারীই তিনি বেকনকে দিয়ে দিলেন। সত্যই এ এক মূল্যবান উপহার—সকলে মনে করলো এবার বেকন জীবনের জন্যই এসেক্সের সঙ্গে বাঁধা পড়লেন কিন্তু অচিরে তা প্রমাণিত হলো ভুল। কয়েক বছর পর এসেক্স রাণী এলিজাবেথকে সিংহাসন-চ্যুত করে আর একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার ষড়যন্ত্রে হলেন লিপ্ত। বেকন তাঁর উপকারীর কাছে চিঠির পর চিঠি লিখে এ রকম রাজোদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। এসেক্স যখন তাতেও ক্ষান্ত হলো না তখন বেকন এসেক্সকে সাবধান করে দিয়ে জানিয়ে দিলেন প্রয়োজন হলে তিনি বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে রাণীর প্রতি তাঁর আনুগত্যকেই প্রাধান্য দেবেন। এসেক্সের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো—তিনি বন্দী হলেন। বেকন এসেক্সের জন্য রাণীর কাছে অনবরত এত অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন যে শেষকালে রাণী তাঁকে বলে দিলেন: "অন্য বিষয়ে আলাপ করুন।" এসেক্সকে যখন সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হলো তখন তিনি কিছু সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করে আবার লণ্ডনের দিকে অভিযান চালালেন আর চেষ্টা করলেন জনগণকে বিদ্রোহী করে তুলতে রাণীর বিরুদ্ধে। বেকন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এরি মধ্যে কিন্তু বেকনকে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগে স্থান। এসেক্সকে যখন আবার গ্রেপ্তার করে রাজোদ্রোহের অপরাধে বিচারে সোপর্দ করা হলো তখন বেকন তাঁর এ চিরবিশ্বস্ত বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[১] এসেক্স দোষী প্রমাণিত

---

১. বেকন-চরিত্রের এ দিক সম্বন্ধে শত শত বই লেখা হয়েছে। পোপ (pope) বলেছেন তিনি হচ্ছেন "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ আর সবচেয়ে হীন"- মেকলের 'রচনাবলীতে' তাঁর বিরুদ্ধে প্রচুর লেখা আছে, এবোট রচিত 'ফ্রান্সিস বেকন' নামক বইতেও অনেককিছু উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথাই তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়ঃ "নিজের জন্য যে বিজ্ঞতা তা হচ্ছে ইঁদুরের বিজ্ঞতা, যে ভাবেই হোক ঘর পড়ার আগে ইঁদুর ঘর ছেড়ে পালাবেই"। তার সপক্ষে লিখেছেন স্পেডিং (Spedding) "ফ্রান্সিস বেকনের জীবন আর যুদ্ধ" আর "সমালোচকের সঙ্গে কয়েক সন্ধ্যা বই দুটাতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেন আর তাঁকে দেওয়া হলো মৃত্যু দণ্ড। বিচারে বেকন যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তার জন্য কিছুকালের জন্য তিনি হারালেন জনপ্রিয়তা—এখন থেকে তাঁকে এমন সব শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে হলো যে যারা সুযোগ খুঁজছিল তাঁকে শেষ করে দেওয়ার। অতিরিক্ত উচ্চাকাংক্ষার জন্য তিনি পাচ্ছিলেন না বিশ্রাম, সব সময় ছিলেন অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট আর আয়ের তুলনায় সব সময় বছর দু'বছর আগাম খরচ করে বসতেন। খরচের বেলায় অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন লোক দেখানো ব্যাপারটিই ছিল তাঁর এক পলিশি বা চাতুর্য। ৪৫ বছর বয়সে তিনি যখন বিয়ে করলেন তখন বিয়েতে যা ঝাঁকজমক আর ব্যয়বহুল আড়ম্বর করলেন তাতে খরচের বহর প্রাপ্য যৌতুককেও ছাড়িয়ে গেলো অথচ এ যৌতুকই ছিল মহিলাটির প্রধান আকর্ষণ। ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে ঋণের দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। তা সত্ত্বেও তাঁর অগ্রগমনে বাধা পড়লো না। তাঁর যোগ্যতা আর অশেষ জ্ঞানের জন্য তাঁকে সব গুরুত্বপূর্ণ কমিটিরই মূল্যবান সদস্য বিবেচনা করা হতো—ক্রমশঃ সব রকম উচ্চপদেরই দ্বার তাঁর সামনে যেতে লাগলো খুলে—১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে নিযুক্ত করা হলো সলিসিটার জেনারেল, ১৬১৩-তে তিনি হলেন এটর্নী জেনারেল আর অবশেষে ১৬১৮-তে ৫৭ বৎসর বয়সে তিনি হয়ে গেলেন লর্ড চ্যান্সেলার।

৩. প্রবন্ধাবলী

বেকনের পদোন্নতিতে মনে হয় প্লেটোর দার্শনিক রাজার স্বপ্নই যেন বাস্তবায়িত হলো। কারণ এক এক পা করে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতায় আরোহণের সাথে সাথে তিনি দর্শনেরও চূড়ায় আরোহণ করছিলেন। এমন অশান্ত রাজনৈতিক কলকোলাহলের মধ্যে থেকেও এত বিরাট পাণ্ডিত্য আর এতখানি সাহিত্যিক সাফল্য সত্যই অবিশ্বাস্য মনে হয়। তাঁর মটোইছিল লোক-চক্ষুর অন্তরালের জীবনই ব্যক্তি বিশেষের শ্রেষ্ঠজীবন। তিনি নিজেই যেন ঠিক করতে পারতেন না তিনি কি কর্মের না চিন্তার জীবন বেশী পছন্দ করেন। সেনেকার মতো তিনি দার্শনিক আর রাজনীতিবিদ দুই-ই হতে চাইতেন যদিও মনে মনে সন্দেহও তাঁর কম ছিল না দুই-ই হতে চাইলে তাঁর অর্জন আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফল্য কম হবেই। তিনি লিখেছেন : "এটা বলা কঠিন সক্রিয় জীবনের সঙ্গে ধ্যানের জীবনকে মিশাতে গেলে অথবা সম্পূর্ণভাবে যদি ধ্যানের জীবনে ডুবে থাকা যায় তা হলে মন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে কি না কিম্বা তাতে জন্মে কি না কোন বাধা।" তিনি মনে করতেন শুধু পড়া-শোনা লক্ষ্য হতে পারে না আর তাতে আয়ত্ত হয় না বিজ্ঞতা, আর যে জ্ঞান প্রয়োগ করা হয় না বাস্তবে তা স্রেফ ফ্যাকাশে এক কেতাবী আত্মম্ভরিতা। "পড়া-শোনায় অতি মাত্রায় সময় ব্যয় করাও কুড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া, বিদ্যাকে অতি মাত্রায় ভূষণ হিসেবে ব্যবহার করাও একরকম ছলনা মাত্র, ঐসবের বিধান মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে পণ্ডিতেরা পেয়ে থাকে আনন্দ........চতুর লোকেরা লেখাপড়াকে নিন্দা করে, সরল লোকেরা প্রশংসা করে আর ব্যবহার করে জ্ঞানীরা। কারণ তারা (অর্থাৎ জ্ঞানের কথা) নিজেরা নিজেদের ব্যবহার শিক্ষা দেয় না, লেখাপড়ার বাইরে, তার উর্ধ্বে জ্ঞানের স্থান, তা অর্জিত হয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা।" এ একটি নতুন সুর যা পণ্ডিতন্মন্যতার সমাপ্তি চিহ্নিত করছে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ আর ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কহীন যে পণ্ডিতী তার চেয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে অভিজ্ঞতা আর ফলের উপর যা ইংরেজ-দর্শনের বিশিষ্টতা এবং যার পরিণতি প্রয়োগবাদে। এ কথার এ অর্থ নয় যে, এখন থেকে বেকনের বইপুস্তক আর চিন্তার প্রতি আকর্ষণ কিছুমাত্র কমে এসেছিল—বরং তাঁর এ মন্তব্য সক্রেটিসের কথাই মনে করিয়ে দেয়—"দর্শন ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে চাই না"। অবশেষে নিজের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে : "আমি এমন এক মানুষ যে সাহিত্য ছাড়া আর কিছুরই যোগ্য নয় কিন্তু নিয়তি যাকে নিয়ে গেছে তার প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতার বিরুদ্ধে কর্মময় জীবনে।" তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম ছিল "জ্ঞানের প্রশংসা"—তাতে দর্শন সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে এভাবে :

'মনের প্রতিই আমার সব প্রশংসা উৎসর্গিত হবে। মনই তো মানুষ আর জ্ঞান হচ্ছে মন—মানুষ যা জানে তাতেই তার পরিচয়। স্নেহের আনন্দ কি ইন্দ্রিয়জ আনন্দের চেয়ে অনেক বড় নয়? আর স্নেহের আনন্দের চেয়ে মননের আনন্দ কি শ্রেষ্ঠতর নয়? শুধু সত্য আর স্বাভাবিক আনন্দের মধ্যে পরিতোষ নেই। এটা কি সত্য নয় জ্ঞানই একমাত্র দূর করতে পারে মনের সব চাঞ্চল্য? আমরা নেই বলে কত জিনিষেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না কল্পনা করে থাকি? যা, তা নয় তেমন কত জিনিষকেই আমরা কাম্য আর মূল্যবান মনে করি? ব্যর্থ কল্পনা, বে-আন্দাজি মূল্যবান মনে করা—এসবই মনকে ভুলের মেঘে আচ্ছন্ন করে অকারণ চাঞ্চল্যের ঝড় সৃষ্টি করে বসে। এমন কোন আনন্দ কি নেই যা মনকে বিশৃঙ্খল বস্তুরাশির উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারে, যেখানে মানুষের ভুল আর প্রকৃতির শৃঙ্খলার সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায়? শুধু কি আনন্দের দৃশ্যই আছে আর আবিষ্কারের অনুপস্থিত? শুধু সন্তোষ, কিছুমাত্র উপকারী নয়? আমরা কি শুধু প্রকৃতির দোকান-ঘরের সৌন্দর্যই দেখবো প্রকৃতির ভাণ্ডার-ঘরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই করব না? সত্য কি বন্ধ্যা, নিষ্ফলা? আমরা কি তার দ্বারা উপযুক্ত ফল পেতে পারি না, পারি না তার অফুরন্ত পণ্য দিয়ে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে?'

তাঁর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ফসল তাঁর প্রবন্ধাবলী (Essays) যা রচিত হয়েছে ১৫৯৭ থেকে ১৬২৩-এর মধ্যে, তাতেও দেখা যায় তিনি তখনো দর্শন আর রাজনীতির যুগ্ম প্রেমে দ্বিধা-খণ্ডিত। তাঁর 'সম্মান আর খ্যাতি' নামক প্রবন্ধে দেখা যায় তিনি সব সম্মান রাজনৈতিক আর সাফল্যকেই দিয়েছেন—সাহিত্য আর দর্শনের জন্য কিছুই বাকি রাখেননি।

কিন্তু 'সত্য' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন: "সত্যান্বেষণ মানে সত্যের সঙ্গে প্রেমে পড়া, তার প্রতি অনুরাগ নিবেদন করা, সত্যের জ্ঞান মানে সত্যের প্রশংসা করা, সত্যে বিশ্বাস ন্যস্ত করা মানে তাকে উপভোগ করা—এ হচ্ছে মানব-স্বভাবের সর্বপ্রধান মঙ্গল।" বইতে "আমরা জ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ করি আর কর্মে আহাম্মকদের সঙ্গে।" অবশ্য যদি আমরা জানি কিভাবে বই নির্বাচন করতে হয়। এক প্রসিদ্ধ অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন: "কোন কোন বইর একটু স্বাদ গ্রহণ করে দেখতে হয়, কোন কোনটা গিলে খেতে হয় আর কোন কোনটা চিবিয়ে হজম করতে হয়।" নিঃসন্দেহে এ কয় শ্রেণীর গ্রন্থ-কালির অজস্র স্রোত যে মহাসমুদ্র সৃষ্টি করছে যাতে প্রত্যহ এ পৃথিবী স্নান করছে, বিষাক্ত হচ্ছে, ডুবে মরছে তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। সত্যই 'প্রবন্ধাবলী" অতি স্বল্প সংখ্যক বইয়ের অন্যতম যা চিবিয়ে হজম করার দাবী রাখে। এতটুকুন বাসনে এতখানি মাংস এমন চমৎকারভাবে রেঁধে খোশবায়িত করে পরিবেশন করতে খুব কদাচিৎ দেখা যায়। কোমল গদি নির্মাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেকনের পছন্দ নয়—একটি শব্দের অকারণ ব্যবহারও তাঁর অপছন্দ—একটিমাত্র বাক-ভংগীতেই তিনি দিয়ে থাকেন আমাদের অফুরন্ত সম্পদ। এ 'প্রবন্ধাবলী'র প্রত্যেকটা প্রবন্ধে মাত্র দু'এক পৃষ্ঠায় জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে এক পরিপক্ব মনের সূক্ষ্ম স্বচ্ছতা পেয়েছে রূপ। তাঁর বিষয়বস্তু না প্রকাশ ভংগী শ্রেষ্ঠতর তা বলা মুস্কিল—শেক্সপিয়রের কাব্যের ভাষার মতই তাঁর গদ্য অনুপম। টেকিটাসের (Tacitus) রচনা-শৈলীর মতই তা যেমন সংহত তেমনি প্রাঞ্জল—অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন বাক্-রীতি ও বাক্যাংশ অনুসরণের ফলেই তাঁর ভাষায় দেখা দিয়েছে সংক্ষিপ্ততা। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগে যে প্রাচুর্য তা এলিজা-বেথীয় যুগেরই লক্ষণ আর তাতে প্রতিফলিত হয়েছে রেনেসাঁসের জীবন-জোয়ার। তাঁর মতো এমন অর্থ ও সার-গর্ভ উপমা প্রয়োগের দ্বিতীয় নজির ইংরেজি সাহিত্যে নেই বল্লেই চলে। বরং এসবের অতি প্রাচুর্য তাঁর রচনাশৈলীর একটা ত্রুটিও বলা যায়—অলঙ্কার, রূপক আর সং-কেতের এমন অপরিমিত প্রয়োগ আমাদের স্নায়ুর উপর যেন মারতে থাকে চাবুক আর ক্লান্ত করে ছাড়ে শেষে। 'প্রবন্ধাবলী' যেন খুব ভারী আর মূল্যবান খাবার যা এক সঙ্গে বেশী খেয়ে হজম করা যায় না তবে এক সঙ্গে চার পাঁচটা নিঃসন্দেহে ইংরেজি সাহিত্যের সর্বোত্তম মননশীল খাদ্য।

জ্ঞানের এ নির্যাস থেকে আমরা কি গ্রহণ করতে পারি? মধ্যযুগীয় দার্শনিক রেওয়াজ ছেড়ে বেকন যে খোলাখুলিভাবে 'সুখবাদী' নীতি মেনে নিয়েছিলেন সর্বাগ্রে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি হয় আকৃষ্ট। "দার্শনিক অগ্রগতি, 'যা তুমি পছন্দ করবে না তার ব্যবহার করো না, পেতে চেয়ো না যা তুমি ভয় করবে না'—মনে হয় এক দুর্বল, ভীরু আর ভীত মনেরই অভিব্যক্তি। সত্যই মনে হয় অধিকাংশ দার্শনিকই সন্দেহপ্রবণ—তাঁদের মতামত প্রয়োজনীয় বস্তুর স্বভাবের চেয়ে মানবজাতি সম্বন্ধেই যেন বেশী সতর্ক। ফলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে যে প্রতিকার তারা বাৎলায় তাতে বরং মৃত্যু-ভয় যায় আরো বেড়ে। কারণ মৃত্যুর জন্য তারা মানুষের মনকে অতি সামান্যই শিক্ষিত ও তৈয়রী করে তোলে—আত্মরক্ষার উপায় যেখানে নেই সেখানে শত্রুকে অতিরিক্ত ভয়ঙ্কর করে চিত্রিত করলে আত্মরক্ষা হয়ে পড়ে আরো অসম্ভব।" বৈরাগ্যবাদীদের আত্মদমনের চেয়ে স্বাস্থ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষে ক্ষতিকর আর কিছুই নেই—বৈরাগ্য বা নিস্পৃহা যেখানে অকাল মৃত্যু নিয়ে আসে সেখানে দীর্ঘজীবী হওয়ার আবশ্যক কি? উপরন্তু এ এক অসম্ভব দর্শন—কারণ প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করবেই। "স্বভাব প্রায়ই গুপ্ত থাকে, শুধু সময় সময় বেরিয়ে আসে, কদাচিৎ হয় নির্বাপিত। বল-প্রয়োগে স্বভাব প্রত্যাবর্তন করে আরো ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে, মতামত আর বিতর্ক স্বভাবকে কিছুটা অনাগ্রহী করতে পারে শুধু কিন্তু একমাত্র অভ্যাসই স্বভাবকে বদলাতে অথবা দমাতে সক্ষম......কিন্তু কেউ যেন স্বভাবের বিজয়কে বেশী দূর বিশ্বাস করে না বসে-কারণ স্বভাব দীর্ঘকাল সমাধিস্থ হয়ে থাকে বটে কিন্তু সুযোগ বা প্রলোভন এলেই ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে, যেমন—ঈশপের (Aesop) গল্পে এক বিড়ালকে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করার পরও দেখা যেতো কখন একটা ইঁদুর তার সামনে দিয়ে দৌড়ে যাবে সে প্রতীক্ষায় টেবিলের ধারে গম্ভীর মুখে বসে থাকতে। তাই মানুষের উচিত সম্পূর্ণভাবে এসব সুযোগ পরিহার করে চলা অথবা তাতে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়া যা মনে আর কোন সাড়াই জাগাবে না।" বেকন মনে করতেন শারীরিক সংযমে যেমন অভ্যস্ত হওয়া উচিত তেমনি অভ্যস্ত হওয়া উচিত মাত্রাধিক্যেও—তা না হলে সামান্য বাড়াবাড়িতেই খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। (তাই যে খুব পরিচ্ছন্ন আর সহজপাচ্য খাবারে অভ্যস্ত হঠাৎ ভুলে বা বাধ্য হয়ে তার যদি একটু ব্যতিক্রম ঘটে তখন সে রীতিমতো বেসামাল হয়ে পড়ে)। তবুও "অতি ভোজনের চেয়ে বৈচিত্র্যই ভালো" কারণ "তরুণ বয়সের স্বভাব-শক্তি অনেক আতিশয্যকে ডিঙিয়ে যেতে পারে যা বয়স কালেও ঋণ হয়ে থাকে" একমাত্র প্রবীণতাই দিয়ে থাকে যৌবনের মূল্য। উদ্যান হচ্ছে স্বাস্থ্যের রাজপথ—জেনেসিস্ (Genesis) প্রণেতার সঙ্গে বেকনও এ বিষয়ে একমত: "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রথম রচনা উদ্যান" আর ভল্টেয়ারের অনুসরণে আমাদেরও উচিত বাড়ির পশ্চাদভূমি কর্ষণ করা।

তাঁর 'প্রবন্ধাবলী'তে যে নৈতিক দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তা অনেকখানি মেকিয়াভেলি—খ্রীস্টিয় মোটেও নয়—যার প্রতি তিনি সুচতুর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। "আমরা মেকিয়াভেল ও অনুরূপ লেখক-দের কাছে বাধিত, যাঁরা প্রকাশ্যে ও অকুণ্ঠিত ভাষায় যা করা উচিত তা না বলে সত্য সত্যই মানুষ যা করে থাকে তাই বলে দিয়েছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ পাপের স্বরূপ জানা না থাকলে সর্পের বিজ্ঞতা আর ঘুঘুর নিরীহতার শরিক হওয়া সম্ভব নয়—আর তা ছাড়া পুণ্যও থেকে যায় অনির্দিষ্ট ও অনাবৃত।" ইটালিতে একটা বড়ড অকরুণ প্রবাদ চলতি আছে—"লোকটা এত ভালো যে, ও কোন কিছুর জন্যই ভালো নয়"। বেকন যা প্রচার করতেন তা প্রয়োগও করতেন বাস্তবে আর সাধুতার সঙ্গে পরিমিত কপটতা মিশাবার পরামর্শ দিতেন এ ভেবে যে, খাদ মিশালেই নিখুঁত ও নরম ধাতুদ্রব্য টেকসই হয়! তিনি পরিপূর্ণ আর বৈচিত্র্যময় জীবন করতেন পছন্দ—যা কিছু মানুষের মনকে প্রসারিত ও গভীর করে আর যা মনকে শক্ত আর ধারালো করে তেমন সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত এ তিনি বিশ্বাস করতেন। শুধু ভাবুক জীবন তাঁর পছন্দ ছিল না। গ্যেটের মতো তিনিও যে জ্ঞান কর্মে বাস্তবায়িত হয় না তাকে তাচ্ছিল্য করতেন—"মানুষের জানা উচিত জীবনের রঙ্গমঞ্চে শুধু দেবতা আর ফেরেস্তাদেরই দর্শক হওয়া শোভা পায়।"

রাজাদের মতো তাঁর কাছেও ধর্ম ছিল অনেকখানি স্বদেশপ্রেমমূলক। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার নাস্তিক্যের অভিযোগ হয়েছে তোলা তবুও দেখা যায় তাঁর সমগ্র দর্শনের প্রবণতা হচ্ছে যুক্তিবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে—তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাসের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। "কোন একটা মন-ছাড়া এ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এ বিশ্বাস করার চেয়ে আমি বরং সব রকম গল্প কিম্বদন্তী আর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত পুরা কাহিনী বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। ....সামান্য দর্শন-জ্ঞানই মানুষকে নাস্তিক করে তোলে কিন্তু গভীর দর্শন-জ্ঞান মানুষের মনকে নিয়ে যায় ধর্মের দিকে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় কারণের দিকে যখন মানুষের মন তাকিয়ে দেখে তখন সাময়িকভাবে তাতেই সে বাঁধা পড়ে-এগিয়ে যায় না সামনে কিন্তু যখন সে কার্য কারণের শৃঙ্খল, পারস্পরিক সংযোগ ও সম্মিলন দেখতে পায় তখন ঈশ্বরের দিকে উড্ডয়ন ছাড়া তার গতি থাকে না।" অনেক দলাদলিতেও ধর্মের প্রতি উপেক্ষা ঘটে থাকে। "ধর্মে অনেক দল ও সম্প্রদায় সৃষ্টির ফলেও নাস্তিক্যের সৃষ্টি হয়—একটা দল দু'ভাগ হলে দু'দিকেই গোঁড়ামি বেড়ে যায় কিন্তু বহু ভাগ বা দল নিয়ে আসে নাস্তিক্য.......অবশেষে পাণ্ডিত্য, বিশেষ করে শান্তি আর সমৃদ্ধি (অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসবে নাস্তিক্য পায় প্রশ্রয়)। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট আর বিপদ মানুষের মনকে করে তোলে অধিকতর ধর্ম-মুখীন।"

কিন্তু শাস্ত্র বা নীতিকথায় বেকনের মূল্য তেমন নয় যেমন মনস্তত্ত্বে। তিনি মানব স্বভাবের এক নির্ভুল ও অপ্রতারিত বিশ্লেষক—সব হৃদয়েই তিনি হেনেছেন তাঁর সন্ধানী শর। প্রাচীনতম নীরস বিষয়েও তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবেই মৌলিক। "বিবাহিত জনের চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম দিনেই সাত বছর আয়ু বেড়ে যায়।" "অনেক সময় দেখা যায় বদ স্বামীরাই ভালো স্ত্রী পেয়ে থাকে।" (বেকন নিজে কিন্তু ব্যতিক্রম)। "একক অবিবাহিত জীবন গির্জাওয়ালাদের জন্যই ভালো, যেখানে সর্বাগ্রে একটা ডোবা ভরতি করতে হয়, বদান্যতার জলে সেখানে অন্য মাটিভিজানো সম্ভবপর হয় না........যার স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততি আছে সে নিজেকে বন্ধক রেখেছে ভাগ্যের হাতে কারণ তারা ভালো কি মন্দ যে কোন বড় উদ্যোগের বাধাস্বরূপ।" মনে হয় বেকন এত বেশী কঠোরভাবে কর্মব্যস্ত থাকতেন যে, তিনি প্রেম-ভালোবাসা চর্চার সময়ই পাননি—বোধ হয় কখনো গভীরভাবে তা অনুভবও করেননি।

"এ প্রবৃত্তির বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়......প্রেমিক প্রেমিকা সম্বন্ধে যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কোন দাম্ভিক লোকও নিজের সম্বন্ধে কখনো তেমন অসম্ভব কল্পনা করে না......এ যাবৎ কোন মহৎ ও সার্থক লোককে (কি প্রাচীন কি আধুনিক যুগে) প্রেমের নামে পাগল হতে দেখা যায়নি, এতে বুঝা যায় যে মহৎ ভাবনা ও বিরাট ব্যবসা এ দুর্বল প্রবৃত্তিকে পরিহার করে চলে।"

তিনি প্রেমের চেয়ে বন্ধুত্বকে অধিক মূল্যবান মনে করতেন, যদিও বন্ধুত্ব সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন সংশয়শীল। "দুনিয়ায় বন্ধুত্ব বলে তেমন কিছু নেই—সমকক্ষদের মধ্যে তার অভাব আরো বেশী—জাহির করতে বা বাড়িয়ে দেখানোতেই যা অভ্যস্ত। বড় আর ছোটর মধ্যে তা ঘটে বটে কিন্তু তাতে একের ভাগ্য অন্যকে করে গ্রাস.... বন্ধুত্বের প্রধান ফল হলো হৃদয়ের প্লাবিত পূর্ণতাকে সহজ নির্গমনের সুযোগ দেওয়া—সব রকম আবেগ-প্রবৃত্তিই তা করে থাকে।" বন্ধু যেন একটি শ্রবণেন্দ্রীয়।" "যারা চায় বন্ধুরা তাদের কাছে হৃদয় খুলে দিক তারা নিজেদের হৃদয়েরই নরভুক......যার মন নানা চিন্তা আর ভাবে ভরতি হয়ে আছে সে অন্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, ভাবের আদান-প্রদান করে নিজের বুদ্ধি আর বোধশক্তিকে পরিষ্কার আর স্বচ্ছ করে নিতে পারে—সে সহজে ভাব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সক্ষম, সে তার চিন্তাকে দিতে পারে সুশৃঙ্খল সংহতি, দেখতে পারে ভাষায় রূপান্তরিত করলে তা কেমন দাঁড়ায়—অবশেষে সে আগের চেয়ে হয়ে উঠতে পারে বিজ্ঞতর এবং তা পারে সারাদিন বসে বসে ধ্যান করার চেয়ে এক ঘন্টার আলাপ-আলোচনার মারফৎ।" 'যৌবন আর প্রবীণতা' নামক প্রবন্ধে তিনি একটা গোটা বইকেই যেন একটা অনুচ্ছেদে প্রকাশ করেছেন। "তরুণেরা বিচারের চেয়ে আবিষ্কারের জন্যই যোগ্যতর, যোগ্যতর উপদেশের চেয়ে কাজ বাস্তবায়নে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার চেয়ে নতুন পরিকল্পনার জন্যই তারা অধিকতর উপযোগী—বয়সের অভিজ্ঞতা পরিচিত পরিধিতে পরিচালনা করতে সক্ষম কিন্তু নূতন বিষয়ে ব্যর্থ......তরুণেরা অতি-উৎসাহের ফলে কাজ করতে গিয়ে নিজের সাধ্যের বাইরেও হাত বাড়িয়ে বসে, যত না সামলাতে পারবে তার অনেক বেশী সমস্যা করে বসে স্বষ্টি। সামর্থ্য আর পরিমাণ সম্বন্ধে না ভেবেই পরিণতিতে পেঁাছতে চায় উড়ে গিয়ে, যে কয়টা বিধি নিয়ম চোখের সামনে দেখতে পায় অসম্ভব দ্রুত তার পেছনে করে ধাওয়া, ভাবেই না কিভাবে তা সম্ভব, নতুন কিছু করতে গিয়ে অজ্ঞাত সব অসুবিধার হয় সম্মুখীন........বয়স্করা অতি বেশী আপত্তি তোলে, আলোচনা করে দীর্ঘ সময় ধরে, নিতে চায় না কোন ঝুঁকি, অনুতাপ করতে শুরু করে তাড়াতাড়ি—কদাচিৎ পূর্ণসময় পর্যন্ত চালু রাখে ব্যবসা, আর মাঝারি সাফল্যেই থাকে খুসী। অবশ্য দুই পক্ষেরই (অর্থাৎ তরুণ ও প্রবীণ) কাজে লাগা উচিত........কারণ এক পক্ষের গুণ দুই পক্ষের ত্রুটি সংশোধনে করবে সহায়তা।" তা সত্ত্বেও তাঁর ধারণা যৌবন এবং শৈশব অতি মাত্রায় স্বাধীনতা পেয়ে দুর্বল ও অসংযত হয়ে ওঠারই সম্ভাবনা। "পিতামাতার উচিত সময়ে যখন ওরা নমনীয় থাকে তখনই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ পেশা ও পন্থা যা তাঁরা উপযুক্ত মনে করেন তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। ছেলেদের স্বভাবের উপর অত বেশী গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত নয়--তাদের মনের গতি যেদিকে তাই তারা ভালো-ভাবে গ্রহণ করবে একথা মনে করে। অবশ্য এটা ঠিক যে, কোন ব্যাপারে ছেলের যদি অসাধারণ আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখা যায় তা নাকচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা উচিত নয়, নতুবা সাধারণভাবে পিতাগোরাসের নির্দেশই উত্তম: "উত্তমটাই বেছে নাও, অভ্যাস তাকে সহজ ও প্রীতিকর করে তুলবে।" কারণ "অভ্যাস হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রধান নিয়ন্তা।"

'প্রবন্ধাবলী'তে যে রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় তা হচ্ছে রক্ষণশীলতা—যাঁর মনে শাসক হওয়ার আকাংক্ষা রয়েছে তাঁর পক্ষে এ হয়ত স্বাভাবিক। বেকন সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষপাতী। তাঁর মতে রাজতন্ত্রই উত্তম শাসন ব্যবস্থা—সাধারণতঃ শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার তারতম্যানুসারেই রাষ্ট্রের যোগ্যতায় রকমফের ঘটে।

"সরকার পরিচালনায় তিনটি বিষয় অত্যাবশ্যক: প্রস্তুতি, বিতর্ক বা পরীক্ষা আর পূর্ণতা বা বাস্তবায়ন। যদি দ্রুত কাজ চাও, শুধু মাঝখানের কাজে বেশী লোককে অংশ নিতে দাও কিন্তু প্রথম আর শেষের কাজ হবে স্বল্প সংখ্যকের।" তিনি স্পষ্ট যুদ্ধবাদী ছিলেন, শিল্পের উন্নয়নে তিনি এ কারণে দুঃখিত ছিলেন যে, তাতে মানুষের যোদ্ধৃ শক্তি যাবে কমে, একটানা দীর্ঘ শান্তি যোদ্ধাকে শান্ত মানুষে পরিণত করবে বলে তাঁর দুঃখের ছিল না অন্ত। তবে কিছু কাঁচামালের গুরুত্ব তিনি স্বীকার করতেন: "ক্রয়সাসকে (Croesus) সলোন (Solon) চমৎকার বলেছিলেন (যখন ক্রয়সাস বেশ আত্মম্ভরিতার সঙ্গে তাঁর স্বর্ণ ভাণ্ডার তাঁকে দেখালেন), হুজুর, উৎকৃষ্টতর লৌহ-হস্তে যদি কেউ আসে, এসব সোনার সে-ই হয়ে বসবে মালিক।"

এরিস্টোটলের মতো বিপ্লব পরিহারের জন্য তিনিও কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন। "বিপ্লব পরিহারের সুনিশ্চিত উপায় হচ্ছে তার বস্তু অর্থাৎ কারণ দূর করা, কারণ দাহ্য বস্তু সঞ্চিত হতে থাকলে কোন্ দিক থেকে কখন যে আগুন লেগে সব পুড়িয়ে দেবে তা বলা কঠিন......খুব কঠোর হস্তে খ্যাতি অর্থাৎ আলাপ-আলোচনা দমন করলেই যে বিপদের হাত থেকে বাঁচা যাবে তাও বলা যায় না। অনেক সময় উপেক্ষাতেই তা দমিত হয়ে যায়—জোর করে দমাতে গেলে তা আরো দীর্ঘজীবী হয়ে ওঠে। দুই কারণে সাধারণতঃ রাজোদ্রোহ ঘটে থাকে: অতি দারিদ্র্য আর অতিমাত্রায় অসন্তোষ। রাজোদ্রোহের কারণ আর মতলব অনেক, যেমন—ধর্ম-সংস্কার, কর, আইন আর দেশাচারের রদবদল, সুবিধাবাদে হস্তক্ষেপ, সাধারণ নির্যাতন, অযোগ্য লোকের অগ্রাধিকার, নবাগত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাব, প্রাক্তন সৈনিক, দলবিশেষ মরীয়া হয়ে ওঠা আর আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্তরা সহজে একই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়া।" প্রত্যেক দলপতি-রই অস্ত্র হচ্ছে শত্রুদলে বিভেদ সৃষ্টি আর নিজের বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করা। "যারা রাষ্ট্রের বিপক্ষে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, নির্মূল করা বিদ্রোহী দলকে, দূরে সরিয়ে রাখা আর ওদের মধ্যে অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া এসবকে খুব মন্দ প্রতিকার বলা যায় না কারণ এ এক চরম বিপদের মুহূর্ত—রাষ্ট্রের পরিচালন ভার যাদের হাতে তাদের মধ্যে যদি অমিল আর দলাদলি থাকে আর যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা যদি সব মিলে ঐক্যবদ্ধ হয় তা হলে সমূহ সর্বনাশ।" বিপ্লব পরিহারের উৎকৃষ্ট ঔষধ হচ্ছে সম্পদের সমবন্টন: "টাকা হচ্ছে ভিজা গোবরের মতো, ছড়িয়ে না দিলে কোন ফায়দা পাওয়া যায় না।"

কিন্তু এর অর্থ সমাজতন্ত্র নয় অথবা নয় গণতন্ত্র—বেকন কিন্তু জনগণকে বিশ্বাস করতেন না যারা তাঁর সময় শিক্ষার সব সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত, "জনগণের তোষামোদ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তোষামোদ" আর "পোসিয়ন (Phocion) ঠিকই করেছিলেন, জনসাধারণ যখন তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আমি এমন কি ভুল করেছি?" বেকন চাইতেন প্রথমে ভূমিমালিক জোৎদার শ্রেণী তারপর শাসন কাজের জন্য অভিজাত সম্প্রদায় আর সবার উপর রাজ-দার্শনিক। "শিক্ষিত শাসকের অধীনে অনুন্নত রাষ্ট্রের কোন নজিরই খুঁজে পাওয়া যাবে না।" তিনি উদাহরণতঃ সেনেকা, এন্টোনিয়াস পায়াস আর অরেলিয়াসের উল্লেখ করেছেন, তাঁর আশা ছিল এঁদের নামের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাঁর নামও যোগ করবেন।

৪. এক বিরাট পুনর্গঠন

তাঁর সাফল্যের সময়ও অলক্ষ্যে তাঁর মন ছিল দর্শনে নিহিত। যৌবনে ঐ ছিল তাঁর ধাত্রী, রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে থাকার সময় ছিল তাঁর সঙ্গী, অসম্মান আর কারাগারে ছিল তাঁর সান্ত্বনা। দর্শনের পতন ও অখ্যাতির জন্য তিনি শুষ্ক পণ্ডিতিয়ানাকেই করতেন দোষারোপ। "সত্য সম্বন্ধে এত সব বাদানুবাদ দেখে জনসাধারণ সত্যের প্রতি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে অত্যন্ত বিমুখ আর যারা একমত হয় না তাদের সবাইকে মনে করে ভুল পথের পথিক।" "বিজ্ঞানও প্রায় থেমে আছে, লাভ করছে না মানবজাতির যোগ্য কোন রকম সমৃদ্ধিই.....সমপ্রদায়গত সব ঐতিহ্য আর উত্তরাধিকার মানে গুরু-শিষ্যেরই উত্তরাধিকার—কোন রকম আবিষ্কারের নয়। এখন বিজ্ঞানে শুধু আবর্তনই চলছে, চলছে অবিরাম আন্দোলন যার সমাপ্তি ঘটছে ফের সূচনায় ফিরে গিয়ে।" তাঁর উত্থান ও সমৃদ্ধির কালে সব সময় তিনি দর্শনের পুনরুদ্ধার বা পুনর্গঠন সম্বন্ধেই ভাবতেন আর করতেন চিন্তা।

তাঁর সব পড়াশোনার পরিকল্পনা ছিল এ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই। তিনি তাঁর "কাজের পরিকল্পনা"য় বলেছেন তিনি পুরোনো মৃত পদ্ধতির অনুসরণের ফলে দর্শন কিভাবে বদ্ধ জলাসয়ে পরিণত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে পুনরারম্ভের জন্য তাঁর প্রস্তাবের এক রেখাচিত্র দিয়ে প্রথমে একটি ভূমিকা (Introductory Treatises) গ্রন্থ রচনা করবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বিজ্ঞানের একটি নতুন শ্রেণী-বিভাগ (Classification of the Sciences) রচনা করতে চেষ্টা করবেন তাতে বস্তুর নিজস্ব এলেকা নির্দিষ্ট করে দিয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার এখনো হয়নি সমাধান তার তালিকা দেবেন। তৃতীয়তঃ প্রকৃতির ব্যাখ্যা (Interpretation of nature) সম্বন্ধে তাঁর নতুন পদ্ধতির বর্ণনা করবেন। চতুর্থতঃ তিনি তাঁর কর্ম ব্যস্ত হাত লাগাবেন ব্যবহারিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আর অনুসন্ধান চালাবেন প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য সম্বন্ধে (Phenomena of nature)। পঞ্চমতঃ তিনি দেখিয়ে দেবেন 'মননের সিঁড়ি' (Ladder of the Intellect), যে সিঁড়ি বেয়ে অতীতের লেখকেরা সত্যে পেঁৗছেছিলেন যা আজ মধ্যযুগীয় বাগাড়ম্বরের পটভূমিতে হয়েছে রূপায়িত। ষষ্ঠতঃ তিনি বৈজ্ঞানিক ফলাফলের কিছুটা 'পূর্বাভাস' (Anticipations) দিতে চেষ্টা করবেন। তাঁর বিশ্বাস তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করলে তা ঘটবেই। এবং শেষে দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্যবহারিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করে তাতে তিনি য়ূটোপিয়া (Utopia) বা 'সব পেয়েছির দেশের' ছবি আঁকবেন যা পুষ্পিত হবে এসব ফুটোন্মুখ বিজ্ঞান-কলি থেকে আর আশা করছেন তিনি হবেন তার নবী। এসবের সামগ্রিক পরিণতি হবে দর্শনের এক বিরাট পুনর্গঠনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ এক বিরাট উদ্যোগ—এরিস্টোটল ছাড়া চিন্তার ইতিহাসে এ রকম দ্বিতীয় পূর্ব-নজির নেই। কোন রকম খেয়ালী মতামত নয় ব্যবহারিক প্রয়োগই এর উদ্দেশ্য, এদিক দিয়ে অন্য সব দর্শন থেকে এ হবে আলাদা—কাল্পনিক সমন্বয়ের চেয়ে এর লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট ও মূর্ত বাস্তব-বস্তু। জ্ঞানই শক্তি—শুধু যুক্তি বা ভূষণ নয়। "শুধু একটা মতামত পোষণ করা নয়........কিন্তু কাজের বাস্তবায়ন চাই, আর আমি কোন একটা সম্প্রদায় বা অনড় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাই না—আমি চাই প্রয়োগ আর ক্ষমতা।" এখানে আমরা সর্বপ্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের স্বর ও সুর শুনতে পাচ্ছি।

৫. জ্ঞানের অগ্রগতি

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য জ্ঞান অত্যাবশ্যক। "একমাত্র প্রকৃতির অনুসরণ করেই প্রকৃতিকে আয়ত্ত করা সম্ভব।" প্রকৃতির আইন বা নিয়ম অধ্যয়ন করেই আমরা হতে পারবো তার প্রভু, যেমন আমরা এখন হয়েছি। অজ্ঞতায় হয়ে পড়বো তার দাস। বিজ্ঞান য়ূটোপিয়া বা 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁচারই পথ। কিন্তু এখন এ পথ কি অবস্থায় আছে: যন্ত্রণাকর, অনালোকিত, পেছন মুখো, আর তা পথ হারিয়ে ফেলেছে অনাবশ্যক অলিতে গলিতে—মানুষকে আলোকের দিকে না নিয়ে গিয়ে নিচ্ছে বিশৃঙ্খলার দিকে। আমাদের উচিত সর্বাগ্রে বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার একটা সার্বিক পরিচয় নিয়ে তার যথাযথ ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নির্দেশ করা—চলুন আমরা "বিজ্ঞানকে তার উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে দিই", তার ত্রুটি, প্রয়োজন আর সম্ভাবনা সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখি, নির্দেশ করে দিই যেসব নতুন সমস্যা রয়েছে আলোকের প্রতীক্ষায় আর সাধারণ-ভাবে "সে সবের মূল সম্বন্ধে পথ খুলে দিয়ে পৃথিবীকে দিই একটা নাড়া।"

বেকন তাঁর 'জ্ঞানের অগ্রগতি'তে (The advancement of learning) এ উদ্দেশ্য সাধনেরই সংকল্প নিয়েছেন। রাজ্য যেমন স্বরাজ্যে প্রবেশ করেন, বেকনও সেভাবে বলেছেন: "আমার উদ্দেশ্য জ্ঞান-রাজ্য প্রদক্ষিণ, দেখা কোন্ অংশ অকর্ষিত পতিত অবস্থায় পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, মানুষের শ্রম যা পরিহার করে গেছে। উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত এলেকার বিশ্বস্ত মানচিত্র রচনা করে যৌথ ও ব্যক্তিগত শক্তি প্রয়োগ করে তার উন্নয়নসাধন।" আগাছা জন্মানো ভূমির তিনি হবেন রাজকীয় জরিপকারী—সোজা করবেন রাস্তা, ভাগ করে দেবেন জমি শ্রমিকদের মধ্যে। এ এক দুঃসাহসকি পরিকল্পনা যা প্রায় অবিনয়ের সীমা ছুঁইয়েছে বলা যায় কিন্তু বেকন তখনো বিরাট সমুদ্র যাত্রার পরিকল্পনা গ্রহণের মতো তরুণ (৪২ বছরেও দার্শনিককে তরুণই বলা যায়) ছিলেন। ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বার্গলেকে লিখেছেন "আমি সব বিদ্যাকেই আমার নিজের এলাকা বলে মনে করি" অবশ্য এ কথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তিনি নিজেকে আগাম 'বৃটিশ বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia Britanica) করে তুলবেন। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন সামাজিক পুনর্গঠন কাজে প্রতিটি বিজ্ঞানের সমালোচক ও সমন্বয় সাধক হিসেবে তিনি জ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রে করবেন বিচরণ। তাঁর উদ্দেশ্যের বিপুলত্ব তাঁর রচনাশৈলীতেও নিয়ে এসেছে এক রাজকীয় ঐশ্বর্য, এবং সময় সময় তাঁকে নিয়ে গেছে ইংরেজি গদ্যের চূড়ায়।

স্বাভাবিক বাধা আর মানবীয় অজ্ঞতা নিয়ে যে বিরাট যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানব গবেষণা সংগ্রাম করে চলেছে তার সর্বত্র তিনি বিচরণ করেছেন আর সবক্ষেত্রেই তিনি বিকিরণ করেছেন আলো। তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন শারীরবিদ্যা আর ঔষধ সম্বন্ধে—শেষোক্তকে তিনি "চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈয়রী অথচ সহজে বিকল হয়ে পড়া সংগীত যন্ত্রের" সমতা বিধায়ক বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি আধুনিক ডাক্তারদের নীতিহীন হাতুড়ে চিকিৎসা আর তাদের সব রোগে একই ব্যবস্থা দেওয়ার প্রবণতা—যা প্রায় ঔষধীয়, তার করেছেন নিন্দা। "আমাদের চিকিৎসকেরা পাদ্রীদের মতই—বাঁধা আর ছাড়ার চাবিই শুধু আছে তাঁদের তার বাইরে অতিরিক্ত কিছু করতে তাঁরা অক্ষম।" তাঁরা অতিমাত্রায় বিশৃঙ্খল অসমন্বিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরই করে থাকেন নির্ভর—তাঁদের আরো ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষায় হাত দেওয়া উচিত, শারীর অবস্থান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তাঁরা যেন মানবদেহ সম্বন্ধে আরো আলোকপাত করতে হন সক্ষম, তাঁরা শব-ব্যবচ্ছেদ করুন প্রয়োজন হলে জীবিত দেহ খণ্ড করে দেখুন। সর্বোপরি তাঁরা যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর তার ফলাফলের একটা সহজপ্রাপ্য ও বোধগম্য বিবরণ তৈয়ের করেন। বেকন বিশ্বাস করতেন মৃত্যু যেখানে অবধারিত, দু'এক দিনের বিলম্বে শুধু যন্ত্রণা-সার, সেখানে চিকিৎসকদের মৃত্যু সহজ ও ত্বরান্বিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত। তবে জীবনকে দীর্ঘতর করার শিল্প বা কৌশল সম্বন্ধে আরো বেশী অধ্যয়নের জন্য তিনি চিকিৎসকদের দিয়েছেন উৎসাহ। "ও ঔষধের" এ হবে এক নতুন অঙ্গ, যদিও এখনো অসম্পূর্ণ—তা সত্ত্বেও আরোগ্যের তথা দীর্ঘ জীবনের সবচেয়ে মহত্তম উপকরণ এ ঔষধ যদি সরবরাহ করা যায় তা হলে ঔষধ শুধু আরোগ্যের সামান্য উপায় বলে গণ্য হবে না আর চিকিৎসককেও লোকে শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই করবে না সম্মান বরং মরণশীল মানুষের প্রতি চরম পার্থিব আনন্দের পরিবেশক হিসেবে ঔষধ আর চিকিৎসকের মর্যাদা যাবে অনেক বেড়ে।" দীর্ঘ-জীবন যে সুখের নিদান এ সম্পর্কে শোপেনহাওয়ারবাদী কোন কোন খিটখিটে মেজাজী হয়ত আপত্তি করে বলবেন কোন কোন চিকিৎসক যে রোগ আর রোগী উভয়কে তড়িৎ গতিতে খতম করে দেন তা বরং অধিকতর ভক্তি-প্রশংসার যোগ্য। বেকন যদিও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিবাহিত ও বিব্রত ছিলেন তবুও কখনো জীবন যে চমৎকার এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করতেন না।

মনস্তত্ত্বে তিনি 'ব্যবহারবাদী' ছিলেন, মানুষের কাজে কার্যকারণ সম্বন্ধে কঠোর অধ্যয়নের দাবী করতেন তিনি আর বিজ্ঞানের পরিভাষা থেকে 'দৈবাৎ' কথাটাকে চেয়েছেন তাড়াতে। তাঁর মতে "দৈবাৎ এমন বস্তুর নাম যার কোন অস্তিত্ব নেই।" আর "বিশ্ব ব্যাপারে যা দৈবাৎ মানুষের ব্যাপারে তা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি।" এখানে একটি মাত্র ক্ষুদ্র পঙ্ক্তিতে এক অর্থপূর্ণ জগৎ আর যুদ্ধের এক আহ্বান প্রকাশ পেয়েছে: আলাপ-আলোচনার নীচে যেন মুক্ত ইচ্ছার (Free will) পণ্ডিতি মতবাদকে ঠেলে ফেলা হয়েছে আর মেধা থেকে পৃথক বিশ্ব ইচ্ছা-শক্তির ধারণাকে করা হয়েছে নাকেচ। এসব নব মতবাদকে বেকন আর অনুসরণ করেননি শুধু এটিই একমাত্র নিদর্শন নয় যেখানে তিনি একটা সমগ্র গ্রন্থকে হয়ত একটা বাক্যাংশে প্রকাশ করে হৃষ্ট চিত্তে বিষয়ান্তরে গিয়েছেন চলে।

আবার বেকন সামান্য কয়েকটা শব্দে 'সামাজিক মনস্তত্ত্ব' নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক নতুন বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে হয়েছেন সক্ষম। "দার্শনিকদের অত্যন্ত শ্রম সহকারে আচার-বিচার, ব্যায়াম, অভ্যাস, শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, অনুকরণ, প্রতিযোগিতা, সঙ্গ, বন্ধুত্ব, প্রশংসা, নিন্দা, উৎসাহবাণী, খ্যাতি, আইন, বই-পুস্তক, অধ্যয়ন ইত্যাদির শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত, কারণ এসবই মানুষের নৈতিক জীবনের উপর করে থাকে কর্তৃত্ব—এসবের দ্বারাই গড়ে ওঠে মন আর তা থাকে সংযত।" এ নতুন বিজ্ঞান এ রূপ-রেখাকে এমন সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে যে মনে হয় এ টার্ডে (Tarde), লেবন (Lebon), রস (Ross), ওয়াল্লাস (Wallas) আর ডারকেইমের (Durkheim) গ্রন্থেরই যেন সূচীপত্র।

বিজ্ঞানের উপরে বা নীচে কিছু নেই। যাদু, স্বপ্ন, ভবিষ্যদ্বাণী, টেলিপ্যথী যোগাযোগ, সাধারণভাবে "আত্মসম্বন্ধীয় সব ঘটনা" বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আওতায় নিয়ে আসা উচিত, "কারণ এটা জানা নেই যে, যেসব ঘটনাকে অলৌকিক বলে অভিহিত করা হচ্ছে তার কি কি আর কতটুকু স্বাভাবিক কার্য কারণের ফল।" তাঁর খুব একটা পার্থিব প্রবণতা সত্ত্বেও এসব সমস্যাও তাঁকে কম আকর্ষণ করতো না : মানবীয় কোন কিছুকেই তিনি বৈদেশিক মনে করতেন না। আলকেমি থেকে যেমন রসায়নের উৎপত্তি হয়েছে, কে জানে এসব অনুসন্ধানের ফলে কোন্ অজানা সত্যের ও কোন্ নতুন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটবে?" "আলকেমির সঙ্গে ঐ লোকটার তুলনা করা যায় যে তার ছেলেদের বলেছিল তার সব সোনা সে দ্রাক্ষা-উদ্যানে পুঁতে রেখেছে—যা খুঁড়ে ছেলেরা কোন সোনার সন্ধান পায়নি বটে কিন্তু দ্রাক্ষা-লতার গোড়ার মাটি খোঁড়ার ফলে পেয়েছিল প্রচুর দ্রাক্ষা-মদিরা। এভাবে সোনার সন্ধান ও সোনা পাবার চেষ্টা বহু প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের কারণ হয়েছে আর তুলে ধরেছে মানুষের সামনে বহু শিক্ষণীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে।"

আরো একটি বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তাঁর অষ্টম বইতে (Book VIII) : জীবনে সাফল্য লাভের বিজ্ঞান। তখনো তিনি ক্ষমতাচ্যুত হননি—জীবনে কি করে উন্নতি লাভ করতে হয় এ সম্বন্ধে বেকন তখন কিছু কিছু প্রাথমিক ইংগিত করেছেন। জীবনে উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন জ্ঞান—নিজের ও পরের সম্বন্ধে। 'নিজেকে জানো'—এ শুধু জ্ঞানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধেক মাত্র, অন্যকে জানার উপায় হিসেবেই এর প্রধান মূল্য। অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে :

'যে বিশেষ বিশেষ মানুষের সংস্পর্শে আমাদের আসতে হবে তাদের সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে ভালো করেই, জানতে হবে তাদের মেজাজ, বাসনা-কামনা, মতামত, আচার, ব্যবহার—কিরকম সাহায্য, সহায়তা আর আশ্বাসের উপর তারা প্রধানতঃ করে থাকে নির্ভর আর তাদের ক্ষমতার উৎস কি, তাদের ত্রুটি আর দুর্বলতা, কোথায় তারা সহজ প্রাপ্য ও সহজগম্য; তাদের বন্ধু-বান্ধব, দল, পৃষ্ঠপোষক, পোষ্য, শত্রু, ঈর্ষাকারী, প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের সন্নিধ্যলাভের সময় আর উপায়........ কিন্তু অন্যের মনের দ্বার খোলার সুনিশ্চিত উপায় হচ্ছে তাদের স্বভাব আর মেজাজ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে সন্ধান আর ফরখ করে দেখা অথবা তাদের উদ্দেশ্য আর মতলব সম্বন্ধে খবর নেওয়া। কিন্তু এসব সন্ধান তিনটি বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যথা (১) বহু সংখ্যক বন্ধুত্ব স্থাপন......(২) বেপরওয়া আলাপ-আলোচনা আর নীরবতার মাঝখানে একটা বিবেচনাসম্মত মধ্যপন্থা গ্রহণ........কিন্তু সবার উপরে চাই সৎ স্বভাব আর ব্যবহারের মাত্রাধিক মাধুর্যে নিজেকে যেন নিবীর্য করে তোলা না হয়, ঐ করলে নিজেকে করা হয় নিন্দনীয় আর ক্ষতিগ্রস্ত—এ করতে পারলেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিজের অধিকার রাখা যায় বজায়। তবে সময় সময় নিজের স্বাধীন আর সদয় মনের দু'একটা স্ফুলিঙ্গ ছাড়তে পারলে, যাতে অবশ্য মধুর চেয়ে হুলের কমতি যেন না পড়ে তা হলে আরো ভালো।'

বেকনের কাছে বন্ধু হচ্ছে ক্ষমতা লাভের উপায়। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে রয়েছে মেকিয়াভেল্লির সাদৃশ্য—এদৃষ্টিভঙ্গী রেনেসাঁসের অবদান এ ভাবতে ইচ্ছা হয় বটে কিন্তু যখন মাইকেল এনজেলো আর কেভেলিয়াবির, মনটেইনি আর লা বোয়েটির এবং স্যার ফিলিপ সীড়নি আর হুবার্ট লেংগোয়েটের চমৎকার আর বেহিসেবী বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ে তখন তা থেকে বিরত থাকতে হয়। বন্ধুত্বের এ বাস্তব মূল্যায়নেই আমরা খুঁজে পাবো বেকনের ক্ষমতার উচ্চাসন থেকে পতনের কারণ—এ ব্যাখ্যায় খুঁজে পাওয়া যাবে নেপোলিয়নেরও পতনের হেতু। বন্ধুদের প্রতি ব্যবহারে তিনি যে দর্শন অনুসরণ করেছেন তাঁর প্রতি ব্যবহারেও তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুরা উন্নততর দর্শনের অনুসরণ করবেন এ আশা করা যায় না। প্রাচীন গ্রীসের 'সপ্ত জ্ঞানীর' অন্যতম বিয়াসের (Bias) এ উক্তিটি বেকন প্রায় উদ্ধৃত করতেন : "বন্ধুকে এ মনে করে ভালোবাসবে যে সে একদিন তোমার শত্রু হতে পারে আর শত্রুকে বাসবে ভালো এ মনে করে যে, সে একদিন হতে পারে তোমার বন্ধু।" নিজের আসল উদ্দেশ্য ও মনের কথা বন্ধুর কাছেও কখনো করবে না প্রকাশ, আলাপের সময় নিজের মনোভাব প্রকাশ না করে বেশী বেশী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকবে আর যখন কথা বলবে তখন তোমার বিশ্বাস আর সিদ্ধান্ত না জানিয়ে স্রেফ খবর আর ঘটনাপঞ্জীই দিয়ে যাবে। প্রকাশ্য অহঙ্কার অগ্রগতিতে সহায়তা করে আর "নীতির ব্যাপারে দম্ভ দোষ বটে কিন্তু রাজনীতির বেলায় তা নয়।" এখানে আবার নেপোলিয়নের কথা স্মরণ হয়, কর্সিকার ক্ষুদ্র লোকটির মতো বেকনও নিজের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বেশ সরল ও সাদাসিদা কিন্তু বাইরে দেখাতেন ঝাঁকজমক আর আড়ম্বর যা তিনি মনে করতেন জন-খ্যাতির জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রতি বিজ্ঞানে নিজের চিন্তার বীজ ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেকন ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। জরীপ শেষ করে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, শুধু বিজ্ঞান নিজে যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানের বাইরে এমন একটা শক্তি আর শৃঙ্খলা থাকা চাই যা সব বিজ্ঞানকে সমন্বিত করে একটা লক্ষ্য নির্দেশ করতে সক্ষম। "আরো একটি বড় ও শক্তিশালী কারণ রয়েছে যার জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হয়নি, তা হচ্ছে—উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই যদি সঠিকভাবে স্থাপন করা না হয় তা হলে ঠিক মার্গে দৌড়ানোই যায় না।" বিজ্ঞানের যা দরকার তা হচ্ছে দর্শন—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ আর বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য আর ফলাফলের সমন্বয় সাধন, এ ছাড়া বিজ্ঞান ভাসাভাসা আর অগভীর থেকে যেতে বাধ্য।" সমতলক্ষেত্রের উপর দাঁড়িয়ে যেমন কোন দেশের পুরোপুরি দৃশ্য দেখা যায় না তেমনি একই বিজ্ঞানের সমতায় দাঁড়িয়ে অথবা আরো উঁচুতে না চড়ে কোন বিজ্ঞানেরই সুদূর ও গভীর অংশগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।" স্বভাবের ঐক্য সম্বন্ধে বিবেচনা না করে, মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন একক কোন বিষয়ের প্রতি তাকানোকে তিনি নিন্দা করেছেন। তিনি যেন বলতে চান কেন্দ্রীয় একটি আলোতে যে ঘর আলো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিত তার আনাচে কানাচেই শুধু ছোট একটি বাতি হাতে যাওয়া উচিত।

শেষ পর্যন্ত বেকনের ভালোবাসা বিজ্ঞানে নয় দর্শনেই নিয়েছিল আশ্রয়—একমাত্র দর্শনই এমনকি সংক্ষুব্ধ আর শোকাচ্ছন্ন জীবনেও দিতে পারে রাজকীয় শান্তি যার উৎস বোধশক্তি। "বিদ্যার সাহায্যে জয় করা যায়, লাঘব করা যায় মৃত্যু ভয় আর দুর্ভাগ্যকেও।" তিনি উদ্ধৃত করতেন ভার্জিলের এ মহৎ পঙক্তিগুলি :

"সে ব্যক্তিই সুখী যে সব বিষয়ের কারণ আয়ত্ত করতে পেরেছে আর পেরেছে সব ভয়, নির্মম ভাগ্য আর লোভের নারকীয় কোন্দলকে পদদলিত করতে।" সম্ভবতঃ দর্শনের সর্বোত্তম ফল হচ্ছে শিল্প বাণিজ্যিক পরিবেশ অসীম সঞ্চয়ের যে পাঠ অবিরাম আমাদের কাছে আউড়িয়ে চলেছে তা ভুলতে পারা। "দর্শন আমাদের সর্বাগ্রে মনের সামগ্রী সন্ধানেরই দেয় নির্দেশ, বাদ বাকি হয় আয়ত্ত হবে, না হয় অনুভূত হবে না তার প্রয়োজন।" জ্ঞানের কণিকাও চির আনন্দ।

দর্শনের অভাবে বিজ্ঞানের মতো সরকারও হয় ক্ষতিগ্রস্ত। দর্শন বিজ্ঞানের প্রতি সে-ই আত্মীয়তাই নিয়ে আসে যা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান নিয়ে আসে রাজনীতিতে : তা হচ্ছে লক্ষ্যহীন, ব্যক্তিগত স্বার্থ সন্ধানের পরিবর্তে পরিপ্রেক্ষিত আর পূর্ণজ্ঞানের সাহায্যে পরিচালনা (সরকার পরিচালনা)। মানুষের আর জীবনের প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে জ্ঞানানুসন্ধান যেমন পণ্ডিতিয়ানায় গিয়ে দাঁড়ায়, তেমনি রাজনীতিও যদি দর্শন-বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা হলে তাও হয়ে পড়ে ধ্বংসকর এক পাগলা-নিবাস।" যে হাতুড়ে চিকিৎসক সাধারণতঃ কয়েকটা টোটকার উপরই নির্ভর করে কিন্তু না জানে রোগের কারণ, রোগীর দেহ-গঠন অথবা দুর্ঘটনার বিপদ বা আরোগ্যের সঠিক পদ্ধতি, তার উপর একটা স্বাভাবিক দেহ ন্যস্ত করা অন্যায়। তেমনি হাতুড়ে রাজনীতিবিদদের উপর যারা দীর্ঘকাল ভালো ভাবে জ্ঞানী-সংসর্গে থাকেনি, বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা ন্যস্ত করা খুবই বিপজ্জনক।......যদিও যিনি এ কথা বলেছেন তাঁকে তাঁর পেশার প্রতি হয়ত কিছুটা পক্ষপাতী বলা যায়—'রাজারা দার্শনিক অথবা দার্শনিকরা রাজা হলেই তবে রাষ্ট্র সুখী হতে পারে' তবুও অভিজ্ঞতার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে সবচেয়ে ভালো সময় কেটেছে জ্ঞানী আর শিক্ষিত রাজাদের আমলেই।" এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গে বেকন আমাদের ডোমিটিয়ানের (Domitian) পরে আর কমোডাসের (Commodus) আগে যেসব মহান সম্রাটরা রোম শাসন করেছিলেন তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।"

কাজেই বেকন প্লেটোর মতো, বলা যায় আমাদের সকলের মতই নিজের প্রিয় সখ (hobby) সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত ছিলো আর তিনি বলেছেনও এতেই মানব জাতির মুক্তি। কিন্তু প্লেটোর চেয়েও তিনি আরো স্পষ্টভাবে (এতে আধুনিক যুগের সূচনা ঘোষিত হচ্ছে) বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আর গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক সৈন্য ও বিশেষজ্ঞ বাহিনীর আবশ্যকতা। অলিমপাসশৃঙ্গ থেকে তাকিয়ে দেখলেও কোন একক মনের পক্ষে, এমনকি বেকনের মতো মনের পক্ষেও জ্ঞানের সব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। সহায় অত্যাবশ্যক, এ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—সহায়হীন উদ্যোগের পার্বত্য হাওয়ায় থেকেও তিনি নিজে তীব্রভাবে একা বোধ করতেন। তিনি একবার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"তোমার কাজে কেমন সব সঙ্গী-সাথী পেয়েছ ? আমার কথা যদি বলো, আমি সম্পূর্ণভাবে একা আর নিঃসঙ্গ।" তিনি কল্পনা করতেন কোন একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিকদের একটা লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ রাখবে আর ওরা সব সময় পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার দ্বারা বিশেষ ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করবে। "ভেবে দেখ যাদের প্রচুর অবসর রয়েছে তাদের কাছে কি না প্রত্যাশা করা যায়—যদি তাদের সব শ্রম একত্রিত হয় আর তা চালু থাকে যুগ যুগ ধরে ? এ কোন একক মানুষের এক সময়ের কাজ নয় (যেমন যুক্তির বেলায়), কিন্তু এ সময়ের মধ্যে মানুষের শ্রম ও অধ্যবসায়কে (বিশেষ করে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের ব্যাপারে) ভালোভাবে সংগৃহীত করে, বন্টন করে, পরে একত্রিত করতে হবে। বহু সংখ্যক লোক মিলে একই কাজ করার পরিবর্তে একজন এক কাজের অন্যজন অন্য কাজের ভার নিলেই মানুষ তখন নিজের শক্তি উপলব্ধি করতে হবে সক্ষম।" বিজ্ঞান সংঘবদ্ধ জ্ঞানেরই নাম বটে কিন্তু বিজ্ঞানকেও নিজে সংঘবদ্ধ হতে হয়।

তবে বিজ্ঞানের এ সংগঠন আন্তর্জাতিক হওয়া চাই—"স্বাধীনভাবে সব সীমান্ত পার হয়ে মননশীলতার ক্ষেত্রে এ যেন সমস্ত য়ুরোপকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।" দ্বিতীয় আর এক অভাব আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে শুধু যে সমগ্র য়ুরোপে তা নয়। "একই রাষ্ট্র ও একই রাজত্বেও কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পরস্পরের মধ্যে না আছে সহানুভূতি না আছে কোন যোগাযোগ।" এসব বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির উচিত পরস্পরের মধ্যে বিষয় আর সমস্যা ভাগ করে নিয়ে গবেষণা আর প্রকাশনা উভয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। এভাবে সংঘবদ্ধ আর পারস্পরিক সহযোগিতায় যুক্ত হলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য বিবেচিত হবে—তখন তারা য়ুটোপিয়ায় যে এক অপক্ষপাত জ্ঞান-কেন্দ্র বিশ্ব শাসন করবে বলে স্বপ্ন দেখা হয়ে থাকে তা হয়ে উঠবে। বেকন এও লক্ষ্য করেছেন: "বিজ্ঞান আর কলা-শিল্পের সাধারণ অধ্যাপকদের এখন অতি নগণ্য মাইনেই দেওয়া হয়"—তাঁর ধারণা সরকার যতদিন শিক্ষার ভার নিজের হাতে গ্রহণ না করছে ততদিন এর অবসান হবে না। "প্রাচীনতম আর সর্বোত্তমকালের জ্ঞান বা বিজ্ঞতা সব সময় এ আপত্তি করে এসেছে যে, রাষ্ট্র অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকে আইন কানুন নিয়ে আর হয়ে থাকে অত্যন্ত অমনোযোগী শিক্ষার প্রতি।" তাঁর এক বড় স্বপ্ন ছিল প্রকৃতিকে জয় আর মানুষের শক্তির দিগন্ত বাড়াবার জন্য বিজ্ঞানের সমাজতন্ত্র সাধন অর্থাৎ বিজ্ঞানকে সমাজতান্ত্রিক করে তোলা।

তাই তিনি প্রথম জেমসের (James) প্রতি আবেদন জানিয়ে-ছিলেন—তিনি জানতেন রাজা খোসামোদ গলাধঃকরণ করতেই খুব অভ্যস্ত, তাই তিনি তাঁর আবেদনের সঙ্গে প্রচুর খোসামোদের বারি-ধারা করেছিলেন বর্ষণ। জেমস ছিলেন একাধারে রাজা আর পণ্ডিত—রাজদণ্ড থেকেও নিজের কলম সম্বন্ধে বোধ করতেন বেশী অহঙ্কার। কাজেই এমন সাহিত্যিক-পণ্ডিত রাজা থেকে নিশ্চয়ই কিছু আশা করা যায়। বেকন রাজাকে জানালেন তিনি যে পরিকল্পনা তৈরী করেছেন তা সত্যই 'রাজকীয় কর্তব্য'—"এ কর্তব্য একজনে পালন করতে চেষ্টা করা চৌ-মাথায় শুধু একটা মূর্তি খাড়া করা, যে মূর্তি পথ নির্দেশ করতে পারে বটে কিন্তু নিজে পথ চলতে অক্ষম।" সত্যই এ রাজকীয় কাজের জন্য প্রচুর খরচ অত্যাবশ্যক, কিন্তু "খবর সরবরাহের জন্য যদি রাষ্ট্র বা রাজাদের সেক্রেটারী আর গোয়েন্দারা মোটা মোটা বিল দাখিল করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন, যে সব খবর জানা অত্যাবশ্যক তা যদি প্রকৃতির গোয়েন্দা আর ওয়াকিবহালরা নিয়ে আসেন তাদেরও বিল্ দাখিল করার অনুমতি দেওয়া উচিত। যদি আলোকজ্ঞাওার শিকারী, ব্যাধ আর জেলেদের প্রতি-পালনের জন্য এরিস্টোটলের হাতে বিরাট ধনভাণ্ডার ন্যস্ত করতে পারেন তা হলে প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার যারা উন্মোচন করবেন তাঁরা তো আরো অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা দাবী করতে পারেন।" এ রকম রাজকীয় সহায়তা পাওয়া গেলে এ বিরাট পুনর্গঠন কয়েক বছরেই সম্ভব হতো—এ ছাড়া করতে গেলে প্রয়োজন হবে বহু প্রজননের।

বেকন যে মহৎ বিশ্বাসের সাথে মানুষ যে একদিন প্রকৃতিকে জয় করবে এ আশ্বাস আর ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছেন তাতে মন এক নূতন আশায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। "আমি সর্বস্ব বাজি রেখে বলতে পারি প্রতিযোগিতায় শিল্প প্রকৃতির উপর জয়লাভ করবেই।" মানুষ যা করেছে তা তারা যা করবে তারই শুধু প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কেন এ মহৎ আশা? গত দু' হাজার বছর ধরে মানুষ কি সত্যের সন্ধান করেনি, করেনি বিজ্ঞান পথের অন্বেষণ? এতকালের সন্ধানের ফলে যেখানে অতি সামান্য ফলই পাওয়া গেছে এখন কেন সেখানে মানুষ এত বড় আশা পোষণ করছে? হাঁ—বেকন তাঁর উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ এতকাল যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তা যদি ভুল আর অকেজো হয়? যদি সে পথ হারিয়ে শুধু গবেষণার কানা গলিতেই ঘুরপাক খেয়ে থাকে? অর্থাৎ তার সব চেষ্টা যদি শূন্যে গিয়ে ঠেকে? আমাদের চিন্তা আর গবেষণার পদ্ধতিতে আমাদের বিজ্ঞান আর যুক্তিবিদ্যার তথা লজিকের ক্ষেত্রে নির্মম বিপ্লব অত্যাবশ্যক—আমাদের দরকার এ বৃহত্তর জগতের উপযোগী এরিস্টোটলের থেকেও উন্নততর এক নতুন অনুসন্ধান প্রণালী বা অর্গানন (organon)।

তাই বেকন এবার আমাদের দিয়েছেন তাঁর সর্বোত্তম গ্রন্থ।

৬. যুক্তি-বিদ্যার নয়া পদ্ধতি (The New Organon)

তাঁর কঠোরতম সমালোচক মেকলে বলেছেন: "বেকনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর নিউ অর্গাননের প্রথম পুস্তক।" ইতিপূর্বে কেউই যুক্তি-বিদ্যা বা লজিককে এতখানি জীবন্ত করে তুলতে পারেনি—পারেনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরোহ (Induction) অংশকে এমন এক মহাকাব্যিক অভিযান আর বিজয়ে পরিণত করতে। কেউ যদি লজিক পড়তে চায় সে যেন এ বই দিয়েই করে শুরু। "মানব-দর্শনের এ দিকটা অর্থাৎ লজিক অনেকের রুচিতে খাপ খায় না—তারা মনে করে কন্টকিত সূক্ষ্মতার এ এক রকম জাল বা ফাঁদ....কিন্তু যে কোন কিছুর সত্যকার মূল্যায়ন করতে গেলে বুঝতে পারা যাবে বাকি সব কিছুর চাবি কাটি হচ্ছে যুক্তি-বিজ্ঞান।"

বেকন বলেছেন এতকাল দর্শন ছিল বন্ধ্যা—কারণ তাকে উর্বরা করার জন্য প্রয়োজন ছিল নবতর পদ্ধতির। গ্রীক দার্শনিকরা পর্যবেক্ষণে সময় দিয়েছেন অল্প আর অধিকতর সময় ব্যয় করেছেন মতবাদের আলোচনায়—এখানেই তাঁরা করে বসেছেন মস্ত বড় ভুল। কিন্তু চিন্তা পর্যবেক্ষণের সহায় হতে পারে বটে কিন্তু হতে পারে না প্রতিভূ বা স্থলাভিষিক্ত। পরাবিদ্যাকে যুদ্ধংদেহি বলেই যেন নিউ অর্গাননের প্রথম সূত্রেই বলা হয়েছে: "মানুষ প্রকৃতির সেবক আর ভাষ্যকার হিসেবে প্রকৃতির স্তর বিন্যাস যতটুকু পর্যবেক্ষণ করতে পারে ততটুকুই শুধু বুঝতেও সক্ষম, তার অতিরিক্তও জানতে পারে না। জানার সামর্থ্যও তার নেই।" এ ব্যাপারে সক্রেটিস পূর্ববর্তীরা তাঁর পরবর্তীদের চেয়ে অনেক বেশী অভ্রান্ত ছিলেন। বিশেষত ডেমোক্রিটাসের (Democritus) ঘটনার প্রতি যেমন নাক ছিল, মেঘের প্রতি ছিল না তেমন দৃষ্টি এটা কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয় যে এরিস্টোটলের পর থেকে দর্শনের তেমন অগ্রগতি ঘটেনি—এতকাল দর্শন এরিস্টোটলের পদ্ধতিরই করে এসেছে অনুসরণ। "এরিস্টোটলের আলোর সাহায্যে এরিস্টোটলকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব এ মনে করা যা ধার-করা আলোর পক্ষে মূল-আলোকে বাড়াতে পারার কল্পনা করাও তাই।" এরিস্টোটল আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে দু' হাজার বছর ধরে লজিককে কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করার পর, দর্শনের এমন পতন হয়েছে যে তার প্রতি আর কারো কোন শ্রদ্ধাই নেই। এসব মধ্যযুগীয় মতাদর্শ প্রতিপাদ্য আর বাদানুবাদ সব ঝেড়ে ফেলতে হবে, যেতে হবে ভুলে। স্বচ্ছ মন আর পরিষ্কার শ্লেটে দর্শনকে আবার নতুন জীবন করতে হবে শুরু।

তাই সর্বাগ্রে করতে হবে মন আর মননকে শোধন। সবরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতবাদ, পক্ষপাতমূলক ধারণা আর কুসংস্কার ও পূর্ব ধারণা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আমাদের আবার হতে হবে ছোট শিশু। আমাদের মনের প্রতিমাকে ভেঙ্গে করতে হবে চুরমার।

বস্তুর পরিবর্তে ভুল করে বাস্তবেরই যে ছবি কল্পনা করা হয় তা বোঝাবার জন্যই হয়ত বেকন 'প্রতিমা' শব্দটির করেছেন ব্যবহার (প্রটেস্-টেন্টদের প্রতিমা-পূজা প্রত্যাখ্যানের প্রতিভাসও এ হতে পারে)। এ সম্পর্কেই ভুলের কথা এসে পড়ে—লজিকের প্রথম সমস্যা হলো এসব ভুলের উৎস সন্ধান করে তার মুখবন্ধ করে দেওয়া। এখন বেকন যত সব সুপরিচিত ভুল সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণে হয়েছেন অগ্রসর। কণ্ডিলাক (Condillac) বলেছেন: "মানুষের ভুলের কারণ বেকনের চেয়ে আর কারো বেশী জানা ছিল না।"

এ সব ভুলই হচ্ছে সব গোত্রের 'প্রথম প্রতিমা'—ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানুষের এক সাধারণ স্বভাব, (প্রটেগোরাসের মতে "মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড") এ সম্পর্কে বেকনের মন্তব্য: "মানুষের ইন্দ্রিয়কে ভুল প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মানুষকে সব বস্তুর মানদণ্ড করে। বরং এর বিপরীতই সত্য, মানুষের ইন্দ্রিয়জ আর মনের সব ধারণা ও উপলব্ধির সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে; বিশ্বের সঙ্গে নয়, মানুষের মনকে তুলনা করা যায় অসমান আয়নার সঙ্গে যে আয়নায় বিভিন্ন বস্তুর ছায়া পড়ে আয়নার মতো এবড়ো খেবড়ো বিশ্রী আর বিকৃত হয়ে।" আমাদের চিন্তা আমাদের নিজেদেরই ছবি, বস্তু বা উদ্দেশ্যের নয়। উদাহরণত "মানুষের বোধ-শক্তির এমন এক অদ্ভুত স্বভাব যে বস্তুকে যা ও যে রকম দেখে তাতে তার চেয়ে অনেক বেশী শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সে ভেবে বসে........এ কারণে স্বর্গীয় সবকিছু নির্ভুল বৃত্তাকারে চলে এ এক অমূলক ধারণা লোকের মনে রয়েছে।" আবার—

'যখন কোন একটা প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (সাধারণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতির ফলে বা মনের খেয়াল খুশীতে), মানুষের বোধ বা স্বভাব এমন যে সে অন্য সব কিছুকে তার সমর্থন ও গ্রহণে বাধ্য করে যদিও তার বিরুদ্ধে প্রচুর ও প্রবল যুক্তি আর নিদর্শন সব রয়েছে। এ সবকে সে দেখেও দেখে না অথবা উপেক্ষা করে, ভয়ানক ও ক্ষতিকর কুসংস্কারবশত ঐ সবকে নির্মূল করতে হয় উদ্যত তবুও নিজের পূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্ত করে না ত্যাগ। একটি ধ্বংসাবশেষ মন্দিরে একটি ব্রতপালন উপলক্ষে ঝুলানো ফলক কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল তা দেখিয়ে একটা লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'এবার দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করবে ত?' সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও আর একটা চমৎকার প্রশ্ন করেই দিয়েছিল উত্তর: "আরো যে সব লোক দেবতার ব্রত পালন করেছিল তাদের ছবিগুলো ভাঙ্গলো কেন?" সব কুসংস্কারই এরকম—'যে জ্যোতিষ, স্বপ্ন, ঘটনার আগাম লক্ষণ, প্রতিশোধ প্রতিদানসূচক রায় যাই হোক না কেন, এ রকম সব ব্যাপারেই প্রবঞ্চিত বিশ্বাসীরা যে মানত বা ব্রত পূর্ণ হয় তাই শুধু দেখে যা পূর্ণ হয় না তা নিত্য ব্যাপার হলেও তা দেখে না বা যায় এড়িয়ে।'

"কোন প্রশ্ন বা সমস্যা সম্বন্ধে আগে নিজের ইচ্ছামতো সংকল্প গ্রহণ করে তবে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জনে হয় অগ্রসর—নিজের ইচ্ছা মতো মুচড়িয়ে অভিজ্ঞতাকে গৃহীত সংকল্পের সঙ্গে নিয়ে খাপ খাইয়ে, মিছিলের বন্দীর মতো যেমন খুশী ঘোরায়।" সংক্ষেপে মানুষের মন বা বোধ-শক্তি শুষ্ক কোন আলোকবর্তিকা নয়—তা সংক্রমিত হয় ইচ্ছা আর প্রবণতার দ্বারা, মনের এ অবস্থা থেকে যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি তাকে বলা যায় 'ইচ্ছামতো বিজ্ঞান'—কারণ মানুষ যাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিল তাকে সে আরো তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে বসে।" সত্য নয় কি?

এ প্রসঙ্গে বেকন এক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। "সাধারণভাবে প্রকৃতির সব ছাত্রই যেন এ নিয়মটি গ্রহণ করে—যা কিছুই সহজে তার মনে স্থান পায় আর তাতে পায় সে অদ্ভুত তৃপ্তি, তা হলে সে সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করা উচিত আর নিজের মনও বোধ--শক্তির স্বচ্ছতা আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য এসব প্রশ্নের আলোচনার সময় কিছুটা বেশী সতর্ক থাকা উচিত।" "বোধ শক্তিকে নির্দিষ্ট বিষয় ছেড়ে সুদূরের কোন প্রতিপাদ্যে উড়ে যেতে কি লাফ দিয়ে পড়তে দেওয়া অনুচিত—অনুচিত করতে দেওয়া উচচতম সাধারণীকরণে......বোধশক্তিকে পাখা সরবরাহ না করে বরং তার গায়ে ভারী কিছু ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত যাতে ও লাফাতে বা উড়তে না পারে।" কল্পনা হচ্ছে মননের প্রধানতম শত্রু অথচ হওয়া উচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থল।

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর ভুলের নাম দিয়েছেন বেকন—'গুহার প্রতিমা'—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ ব্যক্তিগত মানুষের বিশেষ রকমের যত সব ভুল। "কারণ প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক একটি গুহা বা গর্ত আছে যা প্রাকৃতিক আলোকে করে প্রতিহত আর করে বিকৃত"—এ হচ্ছে ব্যক্তির জন্ম আর প্রতিপালনের দ্বারা গঠিত চরিত্র—এ গঠনে সহায়তা করেছে তার মেজাজ আর দেহমনের অবস্থা। কোন কোন মনের গঠনই বিশ্লেষণধর্মী তারা সর্বত্র পার্থক্য দেখতে পায়, অন্যান্যরা সমন্বয়ধর্মী তারা দেখতে পায় সাদৃশ্য। তাই আমরা একদিকে পাই বিজ্ঞানী আর চিত্রকরকে অন্যদিকে পাই কবি আর দার্শনিককে। আবার "কারো কারো স্বভাবে পুরাতত্ত্বের প্রতি রয়েছে অসীম আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস আবার অন্যরা সাগ্রহে বরণ করে নেয় যে কোন নতুনত্বকে—শুধু স্বল্প সংখ্যকেই পারে মাঝপথে থাকতে প্রাচীনরা যা যথার্থের সঙ্গে রক্ষা করেছে তারা সে সবকেও যেমন-ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয় না তেমনি আধুনিকদের নতুন প্রবর্তনাকেও করে না অস্বীকার।" বলা বাহুল্য সত্যের কোন দল নেই।

'হাট-বাজারের প্রতিমা' বলে তৃতীয় আর এক রকম প্রতিমারও উল্লেখ করেছেন বেকন—"মানুষ একে অন্যের সঙ্গে বেচা-কেনা আর মেলামেশা করার ফলেই যার উৎপত্তি। মানুষ ভাষার সাহায্যেই কথা বলে কিন্তু শব্দ ব্যবহার করা হয় জনতার বোধ-শক্তি অনুসারেই—ফলে বহু খারাপ ও অনুপযুক্ত শব্দও গড়ে ওঠে যা হয়ে পড়ে মনের এক আশ্চর্য অন্তরায়।" বৈয়াকরণদের অসমাপিকার অসতর্ক প্রয়োগ দিয়েই দার্শনিকরা অসীমের আলোচনা করে থাকেন, তবুও কেউ কি জানে এই "অসীম" কি অথবা তার অস্তিত্বই বা কোথায়? দার্শনিকরা "প্রথম কারণ কারণহীন" অথবা "প্রথম গতিশীল গতিহীন" সম্বন্ধে আলাপ করে থাকেন কিন্তু এসব ডুমুর-পাতা বাক্যাংশ কি অজ্ঞতা ঢাকার জন্যই ব্যবহার করা হয়নি? হয় তো এতে মিলছে এসব বাক্যাংশ প্রয়োগকারীদের অপরাধী বিবেকেরই পরিচয়। প্রত্যেক স্বচ্ছ ও সৎ মস্তিষ্কবানই জানে কারণহীন কোন কারণই হতে পারে না অথবা হতে পারে না গতিহীন গতিশীল। সম্ভবতঃ দর্শনে সর্বপ্রধান পুনর্গঠন হচ্ছে শুধু এটুকু—আমরা যেন মিথ্যা বলা বন্ধ করি।

"অবশেষে আরো সব প্রতিমা রয়েছে যা দার্শনিকদের নানা অনড় মত-বিশ্বাস আর প্রদর্শনের ভুল আইন-কানুনের পথ বেয়ে মানুষের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকে পড়েছে। এগুলিকে আমি 'অভিনয় মঞ্চের প্রতিমা' বলে থাকি কারণ আমার বিশ্বাস দর্শনের প্রাপ্ত সব পদ্ধতিগুলি যেন কতকগুলি রঙ্গমঞ্চের নাটক—অবাস্তব আর নাটকীয় ধরনে সৃষ্ট তাদের নিজেদের জগতেরই প্রতিনিধি........কবিদের অভিনয় মঞ্চে যেমন ইতিহাসের সত্যকার গল্পের চেয়ে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী অধিকতর সংহত ও সুন্দর নাটক তৈয়ার করা অবিকল সেভাবে দার্শনিক অভিনয়-মঞ্চের নাটকগুলিও গড়ে ওঠে।" প্লেটো যে যে-জগতের বর্ণনা করেছেন তা তাঁর নিজের সৃষ্ট জগত আর তাতে জগতের নয় প্লেটোর ছবিই উঠেছে ফুটে।

পদে পদে এসব প্রতিমা যদি এখনো আমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে থাকে তা হলে সত্যের পথে আমরা কখনো এগিয়ে যেতে পারবো না—আমাদের শ্রেষ্ঠ জনেরাও পারবে না। যুক্তির নতুন পদ্ধতি চাই, বুঝবার নতুন উপকরণ। "কম্পাস বা দিক্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার আগে জানা না থাকলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের (West Indies) বিরাট এলাকা আবিষ্কার কখনো সম্ভব হতো না। এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে এতকাল যখন বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও সন্ধান অজানা ছিল তখন শিল্পের উন্নয়ন আর আবিষ্কার, তেমন বেশী দূর এগুতে পারেনি। আজ আমাদের যুগে বস্তু জগতের বিস্তীর্ণ এলেকা যখন উন্মুক্ত প্রকাশিত তখন মানস-জগত যদি পুরোনো আবিষ্কারের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে তা হলে সত্যই তা লজ্জার বিষয়।"

শেষমেস অনড় বিশ্বাস আর অনুমান নিয়েই আমাদের যত বিপদ, আমাদের পক্ষে কোন নতুন সত্যে পৌঁছানো এ কারণে সম্ভব হয় না যে আমরা শুরুতেই অসন্দিগ্ধভাবে কতকগুলি শ্রদ্ধেয় কিন্তু সন্দেহজনক প্রস্তাবকে মেনে নিই আর এগুলিকে পর্যবেক্ষণ কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার কথা কখনো ভাবিই না। "কোন লোক যদি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস নিয়ে শুরু করে তার সমাপ্তি ঘটে সন্দেহে কিন্তু সে যদি সন্দেহ নিয়ে শুরু করতে রাজি থাকে তার সমাপ্তি ঘটবে সুনিশ্চিত বিশ্বাসে"—(হায়, এ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী নয়)। আধুনিক তরুণ দার্শনিকদের এ এক লক্ষণ, তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার এ এক অংশ বিশেষ—সৎ চিন্তাকে মাকড়শা-জাল মুক্ত করার অত্যাবশ্যক হিসেবে 'সুশৃঙ্খল সন্দেহ' সম্বন্ধে ইদানিং ডেস্‌কার্টিস্ (Descartes) ও বলতে চাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেকন সন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। "সরল অভিজ্ঞতা লাভও ঘটে, তবে যেভাবে তা ঘটে তাকে দুর্ঘটনা বলা যায় (ভূয়োদর্শনঘটিত), সন্ধানের পর যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা........অভিজ্ঞতার খাঁটি পদ্ধতি প্রথমে বাতিটি (কল্পনা বা অনুমান) নেয় জ্বালিয়ে পরে বাতির সাহায্যে করে পথ নির্দেশ (পরীক্ষার ফলাফলকে সীমিত আর সুশৃঙ্খল করা)। এভাবে অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে সাজিয়ে হজম করে কোনরকম ভুল না করে, বেসামাল না হয়ে শুরু করলেই স্বতঃসিদ্ধে পৌঁছোনো যায়—সুপ্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ (Axioms) থেকে ফের শুরু করতে হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা।" (এখানে এবং পরে অন্য একটা অনুচ্ছেদেও প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলকে তিনি আরো গবেষণার 'প্রথম মদিরা' বলেই করেছেন উল্লেখ—কিছুটা অসম্পূর্ণ হলেও স্পষ্টভাবে তিনি এখানে কল্পনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অনুমানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। (যদিও বেকনের কোন কোন সমালোচকের ধারণা তিনি এসব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন)। বই-পুস্তক ঐতিহ্য আর কর্তৃত্বের তথা পণ্ডিতদের কাছে না গিয়ে আমাদের উচিত সোজা প্রকৃতির কাছে যাওয়া, আমরা "প্রকৃতিকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করাবো"—এমনকি তার নিজের বিরুদ্ধেও তা হলেই তাকে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে বাধ্য করাতে পারবো। য়ুরোপের তাবৎ বৈজ্ঞানিকদের সম্মিলিত গবেষণার দ্বারা, সব ক্ষেত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে বিশ্বের একটা "প্রাকৃতিক ইতিহাস", আমাদের রচনা করতে হবে।

সব রকম তালিকার "সাধারণ গণনা"কে আরোহ বা অনুমান বলা হয় না—এটা সহজেই বোধগম্য যে এ কাজ যেমন অশেষ তেমনি প্রয়োজনহীনও, কোন বস্তু স্তূপই নিজে নিজে বিজ্ঞান তৈয়রী করতে অক্ষম। এ করা "উন্মুক্ত মাঠে শিকারের পশ্চাদ্‌ধাবনের মতো"—শিকার ধরতে হলে চারদিক ঘিরে স্থানটাকে সংকীর্ণ করে আনতে হবে। আরোহ পদ্ধতির এমন একটা আঙ্গিক চাই যাতে সব রকম বাজে কল্পনাকে বাদ দিয়ে বিষয়বস্তুর তালিকাকে (data) শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব—তা হলে সব সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একে একে নাকচ হয়ে মাত্র একটিতে গিয়ে দাঁড়াবে।

সম্ভবতঃ এ আঙ্গিকের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে "বাড়া-কমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালিকা”—যেখানে দু'টি গুণ বা অবস্থার একই সঙ্গে বাড়া বা কমার তালিকা লিপিবদ্ধ করা হবে। তা হলে একই সঙ্গে দুই বিভিন্ন দৃশ্যেরহেতু নির্ণয় হয়তো সম্ভব হবে। তাই বেকন, তাপ কি ? এ প্রশ্নের দ্বারা জানতে চেয়েছেন বাড়া ও কমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন্ উৎপাদকটা বাড়ে বা কমে—দীর্ঘ বিশ্লেষণের ফলে তিনি তাপের সঙ্গে গতির প্রকৃত সম্পর্ক জানতে সক্ষম হয়েছেন। তাপ যে গতিরই রূপান্তর তাঁর এ সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁর কয়টি যে বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট অবদান তার মধ্যে অন্যতম।

ক্রমাগত এ সঞ্চয় আর তালিকার বিশ্লেষণ করে, বেকনের কথায় আমরা যে দৃশ্যাবলী অধ্যয়ন করি তার রূপ বা অবয়বে পেঁছিতে পারি—জানতে পারি তার গোপন-স্বভাব আর ভিতরের সার-মর্ম, বেকনের রূপের ধারণার সঙ্গে প্লেটোর ভাবের ধারণার ঐক্য বা মিল রয়েছে—এ যেন বিজ্ঞানের পরা-বিদ্যা। “আমরা যখন রূপ বা অবয়বের কথা বলি তখন সাধারণ কাজের আইন আর নিয়মকানুনই বুঝে থাকি। সাধারণত সরল স্বভাবও এর দ্বারা গঠিত হয়......কাজেই তাপ বা আলোর রূপ মানে তাপ বা আলোর নিয়মকানুন।” (একই ভাবে স্পিনোজাও বলেছেন বৃত্তের বস্তুই বৃত্তের নিয়ম কানুন)। “যদিও বিশেষ নিয়মে ব্যক্তিগত দেহে স্পষ্ট ব্যক্তিগত প্রকাশ প্রদর্শন ছাড়া প্রকৃতিতে আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই তবুও বিদ্যার প্রতি শাখায়, ঐসব নিয়ম কানুন সে সবের সন্ধান, আবিষ্কার আর উন্নয়ন হচ্ছে মতামত আর ব্যবহার উভয়ের বুনিয়াদ।” মতামত আর ব্যবহার বা প্রয়োগ—একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা অর্থহীন আর বিপজ্জনক, যে জ্ঞান কীর্তি-অর্জনের প্রেরণা দেয় না তা রক্তহীন ফ্যাকাশে আর মানুষের জন্য অনুপযুক্ত। আমরা বস্তুর রূপ যে জানতে চাই তা শুধু রূপের খাতিরে নয় বরং রূপ আর তার নিয়মকানুনকে জেনে নিয়ে আমাদের ইচ্ছামতো বস্তুর পুনর্গঠনের জন্যই, কাজেই আমরা যে গণিত অধ্যয়ন করি তার কারণ পরিমাণ স্থির আর সেতু নির্মাণ করার জন্যই। সমাজ-রূপ জঙ্গলে পথ খুঁজে পাওয়ার জন্যই আমরা অধ্যয়ন করি মনস্তত্ত্বের। যখন বিজ্ঞান যথেষ্টভাবে বস্তু-রূপকে চারদিক থেকে সুসজ্জিত করে তুলবে তখন মানুষের হাতে এ পৃথিবী হবে শুধু ইচ্ছামতো যূটোপিয়া বা 'সব পেয়েছির দেশ' গড়ে তোলার কাঁচা মাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. বিজ্ঞানের 'সব পেয়েছির দেশ' অর্থাৎ য়ুটোপিয়া (Utopia)

বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণতা প্রদান করে বিজ্ঞানের কর্তৃত্বে সমাজকে সুশৃঙ্খল ভাবে গড়ে তুলতে পারলেই ত য়ুটোপিয়া প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। আমাদের সামনে এ জগতেরই পরিচয় তুলে ধরেছেন বেকন তাঁর শেষ আর বিক্ষিপ্ত রচনা—দি নিউ আটলান্টিসে (The New Atlantis)—যা তাঁর মৃত্যুর মাত্র দু'বছর আগে হয়েছে প্রকাশিত। এচ্. জি. ওয়েলসের মতে এটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেকনের সর্বপ্রধান অবদান—এখানে এমন একটি সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে যেখানে অবশেষে বিজ্ঞানকে দেওয়া হয়েছে সবকিছুর নিয়ন্তা হিসেবে যথাযথ স্থান। এখানে এমন একটি রাজকীয় কল্পনা শক্তির পরিচয় রয়েছে যা নিয়ে তিন শতাব্দী ধরে মানুষকে অজ্ঞতা আর দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার এ একক উদ্দেশ্য সামনে রেখে জ্ঞান আর আবিষ্কার ক্ষেত্রের মহান যোদ্ধারা সংগ্রাম করে এসেছে। এ কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠায় আমরা ফ্রান্সিস বেকনের 'রূপ' আর তাঁর অন্তর নির্যাসকে যেন খুঁজে পাই, খুঁজে পাই তাঁর জীবন আর অস্তিত্বের নীতি-নিয়মকে—তাঁর আত্মার রহস্য আর বিরামহীন অভীপ্সাকে।

প্লেটো তাঁর তিমাউসে (Timaeus) পশ্চিম মহাসমুদ্রে নিমগ্ন আটলান্টিসের এক পুরা কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। এ পুরোনো আটলান্টিসেই বেকন ও অন্যান্যরা কলাম্বাস আর কেবটের আমেরিকা বলেই করেছেন চিহ্নিত—তাঁদের মতে বিরাট মহাদেশটা জলমগ্ন ছিল না শুধু অপেক্ষায় ছিল সামুদ্রিক অভিযানের দুঃসাহসের। এখন যখন পুরোনো আটলান্টিস্ জানা হয়ে গেছে—যেখানে বেকনের কল্পনার য়ুটোপিয়ার মতো সব মেধাবী লোকেরা বাস না করলেও সেখানকার অধিবাসীরাও বেশ বলিষ্ঠ আর কর্মঠ গোত্রেরই মানুষ তখন বেকন কল্পনা করেছেন এ নূতন আটলান্টিসের—দূর প্রশান্ত সাগরের বুকে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ, যেখানে ড্রেক (Drake) আর মেগেল্লানই (Magellan) শুধু পেরেছিল পোঁছতে। তাঁর য়ুটোপীয় কল্পনাকে উদার সুযোগ দেওয়ার জন্যই বোধ করি দ্বীপটির অবস্থান য়ুরোপ আর জ্ঞানের এলাকা থেকে দূরে করা হয়েছে নির্দেশ।

ডিপো (Depoe) আর সুইফ্‌টের (swift) সুপ্রসিদ্ধ গল্পের মতো বেকনও অত্যন্ত শিল্পহীন কৌশলের সাথে তাঁর কাহিনীটি করেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু। "আমরা পেরু থেকে জাহাজ ছাড়লাম (ওখানে আমরা প্রায় এক বছর কাটিয়েছিলাম), দক্ষিণ সাগর দিয়ে চীন আর জাপান যাওয়ার মতলবে।" সমুদ্রে নেমে এলো শান্তি—এ বিপুল শান্তির মাঝে অসীম সাগরের বুকে, দর্পনের উপর কলঙ্ক-চিহ্নের মতো তাদের জাহাজও পড়ে থাকলো। এদিকে অভিযাত্রী দলের খাদ্য শুরু করেছে কমতে। তারপর নির্মম ঝড়ো হাওয়া জাহাজকে শুধু উত্তরে, আরো উত্তরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো—দ্বীপ চিহ্নিত দক্ষিণ সাগর ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো অসীম নির্জন মহাসমুদ্রে। রসদ কমে এলো, কমে এলো আরো। এবার নাবিকরা পড়লো পীড়িত হয়ে। অবশেষে যখন তারা নিজেদের মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করলো, তখন হঠাৎ দেখতে পেলো, নিজের চোখ-কেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না—দূর আকাশের নিচে চমৎকার এক দ্বীপ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাহাজ নিকটবর্তী হলে তারা দেখতে পেলো তীরে যে লোকগুলি দেখা যাচ্ছে তারা কিছুমাত্র বন্য নয়, তারা সাধারণ মানুষ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন কাপড় তাদের পরনে, দেখলেই মনে হয় তারা বুদ্ধিশুদ্ধিতে উন্নত। তাদেরে অবতরনের অনুমতি দেওয়া হলো বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েও দেওয়া হলো সরকার দ্বীপে কোন বিদেশীকেই থাকতে দেয় না। যাই হোক কয়েকজন নাবিক যখন অসুস্থ তারা সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সবাইকে অস্থায়ীভাবে থাকতে দেওয়া হলো।

সুস্থ হয়ে ওঠার কয় সপ্তাহ ধরে নবাগতরা দিনের পর দিন ঘুরে নতুন আটলান্টিসের যত সব রহস্য উদ্ঘাটন করলো। একজন অধি-বাসী জানালো—"প্রায় উনিশ শ' বছর আগে এক রাজা এ দ্বীপে রাজত্ব করতেন, অন্য সব রাজার চেয়ে তাঁর স্মৃতিই আমরা বেশী করে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি.........তাঁর নাম সোলেমোনা, তাঁকে আমরা সম্মান করি আমাদের জাতির আইন প্রণেতা হিসেবে, এ রাজার হৃদয় ছিল খুব বড়........এবং তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন তাঁর রাজ্য আর প্রজাদের সুখী করার জন্য। রাজার অন্য সব সৎকর্মের উপরে ব্যবস্থা বা সমাজ-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি যাকে সলোমন-গৃহ' বলা হয়, তা হচ্ছে সর্বপ্রধান। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারি পৃথিবীতে এ এক মহত্তম ভিৎ রচনা আর এ রাজ্যের আলোকবর্তিকা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর দেওয়া হয়েছে 'সলোমন-গৃহের' দীর্ঘ বর্ণনা—উদ্ধৃতির জন্য কিছুটা বেশী জটিল, তবে বেকনের কঠোরতম সমালোচক মেকলের মতটা উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে—"কোন মানবীয় রচনাতেই এত গভীর ও নির্মল জ্ঞানের কথা এমন বিশিষ্টতার সঙ্গে রচিত হয়নি।" লণ্ডনের পার্লিয়ামেন্ট-গৃহই যেন নিউ আটলান্টিসে "সলোমন-গৃহে' রূপান্তরিত হয়েছে—ঐ দ্বীপ-সরকারের বাস-গৃহ। কিন্তু সেখানে কোন রাজনীতিবিদ নেই, নেই কার্লাইলের ভাষায় কোন দাম্ভিক 'নির্বাচিত সদস্য' অথবা 'জাতীয় বাগাড়ম্বর-সভা', নেই দল, রাজনৈতি নির্বাচক সভা, প্রাথমিক সদস্য, সাংগঠনিক সভা, প্রচারণা, বোতাম টেপাটেপি, লিখোছাপা, ইস্তাহার, সম্পাদকীয়, বক্তৃতা, মিথ্যা আর নির্বাচন—এমন নাটকীয়ভাবে সরকারী পদে লোক নিয়োগের এ খেয়াল মনে হয় নিউ আটলান্টিসের লোকদের মাথায়ই ঢোকেনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক খ্যাতির চূড়ায় আরোহণের পথ সকলের জন্যই রয়েছে খোলা আর যারা এ পথ অতিক্রম করেছে একমাত্র তারাই বসতে পারে রাষ্ট্রের শাসন পরিষদে। এ জনগণের সরকার, জনগণের জন্যই কিন্তু জনগণের নির্বাচিত উত্তম-দের দ্বারাই এ সরকার পরিচালিত। এ সরকারের পরিচালক হচ্ছে কারিগর, স্থপতি, জ্যোতির্বিদ, ভূতত্ত্ববিদ, জীব-বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, রাসায়-নিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ-বিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিদ আর দার্শনিকরা। অত্যন্ত জটিল বটে কিন্তু ভাববার কথা রাজনীতিবিদ ছাড়াই গঠিত হবে একটা গভর্ণমেন্ট।

অবশ্য নিউ আটলান্টিসে গভর্ণমেন্ট বলতে কিছুই নেই—যেসব পরিচালক বা শাসকের কথা বলা হয়েছে তারা মানুষকে শাসন করার বদলে বরং ব্যস্ত থাকবেন প্রকৃতিকে শাসন করার কাজে। "আমাদের সংস্থা বা বুনিয়াদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কারণসমূহের জ্ঞান আর বস্তুর গোপন গতি সন্ধান এবং মানব-সাম্রাজ্যের সীমা-রেখা বাড়িয়ে সম্ভাব্য সব বস্তুতে প্রসারিত করা।" এ হচ্ছে ফ্রান্সিস্ বেকন আর এ বাক্যটি হচ্ছে তাঁর গ্রন্থের চাবিকাঠি। আমরা দেখতে পাই শাসকরা লিপ্ত রয়েছে তারকা নিরীক্ষণের মতো অগৌরবের কাজে, জলপ্রপাতের শক্তিকে শিল্পে প্রয়োগের ব্যবস্থায়, নানারকম রোগের চিকিৎসার জন্য গ্যাস্ উৎপাদনে, অস্ত্রো-পচারের জ্ঞান লাভের জন্য জীব-জন্তুর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে নানা রকম নতুন গাছপালা আর জীব-জন্তু উৎপাদন করতে সঙ্কর প্রজননের সাহায্যে ইত্যাদি। "আমরা পাখীর অনুকরণে উড়তে চেষ্টা করছি—কিছুটা উড়তে সক্ষমও হয়েছি। জলের তলায় চলার মতো জাহাজ আর নৌকাও রয়েছে আমাদের।" বৈদেশিক বাণিজ্য আছে তবে তা কিছুটা অদ্ভূত ধরনের যা "ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন দ্বীপে তাই শুধু উৎপন্ন হয় আর যা উৎপন্ন হয় তাই শুধু করা হয় ব্যবহার, বৈদেশিক বাজার আয়ত্তের জন্য করে না কোন রকম যুদ্ধবিগ্রহ।" "আমাদেরও বাণিজ্য আছে বটে তবে তা সোনা-রূপা, হীরা জহরৎ, সিল্ক বা মসলার নয় অথবা অন্য কোন পণ্যের ও বাণিজ্য নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি যে আলো, আমরা শুধু সে আলোরই বাণিজ্য করে থাকি—বিশ্বের সকল অংশের উন্নয়নের যে আলো আমরা সে আলোই পেতে চাই।" এসব আলোর বণিকরা হচ্ছে 'সলোমন-গৃহে'র সদস্য, প্রতি বারো বছর অন্তর এদেরে বিদেশে পাঠানো হয়, সভ্য জগতের এক চতুর্থাংশে বিদেশীদের মধ্যে বাস করার জন্য--যেখানে তারা ওদের ভাষা শিখবে, অধ্যয়ন করবে ওদের বিজ্ঞান, শিল্প আর সাহিত্য। বারো বছর পরে ফিরে এসে 'সলোমন গৃহে'র প্রধানদের কাছে দেবে তাদের সন্ধানের ফলাফলের বিবরণ—ইত্যবসরে বিদেশে তাদের স্থান গ্রহণ করবে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীদের আর এক নতুন দল। এভাবে বিশ্বের যা কিছু ভালো তা সব দ্রুত চলে আসবে নতুন আটলান্টিসে।

খুব সংক্ষিপ্ত হলেও আমরা প্রত্যেক দার্শনিকের য়ূটোপিয়ার রূপ রেখার সন্ধান এখানে পাচ্ছি —একটা জাতি শান্তিতে পরিমিত প্রাচুর্যের মধ্যে তাদের বিজ্ঞতমদের দ্বারা হচ্ছে পরিচালিত, শাসিত। প্রত্যেক ভাবুকেরই স্বপ্ন হচ্ছে রাজনীতিবিদের আসনে বৈজ্ঞানিককে বসানো। এত সব অবতারের পরেও এ স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই রয়ে গেল কেন? ভাবুকরা অতি বেশী স্বাপ্নিক মনশীল বলে সংসার সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিজের কল্পনার বাস্তবায়নে তারা অক্ষম বলেই কি? অথবা সংকীর্ণ অর্জন-লিপ্সুদের কঠোর উচচাকাংখার কাছে দার্শনিক আর ঋষিদের সুকোমল বিবেকী অভীপ্সা পরাজিত হওয়াই কি নিয়তি? হয়ত বিজ্ঞান এখনো নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়নি আর পৌঁছেনি প্রবীনতায় বা সাবালেগত্বে। এখন, আমাদের যুগেই শুধু পদার্থ-বিজ্ঞানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসায়নবিদ আর কারিগরেরা শিল্পে আর যুদ্ধে বিজ্ঞানের যে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা তা দেখতে শুরু করেছে—ফলে সামাজিক সংস্থায়ও তারা আজ পাচ্ছে বিশিষ্ট আসন আর তা ইংগিত দিচ্ছে তাদের সংগঠিত শক্তি একদিন নেতৃত্বের আসন তাদের হাতে ছেড়ে দিতে বিশ্বকে বাধ্য করতে হবে সক্ষম। হয়তো বিজ্ঞান এখনো বিশ্ব কর্তৃত্বের লায়েক হয় নি, সম্ভবত অল্পকালের মধ্যে তা হবে।

৮. সমালোচনা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : ফ্রান্সিস বেকনের এ দর্শনের মূল্যায়ন কি করে করা যায় ?

কোন নতুনত্ব আছে কি এ দর্শনে ? মেকলে মনে করেন বেকন যেভাবে আরোহ তত্ত্ব (Induction) বর্ণনা করেছেন তা পুরোনো ব্যাপার ঐ নিয়ে বিশেষ হৈ চৈ করা বা ওটা তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি মনে করার কোন মানে হয় না। "পৃথিবীর সূচনা থেকেই মানুষ দিনরাত আরোহ অভ্যাস করে আসছে। যে লোকের ধারণা অসুস্থ অবস্থায় খেয়েছিল বলেই গোস্ত-দেওয়া পিঠা তার স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়নি, যখন ঐ রকম খাবে না তখন সে সুস্থ থাকবে, বেশী খেলে বেশী অসুস্থ হবে, কম খেলে কম অসুস্থ হবে—সে অজ্ঞাতে বটে কিন্তু যথাযথভাবে নিউ অর্গাননের সব তালিকাই (Table) পালন করে থাকে।" কিন্তু জন স্মিথ (John Smith) কদাচিৎ তাঁর" কম বা বেশী তালিকা" এমন নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করে থাকেন, আর পেটে ভূমিকম্প হতে থাকলেও বোধকরি গোস্তের তৈয়রী পিঠা তিনি খেতেই থাকবেন। জন স্মিথ ওরকম বিজ্ঞতার পরিচয় দিলেও বেকনের গৌরব কিছুমাত্র খসে পড়ে না, কারণ লজিক বা যুক্তিবিদ্যার কাজই তো হলো বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা আর পদ্ধতিকে সূত্রাকার দেওয়া। যে কোন শাসন-শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যেই তো জন কয়েকের শিল্পকে সর্বসাধারণের শিক্ষণীয় বিজ্ঞানে পরিণত করা।

কিন্তু সূত্রাকার কি বেকন দিয়েছেন ? সক্রেটিসও কি আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করেননি ? এরিস্টোটলের জীব-বিদ্যাও কি আরোহ পদ্ধতির নয় ? ফ্রান্সিস বেকন যে আরোহ পদ্ধতির শুধু প্রচারক ছিলেন

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বয়ং রোজার বেকনও কি তা প্রচার ও ব্যবহার করেননি? বিজ্ঞান যে পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগ করেছে গেলেলিও কি তা আরো উত্তমভাবে প্রণালীবদ্ধ করেননি? একথা রোজার বেকনের বেলায় সত্য, কিছুটা কম সত্য গেলেলিয়োর বেলায়, আরো কম সত্য এরিস্টোটল সম্পর্কে—সবচেয়ে কম সত্য সক্রেটিস সম্পর্কে। সব রকম অভিজ্ঞতা আর সম্পর্কের গাণিতিক আর পরিমাণগত সূত্র-প্রণালীর গন্তব্য তার অনুসরণকারীদের সামনে তুলে ধরে গেলেলিয়ো বিজ্ঞানের পদ্ধতির চেয়ে তার উদ্দেশ্যেরই বরং রূপ-রেখাই এঁকেছেন। কিছুই যখন করার ছিল না তখন এরিস্টোটল আরোহ-পদ্ধতিরই করেছেন অভ্যাস যখন সাধারণভাবে গৃহীত বিরাট রকমের অনুমানও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁৗছার জন্য তাঁর যে স্বাভাবিক প্রবণতা তার বস্তু-গত সহায়তা করতে অক্ষম তখন এ না করে তিনি পারেননি। সক্রেটিস আরোহ, নাম-তালিকা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, শব্দ আর ভাবের পার্থক্য আর সংজ্ঞা নিরূপণ ইত্যাদির তেমন বেশী অভ্যাস করেননি।

অবিমিশ্র মৌলিকতার দাবী বেকনের নয়—সেক্সপিয়রের মতো তিনিও শাহী হাতেই নিয়েছেন—নিয়েছেন যাতেই তিনি হাত দেন তাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন, এ একই অজুহাতে। প্রত্যেক জীবের জন্য যেমন খাদ্য তেমনি প্রত্যেক মানুষেরও রয়েছে মূল বা উৎস—তিনি যা যেভাবে হজম করে রক্ত মাংসে পরিণত করতে পারেন তাই তাঁর নিজস্ব। যেমন র'লী (Rawly) বলেছেন: "বেকন কারো পর্যবেক্ষণকে হেয় মনে করতেন না বরং প্রত্যেকের বাতি থেকে নিজে মশাল নিতেন জ্বালিয়ে।" বেকন সব ঋণেরই জানিয়েছেন স্বীকৃতি—"প্রয়োজনীয় হিপ্পোক্রেটিস (Hippocrates) পদ্ধতির" প্রতি তিনি ইংগিত করেছেন, ফলে গ্রীকদের মধ্যে আরোহ-লজিকের প্রকৃত উৎস কে তাই তিনি আমাদের নির্দেশ করে দেখালেন, তিনি লিখেছেন: "আরোহ আর বিশেষের দৃষ্টি দিয়ে সন্ধানের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্লেটোই (কিছুটা ভুল করে এখানে আমরা সক্রেটিসের উল্লেখ করে থাকি) দিয়ে গেছেন, যদিও এমন অস্থির ও বিক্ষিপ্তভাবে যে তা যেন কোন ফল বা শক্তিই জোগাতে পারেনি।" পূর্বসূরীদের প্রতি তাঁর ঋণ সম্বন্ধে কোন রকম ঝগড়া করতে তিনি ঘৃণা করতেন—আমরাও ঐ সম্বন্ধে অত্যুক্তি করতে না নরাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবারও জিজ্ঞাসা যায়— বেকন পদ্ধতি কি নির্ভুল? এ পদ্ধতি কি আধুনিক বিজ্ঞানে সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে? নাঃ সাধারণ-ভাবে সর্বোত্তম ফলের জন্য বিজ্ঞান, স্তূপীকৃত নাম-তালিকা (প্রাকৃতিক ইতিহাস) এবং সে সবের নিউ অর্গানে উল্লেখিত জটিল নাম-তালিকার প্রয়োগ করেনি বরং প্রয়োগ করেছে কল্পনা, অনুমান আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সরল ও সহজ পদ্ধতি। এভাবে ম্যলথাসের জন-সংখ্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়ে ডারুইন, খাদ্য সরবরাহের তুলনায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হয় ম্যলথেসীয় এ মতবাদ সর্বজীবে প্রয়োগের কথা ভাবতে পেরেছিলেন আর এ থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে খাদ্য সরবরাহের উপর জন-সংখ্যার চাপের ফলে শুরু হয় বাঁচার সংগ্রাম, যে সংগ্রামে টিকে থাকে যোগ্যতম। এভাবে প্রতি জীব-শ্রেণী, প্রতি প্রজননেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। অবশেষে (কল্পনা আর নির্বাচনের দ্বারা তাঁর সমস্যা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রকে তিনি সীমিত করে নিয়েছেন) তিনি প্রকৃতির অম্লান মুখের' দিকে দিয়েছেন নজর আর বিশ বছর ধরে পরম ধৈর্য সহকারে করেছেন সব ঘটনার আরোহী পরীক্ষা। পরে আইনস্টাইন নিজে উপলব্ধি করেছেন অথবা নিউটনের প্রেরণায় বুঝতে পেরেছেন আলো সোজা নয় বরং আঁকাবাঁকা হয়েই চলে—এর থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে আকাশে যে নক্ষত্রকে সোজা রেখায় কোন বিশেষ অবস্থায় দেখা যায় আসলে তা তার থেকে একটুখানি এক ধারে বেঁকে থাকে এবং সব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কল্পনা আর অনুমান সম্বন্ধে বেকন যা ধারণা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী এসবের কার্যকরী শক্তি আর বেকনীয় পদ্ধতি থেকে বিজ্ঞানের নিয়ম পদ্ধতি আরো প্রত্যক্ষ ও পরিবেষ্টিত। বেকন নিজেই তাঁর পদ্ধতি যে অতিরিক্ত বা ফালতু হয়ে যাবে তা বুঝতে পেরেছিলেন —রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি যা করেছেন তারচেয়ে ঢের উত্তম গবেষণা-পদ্ধতি বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের ফলে আবিষ্কৃত হবেই। "এসব জিনিস পরিপক্ক হওয়ার জন্য বহু কালের প্রয়োজন।"

বেকনীয় চিন্তা ধারার পরম প্রেমিককেও স্বীকার করতে হবে যে, বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন রচনার সময় মহান চ্যান্সেলার (অর্থাৎ বেকন)

১২—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গেও তাল রাখতে সক্ষম হননি। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন কপারনিকাশকে, অস্বীকার করেছেন কেপলার (Kepler) আর টাইকো ব্রে'কে (Tycho Brake), কিছুমাত্র মূল্য দেননি গিলবার্টকে, মনে হয় হার্ভে সম্বন্ধে কোন খবরই রাখতেন না তিনি। বস্তুত তিনি গবেষণার চেয়ে আলোচনাই বেশী পছন্দ করতেন, হয়ত শ্রমসাধ্য গবেষণার সময়ই তাঁর ছিল না। দর্শন আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি যা কিছু করেছেন তাঁর মৃত্যুর সময় তা সব বিচ্ছিন্ন আর বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলে গিয়েছিলেন—ফলে ঐ সবে রয়ে গেছে পুনরাবৃত্তি, স্ববিরোধিতা, অভীপ্সা আর মুখবন্ধের নিদর্শন। শিল্প সুদীর্ঘ কিন্তু জীবন দ্রুত বিলীয়মান—এ হচ্ছে প্রত্যেক মহৎ আত্মারই ট্রেজিডি বা বিয়োগান্ত পরিণতি।

এমন একটা কর্ম-ক্লান্ত মানুষের উপর বিরক্তিকর ও দায়িত্ব ভারাক্রান্ত রাজনৈতিক জীবনে যিনি জড়িত, দর্শনের পুনর্গঠনের মতো গুরুভার যা শেক্সপিয়রের সৃষ্টি কর্মের মতই একাধারে জটিল ও বিপুল, তা অর্পণ করা মানে অলস মতসর্বস্বদের বৈঠকী আলোচনায় শিক্ষার্থীদের বৃথা সময়ক্ষেপ করা। যে পাণ্ডিত্য ও দর্শনের জন্য শাহী চ্যান্সেলারের খ্যাতি, শেক্সপিয়রে তার অভাব ছিল। সব বিজ্ঞানেরই কিছুটা ভাসা ভাসা অথচ আকর্ষণীয় জ্ঞান শেক্সপিয়র রাখতেন বটে কিন্তু পুরা দখল কোন বিজ্ঞানেই তাঁর ছিল না। অবিশেষজ্ঞের সহজ আর প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি সব বিজ্ঞান সম্বন্ধেই বলতে পারতেন। তিনি জ্যোতিষকে এ ভাবে নিয়েছেন: "এই বিরাট রাজ্য........যেখানে নক্ষত্রেরা গোপন প্রভাব ছড়ায়" (সনেট)। তিনি প্রায় এমন ভুল করেছেন যা হয়ত সুপণ্ডিত বেকনের পক্ষে সম্ভব ছিল না: তাঁর হেকটর এরিস্টটল থেকে উদ্ধৃতি আউড়ায় আর তাঁর করিয়োলেনাস ইংগিত করে কেটোর (Cato), তিনি লুপারকেলিয়াকে মনে করেন পাহাড় আর সীজারকে যেন প্রায় এচ. জি. ওয়েলসের মতোই গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন আর বৈবাহিক সন্তাপ সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য বার ইংগিত করেছেন। সেকালের স্ট্রেটপোর্ডের (Stratpord) কলহপ্রিয় ভদ্র সন্তানেরা যেসব দুষ্কর্ম করতেন, যে অশোভন, অশ্লীল আর শ্লেষ বাক্য সব ব্যবহার করতেন তিনি নিজেও তাসব করেছেন—কিন্তু শান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও গম্ভীর প্রকৃতির দার্শনিকের কাছে এমন ব্যবহার আশা করা যায় না। কার্লাইল শেক্সপিয়রকে সর্বশ্রেষ্ঠ মননশীল বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু মনে হয় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পনা আর তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি দার্শনিক নন কিন্তু নিঃসন্দেহ ছিলেন মনস্তত্ত্ববিদ—তাঁর নিজের কি বিশ্বমানবের জন্য কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা সমন্বিত এমন কোন চিন্তার কাঠামোই তাঁর ছিল না। তিনি প্রেম আর প্রেমের সমস্যায় ছিলেন নিমজ্জিত। হৃদয় ভেঙ্গে চূর্ণ হলে তবে তিনি দর্শনের কথা ভাবতেন আর তাও মন্টেইনির ভাষায়। অন্যথা, সংসারকে তিনি হৃষ্ট-চিত্তেই করেছিলেন গ্রহণ—পুনর্গঠনের যে দিব্য দৃষ্টি প্লেটো, নীটশে বা বেকনকে দিয়েছে মহত্ব তেমন কোন গভীর ভাবাদর্শের শিকার তিনি হননি।

তাঁর সমন্বয়ী প্রতিভাকে শত বিজ্ঞানে ছড়িয়ে দেওয়ার বাসনা আর তাঁর অদন্য ঐক্য কামনায় সন্ধান মিলবে বেকনের শ্রেষ্ঠত্ব আর দুর্বলতার। তাঁর বাসনা ছিল প্লেটোর মতো তিনি: "এক মহৎ প্রতিভার অধিকারী হয়ে উত্তুঙ্গ পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করে সবকিছুর দৃশ্য করবেন অবলোকন।"

যত সব কাজের দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন তারই ভারে তিনি পড়েছেন ভেঙ্গে তাঁর অসাফল্য এভেবে ক্ষমা করা যায় যে তিনি বড্ড বেশি কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুত রাজ্যে ঢুকতে পারেননি তবে কৌলির (Cowley) স্মারক লিপিতে যে লেখা হয়েছে—'তিনি অন্ততঃ তার (অর্থাৎ বিজ্ঞান-রাজ্যের) সীমান্তে দাঁড়িয়ে দূরে তার মনোরম দৃশ্যাবলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পেরেছেন'—তা যথার্থ বলে মনে হয়।

পরোক্ষ হলেও তাঁর কীর্তি কিছুমাত্র নগণ্য নয়। তাঁর দার্শনিক রচনা এখন খুব কম পড়া হলেও "যেসব প্রতিভা পৃথিবীকে করেছে গতিশীল সেসবকে গতিশীল করেছে তাঁর রচনা।" তাঁর কন্ঠস্বরই মুখর করে তুলেছে রেনেসাঁসের আশাবাদ আর সংকল্পকে। অন্য ভাবুকদের মনে তাঁর মতো এতখানি প্রেরণা আর কেউ কখনো জোগায়নি। বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি যে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজা জেমস্ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন আর নিউ অর্গানন সম্বন্ধে বলেছেন "ওটা ঈশ্বরের শান্তির মতই। কারো বোধগম্য নয়"—এতদ্‌সত্ত্বেও ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন মহত্তর ব্যক্তিরা মিলে রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা কালক্রমে পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্ঘে হয়েছে পরিণত, তাঁদের আদর্শ আর প্রেরণাস্থল বলে তারা বেকনেরই নাম করেছেন আর আশা প্রকাশ করেছেন ইংরেজদের এ গবেষণা কেন্দ্র একদিন নিখিল য়ুরোপ সঙ্ঘে হবে পরিণত যা ছিল বেকনের স্বপ্ন ও আকাংক্ষা। যে আকাংক্ষা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর 'বিদ্যার অগ্রগতিতে' (Advancement of Learning)। যখন ফরাসী বিদ্যা-বত্তার মহৎ-মনারা মননশীলতার সে বিরাট উদ্যোগ 'বিশ্বকোষ' সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তাঁরা ঐটি ফ্রান্সিস বেকনের নামেই করেন উৎসর্গ। ঐ বিশ্ব-কোষের অনুষ্ঠানপত্রে দিদারো (Diderot) বলেছেন: "আমাদের এ উদ্যম যদি সফল হয় তা' হলে এজন্য আমরা চেন্সেলার বেকনের কাছেই ঋণী থাকবো কারণ যখন ধরতে গেলে বিজ্ঞান আর শিল্প বলে কিছুই ছিল না তখনই তিনি শিল্প ও বিজ্ঞানের এমন একটি বিশ্ব-জ্ঞান-কোষ রচনার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। ঐ অসাধারণ প্রতিভা যখন জানা বিষয়ে ইতিহাস রচনা ছিল অসম্ভব তখনই লিখেছিলেন যা জানা অত্যাবশ্যক তার ইতিহাস।" ডি এলেমবার্ট (D. Alembert) বেকনকে বলেছেন "দার্শনিকদের মধ্যে সর্বপ্রধান, সবচেয়ে সার্বজনীন আর সবচেয়ে প্রাঞ্জল।" কন্‌ভেন্‌শন রাষ্ট্রীয় খরচে বেকনের রচনাবলী প্রকাশ করেছেন। সমস্ত বৃটিশ চিন্তা-ধারা আর ধরন-ধারণ বেকন দর্শনকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে। পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর যে ডেমো-ক্রিটিয় (Democritean) যান্ত্রিক প্রবণতা তার থেকেই পুরোপুরি জড়বাদের সূচনা করেছেন তাঁর সেক্রেটারী হবস্‌ (Hobbes), তাঁর আরোহী পদ্ধতি লককে (Locke) দিয়েছে ভূয়োদর্শন-জাত মনস্তত্ত্বের ধারণা—যা হবে পরা-বিদ্যা আর শাস্ত্রের বন্ধন-মুক্ত স্রেফ পর্যবেক্ষণ নির্ভর। তিনি যেভাবে "পণ্য-দ্রব্য" আর "ফলাফলের" উপর জোর দিয়েছেন তা থেকে বেন্থাম (Bentham) ভালো আর প্রয়োজনীয়ের সম-সম্পর্কের সূত্র-নির্মাণ পদ্ধতির পেয়েছেন খোঁজ।

আত্মসমর্পণের ইচ্ছার উপর যেখানে কর্তৃত্ব-সাধনা হয়েছে জয়ী সেখানেই বেকনের অবদান হয়েছে অনুভূত। তাঁর কন্ঠস্বরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে ঐ সব য়ুরোপীয়দের মধ্যে যাদের সাধনায় একটা মহাদেশ জঙ্গল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্প-বিজ্ঞানের ধন-ভাণ্ডারে হয়েছে পরিণত আর যাঁরা একটা ক্ষুদ্র উপদ্বীপকে পরিণত করেছে বিশ্বের কেন্দ্রে। বেকন বলেছেন: "মানুষ খাড়া জীব-জন্তু নয়—বরং অমর দেবতা। স্রষ্টা আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমতুল্য আত্মা দিয়েছেন অথচ সে আত্মা একটা আস্ত পৃথিবী পেয়েও সন্তুষ্ট নয়।" মানুষের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। কাল এখনো তরুণ, আমাদের হাতে কয়েকটি ক্ষুদ্র শতাব্দী দাও, আমরা সবকিছুকে আয়ত্তে এনে নতুন করে গড়ে তুলবো। হয়তো আমরা অবশেষে এ মহত্তম শিক্ষালাভ করবো যে—মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ করা উচিত নয়—প্রকৃতি মানুষের বিজয়ের পথে যে বাধা সৃষ্টি করে মানুষকে এখন এক মাত্র তার বিরুদ্ধেই করতে হবে সংগ্রাম। একটি চমৎকার অনুচ্ছেদে বেকন লিখেছেন: "মানুষের তিন রকমের উচ্চাকাংখার পার্থক্য অনুধাবন করা উচিত (তিনটি পৃথক স্তর হিসেবে) আর এ করা দোষের গণ্য হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রথমতঃ, যারা শুধু নিজের জন্মস্থানের উপর ক্ষমতা বিস্তার করতে চায়: এ হচ্ছে অত্যন্ত ইতর আর হীনমনের পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ যারা চায় সব মানুষের উপর নিজের দেশের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তার করতে—এ অবশ্য এটা অধিকতর আত্মমর্যাদা-জনক কিন্তু এতেও মেলে লুব্ধতার পরিচয়। কিন্তু কেউ যদি সমস্ত বিশ্বের উপর মানবজাতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে নিঃসন্দেহে তা সবচেয়ে মঙ্গলকর আর অন্য দু'য়ের চেয়ে এ হচ্ছে মহত্তর।" এ পরস্পর বিরোধী উচ্চাকাংখার আত্ম-দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হওয়াই ছিল যেন বেকনের বিধি-লিপি।

৯. সমাপ্তি

"উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ত্রি-বিধ চাকর বলা যায়: রাজা বা রাষ্ট্রের চাকর, খ্যাতির চাকর আর নিজের কাজ-কারবারের চাকর, কাজেই এদের কোন স্বাধীনতা নেই—স্বাধীনতা নেই নিজের সময়, নিজের কাজ এমন কি নিজের দেহের ব্যাপারেও.........উচ্চপদে আরোহণ পরিশ্রম-সাপেক্ষ, দুঃখ বা শ্রমের ভিতর দিয়েই মানুষ অধিকতর দুঃখ বা শ্রমে পৌঁছে আর কোন কোন সময় নেহাৎ হীন ও অসম্মানের পথেও মানুষ হয় সম্মানিত। এ অতি পিচ্ছিল অবস্থা এখান থেকে প্রত্যাবর্তন মানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় পতন না হয় মেঘাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ।" বেকনের সমাপ্তি বচনের কি এক সুচিন্তিত সংক্ষিপ্ত সার!

গ্যেটে বলেছেন: "ব্যক্তি বিশেষের ত্রুটির জন্য যুগই দায়ী কিন্তু মহত্ব আর গুণাবলী তাঁর নিজস্ব।" এ মন্তব্যে যুগ-চেতনার প্রতি কিছুটা অবিচার করা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু অত্যুদ্ভুতভাবে বেকনের বেলায় খাঁটি। ফ্রান্সিস বেকন নামক গ্রন্থের লেখক এবট (Abbott) এলিজাবেথের রাজ-সভার নৈতিক-মান সম্বন্ধে বহু শ্রম-সাধ্য অধ্যয়নের পর এ সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছেন—নরনারী নির্বিশেষে সেদিনের সমাজপতিরা সবাই ছিলেন মেকিয়াভেল্লির শিষ্য। রাণী এলিজাবেথের রাজ-সভার চারটি গুণের কথা রোজার এশাম (Roger Aseham) এক ব্যঙ্গ কবিতায় প্রকাশ করেছেন:

'প্রতারণা, মিথ্যা, চাটুকারিতা আর চেহারা,
রাজ-সভাসদদের অনুগ্রহ লাভের এ হচ্ছে চার পন্থা,
এ চারের কোনটারই যে দাস হতে নারাজ
তার রাজ-সভা থেকে তফাত থাকা উচিত।'

তাঁদের কোর্টে যাদের বিচার হচ্ছে তাদের থেকে বিচারকদের উপহার নেওয়া সে প্রাণবন্ত যুগে এক রেওয়াজই তো ছিল। এ ব্যাপারে বেকনও যুগাতীত ছিলেন না—তাঁর অমিতব্যয়ী বিলাসিতা যা তাঁর আয়কে বহু বছর আগাম ছাড়িয়ে যেতো, এ বিষয়ে তাঁকে দ্বিধা করতে দেয়নি। এসেক্সের মোকদ্দমা ব্যাপারে তিনি শত্রু সৃষ্টি না করলে আর যখন তখন বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি বাক্যবান না হানলে এসব হয়তো কারো নজরেই পড়তো না। একজন বন্ধু তাঁকে এ বলে হুঁশিয়ারও করেছিলেন: "রাজ-দরবারে সবারই মুখে একথা শোনা যাচ্ছে.........তোমার জবান অন্যের বেলায় যেমন ধারাল ক্ষুর, তাদের জবানও তোমার প্রতি সে রকম হতে পারে।" কিন্তু হুঁশিয়ারির দিকে তিনি কানই দেননি। মনে হয় তিনি রাজার অনুগ্রহভাজন ছিলেন—১৬১৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে ভেরুলামের ব্যরন করা হয়, ১৬২১শে করা হয় সেন্ট আল-বান্সের ভাইকাউন্ট্ আর তিন বছর ধরে ছিলেন চ্যান্সেলর।

তারপর হঠাৎ এলো আঘাত। ১৬২১শে এক ব্যক্তি তার সপক্ষে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করে দেবেন বলে বেকন তার কাছ থেকে টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছেন এ অভিযোগ করে বসলো—সে যুগে এটা তেমন অভিনব কিছু ছিল না কিন্তু বেকন মুহূর্তে বুঝতে পারলেন তাঁর শত্রুরা এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাঁর পতন ঘটাতে পারবে। তিনি দেশের বাড়ী গিয়ে সেখান থেকে ঘটনার গতি অবলোকন করতে লাগলেন। কিন্তু যখন শুনলেন তাঁর শত্রুরা সবাই মিলে তাঁর বরখাস্তের দাবী জানাচ্ছে তখন তিনি রাজার কাছে তাঁর "দোষ স্বীকার করে সবিনয়ে আত্মসমর্পণ করলেন।" রাজার পক্ষ সমর্থন করে বেকন অবিরাম যে পার্লিয়ামেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন এখন সে পার্লিয়ামেন্ট হয়েছে জয়ী আর এ জয়ী পার্লিয়ামেন্টের দাবী জেমস্ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না কিছুতেই—অতএব বেকনকে পাঠালেন জেল-দুর্গে। কিন্তু দু'দিন পরেই বেকনকে দেওয়া হলো মুক্তি আর যে মোটা জরিমানা করা হয়েছিল রাজা তা করেছিলেন মাপ। তাঁর অহঙ্কারবোধ কিন্তু তখনো ভেঙ্গে পড়েনি। তিনি বলেছেন: "এ পঞ্চাশ বছরের ইংলণ্ডে আমিই ছিলাম সবচেয়ে ন্যায়বিচারক বিচারপতি কিন্তু গত দু'শ বছরের মধ্যে পার্লিয়ামেন্টের পক্ষে এ হয়েছে সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত রায়।" এর পর তাঁর জীবনের যে পাঁচ বছর বাকি ছিল তা তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরে শান্তিতে কাটিয়েছেন যদিও পোয়াতে হয়েছে অনভ্যস্ত দারিদ্র্য-দুর্ভোগ তবে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন সক্রিয় দর্শন চর্চায়। এ পাঁচ বছরে তিনি তাঁর সর্বপ্রধান ল্যাটিন গ্রন্থ De Argumentis Scientiarum, 'প্রবন্ধাবলীর' বর্ধিত সংস্করণ, Sylva Sylvarum নামক এক বিচ্ছিন্ন রচনা সংকলন আর History of Henry VII প্রকাশ করেছেন। আরো আগে কেন তিনি রাজনীতি ত্যাগ করে সমস্ত সময় সাহিত্য আর বিজ্ঞানে নিয়োগ করেননি; এ ভেবে তিনি প্রায় অনুতাপ করতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন—ধরতে গেলে তিনি এক রকম যুদ্ধক্ষেত্রেই গেছেন মারা। তাঁর "মৃত্যু সম্বন্ধে" প্রবন্ধে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁর মৃত্যু যেন "একাগ্র কর্ম-রত অবস্থায় ঘটে, তা হলে উষ্ণ রক্তে আঘাত পেলে তা যেমন কদাচিত অনুভূত হয় তাঁর অবস্থাও তাই হবে (অর্থাৎ মৃত্যু-যাতনা অনুভূত হবে না)।" সীজারের মতোই তাঁরও ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল।

১৬২৬শের মার্চ মাসে তিনি লণ্ডন থেকে হাই গেটে ঘোড়ায় চড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছিলেন আর মনে মনে চিন্তা করছিলেন বরফে ঢেকে রেখে মাংসকে কতকাল পচন থেকে রক্ষা করা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প নিলেন পরীক্ষা করে দেখার। পথে এক কুটিরের অদূরে থেমে একটা মুরগী কিনে নিয়ে ওটাকে মারলেন তারপর দিলেন বরফ চাপা যখন এসব করছিলেন তখন তাঁকে আক্রমণ করলে একই সঙ্গে ঠাণ্ডা আর দুর্বলতায় যখন দেখলেন তাঁর অসুখ এমন যে ঘোড়ায় চড়ে শহরে ফেরা সম্ভব নয় তখন তাঁকে নিকটবর্তী লর্ড অরুণডেলের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন আর সেখানে পোঁছেই তিনি গ্রহণ করলেন শয্যা। তখনো তিনি জীবনের আশা ছাড়েননি--উৎফুল্ল মনে লিখলেন : "আমার পরীক্ষা বেশ ভালোভাবেই সফল হয়েছে।" কিন্তু ঐ তাঁর শেষ কথা। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের উত্তেজক জ্বর তাঁকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে—ভিতরের সব শক্তি যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আর এমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে--রোগ যখন তাঁর হৃদয় আক্রমণ করে বসলো তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট ছিল না তাঁর দেহে। ১৬২৬শের ৯ই এপ্রিল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

তাঁর উইলে বেশ গর্বের সঙ্গে এ বিশেষ অর্থপূর্ণ কথা কয়টি তিনি লিখে গেছেন : "আমি আমার আত্মা ঈশ্বরে অর্পণ করলাম ....দেহটা দিলাম অজ্ঞাত স্থানে সমাধিস্থ করার জন্য। আমার নামটি দিয়ে যাচ্ছি ভবিষ্যৎ আর বৈদেশিক জাতিদের হাতে।"

কাল আর জাতিসমূহ তাঁকে গ্রহণ করেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

স্পিনোজা

॥ ১ ॥

ঐতিহাসিক আর জীবনী-সংক্রান্ত

ক ঃ য়ূহুদী মহা-কাব্য

'বিতাড়নের' পর থেকে য়ুহুদীদের কাহিনী যেন য়ূরোপীয় ইতিহাসের এক মহাকাব্য। রোমানরা ৭০ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেম দখল করার পরই য়ূহুদীরা বিতাড়িত হয়েছে তাদের স্বাভাবিক মাতৃভূমি থেকে—তার পর পলায়ন আর ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে তারা ছড়িয়ে পড়েছে সব মহাদেশের সব জাতির মধ্যে। যে দুই বিরাট ধর্ম খ্রীস্টীয় আর মোহাম্মদীয়—তাদের ধর্ম-শাস্ত্র আর স্মৃতি থেকেই নিয়েছে জন্ম, সে দুই ধর্মের অনুসারীদের নির্যাতনে এদের সংখ্যা পেয়েছে দিন দিন ক্ষয়। বণিক সংঘগুলি রুদ্ধ করেছে এদের শিল্পে অংশ গ্রহণের পথ আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এদের দেয়নি ভূমির মালিক হতে। অবরুদ্ধ হয়েছিল এরা সংকীর্ণ গ্রাম-সীমা আর অতি সীমিত পেশায়। ওদেরে ক্ষীপ্ত জনতা করেছে আক্রমণ আর রাজারা করেছে লুন্ঠন। ওরা গড়ে তুলেছে শহর ও বাণিজ্য—যা সভ্যতার বিকাশের জন্য অপরিহার্য। হয়েছে নির্বাসিত, সমাজচ্যুত, অপমানিত আর আহত-ক্ষতিগ্রস্ত। এত সব সত্ত্বেও এ অদ্ভুত জাতি বেঁচে রয়েছে নিজের দেহ-মন রক্ষা করে—না ছিল এদের কোন রাজনৈতিক কাঠামো, না ছিল সামাজিক ঐক্য রক্ষার কোন আইনের বন্ধন, এমন কি ছিল না কোন সাধারণ ভাষা পর্যন্ত। তবুও এরা রক্ষা করেছে নিজেদের রক্ত আর সংস্কৃতির অবিমিশ্রতা। এক ঈর্ষান্বিত প্রেমের দ্বারাই যেন রক্ষা করেছে নিজেদের প্রাচীনতম ঐতিহ্য আর ধর্মাচার আর মুক্তি দিবসের প্রতীক্ষা করেছে এক অসীম ধৈর্য আর অটল সঙ্কল্প নিয়ে। অবশেষে দু'হাজার বছর ধরে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াবার পর, পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী বর্ধিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার অবদানে অধিকতর খ্যাতিমান হয়ে—বিজয় গৌরবে ফিরে এসেছে নিজেদের প্রাচীন আর অবিস্মৃত স্বদেশে। এত নির্যাতন-মহিমা, এমন বিচিত্র-দৃশ্য আর এমন গৌরব আর পূর্ণ-সাফল্যের সাথে তুলিত হতে পারে তেমন নাটক কোথায়? এ বাস্তব-রোমাঞ্চের সঙ্গে তুলনা করার মতো উপন্যাসই বা কোথায় মিলবে? তীর্থ-ভূমির পতনের বহু শতাব্দী আগে থেকেই শুরু হয়েছে 'বিতাড়ন' আর ছড়িয়ে পড়া—টায়ার (Tyre), সিডন (Sidon) ও অন্যান্য বন্দর দিয়ে য়ুহুদীরা ভূমধ্যসাগরীয় সব অখ্যাত আনাচে কানাচেও পড়েছিল ছড়িয়ে—ঢুকে পড়েছিল এথেন্স, এন্টিওক, আলেকজেন্ড্রিয়া, কার্থেজ, রোম মার্সেলেস্ এমন কি সুদূর স্পেনে পর্যন্ত। মন্দির ধ্বংসের পর এ ছড়িয়ে-পড়া পরিণত হয় সার্বিক দেশত্যাগে। শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগের এ স্রোত বয়ে চলে দুই পথে—এক, দানিউব আর রাইন নদী হয়ে পোলাণ্ড আর রাশিয়ার দিকে, অন্য স্রোত ঢুকে পড়ে বিজয়ী মূরদের সঙ্গে (৭১১ খ্রীঃ) স্পেন আর পর্তুগালে। মধ্য য়ুরোপে য়ুহুদীরা খ্যাতি অর্জন করে বণিক আর অর্থবিদ হিসেবে আর উপদ্বীপে তারা সানন্দে আয়ত্ত করে নেয় আরব দর্শন, চিকিৎসা আর গণিতবিদ্যা, কর্ডোভা, বার্সিলোনা আর সেভিলে গড়ে তোলে নিজেদের সংস্কৃতি। এখানে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম য়ুরোপে প্রাচীন প্রাচ্য সংস্কৃতি প্রচারের ব্যাপারে য়ুহুদীরা এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কর্ডোভায় বসেই সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ মোজেস্ মায়মনিডেস (Moses Maimonides 1135—11204) বাইবেলের বিখ্যাত ভাষ্য 'হত-বুদ্ধিদের পথনির্দেশ' (Guide to the Perplesed) রচনা করেন আর বার্সিলোনায় বসে হেসডেই ক্রেস্কাস (Hasdai Crescas 1370—1430) প্রচার করলেন এমন এক ধর্মোদ্রোহী মতবাদ যাতে আলোড়িত হলো সমগ্র য়ুহুদী জগৎ।

১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে ফার্ডিনেন্দ্ (Ferdinand) গ্রানাডা জয় করে মূরদের নিঃশেষে তাড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত স্পেনীয় য়ুহুদীরা ছিল বেশ সমৃদ্ধ ও উন্নত। ইসলামের উদার কর্তৃত্বের অধীনে উপদ্বীপীয় য়ুহুদীরা যে অবাদ স্বাধীনতা ভোগ করতো এখন তারা তার থেকে হলো বঞ্চিত। 'ধর্মোদ্রোহিতার' বিচার-দণ্ড নেমে এলো তাদের উপর, বলা হলো হয় তৌবা করে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করো না হয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পাঠানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে নির্বাসনে। গির্জা যে খুব য়ূহুদী বিদ্বেষী ছিলো তা নয়, এমন কি পোপ বার বারই ধর্মোদ্রোহিতা বিচারের' বর্বরতার বিরুদ্ধে জানিয়েছেন প্রতিবাদ কিন্তু স্পেনরাজ ভাবলেন এভাবে এদেরে তাড়াতে পারলে দীর্ঘ ধৈর্য্যে সঞ্চিত এ বিজাতির ধনে তিনি তাঁর রাজ-ভাণ্ডার করে তুলতে পারবেন স্ফীত। প্রায় যে বছর কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন সে বছরই ফার্ডিনেন্দ্ আবিষ্কার করলেন য়ূহুদীদের।

অধিকাংশ য়ূহুদী বেছে নিল কঠিনতর পথ আর চারদিকে খুঁজতে লাগলো একটা আশ্রয়স্থল। কেউ কেউ জাহাজে করে ইটালীর জেনোয়া ইত্যাদি বন্দরে প্রবেশ করতে চাইল কিন্তু পেল না প্রবেশাধিকার। তারপর ক্রমবর্ধমান দুঃখ-শোক-রোগ নিয়ে জাহাজ চালিয়ে কোন রকমে পৌঁছলো গিয়ে আফ্রিকার উপকূলে, তাদের উদরে সোনা আছে (অর্থাৎ শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তারা সোনার পিণ্ড সব গিলে উদরে রেখে দিয়েছে) এ সন্দেহে সেখানে তাদের অনেকেই হলো নিহত। কিছু সংখ্যক য়ুহুদী আশ্রয় পেলো ভেনিসে—কারণ ভেনিস জানতো তার নৌ-শক্তির প্রাধান্য তার য়ুহুদী নাগরিকদেরই অবদান। অনেক য়ুহুদী হয়তো নিজেদের সগোত্র মনে করে তিনি তাদের জন্য একটি নতুন স্বদেশ খুঁজে বার করতে পারবেন এ আশায় কলম্বাসের সমুদ্র-যাত্রার ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। অনেকে আবার সে যুগের ক্ষণ ভঙ্গুর জল-যানে চড়ে, ইংলেণ্ড আর ফ্রান্সের মতো দুই শত্রু দেশের মাঝখান দিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন আট-লান্টিক মহাসমুদ্রে—এরা আশ্রয় পেলেন ক্ষুদ্র অথচ দরাজ দিল হোলাণ্ডে। এদের মধ্যে স্পিনোজা নামে একটি পর্তুগীজ য়ূহুদী পরিবারও ছিল।

এর পর থেকেই শুরু হলো স্পেনের অবক্ষয় আর হোলাণ্ডের সমৃদ্ধি। য়ূহুদীরা আমস্টারডামে তাদের প্রথম ধর্ম মন্দির তৈয়রী করলো ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে—এর পঁচাত্তর বছর পরে তারা যখন আর একটি ধর্ম-মন্দির—যা য়ুরোপে সবচেয়ে মনোরম, তৈয়ার করতে অগ্রসর হলো তখন তাদের খ্রীস্টান প্রতিবেশীরাও অর্থ-সাহায্য করেছিল। য়ূহুদীরা যে এখানে সুখে শান্তিতে ছিল তা আমরা রেমব্রেণ্ডের অমর তুলিতে আঁকা পুষ্টদেহ য়ূহুদী বণিক আর ধর্ম-যাজকদের ছবি দেখেও বুঝতে পারি। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হঠাৎ য়ূহুদী ধর্ম-মন্দিরে এমন এক তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হলো যে তাতে এতদিনের শান্ত আবহাওয়া নতুন করে আলোড়িত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠলো। হয়তো সন্দেহ-প্রবণ রেনেসাঁসের প্রভাবেই উরিয়েল এ কোস্টা (Uriela Costa) নামে এক অত্যন্ত আবেগপ্রবণ য়ূহুদী তরুণ পরলোকী জীবনের ধারণাকে তীব্র আক্রমণ করে এক বই লিখে বসেছিলেন। ঐ ধারণা প্রাচীন য়ূহুদী মতবাদের খুব যে বিরোধী তা নয় কিন্তু য়ুহুদী-মন্দির কর্তারা প্রকাশ্যে এ মত পরিত্যাগ করতে উক্ত তরুণকে বাধ্য করলেন এ বলে যে, যে-সম্প্রদায় আমাদেরে সাদরে আশ্রয় দিয়েছে, বরণ করে নিয়েছে উদারতার সঙ্গে, এতে আমরা তাদের বিরাগভাজন হবো—যাকে খ্রীস্টধর্মের মূল বিশ্বাস মনে করা হয় তার বিরুদ্ধে কথা বলাকে রীতিমতো ধর্মোদ্রোহিতা ভেবে নিয়ে ওরা সমস্ত য়ূহুদী সম্প্রদায়েরই শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। মত-পরিত্যাগ নতুবা দণ্ড-বিচার এ ঠিক হলো। দণ্ড মানে, ঐ দাম্ভিক তরুণকে আড়াআড়িভাবে মন্দিরের চৌকাঠে শুয়ে থাকতে হবে আর উপাসকমণ্ডলী তাকে পায়ে মাড়িয়ে ঢুকবেন মন্দিরে। এ অপমান সহ্য করতে না পেরে উরিয়েল বাড়ী ফিরে তার অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে লিখলেন এক তীব্র নিন্দা তার পর নিজের হাতে গুলি করে বরণ করলেন মৃত্যু। এ হচ্ছে ১৬৪০-এর ঘটনা। তখন য়ুহুদী ধর্ম-মন্দিরের প্রিয় ছাত্র, এ যুগের সর্বপ্রধান দার্শনিক আর বর্তমানকালের "সর্বশ্রেষ্ঠ য়ূহুদী" ব্যরুস স্পিনোজার (Baruch Spinoza) বয়স মাত্র আট।

AMARBOI.COM

খ. স্পিনোজার শিক্ষা

য়ূহুদী জাতির এ মহাকাব্যই জুগিয়েছে স্পিনোজা-মনের পটভূমি—সমাজচ্যুত হলেও তিনি রয়ে গেছেন অপরিবর্তনীয় য়ূহুদী। তাঁর পিতা এক সফল বনিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন না মোটেও—বরং চাইলেন ধর্ম-মন্দিরে বা তার আশেপাশে থেকে তাঁর জাতির ধর্ম আর ইতিহাস অধ্যয়নে মগ্ন হয়ে থাকতে। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। বয়স্করা তাঁকে মনে করতেন তাঁদের ধর্ম আর সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ আলোক-বর্তিকা। অনতিবিলম্বে তিনি বাইবেল অধ্যয়ন শেষ করে তৌরাতের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল ভাষ্য পড়া শুরু করলেন —তারপর পড়তে লাগলেন মায়মনিডেস্। লেভি বেন গারসন, ইবনে এজরা আর হাস্ডায়ই ক্রেস্কাসের লেখা। তাঁর নির্বিচার আর নির্বিশেষ এ পেটুকী অধ্যয়নের সীমা এতখানি বিস্তৃত ছিল যে তার থেকে ইব্‌নে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেবিরলের রহস্যময় দর্শন আর কর্ডোভার মোসেজের অতিসূক্ষ্ম গূঢ় অর্থবহ রচনাও বাদ পড়েনি।

'ঈশ্বর আর বিশ্ব এক' শেষোক্তজনের এ ধারণায় তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন—অনুসরণ করেছিলেন বেন গার্সনের 'বিশ্বের চিরন্তনতা' মতের, আর হাসডায়ই ক্রেসকাসের, যিনি বিশ্বাস করতেন এ বস্তু-বিশ্বই ঈশ্বর-দেহ। 'অমরতা নৈর্ব্যক্তিক' ইব্‌নে রুশদের এ মতের অর্ধ অনুকূল আলোচনা তিনি পড়েছেন মায়মনিডেসে কিন্তু 'হতবুদ্ধিদের পথ-নির্দেশে' পথ-নির্দেশের চেয়ে তিনি হতবুদ্ধিতাই দেখতে পেয়েছিলেন বেশী। কারণ লেখক ধর্ম-যাজক প্রবর যত না উত্তর দিয়েছেন তার থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন অনেক বেশী। মায়মনিডেসের বাৎলানো সমাধান মন থেকে মুছে যাওয়ার পরও দীর্ঘকাল স্পিনোজা ওল্ড্ টেস্টামেন্ট বা তৌরাতে যে সব অসম্ভব আর স্ববিরোধিতা দেখতে পেয়েছিলেন তা কিছুতেই ভুলতে পারেননি। ধর্মের সেরা কৌশলী চতুর সমর্থকরাই অবশেষে ধর্মের প্রধানতম শত্রু হয়ে দাঁড়ান কারণ তাঁদের সূক্ষ্ম চাতুর্যই সন্দেহের সঞ্চার করে আর মনকে করে তোলে সচেতন। মায়মনিডেসের লেখা সম্বন্ধে এ কথা যতখানি সত্য তার চেয়ে অনেক বেশী সত্য ইব্‌নে এজরার ভাষ্য সম্বন্ধে—ওখানে পুরোনো ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি অনেক বেশী খোলাখুলি আলোচনা করেছেন, সময় সময় উত্তর দেওয়া অসম্ভব বলে এড়িয়ে গেছেন অনেক সমস্যা। স্পিনোজা যতই পড়তে আর ভাবতে লাগলেন ততই তাঁর মনের সরল বিশ্বাস সব গলে গিয়ে তাতে বিস্ময় আর সন্দেহের সঞ্চার হতে লাগলো।

ঈশ্বর আর মানব-নিয়তির এ বিরাট জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে খ্রীস্ট-জগতের চিন্তাবিদরা কি লিখে গেছেন তা জানার জন্য তাঁর মনে এক অদম্য কৌতূহলের সঞ্চার হলো। ভন্ ডেন্ এণ্ডে নামক এক ডাস্ পণ্ডিতের কাছে তিনি ল্যাটিন শেখা আরম্ভ করলেন আর শুরু করলেন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার আরো বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিচরণ করতে। তাঁর এ নতুন শিক্ষক নিজেও কিছুটা ধর্ম ব্যাপারে অবিশ্বাসী ছিলেন, সরকার আর ধর্ম-মত দু'য়েরই করতেন সমালোচনা—মনে পোষণ করতেন উচ্চাকাংক্ষা তাই পাঠাগার ছেড়ে যোগ দিলেন ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে। পরিণামে ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে ফাঁসি কাষ্ঠেই ঘটে তাঁর জীবনাবসান। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল এক সুন্দরী কন্যা, স্পিনোজার প্রেমের জন্য ল্যাটিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো সে-ই—আধুনিক কলেজ-ছাত্রও এমন প্রেরণা পেলে সানন্দে ল্যাটিন শিখতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকার মতো মননশীল ছিলেন না তরুণী সুন্দরীটি—যখন অধিকতর বিত্তশালী আর একজন প্রার্থী মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে আবির্ভূত হলেন তখন তিনি স্বচ্ছন্দে স্পিনোজার কথা ভুলে বসলেন। সন্দেহ করার কারণ নেই আমাদের এ আলোচনার নায়কও তখন থেকে হয়ে গেলেন দার্শনিক।

যাই হোক ল্যাটিন আয়ত্ত করে তিনি প্রাচীন আর মধ্যযুগীয় য়ূরোপীয় চিন্তা-রাজ্যের ঐতিহ্যে প্রবেশ করতে এবার সক্ষম হলেন। মনে হয় তিনি সক্রেটিস, প্লেটো আর এরিস্টোটল পড়েছিলেন কিন্তু পছন্দ করতেন ডেমো-ক্রিটাস, এপিকুরাস আর লুক্রেটিয়াসের মতো পরমাণুবাদীদের আর তাঁর মনে অক্ষয় দাগ কেটেছিল বৈরাগ্যবাদীরা। তিনি অধ্যয়ন করেছেন মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যবাদী দার্শনিকদের রচনা, তাদের থেকে তিনি যে শুধু তাদের পরিভাষা গ্রহণ করেছেন তা নয়, নিয়েছেন কোন কিছু ব্যাখ্যা করার তাদের জ্যামিতিক পদ্ধতিও, যেমন স্বতঃসিদ্ধ, সংজ্ঞা, প্রতিপাদ্য, প্রমাণ, টীকা এবং উপ-প্রতিপাদ্য ইত্যাদি। তিনি অধ্যয়ন করেছেন মহাবিদ্রোহী ব্রুনোর (Bruno 1548—1600) রচনা—যাঁর অন্তরের আগুন সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে "ককেসাসের সমস্ত তুষাররাশিও তাঁর মনের আগুন নিভাতে পারেনি", যিনি ক্রমাগতই বিচরণ করেছেন দেশ থেকে দেশে, এক ধর্ম বিশ্বাস থেকে অন্য ধর্ম বিশ্বাসে আর ঘুরতে ঘুরতে, সন্ধান করতে করতে "যে দরজা দিয়ে ঢুকেছেন আবার সে দরজা দিয়েই এসেছেন বেরিয়ে," অবশেষে যাঁকে খ্রীস্টীয় ধর্ম আদালত দণ্ড দিয়েছেন—"কোন রকম রক্তপাত না করে যতখানি সম্ভব করুণার সঙ্গেই করতে হবে হত্যা—অর্থাৎ তাঁকে দগ্ধ করতে হবে জীবন্ত।" এ কল্পনাপ্রবণ ইটালীবাসীর মনে ভাবের কি অপরিমিত ঐশ্বর্যই না ছিল! প্রথমতঃ ভাবের সেরা ভাব ঐক্যবোধঃ মূলে সব বাস্তবতাই এক, কারণও এক, মূলও এক আর ঈশ্বর আর এ বাস্তবতাও এক। ব্রুনোর কাছে মন আর পদার্থও এক। বাস্তবতার প্রতিটি কণা অবিচ্ছিন্নভাবে দেহ আর মনের সংযোগেই গঠিত। তাই দর্শনের উদ্দেশ্য বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, পদার্থে মন আর মনে পদার্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলব্ধি আর এমন একটা সমন্বয় খোঁজা যেখানে মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যাবে সব রকম বৈপরিত্য আর স্ব-বিরোধিতা। এ বিশ্বব্যাপী ঐক্য-জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহন করাই হচ্ছে মননশীলতায় ঈশ্বর প্রেমের সমতা অর্জন। এসব ভাবের প্রতিটি অংশই স্পিনোজা-চিন্তার অন্তরঙ্গ গঠনে সহায়তা করেছে।

অবশেষে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন ডেসকার্টিসের (Descartes 1596-1650) দ্বারা যে ডেস্‌কার্টিসকে মনে করা হয় আধুনিক দর্শনের মন্ময় আর আদর্শবাদী ঐতিহ্যের জনক বলে (যেমন বেকনকে মনে করা হয় তন্ময় আর বাস্তববাদী দর্শনের জনক)। তাঁর ফরাসী অনুরাগী আর ইংরেজ বিরুদ্ধবাদীদের ধারণা ডেস্‌কার্টিসে কেন্দ্রীয় ভাব হলো চেতনার প্রাধান্য—তাঁর স্পষ্ট মত হলো মন অন্য কিছু জানার চেয়ে নিজেকেই অধিকতর দ্রুত আর প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে, "বহির্জগতকে" মন শুধু অতটুকুই জানতে পারে যতটুকু সে-জগৎ তার চেতনা আর বোধিতে দাগ কাটতে সক্ষম। তাই সব দর্শনেরই সূচনা হওয়া উচিত ব্যক্তিগত মন আর অহংএ (অন্য সব কিছুকেই সন্দেহ করা উচিত) আর তিনটা মাত্র শব্দই হওয়া উচিত তার (অর্থাৎ মনের) প্রথম যুক্তি: "আমি ভাবি, তাই আমি আছি" (ল্যাটিনে এ কথাটা তিনটা মাত্র শব্দেই প্রকাশিত হয়েছে)। সম্ভবতঃ রেনেসাঁসের ব্যক্তিত্ব বোধের আভাস আমরা এখানে পাচ্ছি—সত্যই কল্পনা-বিদ্যার ভবিষ্যৎ পরিণতির বহু যাদুকরী বীজই যেন একথায় নিহিত। এবার শুরু হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাক্রীড়া—যা লিবনিট্‌জ্ (Leibnitz), লকে (Locke), বার্কলে (Barkley) হিউম (Hume) আর কান্ট্ (Kant) মিলে এমন এক তিন শ' বছরব্যাপী বাক্-যুদ্ধে পরিণত করেছিল যে, যা একদিকে আধুনিক দর্শনকে অনুপ্রাণিত যেমন করেছিল তেমনি করেছিল ধ্বংসও।

কিন্তু ডেস্‌কার্টিসের চিন্তার এদিকটা সম্বন্ধে স্পিনোজা তেমন কৌতূহল বোধ করেননি—জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোলক ধাঁধায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতে তিনি রাজি ছিলেন না। কিন্তু সব বস্তু-রূপের মূলে একটা সমজাতীয় "বস্তু" আর সব মনের রূপের মূলেও রয়েছে অনুরূপ সমজাতীয় বস্তু—ডেস্‌কার্টিসের এসব উপলব্ধিই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী করে। এভাবে বাস্তবকে দুই চূড়ান্ত বস্তুতে বিভক্ত করা স্পিনোজার ঐক্য-প্রবণতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি যে এক চ্যালেঞ্জ—তাঁর স্তূপীকৃত চিন্তায় তা হয়ে দাঁড়ালো বিচিত্র ফলপ্রসূ অঙ্কুর। ঈশ্বর আর আত্মাকে বাদ দিয়ে বাদ বাকী বিশ্বের যাবতীয় কিছুকে যান্ত্রিক আর গাণিতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করতে যে ডেস্‌কার্টিস চেয়েছেন তার প্রতিও স্পিনোজা আকৃষ্ট হয়েছিলেন—অবশ্য এ ভাব অনেক আগে লিউনার্ডো আর গেলেলিয়োতেও দেখা গেছে, হয়তো তখন ইটালীর নগরগুলিতে যন্ত্র আর শিল্পের যে উন্নতি ঘটেছিল এ তারই প্রতিচ্ছায়া। ডেস্‌কার্টিস বলেছেন গোড়াতে প্রথম ধাক্কাটা ঈশ্বরই দিয়েছেন (দু' হাজার বছর আগে এনেক্সাগোরাসও অনুরূপ কথা বলে গেছেন), বাদ বাকী সব কিছুই—যেমন জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা আর যা কিছু অ-মানসিক ও সব রকম বিকাশ এক সমজাতীয় পদার্থ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়, যে পদার্থ প্রথম অবস্থায় ছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে (লেপলেস (Laplace) আর কান্টের 'নৈহারিক কল্পনা')। প্রতিটি প্রাণীর প্রত্যেকটা গতি, এমন কি মানব দেহেরও যান্ত্রিক নিয়মেই সাধিত হয়। উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যায় রক্ত চলাচল আর স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ার। সমস্ত বিশ্ব জগৎ এবং প্রত্যেকেই এক একটি যন্ত্র বিশেষ কিন্তু বিশ্বের বাইরে আছে ঈশ্বর আর মানুষের দেহাভ্যন্তরে আছে আধ্যাত্মিক আত্মা।

এখানে ডেস্‌কার্টিস থেমে পড়েছেন কিন্তু সাগ্রহে স্পিনোজা। গেছেন এগিয়ে।

গ. সমাজ-চ্যুতি

১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে ধর্মোদ্রোহিতার অভিযোগে যখন স্পিনোজাকে (জন্ম: ১৬৩২ খ্রীঃ) য়ুহুদী ধর্ম-মন্দিরের প্রবীন নেতাদের সামনে হাজির করা হলো তখন বাইরে শান্ত ভিতরে বিচলিত এ তরুণের পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত অবস্থাই ছিল মন-মানসের পটভূমি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: ঈশ্বরেরও দেহ আছে অর্থাৎ তিনিও বস্তুজগতের সামিল, ফেরেস্তারা সব ভ্রান্ত-কল্পনা। আত্মা স্রেফ জীবনী শক্তিই, ওল্ড্‌ টেস্টামেন্টে অমরতা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নেই—এসব কথা কি তুমি সত্য সত্যই তোমার বন্ধুদের কাছে বলেছ?

তাঁর উত্তর আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু জানি তিনি যদি য়ুহুদী ধর্ম আর ধর্ম-মন্দিরের প্রতি অন্তত বাইরে, মৌখিক আনুগত্যও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখান তা হলে তাঁকে পাঁচ শ' ডলার বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হবে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলে ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুলাই হিব্রু ধর্ম-বিধানের গুরু গম্ভীর যত সব আচার অনুষ্ঠান যথাবিধি পালন করে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হলো। "অভি-সম্পাত পাঠের সময়, একটি বিরাট শিঙ্গা থেকে বিলম্বিত বিলাপ ধ্বনির উত্থান-পতন যাচ্ছিল শোনা, অনুষ্ঠানের সূচনায় যে সব আলো অতি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলছিল অনুষ্ঠানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে তা দেওয়া হলো নিভিয়ে, অবশেষে নিভিয়ে দেওয়া হলো সর্ব শেষটিও—এ যেন সমাজ-চ্যুত ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনেরও সমাপ্তি ঘোষণার প্রতীক। উপস্থিত ধর্মমণ্ডলীও নিমজ্জিত হলো অন্ধকারে।"

স্পিনোজাকে সমাজচ্যুত করার সময় যে জাবেতা ব্যবহার করা হয়েছিল ভন ব্লটেন (Von Vloten) তা আমাদের সরবরাহ করেছেন:

'যাজক মণ্ডলীর নেতারা এ কথা জানিয়ে দিতে চান যে তাঁরা বেরুচ দ্য ইস্পিনোজার পাপ মতামত ও কাজের সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে নানাভাবে ও বহুরকম প্রতিশ্রুতির দ্বারা তাকে তার পাপ পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করেছেন। তাকে তখন কোন রকমেই সুচিন্তার পথে আনা গেল না, বরং উল্টো প্রতিদিন তার বিরুদ্ধে ভয়াবহ সব ধর্মোদ্রোহিতা, যা সে প্রকাশ্যে দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করে বেড়ায় তা প্রমাণিত হয়েছে এবং বহু বিশ্বস্ত ব্যক্তি যখন কথিত স্পিনোজার সামনেই সে সম্বন্ধে দিয়ে গেছে প্রামাণ্য সাক্ষ্য—তখন আমরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ডিত করলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ধর্মযাজক মণ্ডলীর নেতারা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যে সিদ্ধান্ত সভাসদরাও করেছেন অনুমোদন—কথিত স্পিনোজাকে অভিসম্পাত দিতে হবে, কেটে দিতে হবে ইসরাইল জাতির সঙ্গে তার সব সম্পর্ক। এখন থেকেই নিম্নলিখিত অভিশাপ-বাণী দিয়ে তাকে ঘোষণা করা হবে অভিশপ্ত বলে:

পবিত্র সম্প্রদায়ের সম্মতিতে আর ছ'শ তেরটি উপদেশ সম্বলিত পবিত্র গ্রন্থসমূহ সামনে রেখে, ফেরেস্তাদের সিদ্ধান্ত আর সাধু-সন্তদের দণ্ডাদেশের সঙ্গে আমরা বেরুচ দ্য ইস্পিনোজাকে অভিসম্পাত দিচ্ছি, প্রকাশ করছি তার প্রতি ঘৃণা, তার জন্য কামনা করছি গজব আর তাকে করছি বিতাড়িত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এলিসা (Elisha) তাঁর সন্তানদের প্রতি যে সব অভিশাপ হেনেছিলেন আর বিধি-পুস্তকে (Book of the Law) যে সব অভিশাপ লিপিবদ্ধ আছে সে সব অভিশাপে সে হোক অভিশপ্ত। তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক দিনের বেলা—অভিশাপ বর্ষিত হোক রাত্রি বেলা, যখন সে শুয়ে থাকে তখন হোক অভিশপ্ত, অভিশপ্ত হোক যখন ও জেগে থাকে তখনো, অভিশপ্ত হোক যখন ও ঘরে ফিরে আসে আর অভিশপ্ত হোক যখন ও যায় বেরিয়ে। ঈশ্বর যেন তাকে আর কখনো ক্ষমা না করেন আর যেন গ্রহণ না করেন কখনো। এখন থেকে এ লোকটার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিশাপ আর ক্রোধ যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে থাকে। বিধি-পুস্তকে লিখিত সব অভিশাপে তাকে করা হোক ভারাক্রান্ত, আসমানের নিচের এ দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা হোক তার নাম। ঈশ্বর যেন তার সমস্ত পাপ থেকে ইসরাইলদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন, আকাশব্যাপী যত অভিশাপের কথা লিপিবদ্ধ আছে বিধি-পুস্তকে তার সব দিয়ে তাকে করা হোক ভারাক্রান্ত। আর যারা প্রভু ঈশ্বরের প্রতি অনুগত তারা যেন আজ পায় রক্ষা।

এতদ্‌সঙ্গে সকলকেই সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে—এখন কেউ যেন তার সঙ্গে জবানে কোন আলাপ না করে, লেখার সাহায্যে কেউ যেন না রাখে কোন সম্পর্ক, কেউ যেন তার কোন কাজ করে না দেয়। কেউ যেন তার সঙ্গে একই ছাদের নিচে বাস না করে, কেউ যেন তার চার হাতের মধ্যেও না যায় আর কেউ যেন তার নিজের হাতে লেখা বা মুখে বলা কোন দলিল বা রচনা না পড়ে।'

যাজকমণ্ডলীর নেতাদের সম্পর্কে কোন ত্বরিৎ রায় দেওয়া সঙ্গত হবে না কারণ তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছিল এক নাজুক সমস্যার। খৃস্টীয় যাজক-বিচারের প্রচলিত মত বিরোধিতার প্রতি যে অসিহিষ্ণুতা তাদেরে স্পেন থেকে করেছে বিতাড়িত সে একই অপরাধে তারা নিজেরাও অপরাধী হচ্ছে এ কথা ভেবে তাদের মনে নিশ্চয়ই কিছু দ্বিধার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু যে লোকটার মতামত শুধু য়িহুদী ধর্মের নয় খৃস্টীয় ধর্ম-মতের মূলেও কুঠারাঘাত করছে তাকে সমাজচ্যুত করা তাদের বিপদের দিনের আশ্রয়দাতাদের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার দাবী এ মনে না করে তারা পারেনি। তখনো প্রটেস্‌টেন্টাস্‌ ধর্মমত এখনকার মতো উদার ও অবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শন হয়ে দাঁড়ানি—ধর্মমত নিয়ে যে যুদ্ধ ঘটেছে তাতে নিজ নিজ মতের সপক্ষে লড়তে গিয়ে সম্প্রতি যে রক্তপাত হয়েছে তার স্মৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নিজ নিজ মত বিশ্বাসে অনড়ভাবে গণ্ডীবদ্ধ করে তুলেছিল। খৃস্টীয় উদারতা আর আশ্রয় প্রাপ্তির বিনিময়ে য়ূহুদী সম্প্রদায় যদি এক প্রজননে একটা এ. কোস্টা (A. Costa) আর পরবর্তী প্রজননে একটা স্পিনোজা সৃষ্টি করে বসে তা হলে ডাচ্ কর্তৃপক্ষই বা কি ভাববেন? অধিকন্তু সমাজ-নেতাদের হয়ত মনে হয়েছে আমস্টারডামের ক্ষুদ্র য়ূহুদী সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচিয়ে সংঘবদ্ধ রাখতে হলে ধর্ম বিশ্বাসে ঐক্য চাই—আর সামাজিক ঐক্য রক্ষার এ হচ্ছে শেষ অবলম্বন, পৃথিবীব্যাপী বিচ্ছিন্ন য়ূহুদীদের আত্মরক্ষায় এ একমাত্র উপায়। যদি তাদের নিজেদের রাষ্ট্র থাকতো, থাকতো নিজেদের আইনকানুন, নিজেদের ধর্ম-নিরপেক্ষ সংস্থা আর কর্তৃত্ব যার দ্বারা সক্ষম হতো নিজেদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য আর বাইরের ইজ্জত বজায় রাখতে, তা হলে তারা হয়তো অধিকতর সহিষ্ণু হতে পারতো। কিন্তু একমাত্র ধর্মই ছিল তাদের কাছে একাধারে স্বদেশপ্রেম আর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস—ধর্ম-মন্দিরই ছিল একই সঙ্গে ধর্মীয় আচার উপাসনার যেমন তেমনি সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবনেরও কেন্দ্র। আর যে বাইবেল তাদের জাতির একমাত্র "বহনীয় পিতৃভূমি", স্পিনোজা তার সত্যতা সম্বন্ধেই তুলেছে তর্ক, করছে প্রতিবাদ—এ অবস্থায় তারা স্বভাবতই মনে করলো ধর্ম-দ্রোহ মানে রাজোদ্রোহ আর এখানে সহিষ্ণুতা দেখানো মানে আত্মহত্যা। অবশ্য এ কথাও ভাবা যায় যে তাঁরা অকুতোভয়ে এসব বিপদের ঝুঁকি নিতে পারতেন কিন্তু মানুষের পক্ষে নিজের চামড়া ছেড়ে বাইরে আসা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন অন্যের সম্বন্ধে সঠিকভাবে বিচার করা। সম্ভবতঃ আমস্টারডামের য়ূহুদী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক গুরু মেনাস্বেহ্ বেন্ ইসরাইল এমন কোন উপায় খুঁজে বার করতে পারতেন যাতে ধর্ম-মন্দির (Synagogue) আর দার্শনিক উভয়ে পারস্পরিক শান্তিতে বাস করতে সক্ষম হতো কিন্তু এ মহান ধর্মগুরু তখন ছিলেন লণ্ডনে—ইংলেণ্ডের দ্বার য়ূহুদীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন ক্রমলয়েলকে রাজি করাতে।

কিন্তু ভাগ্যের লিখন—স্পিনোজা হলেন পৃথিবীর সম্পদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. অবসর গ্রহণ ও মৃত্যু

সমাজচ্যুত হওয়ার দণ্ড তিনি অবিচলিত সাহসের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। শুধু এটুকুমাত্র মন্তব্য করলেন: "যে কাজ আমি কোন সময় করতাম না তেমন কোন কাজে আমাকে বাধ্য করা হয়নি।" কিন্তু এ যেন অন্ধকারে শীষ দেওয়া। আসলে এখন থেকে এ তরুণ ছাত্রটি পড়লেন এক তিক্ত ও নিষ্করুণ নিঃসঙ্গতায়। নির্জনতার মতো ভয়ঙ্কর কিছুই নেই—তা অধিকতর কষ্টকর একজন য়ূহুদীর পক্ষে, যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে নিজের সমস্ত সম্প্রদায় থেকে। নিজের ধর্ম-বিশ্বাস হারিয়ে স্পিনোজা এর মধ্যে যথেষ্ট কষ্টভোগ করেছেন—এভাবে কারো মনের অবলম্বন নির্মুল হয়ে যাওয়াই তো একটা বড় রকমের অস্ত্রোপচার, তাতে মনে থেকে যায় অনেক ক্ষতচিহ্ন। তিনি যদি অন্য ধর্ম দলে ভিড়ে পড়তেন, গ্রহণ করতেন, অন্য রকম গোঁড়ামী যাতে, গরু যেমন উষ্ণতার জন্যে গায়ে গা ঠেকিয়ে গাদাগাদি হয়ে থাকে, তেমনি মানুষও হয়ে থাকে দলবদ্ধ, তা হলে পরিবার ও সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের যা কিছু তিনি হারিয়েছেন বিশিষ্ট নব-দীক্ষিতের ভূমিকায় তা সবই হয়ত ফিরে পেতেন। কিন্তু তিনি যোগ দিলেন না অন্য কোন সম্প্রদায়ে—যাপন করতে লাগলেন একক জীবন। তাঁর পিতা যিনি হিব্রু বিদ্যায় ছেলের ভবিষ্যৎ পাণ্ডিত্য খ্যাতির দিকে তাকিয়েছিলেন এবার তাঁকে দিলেন ঘর থেকে তাড়িয়ে, তাঁর বোন চাইলেন সামান্য উত্তরাধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে[১], আর পুরোনো বন্ধুরা চল্লেন তাঁকে এড়িয়ে। স্পিনোজার রচনায় যে কোন হাস্য রসের পরিচয় মেলে না তা তেমন বিস্ময়ের বিষয় নয়! আর এও বিস্ময়ের বিষয় নয় যে মাঝে মাঝে আইন কানুনের রক্ষকদের প্রতি তিনি যে ভাবে তিক্ত বিরক্তিতে ফেটে পড়েছেন।

'দার্শনিক হিসেবে যারা অলৌকিক ঘটনার কারণ সন্ধান করতে চায়, বুঝতে চায় প্রাকৃতিক বস্তুকে, আহাম্মকের মতো বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতে চায় না—তাদেরে মনে করা হয় অসাধু আর ধর্মোদ্রোহী। আর এ ঘোষণা করে বেড়ায় ঐ সব লোক যাদেরে অশিক্ষিত

১. বোনের সঙ্গে এ মোকদ্দমায় তিনি জিতেছিলেন কিন্তু জেতার পর সম্পত্তিটি বোনকে দান করে দিয়ে অধিকতর মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনতা দেবতা আর প্রকৃতির ভাষ্যকার হিসেবে করে পূজা। কারণ তারা ভালো করেই জানে যদি অজ্ঞতা একবার বিদূরিত হয় তা হলে জনতার যে বিস্ময়-বোধের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত তাও হয়ে যাবে বিলীন।

সমাজ চ্যুতির অল্পকালের মধ্যেই তিনি চরম অভিজ্ঞতায় সম্মুখীন হলেন। একরাত্রে স্পিনোজা যখন রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন নরহত্যার দ্বারা তার শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিতে চাইলো এক ধার্মিক বদমাইশ—মুক্ত ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে বসলে তরুণ ছাত্রটিকে। দ্রুত ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই গলায় সামান্য আঘাত পেয়েই স্পিনোজা রেহাই পেয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন দার্শনিকের জন্য নিরাপদ স্থানের সংখ্যা বিরল—এবার তাই তিনি আমস্টারডামের বাইরে আউটার-ডেক রাস্তায় একটা নির্জন চিলেকোঠায় বাস করতে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ এ সময় তিনি তাঁর নাম বেরুচ থেকে বেনেডিক্ট-এ (Benudict) বদলে নেন।

তাঁর গৃহস্বামী আর গৃহস্বামীনী ছিলেন মেন্নো নাইট (Mennonite) সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীস্টান--তাঁরা ধর্মোদ্রোহীকে কিছুটা যেন বুঝতে পারতেন। তাঁর বিষণ্ণ করুণ মুখখানি তাঁদের ভালো লাগতো (যাদের জীবন খুব দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয় তাদের চেহারা হয় খুব রুক্ষ্ম অথবা খুব করুণ) আর কোন কোনদিন সন্ধ্যাবেলা ও যখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে বসে ধূমপান করতে করতে ওদের সরল মনের সুরে সুর মিলিয়ে আলাপ করতো তখন ওরা খুব খুসী হতেন। প্রথম দিকে তিনি তাঁর জীবিকা উপার্জন করতেন ভন ডেন এণ্ডের (Vonden Ende) স্কুলে শিক্ষকতা করে, পরে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করে—মনে হতো অবাধ্য জিনিসের মোকাবেলা করাতেই যেন তাঁর এক বিশেষ আগ্রহ। য়ুহুদী সম্প্রদায়ে থাকার সময়েই তিনি চশমা ব্যবসায় শিখেছিলেন কারণ হিব্রু ধর্মের এক বিধানই হলো প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ শিখতে হবে—শুধু এ কারণে নয় যে অধ্যয়ন আর সৎ শিক্ষাদানে কদাচিৎ জীবিকার সংস্থান হয় বরং যেমন গ্যামালিয়েল (Gamaliel) বলেছেন—একমাত্র কর্মের দ্বারাই মানুষ থাকতে পারে পূণ্যবান আর যেহেতু "যে শিক্ষিত ব্যক্তি কোন বৃত্তি বা পেশা অর্জনে অক্ষম শেষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে একটা বদমাইশে হয় পরিণত"—এসব কারণেও হয়তো স্পিনোজা চশমা ব্যবসায় শিখেছিলেন। পাঁচ বছর পরে (১৬৬০) তাঁর আশ্রয়দাতা লিডেনের নিকটে রাইনবার্গে (Rhynsburg) চলে আসেন—স্পিনোজাও চলে আসেন ঐ সঙ্গে। সে বাড়ী এখনো রয়েছে আর রাস্তাটা এখন আমাদের দার্শনিকের নামেই পরিচিত। ঐ ছিল তাঁর সরল জীবন আর উচ্চ চিন্তায় কাটিয়ে দেওয়া কয়টি বছর। অনেক সময় নিজের কক্ষাভ্যন্তরে আবদ্ধ থেকে তিনি দু'তিন দিনও কাটিয়ে দিতেন, দেখা করতেন না কারো সঙ্গে আর তাঁর যা সামান্য খাবার তা নিয়ে আসা হতো উপরে। কাঁচ ভালোভাবেই পরিষ্কার হতো কিন্তু এক-লাগা কাজ করতেন না বলে তাঁর যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী রোজগার কদাচিৎ হতো। জ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত প্রবল ছিল যে তাঁর পক্ষে "সফল মানুষ" হওয়া সম্ভব ছিল না। কোলেরাস্ (Colerus) তাঁর এসব বাসস্থানে প্রায় আনাগোনা করতেন, তিনি স্পিনোজাকে যাঁরা জানতেন তাঁদের কাছ থেকে খবরাখবর নিয়ে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখেছেন। তিনি বলেছেন: "প্রতি বছর তাঁকে যা খরচ করতে হয় তার চেয়ে যাতে বেশী বা কম খরচ না হয় তা দেখার জন্য তিনি প্রতি তিন মাস অন্তর তাঁর আয়-ব্যয়ের হিসেব করে দেখা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। সময় সময় তিনি ঐ বাড়ির লোকদের বলতেন তাঁর অবস্থা হচ্ছে মুখে লেজ দিয়ে কুণ্ডলীকৃত সর্পের মতো, এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাইতেন বছর শেষে তাঁর হাতে কিছুই থাকে না।" এ অতি সংযত জীবনযাপন করেও তিনি সুখী ছিলেন। এক ব্যক্তি যখন তাঁকে যুক্তির উপর নির্ভর না করে ঐশী বাণীর উপর নির্ভর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "যদিও সময় সময় আমার স্বাভাবিক বোধ শক্তির দ্বারা যে ফল আমি পেয়ে থাকি তা দেখা যায় অবাস্তব তবুও আমি দুঃখিত না হয়ে সুখীই হয়ে থাকি কারণ ফল সংগ্রহেই আমার আনন্দ, দুঃখ করে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আমি দিন কাটাই না বরং আমার দিন কাটে শান্তি, স্বস্তি আর আনন্দে"। একজন বিখ্যাত সাধুপুরুষ বলেছেন: "নেপোলিয়ন যদি স্পিনোজার মতো বুদ্ধিমান হতেন তবে তিনিও চিলে ঘরে বাস করতেন আর লিখতেন চারখানি বই।"

স্পিনোজার যে সব ছবি আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে তার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর জীবনী লেখক কোলেরাসের অনুসরণে আমরা আরো কিছু বিবরণ যোগ করতে পারি : "তিনি মধ্যমাকার ছিলেন। তাঁর মুখের গঠন ছিল সুন্দর, গায়ের চামড়া কিছুটা কালো, চুশ কালো আর কোঁকড়ানো, চোখের ভ্রূও লম্বা আর কালো ছিল—তিনি যে পর্তুগীজ য়ুহুদীর বংশধর তা তাঁর চোখের দৃষ্টিতেই ধরা পড়তো। কাপড় চোপড়ের প্রতি ছিল অত্যন্ত অযত্ন অবহেলা, পরতেন অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর পরিধেয়। একবার এক খুব বিখ্যাত এক পরিষদ সদস্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেন তিনি সকাল বেলার অপরিচ্ছন্ন এক গাউন পরে আছেন—সদস্যটি তাঁকে ভর্ৎসনা করে নিজে থেকে আর একটি গাউন দেওয়ার ইচ্ছা জানালেন। স্পিনোজা বল্লেন : 'খুব চমৎকার গাউন পরলেই কোন লোক ভালো হয়ে যায় না' তারপর যোগ করলেন : "খুব সামান্য যার মূল্য অথবা কোন মূল্যই যার নেই তেমন জিনিসকে মূল্যবান আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করা অত্যন্ত যুক্তি-হীন"। স্পিনোজার এ দর্জি-দর্শন কিন্তু সব সময় বৈরাগ্যবাদী নয়। তিনি লিখেছেন : "বিশৃঙ্খল বা অলস আচার ব্যবহার আমাদেরে কখনো সাধু বা জ্ঞানী বানায় না কারণ ব্যক্তিগত ব্যবহারে বা চেহারায় ইচ্ছাকৃত অবহেলা ক্ষুদ্র শক্তিরই পরিচায়ক, যা সত্যকার জ্ঞানের উপযুক্ত বাসস্থান নয়, এ অবস্থায় বিজ্ঞানও হয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল, বিচ্ছিন্ন আর পর্যুদস্ত।"

রাইন্‌স্‌বার্গে যে পাঁচ বছর তিনি ছিলেন তখনই তাঁর ক্ষুদ্র খণ্ড রচনা 'On the Improvement of the Intellect' আর 'Ethics Geometrically Demostrated বই দুইখানি তিনি লেখেন। শেষোক্তটি লেখা শেষ হয় ১৬৬৫তে কিন্তু দশ বছর ধরে স্পিনোজা তার প্রকাশের কোন চেষ্টাই করেননি। ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে স্পিনোজার অনুরূপ মত প্রকাশের জন্য এড্রিয়ান কোয়েরবাগের (Adrian koerbagh) দশ বছর জেল হয়েছিল এবং আঠারো মাস জেল খাটার পরই তাঁর ঘটে মৃত্যু। এবার নিরাপদে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কীর্তি', প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন এ মনে করে ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি আমস্টার-ডামে এসে পৌঁছেন আর তাঁর বন্ধু ওল্ডেনবার্গকে লেখেন "চারদিকে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে আমার একটা বই নাকি শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে যাতে আমি প্রমাণ করেছি ঈশ্বর বলে কেউ নেই। দুঃখের বিষয় সকলেই গুজবটা সত্য বলেই স্বীকার করে নিয়েছে। কয়েকজন শাস্ত্রবিদ্ (হয়তো এরা নিজেরাই এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুজবের জনক) এ গুজবের ধূয়া ধরে আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন রাজা আর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে....বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে এ খবর পেয়েছি, বন্ধুরা এও জানিয়েছেন শাস্ত্রবিদ্‌রা সর্বত্র আমার জন্য ওৎপেতে আছে—তাই অগত্যা আমি আমার পরিকল্পিত গ্রন্থ প্রকাশনার সংকল্প ত্যাগ করে ঘটনাস্রোত কোন্‌দিকে যায় তা দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম।”

স্পিনোজার মৃত্যুর পরই শুধু (১৬৭৭) তাঁর এক অসমাপ্ত রাজনৈতিক রচনা আর 'Treatise on the Rainbow' নামক গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর নীতিকথা বা Ethics প্রকাশিত হয়েছিল। এ সব গ্রন্থ সবই ল্যাটিনে লেখা কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে যারা যূরোপের সাংস্কৃতিক ভাষাই ছিল ল্যাটিন। ডাচ্ ভাষায় লেখা 'A short Teatise on God and Man' নামে তাঁর এক রচনা ভন্ ব্লুটেন ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে খুঁজে পান—মনে হয় ওটা Ethics-রই প্রাথমিক খসড়া। স্পিনোজার জীবদ্দশায় তাঁর দু'টিমাত্র বই বেরিয়েছিল একটি The Principles of the Cartesian philosophy(১৬৬৩) দ্বিতীয়টি A Treatise on Religion and the State—এটি বেরিয়েছিল ১৬৭০ খ্রীস্টব্দে আর বেনামীতে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ওটা সম্মানিত হলো নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় স্থান পেয়ে—প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিলো ওটার বিক্রি। কিন্তু চিকিৎসা গ্রন্থ বা ঐতিহাসিক বিবরণ এ ধরনের ছদ্মনামের আড়ালে বইটির ঘটেছিল ব্যাপক প্রচার। এটার প্রতিবাদে লেখা হয়েছে অসংখ্য বই—ঐ রকম একটাতে লেখা হয়েছিল ঃ “পৃথিবীর বুকে স্পিনোজার মতো এমন পাষণ্ড নাস্তিক আর জন্মায়নি”। আর একটি প্রতিবাদ সম্বন্ধে কোলেরাস বলেছেনঃ “অত্যন্ত মূল্যবান—যা কখনো ধ্বংস হবে না” অবশ্য ঐ রচনা সম্বন্ধে এ উল্লেখটুকুই শুধু বেঁচে আছে। এ সব প্রকাশ্য ভর্ৎসনা ছাড়াও স্পিনোজা অনেক চিঠিপত্র পেয়েছেন যাতে তাঁকে সংশোধনের অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে—তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র আলবার্ট বার্গ ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল তার চিঠিখানি থেকেই পরিচয় পাওয়া যাবে স্পিনোজা কি ধরনের চিঠি পেয়েছিলেন তখন ঃ 'তুমি মনে কর অবশেষে তুমিই সত্যকার দর্শনের সন্ধান পেয়েছ। যে সব দর্শন চিরকাল ধরে পড়া হয়েছে, হচ্ছে, এর পরেও হবে পড়ানো সে সব থেকে তোমার দর্শনই যে সর্বোত্তম তা তুমি কি করে জানলে? ভবিষ্যতে আরো যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবের উদ্ভব হবে তার কথা নাই বা বল্লাম। প্রাচীন ও আধুনিক যে সব দর্শন এখানে, ভারতে আর পৃথিবীর সর্বত্র পড়ানো হয় তা সব কি তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ? সব দর্শন তুমি যথাবিধি পরীক্ষা করে দেখেছ একথা যদি মেনেও নিই তা হলেও জিজ্ঞাসা করা যায় তোমার নির্বাচনই যে সর্বোত্তম তা তুমি কি করে জানলে? সব ধর্মাধ্যক্ষ, নবী, অবতার, শহীদ, পণ্ডিত আর গির্জার পাপের স্বীকারুক্তি শ্রোতা পুরোহিত এদের সকলের উর্ধ্বে নিজেকে ভাবতে তুমি কি করে সাহস করো? এ পৃথিবীর বুকে তুমি এক হতভাগ্য জীব, এক কীট বিশেষ, হাঁ ভস্ম আর কীটেরই খাদ্য তুমি—তোমার ধর্ম বিরোধী কথা দিয়ে তুমি কি করে সনাতন জ্ঞানের প্রতিকূলতা কর? তোমার এসব যুক্তিহীন, উন্মত্ত, অত্যন্ত পরিতাপজনক আর অভিশপ্ত মতামতের ভিত্তিই বা কি আছে? যে সব অতিন্দ্রীয় রহস্য সম্বন্ধে স্বয়ং ক্যাথলিকরাই অবোধ্য বলে ঘোষণা করেছেন সে সব সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার জন্য কোন্ শয়তানী অহঙ্কার তোমাকে স্ফীতবক্ষ করে তুলেছে?' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ চিঠির জবাবে স্পিনোজা লিখেছিলেন:

"তুমি যে অবশেষে সর্বোত্তম ধর্ম অথবা সর্বোত্তম শিক্ষকদের খুঁজে পেয়েছ বলে মনে কর আর ন্যস্ত করেছ তাদের উপর তোমার সব বিশ্বাস —কি করে জানো যারা ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন, এখন দিচ্ছেন অথবা এর পরে দেবেন তাদের মধ্যে এরাই সর্বোত্তম? তুমি কি যে সব প্রাচীন আর আধুনিক ধর্ম এখানে, ভারতে আর বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষা দেওয়া হয় তা পরীক্ষা করে দেখেছ? যথাবিধি তুমি সব পরীক্ষা করে দেখেছ এ কথা যদি মেনেও নিই তা হলেও তুমি কি করে জানো তুমি যা নির্বাচন করেছ তাই সর্বোত্তম?'

বস্তুতঃ প্রয়োজন হলে আমাদের ঐ ভদ্র দার্শনিকটি বেশ কঠোর ও হতে পারতেন।

বলা বাহুল্য সব চিঠি বিরক্তিকর ছিল না। অনেক চিঠি তিনি উচ্চ পদাধিকারী আর পরিণত সংস্কৃতিবানদের থেকেও পেয়েছেন। যে সব বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁকে চিঠি লিখতেন তার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রয়াল সোসাইটির সম্পাদক হেনরী ওল্ডেন বার্গ, তরুণ জার্মেন আবিষ্কারক ও অভিজাত-তনয় ভন্ শিরিন্হাউস্ (Von Tschirnhous), ডাচ্ বৈজ্ঞানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুইজেন্‌স্‌, দার্শনিক লিব্‌নিট্‌জ্‌ যিনি ১৬৭৬-এ স্পিনোজার সঙ্গে এসে দেখাও করেছিলেন, লুইস্‌ মেয়ার নামে হেগের এক চিকিৎসক, সাইমন্‌ দে ভ্রাইস নামে আমস্‌টারডামের এক ধনী বণিকের নাম করা যায়। শেষোক্তজন স্পিনোজার এতখানি ভক্ত ছিলেন যে তাঁর কাছ্‌ থেকে হাজার ডলারের একটা উপহার গ্রহণের জন্য তিনি স্পিনোজাকে অনেক অনুনয় বিনয় করেছিলেন। কিন্তু স্পিনোজা তাঁর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শেষে দে ভ্রাইস্‌ যখন উইল করে তাঁর সব সম্পত্তি স্পিনোজাকে দিয়ে যেতে চাইলেন তখন অনেক বলে কয়ে সম্পত্তিটা তাঁর নিজের ভাইকে দিয়ে যাওয়ার জন্য দে ভ্রাইসকে তিনি রাজি করিয়েছিলেন। বণিক প্রবরের মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে বার্ষিক আড়াই শ' ডলার স্পিনোজাকে দেওয়ার জন্য উইলে বরাদ্দ করে গেছেন। এ দানও প্রত্যাখ্যানের সময় তিনি বলেছিলেন: "প্রকৃতি যদি অতি সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে, আমিও পারবো"—কিন্তু অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে তাঁকে বছরে দেড় শ' ডলার গ্রহণ করতে রাজি করানো হয়েছিল। ডাচ্‌ প্রজাতন্ত্রের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর বন্ধু জাঁ দে উইট্‌ তাঁকে পঞ্চাশ ডলারের একটি সরকারী বৃত্তি দিয়েছিলেন। অবশেষে রাজা চতুর্দশ লুই নিজেই একটি বেশ দরাজ পেনসন তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন, অবশ্য প্রকারান্তরে এ শর্তে যে স্পিনোজা তাঁর পরবর্তী বই রাজার নামে উৎসর্গ করবেন। স্পিনোজা অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে রাজার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বন্ধু আর পত্র লেখকদের অনুরোধ রক্ষার্থে ১৬৬৫-তে স্পিনোজা হেগের শহরতলী এলাকার ভূরবার্গে এসে বাস করতে থাকেন পরে ১৬৭০-এ ঐ স্থান ছেড়ে একেবারে হেগে (The Hague) এসেই তিনি স্থায়ীভাবে বাসস্থান নিলেন। এর শেষের দিকে তাঁর খুব একটা সস্নেহ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে জাঁ দে উইটের সঙ্গে। ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীদের হাতে ডাচ্‌ সৈন্য বাহিনীর পরাজয়ের জন্য ডাচ্‌ জনতা দে উইট আর তাঁর ভাইকে দায়ী মনে করে প্রকাশ্য রাজপথে দুই ভাইকে হত্যা করে বসলো। এ জঘন্য অপরাধের কথা শুনে স্পিনোজা অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। যে স্থানে এ হত্যা সংঘটিত হয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে এ জঘন্য অপরাধকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য তিনি যেভাবে গরীয়া হয়ে উঠেছিলেন জোর করে তাঁকে তার সংকল্প থেকে বিরত করা না হলে হয়ত আর একটা এস্থনিরই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Anthony) আবির্ভাব ঘটতো। এ ঘটনার অনতিকালের মধ্যেই ফরাসী আক্রমণ বাহিনীর প্রধান প্রিন্স দে কোন্দে (De Conde) তাঁকে তাঁর শিবিরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন ফরাসী সরকার তাঁকে একটা বৃত্তি দিতে চায় তা জানাবেন আর পরিচয় করিয়ে দেবেন তাঁর কয়েকজন অনুরাগী ভক্তের সঙ্গে, নিমন্ত্রণের এ ছিল উদ্দেশ্য। জাতীয়তাবাদীর চেয়েও স্পিনোজা ছিলেন "সৎয়ূরোপীয়"—তাই তিনি ভাবলেন দে কোন্দের শিবিরে যাওয়ায় কোন অন্যায় নেই। কিন্তু তিনি হেগে ফিরে আসার পরই খবরটি রাষ্ট্র হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের মধ্যে চলতে থাকে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন। তাঁর আশ্রয় দাতা ভেন ডেন স্পাইক্ (Van den Spyck) পাছে জনতা তাঁর বাড়ী আক্রমণ করে বসে এ ভেবে ভীত হয়ে পড়লেন। স্পিনোজা তাঁকে আশ্বাস দিলেন এ বলে: "আমার বিরুদ্ধে রাজোদ্রোহের সব সন্দেহই আমি বিদূরীত করতে সক্ষম........কিন্তু জনতা যদি তোমাকে আক্রমণ করবার সামান্যতম চেষ্টাও করে। এমন কি তারা যদি তোমার বাড়ির সামনে জমায়েত হয়ে হৈ চৈও করে আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো, হতভাগ্য দে উইটের প্রতি তারা যে ব্যবহার করেছে আমার প্রতি তা করবে জেনেও।" কিন্তু জনতা যখন শুনলো যে স্পিনোজা স্রেফ এক দার্শনিক মাত্র, তখন ওরা ধরে নিলে তিনি নিশ্চয়ই নিরীহ গোবেচারি মানুষ। তারপর সব হৈ চৈ'য়ের ঘটলো অবসান।

এসব ছোট ছোট ঘটনা থেকে বুঝা যায় সচরাচর লোকের যে বিশ্বাস স্পিনোজার জীবন নির্জনে, নেহাৎ দারিদ্রের মধ্যেই কেটেছে তা সত্য নয়। মোটামুটি তাঁর আর্থিক নিরাপত্তা ছিল, প্রভাবশালী সহৃদয় বন্ধুরও তাঁর অভাব ছিল না, সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়েও তিনি কৌতূহলী ছিলেন, এমনকি মরা-বাঁচার দুঃসাহসিক ঘটনার কাছাকাছি এসে পড়তেও তিনি দ্বিধা করতেন না। ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে হিডেল্‌বার্গ (Heidelberg) বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়—এ থেকে আমরা বুঝতে পারি সমাজচ্যুতি আর তাঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা নিষিদ্ধ হলেও তিনি তাঁর সমসাময়িকদের কাছে সম্মানের পাত্র ছিলেন। অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে অত্যন্ত সপ্রশংস ভাষায় করা হয়েছিল অনুরোধ আর দেওয়া হয়েছিল এ প্রতিশ্রুতি "দার্শনিকতার জন্য পুরোপুরি স্বাধীনতাই ভোগ করবেন আপনি, সম্রাটের সুনিশ্চিত বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রের স্বীকৃত ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক তুলে আপনি এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করবেন না।” স্পিনোজা উত্তর দিয়েছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্টের সঙ্গে :

“মান্যবরেষু, যদি বিদ্যার কোন শাখায় অধ্যাপক পদ গ্রহণের এতটুকু বাসনাও আমার মনে থাকতো তা হলে মহামান্য প্রিন্স প্লেটিন (Palatine) আপনার মারফৎ আমাকে অনুরোধ জানিয়ে যে সম্মান দেখিয়েছেন তাতে তা সম্পূর্ণই চরিতার্থ হতো। দার্শনিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়ায় এ অনুরোধের মূল্য আরো বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এ স্বাধীনতার কতখানি সীমা রক্ষা করে চল্লে রাষ্ট্রের স্বীকৃত ধর্মের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ ঘটবে না........কাজেই মহাত্মন্, আপনি বুঝতে পারবেন আমি এখন যে অবস্থায় আছি তার চেয়ে উচ্চতর পার্থিব কোন পদ আমি কামনা করি না। আমি মনে করি যে শান্তি আমি এখন ভোগ করছি তা অন্য কোন ভাবেই আমি পেতে পারি না, তাই জন-শিক্ষকের পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকাই আমার সঙ্কল্প।”

তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় এলো ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর বয়স তখন মাত্র চুয়াল্লিশ—কিন্তু তাঁর বন্ধুরা মনে করতেন তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন যক্ষ্মা রুগী, দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ স্থানে করেছেন বাস, কাজ করেছেন ধূলি-ধূসরিত পরিবেশে—এ সবই তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। দিন দিনই তিনি শ্বাস প্রশ্বাসে অধিকতর কষ্ট পাচ্ছিলেন—বছরের পর বছর তাঁর অনুভূতিশীল ফুসফুসের ক্ষয় বেড়েই চলেছিল। বুঝতে পারলেন দীর্ঘদিন তিনি বাঁচবেন না কিন্তু শঙ্কিত হলেন জীবনে যে বই প্রকাশ করতে সাহস পাননি তাঁর মৃত্যুর পর তা হয়ত হারিয়ে যাবে। হয়তো যাবে নষ্ট হয়ে। পাণ্ডুলিপিটা একটা ছোট্ট লেখার ডেস্কে তালাবন্ধ করে চাবিটা তাঁর আশ্রয়দাতাকে দিয়ে বল্লেন তাঁর মৃত্যুর পর চাবি-শুদ্ধ ডেস্কটা যেন আমস্টারডামের বিখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশক জাঁ রিউওয়ারেটজ্‌কে (Jan Rieuwartz) দিয়ে দেওয়া হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, তিনি তেমন অসুস্থবোধ করছেন না এ আশ্বাস দেওয়ায় তিনি তখন যাঁদের বাড়ী ছিলেন তাঁরা সপরিবারে রবি-বাসরীয় উপাসনায় যোগ দেওয়ার জন্য গির্জায় চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে থাকলেন শুধু ডাক্তার মেয়ার। বাড়ীর সবাই গির্জা থেকে ফিরে এসে দেখেন তিনি বন্ধুর দুই বাহুর মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। অনেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মৃত্যুতে শোকাভিভূত হলো, তাঁর সুগভীর জ্ঞানের জন্য যেমন শিক্ষিতরা তেমনি সরল জনসাধারণ তাঁর অমায়িক ভদ্রতার জন্য তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর শেষ বিশ্রাম স্থানে জনসাধারণের সাথে সাথে দার্শনিক আর প্রশাসকরাও এসে হাজির হয়েছিল আর তাঁর কবরের পাশে মিলিত হয়েছিল নানা ধর্ম-মতের মানুষ। নীট্‌শে কোথায় যেন বলেছেন ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েই শেষ খ্রীস্টান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি বোধ করি স্পিনোজার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

২. ধর্ম আর রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় রচনা

স্পিনোজা মোট চারখানি বই লিখেছেন। তাঁর লেখার পর্যায়নুক্রম বজায় রেখে আমরাও তাঁর বই চতুষ্টয় অধ্যয়ন করে দেখবো। আজকের দিনে তাঁর ধর্ম আর রাজনীতি সম্বন্ধীয় নিবন্ধের আকর্ষণ কমে গেছে অনেকখানি, কারণ উচচতর সমালোচনার যে আন্দোলন স্পিনোজা শুরু করেছিলেন আর তাতে যে সব কথা বলে তিনি তাঁর জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন তা এখন অনেকটা অসার উক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন লেখকের পক্ষেই নিজের বক্তব্যকে অতিবেশী বিশদভাবে প্রমাণ করতে যাওয়া বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়—এ করতে গেলে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো শিক্ষিত জনের কাছে এত বেশী বহুল প্রচারিত হয়ে পড়ে যে তাঁর রচনার যে রহস্য পাঠককে আকর্ষণ করে রাখতো তা আর থাকে না। ভল্‌টেয়ারের বেলায় ঘটেছে তাই—স্পিনোজার ধর্ম আর রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নিবন্ধের বেলায়ও ঘটেছে একই পরিণতি।

স্পিনোজার এ বইটার মূল বক্তব্য হচ্ছে বাইবেলের ভাষা রূপক বা প্রতীকধর্মী আর এটা ইচ্ছাকৃত—সাহিত্যের ভাষায় রং আর অলঙ্কার লাগানো আর প্রকাশভঙ্গীতে মাত্রাধিক বর্ণনার আতিশয্য এ প্রাচ্য প্রবণতার জন্যই যে শুধু এ ঘটেছে তা নয় বরং নবী-পয়গাম্বরেরা জনসাধারণের কল্পনা শক্তিকে জাগিয়ে আর ওদের মনের শক্তি আর পূর্ব-প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের ধর্মমত এ ভাবে প্রচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। "সব ধর্ম-শাস্ত্রই প্রথমতঃ একটা বিশেষ জাতির জন্যই লিখিত পরে তার লক্ষ্য হয়েছে সমস্ত মানব জাতি। কাজেই যতদূর সম্ভব এ সবের বিষয়-বস্তু প্রয়োজনের খাতিরেই জন-চিত্তের সঙ্গে খাপ রেখেই করতে হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণ। ধর্ম-শাস্ত্র কোনকিছু দ্বিতীয় তথা পরবর্তী উদ্দেশ্যের আলোয় ব্যাখ্যা করে না বরং এমনভাবে আর এমন রচনা-শৈলীতে বর্ণনা করা হয় যা জনসাধারণকে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণকে অতি সহজে ভক্তির পথে আকর্ষণ করতে সক্ষম···। এ সবের উদ্দেশ্য যুক্তি নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের কল্পনা আকর্ষণ আর তাকে বিধৃত করে রাখা।" এ কারণেই ধর্মশাস্ত্রে প্রচুর অলৌকিক ঘটনার আমদানি আর ঈশ্বরের আবির্ভাবের পুনরাবৃত্তি। "জনসাধারণ মনে করে প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের যে ধারণা তার বিপরীত অসাধারণ যে সব ঘটনা ঘটে তাতেই ঈশ্বরের শক্তি আর বিধানের প্রকাশ অধিকতর স্পষ্ট......বস্তুত তারা ভাবে প্রকৃতি যতদিন নিজের স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করে চলে ততদিন ঈশ্বর থাকেন নিষ্ক্রিয় আর ঈশ্বর যখন সক্রিয় হয়ে ওঠেন তখন প্রাকৃতিক ক্ষমতা আর কারণ-সমূহ থাকে অলস আর নিষ্ক্রিয়। এভাবে ওরা একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্কহীন দু'টা পৃথক শক্তিরই কল্পনা করে বসে—একটা ঈশ্বরের শক্তি অন্যটা প্রকৃতির শক্তি।" (এখানে আমরা স্পিনোজা দর্শনের মূল ভিৎ যে ঈশ্বর ও প্রকৃতি এক ও অভিন্ন তার প্রথম অনুপ্রবেশ দেখতে পাচ্ছি)। ঈশ্বর তাদের খাতিরেই ঘটনার স্বাভাবিক গতিকে লংঘন করে একথা ভেবে সাধারণ মানুষ আনন্দ পেয়ে থাকে—তাই য়ুহুদীরা দিনের দৈর্ঘী-করণ সম্বন্ধে এক অলৌকিক ব্যাখ্যা দিয়ে অন্যকে (সম্ভবতঃ তাদের নিজে-দেরও) বুঝাতে চেয়েছিল আর তাদের বিশ্বাস য়ুহুদীরা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগৃহীত জাতি। প্রত্যেক জাতির প্রাচীন ইতিহাসে এ রকম ঘটনার প্রচুর নজীর রয়েছে—সত্য আর যুক্তিপূর্ণ বর্ণনায় মানুষের মন মোটেও আলোড়িত হয় না। যে জনসাধারণ মূসার অনুসরণ করছিলেন মূসা যদি তাদেরে বলে দিতেন জোরে প্রবাহিত পূবালী হাওয়ার ফলেই (পরবর্তী এক বর্ণনা থেকে যা জানা গেছে) লোহিত সাগরে রচিত হয়েছে তাদের জন্য পথ তা হলে ওদের মনের উপর কোন প্রভাবই পড়তো না। যে কারণে নবীরা উপদেশপূর্ণ গল্পের আশ্রয় নিতেন সে একই কারণে আশ্রয় নিতেন অলৌকিকতারও—এ হচ্ছে জন-চিত্তের চাহিদা পূরণ। দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিকদের তুলনায় ধর্ম-প্রবর্তকদের অধিকতর প্রভাবের কারণ ভাষায় স্পষ্টতর রূপকের প্রয়োগ যা তাঁদের উদ্দেশ্যের যেমন অনুকূল তেমনি তাঁদের তীব্র আবেগময়তারও সহযোগী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পিনোজার মতে এ নীতির অনুসরণে ব্যাখ্যা করলে বাইবেলে যুক্তি-বিরোধী কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে গেলেই দেখা যাবে ওটা ভুল, স্ববিরোধিতা আর অসম্ভব উক্তিতে ভরতি—যেমন মূসা লিখিত ওল্ড্ টেষ্টামেন্টের প্রথম পঞ্চগ্রন্থ। একমাত্র অধিকতর দার্শনিক ব্যাখ্যাই রূপক আর কবিত্বের কুয়াসা ভেদ করে মহান আর প্রধান চিন্তাবিদদের গভীর ভাবরাজি উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম আর তখনই বাইবেলের অপরিসীম আর অবিচ্ছিন্ন প্রভাবের কারণ আমাদের হয় বোধগম্য। দুই ব্যাখ্যারই যথাযোগ্য স্থান আর কর্তব্য রয়েছে—জনসাধারণ সব সময় চাইবে অলৌকিকতায় মণ্ডিত আর কল্প-রূপে সজ্জিত এক ধর্ম, এ রকম এক ধর্মের বিনাশ ঘটলে তারা গড়ে তুলবে অনুরূপ আর এক ধর্ম। কিন্তু দার্শনিক জানে ঈশ্বর আর প্রকৃতি এক সত্তা—অপরিবর্তনীয় আইন আর প্রয়োজনের তাগাদাতেই তারা কাজ করে, এ মহান আইনের প্রতি তার (দার্শনিকের) শ্রদ্ধা আর আনুগত্য। তিনি জানেন ধর্ম-শাস্ত্রে "ঈশ্বরকে যে আইন-প্রণেতা আর সম্রাট বা প্রভু বলে বর্ণিত হয়েছে আর তাঁকে যে অভিহিত করা হয়েছে ন্যায়বান, দয়ালু ইত্যাদি বলে—তা করা হয়েছে জনসাধারণের অসম্পূর্ণ জ্ঞান আর অপূর্ণ বোধ-শক্তির প্রতি দয়াবশতই। আসলে নিজের স্বভাবের প্রয়োজনেই ঈশ্বরের কাজ চলে....আর তাঁর নির্দেশ সনাতন সত্য।"

স্পিনোজা ওল্ড্ আর নিউ টেষ্টামেন্টে কোন ভেদ করেন না আর য়ুহুদী আর খ্রীস্টান ধর্মকেও মনে করেন এক। তাঁর ধারণা প্রচলিত হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম মতের মূল সত্য আর গোপন রহস্য যদি দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা খুঁজে নেওয়া যায় তা হলে এ সত্য সকলেই জানতে পারবে। "আমি অনেক সময় ভেবে তাজ্জব হই যারা নিজেদের খ্রীস্ট-ধর্ম বিশ্বাসী বলে গর্ব করে, যে খ্রীস্ট-ধর্মের শিক্ষা হলো সর্ব মানবের প্রতি প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সংযম আর দয়া তারা যেভাবে প্রত্যহ পরস্পর বিদ্বেষপূর্ণ ঝগড়া-বিবাদ আর শত্রুতায় লিপ্ত হয় আর যেভাবে একে অপরকে তীব্র হিংসা-বাণে জর্জরিত করে তাতে মনে হয় এসবই যেন তাদের ধর্মের সাক্ষাৎ পরিচয়-চিহ্ন, যে শিক্ষা নিয়ে তারা গর্ব করে তা মোটেও নয়।" প্রধানত খ্রীস্টানদের বিদ্বেষের ফলেই আজো য়ুহুদীরা বেঁচে রয়েছে—সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে ঐক্য ও সংহতি অত্যা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশ্যক নির্য্যাতনই জুগিয়েছে তা, নির্যাতিত না হলে তারা হয়ত য়ুরোপের অন্যান্য জাতির সঙ্গে একাকার হয়ে যেতো, হতো বিবাহসূত্রে আবদ্ধ, সর্বত্র যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাঝখানে তাদের বাস করতে হয়েছে হয়তো তাতেই যেতো ডুবে। কিন্তু তাই বলে সমস্ত নির্বুদ্ধিতা ঝেড়ে ফেলে দার্শনিক য়ূহুদী আর দার্শনিক খ্রীস্টান ধর্মমতে যথেষ্ট ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে শান্তি আর সহযোগিতায় বাস করতে না পারার কোন কারণ নেই।

স্পিনোজার মতে এ চরম গন্তব্যে পৌঁছার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হবে যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে পরস্পর এক মত হওয়া। অসম্ভব ও অনড় ধর্ম-বিশ্বাস (dogma) ত্যাগ করলেই য়ূহুদীরা যিশুকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম নবী হিসেবে চিনে নিতে পারবে। স্পিনোজা খ্রীস্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন না কিন্তু মানুষের মধ্যে তাঁকে প্রধানতম বলে মানেন। "ঈশ্বরের চিরন্তন জ্ঞান সর্ব বস্তুতেই প্রতিফলিত হয়েছে, তবে প্রধানত প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের মনে আর সবচেয়ে বেশী হয়েছে যিশুখ্রীষ্টে। খ্রীষ্টকে শুধু য়ূহুদীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়নি বরং পাঠানো হয়েছে সমস্ত মানব জাতির শিক্ষক হিসেবে। তাই তিনি মানুষের বোধশক্তির সঙ্গে নিজেকে খাপখাইয়েছিলেন........আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছেন উপদেশমূলক গল্পের সাহায্যে।" তিনি মনে করতেন জ্ঞান আর যিশুর নীতি-উপদেশ সমার্থক তাঁকে শ্রদ্ধা করে ওঠা যায় "ঈশ্বরের প্রতি মননশীল প্রেমে।" যে অনড় ধর্ম-মত বিভেদ আর ঝগড়ার মূল তার বন্ধনমুক্ত এ মহৎ মানুষটির প্রতি সব মানুষই যে আকৃষ্ট হবেন তাতে সন্দেহ নেই, হয়তো রসনা আর তরবারির আত্মঘাতী যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ও বিচ্ছিন্ন পৃথিবী একদিন তাঁর নামে ধর্ম-বিশ্বাসে খুঁজে পাবে একটা ঐক্যবোধ আর অবশেষে হয়তো সন্ধান পেয়ে যাবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনা।

৩. মননশীলতার তথা বুদ্ধির উন্নয়ন (Improvement of the Intellect)

স্পিনোজার দ্বিতীয় গ্রন্থের সূচনাতেই আমরা দার্শনিক সাহিত্যের এক রত্ন-কণার সাক্ষাৎ পাই। অন্য সবকিছু ছেড়ে দর্শনকেই কেন তিনি একমাত্র গ্রহণীয় মনে করেছেন তাঁর সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

'অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমি যখন এটুকু বুঝতে পারলাম আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ জীবনে অহরহ যা ঘটে তা মূল্যহীন আর নেহাৎ বাজে আর যখন দেখলাম যে সব-কিছুকে আমি ভয় করে এসেছি অথবা যা কিছু আমাকে ভয় করেছে, মনের উপর কার্যকরী না হলে তার সঙ্গে ভালো-মন্দের কোন সম্পর্কই নেই তখন আমি সঙ্কল্প করলাম খুঁজে দেখতে হবে সত্যকার ভালো কিছু আছে কিনা আর অন্য সব কিছুকে বাদ দিয়ে সে-ই ভালোটা মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় কিনা যাতে মন হবে সক্রিয়। তাই আমার সঙ্কল্প এমন কিছু খুঁজে বার করা আর এমন একটা মানসিক শক্তি আয়ত্ত করা যাতে চিরকাল ধরে চরম সুখ ভোগ করা সম্ভব......অর্থ আর সম্মান দিয়ে যে অনেক সুখ-সুবিধা হাসিল করা যায় তা আমার অজানা নয়। একান্তভাবে নতুন কিছুর সন্ধান করতে গেলে এসব থেকে যে আমাকে বঞ্চিত থাকতে হবে তাও আমি বুঝতে পারি......কিন্তু এর যে কোন একটা যতই আয়ত্ত হয় ততই সুখ বৃদ্ধি পায় বলে তা আরো বেশী করে পাওয়ার জন্য মানুষ লালায়িত হয়ে ওঠে। আবার যখনি কোন একটা আশা ব্যর্থ হয় তখন মনে সঞ্চারিত হয় গভীর দুঃখ। খ্যাতির বেলায়ও রয়েছে এ বিপদ—মন একবার ঐদিকে গেলে নিজের জীবনকে তখন চালাতে হয় অন্যের খেয়াল খুশী চরিতার্থ করার দিকে তারা যা অপসন্দ করে তা এড়িয়ে গিয়ে তারা যাতে খুশী হয় তা করার দিকে। কিন্তু মনকে সর্ব দুঃখাতীত যে আনন্দ তা দিতে পারে একমাত্র চিরন্তন আর অসীমের প্রতি ভালোবাসা। সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের যে ঐক্য ও মিলন তার জ্ঞান বা তার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া........মন যতই ওয়াকিবহাল হয় ততই সে নিজের শক্তি যেমন উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি প্রাকৃতিক বিধানকেও পারে বুঝতে—যতই মন তার শক্তি আর ক্ষমতা সম্বন্ধে বুঝতে পারবে ততই সে নিজেকে ভালোভাবে চালাতে পারবে, রচনা করতে পারবে নিজের সম্বন্ধে বিধি-বিধান। যতই সে প্রকৃতিকে বুঝতে পারবে ততই সে নিজেকে নিতে পারবে অনাবশ্যকের হাত থেকে মুক্ত করে। এ হচ্ছে স্পিনোজার মূল ও সাধিক্য পদ্ধতি।'

তা হলে জ্ঞানই হচ্ছে একাধারে শক্তি, স্বাধীনতা আর বোধের আনন্দ। আর জ্ঞানের সন্ধানই হচ্ছে স্থায়ী আনন্দ। অবশ্য তবুও দার্শনিক মানুষ আর নাগরিকই থাকবেন। তবে প্রশ্ন সত্যানুসন্ধানের সময় তাঁর জীবন-যাপন কি রকম হবে? স্পিনোজা নিজেই এ সম্পর্কে একটি

১৪—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরল নিয়ম বাতলিয়েছেন—আমরা যতদূর জানি, তাঁর নিজের বাস্তব জীবনও ছিল এ নিয়মেরই অনুগামী ঃ

'১. জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় আলাপ করা আর আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পরিপন্থী না হলে ওদের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা.........।

২. স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আনন্দ ভোগ করা।

৩. জীবন আর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন শুধু ততটুকুই পেতে চাওয়া আর যে সব আচার-ব্যবহার আমাদের লক্ষ্যের পরিপন্থী নয় তার আনুকূল্য করা।'

এভাবে সত্যের সন্ধানে নির্গত হয়ে এ সৎ ও স্বচ্ছ-মস্তিষ্ক দার্শনিক এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ঃ আমার জ্ঞানটাই যে জ্ঞান তা কি করে জানবো ? আমার যে ইন্দ্রিয়গুলি আমার যুক্তির সম্মুখে বস্তু বা পদার্থকে নিয়ে আসে তারা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য ? সচেতন-পদার্থ থেকে যুক্তি যে সিদ্ধান্তে পোঁছে সে যুক্তিকেও বা কতটুকু বিশ্বাস করা যায় ? তার কর্তৃত্বে নিজেদের সোপর্দ করার আগে মাধ্যমটাকে যাচাই করে দেখা কি আমাদের উচিত নয় ? তাকে নিখুঁত করার জন্য যা কিছু করা দরকার আমরা কি তা করব না ? প্রায় বেকনের মত করেই স্পিনোজা বলেছেন ঃ "সর্বাগ্রে এমন একটা উপায় বার করতে হবে যা দিয়ে মেধা বা বুদ্ধিকে করা যাবে স্বচ্ছ আর উন্নত।" সযত্নে জ্ঞানের সব রকম রূপ পরখ করে দেখতে হবে আর বিশ্বাস ন্যস্ত করতে হবে যা উত্তম তার উপর।

প্রথমত এক রকম জ্ঞান আছে তাকে বলা যায় শোনা জ্ঞান, যেমন আমি জানতে পারি আমার জন্ম-দিবস। দ্বিতীয়ত ভাসা ভাসা অভিজ্ঞতা, হীনার্থে ভূয়োদর্শনঘটিত জ্ঞান, যেমন কোন রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়াই, 'সাধারণত' ফল পাওয়া যায় এ রকম 'সাধারণ ধারণার' বশবর্তী হয়ে চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করে থাকেন। তৃতীয়তঃ ত্বরিত অনুমান অর্থাৎ যুক্তির সাহায্যে জ্ঞান আহরণ, যেমন দূরত্ব অনুসারে বস্তুর আকার ক্ষুদ্র হয়ে যেতে দেখে সূর্যের বিশালতা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করে থাকি। অন্য দুই ধরনের জ্ঞানের চেয়ে এটি শ্রেষ্ঠতর কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে এ জ্ঞানও হঠাৎ অস্বীকৃত বা পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিজ্ঞান ত শত বছরে যুক্তির পথে এমন এক 'ইথার' বা আকাশ রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বসেছে যা এখন বড় বড় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে আর আমল পাচ্ছে না। কাজেই চতুর্থ প্রকারের জ্ঞানই হচ্ছে সর্বোত্তম যা ত্বরিত অনুমান আর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সাহায্যেই পাওয়া যায়, যেমন, ২ : ৪ : : ৩ : X এ বিন্যাসে মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারি ৬ এখানে অনুপস্থিত অথবা যেমন আমরা বুঝতে পারি অংশের চেয়ে সমগ্র বৃহত্তর। স্পিনোজার বিশ্বাস গণিতজ্ঞরা এ সহজাত উপলব্ধির দ্বারা ইউক্লিডের অনেক কিছুই জেনে নিতে পারে। তবে কিছুটা খেদের সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন—"এ যাবৎ এ রকম জ্ঞানের সাহায্যে আমি যা জানতে পেরেছি তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎ কর।"

স্পিনোজা তাঁর নীতিকথা তথা এথিক্সে প্রথম দুই রকমের জ্ঞানকে কমিয়ে এক রকমে এনেছেন আর সহজাত-জ্ঞানকে বলেছেন—ঐ হচ্ছে চিরন্তন রূপ আর সম্পর্কের সাথে বস্তুর উপলব্ধি, এভাবে একটি খণ্ড-বাক্যে পাওয়া যাচ্ছে দর্শনের সংজ্ঞা। কাজেই সহজাত-উপলব্ধ জ্ঞান প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনার পেছনে কি আইনকানুন আর চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে তাই খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। স্পিনোজার মৌলিক বা প্রধান বৈশিষ্ট্য (তাঁর সমগ্র পদ্ধতিরই যা ভিত্তি) হচ্ছে 'অনিত্য ব্যবস্থা' তথা ঘটনা আর বস্তু জগতের সঙ্গে 'নিত্যকালের ব্যবস্থা' তথা আইন আর গঠন-জগতের ব্যবধান বা পার্থক্য নিরূপণ। তাঁর এ বৈশিষ্টটুকু সযত্নে অনুধাবন করা উচিত :

'এটা মনে রাখা উচিত এখানে আমি কারণ পরম্পরা আর বাস্তব অস্তিত্বের দ্বারা কোন বিশেষ পরিবর্তনশীল বস্তুর পরম্পরা বুঝাতে চাচ্ছি না বরং বুঝাতে চাচ্ছি স্থির আর শাশ্বত বস্তু-পরম্পরা। কারণ মানবীয় দুর্বলতা দ্বারা কোন বিশেষ পরিবর্তনশীল বস্তু-পরম্পরার অনুসরণ সম্ভব নয়—শুধু যে তার সংখ্যা অগণ্য বলে তা নয় বরং একই বস্তুতে বহু অবস্থান্তর ঘটে বলেই। এ সব অবস্থার যে কোনটাই বস্তুর অস্তিত্বের কারণ হতে পারে। বস্তুত কোন বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে তার সারবত্তার কোন সংস্রবই নেই আর তা কোন চিরন্তন সত্যও নয়। যাই হোক কোন বিশেষ পরিবর্তনশীল বস্তু পরম্পরা বোঝার তেমন কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের সারবত্তার সন্ধান পাওয়া যাবে একমাত্র স্থির আর চিরন্তন বস্তুতে আর তাদের সত্যকার নিয়ামক হিসেবে যে সব বিধি-নিয়ম ঐ সবে লিপিবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে তাতে—ঐ সব বিধি-নিয়মেই বিশেষ বিশেষ বস্তু তৈয়রী হয়েছে, হয়েছে সাজানো। শুধু তা নয়, এসব বিশেষ আর পরিবর্তনশীল বস্তুগুলি স্থির বস্তুগুলির উপর এমন মৌলিক আর অন্তরঙ্গভাবে নির্ভরশীল যে ওদের (স্থির বস্তুগুলি) বাদ দিলে এদের (পরিবর্তনশীল বস্তুর) অস্তিত্বই থাকবে না, এমন কি ওদের সম্বন্ধে কোন ধারণাই যাবে না করা।' স্পিনোজার শ্রেষ্ঠতম রচনা এথিক্সের (Ethics) অধ্যয়নের সময় উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি মনে রাখলে সঙ্গে সঙ্গে তাও যেমন স্বচ্ছ হয়ে উঠবে তেমনি এথিক্সের অনেক কিছু যা নিরুৎসাহজনকভাবে জটিল তাও সরল আর সহজবোধ্য হয়ে যাবে অনেকখানি।

৪. নীতি কথা (Ethics)

এটি আধুনিক দর্শনের এক মূল্যবান সৃষ্টি। চিন্তাকে ইউক্লিডীয় স্বচ্ছতা দানের জন্যই তাকে দেওয়া হয়েছে জ্যামিতিক রূপ। কিন্তু ফলে তা এমন এক সংক্ষেপিত দুর্বোধ্যতায় পরিণত হয়েছে যে প্রতি পংক্তির জন্যই তালমুদীয় (Talmud-য়হুদী আইন গ্রন্থ) ভাষ্যের প্রয়োজন। মধ্য-যুগীয় দার্শনিকরাও তাঁদের চিন্তাকে প্রণালীবদ্ধভাবেই রূপ দিয়েছেন কিন্তু কখনো এমন সংক্ষিপ্তসারের আশ্রয় নেননি। আর তাঁদের সিদ্ধান্ত পূর্ব নির্দিষ্ট বলে তার বোধগম্যতা বিঘ্নিত হতো না। ডেস্কার্টিস্ মনে করতেন গণিতের ভাষায় ছাড়া দর্শন সুনির্দিষ্ট হতে পারে না কিন্তু তিনি নিজে তাঁর এ আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে করেননি চেষ্টা। সব রকম সুকঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে যে গাণিতিক মনের প্রয়োজন স্পিনোজা সে মন নিয়েই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন আর প্রভাবিত হয়েছিলেন কপারনিকাস্, কেপ্‌লার আর গেলেলিয়োর সাফল্যে। আমাদের শিথিল মনের কাছে এসব যেন বস্তু আর রূপের এক ক্লান্তিকর সমাবেশ। তাই এ জ্যামিতিক দর্শনকে চিন্তার এক কৃত্রিম দাবা খেলা বলে উড়িয়ে দিয়ে আমরা পেতে চাই সান্ত্বনা-স্বতসিদ্ধ, সংজ্ঞা, প্রতিপাদ্য, প্রমাণ ইত্যাদিকে তিনি ব্যবহার করেছেন দাবার ছকের রাজা, পুরোহিত, গোলাম আর বোড়ে হিসেবে। স্পিনোজার নিঃসঙ্গতায় সান্ত্বনা-দানের জন্যই যেন যুক্তিবিদ্যার এ বৈরাগ্য আবিষ্কার শৃঙ্খলা আমাদের মনের বিপরীত-ধর্মী, কল্পনার বিক্ষিপ্ত পথে বিচরণই আমাদের প্রিয় আর আমাদের অনিশ্চিত স্বপ্ন দিয়ে বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই আমরা দর্শন। দুনিয়ার অসহনীয় বিশৃঙ্খলাকে ঐক্য আর শৃঙ্খলায় পরিণত করবেন এ ছিল স্পিনোজার অদম্য ইচ্ছা। দক্ষিণদেশীয়দের সৌন্দর্য লিপ্সা থেকে তাঁর ছিল উত্তরাঞ্চলীয় সুলভ সত্য সন্ধানের ক্ষুধা। তাঁর ভিতরকার শিল্পীটা ছিল পুরোপুরি স্থপতি—চিন্তার পদ্ধতিকে আকারে আর পরিমিতিতে একটা সামঞ্জস্য দিতে চেয়েছেন তিনি। স্পিনোজা যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন আধুনিক ছাত্র তাতে হয়তো হোঁচট খাবেন আর মনে মনে খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকবেন। ল্যাটিন ভাষায় লিখেছেন বলে অত্যন্ত আধুনিক চিন্তাকেও তিনি মধ্যযুগীয় পণ্ডিতি ভাষায় প্রকাশ করতে হয়েছেন বাধ্য। তখন এ ছাড়া দর্শনের অন্য কোন বোধগম্য ভাষা ছিলই না। তাই আমরা যেখানে 'বাস্তব' (Reality) অথবা সার-বস্তু (Essence) লিখছি তিনি সেখানে 'সংক্ষিপ্ত-সার' (Substance) লিখেছেন, আমরা যেখানে পূর্ণাঙ্গ (complete) লিখছি তিনি লিখেছেন সেখানে 'পরিপূর্ণ' (perfect), আমাদের 'উদ্দেশ্যের (object) পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন 'আদর্শ' (Ideal), 'মন্ময় ভাবের' (Subjectivity) বদলে 'তন্ময় ভাবে' (objcetivity), আর 'তন্ময় ভাবের' বদলে 'বিধি মতে' (formally) আমাদের বিশ্বাস পথের এসব বাধা দুর্বলকে নিরাশ করলেও সবলকে জোগাবে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ আর প্রেরণা।

মোট কথা স্পিনোজাকে শুধু পড়লে চলবে না তাঁকে অধ্যয়ন করতে হবে। ইউক্লিডকে অধ্যয়নে যেভাবে অগ্রসর হতে হয় এঁর বেলায়ও সেভাবেই হতে হবে অগ্রসর—বুঝতে হবে তিনি তাঁর সারাজীবনের চিন্তাকে এ সংক্ষিপ্ত দু'শ পৃষ্ঠায় করেছেন লিপিবদ্ধ। এক মোহ-মুক্ত স্থপতির মতো সব অবাস্তবকেই তিনি ফেলেছেন ছেঁটে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলে এর মর্মের সন্ধান মিলবে না, দর্শনের এমন আর কোন রচনা নেই যার সামান্য বাদ দিলেও এতখানি ক্ষতি হতে পারে। প্রত্যেকটা অংশই পূর্ববর্তী অংশের উপর নির্ভরশীল, যাকে হয়তো প্রথমে মনে হবে অনাবশ্যক প্রতিপাদ্য পরে দেখা যাবে তাই যুক্তিবিদ্যার এক বিশেষ বিকাশের ভিত্তি প্রস্তর। ভালো করে পড়ে নিয়ে সবটা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে চিন্তা না করলে কোন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ই ভালো করে বুঝতে পারা যাবে না। অবশ্য জেকোবির (Jacobi) মতো অতখানি অতিরঞ্জিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বলার দরকার নেই যে নীতিকথার (Ethics) এক পংক্তিও যার কাছে অবোধ্য থেকে গেছে সে কখনো স্পিনোজাকে বুঝতে পারেনি।" তাঁর এ রচনার দ্বিতীয় খণ্ডে স্পিনোজা নিজেই বলেছেন "নিঃসন্দেহে এখানে এসে পাঠক কিছুটা হতবুদ্ধি হবেন, এমন বহু জিনিস তাঁর মনে হবে যাতে তিনি হয়তো থমকে পড়বেন, তাই আমার বিনীত অনুরোধ তিনি যেন আমার সঙ্গে এগিয়ে চলেন আর সবটা পড়া শেষ না করে যেন কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছেন।" সবটা বই এক সঙ্গে পড়বেন না, একটু একটু করে বহুবারে পড়বেন। শেষ হওয়ার পর মনে করবেন আপনি সবেমাত্র বুঝতে শুরু করেছেন। তারপর কিছু কিছু ভাষ্য যেমন পল্লকের স্পিনোজা (Pollock's Spinoza) অথবা মার্টিনোর স্টাডি অব স্পিনোজা (Study of Spinoza) পড়ুন, দুইই পড়তে পারলে আরো ভালো। শেষে এথিক্সটা আবার পড়ুন, এবার বইটা সম্পূর্ণ নূতন মনে হবে। দ্বিতীয়বার শেষ করার পর আপনি হয়ে পড়বেন চির-জীবনের জন্য দর্শন-পোষক।

AMARBOI.COM

ক. প্রকৃতি আর ঈশ্বর

পড়া শুরু করলে প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমাদের নিমজ্জন ঘটে পরা-বিজ্ঞানের আবর্তে। পরা-বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আধুনিক শক্ত মস্তিষ্কের, (না কি কোমল মাথার?) যে বিতৃষ্ণা তা আমাদের পেয়ে বসে—মুহূর্তে মনে হয় স্পিনোজা ছাড়া অন্য কিছু পড়লেই ভালো হতো। কিন্তু আসলে, যেমন উইলিয়াম জেমস্ বলেছেন, পরা-বিজ্ঞান ত বস্তুর চরম স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন চিন্তা ছাড়া আর কিছুই না—বাস্তবের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের সত্যানুসন্ধান করে সব সত্যকে ঐক্যবদ্ধ করে "সাধারণীকরণের উচ্চতম পর্যায়ে" পৌঁছাই তার লক্ষ্য। অত্যন্ত বাস্তববাদী ইংরেজেরও এ দর্শনকে স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই। যে বিজ্ঞান অত্যন্ত হাল্কাভাবে পরা-বিদ্যার নিন্দা করে থাকে সে বিজ্ঞান ও তার চিন্তার প্রতি ক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়ে থাকে পরাবিদ্যার। আর সে পরা-বিদ্যা হচ্ছে স্পিনোজার পরা-বিদ্যা।

স্পিনোজা-পদ্ধতিতে তিনটি পারিভাষিক শব্দ স্থান পেয়েছেঃ সার-বস্তু (Substance) গুণ (Attribute) আর প্রকৃতি (Mode)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাময়িকভাবে গুণের কথা এখন থাক্—যে কোন বিশিষ্ট বস্তু বা ঘটনা, যে কোন বিশেষ রূপ বা আকার যা ক্ষণস্থায়ীভাবে বাস্তবতার রূপ নেয় তাই 'প্রকৃতি'। যেমন তুমি, তোমার দেহ, তোমার চিন্তা, তোমার দল, তোমার প্রজাতি, তোমার গ্রহ ইত্যাদি। এসবের পেছনে যে চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা রয়েছে প্রায় আক্ষরিক অর্থেই এগুলি তার রূপ আর 'প্রকৃতি'।

অন্তর্নিহিত বাস্তবতা কি ? এসবের পেছনে যা আছে প্রায় আক্ষরিক অর্থেই তাকেই স্পিনোজা 'সার-বস্তু' বলেছেন। স্পিনোজার পর অষ্ট প্রজনন (generation) এর অর্থ-সন্ধানে স্তূপীকৃত রচনার সাহায্যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, কাজেই একটা মাত্র অনুচ্ছেদে আমরা যদি তার সমাধানে অপারগ হই তাতে আমাদের অনুৎসাহিত হওয়ার কোন কারণ নেই। একটা ভুল সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত: চেয়ারের সার-বস্তু (Substace) যে কাঠ এ যেমন আমরা বলে থাকি ঠিক তেমনিভাবে স্পিনোজা কথিত Substance সব কিছুর গঠন-উপাদান বুঝায় না। "তাঁর বক্তব্যের সার-মর্ম" এ কথা বলে তিনি যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার নাগাল আমরা পেয়ে থাকি। মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের থেকেই স্পিনোজা এ শব্দটি নিয়েছেন আর তারা নিয়েছেন গ্রীক থেকে, গ্রীক ভাষায় এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে হওয়া, এতে অন্তর-সত্তা বা সার বস্তুকেই বুঝিয়ে থাকে। তা হলে স্পিনোজার মতে (স্পিনোজা জেনেসিসের 'আমি হই আমি' ভুলে যাননি) সার-বস্তু বা Substance হচ্ছে যা সনাতন ও অপরিবর্তনীয় তাই, যার অন্য সবকিছু একটা ক্ষণস্থায়ী রূপ বা প্রকৃতি। আমরা যদি এখন সারবস্তু আর প্রকৃতি এবং তার বিভিন্ন ভাগ নিয়ে তুলনা করে দেখি—একদিকে 'মননশীলতার উন্নয়ন' আর সনাতন নিয়ম কানুন যা অপরিবর্তনীয় আর অন্যদিকে সাময়িক ও নশ্বর বস্তু তা হলে আমরা এমন সিদ্ধান্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছবো যাতে মনে হবে স্পিনোজা এখানে যাকে 'সারবস্তু' বলেছেন অন্যত্র তাকে বলেছেন সনাতন ও অবিনশ্বর। সাময়িকভাবে আমরা ধরে নিতে পারি এ 'সার-বস্তুই' চিহ্নিত করে সবকিছুর অস্তিত্বের গঠন, যা নিহিত রয়েছে সব ঘটনা ও বস্তুর অন্তরালে আর এ হচ্ছে বিশ্বের মূল।

স্পিনোজা এ বস্তু-সারের সঙ্গে প্রকৃতি আর ঈশ্বরকেও একাত্ম করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছেন। মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের মতো তিনিও প্রকৃতির দ্বৈত-রূপ অবলোকন করেছেন: এক সক্রিয় প্রাণ-শক্তি, স্পিনোজা যাকে প্রজননশীল প্রকৃতি আর বার্গসঁ (Bergson) যাকে সৃষ্টিশীল বিবর্তন বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ এ পদ্ধতির অকর্মক সৃষ্টি, যা প্রকৃতি-জাত, প্রকৃতিতে যে বস্তু ও পদার্থ রয়েছে তাই—যেমন প্রকৃতির অরণ্য, জল বায়ু, পাহাড়-পর্বত, মাঠ আরো অসংখ্য বাহ্যিক বস্তু-নিয়ে। শেষোক্ত চিন্তাকে তিনি আমল দেননি, প্রথমোক্ত ভাবকেই তাঁর বস্তুসারের সঙ্গে প্রকৃতি আর ঈশ্বরের একাত্মতা স্বীকার করেছেন। বস্তু-সার আর প্রকৃতি, চিরন্তন নিয়ম আর অস্থায়ী নিয়ম, সক্রিয় প্রকৃতি আর নিষ্ক্রিয় প্রকৃতি, ঈশ্বর আর বিশ্ব—স্পিনোজার মতে এসবই এক বিন্দুতে লীন আর সমার্থক দ্বিধা বিভক্তিকরণ, এসবই পৃথিবীকে বস্তু-সার আর ঘটনায় করে খণ্ডিত। বস্তু-সার বস্তু নয়। ওটা একটা রূপ বটে কিন্তু পদার্থ নয়—চিন্তা আর বস্তুর সঙ্কর এবং নির্বিকার মিশ্রণ ওটি নয়, যদিও কেউ কেউ তা মনে করে থাকেন। অকর্মক বা বস্তু প্রকৃতি থেকে সৃষ্টিশীল আর বস্তুসারের যে একাত্মতা তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। স্পিনোজার চিঠিপত্র থেকে একটি অনুচ্ছেদ উধৃত হলো যা আমাদেরে এ বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করবে:

'পরবর্তী খ্রীস্টানদের থেকে ঈশ্বর আর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করি—আমি মনে করি ঈশ্বর স্বতঃপ্রসূত ও চিরন্তন, স্বতন্ত্র-ভাবে সব বস্তুর কারণ তিনি নন। আমি বলি, সবকিছুই ঈশ্বরে নিহিত —ঈশ্বরই সবকিছুর গতি আর জীবন। এ বিষয়ে পলের (Paul) সঙ্গে আমি একমত, সম্ভবতঃ প্রাচীন সব দার্শনিকেরও এ মত। এমন কি আমি বলতে চাই যে প্রাচীন হিব্রুরাও এ মত পোষণ করতেন—অনেক মিথ্যা আর পরিবর্তন সত্ত্বেও কোন কোন প্রাচীন ঐতিহ্য থেকেও এ অনুমান সহজেই করা যায়। অনেকে সম্পূর্ণ ভুল ধারণাবশত বলে থাকেন যে, আমার উদ্দেশ্য নাকি ঈশ্বর আর প্রকৃতিকে (প্রকৃতি অর্থে যাঁরা মনে করেন কতকগুলো বস্তু পিণ্ড) এক আর একই দেখানো। আমার এরকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না।'

'ধর্ম ও রাষ্ট্র' প্রবন্ধেও তিনি আবার বলেছেন: 'ঈশ্বরের সাহায্য অর্থে আমি প্রকৃতির নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নীতি বা স্বাভাবিক ঘটনার পরম্পরা বুঝাতে চেয়েছি।" প্রকৃতির বৈশ্বিক নীতি আর ঈশ্বরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরন্তন বিধান এক আর একই ব্যাপার। "ত্রিভুজের ত্রি-কোণ দুই সম-কোণের সমান, যুগ যুগ ধরে ত্রিভুজের এ স্বভাবের যেমন ব্যতিক্রম ঘটেনি তেমনি একই নিয়মে ঈশ্বরের অসীম প্রকৃতিই যে সব কিছুর উৎস সে চিরন্তন নীতিরও ঘটেনি কোন রদবদল।" বৃত্তের সব নিয়ম যেমন সব বৃত্তের বেলায় একই তেমনি বিশ্বের বেলায়ও ঈশ্বর। বস্তু-সারের মতো ঈশ্বরও সব কিছুর অদৃশ্য শৃঙ্খল বা পদ্ধতি—সবকিছুর অন্তর্নিহিত অবস্থা, বিশ্বের গঠন আর তার বিধি-বিধান। সেতুর সঙ্গে তার নকশা, গঠন যে গাণিতিক আর যান্ত্রিক নিয়ম-কানুনে তা তৈয়রী হয় তার যে সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে প্রাকৃত আর বস্তু-বিশ্বেরও সে রকম সম্পর্ক। বর্ণিত বিষয়গুলো সেতুর স্থিতিশীলতার ভিত্তি, অন্তর্নিহিত শর্ত আর তার বস্তু-সার—এ সব ছাড়া সেতু ভেঙ্গে পড়া অনিবার্য। সেতুর মতো বিশ্বের স্থিতিশীলতা ও তার গঠন আর নিয়মকানুনের উপর নির্ভরশীল—যা ঈশ্বরের হস্ত-বিধৃত।

ঈশ্বরের ইচ্ছা আর প্রাকৃতিক নিয়ম এক আর একই বাস্তবতা—শুধু প্রকাশ ঘটেছে ভিন্নতর ভাষায়। সবকিছু বা সব ঘটনা এক অপরিবর্তনীয় নিয়ম-কানুনের যান্ত্রিক প্রয়োগেরই ফল—তারকালোকে বসে-থাকা কোন দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারীর খেয়াল খুশী নয় এসব। ডেস্‌কার্টেস্‌ (Descartes) দেহ আর পদার্থে যে যান্ত্রিকতা দেখেছেন তাই দেখেছেন স্পিনোজা ঈশ্বর আর মনে। এ বিশ্ব প্রাক্তনবাদের ফল—কোন নক্‌শা করা ব্যাপার নয়। আমরা সচেতন উদ্দেশ্যেই কাজ করে থাকি বলে মনে করি সব পদ্ধতিরই বুঝি এ একই উদ্দেশ্য আর আমরা নিজেরা মানুষ বলে আমরা মনে করি সব কিছুর লক্ষ্য মানুষ আর সবকিছু পরিকল্পিত হয়েছে মানুষের প্রয়োজন মিটাবার জন্যই। আমাদের বহু চিন্তার মতো এও এক মানব-প্রধানী ভ্রান্তি বিলাস। দর্শনে সব রকম প্রধান প্রধান ভুলের মূল হচ্ছে—তন্মায় বিশ্বের ব্যাপারে আমাদের মানবীয় উদ্দেশ্য, মাপকাঠি আর প্রবণতা আরোপ করা। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে "পাপের সমস্যা"—জীবনের দুঃখকষ্টকে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলের সঙ্গে আপোষ করাতে চাই—আমরা ভুলে যাই যবকে (Job) যে শেখানো হয়েছিল 'ঈশ্বর আমাদের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের অতীত' সে পাঠ। মানুষের সঙ্গেই ভালো মন্দের সম্পর্ক, অনেক সময় এসব নির্ভর করে ব্যক্তিগত রুচি আর উদ্দেশ্যের উপর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের ব্যাপারে, এসবের কোন মূল্য নেই, যে বিশ্বে ব্যক্তি হচ্ছে নেহাৎ ক্ষণজীবী। এ বিশ্বে 'গতিশীল অঙুলি' জাতির ইতিহাসও লিখে থাকে জলের রেখায়।

'কোন কিছু যে আমাদের কাছে হাস্যকর, অসম্ভব ও অন্যায় মনে হয় তার কারণ সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খণ্ডিত আর প্রকৃতির সামগ্রিক শৃঙ্খলা ও ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব। তার উপর আমরা চাই, সব কিছু আমাদের যুক্তি অনুসারেই ঘটুক। আসলে যাকে আমরা মন্দ বলছি বিশ্বের সামগ্রিক বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে তা মোটেও মন্দ নয়। বিচ্ছিন্ন-ভাবে আমাদের নিজেদের স্বভাবের নিয়মে বিচার করলেই তা মন্দ মনে হয় বটে......নিজস্বভাবে ভালো বা মন্দ হাঁ-সূচক কিছুই ইংগিত করে না........ একই জিনিস ভালো মন্দ, নির্বিকার সবই হতে পারে এক সঙ্গে। যেমন সংগীত বিষণ্ন মনের জন্য ভালো, শবযাত্রী বা বিলাপীর জন্য মন্দ, মৃতের জন্য নির্বিকার।'

ভালো বা মন্দ মনের সংস্কার মাত্র—চিরন্তন সত্যের কাছে তাই অস্বীকৃত। "অসীমের পরিপূর্ণ সত্তার প্রকাশই বিশ্বের জন্য যুক্তিসঙ্গত বা সত্য পন্থা—শুধু মানুষের বিশেষ আদর্শ প্রকাশ তার লক্ষ্য নয়।" ভালো মন্দের মতো কুৎসিত আর সৌন্দর্যের ব্যাপারেও একই কথা: এ সবও মন্ময় আর ব্যক্তিগত পরিভাষা—বিশ্ব ব্যাপারে প্রয়োগ করতে গেলেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। "আমি প্রকৃতিকে সুন্দর বা কুৎসিত, সুশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল এমন বিশেষণে বিশেষিত করি না। আমাদের কল্পনার পরি-প্রেক্ষিতেই শুধু কোন কিছুকে সুন্দর বা কুৎসিত, সুশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল বলা যায়। যেমন আমাদের সামনে রক্ষিত যে বস্তুর গতি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে স্বাস্থ্যপ্রদ। তাই আমাদের কাছে মনে হয় সুন্দর আর যা তা নয় তাই মনে হয় কুৎসিত।" এসব অনুচ্ছেদে স্পিনোজা প্লেটোকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্লেটো মনে করতেন তাঁর সৌন্দর্য বিচার সৃষ্টি-বিধান আর ঈশ্বরের চিরন্তন নির্দেশের অনুকূল।

ঈশ্বর কি ব্যক্তি? অবশ্য এ শব্দের মানবীয় অর্থে নয়। স্পিনোজা লক্ষ্য করেছেন: "সাধারণে এখনো ঈশ্বরকে পুরুষ হিসেবেই কল্পনা করে, নারী হিসেবে নয়"—যে ধারণা নারীকে সাংসারিক ব্যাপারে পুরুষের অধীন কল্পনা করা হয়েছে তা তিনি সাহসের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে এক পত্র-লেখক আপত্তি জানিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন তাতে প্রাচীন গ্রীক সংশয়বাদী এক্সেনোপেনিসের (Xenophanes) কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়:

"তুমি লিখেছ আমার ঈশ্বর যদি দেখতে, শুনতে, পর্যবেক্ষণ করতে, ইচ্ছা করতে বা অনুরূপ কিছু করতে না পারে তা হলে সেটা কি রকম ঈশ্বর হবে তা তুমি বুঝতে পারছ না। মনে হয় উপরে যে সব গুণের কথা বলা হলো, তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর কোন গুণ যে আছে তা তুমি বিশ্বাস কর না। এতে আমি কিছুমাত্র অবাক হই না, কারণ আমার বিশ্বাস, যদি ত্রিভুজ কথা বলতে পারতো তা হলে সে নিশ্চয়ই বলতো নিঃসন্দেহে ঈশ্বর ত্রিভুজাকার আর বৃত্ত কথা বলতে পারলে বলতো ঈশ্বর বৃত্তাকার—এভাবে প্রত্যেকে নিজের গুণটাই ঈশ্বরে আরোপ করে বসতো।" মেধা বা ইচ্ছা-শক্তির মতো যে সব সাধারণ মানবীয় গুণ ঐশী শক্তিতে আরোপ করা হয় তার কোনটাই ঈশ্বর প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সব কারণ আর বিধি-বিধানেরই সমাহার হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা আর সব মন-মানসের সমাহার ঈশ্বরের মেধা বা মনন। স্পিনোজার মতে "কালে ও স্থানে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা মানসিকতাই হচ্ছে ঈশ্বরের মন—যার বিকীর্ণ চেতনা বিশ্বকে সঞ্জীবিত করে তোলে। পরিমাণের যত তারতম্যই হোক সব জিনিসই হয়ে ওঠে সজীব।" আমাদের পরিচিত সবকিছুর একটা দিক হচ্ছে প্রাণ বা মন আর জড় প্রকাশ বা দেহ হচ্ছে অন্য দিক। এ দুই দিক বা গুণের (স্পিনোজার ভাষায়) সাহায্যে আমরা সার-বস্তু বা ঈশ্বরের উপলব্ধি করে থাকি। একমাত্র এ অর্থে সবকিছুর পরিবর্তনের পেছনে যে সনাতন সত্য ও বিশ্ব-শক্তি রয়েছে যাকে বলা হচ্ছে ঈশ্বর তাঁর দেহ আর মন দুই-ই হয়তো থাকতে পারে। মন বা পদার্থ কিছুই ঈশ্বর নয়—কিন্তু মানসিক আর আণবিক এ দুই প্রক্রিয়ার দ্বৈত ভূমিকাই বিশ্বের ইতিহাস—এসব আর এ সবের কারণ আর বিধি-বিধানই ঈশ্বর।

খ. জড়বস্তু ও মন

মন কি? জড়-বস্তুই বা কি? মন কি পদার্থিক কিছু যেমন কোন কোন নিরেট মস্তিষ্ক লোক ভেবে থাকেন? অথবা দেহ কি একটা ভাব বা কল্পরূপ যা মনে করেন কোন কোন কল্পনা-বিলাসী? মনের ক্রিয়াটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্তিষ্ক চালনার কাজ না কারণ ? না কি তারা অসম্পর্কিত ও স্বাধীন, তাদের সমান্তরাল স্রেফ্ আকস্মিক ?

স্পিনোজার উত্তর : মন যেমন নয় জড়-বস্তু তেমনি জড়-বস্তুও নয় মানসিক—মস্তিষ্কক্রিয়া যেমন নয় চিন্তার কারণ তেমনি নয় তা তার ফলশ্রুতি এ দুই ক্রিয়া স্বাধীনও যেমন নয় তেমনি নয় সমান্তরাল। কারণ দু'রকম ক্রিয়া-পদ্ধতি বা দু'রকম অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু এক রকম ক্রিয়া-পদ্ধতি—অন্তর্মুখিনতায় যা ভাব আর বহির্মুখিনতায় যা গতি হিসেবেই হয় প্রতিভাত। তেমনি আছে শুধু একটি অস্তিত্ব—যা ভিতরের দিকে তাকালে দেখা যায় মন হিসেবে আর বাইরের দিকে তাকালে মনে হয় বস্তু। কিন্তু আসলে এ দুই অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ। মন আর দেহ একে অন্যের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে অক্ষম, কারণ তারা স্বতন্ত্র নয় তারা এক। "দেহ মনকে চিন্তার নির্দেশ দিতে অক্ষম তেমনি মনও দেহের গতি-নিয়ন্ত্রণে অপারগ—দেহ বিশ্রাম নেবে না অন্য অবস্থায় থাকবে তার নির্দেশ দেওয়া মনের কাজ নয়। এর একমাত্র কারণ মনের সিদ্ধান্ত আর দেহের ইচ্ছা আর সঙ্কল্প এক আর একই ব্যাপার। এভাবে সারা বিশ্বই দ্বৈতভাবে ঐক্যবদ্ধ। যেখানেই একটা বাহ্যিক জড়-প্রক্রিয়া দেখা যায়, বুঝতে হবে তা সত্যিকার প্রক্রিয়ার শুধু একটা দিকমাত্র—পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিপাতের ফলে দেখা যাবে আমাদের অন্তর্লীন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। যতই আনুপাতিক বেশকম থাকুক না কেন তার সঙ্গে আমাদের ভিতরের প্রক্রিয়ার সম্পর্ক আমরা বুঝতে পারি। বাইরের জড়-ক্রিয়ার প্রতি স্তরের সঙ্গে ভিতরের তথা মানসিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। "বস্তুর সম্পর্ক আর পদ্ধতি যে রকম ভাবেরও সম্পর্ক আর পদ্ধতি অবিকল তাই।" চিন্তা-প্রক্রিয়া আর প্রসারণ-প্রক্রিয়ার বস্তু-সার একই—যা কখনো আমরা একভাবে আবার কখনো অন্যভাবে উপলব্ধি করে থাকি। "যদিও কিছুটা বিশৃঙ্খলভাবে হলেও মনে হয় কোন কোন য়ুহুদী এটা বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁরা বলেছিলেন ঈশ্বর আর মানুষের মেধা আর এ মেধার সাহায্যে যা উপলব্ধি করা হয় তা এক ও একই।"

'মন'-কে যদি সর্বতোভাবে স্নায়ু-যন্ত্রের সব কিছুর সমার্থক ধরে নেওয়া হয় তা হলে শারীরিক সব রকম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের সম্পর্কও মানতে হবে। "যেমন চিন্তা আর মানসিক সব রকম প্রক্রিয়া মনেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ করে শৃঙ্খলা তেমনি শারীরিক সব রূপ-বদল আর শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর রদবদলও ঘটে মনের নিয়ন্ত্রাধীনে—জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মনের উপলব্ধি ছাড়া দেহে কিছুই ঘটতে পারে না।" অনুভূত আবেগও সমগ্রের অংশমাত্র—যার ভিত্তি রক্ত-চলাচল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর হজম-ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। তেমনি 'ভাব'ও দৈহিক পরিবর্তনের অংশমাত্র—যার গঠন অতিমাত্রায় জটিল। এমনকি অতি ক্ষুদ্র আর অতি সূক্ষ্ম গাণিতিক চিন্তা-কল্পনারও প্রতিফলন ঘটে দেহে। ('ব্যবহার বিজ্ঞানীরা' সব চিন্তা-ভাবনার সময় মানুষের বাক-যন্ত্রে যে সহজাত কম্পন ঘটে তার যন্ত্র লিখনের সাহায্যে কি মানুষের চিন্তাকে ধরে রাখার প্রস্তাব করেন নি?)

এভাবে দেহ-মনের পার্থক্যটা ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে স্পিনোজা অগ্রসর হলেন মেধা আর ইচ্ছা-শক্তির ব্যবধান কমাবার দিকে। মনের কোন 'বৃত্তি' নেই, মেধা বা ইচ্ছা-শক্তি বলে স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, স্মৃতি বা কল্পনার অস্তিত্ব সম্ভাবনা আরো কম। মন কোন রকম ভাবের বাহন বা প্রতিনিধি নয় বরং তা হচ্ছে ভাবেরই প্রক্রিয়া আর তার পরম্পরা। মেধা বা মনীষা হচ্ছে ভাব-পরম্পরার এক সংক্ষেপিত বিমূর্ত নাম আর কার্য বা প্রবৃত্তি পরম্পরারই বিমূর্ত নাম হচ্ছে ইচ্ছা-শক্তি। "এ ভাব কি ঐ ভাবের সঙ্গে মনীষা আর ইচ্ছা-শক্তির সম্পর্ক হচ্ছে শৈলের সঙ্গে শৈল-ময়তার সম্পর্কের মতো। আসলে ইচ্ছা-শক্তি আর মনীষা একই বস্তু কারণ প্রবৃত্তি বা সঙ্কল্প স্রেফ একটি ভাবমাত্র যা প্রচুর সহযোগিতার ফলে (অথবা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের অনুপস্থিতির ফলে) মানুষের চৈতন্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে কর্মে রূপান্তরিত হয়। ভিন্নতর ভাবের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হলে প্রত্যেকটা ভাবই এক একটা কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। ভাব নিজেই ঐক্যবদ্ধ আঙ্গিক প্রক্রিয়া যা সমাপ্তি লাভ করে কর্মে।

যে প্রেরণা কোন ভাব বিশেষের চৈতন্যে অবস্থানের সময় নির্ধারণ করে তাকে প্রায়ই ইচ্ছাশক্তি বলে অভিহিত করা হয় কিন্তু আসলে তা হচ্ছে আকাংক্ষা—আর মানুষের এ হচ্ছে প্রকৃত ব্যক্তি-সত্তা। আকাংক্ষার ক্ষুধা বা প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমরা সচেতন কিন্তু এ প্রবৃত্তি সব সময় সচেতন আকাংক্ষার দ্বারা হয় না পরিচালিত। প্রবৃত্তির অন্তরালে আত্মরক্ষার সব বিচিত্র ও অনির্দিষ্ট বহুতর চেষ্টাই নিহিত থাকে। শফেনহাওয়ার আর নীট্‌সে যেমন সর্বত্র বাঁচার আর ক্ষমতার ইচ্ছা দেখতে পেতেন তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পিনোজা ও সব মানুষে এমনকি মানবেতরের মধ্যেও এ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি দেখতে পেতেন। দার্শনিকদের মধ্যে কদাচিৎ মতভেদ ঘটে।

"প্রত্যেক বস্তুই স্বরূপে বাঁচতে চেষ্টা করে—যে শক্তি দিয়ে এ চেষ্টা সাধিত হয় তা হচ্ছে সে বস্তুর প্রকৃত সারাংশ (essence)। যে শক্তি দিয়ে বস্তু নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে তাই তার বস্তু-সার। ব্যক্তির আত্মরক্ষার উপযোগী করেই প্রকৃতি মানুষের সব প্রবৃত্তিকে রূপায়িত করেছে (শুধু ব্যক্তিকে নয় প্রজাতি আর শ্রেণীকেও, যার কথা বলতে এ নিসঙ্গ চিরকুমার দার্শনিক হয়তো ভুলে গেছেন)। প্রবৃত্তির তৃপ্তি বা বাধারই নাম আনন্দ ও বেদনা—এগুলি আকাংক্ষার কারণ নয় বরং তার ফল। আনন্দ দেয় বলেই আমরা কোন বস্তু চাই না বরং আমরা চাই বলেই ঐগুলি আমাদের আনন্দের কারণ হয় আর না চেয়ে পারি না বলেই ঐগুলি আমরা চাই পেতে।

কাজেই স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই, আত্মরক্ষার প্রয়োজনই নির্ধারণ করে সহজপ্রবৃত্তি। সহজপ্রবৃত্তি নির্ধারণ করে আকাংক্ষা আর আকাংক্ষা নির্ধারণ করে চিন্তা আর কর্ম। শুধু আকাংক্ষা ছাড়া মনের সঙ্কল্প আর কিছু নয় আর স্বভাব-প্রবৃত্তির রকম ফের অনুসারে তা নেয় বিচিত্র রূপ। মনের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন কোন ইচ্ছা নেই কিন্তু মনের পক্ষে এটা কি ওটা চাওয়া নির্ধারণ করে কারণ আবার সে কারণেরও রয়েছে কারণ, তারও আছে কারণ, এ ভাবে চলে অনন্তধারা। মানুষ নিজের সঙ্কল্প আর আকাংক্ষা সম্বন্ধে সচেতন বলেই নিজেকে স্বাধীন মনে করে কিন্তু যে কারণ পম্পরা তাদের ইচ্ছা আর আকাংক্ষাকে রূপ দেয় তার সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ।" স্পিনোজা স্বাধীন ইচ্ছার যে অনুভূতি তার সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে—যে প্রস্তর খণ্ড তার শূন্য ভ্রমণের সময় ভাবে এ নিক্ষিপ্ত ঘূর্ণন আর তার পতনের স্থান কাল তারই স্ব-নির্ধারিত।

জ্যামিতিক নিয়ম-কানুনের মতো মানবীয় কর্মও যখন নির্দিষ্ট ও স্থির নিয়মাধীন তখন মনস্তত্ত্বকেও জ্যামিতিক নিয়ম আর গাণিতিক তন্ময়তার (objectivity) সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত। "তাই মানুষ সম্বন্ধেও আমি এভাবে লিখতে চাই যেন আমি রেখা, সমতল আর স্থূল বস্তু নিয়েই আলোচনা করছি। সব রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ, হা-হুতাশ বা ঘৃণা পরিহার করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, শুধু চেয়েছি মানবীয় কাজ-কর্ম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে, তাই কামনাকে আমি মানুষের এক পাপ প্রবৃত্তি বলে মনে করিনি বরং মনে করেছি প্রাকৃতিক পরিবেশে শীত-উত্তাপ, ঝড়-বজ্র যেমন এও তেমনি মানব-স্বভাবের প্রয়োজনীয় উপকরণ।" স্পিনোজার মানব-স্বভাব অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে এ নিরঙ্কুশ নিরপেক্ষতা, এ কারণেই ফ্রাউড্ (Froude) বলেছেন: "মানব-স্বভাবের এমন পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন আর কোন নৈতিক দার্শনিকই করেননি।" টেইন্ (Taine) বেইলির (Beyle) বিশ্লেষণকে প্রশংসা করতে গিয়ে স্পিনোজার সঙ্গে তুলনা করা ছাড়া শ্রেষ্ঠতর আর কিছু খুঁজে পাননি। আবেগ আর সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জোহানেস্ মূলার (Johannes Muller) লিখেছেন: "আবয়বিক অবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন প্রবৃত্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ স্পিনোজা যে দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন তা অতিক্রম করা এক রকম অসম্ভব বল্লেই চলে।" এ খ্যাতনামা অবয়ব-বিজ্ঞানী অত্যন্ত সবিনয়ে স্পিনোজার এথিক্সের তৃতীয় খণ্ডের প্রায় সবটাই করেছেন উদ্ধৃত। মানব-স্বভাবের এ বিশ্লেষণ পদ্ধতিই স্পিনোজা অনুসরণ করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনায়।

AMARBOI.COM

গ: বুদ্ধি আর নীতি

শেষ পর্যন্ত নৈতিক পদ্ধতি বা আদর্শ চরিত্র ও নৈতিক জীবনের তিন রকম ধারণাই দেখতে পাওয়া যায়। এক: বুদ্ধ আর খ্রীস্টের নীতি, যে নীতির জোর হচ্ছে নারী-সুলভ তথা সুকোমল গুণাবলীর উপর। এঁদের শিক্ষা সব মানুষ সমান মূল্যবান, মন্দকে প্রতিরোধ কর ভালোর দ্বারা, পুণ্য মানে ভালোবাসা আর রাজনীতি ক্ষেত্রে অসীম গণতন্ত্রের প্রতিই এঁদের প্রবণতা। আর এক নীতি হলো মেকিয়াভেল্লি আর নীট্‌শের নীতি, যে নীতির জোর হচ্ছে পৌরুষের উপর। এঁরা বলেন মানুষ অসমান, যুদ্ধ বিগ্রহ, বিজয় আর শাসনের ঝুঁকি নিতেই হবে, এঁদের কাছে পুণ্য মানে ক্ষমতা আর আভিজাত্যের উত্তরাধিকার এঁদের কাছে প্রশংসনীয়। তৃতীয় নীতি হচ্ছে সক্রেটিস, প্লেটো-এরিস্টোটলের নীতি —এ নীতি রমনী-সুলভ বা পুরুষ-সুলভ কোন গুণকেই সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য মনে করে না। এঁদের ধারণা শুধু ওয়াকিবহাল আর প্রবীণ মনই বিচার করতে সক্ষম—বিভিন্ন অবস্থার হেরফেরে কখনো শাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে প্রেমের আর কখন হবে ক্ষমতার। বুদ্ধিই এঁদের কাছে গুণ—এঁরা আভিজাত্য আর গণতন্ত্রের নানা মিশ্রিত ধরনের সরকারেরই পক্ষপাতী। স্পিনোজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেকটা অজ্ঞাতসারেই এসব পরস্পর বিরোধী দর্শনের সমন্বয় সাধন—সবই তিনি একই ঐক্যসূত্রে গেঁথেছেন। ফলে তিনি আমাদের এমন এক দর্শন দিয়েছেন যা আধুনিক চিন্তার এক চরম সাফল্যের নিদর্শন।

সুখই ব্যবহারিক জীবনের লক্ষ্য—এ বলেই তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন। আর সুখ অর্থে তিনি মনে করেন আনন্দের উপস্থিতি আর বেদনার অনুপস্থিতি। কিন্তু সুখ-দুঃখ ত আপেক্ষিক ব্যাপার—স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় মোটেও, তা তো কোন স্থির অবস্থা নয় বরং অবস্থান্তর। অপূর্ণতা থেকে অধিকতর পূর্ণতায় উত্তরণেরই নাম সুখ। ক্ষমতার ক্রমোন্নতিতেই আনন্দ নিহিত। অধিকতর পূর্ণতা থেকে অপূর্ণতার দিকে অধোগতিরই নাম দুঃখ বা বেদনা। আমি অবস্থান্তর বলছি এ কারণে যে আনন্দ নিজে কোন পূর্ণতা নয়—কেউ যদি সহজাত পূর্ণতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে তা হলে আনন্দের আবেগ থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। এর বিপরীত অবস্থা এ উপলব্ধিকে আরো পরিস্ফুট করে তোলে। সব প্রবৃত্তি আর সব আবেগ পূর্ণতা আর ক্ষমতার দিকে যাত্রা অথবা তার থেকে ফিরে আসাই বুঝিয়ে থাকে।

"আবেগের দ্বারা আমি বুঝি শরীরের ঐসব পরিবর্তন যার ফলে দেহের কর্ম-শক্তি বাড়ে বা কমে, যা তার সহায় বা বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সেই সঙ্গে এ পরিবর্তনের ভাবগুলিকেও আমি বুঝি।" (সাধারণতঃ জেমস্ (James) আর লেঞ্জকেই (Lange) আবেগ সম্পর্কীয় এ মত-বাদের উদ্‌গাতা মনে করা হয় কিন্তু এ দুই মনস্তত্ত্ববিদ থেকেও এ মতবাদ এখানেই অধিকতর স্বচ্ছভাবে বর্ণিত হয়েছে আর অধ্যাপক কেননের (Connon) গবেষণার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে গেছে মিলে।) প্রবৃত্তি বা আবেগ বিশেষ এমনি ভালো কি মন্দ নয়—তার ভালো মন্দ নির্ভর করে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি বা শক্তি হ্রাসের উপর। আমার কাছে গুণ আর ক্ষমতা সমার্থক—কর্ম-ক্ষমতারই নাম গুণ, যোগ্যতার ঐ এক রূপ। নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে যা নিজের জন্য প্রয়োজন তার সন্ধানেরই নাম গুণ—এসব যে যত বেশী করতে পারে সে ততই গুণবান। অপরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গলের জন্য নিজের আত্মত্যাগের কথা স্পিনোজা কখনো বলেননি। প্রকৃতি থেকেও তিনি অধিকতর সদয়। তিনি মনে করেন অহংবোধ আত্মরক্ষার যে চরম প্রবৃত্তি তার আনুষঙ্গিকও এক প্রয়োজনীয় সহায়ক। "শুধু অধিকতর মঙ্গলের আশায় ছাড়া কেউই যা নিজের জন্য ভালো মনে করে তা কখনো ত্যাগ করে না।" স্পিনোজার কাছে এ হচ্ছে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। "প্রকৃতি বা স্বভাবের বিরুদ্ধে যখন যুক্তির কোন দাবী নেই তখন বুঝতে হবে নিজেকে ভালোবাসায় প্রকৃতির সমর্থন রয়েছে—যা নিজের জন্য প্রয়োজন তারই সন্ধান করা উচিত মানুষের আর আকাংক্ষা করা উচিত যা তাঁকে অধিকতর পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় তার। নিজের ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব আত্মরক্ষার চেষ্টা করা উচিত প্রত্যেকের।" কাজেই য়ূটোপীয় সংস্কারকদের মতো যেমন তিনি পরোপকার ও মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধির উপর তাঁর নীতি গড়ে তোলেননি তেমনি গড়ে তোলেননি হৃদয়হীন রক্ষণশীলদের স্বার্থপরতা আর মানুষের সহজাত দুষ্ট-বুদ্ধির উপর। তাঁর নীতির ভিত্তি হলো অবশ্যম্ভাবী আর যুক্তিসঙ্গত অহংবোধ। তাঁর মতে যে নীতি মানুষকে দুর্বল হতে শেখায় তা অত্যন্ত বাজে নীতি। "নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টাই হচ্ছে পুণ্য বা গুণের বুনিয়াদ-আর এ করতে পারার ক্ষমতাতেই নিহিত মানুষের সুখ।"

নীট্‌সের মতো স্পিনোজাও বিনয়কে তেমন আমল দেননি—তাঁর ধারণা ঐ হচ্ছে মতলবাজের মোনাফেকি অথবা দাসের ভীরুতা-অক্ষমতার পরিচয়। আর ক্ষমতা ও যোগ্যতার সবরকম অভিব্যক্তিই স্পিনোজার কাছে গুণ বলেই স্বীকৃত। তাই তাঁর মতে অনুতাপ-অনুশোচনা কোন রকম গুণ নয় বরং ত্রুটি: "অনুতপ্ত ব্যক্তি দ্বিগুণ অসুখী আর দ্বিগুণ দুর্বল।" কিন্তু নীট্‌সের মতো বিনয়ের নিন্দায় তিনি অতখানি কালক্ষেপ করেননি, কারণ তাঁর অজুহাত "বিনয় অত্যন্ত দুর্লভ"। সিসেরো (cicero) বলেছেন, এমন কি দার্শনিকরাও তখন বিনয়ের প্রশংসাসূচক কিছু লেখেন তাতে নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করতে ভুল করেন না। "অহঙ্কারী ব্যক্তির নিকটতম হচ্ছে আত্ম-নিন্দুক "এ হচ্ছে স্পিনোজার মত (মনস্তত্ত্ববিদদের একটি প্রিয় ধারণাকে তিনি একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করেছেন—প্রতিটি সচেতন গুণ হচ্ছে মনের গোপন পাপ-বোধকে ঢাকার বা সংশোধন করারই চেষ্টা মাত্র।) স্পিনোজা বিনয় অপসন্দ করতেন বটে কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক লাজুকতার করতেন প্রশংসা। যে অহঙ্কার-বোধ কর্মে বাস্তবায়িত হয় না তার প্রতি ছিল তাঁর আপত্তি। দণ্ড পরস্পরকে বিরক্তিভাজন করে তোলে—"দাম্ভিক লোক কেবল নিজের কীর্তিই বয়ান করতে থাকে আর বলতে থাকে স্রেফ অপরের নিন্দনীয় গুলোই।" ওর থেকে যারা ছোটো আর যারা ওর সাফল্য আর কীর্তির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাত, তাদের সান্নিধ্যেই ওর প্রিয়। অবশেষে ও হয়ে পড়ে এসব স্তাবকদেরই শিকার। কারণ "দাম্ভিকের মতো আর কেউই অত সহজে স্তাবকতায় হয়ে পড়ে না অমন অভিভূত।"

এ পর্যন্ত স্পিনোজা আমাদের স্পার্টান-সুলভ কঠিন নীতি কথাই শুনিয়েছেন শুধু কিন্তু অন্যত্র তাঁর রচনায় সুকোমল ভাবেরই ঘটেছে প্রকাশ। যে অপরিমিত ঈর্ষা, পারস্পরিক দোষারোপ হিংসা আর একে অপরকে ছোট করার দুশ্চেষ্টা মানুষকে উত্তেজিত ও বিচ্ছিন্ন করে তার প্রতি তিনি ছিলেন কঠোর। তাঁর বিশ্বাস এ সব আর অনুরূপ আবেগ সব দূর করতে না পারলে সমাজ-জীবনে ঘটবে না দুঃখের অবসান। তিনি মনে করতেন যেহেতু হিংসা ভালোবাসার প্রায় সীমান্তবর্তী বলে ভালোবাসা দিয়েই হিংসা দমন করা সহজ। হিংসা হিংসার দ্বারাই হয় লালিত—"যাকে হিংসা করা হচ্ছে প্রতিদানে সে ভালোবাসবে যে মনে মনে এ বিশ্বাস পোষণ করে বুঝতে হবে সে হিংসা-ভালোবাসার পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের হয়েছে শিকারে পরিণত।" স্পিনোজার এক আশাপ্রদ বিশ্বাস—ভালোবাসাই দিয়ে যাকে ভালোবাসার জন্য। ভালোবাসার ফলে হিংসার ঘটে ক্ষয়, প্রেমে হিংসা হয়ে পড়ে হৃত-শক্তি। হিংসা করা মানে নিজের দুর্বলতা আর ভয়টাকেই মেনে নেওয়া—দুর্বল শত্রুকে আমরা কখনো হিংসা করি না। "হিংসার বদলে হিংসা দিয়ে যে প্রতিশোধ নিতে চায় তার জীবনটাই হয় দুঃখময়। কিন্তু যে ভালোবাসা দিয়ে চায় হিংসাকে বিতাড়িত করতে তার সংগ্রাম হয় আনন্দ ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ। এমন লোক এক কেন একাধিকের সঙ্গেও সংগ্রামে সক্ষম—এমন লোকের দরকারই পড়ে না ভাগ্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার। বিজিত নিজেই আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করে নেয় তাঁর বশ্যতা। অস্ত্র দিয়ে জয় করা যায় না মন—জয় করা যায় না আত্মার মহিমায়।" গেলিলি (galilee) পর্বতে যে রশ্মি বিকীর্ণ হয়েছিল স্পিনোজার এসব অনুচ্ছেদে তারই যেন কিছুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আভাস দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তাঁর নীতি-কথার মর্ম-বাণীর সঙ্গে খ্রীস্টিয় মতবাদের চেয়ে গ্রীক মতবাদের সাদৃশ্যই বেশী লক্ষ্যগোচর। "বুঝতে চেষ্টা করাই হচ্ছে চারিত্রিক গুণের প্রথম ও একমাত্র বুনিয়াদ" তাঁর এ উক্তি পুরোপুরিই সক্রেটিয়। সংক্ষেপে সক্রেটিসের এর থেকে সহজ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আজ হতে পারে না। কঠোর নীতি নিষ্ঠার প্রয়োজন এ কারণে যে বাহ্যিক কারণসমূহ নানাভাবে আমাদেরে ইতস্ততঃ ছোঁড়াছুড়ি করতে থাকে, সমুদ্র-তরঙ্গের মতো বিপরীত বায়ু আমাদের করতে থাকে তাড়িত। ফলে আমরা নিজেরা ইতস্ততঃ করতে থাকি। আমাদের সমস্যা আর ভাগ্য দুই-ই আমাদের অজ্ঞাত। মনে করি চরম আবেগ-ঘন মুহূর্তেই বুঝি আমরা নিজের সন্ধান পেয়ে থাকি। অথচ তখন থাকি আমরা সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় তখন আমাদের পেয়ে বসে কোন পৈত্রিক আবেগ-অনুভূতির উচ্ছাস, যা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় এমন এক প্রতিক্রিয়ার দিকে যাতে হয়তো রয়েছে সমস্যার আর্ধেক খানিরই মাত্র সমাধান। কারণ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অবস্থা বা সমস্যার আংশিক উপলব্ধি সম্ভব নয়। আবেগ মানে "অপর্যাপ্ত চিন্তা বা ভাব"—চিন্তা মানে অর্জিত বা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সব প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠা পর্যপ্ত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত রাখা। এভাবে চিন্তা পূর্ণাঙ্গ হলে তবে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় বা দেওয়া যায় যথাযথ সাড়া। গতি শক্তি হিসেবে সহজাত প্রবৃত্তি অত্যন্ত মূল্যবান তবে পরি চালক হিসেবে তা বিপজ্জনক। কারণ ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক কল্যাণের পরিবর্তে প্রবৃত্তিগুলি নিজ নিজ চরিতার্থতারই করে সন্ধান। যে সব লোক প্রবৃত্তির দাস হয়ে তার লেজুড়ে হয় পরিণত তাদের অসংযত লোভ, লালসা আর কলহপ্রিয়তা মানুষের কি সর্বনাশই না সাধন করে! প্রতিদিন যে সব আবেগের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই তা দেহের অংশ বিশেষকে ছাড়িয়ে অন্যত্রও করে প্রভাব বিস্তার। কাজেই আবেগ আনে স্বভাবতই কিছুটা অতিরিক্ততা, আবেগ মনকে একটা বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ রাখে বলে তখন অন্য কিছুর চিন্তা মনের পক্ষে হয়ে পড়ে দুঃসাধ্য। কিন্তু যে কামনার উৎপত্তি দৈহিক অংশ বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন আনন্দ বা বেদনা থেকে সামগ্রিকভাবে তাও করে না মানুষের কোন উপকার। পুরোপুরি নিজের মতো হতে পারলেই নিজেকে যায় পাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসবই পুরোনো দর্শনের যুক্তি আর প্রবৃত্তির পার্থক্যের কথা। কিন্তু স্পিনোজা সক্রেটিস আর বৈরাগ্যবাদীদের চিন্তার উপর আরো কিছু করে-ছেন যোগ। তিনি জানতেন যুক্তি ছাড়া প্রবৃত্তি যেমন অন্ধ তেমনি প্রবৃত্তিহীন যুক্তিও প্রাণহীন-মৃত। "আবেগ বিশেষকে বাধা দিতে কি নির্মুল করতে হলে বিপরীত ও প্রবলতর আবেগের প্রয়োজন।" অনেক আবেগের সঙ্গে পৈত্রিক কোন কিছুর দৃঢ়-মূল সম্পর্ক থাকা সম্ভব যা শেষ পর্যন্ত থেকে যায় অপরাজয়। তাই শুধু যুক্তির খাতিরে স্পিনোজা সব আবেগের অকারণ বিরোধিতা করেননি। তিনি শুধু যুক্তিহীন আবেগের করেছেন বিরোধিতা—ঘটনার সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি নিয়ন্ত্রিত আবেগের তিনি ছিলেন সমর্থক। তাঁর মতে চিন্তায় বাসানার উত্তাপ থাকা চাই আর বাসনায় থাকা চাই চিন্তার আলো। "পূর্ণ আর স্বচ্ছ ধারণার পর প্রবৃত্তি আর প্রবৃত্তি থাকে না—পর্যাপ্ত ধারণা ভাবের সংখ্যানুপাতেই মন প্রবৃত্তির অধীন হয়ে পড়ে।" অপূর্ণ ভাব ও ধারণা থেকে উৎপন্ন সব ক্ষুধাই প্রবৃত্তি—পূর্ণাঙ্গ ভাব বা ধারণা থেকে উৎপন্ন হলেই তা গুণ। সামগ্রিক অবস্থার সম্মুখীন হতে পারলেই তা হয় গুণ বা বুদ্ধিজনক ব্যবহার। অবশেষে দেখা যাবে বুদ্ধিই সব গুণের শেষ।

স্পিনোজার নীতি-ধর্ম তাঁর পরাবিজ্ঞানেরই ফল: বিশৃঙ্খল বস্তু-প্রবাহের মধ্যে যেমন যুক্তি নিয়ম-শৃঙ্খলার উপলব্ধিতে সহায়তা করে, তেমনি বিশৃঙ্খল কামনা-প্রবাহের মধ্যে তা সাহায্য করে বিধি-নিয়ম প্রবর্তনে। যা ছিল শুধু দেখায় পর্যবসিত এখন তা হয়েছে কর্মে রূপান্তরিত —এরই নাম চিরন্তনতা। সমগ্রের এ চিরন্তন পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যই গড়তে হয় সব কর্ম ও উপলব্ধিকে। কল্পনার সহয়াতায় চিন্তা এ বৃহত্তর ধারণায় পৌঁছতে আমাদের করে সাহায্য। বর্তমান কর্মের দূর ভবিষ্যতে কি প্রতিক্রিয়া হবে একমাত্র কল্পনাই সে সম্বন্ধে আমাদের করে তুলতে পারে সচেতন—যার উপর চিন্তা-ভাবনাহীন ত্বরিৎসাধিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কোন প্রভাবই পারে না বিস্তার করতে। সুচিন্তিত ব্যবহারের এক বড় অন্তরায় হচ্ছে কল্পনার দূর পরিকল্পনার তুলনায় বর্তমানের অধিকতর প্রখর ও স্বচ্ছতর চেতনা। তবে "যুক্তির সাহায্যে মনের যে উপলব্ধি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নির্বিশেষে তার প্রভাব সমান।" কল্পনা আর যুক্তির সাহায্যে আমরা করতে পারি অভিজ্ঞতাকে দূরদর্শিতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণত, তখন আমরা অতীতের দাস না হয়ে হতে পারি আমাদের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা।

এভাবে মানুষের যে একমাত্র স্বাধীনতা তা আমরা অর্জন করতে পারি। প্রবৃত্তির নিশ্চেষ্টতা হচ্ছে 'মানুষের বন্ধন' আর যুক্তিসঙ্গত কর্মে তার প্রয়োগ মানুষের স্বাধীনতা। হেতুজনিত বিধি-পদ্ধতি থেকে মুক্তি নয় বরং খণ্ডিত প্রবৃত্তি বা ঝোঁকের হাত থেকে মুক্তি—প্রবৃত্তির হাত থেকে নয় মুক্তি চাই অসম্পূর্ণ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির হাত থেকে। যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আছে সেখানেই শুধু আমরা মুক্ত। অতি মানব মানে এ নয় যে সামাজিক সুবিচারের বন্ধন ও সুযোগ সুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়া বরং প্রবৃত্তির ব্যক্তি-চেতনা থেকে মুক্তিই তার লক্ষ্য। জ্ঞানী-মনের স্থিরতা আসে এ অখণ্ড সাধুতা থেকেই—যা এরিস্টোটলের আত্ম-সন্তুষ্ট নায়কের আভিজাত্য বা নীট্‌শের দাম্ভিক শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। বরং অর্জিত হওয়া সম্ভব মনের শান্তি আর সহকর্মী-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। "যুক্তির সাহায্যে যে মানুষ সৎ অর্থাৎ যে মানুষ যুক্তি দিয়েই নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু পেতে চায় সে কখনো এমন কিছু পেতে চাইবে না যা সে সমস্ত মানুষের জন্যও কাম্য মনে করে না।" বড় হওয়ার অর্থ এ নয় যে সব মানুষের উপর চড়ে বসে, অন্যকে শাসন করা বরং আত্মদমন করে সকলের সুরে সুর মিলিয়ে একই রকম কামনার তুচ্ছতা আর সব রকম পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে আরোহণ।

লোকে যাকে স্বাধীন-ইচ্ছা বলে তার চেয়ে এ অনেক বেশী মহত্তর স্বাধীনতা, কারণ ইচ্ছা কখনো স্বাধীন নয়, হয়তো 'ইচ্ছা' বলে কিছু নাইও। এমন কথা কেউ যেন না ভাবেন তিনি যেহেতু আর 'স্বাধীন' নন্ অতএব তাঁর ব্যবহার ও জীবনের গঠন ব্যাপারে তাঁর কোন নৈতিক দায়িত্বই নেই। যখন স্মৃতির সাহায্যেই মানুষের কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সমাজের উচিত নিজের আত্মরক্ষার জন্যই নাগরিকদের আশা-আকাংক্ষার মাধ্যম তাদেরে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সহযোগিতায় কিছুটা সংঘবদ্ধ করা। সব রকম শিক্ষাই যে কিছুটা নিয়ন্ত্রণমূলক তা তো পূর্ব-নির্দিষ্ট—তাই তরুণ মনে অনেক বিধি-নিষেধই আরোপ করা হয় যার সাহায্যে গড়ে তোলা হয় ওদের স্বভাব। "প্রয়োজনের তাড়নার ফল হলেও পাপ থেকে পাপের উৎপত্তি ও আশঙ্কাজনক। আমাদের কাজ-কর্ম স্বাধীন হোক বা না হোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখনো আশা আর আশঙ্কা। কাজেই আদেশ-উপদেশের কোন স্থান বা সুযোগ রাখা হয়নি বলাটা ভুল।” অধিকন্তু প্রাক্তন-বাদ নৈতিক জীবনকে উন্নততর করার সুযোগ দিয়ে থাকে : এ আমাদের শেখায় কাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপ না করতে, নিষেধ করে কারো উপর রাগ করতে। বলে মানুষ ‘নিরপরাধ’। দোষীকে শাস্তি দিলেও ঘৃণা না করেই দেওয়া উচিত। অপরাধ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলেই তাদেরে আমরা ক্ষমা করতে পারি।

সবচেয়ে বড় কথা প্রাক্তন-বাদ আমাদেরে অবিচলিত মনে ভাগ্যের দুই বিপরীত মুখের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি যুগিয়ে থাকে। আমাদের মনে জাগে সবকিছুই ঘটে চলেছে ঈশ্বরের চিরন্তন নির্দেশেই। হয়তো তা আমাদের ‘মননশীল ঈশ্বর-প্রেম’ও শেখাতে পারে—যার ফলে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনে নিতে পারবো সানন্দে আর নিজেদের পরিপূর্ণতা খুঁজতে পারবো তার সীমা রেখায় থেকে। এ প্রাক্তন বাদের দৃষ্টি দিয়ে যে সব কিছুর দিকে তাকায় তার মনে কোন ক্ষোভ থাকার কথা নয়, যদিও কোন কোন বিষয় সে ঠেকাতে যে চেষ্টা করে না তা নয়। কারণ তার বিশ্বাস—“সব কিছুই এক চিরন্তনের সঙ্গে বিধৃত” আর এও সে বুঝতে পারে তার নিজের জন্য যেটা অঘটন সামগ্রিক পরিকল্পনায় তা অঘটন নয় —বিশ্ব-গঠন ও চিরন্তন কার্য পরম্পরার সঙ্গে তার রয়েছে সামঞ্জস্য। এ রকম মনোভাবের ফলে সে ক্ষণিকের প্রবৃত্তি-জাত উল্লাসের ঊর্ধ্বে উঠে স্থির ধ্যানালোকে দেখতে পায় সবকিছুই চিরন্তন নিয়ম-কানুন ও বিকাশেরই অংশমাত্র। এমন লোক অনিবার্যের সামনে দাঁড়িয়ে জানে হাসতে—“সে অনিবার্য তার জীবনেই আসুক কি হাজার বছরেই আসুক তাতেই সে সন্তুষ্ট।” ঈশ্বর যে পৃথিবীর রক্ষাকর্তা এক অবশ্যম্ভাবী শক্তি আর তিনি যে তাঁর ভক্তদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে মগ্ন এক প্রতিহিংসাপরায়ণ কিছু নয় এ প্রাচীন পাঠও সে শেখে। প্লেটো এ ধারণা তাঁর রিপাব্লিকে অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় প্রকাশ করেছেন : “যার মন সত্য-সত্তায় নিবদ্ধ মানুষের ক্ষুদ্রতাকে ঘৃণা করার তার সময় কোথায় অথবা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার অবসরও বা তার কই ? স্থির ও অখণ্ড নীতির দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ—সে দেখে এসব কারো ক্ষতি করছে না নিজেও হচ্ছে না ক্ষতিগ্রস্ত বরং সব কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছে যুক্তি দ্বারা একই নিয়মে। এ নীতিরই সে অনুসরণ করে এবং যতদূর সম্ভব এর সঙ্গে সে নিজেকে চায় খাপ খাওয়াতে।" নীট্সে বলেছেন: "যা অত্যাবশ্যক তার জন্য আমি বিরক্তি বোধ করি না। ভাগ্যকে ভালোবাসাই হচ্ছে আমার স্বভাবের মূল কথা।" কীট্স (Keats) বলেছেন:

> 'সব নগ্ন সত্যকে মেনে নেওয়া আর সব অবস্থা দেখতে পাওয়াতেই পরম শান্তি। ঐ হচ্ছে কর্তৃত্বেরও শিখর-স্থান।'

এ দর্শনই আমাদের শেখায় জীবনের প্রতি শুধু নয় মৃত্যুর প্রতিও হাঁ বলতে। "স্বাধীন মানুষ মৃত্যুর চেয়ে ছোট কিছু নিয়ে ভাবে না আর মৃত্যুর নয় জীবনেরই ধ্যান হচ্ছে তার জ্ঞান বা প্রজ্ঞা।" জীবনের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত আমাদের গণ্ডীবদ্ধ অহংবোধটাকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দেয় আর যে সীমায় আমাদের উদ্দেশ্যকে সীমিত করতে হবে তার সঙ্গে আপোষ করাও তখন আমাদের পক্ষে হয় সম্ভব। হয়তো এ মনোভাব আত্মসমর্পণ ও প্রাচ্য সুলভ জড়তার দিকেও নিয়ে যেতে পারে কিন্তু এ যে সব রকম বিজ্ঞতা আর শক্তির অত্যাবশ্যক বুনিয়াদ তাও স্বীকার না করে উপায় নেই।

AMARBOI.COM

ঘ. ধর্ম ও অমরতা

শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পিনোজার দর্শন হচ্ছে—যে পৃথিবীতে তিনি নিঃসঙ্গ ও হয়েছেন সমাজচ্যুত সে পৃথিবীকে ভালোবাসারই চেষ্টা আর যবের (Job) মতো তাঁর স্বজাতিকেই করেছেন তাঁর চিন্তার কেন্দ্র-বিন্দু তাঁর জিজ্ঞাসা: ঈশ্বর-নির্বাচিত জাতির মতো কেন ন্যায়বান লোক হয় নির্যাতিত, নির্বাসিত ও পরিত্যক্ত? এক সময় বিশ্ব যে এক নৈর্ব্যক্তিক ও অপরিবর্তিত বিধি-নিয়মেরই পদ্ধতি এ ধারণা তাঁকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছেন কিন্তু পরে তাঁর স্বাভাবিক ধর্মবোধ এ মূক পদ্ধতিকেই পরিণত করেছে এক চমৎকার ভালোবাসার বস্তুতে। তিনি চেয়েছেন বিশ্বনীতির সঙ্গে নিজের বাসনা-কামনাকে একান্ত করে দিতে আর চেয়েছিলেন প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন অংশ হতে। তাঁর কথা: "বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মনের যে সংযোগ তার জ্ঞানই হচ্ছে সর্বোত্তম।" বস্তুতঃ আমাদের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা এক অর্থে একটি ভ্রান্ত ধারণা—আমরা কার্য কারণ ও বিশ্ব বিধানের বিরাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রোতধারারই অংশ, ঈশ্বরেরই অংশ আমরা। আমাদের চেয়ে বৃহত্তর এক অস্তিত্বেরই আমরা দ্রুত ধাবমান রূপ—মৃত্যুর পর আমরা মিশে যাই অনন্তে। প্রজাতি-দেহে আমাদের দেহগুলি কোষ বিশেষ আর জীবন-নাট্যে আমাদের প্রজাতি একটি ঘটনা বিশেষ আর আমাদের মন হচ্ছে চিরন্তন আলোর একটি চঞ্চল স্ফুলিঙ্গ মাত্র। "বোধশক্তি অনুসারে আমাদের মন হচ্ছে চিন্তা করার এক চিরন্তন পদ্ধতি, যা নিয়ন্ত্রিত হয় চিন্তার অন্য পদ্ধতি দ্বারা, তা আবার চালিত হয় আর এক পদ্ধতি দ্বারা, এ ভাবে চলে অনন্তকাল পর্যন্ত—যাতে সে সময় তারা সব পরিণত হয় ঈশ্বরের চিরন্তন ও অনন্ত মেধায়।" এভাবে ব্যক্তির সর্বেশ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার অদ্বৈতবাদে প্রাচ্য-সুরই যেন আবার ধ্বনিত হলো: আমরা যেন ওমরের প্রতিধ্বনিই পাই শুনতে, যিনি "একক কখনো দুই বলেননি" আর শুনতে পাই যেন পুরোনো হিন্দু কবিতার সুর: "সর্বেশ্বর একই আত্মা তা নিজের মধ্যেই অনুভব কর, সমগ্র থেকে যা বিচ্ছিন্ন করে তেমন স্বপ্ন বা খেয়াল মন থেকে করো দূর।" থরো (Thorea) বলেছেন "সময় সময় যখন ধর্মীয় রহস্য-সরোবরে অলসভাবে ইতস্তত তাড়িত হই তখন মনে হয় আমি যেন বেঁচে নেই এবং তখনই শুরু করি নিজের মতো হতে।"

এভাবে সমগ্রের যেটুকু অংশ সেখানে আমরা অমর। "দেহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হতে পারে না—কিছু অংশ তার থাকে চিরন্তন হয়ে।" এ অংশই চিরন্তনের উপলব্ধি করতে সক্ষম, এ ভাবে যতই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো ততই আমাদের চিন্তা হবে চিরন্তন। স্পিনোজা এখানে কিছুটা যেন বেশি অস্পষ্ট—পরবর্তী ভাষ্যকারদের অপরিমিত বাদানুবাদ সত্ত্বেও তাঁর ভাষা এক একজনের কাছে এক রকম অর্থ প্রকাশ করে থাকে। সময় সময় মনে হয় তিনি যেন জর্জ ইলিয়টের (Georg Eliot) খ্যাতি সর্বস্ব অমরতার কথাই বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ আমাদের জীবন আর চিন্তায় যা কিছু সব চেয়ে সুন্দর ও যুক্তিসঙ্গত তাই কালজয়ী হয়ে আমাদের রাখে—বাঁচিয়ে। আবার সময় সময় মনে হয় স্পিনোজা যেন ব্যক্তি ও ব্যক্তিগতের অমরতার কথাই ভেবেছেন। হয়তো এত অকালে তাঁর জীবনপথে আসন্ন মৃত্যুর চেহারা দেখে—যে অমরতার আশা চিরকাল মানুষের মনে জেগে উঠে, সে আশা দিয়ে তিনি নিজেও পেতে চেয়েছেন সান্ত্বনা। তবুও সব সময় তিনি চিরন্তনতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশেষের থেকে পৃথক করে দেখে এসেছেন। "সাধারণের বিশ্বাস বা মতামতের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাবো তারা তাদের মনের চিরন্তনতা সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু চিরন্তনতা আর স্থিতিকালের মধ্যে তারা একটা গোল পাকিয়ে বসে আর তা আরোপ করে কল্পনা বা স্মৃতির উপর যা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে এ তাদের ধারণা।" যদিও স্পিনোজাও অমরতার কথা বলেছেন কিন্তু এরিস্টোটলের মতো ব্যক্তিগত স্মৃতির অমরতা করেছেন অস্বীকার। দেহে অবস্থানকালে ছাড়া মন চিন্তা করতে কিম্বা কোন কিছু স্মরণ করতে অক্ষম।" স্বর্গীয় পুরস্কারেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাঁর মতে: "যারা পুণ্যের প্রতিদান চায় তারা পুণ্যের সত্যিকার মূল্যায়ন থেকে সরে থাকে বহু দূরে—ঐ যেন সবচেয়ে বড় এক গোলামী তাই (এ গোলামী করার জন্য) ঈশ্বরও তাদেরে সব চেয়ে বড় পুরস্কারে করবেন পুরস্কৃত। পুণ্য আর ঈশ্বরের সেবা যে নিজেই কত বড় আনন্দ আর কত বড় স্বাধীনতা তারা তা বুঝতেই পারে না।" স্পিনোজার বইয়ের শেষ কথা: "আশীর্বাদ বা রহস্য পুণ্যের পুরস্কার নয় কিন্তু নিজেই তাই।" অনুরূপভাবে তা হলে অমরতাও স্বচ্ছ চিন্তার ফল নয়। কিন্তু নিজেই তাই। এ স্বচ্ছ চিন্তাই অতীত বর্তমানে ও বর্তমানকে ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে যায়—পার হয়ে যায় সময়ের সীমা আর সংকীর্ণতা। বহু-বিচিত্র পরিবর্তনের পেছনে যে পরিপ্রেক্ষিত চিরন্তন তার নাগাল পায় এভাবে। এ চিন্তা অমর কারণ প্রতিটি সত্যই চিরস্থায়ী সৃষ্টি, মানুষের চিরন্তন সম্পদের অংশ—যা অশেষ প্রভাবে প্রভাবিত করছে মানুষকে অহরহ।

এ ভাব-গম্ভীর ও আশাপ্রদ সুরেই স্পিনোজা তাঁর 'এথিক্স' বা নীতি-গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন। একটা বইতে কদাচিৎ এত চিন্তা আর এত ভাবের সমাবেশ দেখা যায় তবুও এ গ্রন্থ বিরুদ্ধ ভাষ্যের এক তীব্র সংগ্রাম-ক্ষেত্রই রয়ে গেছে। এ গ্রন্থের পরাবিজ্ঞান ভুল হতে পারে, মনস্তত্ত্বও হয়তো ত্রুটিপূর্ণ, শাস্ত্রালোচনা ও হয়তো অস্পষ্ট ও সন্তোষজনক নয় কিন্তু যিনিই এ বই পড়েছেন তিনি কখনো এ বইর আত্মা, ভাব ও মর্মকথা সসম্মানে উল্লেখ না করে পারবেন না। শেষ অনুচ্ছেদে অত্যন্ত সহজ ভাষায় এ গ্রন্থের মর্মকথা হয়ে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল:

'আবেগের চেয়ে মন যে কত বড় আর মনের স্বাধীনতা যে কতখানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবান এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করলাম। অজ্ঞলোক যে শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয় তার চেয়ে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কতখানি শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান তা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। অজ্ঞ-লোক নানা বাহ্যিক কারণে শুধু যে উত্তেজিত হয়ে উঠে তা নয় সে কখনো মনের সত্যিকার আনন্দও উপভোগ করতে পারে না। অধিকন্তু সে নিজের সম্বন্ধেও নয় সচেতন, সচেতন নয় ঈশ্বর কি বস্তু সম্বন্ধেও—নিষ্ক্রিয় হতে না হতেই সে হয় বিলুপ্ত। অন্যদিকে বিজ্ঞ ব্যক্তির মন কদাচিত হয় বিচলিত—এক চিরন্তন প্রয়োজনের তাগিদে তিনি নিজের সম্বন্ধে হন সচেতন, সচেতন হন ঈশ্বর ও বস্তু সম্বন্ধে—তিনি কখনো বিলুপ্ত হন না আর সব সময় ভোগ করেন মনের শান্তি। আমার প্রদর্শিত পথ কঠিন হতে পারে তবুও একে আবিষ্কার করা সম্ভব। কদাচিৎ এর সন্ধান মিলে বলে এ নিঃসন্দেহে এক অত্যন্ত কঠিন পথ। মুক্তি যদি এতই নিকট হতো আর যদি বিনা কষ্টে পাওয়া হতো সম্ভব তা হলে প্রায় সবাই তাকে উপেক্ষা করার কারণ কি? কিন্তু সব উত্তম বস্তুই শুধু যে দুর্লভ তা নয়, অত্যন্ত কঠিন লভ্যও।

AMARBOI.COM

৬. রাজনৈতিক নিবন্ধ

'রাজনৈতিক নিবন্ধ' স্পিনোজার পরিণত বয়সের ফল। অকাল-মৃত্যুর জন্য যা তিনি যেতে পারেননি শেষ করে। এটি আকারে খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভাব-গর্ভ। তাই এ কারণে খুব দুঃখ হয় যে এ সুকোমল জীবন যখন পূর্ণতম শক্তি ও পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই তার ঘটলো সমাপ্তি। যে যুগে হবস্ (Hobbes) সার্বিক রাজতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর রাজতন্ত্র বিরোধী ইংরেজ জনসাধারণকে মিল্টন (Milton) যতখানি জোরের সঙ্গে করছিলেন সমর্থন তার চেয়েও প্রবলতর ভাবে দিচ্ছিলেন ধিক্কার তখন প্রজাতন্ত্রী দে উইটসের (De Witts) বন্ধু স্পিনোজা এমন এক রাজনৈতিক দর্শন রচনা করলেন যাতে তখনকার হোলাণ্ডের উদার ও গণতান্ত্রিক আশা-আকাংক্ষাই যেন পেয়েছিল প্রকাশ। কালক্রমে তাঁর এভাবধারাই পরিণতি লাভ করে রুশো আর ফরাসী বিপ্লবে।

স্পিনোজার মতে স্বাভাবিক আর নৈতিকবোধের যে পার্থক্য তার থেকেই সব রাজনৈতিক দর্শনের উৎপত্তি হওয়া উচিত অর্থাৎ পূর্বকালীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে অস্তিত্ব আর পরবর্তী সংগঠিত সমাজের যে অস্তিত্ব তার ব্যবধানের উপরই রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি রচিত হওয়া চাই। স্পিনোজার বিশ্বাস মানুষ এক সময় বিচ্ছিন্নভাবে কোন রকম আইন-কানুন বা সামাজিক সংগঠন ছাড়াই বাস করতো—তাঁর মতে তখন ভালো-মন্দের সুবিচার-অবিচারের কোন ধারণাই ছিলো না—শক্তি আর অধিকার ছিলো তখন এক—এ দু'য়ে ছিল না কোন ব্যবধান।

'স্বাভাবিক রাষ্ট্রে যাকে সর্বসম্মতভাবে ভালো মন্দ-বলা যায় তেমন কিছুই থাকতে পারে না কারণ স্বাভাবিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দ্বারাই হয় চালিত, আর তারা ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে নিজের খেয়ালখুশী মতই, নিজের সুবিধাটার প্রতি ছাড়া আর কিছুর প্রতিই থাকে না তাদের অনুরাগ, নিজের প্রতি ছাড়া কোন আইন-কানুনের প্রতিও থাকে না তাদের কোন দায়িত্ব। কাজেই স্বাভাবিক রাষ্ট্রে পাপের কোন ধারণাই সম্ভব নয়—একমাত্র শিষ্ট বা ভদ্র রাষ্ট্রেই তা সম্ভব যেখানে ভালো-মন্দের ধারণা সর্বসম্মতভাবে নির্ধারিত আর প্রত্যেকে থাকে রাষ্ট্রের কাছে দায়ী।...... স্বভাবের যে আইন ও নির্দেশ প্রত্যেক মানুষের জন্মগত আর প্রত্যেকের জীবনের বেশীর ভাগ কার্যও যার আওতায় তা কিছুই বারণ করে না—বারণ করে শুধু যা কেউ চায় না বা যা সাধ্যাতীত তাই। স্বভাবের আইন মারামারি, হিংসা, রাগ, প্রতারণা মোটকথা ব্যক্তিগত লোভের যা কিছু ইন্ধন মোটেও করে না তার বিরোধিতা।' বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবহার থেকেই আমরা স্বভাব-আইনের তথা স্বভাবের অরাজকতার একটা আভাস পেতে পারি। বিসমার্কের মতে 'জাতিসমূহের মধ্যে নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।' যেখানে রয়েছে সর্বসম্মত সংগঠন, রয়েছে সাধারণভাবে স্বীকৃত কর্তৃত্ব একমাত্র সেখানেই আইন ও নীতির স্থান থাকা সম্ভব। আগে যা ছিল ব্যক্তিগত অধিকার এখন তা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অধিকার। এখন এগুলিই রাষ্ট্রের শক্তি—নেতৃত্ব-স্থানীয় রাষ্ট্রগুলি তাদের রাষ্ট্র দূতদের এক বিস্মৃত সাধুতায় এখন অভিহিত হচ্ছে প্রধান শক্তিসমূহ' বলে। হয়তো এ তাদের যথার্থ পরিচয়। প্রাণীদের মধ্যেও এ একই ব্যাপার—কোন সাধারণ সংগঠন তাদের নেই বলে তাদের মধ্যে আইন-কানুন বা নীতিরও নেই বালাই। একশ্রেণী অন্য শ্রেণীর প্রতি যেমন খুশী আর যেমন শক্তি করে থাকে তেমন ব্যবহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মানুষের বেলায় পারস্পরিক প্রয়োজন জন্ম দেয় পারস্পরিক সহায়তার—এ স্বাভাবিক শক্তি পরম্পরাই পরে অধিকারের নৈতিক পদ্ধতিতে নেয় রূপ। "কেউই পারে না বিচ্ছিন্নভাবে আত্মরক্ষা করতে। পারে না সংগ্রহ করতে জীবনের অত্যাবশ্যকীয়। তাই সব মানুষের মনে মনে বিরাজ করে বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনতার ভয়। এ কারণেই সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হওয়া মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবণতা।" পারস্পরিক সাহায্য আর বিনিময় ছাড়া একক মানুষের শক্তি বিপদের সময় আত্মরক্ষায় অক্ষম। সবাই মিলে সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে নেওয়া বা তার প্রতি তিতিক্ষার পরিচয় দেওয়া মানুষের জন্মগত স্বভাব নয় কিন্তু বিপদই জন্ম দেয় সহযোগিতার যা ধীরে ধীরে সামাজিক বোধকে করে লালিত আর গড়ে তোলে শক্তিশালী করে ; 'মানুষ নাগরিক হয়েই জন্মায় না কিন্তু তাকে গড়ে তুলতে হয় উপযুক্ত করে।'

অধিকাংশ মানুষই ভিতরে ভিতরে আইন-শৃঙ্খলার শত্রু—সামাজিক বোধ সুপ্ত ও অহং-বোধের চেয়ে দুর্বলতর বলেই তাকে বলিষ্ঠভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন। রুশোর এক ভ্রমম ধারণা : "মানুষ স্বভাবতই সৎ এ কথা সত্য নয়।' কিন্তু পরিবারের ক্ষুদ্র সীমায় হলেও সহযোগিতার ফলে সহানুভূতি আর একটুখানি সদয় অনুভূতির ফলে দয়া-মায়া ওঠে জেগে। যা কিছু আমাদের মতো তাকেই আমরা পসন্দ করি : যে বস্তু আমরা ভালোবাসি তার প্রতিই যে শুধু আমরা করুণা বোধ করি তা নয়; যাকে আমাদের মতো মনে হয় তার প্রতিও আমরা বোধ করে থাকি সহানুভূতি। এভাবেই আসে আবেগের অনুকরণ—অবশেষে জন্ম নেয় এক রকম বিবেক। বিবেক কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত নয় বরং অর্জিত আর তার রকমফের ঘটে ভূগোল অনুসারে। ঐ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তি-মনে শ্রেণী বা গোষ্ঠীর জমা-রাখা নৈতিক ঐতিহ্য। এর সাহায্যেই সমাজ তার শত্রু সহজাত ব্যক্তিমুখীন আত্মায় তার সহায়ক ও সহযোগী মিত্র সৃষ্টি করতে হয় সক্ষম।

এ বিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক রাষ্ট্রে যে ব্যক্তিগত শক্তির রূপ নিয়েছিল তা সংঘবদ্ধ সমাজে ক্রমশ: নৈতিক আর আইনের এক সামগ্রিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এখনো শক্তিই অধিকার এ বোধ থেকে যায় বটে কিন্তু সমষ্টির শক্তি ব্যক্তির শক্তিকে রাখে সীমিত করে—নিজের অধিকারেই তাকে এমন ভাবে সীমিত করে রাখে যাতে অপরের সম-স্বাধীনতায় না পারে হস্তক্ষেপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে। ব্যক্তির স্বাভাবিক শক্তির বা সার্বভৌমত্বের কিছুটা অংশ সমাজ-সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয় এ কারণে যে বিনিময়ে তার বাকিশক্তিগুলি আরো প্রসারিত হওয়ার পাবে সুযোগ-সুবিধা। যেমন আমরা রাগের চোটে অন্যের মাথা কাটানো থেকে বিরত থাকি বলেই অন্যের রাগ থেকে আমাদের মাথাটাও যায় বেঁচে। মানুষ প্রবৃত্তির দাস বলেই আইনের প্রয়োজন—সব মানুষ যুক্তিসঙ্গত আচরণ করলে আইন হয়ে পড়বে অনাবশ্যক। প্রবৃত্তির বেলায় পরিপূর্ণ যুক্তি যে রকম ব্যক্তির বেলায় পরিপূর্ণ আইনও সে রকম। ধ্বংস এড়িয়ে সমষ্টির শক্তি বৃদ্ধির জন্যই পরস্পর-বিরোধী শক্তিসমূহের এ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পরাবিজ্ঞানে যুক্তি মানে যেমন বস্তুর শৃঙ্খলা উপলব্ধি তেমনি নীতি-শাস্ত্রে তার অর্থ বাসনা-কামনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা আর রাজনীতিতে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষে মানুষে শৃঙ্খলা বিধান। যে সব শক্তি পরস্পরের ধ্বংসের কারণ, আদর্শ রাষ্ট্রে নাগরিকদের সে সব শক্তিকেই শুধু করে রাখা হবে সীমিত—বৃহত্তর ক্ষমতা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া এ রাষ্ট্র নাগরিকদের কোন স্বাধীনতাই নেবে না ছিনিয়ে।

'মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাখা বা তার উপর কর্তৃত্ব করা কোন রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য হতে পারে না বরং প্রতি নাগরিককে ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দেওয়াই তার লক্ষ্য—যাতে সে পরিপূর্ণ নিরাপত্তায় কাজ করতে ও জীবন-যাপন করতে হয় সক্ষম, নিজের বা প্রতিবেশী কারো কোন ক্ষতিসাধন না করে। আমি আবার পুনরাবৃত্তি করছি যুক্তিশীল মানুষকে নিষ্ঠুর পশু বা যন্ত্রে পরিণত করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হতেই পারে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজন মানুষের দেহ-মনকে নিরাপদে কাজ করে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া —স্বাধীন যুক্তির সাহায্যেও তা প্রয়োগ করে যাতে মানুষ জীবনযাপন করতে পারে সে ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য, নাগরিকরা যাতে অনর্থক রোষ, হিংসা, ছলনা ইত্যাদিতে শক্তির অপব্যয় না করে আর পরস্পরের প্রতি না করে কোন অযৌক্তিক ব্যবহার এসব দেখা ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। সত্যই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা।'

রাষ্ট্রের লক্ষ্য স্বাধীনতা কারণ রাষ্ট্রের কাজই হলো মানুষকে বাড়তে সুযোগ দেওয়া আর বাড়া বা বিকাশ নির্ভর করে সামর্থের স্বাধীনতায় অর্থাৎ নিজের সামর্থকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারায়। কিন্তু আইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি বিকাশ আর স্বাধীনতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়? যদি রাষ্ট্র প্রতিটি প্রাণী বা প্রতিষ্ঠানের মতো নিজের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী করতে চায় (সাধারণ-ভাবে যার অর্থ যারা যে পদে আছে সে পদে আকড়ে থাকতে চাওয়া) আর কর্তৃত্ব এবং সুবিধা সন্ধানে হয় রত তা হলে লোকে কি করতে পারে? স্পিনোজা উত্তরে বলেছেন আইন অন্যায় হলেও তাকে মেনে চলো অবশ্য যদি যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ আর আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয় আর দেওয়া হয় কথা আর বক্তৃতার সাহায্যে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নের সুযোগ। স্বীকার করছি এ রকম স্বাধীনতায় সময় সময় কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে এমন কি প্রশ্ন আছে যা একদম নিখুঁতভাবে পুরো-পুরোপুরি বিজ্ঞতার সঙ্গে সমাধান সম্ভব? বাক্-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আইন সব আইনেরই শত্রু কারণ যে আইনের সমালোচনা থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয় অচিরে সে আইনের প্রতি মানুষ হারিয়ে বসবে সব রকম শ্রদ্ধা।

'গভর্ণমেন্ট যতই বাক্-স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা করবে তার প্রতি বাধাও তত বেশী তীব্র হবে। এ বাধা যে শুধু স্বার্থ-সন্ধানীরাই দেবে তা নয় বরং সুশিক্ষা, সবল নৈতিক বোধ ও নানা গুণের ফলে যাঁরা অধিকতর স্বাধীনতার অধিকারী হয়েছেন তাঁরা দাঁড়াবে এর বিরোধী হয়ে। যে সব মতামত মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে সে সবকে যদি আইনের পরিপন্থী ও অপরাধ বলে মনে করা হয় তা হলে তার সম্বন্ধে মানুষ স্বভাবতই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় মানুষ আইনকে ঘৃণার চক্ষে দেখতে ও সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় বলে মনে করে না বরং মনে করে তা করা সম্মানজনক। প্রতিবেশীর কোন রকম ক্ষতি না করে যে আইন ভঙ্গ করা যায় তা অচিরে হয়ে দাঁড়ায় উপহাসের বিষয় এসব আইন মানুষের লোভ-লালসাকে দমিত না করে বরং বেড়ে যাওয়ার দিয়ে থাকে সুযোগ।'

স্পিনোজা অবশেষে প্রায় আমেরিকান শাসনতন্ত্রবিদদের মতই বলেছেন 'স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দিয়ে শুধু কর্মকেই যদি দণ্ডণীয় অপরাধ গণ্য করা হয় তা হলে রাষ্ট্রোদ্রোহিতার সাফাইয়ের সুযোগই থাকবে না।'

মনের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যত কম হয় রাষ্ট্র আর নাগরিকের পক্ষে তা ততই ভালো। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও রাষ্ট্রের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পিনোজার কিছুটা অবিশ্বাস ছিল কারণ তিনি জানতেন ক্ষমতা দুর্নীতি-হীনকেও দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। দেহ আর কর্মের সীমা ছাড়িয়ে মানুষের চিন্তা আর আত্মার উপরও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিস্তারে তাঁর সমর্থন ছিল না। তাঁর ধারণা এ করা হলে বিকাশ আর গোষ্ঠী উভয়েরই সমাপ্তি ঘটবে। তাই শিক্ষার ব্যাপারে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের তিনি ছিলেন বিরোধী। তিনি বলেছেন:

"যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সাধারণের অর্থে (অর্থাৎ সরকারীভাবে) প্রতিষ্ঠিত তার উদ্দেশ্য মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির চর্চা নয় বরং তাকে দমিত করে রাখাই। কিন্তু স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে যে কেউ নিজের ব্যয়ে ও নিজের দায়িত্বে শিক্ষা দিতে চাইলে তাকে তা করার অনুমতি দিলেই শিল্প-বিজ্ঞানের শিক্ষা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ হবে।" রাষ্ট্রীয় শাসিত বিশ্ববিদ্যালয় আর ব্যক্তিগত অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে একটা মধ্যপন্থার সন্ধান কি করে মিলবে সে সম্বন্ধে স্পিনোজা কিছু বলেননি। অবশ্য তাঁর সময় ব্যক্তিগত সম্পদ এমনভাবে বেড়ে কোন সমস্যা হয়ে দেয়নি দেখা। একদা গ্রীসে যেমন উচ্চতর শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল মনে হয় স্পিনোজার লক্ষ্যও ছিল তাই—সেখানকার উৎকর্ষ কোন প্রতিষ্ঠানের অবদান নয় বরং স্বাধীন ব্যক্তিদেরই প্রচেষ্টার ফল—সরকার বা সাধারণের কোন রকম কর্তৃত্বের উপর নির্ভর না করে 'সফিস্টরা' (Sophists) নগর থেকে নগরে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার আলো করতেন বিকিরণ।

সরকারের রূপ যাই হোক—ধরে নেওয়া যায় এতে তেমন বড় রকমের কোন পরিবর্তন ঘটবে না, অবশ্য স্পিনোজার কিছুটা অনুরাগ ছিল গণতন্ত্রের প্রতি। প্রচলিত যে কোন রাজনৈতিক রূপ এমনভাবে গড়ে নেওয়া যায় যাতে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা থেকে সর্ব-সাধারণিক সুযোগ-সুবিধার প্রতি মানুষের অনুরাগ পায় বৃদ্ধি। এ করার দায়িত্ব আইন-প্রণেতাদের। রাজতন্ত্র যোগ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু তা হয়ে থাকে সামরিক আর জুলুমবাজ।

ভাবা হয় অভিজ্ঞতারই শিক্ষা একনায়কত্ব শান্তি ও শৃঙ্খলার অনুকূল। তুর্কিদের মতো আর কোন সাম্রাজ্যই, বিরাট কোন পরিবর্তন ছাড়া, এত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অন্যদিকে যা জনপ্রিয় আর গণতান্ত্রিক তার মতো অত স্বল্পস্থায়ীও কিছু নেই আর অত রাষ্ট্রোদ্রোহও কোথাও ঘটে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও দাসত্ব, বর্বরতা আর ধ্বংসকেই যদি শান্তি বলা হয় তা হলে তার চেয়ে মানুষের বড় রকমের দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না। নিঃসন্দেহে প্রভু-ভৃত্যে যত না তীব্র ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকে তার চেয়েও তীব্রতর ঝগড়া-ঝাঁটি ঘটে পিতা-মাতা আর সন্তান-সন্ততির মধ্যে। তবুও পিতার অধিকারকে যদি সম্পত্তির অধিকারে আর সন্তানকে যদি দাসে পরিণত করা হয় তাতে পারিবারিক জীবনে বিশেষ কোন উন্নতি ঘটে বলে মনে হয় না। কাজেই এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা শান্তির নয় বরং দাসত্বেরই ঘটে থাকে সমৃদ্ধি।

এ প্রসঙ্গে গুপ্ত কূটনীতি সম্বন্ধেও তিনি দু'এক কথা বলেছেন :

'যারা সর্বময় কর্তৃত্ব-পিয়াসী তারা প্রায় এক সুরেই দাবী করে থাকে যে রাষ্ট্রের স্বার্থেই রাষ্ট্রীয় কাজ গোপনে সাধিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ যুক্তি যতই জন-স্বার্থের ছদ্মবেশে প্রচারিত হয় ততই তা অধিকতর নির্যাতনমূলক দাসত্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বৈরতন্ত্রী শাসকের গোপন পাপ নাগরিকদের থেকে লুকিয়ে রাখার চেয়ে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা শত্রু পক্ষের কানে যাওয়া অনেক ভালো যাদের হাতে জাতীয় ব্যাপার গোপন করে রাখার সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে তারা যুদ্ধের সময় ষড়যন্ত্র করে শত্রুর সঙ্গে আর শান্তির সময় ষড়যন্ত্র করে নিজ নাগরিকদের বিরুদ্ধে।

গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত। কারণ এখানে নিজের মতামত ও যুক্তির স্বাধীনতা বজায় রেখে প্রত্যেকে নিজের কর্মকে কর্তৃত্বের কাছে সোপর্দ করে। বুঝতে পারে সকলের চিন্তা-ভাবনা এক হতে পারে না তাই অধিকাংশের মতামত লাভ করে আইনের শক্তি। গণতন্ত্রে সামরিক দায়িত্ব সার্বজনীন হওয়া উচিত—শান্তির সময়ও নাগরিক-দের হাতেই থাকবে অস্ত্রশস্ত্র। এ রাষ্ট্রের রাজস্ব নীতিতে শুধু এক রকম করেরই থাকবে স্থান। গণতন্ত্রের এক বড় ত্রুটি মাঝারিকে ক্ষমতায় বসানোর দিকেই তার প্রবণতা—'শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের' মধ্যে রাষ্ট্রীয় পদ সীমিত করে রাখা ছাড়া এর হাত থেকে রেহাই নেই। শুধু সংখ্যা কখনো বিজ্ঞতার জনক নয়—অত্যন্ত নগ্ন তোষামোদকারীকেই সে হয়তো দিয়ে বসবে সর্বোচচ পদ। "চপল-মনা জনতার মেজাজ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য নিয়ে আসে হতাশা—কারণ জনতা ধার ধারে না যুক্তির তারা চালিত হয় আবেগের দ্বারা।" ফলে গণতান্ত্রিক সরকার স্বল্প-জীবী বাক্যবাগীশদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক মিছিল হয়ে দাঁড়ায় এবং যোগ্য লোকেরা এ দলভুক্ত হতে এ কারণে রাজি হয় না যে তাদের চেয়ে যারা নিকৃষ্ট ও অযোগ্য তারাই দেবে তাদের সম্বন্ধে মতামত ও করবে তাদের মূল্যায়ন। সংখ্যায় কম হলেও আগে হোক কি পরে হোক এ রকম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত লোকেরা একদিন বিদ্রোহ করবেই। "তাই আমার ধারণা গণতন্ত্রের অভিজাততন্ত্রে আর অভিজাততন্ত্রের রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়া উচিত"—কারণ শেষকালে জনসাধারণ বিশৃঙ্খলার চেয়ে নির্যাতনকেই মনে করবে শ্রেয়। সমক্ষমতা কখনো স্থিরতা পেতে পারে না—মানুষ স্বভাবতই অসমান কাজেই অসমানের মধ্যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া অসম্ভব কিছু করতে যাওয়া ছাড়া কিছুই না। শিক্ষিত আর যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে--যাদের দ্বারা তারা শাসিত হতে চায়, সর্বোত্তম শক্তি প্রয়োগ করে, সবলকে নির্বাচনের সম-সুযোগ দিয়ে, তার নির্বাচনের যে সমস্যা গণতন্ত্র এখনো তার সমাধান করতে সক্ষম হয়নি।

তাঁর এ রচনা শেষ করার সুযোগ পেলে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মূল সমস্যা সম্বন্ধে স্পিনোজা-প্রতিভা কি যে আলোকপাত করতেন তা কে জানে? তাঁর যে নিবন্ধটি আমরা পেয়েছি তা হচ্ছে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রথম ও এক অসম্পূর্ণ খসড়া মাত্র। যখন তিনি তাঁর রচনার গণতন্ত্র অধ্যায়টি লিখছিলেন তখন ঘটে তাঁর মৃত্যু।

AMARBOI.COM

চ : স্পিনোজার প্রভাব

স্পিনোজা কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চাননি, তিনি কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেননি। তবুও পরবর্তী সব দর্শনেই ঘটেছে তাঁর চিন্তার অনু-প্রবেশ। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী প্রজাতি তাঁকে প্রায় ঘৃণার চোখেই দেখতো, এমনকি হিউম (Hume) পর্যন্ত তাঁর কল্পনাকে 'বিকট' বলে অভিহিত করেছেন। লেসিং (Lessing) বলেছেন: "জনসাধারণ স্পিনোজা সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলতো যেন তিনি এক মৃত কুকুর।"

লেসিং-ই তাঁকে আবার খ্যাতির আসনে বসান। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সহকর্মী জেকোবির (Jacobi) সঙ্গে আলাপের সময় এ বিখ্যাত সমালোচক অর্থাৎ লেসিং বলেছিলেন: 'আমার সারা পরিণত বয়সটাই আমি স্পিনোজা-পন্থী আর আমি মনে করি স্পিনোজা-দর্শন ছাড়া অন্য

১৬—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন দর্শনই নেই।' তাঁর এ স্পিনোজা প্রীতিই মোসেস মেণ্ডেল্‌সনের (Moses Mendelssohn) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বকে করেছিল দৃঢ়তর এবং তাঁর এক বিখ্যাত নাটকে (Nathan der weise) তিনি জীবিত বণিক আর মৃত দার্শনিকের কাছ থেকে যে আদর্শ য়ুহুদীর ধারণা করেছিলেন তাকেই তিনি প্রাণ ঢেলে করেছেন রূপায়িত। কয়েক বছর পরে হার্ডারের (Herder) লেখার ফলে উদার শাস্ত্রবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় স্পিনোজার এথিক্‌সের প্রতি। এ দলের নেতা শেলেরমাসের (Schleiermacher) তাঁকে 'পবিত্র জাতিচ্যুত স্পিনোজা' বলেই করেছেন অভিহিত আর কেথলিক কবি নোভালিস (Novalis) তাঁকে অভিহিত করেছেন 'এক ঈশ্বর পাগল মানুষ' বলে।

ইত্যবসরে জেকোবি গ্যেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্পিনোজার প্রতি—এথিক্‌স্ (Ethics) একবার পড়েই কবি হয়ে পড়েছিলেন স্পিনোজা-ভক্ত। গ্যেটের গভীরতা সন্ধানী আত্মা যেন এ দর্শনের জন্যই ছিলেন লালায়িত—এখন থেকে তাঁর কাব্য ও গদ্য রচনা এ দর্শনের দ্বারা হয়েছে প্রভাবিত। প্রকৃতি আমাদের উপর যে সীমা আরোপ করে তা আমাদের মেনে নেওয়াই উচিত—এ দর্শনের কাছ থেকেই গ্যেটে নিয়েছেন এ পাঠ। বেপরওয়া রোমান্টিকতা ছাড়িয়ে পরবর্তী জীবনের এক প্রশান্তিতে যে তিনি পেঁৗছতে পেরেছিলেন তার জন্য অংশত তিনি স্পিনোজা-দর্শনের শান্ত আবহাওয়ার কাছেই ঋণী।

স্পিনোজা-দর্শনের সঙ্গে কান্টের জ্ঞান-বিজ্ঞানবাদের সমন্বয় সাধন করে ফিস্‌টে (Fichte), শেলিং (Schelling) আর হেগেল (Hegel) পেঁৗছে-ছিলেন তাঁদের বিচিত্র সর্বেশ্বরবাদে। স্পিনোজার 'আত্ম-রক্ষার প্রচেষ্টা' থেকেই ফিস্‌টের অহংবাদের, শোপেনহাউরের 'বাঁচবার ইচ্ছা', নীট্‌শের 'শক্তিবাদে'র আর বার্গসর 'পরমা শক্তি'র জন্ম। হেগেলের আপত্তি: স্পিনোজা-পদ্ধতি অত্যন্ত জনড় ও প্রাণহীন। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বিপুল গতিশক্তির কথা তিনি ভুলে গেছেন শুধু মনে রেখেছেন ঈশ্বরকে আইনের স্বরূপে উপলব্ধির মাহাত্ম্যটাই যা তিনি 'পরম যুক্তি' হিসেবেই করেছেন প্রয়োগ। তবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি স্বীকার করেছেন: "কেউ যদি দার্শনিক হতে চায় তাকে প্রথমে স্পিনোজাবিদ্ হতে হবেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ারের সময় ইংলণ্ডেও বৃদ্ধি পেয়েছিল স্পিনোজার প্রভাব। কলেরিজ (Coleridge) আর ওয়াড্‌স্‌ ওয়ার্থের (Wordsworth) মতো তরুণ বিদ্রোহীরা প্রায় 'spy-nosa' (সরকার তাঁদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য যে spy বা গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন তার প্রতি ইংগিত করাই এর উদ্দেশ্য) সম্বন্ধে আলাপ করতেন। ন্যরদের (Narod) স্বপ্নের সময় যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা এ সম্পর্কে আলাপ করতেন এঁদের আলাপ-আলোচনা ছিল সে রকম। কলেরিজ ত খাবার টেবিলে বসে শুধু স্পিনোজার কথাই বলতেন আর ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে স্পিনোজার চিন্তাই তো যেন ধ্বনিত হয়েছে;

'এমন কিছু আছে যা বাস করে
অস্তগামী সূর্যে, বর্তুলাকার সাগরে,
জীবন্ত হাওয়ায়, নীল আসমানে
আর মানুষের মনে—
একটা গতি, একটা শক্তি,
যা চালায় সব চিন্তাশীল,
আর চিন্তার বিষয়-বস্তুকে,
যা সঞ্চালিত হয় সব কিছুতে।'

শেলী উদ্ধৃত করেছেন স্পিনোজার ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় রচনা থেকে আর শুরু করেছিলেন তা অনুবাদ করতে আর বায়রন কথা দিয়েছিলেন ঐ অনুবাদের ভূমিকা লিখতে। এ অনুবাদের খসড়ার এক বিচ্ছিন্ন অংশ মিডল্‌টনের (C. S. Middleton) হাতে পড়েছিল, তিনি ওটা শেলীর নিজের রচনা ধরে নিয়ে বলেছিলেনঃ "স্কুল-ছাত্রের উপযোগী কল্পনা-চর্চা........এত স্থূল যে সবটা ছাপার যোগ্য নয়।" পরবর্তীকালে জর্জ ইলিয়েট এথিক্সের অনুবাদ করেছিলেন যদিও তিনি তা কখনো প্রকাশ করেননি। এ সন্দেহ খুব অমূলক নয় যে স্পেন্সারের যে 'অজ্ঞেয়ের' ধারণা তার জন্য তিনি স্পিনোজার কাছেই কিছুটা ঋণী আর তা হচ্ছে ঔপন্যাসিকার (অর্থাৎ জর্জ ইলিয়েট) সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতারই ফল। বেলফোর্ট বেক্স (Bllfort Bex) বলেছেন: "আজকের দিনে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্যাতনামা লোকের অভাব নেই যাঁরা প্রকাশ্যে বলে থাকেন স্পিনোজায় রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণতা।”

স্পিনোজা এত সব লোককে প্রভাবিত করার কারণ তাঁর সম্বন্ধে করা যায় নানা ব্যাখ্যা, দেওয়া যায় নানা রকম ভাষ্য—প্রতি পাঠেই তাঁর রচনা থেকে পাওয়া যায় নতুন নতুন সম্পদ। তাঁর গভীর সব উক্তিই করে থাকে নানা মনে নানা ক্রিয়া। ওল্ড টেস্টামেন্টে বিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে স্পিনোজা সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়: “আদি মানুষ নিজেকে পুরোপুরি জানতে পারেনি—অন্তিম মানুষও নিজেকে বেশী খুঁজে পাবে না। কারণ তার চিন্তার পরিধি সমুদ্র থেকেও বিপুল আর তার অভিপ্রায় গভীর সমুদ্র থেকেও গভীরতর।”

স্পিনোজার মৃত্যুর দ্বিতীয় শতবার্ষিকীর সময় হেগে (The Hague) তাঁর একটি প্রস্তরমূর্তি স্থাপনের জন্য তোলা হয়েছিল চাঁদা। চাঁদা এসেছিল সভ্য জগতের সব জায়গা থেকেই—সম্ভবতঃ প্রীতি-ভালোবাসার এমন প্রসারিত পাদপীটের উপর আর কোন প্রস্তর মূর্তিই হয়নি স্থাপিত। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে এ প্রস্তর মূর্তি উন্মোচনের সময় আর্নেস্ট রেনা (Ernest Rena) যে কথা কয়টি বলে তাঁর ভাষণের উপসংহার করেছিলেন আমিও সে কথা কয়টি দিয়েই আমার এ অধ্যায়টির সমাপ্তি টানছি: “যে পথ চলতি মানুষ এ শান্ত ও ধ্যানমগ্ন মাথাটির প্রতি কোন রকম অপমান বর্ষণ করবে তার উপর বর্ষিত হোক অভিশাপ। সব ইতরাত্মা যেভাবে শাস্তি পাবে সেও সেভাবে শাস্তি পাবে—সে শাস্তি পাবে তার ইতরামি আর যা ঐশ্বরিক তাকে ধারণা করতে পারার অক্ষমতার হাত থেকে। এই লোকটি তাঁর প্রস্তর নির্মিত পাদপীট থেকেই, যে আশীর্বাদ ও করুণা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তার পথের দিকেই সব মানুষকে করবে অঙ্গুলি নির্দেশ। ভবিষ্যতে যে কোন মার্জিত-মনা পথিক এ স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে বলবে: “যদি কখনো সত্যকার ঈশ্বর-দর্শন ঘটে থাকে তবে সম্ভবতঃ তা ঘটেছে এখানে।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

ভল্টেয়ার ও ফরাশী জ্ঞান-সাধনা

ক. প্যারী ঃ ওয়েডিপে (OEdipe)

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে, প্যারীতে তাঁর নাটক মেরোপের (Morope) মহড়ার সময় ভল্টেয়ার যখন মিসেস ডুমেস্‌নীলকে (Dumesnil) চরম বিয়োগান্ত মুহূর্ত কি করে প্রকাশ করতে হয় তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন মিসেস ডুমেস্‌নীল বলেছিলেন অমন প্রবৃত্তির যথাযথ অভিনয় করতে হলে আমাকে "রীতিমতো শয়তান" হতে হবে। উত্তরে ভল্টেয়ার বলেছিলেন : "সত্যই তাই হতে হবে, যে কোন শিল্পে সফল হতে হলে তোমার ভিতরে শয়তানকে স্থান দিতেই হবে।" তাঁর সমালোচক আর শত্রুরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন ভল্টেয়ার নিজে পুরোপুরি তাই ছিলেন : "তাঁর দেহে শয়তান বিরাজ করতো"—স্বয়ং সেন্ট বোভেই (Sainte-Beuve) বলেছেন একথা—আর দে মেইষ্টার (De Maister) বলেছেন : "নরক তার সব শক্তিই তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে।"

তাঁর দেশের ও তাঁর কালের কোন দোষ থেকেই ভল্টেয়ার মুক্ত ছিলেন না—অধিকন্তু ছিলেন অপ্রিয়, কুৎসিত, দাম্ভিক, বাচাল, অশ্লীল আর ন্যায়-অন্যায় বোধহীন, এমন কি সময় সময় অসাধু কর্মেও তাঁর আপত্তি ছিল না। অথচ আবার এ ভল্টেয়ারই ছিলেন অক্লান্তভাবে সদয়, বিবেচক, নিজের শক্তি আর অর্থের ব্যাপারে ছিলেন উদার আর অমিতব্যয়ী, শত্রু-দমনে যেমন ছিলেন অদম্য অধ্যবসায়ী তেমনি ছিলেন বন্ধুদের সাহায্যের ব্যাপারেও। কলমের এক খোঁচায় যেমন শত্রুকে করে দিতে পারতেন খতম তেমনি বিপক্ষ একটুখানি আপোষের ভাব দেখালেই মুহূর্তে যেতেন গলে! মানুষ এতই স্ববিরোধী।

এ সব দোষ গুণ কিন্তু আসল ভল্টেয়ার নয়। এসবই গৌণ ব্যাপার। তাঁর সম্বন্ধে খুব বিস্ময়কর আর মৌল ব্যাপার হচ্ছে তাঁর মনের অফুরন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উর্বরা-শক্তি আর এক অত্যুজ্জ্বল মনীষা। নিরানব্বই খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে তাঁর রচনা, যার প্রত্যেকটা পৃষ্ঠাই আকর্ষণীয় আর অর্থপূর্ণ যদিও তা বিশ্ব-কোষের মতো এক অদ্ভুত দুঃসাহসিক গতিতে বিশ্বের বিষয় থেকে বিষয়া-ন্তরে করেছে পরিধি বিস্তার। তিনি নিজেই বলেছেন: "আমার পেশাই হচ্ছে যা চিন্তা করি তা-ই প্রকাশ করা"—আর যা তিনি চিন্তা করতেন তা ছিল বলার যোগ্য এবং তা বলতেনও অতুলনীয় ভাবে। এখন যদি আমরা ভল্টেয়ার পড়া ছেড়ে দিয়ে থাকি (আনাতোল ফ্রান্সের মতো লোকেরাও কিন্তু তাঁর রচনা গলাধঃকরণ করেই মনের সূক্ষ্মতা আর বিজ্ঞতা করেছেন আয়ত্ত) তার কারণ আমাদের হয়ে তিনি যে সব শাস্ত্রীয়-যুদ্ধ চালি-য়েছেন তা আর আমাদের অন্তরে কৌতূহল উদ্রেক করে না—হয়তো আমরা এখন অন্য সমরক্ষেত্রের সম্মুখীন। আমরা এখন পর জগতের ভূগোলের চেয়ে এ জগতের অর্থনীতিতেই বেশী নিমজ্জিত। যে সব যাজকীয় ব্যাপার আর কুসংস্কার ভল্টেয়ারের সময় ছিল জীবন্ত তার উপর তাঁর বিজয় এত সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ যে তাকে এখন মৃত বল্লেই চলে। তাঁর খ্যাতির অনেকখানি তাঁর অননুকরণীয় বাক-পটুতার উপরও ছিল নির্ভরশীল কিন্তু কথায় বলে: লিখিত কথাই স্থায়িত্ব পায় আর মৌখিক কথা যায় হারিয়ে। ভল্টেয়ারেরও বহু কথা এভাবে হারিয়ে গেছে। যা রক্ষিত হয়েছে তাতে তাঁর আত্মার ঐশী-আগুনের চেয়ে তাঁর রক্ত-মাংসেরই পরিচয় রয়েছে বেশী। কালের অ-স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়েও যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তখন মনে হয়: কি অসীম আত্ম-শক্তি!—"স্রেফ অসীম বুদ্ধি শক্তিই যেন তাঁর মনের ক্রোধাগ্নিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আর আগুনকে আলোয় করেছে রূপান্তরিত"। কেউ কেউ বলেছেন "তিনি ছিলেন হাওয়া আর আগুনে তৈয়রী মানুষ, অমন উত্তেজনাপ্রবণ দ্বিতীয়জন বোধহয় জন্মাননি। অন্য মানুষের তুলনায় তিনি যেন ছিলেন অধিকতর বায়বীয় আর অধিকতর প্রাণ-চঞ্চল পরমাণুর তৈয়রী। কারো মানসিক যন্ত্রও এত বেশী সূক্ষ্ম ছিল না, ছিল না কারো মনের সমতাও এমন নিশ্চিত আর এমন পরিবর্তনশীল।" জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়: ইতিহাসে তিনিই কি সর্বশ্রেষ্ঠ মননশীল-শক্তির অধিকারী?

সত্যই তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী—তাঁর যুগের অন্যদের তুলনায় সাফল্য অর্জনও করেছেন তিনি অনেক বেশী। তিনি বলেছেন: "কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিযুক্ত না থাকা আর বেঁচে না থাকা এক সমান। অলসেরা ছাড়া আর সব মানুষই ভালো।" তাঁর সেক্রেটারী বলেছেন তিনি সময়ের ব্যাপারেই শুধু ছিলেন কৃপণ। তাঁর মতে: "এ জগতে জীবন ধারণের জন্য নিজের সর্বস্ব নিয়োগ করা উচিত........যতই আমার বয়স বাড়ছে ততই আমি কর্মের প্রয়োজনীয়তা বেশী করে বুঝতে পারছি। অবশেষে কর্মই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ হয়ে দাঁড়ায় এবং দখল করে জীবনের মায়ার স্থান।" অন্যত্র: "যদি আত্মহত্যা করতে না চাও তা হলে সব সময় কিছু না কিছু করতে থেকো।"

বোধ করি আত্মহত্যা তাঁকে সব সময় হাতছানি দিতো, কারণ তিনি সব সময় থাকতেন কর্ম ব্যস্ত। মরলি (Morley) বলেছেন: "তিনি এত বেশী জীবন্ত ছিলেন যে সমস্ত যুগটাকেই তিনি নিজের জীবন দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিলেন।" শ্রেষ্ঠতম শতাব্দীর (১৬৯৪—১৭৭৮) তিনিই ছিলেন আত্মা আর তার সার-মর্ম। ভিক্টর হুগো বলেছেন: "ভল্টেয়ারের নাম নেওয়া মানে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীরই পরিচয় দেওয়া।" ইটালীর ছিল রেনেসাঁস, জারমেনির 'সংস্কার আন্দোলন' (Reformation) আর ফ্রান্সের ছিল ভল্টেয়ার—কিন্তু তাঁর দেশের জন্য তিনি ছিলেন একই সঙ্গে রেনেসাঁস, রিফরমেশান আর বিপ্লবেরও অর্ধেক। তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন মনটেনির (Montaigne) পচননিবারক সংশয়বাদ আর রেবেলের (Rabelais) স্বাস্থ্যপ্রদ হাস্য-কৌতুককে। লুথার বা ইরেসমাস (Erasmus), ক্যালবিন (calvin) বা নক্স (Knox) অথবা মেলানসনের (Melanchthon) চেয়েও নিষ্ঠুরতর ও কার্যকর সংগ্রাম চালিয়েছেন তিনি দুর্নীতি আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তিনি যে বারুদ নির্মাণে সহায়তা করেছেন সে বারুদ দিয়ে মিরাবো (Mirabeau), মেরাট (Mart), ডেন্টন (Danton) আর রবসপিয়র (Robespire) পুরোনো শাসন-ব্যবস্থাকে করে দিয়েছেন ধূলিস্যাৎ। লামারটিন (Lamartine) বলেছেন: "কে কি করেছে সে মাপকাঠি দিয়ে যদি আমরা মানুষের বিচার করি তা হলে বর্তমান য়ুরোপের সর্বপ্রধান লেখক যে ভল্টেয়ার তা মানতেই হবে......ভাগ্য তাঁকে দীর্ঘ তিরাশী বছরের আয়ু দিয়েছিলেন যেন তিনি ধীরে ধীরে অবক্ষয়িত যুগটাকে বিশ্লিষ্ট করে তার বিনাশ সাধন করে যেতে পারেন—সময়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি পেয়েছিলেন। যখন তাঁর জীবনাবসান ঘটলো তখন ত তিনি বিজয়ী।"

নিজের জীবদ্দশায় এতখানি প্রভাবশীল লেখক আর জন্মাননি। নিবাসন, জেল আর তাঁর প্রায় প্রত্যেকটা বই চার্চ আর রাষ্ট্রের স্তাবকদের দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সত্যের পথ কঠোর হস্তে রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন—অবশেষে রাজা, পোপ আর সম্রাটেরাও বাধ্য হয়েছেন তাঁর রচনা গলাধঃকরণ করতে। তাঁর সামনে সিংহাসন হয়েছে কম্পিত আর আর্ধেক পৃথিবী তাঁর প্রত্যেকটা কথা শোনার জন্য থাকতো উৎকর্ণ। ঐ যুগটারই প্রয়োজন ছিল বহু ধ্বংসকারীর। নিট্সে বলেছেন: "হাস্যমুখ সিংহের আবির্ভাব হওয়া চাই"—হ্যাঁ, ভল্টেয়ারের আবির্ভাব ঘটেছে আর হাসি দিয়েই তিনি নিশ্চিহ্ন করেছেন অনেক কিছু। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক যে বিপুল প্রক্রিয়ার ফলে সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের হাত থেকে কর্তৃত্ব মধ্যবিত্তের করায়ত্ত হয়েছে তাতেও ছিল রুশো আর ভল্টেয়ারের দুই কন্ঠস্বর। পরস্পর বিরোধী কামনার সংঘর্ষে ব্যক্তি-মনে যেমন চিন্তার উদ্রেক হয় তেমনি প্রচলিত আইন বা আচার-বিচার যখন জাগ্রত ও উন্নয়নমুখী শ্রেণীর অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন আচার-বিচার যুক্তির আর আইন স্বভাবের দাবী জানায়। তাই বিত্তবান বুর্জোয়ারা ভল্টেয়ারের যুক্তিবাদ আর রুশোর প্রকৃতি-বাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল—বিপ্লবের আবির্ভাবের আগে মনের দরজা-জানালা যাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত হয় তার জন্য চাই চিন্তা আর অনুভূতিকে সতেজ ও সক্রিয় করে তোলা। এজন্যে পুরোনো অভ্যাস আর আচার-বিচারের শৈথিল্য সাধন অত্যাবশ্যক। রুশো আর ভল্টেয়ার যে বিপ্লবের কারণ তা নয় বরং মনে হয় ফরাসী রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপরিভাগের নীচে যে শক্তি আলোড়িত ও তরঙ্গিত হচ্ছিল তাঁরা হচ্ছেন তার দুই সহ-পরিণতি—তাঁরা ছিলেন যেন দাবাগ্নি আর অগ্নি-গিরির উত্তাপের সহগামী আলো আর উজ্জ্বলতা। কামনার পক্ষে যেমন যুক্তি তেমনি ইতিহাসের পক্ষে দর্শন—দু'য়ের ক্ষেত্রেই এক অচেতনপ্রক্রিয়া অন্তরালে থেকে উপরের চিন্তাকে করে নিয়ন্ত্রিত।

দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে দার্শনিকদের কিছুটা অতিরঞ্জিত ধারণা থাকলেও তা সংশোধনের জন্য আমাদেরও মাত্রাধিক উৎসাহিত হওয়ার প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। ষোড়শ লুই তাঁর টেম্পেল (Temple) জেলখানায় রুশো আর ভল্টেয়ারের রচনা দেখতে পেয়ে বলে উঠেছিলেন: "ঐ দুইজনই ফ্রান্সকে ধ্বংস করেছে"—অর্থাৎ তাঁর নিজের সাম্রাজ্যকে। নেপোলিয়ন বলেছেন "বুরবঁ (Bourbonse) রাজারা হয়তো নিজেদের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন, যদি তাঁরা লিখিত বিষয়ের উপর বজায় রাখতেন কর্তৃত্ব। কামানের আবিষ্কার সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, কালি ধ্বংস করবে আধুনিক সমাজ সংগঠনকে।" ভল্টেয়ার বলেছেন: "বই-ই বিশ্বশাসন করে, অন্তত যে সব জাতির লিখিত ভাষা আছে তাদেরে। অন্যরা ধর্তব্যের যোগ্যই নয়।" শিক্ষার মতো মুক্তি দায়িনী আর কিছুই নেই—ভল্টেয়ার ফরাসী জাতিকে মুক্তি দিতেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। "যখন কোন জাতি ভাবতে শুরু করে তখন তাকে থামিয়ে রাখা অসম্ভব।" ভল্টেয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্স ভাবতে আরম্ভ করে।

ভল্টেয়ার অর্থাৎ (Francois Marie Arouet) (তাঁর আসল নাম) ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্যারীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক সফল নোটারী (সনাক্তকারী উকিল) আর মা ছিলেন কিছুটা অভিজাত। পিতার কাছ থেকেই তিনি হয়ত পেয়েছিলেন একদিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর খিটখিটে মেজাজ আর অন্যদিকে মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন চপলতা আর পরিহাসপ্রিয়তা। জীবনের খুব ক্ষীণ আশা নিয়েই তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন—তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মার ঘটে মৃত্যু। শিশু হিসেবে তিনি এত দুর্বল আর রোগাটে ছিলেন যে তাঁর ধাত্রীর ধারণা ছিল এ শিশু একদিনের বেশী বাঁচবে না। কিন্তু ধাত্রীর হিসাবে কিছুটা ভুল হয়েছিল। কারণ ভল্টেয়ার প্রায় চুরাশী বছরের কাছাকাছি বেঁচে ছিলেন তবে তাঁর ক্ষীণ-দেহ সারাজীবন ধরেই তাঁর অপরাজেয় আত্ম-শক্তিকে কষ্ট দিয়ে ছেড়েছে।

আরমান্ড (Armond) নামে তাঁর এক বড় ভাই ছিল যাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিজের আদর্শ আর অনুকরণের পাত্র হিসেবে। বালক আরমাণ্ড ছিল সৎ কিন্তু জেনসেনিস্ট (ক্যথলিক সম্প্রদায় বিশেষ) ধর্ম-বিরোধী বিশ্বাসের ছিল প্রবল অনুরাগী, নিজের ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য বরণ করে নিয়েছিল সে শহীদী। আরমাণ্ডকে যখন এক বন্ধু পলায়নের পরামর্শ দিয়েছিল তখন আরমাণ্ড বলেছিল: "দেখো, তুমি যদি ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে না চাও না চাইতে পারো, কিন্তু অন্যকে বাধা দিয়ো না।" তাঁদের বাবা বলতেন: 'ছেলে হিসেবে আমার দুই আহম্মক আছে--এক আহাম্মক লেখে পদ্য অন্য আহাম্মক গদ্য।' নাম লেখা শিখতে না শিখতেই কিন্তু ফ্রাঙ্কয় (অর্থাৎ ভল্টেয়ার) পদ্য লিখতে শুরু করে—দেখে তাঁর বাস্তববাদী পিতা বুঝতে পারলেন এ ছেলেকে দিয়ে কিছুই হবে না। ফ্রাঙ্কয়ের জন্মের পর যে প্রাদেশিক শহরে ভল্টেয়ারদের পরিবার বাস করতে এলো সেখানে তখন একজন বিখ্যাত মহিলা কলা-শিল্পী বাস করতেন তিনি কিন্তু বালক ভল্টেয়ারে দেখতে পেলেন মহত্বের লক্ষণ। মৃত্যুর সময় তিনি বই কেনার জন্য ভল্টেয়ারকে দিয়ে গেলেন দু' হাজার ফ্রাঙ্ক। এ দিয়েই নির্বাহিত হয়েছিল তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। আর তখন তাঁর শিক্ষার ভার ছিল এক শিথিল-চরিত্র পুরোহিতের উপর। যিনি তাঁকে উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিয়েছিলেন সংশয়বাদ। তাঁর পরবর্তী শিক্ষকরা ছিলেন জেস্যুইট মতাবলম্বী তাঁরা তাঁকে তর্ক-শাস্ত্র শিখিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলেন সংশয়বাদের হাতিয়ার। যে কোন কিছু প্রমাণের কলা-কৌশল শিখতে গিয়ে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেলো কোন কিছুকেই বিশ্বাস না করা। তর্ক করা ফ্রাঙ্কয়ের এক বাতিক হয়ে দাঁড়ালো—সমবয়স্ক ছেলেরা যখন বাইরে খেলা করছে তখন এ বারো বছরের বালক ঘরের ভিতর বসে বসে শাস্ত্র-পণ্ডিতদের সঙ্গে জুড়ে দিতো তর্ক। যখন তাঁর জীবিকার্জনের বয়স হলো তখন তিনি তাঁর পিতাকে জানালেন সাহিত্যকেই তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করবেন। শুনে তাঁর পিতা তো রীতিমতো অপমানবোধ করলেন। বলে উঠলেন: "সাহিত্যকে যারা পেশা করে তারা সমাজে অকেজো আর আত্মীয়স্বজনের উপর বোঝা হয়ে থাকে আর মরে অনাহারে।" বুঝা যায় তাঁর ক্রুদ্ধ কন্ঠের আওয়াজের ধাক্কায় সামনের টেবিলটা কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্কয় সাহিত্যই গ্রহণ করলেন।

তিনি যে খুব শান্তশিষ্ট আর পড়ুয়া ছাত্র ছিলেন তা নয়—মধ্য রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে অপরের তেল পোড়াতেন অনেক। শহরের রসিক বয়াটে ছোকরাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দিতেন রাতের অনেকখানি আর করতেণ ধর্মাদেশগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শেষে অতিষ্ট হয়ে তাঁর বাবা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন কে'নে (Caen) এক আত্মীয়ের কাছে আর বলে দিলেন ওকে যেন ঘরে আটকে রাখা হয়। কিন্তু যিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আটকে রাখবেন তিনি স্বয়ং ভল্টেয়ারের বুদ্ধি দেখে হয়ে গেলেন মুগ্ধ আর আমাদের তরুণ বুদ্ধিজীবীটিকে অচিরে দিলেন পুরোপুরি স্বাধীনতা। অবস্থা জানতে পেরে পিতা এবার তাঁকে দিলেন নির্বাসন, পাঠিয়ে দিলেন হেগে (The Hague) ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে—বলে দিলেন এ মাথা-পাগলা ছেলেটির উপর কড়া নজর রাখতে। ওখানে গিয়েই ফ্রাঙ্কয় কিন্তু পড়ে গেলেন এক তরুণী মহিলার প্রেমে—উভয়ে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগলেন ঘন ঘন। আর উক্ত মহিলাকে তিনি লিখতে লাগলেন খুব আবেগ-বিগলিত চিঠি যা সব সময় শেষ করতেন এ একই পাঠ দিয়ে: 'নিশ্চয়ই তোমাকে চিরকাল ভালোবাসবো।' কিন্তু ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল অল্পদিনে আর তাঁকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বাড়ী। তিনি তাঁর উক্ত প্রণয়িনীকে (যার নাম ছিল Primpette) কয়েক সপ্তাহ পর্যন্তই শুধু রেখেছিলেন মনে।

১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে একুশ বছরের সাবালকত্বের অহঙ্কার নিয়ে তিনি যখন প্যারীতে এলেন তখন সবেমাত্র চতুর্দশ লুইর মৃত্যু ঘটেছে। পরবর্তী লুই এত অল্পবয়স্ক ছিলেন যে তাঁর পক্ষে ফ্রান্স শাসন করা সম্ভব ছিল না, প্যারী শাসন করা তো আরো অসম্ভব। কাজেই ক্ষমতা রিজেন্টের হাতেই হলো অর্পিত। মধ্যবর্তী এ শাসনকালে বিশ্ব-রাজধানী প্যারীতে যেন ফূর্তির দাঙ্গাই শুরু হয়ে গেলো আর তরুণ এরায়েট্ও (অর্থাৎ ভল্টেয়ার) অচিরে তাতে হয়ে পড়লেন শরীক। বুদ্ধিদীপ্ত বে-পরওয়া তরুণ বলে তাঁর নামও ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। খরচ কমাবার জন্য যখন রিজেন্ট রাজ-আস্তাবলের অর্ধেক ঘোড়াই বিক্রি করে দিলেন তখন ফ্রাঙ্কয় মন্তব্য করেছিলেন—রাজ-সভার অর্ধেক গর্দভকে বরখাস্ত করলেই অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হতো। অবশেষে এমন হলো যে প্যারীতে যা কিছু চতুর আর দুষ্ট কানাঘুষা হতো তার সবকিছুর জনক তাঁকেই মনে করা হতে লাগলো। তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে এ সময় রিজেন্ট বে-আইনীভাবে সিংহাসন দখল করতে চায় এমন এক অভিযোগ করে কে বা কারা দু'টি কবিতা লিখে বসেছিল আর তাঁকেই এ দু'টি কবিতার লেখক বলে মনে করা হলো। রিজেন্ট রাগে ফেটে পড়লেন। একদিন পার্কে দেখা হতেই ক্রুদ্ধ রিজেন্ট বল্লেন: "মিঃ এরায়েট, আমি বাজি রেখে বলছি আপনাকে আমি এমন জিনিস দেখাবো যা ইতিপূর্বে আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বেশ গর্বের সাথে বলতে লাগলেন কবিতাকে তিনি পরিণত করেছেন সখে তাঁর এ দাবী কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। সবাই এবার তাঁকে বরণ করে নিতে লাগলেন—সর্বত্র হতে লাগলেন তিনি সংবর্ধিত। অভিজাতেরাও তাঁকে তাঁদের দলে ভরতি করে নিয়ে রীতিমতো মার্জিত ভদ্রলোক করে তুল্লেন তাঁকে—হয়ে পড়লেন তিনি অতুলনীয় আলাপচারী আর অত্যুৎকৃষ্ট য়ূরোপীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

আট বছর ধরে এভাবে অভিজাতদের বৈঠকখানার উষ্ণতা ভোগ করার পর ভাগ্য তাঁর প্রতি হলো বিমুখ। কয়েকজন অভিজাত হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন তাঁদের সমাজে আসন আর সম্মান পাওয়ার মতো এ তরুণের কোন পদ বা পদবী-ই নেই—স্রেফ প্রতিভা ছাড়া। তাঁর এ অকারণ খ্যাতি তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। এক অভিজাত-গৃহের ভোজ সভায় ভল্টেয়ার যখন নিজের হাসি, ঠাট্টা আর তীক্ষ্ণ রসিকতায় মুখর হয়ে উঠেছেন তখন কেভেলিয়ার দে রোহান (cheraliw De Rohan কিছুটা নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন: "এতো, যে চীৎকার করে কথা বলছে ঐ তরুণটা কে?" ভল্টেয়ার নিজেই ত্বরিৎ উত্তর দিলেন: "জনাব, সে কোন বড় নামের পদবী বহন করে না কিন্তু নিজের নামেই সে সম্মানিত।" কেভেলিয়ারের কথার উত্তর দেওয়াই তো বেয়াদবি—উত্তর-হীন উত্তর দেওয়া তো রাজোদ্রোহের সামিল। মহামান্য লর্ড এবার ভল্টেয়ারকে ধরে রাত্রে মার লাগাবার জন্য কয়েকজন গুণ্ডা লাগালেন কিন্তু তাদেরে সাবধান করে দিয়ে বল্লেন: "ওর মাথায় কিন্তু আঘাত করো না, ওটা থেকে এখনো ভালো কিছু বের হতে পারে।" পরদিন ভল্টেয়ার থিয়েটারে এলেন মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—রোহানের বক্সের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে করলেন আহ্বান। তার পর বাড়ী ফিরে গিয়ে সারা দিন ধরে তলোয়ারে দিতে লাগলেন শান। কিন্তু ভদ্রলোক কেভেলিয়ারের নেহাৎ একজন প্রতিভাবানের হাতে মরে এত তাড়াতাড়ি স্বর্গে বা অন্যত্র যাওয়ার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না তাই তিনি তাঁর খুড়তুতু ভাই পুলিসমন্ত্রীর কাছে তাঁকে বাঁচাবার জন্য জানালেন আবেদন। ভল্টেয়ারকে গ্রেপ্তার করা হলো—তিনি আবার প্রেরিত হলেন তাঁর পুরাতন বাসস্থান বেস্টিলে (Bastille)—আবার সুযোগ ফেলেন পৃথিবীকে ভিতর থেকে দেখার। তবে দেশ ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেই ইংলণ্ডে নির্বাসন নেবেন এ শর্তে তাঁকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি দেওয়া হলো। তিনি যাত্রা করলেন—ডোবার পর্যন্ত পাহারাদারেরা পৌঁচে দিয়ে ফিরে এলো। তিনিও কিন্তু ছদ্মবেশে চ্যানেল আবার পার হয়ে দেশে এলেন ফিরে। কারণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি ভিতরে ভিতরে তখনো জ্বলছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে হিতৈষীরা তাঁকে সাবধান করে জানালেন তিনি যে ফিরে এসেছেন তা জানাজানি হয়ে গেছে। তৃতীয়বারের জন্য প্রায় গ্রেফতার হতে যাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি চড়ে বসলেন ইংলণ্ডের জাহাজে আর তিন বছরের জন্য মেনে নিলেন ইংলণ্ডে নির্বাসন-দণ্ড (১৭২৬—১৭২৯)।

খ. লণ্ডন : ইংরেজ সম্বন্ধে পত্রাবলী

ইংলণ্ডে এসে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গেই তিনি ইংরেজি শিখতে শুরু করে দিলেন। Plague শব্দটি এক সিলেবেল অথচ ague দুই সিলেবেল—এ দেখেতিনি খুব বিরক্ত হলেন আর কামনা করলেন এ ভাষার আর্ধেককে Plague-এই পেয়ে বসুক আর অর্ধেককে ague-এ। কিন্তু অতি দ্রুত তিনি ইংরেজি ভাষা করে ফেলেছিলেন আয়ত্ত এবং বছরের মধ্যেই হয়ে উঠেছিলেন সে যুগের ইংরেজি সাহিত্যের এক সেরা অধিকারী। লর্ড বলিংব্রুক (lord Bolingbrok) তাঁকে ইংরেজ বিদ্বৎসমাজে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর তিনি একে একে প্রায় সকলের সঙ্গেই রক্ষা করলেন নিমন্ত্রণ। এমনকি আহার করলেন ছল-চাতুরিতে দক্ষ মুমূর্ষু ডীন স্যুইপ্টের (Dean Swift) সঙ্গেও। কোন বংশ-কৌলিন্যের ভাব তাঁর ছিল না —অন্যের কাছেও তা তিনি চাননি। কনগ্রেভ (Congrave) যখন নিজের নাটকগুলিকে খুব তুচ্ছ বলে অভিহিত করে গ্রন্থকারের চেয়েও একজন অবসরভোগী ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত হওয়ার বাসনা জানালেন তখন ভল্টেয়ার তাঁকে বেশ কিছুটা কড়াভাবেই বলেছিলেন "অন্য যে কারো মতো তোমারও যদি শুধুমাত্র ভদ্রলোক হওয়ারই দুর্ভাগ্য হয়ে থাকে তা হলে তো আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আসতাম না।"

বলিং ব্রুক (Bolingbroke) পোপ (Pope), এডিসন (Addision) আর স্যুইপ্ট (Swift) ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে যা খুশী তা লিখছেন দেখে তিনি সব চেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছিলেন। এখানেই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পেলেন এ জাতির রয়েছে নিজস্ব একটা মতামত এ জাতি গড়ে নিয়েছে নিজের ধর্ম, এক রাজাকে দিয়েছে এরা ফাঁসী অন্যটাকে করেছে আমদানি, গড়ে তুলেছে য়ূরোপের যে কোন শাসকের চেয়ে শক্তিশালী এক পার্লিয়ামেন্ট। এখানে নেই কোন ব্যাস্টিল (Bastille), নেই 'রাজকীয় সীল-করা নির্দেশনামা' যার জোরে যে কোন সরকারী পেনসন-ভোগী উপাধিওয়ালা বা রাজকীয় নিষ্কর্মা যারা বিনা কারণে বিনাবিচারে তাদের উপাধিবিহীন যে কোন শত্রুকে জেলে পাঠাতে পারে। এখানে অন্তত ত্রিশ রকমের ধর্ম আছে কিন্তু পুরোহিত নেই একটিও। এখানেই আছে সব চেয়ে দুঃসাহসী কোয়েকার (quakers) সম্প্রদায় যাদের খ্রীস্টান সুলভ ব্যবহার সারা খ্রীস্টীয় জগতকে অবাক করে দিয়েছে। শেষ দিন পর্যন্ত ভল্টেয়ার তাদের প্রতি বিস্ময়ানুভব করে এসেছেন। 'দর্শনের অভিধানে' (Dictionnaive Philosophique) তিনি তাদের একজনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: "আমাদের ঈশ্বর, যিনি আমাদের শত্রুদের ভালোবাসতে আর বিনা-প্রতিবাদে পাপকে বরদাস্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর কখনো এ ইচ্ছা হতে পারে না যে আমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের ভাইদের গলা কাটি যেহেতু লাল উর্দি পরা আর দুই ফুট উঁচু হ্যাট্ মাথায় দেওয়া নরঘাতকেরা একটা গাধার চামড়ায় দু'টা কাটি বাজিয়ে সোরগোল করে (সৈন্যদলে) লোক ভরতি করতে থাকে।"

সেদিনের ইংলণ্ড এক বীযবন্ত মননশীলতায়ও হচ্ছিল স্পন্দিত, তখনো আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বেকনের নাম আর প্রতিক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতির হচ্ছিল জয়। হব্‌স্ (Hobbes—১৫৮৮—১৬৭৯) রেনেসাঁসের সংশয়বাদ আর তাঁর গুরুর ব্যবহারিক প্রেরণাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ আর সুস্পষ্ট বস্তুবাদে পরিণত করেছিলেন যে ফ্রান্সে হলে মিথ্যা সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে শহিদীবরণ করতে হতো। লকে (Locke)—১৬৩২—১৭০৪) কোন রকম অতি প্রাকৃতের ধারণা ছাড়াই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের (Hobbes—১৬৮৯) এক প্রামাণ্য বই লিখেছেন।

কলিন্স (Collins), টিণ্ডেল (Tyndal) ও অন্যান্য একেশ্বরবাদীরা একদিকে গির্জার প্রতিটি মত বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ আর প্রশ্ন তুলছেন অন্যদিকে ঈশ্বরে বিশ্বাসেরও করেছেন পূর্ণ ঘোষণা। সবেমাত্র নিউটনের মৃত্যু ঘটেছে ভল্টেয়ার তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং এই নম্র স্বস্বভাব ইংরেজটির প্রতি যে জাতীয় সম্মান বর্ষিত হয়েছিল প্রায়ই তিনি সে স্মৃতি মন্থন করতেন। তিনি লিখেছেন: "খুব বেশী দিনের কথা নয় একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি সীজার, আলেকজেণ্ডার, তৈমুরলং আর ক্রমোয়েলের মধ্যে কে সবশ্রেষ্ঠ মানব এমন এক তুচ্ছ ও অসার প্রশ্নের আলোচনা করছিলেন। কে একজন উত্তরে বলেছিলেন নিঃসন্দেহে আইসাক নিউটন। অতি খাঁটি উত্তর। সত্যের শক্তি দিয়েই তিনি আমাদের মন অধিকার করেছেন বলেই তাঁর প্রতি রয়েছে আমাদের শ্রদ্ধা। যারা আঘাত আর রক্তপাতের সাহায্যে আমাদের মনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধেছে নিশ্চয়ই তাঁরা আমাদের কোন শ্রদ্ধা দাবী করতে পারে না।" ভল্টেয়ার অত্যন্ত ধৈর্য ও গভীরভাবে নিউটনের রচনাবলী অধ্যয়ন করেছেন এবং পরে ফ্রান্সে তিনিই হয়েছিলেন নিউটনের মতের প্রধান প্রচারক।

দেখে অবাক হতে হয় কত অল্প সময়ের মধ্যেই না ভল্টেয়ার ইংলণ্ডে যা কিছু শিক্ষণীয় তা সব আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সবকিছুই। এসব বিচিত্র বিষয় তিনি গ্রহণ করে ফরাসী সংস্কৃতি আর অন্তর-শক্তির আগুনে শোধন করে তাকে গলিক বুদ্ধি আর প্রকাশের সোনায় করেছেন পরিণত। তাঁর ধারণা ও মতামত তিনি তাঁর ইংরেজ সম্বন্ধে পত্রাবলীতে (Letters on the English) লিপিবদ্ধ করে তার পাণ্ডুলিপি তাঁর বন্ধুদের মধ্যে করেছেন প্রচার। তিনি ঐগুলি প্রকাশ করতে সাহস পাননি কারণ রাজকীয় সেন্সারকে খুশী করার জন্য তিনি ঐ সবে (অর্থাৎ ঐ পত্রগুলিতে) "বিশ্বাসঘাতক আলবিয়নের (Albion)" খুব বেশী করে প্রশংসা করেছিলেন। ঐ সবে তিনি ইংরেজদের রাজনৈতিক আর চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে ফ্রান্সের নির্যাতন আর চিন্তার দাসত্বের করেছেন তুলনা আর কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন ফরাসী আভিজাত্য আর জনগণের আয়ের দশমাংশ আত্মসাৎকারী ফরাসী যাজক-শ্রেণীকে যারা প্রত্যেকটা প্রশ্ন আর সন্দেহের উত্তর দিয়ে থাকেন মানুষকে বেস্টিল কারাগারে পাঠিয়ে। এসব রচনায় তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জাগ্রত হতে আর ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো রাষ্ট্রে তাদের যথাযোগ্য আসন দখলের জন্য জানিয়েছেন আহ্বান। হয়তো অনেকটা অজ্ঞাতে অথবা উদ্দেশ্য ছাড়াই এসব চিঠিগুলিই হয়ে পড়েছে বিপ্লবের প্রথম মোরগের বাঁক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ, কিরে (Cirey) ঃ রোমাঞ্চ-রচনা

যাই হোক এ মোরগের সম্বন্ধে কিছু না জেনেই ১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে রিজেন্ট ভল্টেয়ারেকে ফ্রান্সে ফিরে আসার অধুমতি-পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাঁচ বছর ধরে যে প্যারীর মদ তাঁর শিরায় শিরায় আর যে প্যারীর আত্মা তাঁর কলমে প্রবাহিত হচ্ছে সে প্যারীয় জীবন তিনি সানন্দে ভোগ করলেন। তখন হঠাৎ কোন এক দুষ্ট-বুদ্ধি প্রকাশক 'ইংরেজ সম্বন্ধে পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে, লেখকের অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ করে সর্বত্র তা অবাধে বিক্রি করতে লাগলেন। ভল্টেয়ার-শুদ্ধ সব সৎ ফরাসীই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ প্যারীর পার্লিয়ামেন্ট প্রকাশ্যে বইটি জ্বালিয়ে ফেলার দিলেন হুকুম। এ কারণে যে "বইটি কুৎসাজনক, ধর্ম-বিরোধী, নীতি-বিরোধী আর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাহীন।" ভল্টেয়ার বুঝতে পারলেন আবারো তাঁকে বেস্টিলের পথের যাত্রী হতে হবে। সৎ দার্শনিকের মতো এবার তিনি পলায়নই সঙ্গত মনে করলেন তবে অন্য এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে গোপনে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সুযোগটাও করলেন গ্রহণ!

ভল্টেয়ারের বয়স তখন চল্লিশ আর যাঁকে নিয়ে তিনি পালালেন তাঁর স্বামী মার্কুইস্ ডু চ্যাটেলেটের (Marquise du chatelet) বয়স তখন আটাশ মাত্র। মার্কুইস-পত্নী ছিলেন এক অসাধারণ মহিলা। তিনি অঙ্ক শিখেছেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ মাউপারটুইসের (Maupertuis) কাছে, পরে পড়েছেন ক্লেয়ারৌটের (Claiant) নিকট, নিউটনের প্রিন্সিপিয়ার (Principia) করেছেন সভাষ্য অনুবাদ যাতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্য। ফ্রান্স একাডেমী 'আগুনের প্রকৃতি' সম্বন্ধে একটি রচনা প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেছিলেন সে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়ে অতি শীঘ্রই উক্ত মহিলা ভল্টেয়ারকে হারিয়ে দিতেন। মোট কথা এমন মহিলা সাধারণত পালিয়ে যায় না। কিন্তু মার্কুইস লোকটি নেহাৎ বেরসিক ছিলেন আর ভল্টেয়ার ছিলেন আমুদে—উক্ত মহিলাই বলেছেন: "তিনি (অর্থাৎ ভল্টেয়ার) সব দিক থেকেই ভালোবাসার লায়েক ফ্রান্সের সর্বপ্রধান ভূষণ।" ভল্টেয়ার ও মহিলাটির ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছিলেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সাথে এবং বলেছিলেন: "তিনি এক মহাপ্রাণ মানুষ, তাঁর একমাত্র ত্রুটি তিনি নারী"। এ মহিলা আর তখনকার ফ্রান্সের অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিভাবান নারীদের কাছ থেকেই বোধ করি ভল্টেয়ার মানসিক ব্যাপারে নর-নারী যে সমান এ বিশ্বাসে হয়েছিলেন উপনীত। প্যারীর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে অব্যাহতির উপযুক্ত স্থান যে মার্কুইস-পত্নির কিরে-স্থিত প্রাসাদ এ তিনি বুঝতে পারলেন। মার্কুইস্ ছিলেন তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে অনেক দূরে—অনেকদিন থেকে (স্ত্রীর) অঙ্কের হাত থেকে এভাবে তিনি খুঁজে বেড়াতেন রেহাই। কাজেই এ নতুন ব্যবস্থায় তিনি কোন আপত্তিই করলেন না। কারণ 'সুবিধার খাতিরে যে বিয়ে' তাতে অনেক সময় ধনী বুড়োরা পেয়ে বসতো তরুণী বৌ যাদের বার্ধক্যের প্রতি ছিল না কিছুমাত্র আকর্ষণ বরং ছিল প্রেমের প্রতি। মহিলাদের প্রেমিক গ্রহণ সে যুগে তেমন নীতি বিরুদ্ধ বিবেচিত হতো না অবশ্য তা যদি মানব-জাতির ছল-ছলনার প্রতি সশ্রদ্ধ শোভনতা বজায় রেখে চলতো। এখানে মার্কুইস্ পত্নিও রীতিমতো এক প্রতিভাবানকেই নিয়েছেন প্রেমিক হিসেবে অতএব এতে কেউ কোন দোষই দেখতে পেলো না।

কিরে-প্রাসাদে তাঁরা যে শুধু চুমু খেয়ে আর প্রেমের কূজন করেই সময় কাটিয়েছেন তা নয়। সারাদিন ধরেই তাঁরা মসগুল থাকতেন অধ্যয়ন আর গবেষণা নিয়েই। প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা চালাবার উপযোগী যন্ত্রপাতি সজ্জিত এক মূল্যবান গবেষণাগার (Laboratory) ছিল ভল্টেয়ারের এবং যুগল প্রেমিক প্রেমিকা তাতে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলেন নানা গবেষণা আর আলাপ-আলোচনায়। অনেক অতিথি-অভ্যাগতও আসতেন কিন্তু কথা ছিল তাঁরা সারাদিন নিজেরা আমোদ প্রমোদে থাকবেন মসগুল কেবল মাত্র রাত্রি ন'টায় খাবার টেবিলে বাড়ির কর্তা-গিন্নির সঙ্গে হবেন মিলিত, রাত্রে খাওয়ার পর মাঝে মাঝে ঘরোয়াভাবে থিয়েটার হতো অথবা ভল্টেয়ার অতিথিদের পড়ে শোনাতেন তাঁর চমৎকার সব গল্প-কাহিনী। অনতিবিলম্বে কিরে (Cirey) হয়ে দাঁড়ালো ফরাসী মনের প্যারী অভিজাত আর বুর্জোয়ারাও এ তীর্থে শরিক হয়ে ভল্টেয়ারের মদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রসিকতাও করতে লাগলো উপভোগ আর দেখতে লাগলো ভল্টেয়ারকে নিজের নাটকে নিজে অভিনয় করতে। এ দুর্নীতি আর বুদ্ধি-দীপ্ত জগতের কেন্দ্র-বিন্দু হয়ে ভল্টেয়ার বেশ সুখেই ছিলেন, কিছুই যেন তখন গভীরভাবে গায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাখতেন না—কিছুকালের জন্য তাঁর জীবনের মটোই ছিল : "নিজে হাসা আর অপরকে হাসানো।" রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিনও তাঁকে 'আনন্দের ঐশী-শক্তি' বলেই করেছেন উল্লেখ। ভল্টেয়ার নিজেই বলতেন : "প্রকৃতি আমাদের কিছুটা লঘু-চিত্ত না করলে আমাদের জীবনটাই হতো নিরানন্দময়। মানুষ লঘু চিত্ত হতে পারে বলেই অধিকাংশ মানুষ নিজে ফাঁসি খেয়ে মরে না।" অজীর্ণ রোগী কার্লাইলের মতো কিছুই ছিল না ভল্টেয়ারের জীবনের চারপাশে। "মাঝে মাঝে বোকা বনা বেশ মধুর যে দার্শনিক কপালের বলি-রেখা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না সে অভিশপ্ত। অতিমাত্রায় গাম্ভীর্যকে আমি এক রকম ব্যাধি বলেই মনে করি"—এ কথা গুলো লিখেছিলেন ভল্টেয়ার ফ্রেডেরিক দি গ্রেটকে। এখন তিনি তাঁর সুখপাঠ্য রোমাঞ্চগুলি লিখতে আরম্ভ করেছেন (Zading, Candit, Micromigas, L. Ingenu, Le Monde Commilva ইত্যাদি) তাঁর নিরানব্বই খণ্ড রচনার মধ্যে এগুলিতেই প্রকৃত্যিকার ও খাঁটি ভল্টেয়ার আত্মাকে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি ঠিক উপন্যাস নয়—ভবঘুরে টাইপের হাস্যকৌতুকময় নবন্যাস এগুলিকে হয়তো বলা যায়। এসব রচনার নায়করা কেউ ব্যক্তি নয়, সবই ভাব বা আদর্শ, বদমাইসরা সব কুসংস্কারের প্রতীক আর ঘটনাগুলি হচ্ছে সব চিন্তা। কতকগুলি গ্রেফ খণ্ড রচনা) যেমন ল'ইনজেনু (L. Ingenu,)—জাঁ জেকোয়েসের (Jean Jacques) আগে ঐ যেন রুশো। কয়েকজন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী অভিযাত্রীর সঙ্গে এক হুরণ (Huron) ভারতীয় ও ফ্রান্সে এসে পেঁাচেন—তাকে নিয়ে আর তাকে কি করে খ্রীস্টান করা যায় এ হয়ে দাঁড়ালো প্রথম সমস্যা। এক পাদ্রী তার হাতে তুলে ছিলেন এক কপি নিউ টেস্টামেন্ট—ওটা পড়ে হুরণ এত মুগ্ধ হলো যে সে শুধু খ্রীস্ট-ধর্ম গ্রহণ নয় এমনকি খৎনা করাতেও হলো প্রস্তুত। তার বক্তব্য : "আমার হাতে যে বই দেওয়া হয়েছে তাতে খৎনা করা হয়নি এমন একটা লোকও আমি দেখতে পাইনি। অতএব আমিও হিব্রু রেওয়াজের কাছে আত্মোৎসর্গ করবো আর তা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।" এ সমস্যা চুকতে না চুকতেই দেখা দিল স্বীকারুক্তির অর্থাৎ Confession-এর সমস্যা। সে জিজ্ঞাসা করলো বাইবেলে এ নির্দেশ কোথায় আছে ? তাকে দেখিয়ে দেওয়া হলে সেন্ট জেমস পত্রাংশে (Epirtle of st. James) লেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ঃ "পরস্পরের কাছে পাপের স্বীকারুক্তি কর"। হুরণ স্বীকারুক্তি করলো। করেই পাত্রীকে স্বীকারুক্তির আসন থেকে টেনে এনে নিজের আসনে বসিয়ে দিয়ে পাদ্রী সাহেবকে এবার নিজের পাপের স্বীকারুক্তি করতে হুকুম করলেন ঃ "দোস্ত, এবার তোমার কথা বলো, কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'একে অপরের কাছে পাপ স্বীকার করতে'—আমি আমার পাপের কথা তোমার কাছে খুলে বলেছি—তোমার পাপের কথা না বলে তুমি এখান থেকে নড়তে পারবে না।" হুরণ প্রেমে পড়লো মিস্ সেন্ট ইয়েভসের (Miss st.. yves) কিন্তু তাকে বলা হলো যেহেতু উক্ত মহিলা তোমার খ্রীস্ট-ধর্মে দীক্ষার সময় তোমার দেব-মাতা (godmother) হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তুমি তাঁকে বিয়ে করতে পারো না। ভাগ্যের এ চক্রান্তে সে এত বিরক্ত হলো যে শেষে খ্রীস্ট ধর্মই ত্যাগ করবার ভয় দেখালো। বিয়ের অনুমতি পাওয়ার পর সে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেলো বিয়ের জন্য" নোটারী-উকিল, পুরোহিত, সাক্ষী, চুক্তি, বিধান ইত্যাদি অত্যাবশ্যক......সে ভাবলে 'এত সব সাবধানতার প্রয়োজন হলে তা হলে ধরে নিতে হবে তুমি একটা পাক্কা বদমাইশ'।" এভাবে ঘটনার পর ঘটনায় গল্প এগিয়ে চলেছে। আদিম আর শাস্ত্রীয় খ্রীস্টধর্মের মধ্যে যে সব স্ববিরোধিতা রয়েছে এভাবে তিনি সে সবকে রঙ্গমঞ্চে তুলে ধরেছেন তবে পণ্ডিতের নিরপেক্ষতা আর দার্শনিকের সহানুভূতির কোন পরিচয় এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভল্টেয়ার যুদ্ধ শুরু করেছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধে আমরা শুধু শত্রুর কাছ থেকেই চাই নিরপেক্ষতা ও অনুকম্পা।

মাইক্রোমেগাস্ (Micromegas) সুইফ্টের (Swift) অনুকরণে লিখিত তবে মনে হয় বিশ্বসন্ধীয় কল্পনায় আদর্শের চেয়ে এ অনেক সমৃদ্ধ-তর। ঐ বইতে বর্ণিত হয়েছে লুব্ধক গ্রহ (Sirius) থেকে ওখানকার এক অতিকায় বাসিন্দা পৃথিবী ভ্রমণে এসেছে। অতি বড় গ্রহের বাসিন্দা বলেই হয়তো বলা হয়েছে লোকটার উচচতা পাঁচ লক্ষ ফুট উঁচু। শূন্যপথে আসবার সময় ও শনি গ্রহ থেকে একটা লোককে তুলে নিয়েছিল—সে লোকটার দুঃখ সে মাত্র কয়েক হাজার ফুট উঁচু। ভূমধ্যসাগর দিয়ে হাঁটবার সময় লুব্ধকবাসীর মাত্র পায়ের গোড়ালীটুকুই ভিজেছিল। শনি-গ্রহবাসীকে ও জিজ্ঞাসা করলো ঃ "তোমরা শনিবাসীদের কয়টা করে ইন্দ্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে?" উত্তরে সহযাত্রীটি জানালো: "মাত্র বাহাত্তরটি। এত কম-সংখ্যার জন্য আমরা রোজই আপত্তি জানাচ্ছি।" আবার জিজ্ঞাসা করা হলো: "সাধারণত তোমরা কত বছর বেঁচে থাকো?" উত্তর হলো: "হায়, অতি অল্প সময়......খুব কম সংখ্যকই পনর হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। কাজেই বুঝতেই পারছেন প্রায় জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে আমাদের মৃত্যু: আমাদের অস্তিত্ব ক্ষণিকের চেয়ে আর আমাদের অবস্থান বা আয়ু-সীমা মুহূর্তের চেয়ে বেশী নয়—আমাদের গ্রহটা যেন একটা পরমাণু মাত্র। কিছু শিখতে শুরু করতে না করতেই মৃত্যু এসে বাধা জন্মায়, ফলে অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা মোটেও উপকৃত হতে পারি না।" সাগরে দাঁড়িয়ে থেকেই তারা একটা জাহাজকে এমনভাবে তুলে নিলে যেন ওটা একটা ক্ষুদ্র জীবাণু—লুব্ধকবাসী যখন জাহাজটাকে তার বুড়ো আঙুলের নখের উপর রাখলে তখন জাহাজের মানব-যাত্রীদের মধ্যে রীতিমতো একটা হৈ চৈ পড়ে গেলো। "জাহাজের পুরোহিতও মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন, নাবিকরা সব তৌবা-তিল্লা করতে লাগলো আর দার্শনিকরা এ যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি গড়বরের ফল তা ব্যাখ্যা করার জন্য এক পদ্ধতিই গড়ে তুল্লেন।" লুব্ধকবাসী কৃষ্ণকায় মেঘের মতো নত হয়ে ওদের সম্বোধন করে বল্লে:

"হে বুদ্ধিমান পরমাণুবৃন্দ, মহান প্রভু সানন্দে তোমাদের মধ্যেই তাঁর শক্তি ও সর্বজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, নিঃসন্দেহে এ বিশ্বে তোমরাই চরম ও নির্মল আনন্দের অধিকারী। তোমরা পদার্থের ঝামেলা থেকে মুক্ত দেখে তো মনে হয় আত্মা ছাড়া তোমাদের আর কিছুই নেই—তোমরা সব সময় থাকতে পারো আনন্দ আর চিন্তায় মসগুল। পূর্ণাঙ্গ আত্মার ঐ ত সত্যিকার সুখ। সত্যিকার আনন্দের সন্ধান আমি কোথাও পাইনি, মনে হয় তা এখানেই আছে।"

জনৈক দার্শনিক বলে উঠলেন: "এমন প্রচুর পদার্থই আমাদের মধ্যে আছে যা দিয়ে যথেষ্ট বদমাইশী করা যায়......আপনার জানা ভালো, ধরুন এই মুহূর্তে আমি যখন আপনার সঙ্গে আলাপ করছি তখন এক লক্ষ আমার সমজাতীয় হ্যাট্ মাথায়-দেওয়া জীব অনুরূপ সংখ্যক স্বজাতীয় মাথায় পাগরী বাঁধা প্রাণীকে হত্যা করছে—অন্তত তারা হয় হত্যা করছে না হয় নিজেরা হচ্ছে নিহত। এতে সন্দেহ নেই যে স্মরণাতীতকাল থেকে সারা পৃথিবীতে এই চলে আসছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুদ্ধ লুব্ধকবাসী চেঁচিয়ে উঠল : "ডাহা বদমাইশ সব। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আর দুই এক কদম এগিয়ে গিয়ে গোষ্ঠীশুদ্ধ এসব ইতর খুনীকে পায়ের নীচে পিষে মারি।"

উত্তরে দার্শনিকটি বল্লেন : "দয়া করে আপনি আর অত কষ্ট স্বীকার করবেন না। প্রভূত শ্রম-স্বীকার করে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে....বছর দশেক পরে এ শয়তানদের এক শতাংশও টিকে থাকবে না ....বস্তুত এদের শাস্তি না দিয়ে বরং শাস্তি দেওয়া উচিত ঐসব কুঁড়ে আর নিষ্কর্মার ঢেকি বর্বরদের যারা নিজেদের প্রাসাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার আদেশ দিয়ে থাকে আর পরে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঈশ্বরকে দিয়ে থাকে প্রচুর ধন্যবাদ নিজেদের সাফল্যের জন্য।" কেণ্ডিডের (Candide) পরেই এসব গল্পের মধ্যে জেডিগের (Zadlg) স্থান সর্বোচচ। কেণ্ডিডে রচিত হয়েছে ভল্‌টেয়ারের জীবনের শেষের দিকে। জেডিগ ছিলেন বেবিলনের এক দার্শনিক : "মানুষের পক্ষে যতখানি জ্ঞানী হওয়া সম্ভব তিনি ততখানি জ্ঞানী ছিলেন....পরা-বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। এক ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই তিনি কল্পনা করতে লাগলেন তিনি সেমিরাকে (Semina) ভালোবাসেন, তাই ডাকাতদলের হাত থেকে সেমিরাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি বাঁ চোখে পেলেন আঘাত।

'বিখ্যাত মিশরীয় চিকিৎসক হামেসের কাছে মেম্পিসে (Memphis) খবর পাঠানো হলো। অনেক সঙ্গী সাথী নিয়ে তিনি এলেন। জেডিগকে দেখে তিনি মত দিলেন রোগীর এ চোখটা নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি এ দুর্ঘটনার দিন-ঘনটা পর্যন্ত তিনি আগাম বলে দিলেন। তিনি আরো বল্লেন : "ডান চোখে হলে আমি সহজে ভালো করতে পারতাম কিন্তু বাঁ চোখের আঘাত আরোগ্যের অতীত"। সারা বেবিলনই জেডিগের জন্য দুঃখবোধ করতে লাগল আর প্রশংসা করতে লাগল হার্মেসের (Hermes) গভীর চিকিৎসা-জ্ঞানের। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই জেডিগের চোখের ফোলা আপনাআপনি ফেটে বদরক্ত আর পুঁজ বেরিয়ে গিয়ে চোখ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল। চোখটা ভালো না হওয়াই উচিত ছিল—এটা প্রমাণ করে হামেস এক বই লিখেছিল। জেডিগ কিন্তু ঐ বই কোনদিন পড়েই দেখেনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং জেডিগ ছুটে গেল সেমিরার কাছে। গিয়ে দেখে হামেসের প্রথম নির্দেশ শোনার পর পরই 'একচক্ষু লোকের প্রতি তার যে বিতৃষ্ণা' কাটাতে না পেরে সে অন্য লোকের বাক্‌দত্তা হয়ে পড়েছে। এবার জেডিগ একটা চাষী মেয়েকে বিয়ে করে যে সব গুণ রাজসভার সেমিরার কাছে দেখতে পায়নি তা এ মেয়ের কাছে পাবার আশা করতে লাগল। স্ত্রীর সততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য সে এক বন্ধুর সঙ্গে এ ব্যবস্থা করল যে সে মৃত্যুর ভান করবে আর বন্ধুটি ঘন্টাখানেক পরে এসে তার স্ত্রীর কাছে করবে প্রেম নিবেদন। পরিকল্পনা মতো জেডিগের যথাসময় মৃত্যু হলো, তার দেহ রাখা হলো কফিনে। বন্ধুটি এসে প্রথমে সহানুভূতি দেখালেন, পরে বিধবাকে করলেন অভিনন্দিত, শেষে প্রস্তাব করলেন বিয়ের আর বল্লেন তা যেন হয় অনতিবিলম্বে। মহিলা প্রথমে সামান্য কিছু আপত্তি করলেন। পরে যদিও মুখে বল্লেন : "তিনি কখনো রাজি হবেন না কিন্তু রাজি তিনি হলেন।" জেডিগ কফিন থেকে উঠে প্রাকৃতিক শোভা দেখেই মনকে সান্ত্বনা দেবেন এ আশায় গেলেন জঙ্গলে পালিয়ে।

তিনি খুব একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তি হয়েছেন শুনে রাজা এবার তাঁকে নিজের উজির নিযুক্ত করলেন। তাঁর সুশাসনে রাজ্যে সমৃদ্ধি, সুবিচার আর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু রাণী পড়লেন তাঁর প্রেমে। রাজা বুঝতে পেরে 'খুব অশান্তিবোধ করতে লাগলেন....বিশেষভাবে তাঁর নজরে পড়ল রাণীর জুতো যেমন নীল জেডিগেরও তাই, তাঁর স্ত্রীর মাথার ফিতা যেমন হলদে জেডিগের টুপির রংও তেমনি হলদে।' তিনি দু'জনকে বিষপানে হত্যা করবেন সঙ্কল্প করলেন কিন্তু রাণী এ ষড়যন্ত্রের কথা টের পেয়ে জেডিগকে লিখে জানালে : "পালাও, আমাদের উভয়ের ভালোবাসা আর হলুদবরণ রিবনের দোহাই দিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি, পালাও।" জেডিগ আবার পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন।

একটি ক্ষুদ্র মাটির পরমাণুর উপর এক গাদা কীট যেমন একে অন্যকে গিলে খায় মানুষকেও তাঁর কাছে অবিকল তাই মনে হলো। মানুষের এ সত্যিকার রূপ-কল্প—তিনি আর বেবিলন যে কিছুই নয় এ বোধ তাঁর মনে জাগিয়ে তুল্ল। ফলে তাঁর মন থেকে দুঃখ-দুর্দশার সব ক্ষত-চিহ্নই গেল মুছে। তাঁর আত্মা হলো এবার অসীমের যাত্রী—সব রকম ইন্দ্রিয় আর প্রবৃত্তি মুক্ত হয়ে এবার তিনি বিশ্বের অমোঘ বিধান সম্বন্ধেই ভাবতে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে অবশ্য তিনি যখন সজ্ঞানে ফিরে এলেন....তখন ভাবলেন এর মধ্যে হয়তো রাণী তাঁর জন্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। এবার তাঁর চোখের সামনে থেকে দুনিয়াই যেন হয়ে গেলো লুপ্ত'।

বেবিলন ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা লোক অতি নির্মমভাবে একটি মেয়ে মানুষকে প্রহার করছে। মেয়েটির কাতর আর্তনাদে তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না, পুরুষটিকে বাধা দিলেন, শেষকালে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে লোকটাকে এমন একটা আঘাত করলেন যে লোকটা একেবারে অক্কাই পেয়ে গেলো। তারপর মহিলাটির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার জন্যে আমি আর কি করতে পারি?" বদমাইশ, তুমি আমার মহব্বতের মানুষকে হত্যা করেছ, তুমি মরো। হায়, আমি যদি তোমার কলজেটা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারতাম।" এ হলো মহিলাটির উত্তর।

এর অল্পকাল পরেই জেডিগ ধৃত হলেন আর তাঁকে করা হলো দাস। কিন্তু তিনি তাঁর প্রভুকে শেখালেন দর্শন এবং হয়ে পড়লেন মানবের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। তাঁর পরামর্শে সতীপ্রথা (যাতে বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় সমাধিস্থ হতে হতো) নিবারণের জন্য করা হলো আইন। এ আইনের বিধান হলো যে বিধবা এ রকম সহ-মৃতা হতে চায় তাকে কোন একজন সুপুরুষের সঙ্গে নিভৃতে এক ঘন্টা কাটাতে হবে। কোন এক দৌত্য কাজে তাঁকে সরণদ্বীপের রাজার কাছে পাঠানো হয়েছিল তিনি ঐ রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সৎমন্ত্রী নির্বাচনের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে প্রার্থীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে হাল্কা ও দ্রুত নৃত্যশিল্পীকে নিযুক্ত করা। তারপর তিনি নাচ-গৃহের দরদালান আলগা, যা সহজে সরানো যায় এমন সব মূল্যবান জিনিসে ভরতি করালেন আর ব্যবস্থা করালেন প্রত্যেক নাচিয়েকে একাকী এ দরদালান পার হয়ে যেতে হবে এবং কেউ কোন দিক থেকেই তাদেরে করবে না অবলোকন। প্রার্থীরা যখন সবাই দরদালান পার হয়ে নাচ-ঘরে প্রবেশ করলো তখন তাদের হুকুম করা হলো নাচবার জন্য।" কখনো কোন নাচিয়ে এতখানি অনিচ্ছা নিয়ে আর এমন অশোভনভাবে নাচেনি। সবাইর মাথা নীচু, পিঠ ঝুঁকে পড়া আর হাত দু'টা দু'পাশে চেপে রাখা। এভাবে গল্পটা এগিয়ে চলেছে। কিরে-প্রাসাদের সান্ধ্য-মজলিসের চেহারা মনে মনে কল্পনা করে দেখা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. পট্‌স্‌ডাম ও ফ্রেডেরিক (Patsdarm and Frederick

যারা এসে সাক্ষাত করতে পারতো না তারা চিঠিপত্র লিখতো ভল্টেয়ারকে। ফ্রেডেরিকের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ শুরু হয় ১৭৩৬ থেকে ফ্রেডেরিক তখনো রাজকুমার। মহান বা Great হননি তখনো। ফ্রেডেরিকের প্রথম চিঠিটা ছিল যেন কোন এক কিশোরের কোন রাজার কাছে লেখা চিঠি। যদিও ভল্টেয়ার তখনো তাঁর প্রধান বইগুলির একটাও লেখেননি তবুও তিনি যে তখন কতখানি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন রাজকুমার ফ্রেডেরিকের স-উচ্ছ্বাস স্তুতি থেকেই তা আমরা অনুমান করতে পারি। ঐ চিঠিতেই ভল্টেয়ারকে বলা হয়েছে: "আপনি ফ্রান্সের সর্বপ্রধান ব্যক্তি: যিনি ফরাসী ভাষাকে করেছেন সম্মানিত......আপনার মতো যশস্বী লোকের সমকালে জন্মগ্রহণকে আমি আমার জীবনের সবশ্রেষ্ঠ সম্মান বলে মনে করি......সকলের পক্ষে মনকে হাস্যোৎফুল্ল করে তোলা সম্ভব নয় আর মনের আনন্দের চেয়ে বড় আনন্দ আর কি আছে?" ফ্রেডেরিক ছিলেন মুক্ত-চিন্তায় বিশ্বাসী। রাজা যে দৃষ্টিতে প্রজার প্রতি তাকায় ফ্রেডেরিকও অনড় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সে দৃষ্টিতে তাকাতেন। ভল্টেয়ারের আশা ছিল ফ্রেডেরিক যখন সিংহাসনে বসবেন তখন তিনি জ্ঞান-চর্চাকে পরিণত করবেন একটা রেওয়াজে আর তিনি নিজে হয়তো ফ্রেডেরিকের ডায়োনিসিয়াস (Dionysius) হয়ে প্লেটোর ভূমিকা করবেন পালন। ফ্রেডেরিকের স্তুতির উত্তরে ভল্টেয়ারও স্তুতি জানালে ফ্রেডেরিক আপত্তি করেছিলেন। তখন ভল্টেয়ার তাঁকে লিখলেন: "পোপের পক্ষে 'অভ্রান্ততা'র বিরুদ্ধে লেখা যেমন এক বিশিষ্ট ও অদ্বিতীয় ব্যাপার তেমনি কোন রাজকুমারের পক্ষে স্তুতির বিরুদ্ধে লেখাও এক অসাধারণ ঘটনা।" ফ্রেডেরিক তাঁকে নিজের রচিত এককপি Anti-Machiavel বইটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ বইতে রাজকুমার যুদ্ধ যে পাপ আর রাজার কর্তব্য যে শান্তিরক্ষা তা অতি চমৎকারভাবে করেছেন বর্ণনা। রাজকীয় শান্তিবাদের এ মতবাদ পড়ে ভল্টেয়ার আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে ফ্রেডেরিক যখন রাজা হলেন তিনি সাইলেসিয়া (Silesia) আক্রমণ করে সারা য়ূরোপকে এক শতাব্দীব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে করেছিলেন নিক্ষেপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে কবি তাঁর গণিতজ্ঞাকে সঙ্গে নিয়ে প্যারী এসে ফ্রান্স একাডেমির সভ্যপদপ্রার্থী হলেন। এ নেহাৎ এক অসার সম্মানের জন্য তিনি নিজেকে এবার নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক বলেও দিতে লাগলেন পরিচয়। ক্ষমতাশীন কোন কোন জেস্যুইটের করতে লাগলেন অকারণ প্রশংসা আর বলতে লাগলেন অফুরন্ত সব মিথ্যা। মোটকথা এ অবস্থায় আমরা অধিকাংশ মানুষ যা করে থাকি তিনিও তা করতে লাগলেন। কিন্তু হতে পারলেন না কৃতকার্য। অবশ্য পরের বৎসর তিনি সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তার সংবধনা সভায় যে অভিভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তা আজো ফরাসী সাহিত্যের ক্লাসিকস্ হয়েই আছে। প্যারীতে থাকলেন আরো কিছু কাল। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সেলন (Salon) থেকে সেলনে, নাটকের পর নাটক করতে লাগলেন মঞ্চস্থ। আঠারো বছরের ওয়েডিপে (OEdip) থেকে তিরাশী বছরের ইরীন (Irene) পর্যন্ত নাটকের এক দীর্ঘ সিরিজই হয়ে গেলো লেখা। কোন কোনটা সফল হলো না বটে কিন্তু বেশীর ভাগই অর্জন করলো মঞ্চ সাফল্য। ১৭৩০-এ লেখা ব্রুটাস (Brutus) সফল হলো না, ১৭৩২-এ লেখা ইরিফাইলের (Eriphyle) ভাগ্যেও তাই ঘটলো। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন নাটক লেখা ছাড়ো কিন্তু সে বছরই তিনি মঞ্চস্থ করলেন জেয়ারে (Zaira) আর এ বই নিয়ে এলো তাঁর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য। ১৭৪১-এ মঞ্চস্থ করলেন মোহামেট (Mohmet), ১৭৪৩-এ মেরোপ (Merope), ১৭৪৮-এ সেমিরামিস্ (Semiramis) আর টেনক্রেড্ (Tencred) ১৭৬০-এ।

ইত্যবসরে তাঁর নিজের জীবনেই শুরু হয়ে গেলো একই সঙ্গে বিয়োগাত্মক আর মিলনাত্মক নাটক। ম্যাডাম দু চ্যাটেলেটের প্রতি তাঁর প্রেম দীর্ঘ পনর বছরে এখন বেশ কিছুটা হয়ে এসেছে মন্দীভূত। তাঁরা এখন ঝগড়া করতেও গেছেন ভুলে। ১৭৪৮-এ ম্যাডাম চ্যাটলেট হঠাৎ প্রেমে পড়ে গেলেন সুদর্শন তরুণ মার্কুইস্ দে সেন্ট লেম্বার্টের সঙ্গে। ভল্টেয়ার জানতে পেরে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু সেন্ট লেম্বার্ট যখন ক্ষমা চাইলেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেলেন দয়ার বিগলিত। এখন জীবনের চূড়ায় পৌঁচেছেন তিনি—দেখতে পাচ্ছেন দূরে মৃত্যুর হাতছানি। যৌবনের দাবীকে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ দার্শনিকতার সঙ্গেই বল্লেন : "মেয়েলোকেরা এ রকমই (তিনি ভুলে গেছেন যে এ রকম পুরুষ ও আছে), আমি রিসেলোকে (Richeiieu) বেদখল করেছিলাম এখন সেন্ট লেম্বার্ট আমাকেই তাড়ালেন। এ হচ্ছে নিয়ম, এক পেরেক অন্য পেরেককে বহিষ্কার করে—এ ভাবেই চলে দুনিয়া।" তৃতীয় পেরেককে লক্ষ্য করে তিনি একটি চমৎকার স্তবক লিখেছিলেন :

'ফুল ফুটতে থাকে, সেন্ট্ লেম্বার্ট, এসব তোমার জন্যই।
তোমার জন্যে গোলাপ, আমার জন্য রইল কাঁটা।।'

তারপর ১৭৪৯–এ সন্তান প্রসবের সময় ম্যাডাম দু চ্যাটলেটের ঘটলো মৃত্যু। ঐ যুগের বৈশিষ্ট্যই বলতে হবে ম্যাডামের মৃত্যু শয্যায় এসে মিলিত হলেন ম্যাডামের স্বামী, ভল্টেয়ার আর সেন্ট লেম্বার্ট, দোষারোপ করলেন না কেউ কাউকে ও বরং যৌথ শোকে তাঁরা হয়ে পড়লেন পরস্পরের বন্ধু।

ভল্টেয়ার কর্মে ডুবে থেকেই শোক ভুলতে চাইলেন—কিছুকালের জন্য ব্যস্ত রইলেন তাঁর Siecle de Louis XIV নিয়ে কিন্তু শোক ও হতাশার হাত থেকে তাঁকে বাঁচালো ফ্রেডেরিকের রাজধানী পটস্‌ডামে যাওয়ার আমন্ত্রণ। পথ খরচের জন্য তিন হাজার ফ্রাঙ্কসহ যে আমন্ত্রণ তা অস্বীকার করা যায় না। ১৭৫০-এ ভল্টেয়ার বার্লিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

রাজ-প্রাসাদের অনেক অনুচর তাঁর জিম্মায় দেওয়া হয়েছে আর সে যুগের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজা তাঁর সাথে ব্যবহার করছেন সমকক্ষের মতো এসব দেখে তিনি খুব খুশী। প্রথম দিকের চিঠিগুলি এখুশীতেই থাকতো ভরা। ২৪-এ জুলাইর এক চিঠিতে তিনি পটস্‌ডাম সম্বন্ধে লিখছেন : "১৫০,০০০ সৈন্য,........অপেরা, নাটক, দর্শন, কাব্য, আরম্ভর আর সৌন্দর্য, পদাতিক সৈন্য বাহিনী, গভীর চিন্তা, রণতুর্য আর ভায়োলিন প্লেটো-ভোজ, সমাজ আর স্বাধীনতা—একসঙ্গে এত কে বিশ্বাস করবে?" অনেক বছর আগে তিনি একবার লিখেছিলেন : "ঈশ্বর! তিন চারজন প্রতিভাবান অথচ কোন রকম ঈর্ষা নেই, এমন বুদ্ধিজীবী তথা লেখকের সঙ্গে বাস করতে পারলে জীবন কি সুখেরই না হতো" (কি কল্পনার দৌড়!)" শান্তভাবে থাকা, পরস্পরকে ভালোবাসা নিজের নিজের শিল্পের চর্চা আর সে সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা, পরস্পরকে জ্ঞানালোকিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তোলা। একদিন এমন এক ক্ষুদ্র স্বর্গে আমি বাস করতে পারবো মনে মনে তেমন ছবি আমি দেখছি।" এ সেই স্বর্গ!

ভল্টেয়ার রাষ্ট্রীয়-ভোজ পরিহার করতেন। কেতাদোরস্ত সৈন্যাধ্যক্ষদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকা তাঁর পসন্দের ছিল না। তিনি ঘরোয়া ভোজেই হাজির থাকতেন—সন্ধ্যাশেষের ঐ ভোজে ফ্রেডেরিক অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক-বন্ধুদেরও ডাকতেন। কারণ ঐ যুগের এ সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ-সন্তানের কবি আর দার্শনিক হওয়ারও একটা বাসনা ছিল। এসব ভোজসভায় সব সময় আলাপ-আলোচনা চলতো ফরাসী ভাষায়। ভল্টেয়ার জার্মেন শিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু রুদ্ধশ্বাস হতে হয় দেখে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর বলতেন জার্মেনদের অতবেশী ব্যঞ্জন বর্ণ না থেকে যদি কিছু বেশী রসবোধ থাকতো তা হলেই ভালো হতো। ভল্টেয়ারদের আলাপ আলোচনা শুনেছেন এমন এক ব্যক্তি বলেছেন তা ছিল যে কোন সুলিখিত চমৎকার বই থেকেও উৎকৃষ্ট। তাঁরা সবকিছু সম্বন্ধেই আলাপ করতেন আর আলাপ করতেন যা তাঁরা চিন্তা করেছেন সে সম্বন্ধে। ফ্রেডেরিক ও প্রায় ভল্টেয়ারের মতই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি লোক ছিলেন আর একমাত্র ভল্টেয়ারই সাহস করে তাঁর কথার দিতেন উত্তর—যে উত্তরে এমন এক সূক্ষ্ম চাতুর্য্য থাকতো যা কোন রকম আঘাত না করেই বিপক্ষকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম। ভল্টেয়ার বেশ উৎফুল্ল হয়েই লিখেছেন: "এখানে মানুষ মুক্ত, এখানে মানুষ সাহসের সঙ্গে চিন্তা করতে সক্ষম।

ফ্রেডেরিক এক হাতে আঁচড় দিলে অন্য হাতে দিয়ে থাকে সান্ত্বনা.... কোন ব্যাপারেই আমার বিরোধ ঘটেনি......পঞ্চাশ বছর ঝড়-তুফানে কাটিয়ে আমি এখন একটি বন্দর পেয়েছি। আমি পেয়েছি একটি রাজার আশ্রয় ভোগ করছি এক দার্শনিকের আলাপ-আলোচনা আর এক মনোজ্ঞ চরিত্রের সৌন্দর্য—যাঁর মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ ঘটেছে তিনি দীর্ঘ ষোল বছর ধরে দুঃখে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন আর আশ্রয় দিয়েছেন শত্রুর বিরুদ্ধে। কোন কিছুতে যদি বিশ্বাস ন্যস্ত করা সম্ভব তা করা যায় একমাত্র প্রাশিয়ার রাজ-চরিত্রের উপর।" তবে........

সে বছরেরই নবেম্বর মাসে ভল্টেয়ার ভাবলেন—যদিও এ সম্পর্কে ফ্রেডেরিকের নিষেধ ছিল, তিনি যদি সেক্সন বণ্ডে টাকা খাটান তা হলে প্রচুর লাভ করতে পারবেন। বণ্ডের দাম বেড়ে গেল, ফলে ভল্টেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেন বেশ লাভবান। কিন্তু তাঁর এজেন্ট হিরস্ (Hiruch) তাঁর এ বে-আইনী লগ্নির কথা প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁকে চাইলো ঠকাতে। ভল্টেয়ার এক লাফে তার গলা টিপে ধরে একেবারে ধরাশায়ী করে ছাড়লেন। কথাটা ফ্রেডেরিকের কানেও পৌঁচল—তিনি ভয়ানক রেগে গেলেন। অন্যতম সভা-পণ্ডিত লা মেট্রিকে (La mettric) বল্লেন: "আমি বড় জোর আর এক বছর ওঁকে রাখবো। মানুষ কমলার রসটা নিঙরিয়ে নিয়ে খোসাটা দেয় ফেলে।" লা মেট্রি, হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হওয়ার আগ্রহেই কথাটা ভল্টেয়ারকেও দিলেন জানিয়ে। সে-দিনের নৈশ-ভোজ শুরু হয়েছে। ভল্টেয়ার লিখেছেন: "আমার মাথায় কিন্তু কমলার খোসা ঘুরপাক খাচ্ছিল......যে লোক মন্দির-চূড়া থেকে নাচে পড়বার সময় শূন্যের বাতাসকে মোলায়েম দেখে বলে 'বেশ তো, তবে যদি স্থায়ী হয়,'—অমন লোক কিন্তু আমি নই।"

ফ্রেডেরিকের সঙ্গে একটা ভাঙ্গাভাঙ্গি হোক তাঁর অর্ধেক মনের এও যেন ছিল কামনা। কারণ অন্য ফরাসীদের মতো তিনিও ছিলেন গৃহ-বিরহকাতর। ১৭৫২ তেই এলো চরম মুহূর্ত। ফরাসী জ্ঞানালোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটিয়ে জার্মেন-মনকে জাগিয়ে তোলার জন্য আরো অনেকের সঙ্গে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ মর্ডপায় টুইসকে (Maupertuis) ফ্রেডেরিক ফ্রান্স থেকে আমদানি করেছিলেন—এ মউপারটুইসের সঙ্গে নিউটনের এক ব্যাখ্যা নিয়ে ঝগড়া লাগলো কোয়েনিগ (Koenig) নামক অন্য এক অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের গণিতজ্ঞের সঙ্গে। এ ঝগড়ায় ফ্রেডেরিক অংশ নিলেন মউপারটুইসের পক্ষে, ভল্টেয়ারের সাহস যতখানি ছিল অতখানি সাবধানী বুদ্ধি ছিল না—তিনি পক্ষ নিলেন কোয়েনিগের। ম্যডাম ডেনিসকে (Denis) তিনি লিখেছেন: দুর্ভাগ্যই বলতে হবে আমিও একজন গ্রন্থকার কিন্তু আমার স্থান রাজার বিপক্ষ শিবিরে। আমার হাতে তরবারি নেই বটে তবে আছে কলম।" ঠিক এ সময় ফেডেরিক তাঁর বোনকে লিখেছিলেন: "আমার দরবারের সব লেখকগুলো যেন এক একটা আস্ত শয়তান। এদের নিয়ে আর কিছু করা সম্ভব নয়। একমাত্র সামাজিক-জীবনে ছাড়া এদের আর কোন দিকে বুদ্ধি নেই.... মনের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাদের চেয়ে মোটেও ভালো নয় এ দেখে পশুরা নিশ্চয়ই সান্ত্বনা পায়।" এ সময় ভল্টেয়ার মউপারটুইসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত রচনা "Diatribe of Dr. Akakia" লেখেন। লিখে ওটা ফ্রেডেরিককে পড়ে শোনান ঐ নিয়ে ফ্রেডেরিক সারা রাত ধরেই হেসেছিলেন কিন্তু ভল্টেয়ারকে অনুরোধ করলেন ওটা প্রকাশ না করতে। মনে হয় ভল্টেয়ার রাজি হয়েছিলেন কিন্তু আসলে ওটা অনেক আগেই পাঠানো হয়ে গেছে মুদ্রা-যন্ত্রে—লেখক তাঁর কলম প্রসূত শিশু-হত্যায় নিজেকে রাজি করাতে পারেননি। ওটি যখন প্রকাশ-হলো ফ্রেডেরিক রাগে জ্বলে উঠলেন—সে অগ্নুৎপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ভল্টেয়ার এবার পালালেন পটাস্‌ডাম ছেড়ে।

যদিও ফ্রাঙ্কপোর্ট, ফ্রেডেরিকের রাজ্য-সীমার বাইরে তবুও সেখানে গিয়েই রাজার চরেরা ভল্টেয়ারকে পাকড়াও করল এবং করল বন্দী। ফ্রেডেরিক 'Palladium' নামে এক কবিতা লিখেছিলেন, কবিতাটি কিন্তু ভদ্র সমাজে স্বীকৃতি পায়নি, এ কবিতাটি নাকি ভল্টেয়ারের Pucalla কবিতাটিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত রাজার কবিতাটি ভল্টেয়ারের সঙ্গেই ছিল—রাজ অনুচরেরা জানালেন কবিতাটি ফেরৎ না দিলে তাঁকে আর অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে 'ভয়ঙ্কর' পাণ্ডুলিপিটি যে ট্রাঙ্কে ছিল পথে সেটি গেছে হারিয়ে সেটা খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত, বেশ কয় সপ্তাহ ধরে ভল্টেয়ারকে একরকম জেলেই কাটাতে হলো ওখানে। একজন বইয়ের দোকানদার ভল্টেয়ারের কাছে সামান্য কিছু টাকা পেতেন—ভদ্রলোক সুযোগ বুঝে এখন এসে তাঁর প্রাপ্যের জন্য দিলেন তাগাদা। ভল্টেয়ার রেগে গিয়ে দোকানদারের কান বরাবর মেরে বসলেন এক প্রচণ্ড ঘুষি। তখন ভল্টেয়ারের সেক্রেটারী কলিনি (Collini) এসে দোকানদারকে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন যে : "জনাব, আপনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠতম মানুষের হাতের কানমলা খেয়েছেন, এতে দুঃখ করার কি আছে।"

অবশেষে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে ঢুকতে যাচ্ছেন তখন খবর এলো তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছে। শিকারী-তাড়িত এ বৃদ্ধ আত্মা কোথায় যে আশ্রয় নেবেন তা যেন ভেবেই পাচ্ছিলেন না। একবার ভাবলেন পেনসেলভেনিয়ায় (Pennsylvania) চলে যাবেন। এর থেকে তাঁর চরম নিরূপায় অবস্থা সহজেই বুঝতে পারা যায়। ১৭৫৪-এর মার্চ মাসটা তিনি জেনেভার কাছাকাছি এমন একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সন্তোষজনক কবরের"—সন্ধানেই কাটিয়ে দিলেন—যেখানে তিনি প্যারী আর বার্লিনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী স্বেচ্ছাচারীর হাত থেকে পারবেন আত্মরক্ষা করতে। অবশেষে তিনি লেস ডেলিকেস' (Les Delices) নামে একটি পুরোনো সম্পত্তি (Estate) কিনে সেখানেই নিজের বাগান কর্ষণ আর ভগ্ন স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য বসতি স্থাপন করলেন। যখন তাঁর জীবন বার্ধক্যের ভাটা পথে গড়িয়ে পড়ছিল তখনই তিনি প্রবেশ করলেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এ সর্বোত্তম কর্মময় যুগে।

তাঁর এই নতুন নির্বাসনের কারণ কি? বার্লিনে তাঁর যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সেটা সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "অত্যন্ত দুঃসাহসিক বৃহদাকার খুব বৈশিষ্ট্যজনক আর তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসিক"। নামটিও তার লক্ষ্য করবার মতো: "চার্লমেগন (Charlemague) থেকে ত্রয়োদশ লুই (Louis XIII) পর্যন্ত জাতিসমূহের নৈতিকবোধ আর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি রচনা"। এখন ইতিহাস যেভাবে লেখা হয় তার প্রতি ম্যডাম দু' চ্যটেলেটের দারুণ বিরাগ ছিল—তার জবাবেই এটি লেখা আর এ লেখার সূচনাও কিরেতে (Cirey) থাকতেই।

ইতিহাস সম্বন্ধে ম্যডামের ধারণা: ঐহচ্ছে এক পুরোনো পঞ্জিকা। আমি এক ফরাসী মহিলা, থাকি নিজের জমিদারিতে, সুইডেনে হেকুইনের পর ইগিল (Egil) রাজা হয়েছিল আর অটোমেন (Ottoman) হচ্ছে অর্টোগুরুলের (Ortogral) ছেলে এসব জেনে আমার কি লাভ? আমি শুধু গ্রীক আর রোমানদের ইতিহাস পড়েই বেশ আনন্দ পেয়েছি। সেখানে বর্ণিত বহু চিত্রই আমাকে করেছে মুগ্ধ। কিন্তু কোন জাতিরই দীর্ঘ ইতিহাস আমি একটাওপড়ে শেষ করতে পারিনি। ঐ সবে অরাজকতা ছাড়া আমি কিছুই ত খুঁজে পাই না—সম্পর্কহীন, পরিণতিবিহীন বাজে সব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুধু আর হাজারো রকমের যুদ্ধের কথা যে যুদ্ধ নিয়ে আসে না কোন কিছুরই সমাধান। যে পড়া মনকে শুধু অভিভূত করে, করে না কিছুমাত্র আলোকিত তেমন পড়ায় আমার কাজ নেই।"

ভল্টেয়ারও এ মত স্বীকার করেন। তাঁর ইনজেনু (Ingenu) চরিত্রের মুখ দিয়েই ত তিনি বলিয়েছেন: "দুর্ভাগ্য আর অপরাধের ছায়াছবি ছাড়া ইতিহাস আর কি?" তিনি হোরেস ওয়ালপোলকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Horace Walpole) লিখেছিলেন (১৫ই জুলাই, ১৭৬৮): "বস্তুত ইয়র্কবাসী, লেস্টেরবাসী এবং আরো অনেকের ইতিহাস পড়তে গেলে মনে হয় যেন শুধু খুনী ডাকাতদের কাহিনীই পড়ছি।" তবে তিনি ম্যাডাম দু চ্যাটেলেটকে বলেছিলেন হয়তো ইতিহাসের উপর দর্শনের প্রয়োগ ঘটাতে পারলেই একটা উপায় হতে পারে—খুঁজে দেখতে হবে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের নীচে যে মানব-মন ক্রিয়া করে তাকে। তিনি আরো বলেছেন: "শুধু দার্শনিকদেরই ইতিহাস লেখা উচিত। গল্প কাহিনী সব জাতির ইতিহাসকেই করেছে বিকৃত—একমাত্র দর্শনের হস্তক্ষেপেই মানুষের মন হতে পারে আলোকিত। যদি সত্য সত্যই এ অন্ধকারে দর্শনের আবির্ভাব ঘটে তা হলে দেখতে পাবে শতাব্দীর ভুল-ভ্রান্তিতে মানুষের মন কত অন্ধ হয়ে আছে আর এ ভুল ভাঙ্গানো অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য। আরো দেখতে পাবে মিথ্যার সাফাইয়ের উপর গড়ে উঠেছে নানা উৎসব, ঘটনার কিম্বদন্তী আর স্মৃতি-সৌধ।" উপসংহারে তাঁর মন্তব্য: "আসলে ইতিহাস মৃতদের নিয়ে এক গাদা ভেল্কি দেখানো ছাড়া আর কিছুই না। ভবিষ্যতের জন্য আমরা যা চাই তার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যই আমরা অতীতকে করি আমাদের ইচ্ছা মতো রূপান্তরিত। পরিণামে ইতিহাসই প্রমাণ করে ইতিহাস দিয়ে প্রমাণ করা যায় সব কিছুই।"

"মিথ্যার মিসিসিপিতে" (Missisipi) মানব-ইতিহাসের সত্যের বীজ কণাটুকু খুঁজে নেওয়ার জন্য তিনি খনি-মজুরের মতো খেটেছেন। বছরের পর বছর ধরে তিনি চালিয়েছেন প্রস্তুতি অধ্যয়ন: পার হয়েছেন রাশিয়ার ইতিহাস, দ্বাদশ লুইর ইতিহাস, চতুর্দশ লুই আর ত্রয়োদশ লুইর যুগ—এসব করতে গিয়ে তিনি এমন একটা অম্লান মননশীল বিবেক আয়ত্ত করেছিলেন যে যা তাঁকে প্রতিভাবান হওয়ার পথে রেখেছিল অবরুদ্ধ করে। "দি জেস্যুইট পেরে ডেনিয়েল (The Jesuit Pere Daniel) যিনি ফ্রান্সের ইতিহাস লিখেছেন, প্যারীর রাজকীয় লাইব্রেরীতে তাঁর সামনে বার শ খণ্ড (Volume) দলিল আর পাণ্ডুলিপি রাখা হয়েছিল। ঘন্টা খানেক ঐ সবের দিকে তাকিয়ে দেখে, ভল্টেয়ারের প্রাক্তন শিক্ষক ফাদার টাউরনেমাইনের (Father Tournimine Essai) দিকে ফিরে সব বাতিল করে দিয়ে বলেছিলেন 'বাজে সব পুরোনো কাগজ, তাঁর

১৮—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস লেখায় এসব কোন কাজেই আসবে না।" ভল্টেয়ার কিন্তু এমন ধারা ছিলেন না। তাঁর আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যা পেতেন সব কিছুই তিনি পড়ে দেখতেন। স্মৃতি-কথার শত শত বই তিনি গলাধঃ-করণ করেছেন, প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে তিনি লিখেছেন শত শত চিঠি। এমন কি তাঁর বই প্রকাশের পরও তিনি অধ্যয়নে হননি ক্ষান্ত আর এভাবে প্রতি সংস্করণেই বইটিকে করে তুলেছেন উন্নত থেকে উন্নততর। উপকরণ সংগ্রহ ও শুধু প্রস্তুতিমাত্র নয় কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে নির্বাচন আর সাজানোর নবতর পদ্ধতি। বস্তুগত ঘটনার বিশেষ মূল্য নেই—সত্য হলেও (যদিও তা প্রায়ই হয় না) তা স্রেফ ঘটনা মাত্র।" "বিছানাপত্রের লটবহর যেমন সৈন্যবাহিনীর পক্ষে বাধাস্বরূপ তেমনি ইতিহাসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় আর যা কোন একটা পরিণতিতে নিয়ে যায় না তেমন সব বিস্তৃত ঘটনারাজি। আমাদের উচিত বৃহৎ পরি-প্রেক্ষিতেই সবকিছুর দিকে তাকিয়ে দেখা। কারণ মানুষের মন এত ছোট যে ঘটনা-বাহুল্যের চাপে তা সহজেই যায় তলিয়ে।" আখ্যায়িকা বা বিবরণ-লেখকদের পক্ষেই "ঘটনা" সংগ্রহ করা উচিত আর উচিত ঐতিহাসিক অভিধানের মতই তাকে সাজানো তা হলে শব্দের মতো 'ঘটনা' ও প্রয়োজনের সময় খুঁজে পেতে আর কষ্ট করতে হয় না।

ভল্টেয়ার চেয়েছিলেন এমন একটা সমন্বয়-সাধনী নীতি যা দিয়ে সারা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে গাঁথা যাবে এক সূত্রে আর তাঁর প্রতীতি এ সূত্র হচ্ছে সংস্কৃতির ইতিহাস। তাঁর সংকল্প তাঁর ইতিহাসে রাজ-রাজড়াদের ব্যাপার থাকবে না, থাকবে আন্দোলন, গতি-ধারা আর জনসাধারণের কাহিনী; জাতির পরিবর্তে তাঁর ইতিহাসে স্থান পাবে মানবজাতির কথা। যুদ্ধ বিগ্রহের বদলে তিনি লিপিবদ্ধ করবেন মানব-মনের অগ্রগতির বিষয়। "যুদ্ধ বা বিপ্লব আমার পরিকল্পনার খুব ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী, বিজেতা কি বিজিত, নগর বিশেষ দখল কি বেদখল এসব ত সব ইতিহাসেরই সাধারণ ঘটনা......বিভিন্ন কলা-শিল্প আর মনের অগ্রগতির কথা বাদ দিলে কিছুইত অবশিষ্ট থাকে না। এসব স্মরণীয় কীর্তির অভাবে কোন যুগের ইতিহাসই ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে কিছুমাত্র আকর্ষণীয় মনে হবে না। আমি চাই না শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখতে, আমি লিখতে চাই সমাজের ইতিহাস, জানতে চাই মানুষ পারিবারিক জীবনের অভ্যন্তরে কিভাবে বাস করতো আর সাধারণভাবে কি সব শিল্পের করতো চর্চা তার। আমার উদ্দেশ্য মানব-মনের ইতিহাস উদঘাটন, তুচ্ছ সব বিষয়ে পুঙ্খাপুঙ্খ বিবরণ নয়, বড় বড় সামন্ত প্রভুদের ইতিহাস নিয়েও আমি চাই না মাথা ঘামাতে........কিন্তু আমি জানতে চাই কোন্ কোন্ পদক্ষেপের ফলে মানুষের পক্ষে বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণ সম্ভব হয়েছে তার ইতিহাস।" ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে রাজ-রাজড়াদের এযে বাদ দেওয়া তা গণতান্ত্রিক উত্থানেরই অংশ, যে গণতান্ত্রিক উত্থান অবশেষে তাদেরে সরকার থেকেও দিয়েছে বাদ। ভল্টেয়ারের নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধেই (Essai sure les Maeurs) বুরবঁ (Bourbous) রাজাদের সিংহাসন-চ্যুতির সূচনা।

এভাবে ভল্টেয়ার রচনা করেন ইতিহাসের প্রথম দর্শন—য়ুরোপীয় মনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক কারণ-পরম্পরা অনুধাবনের এ হচ্ছে প্রথম বিধি-বদ্ধ চেষ্টা। এটা সহজেই বুঝতেই পারা যায় এরকম অনুধাবন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সর্বাগ্রে সব রকম কুসংস্কার ত্যাগ অত্যাবশ্যক। শাস্ত্রের প্রাধান্য বাতিল না করলে ইতিহাস কখনো তার আত্ম-স্বরূপ গ্রহণ করতে পারে না। বাক্লের (Buckle) মতে ভল্টেয়ারই আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের ভিৎ রচনা করেছেন। গিবন (Gibbon), নীবোহর (Niebuhr) বাকলে আর গ্রোটে (Grote) কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন আর করেছেন তাঁর অনুসরণ। তিনি ছিলেন এঁদের সকলের প্রধান পথিকৃৎ এবং যে ক্ষেত্রে তিনি প্রথম সন্ধানী আলো ফেলেছিলেন সেখানে আজও তিনি অনতিক্রম্য। কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি তাঁর জন্যে নির্বাসন নিয়ে এলো কেন? কারণ, তাঁর সত্য ভাষণের আঘাত থেকে কেউই পাননি রেহাই। বিশেষ করে পুরোহিত শ্রেণী তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হওয়ার বড় কারণ তাঁর মতে, যা পরে গিবন (Gibbon) আরো বিশদভাবে করেছেন বর্ণনা—পৌত্তলিকতার (Paganism উপর খ্রীষ্ট-ধর্মের দ্রুত বিজয়ের ফলেই রোমের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে বর্বর ঔপনিবেশিক ও অভিযানকারীদের হাতে অতি সহজে তার (রোমের) ঘটে পতন। সাধারণতঃ ইতিহাসে য়িহুদী আর খ্রীষ্টধর্মকে যে স্থান দেওয়া হয় ভল্টেয়ারের বইতে তার চেয়ে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম স্থান দেওয়ায়ও তাঁরা হয়েছিলেন বিরক্ত—তাঁদের রাগের আরো কারণ তিনি প্রায় মঙ্গল-গ্রহবাসীর মতই অত্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন চীন, ভারত ও পারস্য সম্বন্ধে। এ নতুন পরিপ্রেক্ষিতেই উদঘাটিত হলো এক বিরাট ও অভিনব জগত। প্রত্যেক অনড় ধর্ম বিশ্বাস (dogma) আপেক্ষিকতায় হয়ে গেলো নিষ্প্রভ। অসীম প্রাচ্য যেন এবার তার ভূগোলের অনুপাতেই পেলো বেশ কিছুটা গুরুত্ব—য়ুরোপ হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল সে যেন তার চেয়ে বড় এক সংস্কৃতিক আর মহাদেশেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক উপদ্বীপ মাত্র। একজন য়ুরোপবাসীর এমন স্বদেশ প্রেম বিরোধী মতামত তাঁরা কি করে ক্ষমা করেন ? তাই রাজার নির্দেশ : যে ফরাসী নাগরিক নিজেকে আগে মানুষ পরে ফ্রান্সবাসী মনে করে সে আর কখনো ফরাসী ভূমিতে পদার্পণ করতে পারবে না।

6. ফারনে (Ferney) : কেনডিডে (Candide)

WWW.AMARBOI.COM

লেস্ ডেলিকেস্ (Les Delices) ছিল ভল্টেয়ারের অস্থায়ী বাসস্থান। এর চেয়েও এক স্থায়ী আশ্রয়ের আশা ভল্টেয়ারের মনে মনে ছিল। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে, সুইস সীমান্তের সামান্য ভিতরে অথচ ফ্রান্স থেকেও দূরে নয়, ফারনে নামক স্থানে জুটলো তাঁর তেমন এক আশ্রয়। এখানে তিনি থাকতে পারবেন ফ্রান্সের ক্ষমতাসীনদের থেকে নিরাপদে অন্যদিকে সুইস্ সরকার যদি তাঁকে কোন রকম বিপদে ফেলতে চায় তা হলে সহজে তিনি আশ্রয় নিতে পারবেন ফ্রান্সে। এবার অবসান ঘটলো তাঁর পথিক জীবনের। তাঁর ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর সব কারণ তাঁর অস্থির স্বভাবের ফল নয়—নির্যাতনের হাত থেকে নিরাপত্তার সার্বিক অভাব ও এতে সূচিত। মাত্র চৌষট্টি বছর বয়সেই তিনি খুঁজে পেলেন এমন এক আশ্রয় যাকে বলা যায় তাঁর বাড়ী। তাঁর এক গল্পের (The Travels of Scarmentado) শেষে যে অনুচ্ছেদটি আছে তা ঐ গল্পের লেখকের বেলায়ও প্রযোজ্য : "পৃথিবীতে যা কিছু দুর্লভ ও সুন্দর তা দেখা এখন আমার শেষ হয়েছে—আমি এখন সঙ্কল্প করেছি ভবিষ্যতে আমার বাড়ী ছাড়া আমি আর কিছুই দেখবো না। আমি বিয়ে করলাম কিন্তু অনতি-বিলম্বে আমার মনে সন্দেহ হলো আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এ সন্দেহ সত্ত্বেও আমি দেখতে পেলাম জীবনের অন্যান্য অবস্থা থেকে এ হচ্ছে সুখতম অবস্থা।" ভল্টেয়ারের কোন বৌ ছিল না, ছিল এক ভাইজি—প্রতিভাবানের জন্য এ হয়তো ভালো।" তিনি প্যারী ফিরে যাওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন তেমন কথা শোনা যায়নি......তবে এ বিজ্ঞ নির্বাসন যে তাঁকে দীর্ঘায়ু করেছে তাতে সন্দেহ নেই।"

তিনি তাঁর বাগান নিয়েই সুখী ছিলেন—লাগাচ্ছিলেন এমন সব ফল-ফলারের গাছ যা কখনো তাঁর জীবদ্দশায় হবে না ফলন্ত। তাঁর এক অনুরাগী যখন তিনি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যা কিছু করে গেছেন তার প্রশংসায় হয়েছিলেন উচ্ছ্বসিত তখন ভল্টেয়ার বলেছিলেন: "হাঁ, আমি চার হাজার গাছ রোপণ করেছি।" তিনি সকলের সঙ্গেই সদয় কথা বলতেন কিন্তু প্ররোচিত হলে বেশ তীক্ষ্ণ কথা বলতেও ছাড়তেন না। একদিন এক দর্শন প্রার্থীর কাছে তিনি জানতে চাইলেন তিনি কোথা থেকে এসেছেন। উত্তরে লোকটি জানালো: "মিঃ হলারের (Haller) কাছ থেকে।" ভল্টেয়ার বল্লেন: "তিনি এক মহৎ মানুষ, কবি হিসেবে, প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসেবে, দার্শনিক হিসেবেও তিনি শ্রেষ্ঠ—তাঁকে প্রায় বিশ্ব-প্রতিভাই বলা যায়।" লোকটি ফের বল্লো: "মিঃ হলার এ সুবিচারটুকুও আপনার প্রতি করেন না। বলে আপনি যা বল্লেন তা অধিকতর প্রশংসনীয়। ভল্টেয়ার দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে যোগ করলেন "হয়তো আমরা উভয়েই ভ্রান্ত।"

ফারনে এখন হয়ে উঠেছে বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের রাজধানী। যে যুগের পণ্ডিত আর জ্ঞানী রাজারা সবাই হয় সশরীরে এসে না হয় পত্র-মারফৎ তাঁর প্রতি জানাতে লাগলেন শ্রদ্ধা। আসতে লাগলেন সংশয়বাদী পুরোহিতরা, উদার অভিজাতরা আর বিদুষী মহিলারা। ইংলণ্ড থেকে এলেন গিবন আর বস্‌ওয়েল। এলেন জ্ঞান-প্রচার আন্দোলনের বিদ্রোহী নেতা দ' এলেমবার্ট (d' Alembert) ও হেলভেটিয়াস (Helvetius) এবং আরো অসংখ্যজন। শেষে দেখা গেল এ অসীম আগন্তুকদের আতিথেয়-তার খরচ বহন ভল্টেয়ারের সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি যেন এখন হয়ে পড়েছেন সারা য়ুরোপের হোটেল রক্ষক—এবার তাঁর নিজের কন্ঠেই শোনা গেল এ অভিযোগ। একজন পরিচিত ব্যক্তি যখন জানালেন তিনি ছ' সপ্তাহ থাকতে এসেছেন তখন ভল্টেয়ার বল্লেন: "তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ডন্ কুইকসোর মধ্যে বেশ কম কোথায় ? সে সরাইখানাকে মহল মনে করেছিল আর তুমি মহলকেই মনে করছ সরাইখানা।" পরিশেষে তিনি বলে উঠলেন : "ঈশ্বর আমাকে বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা করুন—শত্রুদের বিরুদ্ধে যা করার তা আমি নিজেই করতে সক্ষম।"

এ অবিরাম আতিথেয়তার সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে পৃথিবীর সর্বাধিক আর বুদ্ধিদীপ্ত পত্রসমষ্টি। চিঠি-পত্র আসতো সব রকম ও সব অবস্থার মানুষের কাছ থেকে। জার্মেনির এক নগরাধ্যক্ষ লিখেছেন : "ঈশ্বর আছে কি নেই" তা ফেরৎ ডাকে এবং গোপনে যেন ভল্টেয়ার তাঁকে জানান। সুইডেন-রাজ তৃতীয় গোস্টেভাস্ (Gustavus III) ভল্টেয়ার মাঝে মাঝে উত্তরদিকে তাকিয়ে দেখেন একথা ভেবে অত্যন্ত উল্লসিত হয়েছিলেন এবং ভল্টেয়ারকে জানিয়েছিলেন এ কারণেই ঐদিকে কিছু করার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। ত্বরিৎ সবকিছু সংস্কার করতে না পারার জন্যে ডেনমার্ক রাজ সপ্তম খ্রীস্টিয়ান (Christian VII) ভল্টেয়ারের কাছে করেছিলেন ক্ষমা প্রার্থনা। রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিন (Catherine VII) প্রায়ই তাঁর কাছে সুন্দর সুন্দর উপহার পাঠাতেন, চিঠি লিখতেন ঘন ঘন আর আশা করতেন তিনি যেন তাঁকে রবাহুত মনে না করেন। এমনকি ফ্রেডেরিকও বছর-খানেক নীরব অবহেলায় কাটিয়ে এবার দলে এসে জুটলেন এবং শুরু করলেন ফারনেরাজের সঙ্গে পত্রালাপ করতে।

তিনি লিখলেন : "তুমি আমার প্রতি অনেক অবিচার করেছ কিন্তু সবই আমি ক্ষমা করে দিয়েছি—এমনকি ওসব আমি এখন ভুলে যেতেও চাই। কিন্তু তোমার মহৎ প্রতিভার প্রেমে-পাগল এমন একজনের সঙ্গে যদি তোমার সম্পর্ক না হতো তা হলে এমন উন্নত অবস্থায় তুমি নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারতে না........তুমি কি মধুর কিছু শুনতে চাও ? বেশ, তা হলে তোমাকে আমি কিছু সত্য কথা শোনাই। আমি তোমার মধ্যে সর্ব যুগের সর্বোত্তম প্রতিভাকেই জানাচ্ছি শ্রদ্ধা। আমি তোমার কবিতার প্রশংসা করি আর ভালোবাসি তোমার গদ্য তোমার আগে আর কোন লেখকেরই ছিল না এমন তীক্ষ্ণ নৈপুণ্য আর এমন সূক্ষ্ম ও সুনিশ্চিত রুচিবোধ। আলাপী হিসেবেও তুমি চমৎকার, তুমি জানো একই সঙ্গে কি করে দিতে হয় মানুষকে আমোদ আর শিক্ষা। তোমার মতো প্রলুব্ধ করার এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি আমার পরিচিত আর কারো মধ্যে দেখিনি—তুমি যদি চাও সারা বিশ্বকেই তুমি তোমার প্রেম-মুগ্ধ করে রাখতে পারো। তোমার মনে এমন সব সৌন্দর্য রয়েছে যে তুমি মনকষ্ট দিলেও যারা তোমাকে জানে তারা সানন্দে তা সয়ে যায়। এক কথায় তুমি যদি মানুষ না হতে তা হলে তুমি হতে নিখুঁত।”

এমন এক উৎফুল্ল অতিথিপরায়ণ মানুষ যে নৈরাশ্যবাদী হতে পারে তা কে আশা করেছিল ? বেস্টিল সত্ত্বেও যৌবনে যখন তিনি প্যারীর সেলুনে সেলুনে আমোদ-প্রমোদে ডুবে ছিলেন তখন তিনি জীবনের সুখের দিক দেখেছেন বই কি। তবুও যে অস্বাভাবিক আশাবাদকে লিবনিটজ্ (Leibnitz) জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তার বিরুদ্ধে ভল্টেয়ার তাঁর সে বে-পরওয়া আমোদ-প্রযোদের দিনেও জানিয়েছিলেন আপত্তি। এক অতি-উৎসাহী তরুণ তাঁকে ছাপার অক্ষরে আক্রমণ করেছিলেন আর লিবনিট্জের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন বলেছিলেন: “এ হচ্ছে সম্ভাব্য সর্বোত্তম জগৎ।” উক্ত তরুণকে ভল্টেয়ার লিখেছিলেন: “মহাশয়, আপনি আমার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা লিখেছেন শুনে খুব খুশী হলাম। আপনি আমাকে অতিমাত্রায় সম্মানিত করেছেন......এ সম্ভাব্য সর্বোত্তম জগতে কেন এত সব মানুষ নিজের গলায় ছুরি বসায়, গদ্যে কি পদ্যে আপনি যদি তার কারণ নির্দেশ করেন তা হলে আমি আপনার কাছে চিরবাধিত থাকবো। আমি প্রতীক্ষায় থাকবো আপনার যুক্তির, আপনার কবিতার আর আপনার গালাগালির। আর আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি আমরা কোন পক্ষই এ বিষয়ে কিছুই জানি না। ইতি আপনার.........” ইত্যাদি।

নির্যাতন আর স্বপ্নভঙ্গের ফলে জীবনের উপর বিশ্বাসও তাঁর জীর্ণ হয়ে এসেছিল—বার্লিন আর ফ্রাঙ্কপোর্টের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল আশার ক্ষীণ রেখাটুকুও। কিন্তু যখন ১৭৫৫-এর নভেম্বরে খবর এলো এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে লিসবনে ত্রিশ হাজার লোক মারা গেছে তখন তাঁর মনের আশা এবং বিশ্বাস দুইই ভেঙ্গে পড়লো এক সঙ্গে। সেদিন ছিল ‘নিখিল সন্ত দিবস’ (All Sain's day) উপাসকে উপাসকে গির্জাগুলি ছিল ভরতি, শত্রুদের এক জায়গায় সারিবদ্ধ পেয়ে মৃত্যু যেন এবার সানন্দে নিজের শস্য ভাণ্ডার ভরে তুল্লে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ভূমিকম্পের কথা শুনে ভল্টেয়ার অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন শুনলেন প্যারীর পাদ্রীরা এ মহামারীকে লিসবনবাসীদের পাপের ফল বলে ব্যাখ্যা করছেন তখন তাঁর ক্রোধের আর সীমা ছিল না। তাঁর সমস্ত রোষাগ্নি ফেটে বেরুল এক আবেগময় কবিতায়। হয় ঈশ্বর পাপ দমাতে পারেন কিন্তু দমান না, না হয় তিনি দমাতে চান বটে কিন্তু পারেন না দমাতে অতি জোরালো ভাবে এ পুরোনো ধাঁধাই রূপ পেলো তাঁর ঐ কবিতাটিতে 'ভালো' আর 'মন্দ' এ শুধু মানব পরিভাষা, বিশ্ব-ব্যাপারে অপ্রযোজ্য এবং অসীমের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শোক-দুঃখ অকিঞ্চিতকর'—স্পিনোজার এসব ব্যাখ্যায়ও তিনি পারেন নি খুশী হতে। ভল্টেয়ারের উক্ত কবিতাটি এই :

এক বিরাট সমগ্রের আমি শুধু এক ক্ষুদ্রতম অংশ।
হাঁ ; তবে সব প্রাণীই বাঁচার দণ্ডে দণ্ডিত—
সব সচেতন বস্তুরই জন্য একই অমোঘ বিধানে,
আমার মতই তারা কষ্ট ভোগ করে
আবার আমার মতই মরে।
ভীরু শিকারকে ঝাপটে ধরে হিংস্র শকুনী,
রক্তাক্ত ঠোঁটের আঘাত হানে
শিকারের থর থর করে কেঁপে ওঠা
প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে :
মনে হয় সবই ঠিক আছে, সবই ভালো তার জন্যে।
কিন্তু মুহূর্তে একটা ঈগল এসে
ছিঁড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয় শকুনীর দেহটাকে—
আর ঈগলের দেহ বিদ্ধ হয় মানুষের নিক্ষিপ্ত শরে।
যুদ্ধ বাজ মানুষ পড়ে থাকে যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলায়
তার রক্ত মিশে যায় মৃত্যু মুখের রক্তের ধারায়—
এবার পালাক্রমে তারা পরিণত হয়
শিকারী পাখীর খোরাকে।
এভাবে সারা বিশ্বের সবাই করছে আর্তনাদ—
সবারই যেন জন্ম নির্যাতন ভোগ করে
সমভাবে বরণ করে নেওয়া মৃত্যু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ভয়ানক অরাজকতার মাঝখানে বসে
তুমি কিনা বলে বেড়াচ্ছো :
প্রতি মানুষের দুঃখ নিয়ে আসবে সব মানুষের ভালো !
কি অদ্ভূত কথা ! যেন তোমার মরণশীল সকরুণ মূর্তিই
কম্পিত কন্ঠে চীৎকার করে বলছে "সব ভালো" !

বিশ্ব তোমায় বিশ্বাস করে—
কিন্তু তোমার দিল তোমার মনের অহঙ্কার বোধের প্রতি
জানায় শত শত প্রতিবাদ.........
জিজ্ঞাসা করি : বৃহত্তম মনের রায় কি ?
অসীম নীরবতা : আমাদের জন্য ভাগ্যের কেতাব চির-বন্ধ।
মানুষ জানে না নিজের সন্ধান, সে নিজের কাছেই নিজে অপরিচিত
সে জানে না কোথা থেকে সে এসেছে, জানে না কোথায় সে যাবে।
কাদা-মাটির শয্যায় সে যেন নির্যাতিত পরমাণু—
মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে, সে যেন ভাগ্যের এক পরিহাস।
কিন্তু চিন্তাশীল পরমাণুদের চিন্তা-নিয়ন্ত্রিত দূর-দৃষ্টি
পরিমাপ করতে সক্ষম
দূর-আকাশের অস্পষ্ট তারকারাজিকেও।
আমরা মিশে যাই অসীমের সাথে—
কিন্তু আমরা নিজেরা তা কখনো দেখি না
অথবা পারি না জানতে।
এ পৃথিবীর অহঙ্কার আর অন্যায়ের রঙ্গমঞ্চে
রুগ্ন আহাম্মকের দলই জমিয়েছে ভীড়
আর তারাই বলছে সুখের কথা........
এতখানি বিষাদের সুরে না হলেও
'আমিও একদিন গেয়েছিলাম গান,
সুখের সূর্যালোকিত জীবনের ঐ তো সাধারণ নিয়ম।
সময়ের ঘটেছে পরিবর্তন, বাড়তি বয়সের কাছ থেকেও পেয়েছি পাঠ।
আর মানব দুর্বলতার আমিও তো অংশীদার—
ঘনায়মান অন্ধকারে কামনা করছি একটুখানি আলো,
আমি শুধু কষ্ট-ভোগ করতেই পারি কিন্তু চাই না তার জন্য হাহুতাশ
করতে ।।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক মাস পরেই শুরু হয় 'সাত বছরের যুদ্ধ'—ভল্টেয়ারের মনে হলো এ এক পাগলামী আর স্রেফ আত্মহত্যা—কেনাডায় 'কয়েক একর বরফের মালিক ইংরেজ হবে না ফরাসী এর সমাধানের জন্য সারা য়ুরোপকে ধ্বংস করা। এর উপর তাঁর লিসবন কবিতার এক খোলা উত্তর দিয়ে বসলেন জাঁ জেকোয়েস রুশো (Jean Jacques Rousseau)। রুশো বলেন ধ্বংসের জন্য মানুষই দায়ী, শহরে না থেকে আমরা যদি বাইরে মাঠে থাকতাম তা হলে এত মানুষের এ ভাবে মৃত্যু ঘটতো না, ঘরে না থেকে যদি আকাশের নীচে থাকতাম তা হলে ঘর ত আমাদের মাথার উপর পড়তো না ভেঙ্গে। এ গভীর ঐশী-শাস্ত্রের জনপ্রিয়তায় ভল্টেয়ার রীতিমতো বিস্মিত হলেন আর এ রকম এক কুইকসো (Quixote) তাঁর নামকেও টেনে ধূলায় নামিয়েছেন দেখে তিনি খুব বিরক্তি বোধ করলেন। এবার তিনি বুদ্ধিজীবির সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র—যার নাম 'ভল্টেরীয় বিদ্রূপ'—হানলেন রুশোর দিকে। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে, মাত্র তিন দিনে তিনি লিখে ফেল্লেন ক্যানডিডে (Candide)।

এর আগে কেউ বোধকরি এতোখানি উৎফুল্ল কন্ঠে বিশ্ব নিন্দার ওকালতী করেননি। পৃথিবীটা যে একটা দুঃখ-নিকেতন তা জেনে এত দিল-খোলা হাসিও মানুষবোধ করি আর হাসেনি। গল্প এতখানি উহ্য আর সহজভাবে কদাচিৎ লেখা হয়ে থাকে—এ শুধু কাহিনী আর কথোপকথন, বর্ণনার নেই কোনো প্রলেপ কোথাও—ঘটনার গতি এত দ্রুত যে যেন দিগ্বিদিক ভুলেই চলেছে ছুটে। আনাতোল ফ্রান্স বলেছেন: 'ভল্টেয়ারের আঙুলে কলম যেন হাসতে হাসতেই ছুটে চলে"। মনে হয় বিশ্বসাহিত্যের এ এক সেরা গল্প।

নামেই প্রকাশ ক্যানডিডে হচ্ছে এক সরল আর সৎ বালক, ওয়েস্টফেলিয়ার ব্যরণ থাণ্ডার-টেন-ট্রকের (Thrender–Ten–Trock) পুত্র আর সুপণ্ডিত প্যনগ্লসের (Pangloss) ছাত্র। 'প্যনগ্লস্ ছিলেন Metaphysicotheologicosmonigology'র অধ্যাপক। তিনি বলেন: 'সব কিছুর উদ্দেশ্য যে অবশ্যই ভালো তা প্রমাণ করা সম্ভব। দেখ, নাকটা এমন ভাবে তৈয়রী করা হয়েছে যাতে সহজেই চশমা লাগানো যায়। পা যে মৌজা পরার জন্যই তৈয়রী হয়েছে তা সহজেই দৃষ্টিগোচর........দুর্গ তৈয়রীর জন্যই পাথর পরিকল্পিত হয়েছে ঐভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

.......শূকরকে এমনভাবে তৈয়রী করা হয়েছে যাতে সারা বছর ধরেই আমরা পেতে পারি শূকর মাংস। কাজেই যারা দাবী করে সবই ভালো তারা একটা নির্বোধ-উক্তিই করে থাকে। তাদের বলা উচিত ছিল—সর্বোত্তমের জন্যই সবকিছু।'

যখন প্যানগ্লস আলোচনা রত, তখনই বুলগেরীয় বাহিনী দুর্গ আক্রমণ করে বসলো। ক্যানডিডে ধৃত হলো। তাকে করা হলো সৈন্য।

'তাকে শেখানো হলো কি করে ডানে ঘুরতে হয়, কি করে ঘুরতে হয় বাঁয়ে, কি করে অস্ত্র নিতে হয়, কি করে দিতে হয় ফেরত, কি করে গুলি ছুঁড়তে হয়, কি করে করতে হয় কুচ-কাওয়াজ ইত্যাদি।......বসন্ত-কালের এক মনোরম দিনে সে বাইরে হাঁটতে যাওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে সোজা সামনের দিকে হাটতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো—মানুষ আর জীব-জন্তুর এ এক পরম ভাগ্য যে তারা ইচ্ছা মতো নিজের পায়ের ব্যবহার করতে পারে। মাইল দুই যাওয়ার পর তাকে পাকড়াও করল ছ' ফুট লম্বা চার চারটা বীর পুরুষ। ওরা তাকে বেঁধে নিয়ে গেলো এক পাতাল-গৃহে জিজ্ঞাসা করলো সে কি সমস্ত বাহিনীর দ্বারা ছত্রিশ বার করে বেত্রা-ঘাত খাবে নাকি এক্ষুণি দু'টা সীসার বল নেবে তার মস্তিষ্কে। সে বল্লে যেহেতু মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার মালিক—সে দুটার কোনটাই নেবে না। কিন্তু তার এ কথায় ওরা সায় দিল না। তাকে বাধ্য করা হলো দু'টার একটা বেছে নিতে। অগত্যা ঈশ্বরের যে মহাদানকে স্বাধীনতা বলা হয় তার বলে সে ছত্রিশবার চাবুক খাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলে। মাত্র দু'বার সে তা সহ্য করতে পেরেছিল।''

যাই হোক ক্যানডিডে কোন রকমে পালাতে সক্ষম হলো। চড়ে বসলো লিসবন যাত্রী এক জাহাজে। জাহাজেই দেখা হয়ে গেলো অধ্যাপক প্যানগ্লসের সঙ্গে। তিনিই জানালেন কিভাবে তার পিতামাতা ক্যরন আর ব্যরনেসকে হত্যা করা হয়েছে আর কিভাবে তাদের দুর্গটাকে করা হয়েছে বিধ্বস্ত। তিনি আরো বল্লেন: "এ সবই অনিবার্য ও অত্যাবশ্যক। কারণ ব্যক্তিগত দুঃখই নিয়ে আসে সাধারণ মঙ্গল। কাজেই যতই ব্যক্তিগত দুঃখ বাড়বে ততই সাধারণ মঙ্গল যাবে বেড়ে।" একেবারে ভূমিকম্পের মুখেই তারা পেঁছিলো লিসবন। ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার পর তারা নিজ নিজ সাহসিক কর্ম আর দুঃখকষ্টের কথা একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যকে জানালে। একজন চাকরাণী জানালে তার নিজের দুঃখের তুলনায় তাদের দুঃখ কিছুই না।" আমি কমপক্ষে শতবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছি কিন্তু জীবনকে আমি ভালোবাসি বলে তা করতে পারিনি। এ হাস্যাস্পদ দুর্বলতাই বোধকরি আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক বৈশিষ্ট্য। যেভার আমরা যে কোন মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি তা সব সময় বয়ে বেড়াবার ইচ্ছার মতো অদ্ভুত আর কি হতে পারে?" অন্য এক চরিত্রের জবানিতে বলা হয়েছেঃ "সবকিছু বিবেচনা করে দেখলে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে একজন গাধার জীবন অধিকতর কাম্য মনে হবে তবে আমার বিশ্বাস পার্থক্যটা এত অকিঞ্চিৎকর যে পরীক্ষা করে দেখার কষ্ট পোষাবে না।"

ধর্ম-যাজকদের বিচারের হাত থেকে পালিয়ে ক্যান্‌ডিডে এবার প্রাগে (Paraguay) চলে গেলেন। দেখলেন, "সেখানে সবকিছুর মালিক হচ্ছে জেস্যুইট ফাদারেরা, কোন কিছুর উপরেই জনসাধারণের নেই অধিকার —যুক্তি আর সুবিচারের এ এক পরাকাষ্ঠা।" এক ডাচ্ উপনিবেশে এসে তিনি দেখলেন এক নিগ্রোর আছে একখানা হাত, আর একখানা পা মাত্র—আর সে গায়ে দিয়েছে একখণ্ড ছালা। নিগ্রো দাসটা তার এ অবস্থা সম্বন্ধে বল্লেঃ "আমরা যখন আঁক নিড়াই তখন হঠাৎ যদি কলে লেগে কারো আঙুল কেটে যায়, তারা আমাদের গোটা হাতটাই ফেলে কেটে আর পালাতে চাইলে কেটে ফেলে একটা পা........আমাদের এ মূল্যের বিনিময়েই য়ুরোপে তোমরা খেতে পাও চিনি।" ও দেশের অনাবিষ্কৃত অভ্যন্তরে ক্যানডিডে অনেক আল্গা সোনা খুঁজে পেয়েছিল, সমুদ্র তীরে এসে ঐ দিয়েও ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য করলে এক জাহাজ ভাড়া কিন্তু জাহাজের অধ্যক্ষ তার সোনাগুলো নিয়েই জাহাজ দিলে ছেড়ে আর তাকে ফেলে গেলে একা ঘাটে বসে বসে দর্শনচর্চা করার জন্য। যৎ সামান্য যা ছিল তা দিয়েও শেষকালে এক বোরডো-যাত্রী (Bordeux) জাহাজে একটা সীটের ব্যবস্থা করে তাতেই চড়ে বসলে। জাহাজেই মার্টিন নামে এক সাধুর সঙ্গে তার হলো আলাপ পরিচয়।

ক্যানডিডে জিজ্ঞাসা করলো "আচ্ছা আপনি কি বিশ্বাস করেন মানুষ এখনকার মতো সব সময় একে অন্যকে হত্যা করে এসেছে আর তারা সব সময় মিথ্যাবাদী, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, দস্যু, আহাম্মক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোর, বদমাইশ, পেটুক, মদ্যপায়ী, কৃপণ, হিংসুটে, দুরাশাপোষণকারী, রক্ত-পিপাসু, পর-নিন্দুক, ব্যভিচারী, গোঁড়া, কপট আর বোকা?" মার্টিন বল্লেন: "আচ্ছা তুমি কি বিশ্বাস কর বাজপাখী যখনই পায়রাকে নাগালে পায় তখনই খেয়ে ফেলে?"

ক্যানডিডে জোর গলায় বল্লে: "নিঃসন্দেহে।"

মার্টিন উত্তরে বল্লেন: 'বেশ আচ্ছা বাজপাখীর স্বভাব যদি বরাবরই এক রকম থেকে যায় তা হলে মানুষের স্বভাবে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটবে তা তুমি ভাবতে যাও কেন?"

ক্যানডিডে বল্লে: "ওহ! দুইয়ের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান যে রয়েছে, কারণ স্বাধীন ইচ্ছা—

এভাবে তর্ক-বিতর্কে তারা বোরডোয় এসে পেঁাছলো।

ক্যানডিডের বাকি অভিযাত্রার অনুসরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়— তাতে আছে মধ্যযুগীয় শাস্ত্র আর লিব্‌নিটজীয় আশাবাদের এক হাস্য মুখর সরস বর্ণনা। বহু মানুষের হাতে বহু রকমের দুর্ভোগের পর অবশেষে ক্যানডিডে তুরস্কে এসে চাষী হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন আর গুরু-শিষ্যের শেষ কথোপকথনে গল্পেরও শেষ ঘোষিত হলো:

প্যানগ্লস্ একবার ক্যানডিডেকে বল্লেন: "এ সম্ভাব্য সর্বোত্তম বিশ্বে ঘটনার একটা সুশৃঙ্খল পরম্পরা আছে: কারণ যদি অমন চমৎকার প্রাসাদ থেকে তুমি বিতাড়িত না হতে......যদি তোমাকে যাজকদের ধর্মীয় বিচারের পাল্লায় পড়তে না হতো। যদি তুমি আমেরিকা ঘুরে না আসতে......যদি তোমার সব সোনা তুমি না হারাতে......তা হলে এখানে বসে তুমিও এ সংরক্ষিত কমলা আর মিষ্টি বাদাম খেতে পারতে না।"

উত্তরে ক্যানডিডে শুধু বল্লে: "এ সবই ভালো কিন্তু চলুন আমরা আমাদের বাগান কর্ষণ করতে থাকি।"

ছঃ বিশ্বকোষ ও দার্শনিক অভিধান

[The Encyclopedia and the Philosophic Dictionary]

ক্যান্‌ডিডের মতো এমন এক 'ভক্তিহীন' বইয়ের জনপ্রিয়তা থেকে আমরা ঐ যুগের মনের গতি সম্বন্ধে একটা ধারণায় পেঁাছতে পারি। চতুর্দশ লুইর শাহী সংস্কৃতির এক বড় অংশ ছিল মোটা মোটা ধর্মযাজকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখর সব বক্তৃতা—এ সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু অনড় ধর্ম-বিশ্বাস আর ঐতিহ্য সম্বন্ধে হাসতে শিখেছে। সংস্কার আন্দোলন (Reformation) ফ্রান্সে কিছুমাত্র দানা বাঁধতে পারেনি—ফলে 'অভ্রান্ততা' আর 'কাফেরি'র মাঝখানে ফরাসীদের সামনে আর কোন অর্ধ পথই ছিল না। যখন জার্মেন্ আর ইংরেজ মননসীলতা ধর্মীয় বিবর্তনের পথে মন্থর গতিতে এগুচ্ছিল তখন ফরাসী মন উষ্ণ ধর্ম বিশ্বাস থেকে, যে ধর্ম বিশ্বাস হুগনট্‌দের (Huguenots) বিনাশের কারণ—লাফ দিয়ে পড়ল এক শীতল বিরুদ্ধতায়—আর এ বিরুদ্ধতাকে প্রয়োগ করল পিতৃ-পুরুষের ধর্মের বিরুদ্ধে লা মেট্রি (La Metri) হেলভেটিয়াস্ (Helvetius), হল্‌ব্যক (Halback) আর দিদারো (Didarot)। যে মননশীলতা আর মানসিক আবহাওয়া ও পরিবেশে ভল্টেয়ারের শেষ জীবন কেটেছে এখন তার দিকে একবার ফিরে দেখা যাক।

লা মেট্রি (১৭০৯—৫১) ছিলেন এক সামরিক ডাক্তার, 'আত্মার প্রাকৃতিক ইতিহাস' (National History of the Soul) নামক এক বই লেখার ফলে চাকুরি থেকে হন বরখাস্ত আর 'মানুষ এক যন্ত্র বিশেষ' (Man or Machine) বই লেখায় দেশ থেকে হন নির্বাসিত। আশ্রয় নিলেন ফ্রেডেরিকের দরবারে—চিন্তার ক্ষেত্রে ফ্রেডেরিক নিজেও ছিলেন কিছুটা কালের অগ্রবর্তী আর তাঁর বাসনা ছিল একবারে সর্বাধুনিক প্যারী-সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি হবেন পরিচিত। আঙুলে ছেঁকা লাগলে বালক যেমন কোন কিছু ছেড়ে দেয়, ডেসকার্টিস্ ও (Descartes তেমনি যন্ত্র-সম্বন্ধীয় আলোচনা যেখানে অকস্মাৎ ছেড়ে দিয়েছিলেন লা মেট্রি সেখানে থেকেই ফের শুরু করলেন গবেষণা আর নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন—সারা বিশ্ব, মানুষসহ, একটি যন্ত্রমাত্র, আত্মা ও পদার্থ আর পদার্থ ও আত্মাময়। তারা যাইহোক, একে অপরের উপর প্রতিক্রিয়া করে থাকে আর যেভাবে তারা একে অপরের সঙ্গে বেড়ে ওঠে আর ক্ষয় পায় তাতে তারা পরস্পর যে মূলতঃ সমান আর একে অপরের উপর নির্ভর-শীল এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। যদি আত্মা অশরীরী কোন শক্তি হতো তা হলে উৎসাহ-উদ্দীপনায় শরীর উষ্ণ হয়ে কেন ওঠে? আর দেহে জ্বর এলে মনের ক্রিয়ায়ও ঘটে কেন ব্যাঘাত? এক মূল বীজাণু থেকেই সব দেহের উৎপত্তি—উৎপত্তি হয়েছে দেহ আর পরিবেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে। প্রাণীর বুদ্ধি আছে আর উদ্ভিদের তা নেই—তার কারণ প্রাণীকে খাদ্যের জন্য ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে হয় আর উদ্ভিদেরা স্থির থেকে যা পায় তাই করে গ্রহণ। মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান হওয়ার কারণ মানুষের অভাব সবচেয়ে বেশী আর তার গতিশীলতার পরিধিও ব্যাপক—"যে সব প্রাণীর অভাব নেই, তাদের মনও নেই।"

যদিও এসব মতামতের জন্যই লা মেট্রিকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল তবুও হেলভেটিয়াস (১৭১৫—৭১) তাঁর মানুসের সম্বন্ধে (on Man) বইটি এর উপর ভিত্তি করেই রচনা করেন আর হয়ে ওঠেন ফ্রান্সের প্রধানতম ধনীদের একজন—চড়ে বসেন সম্মান ও প্রতিপত্তির উচ্চাসনে। লা মেট্রির কাছ থেকে যেমন আমরা পেয়েছি পরা-বিজ্ঞান তেমনি এঁর কাছ থেকে পেলাম নাস্তিকের নীতি-কথা। অহংবোধ তথা আত্ম-প্রেমের দ্বারাই হয় সব কাজ পরিচালিত—"এমন কি বীরপুরুষও এমন সব অনু-ভূতির অনুসরণ করে যার সঙ্গে তাঁর বৃহত্তম সুখের রয়েছে সহযোগ" আর গুণ মানে ও দূরবীণ দিয়ে দেখা অহংবোধ মাত্র।" বিবেক ঈশ্বরের বাণী নয় বরং পুলিস-ভীতি—আমাদের বিকাশোন্মুখ মনে পিতামাতার, শিক্ষকের আর পত্র-পত্রিকার যতসব নিষেধাজ্ঞার ঐ যেন এক জমা-মাল। ধর্ম-শাস্ত্রের উপর নীতির প্রতিষ্ঠা না হয়ে তার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত সমাজ-বিজ্ঞানের উপর। অনড় ও অপরিবর্তনীয় ঐশীবাণী বা ধর্ম-বিশ্বাস নয় বরং সমাজের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনই নির্ধারণ করবে ভালো মন্দের স্বরূপ।

এ দলের সর্বপ্রধান হচ্ছেন ডেনিস দিদারো (১৭১৩—৮৪)। তাঁর নিজের বহু বিক্ষিপ্ত রচনায় আর ব্যরণ দ' হলবাক (Baron d' Holbach) —1723-89) রচিত 'প্রকৃতির পদ্ধতি'তে (System of Nature) তাঁর চিন্তা ও মতামত পেয়েছে প্রকাশ—হলবাকের বৈঠকখানাই ছিল দিদারো দলের আডডা। হলবাকের মন্তব্য: "আমরা যদি একেবারে সূচনায় ফিরে যাই তা হলে দেখতে পাবো অজ্ঞতা আর ভীতিই দেবতা-সৃষ্টির মূল, কল্পনা, অতি উৎসাহ আর ছলনাই, তাদেরে অলঙ্কৃত করেছে অথবা করেছে বিকৃত, দুর্বলতার বশেই করা হয় তাদের উপাসনা, এরা বেঁচে থাকে মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতার ফলে, আচারের দ্বারা এদেরে সম্মানিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর নির্যাতনের দ্বারা এদেরে রক্ষা করা হয় স্রেফ মানুষের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য।" দিদারো বলেছেন স্বৈরতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের রয়েছে সম্পর্ক—দু'য়েরই উত্থান-পতন ঘটে একই সঙ্গে—"এবং মানুষ কখনো মুক্ত হতে পারবে না যতদিন না শেষ পুরোহিতের নাড়ীভূড়ির সঙ্গে শেষ রাজাকেও না মারা হয় গলা টিপে।" স্বর্গ যখন ধ্বংস হবে একমাত্র তখনই পৃথিবী আপন স্বরূপে পারবে ফিরে আসতে। বিশ্বের জন্য বস্তুবাদ হয়তো অতিমাত্রায় সরলীকরণ—জীবনের সঙ্গে সব পদার্থেরই হয়তো এক স্বভাব-সম্বন্ধ রয়েছে আর চৈতন্যের ঐক্য-বোধকে পদার্থ আর গতিতে নিয়ে আসা হয়ত অসম্ভব কিন্তু গির্জার বিরুদ্ধে এক প্রধান হাতিয়ার যে বস্তুবাদ তা স্বীকার করতেই হবে আর উৎকৃষ্টতর অন্য কোন উপায় খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এটাকে করতে হবে প্রয়োগ। ইত্যবসরে প্রচার করতে হবে জ্ঞান আর উৎসাহ দিতে হবে শিল্পকে—শিল্প নিয়ে আসবে শান্তি আর জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করবে এক নতুন ও স্বাভাবিক নীতিবোধ। এসব ভাব ও মতামতই প্রচার করেছেন অক্লান্তভাবে দিদারো আর দ' এলেমবার্ট বিরাট এক বিশ্বকোষের মাধ্যমে—যে বিশ্বকোষ ১৭৫২ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে হয়েছে প্রকাশিত। গির্জা প্রথম খণ্ডটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করাতে সক্ষম হয়েছিল। আর বিরুদ্ধতার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দিদারো সহযোগিরাও তাঁকে গেলেন ছেড়ে। কিন্তু ক্রুদ্ধ মনেই তিনি করে যেতে লাগলেন তাঁর কাজ উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন কর্ম-প্রেরণার এক অদৃশ্য আগুনে। বল্লেন: "যুক্তির বিরুদ্ধে শাস্ত্রবিদদের অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বাগাড়ম্বরের চেয়ে রুচিহীন এমন আর কিছুই আমার জানা নেই। তাঁদের কথা শুনলে মনে হয় খ্রীস্টধর্মের বুকে ঢুকতে হলে গরু-ঘোড়ার দল যেমন গোয়ালে-আস্তাবলে ঢোকে তেমনভাবে ঢুকতে হবে।" পেইনের (Paine) ভাষায় ঐ ছিল যুক্তি-চর্চার যুগ—সব সত্য ও মঙ্গলের একমাত্র পরীক্ষা ক্ষেত্র যে মানুষের বুদ্ধি ও মনন এ বিষয়ে এঁদের মনে তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না। এঁদের মতে যুক্তি যদি বন্ধনমুক্ত হয় তা হলে কয়েক প্রজননের (generation) মধ্যেই তা যূটোপিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে সক্ষম। দিদারোর মনে এ সন্দেহ কোনদিন জাগেনি যে, যে প্রেম-বাতিক আর স্নায়ু-রোগী জাঁ জেকুয়েস্ রুশোকে (১৭১২—১৭৭৮) তিনিই প্যারীতে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে রুশোই তাঁর মাথায় আর মনে তাঁদের যুক্তির শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বীজ বহন করছে—যে বিপ্লব ইমানুয়েল কান্টের অস্পষ্ট ভাবাবেগ সজ্জিত হয়ে অনতিবিলম্বে দখল করে বসবে দর্শনের প্রতিটি দূর্গ।

ভল্টেয়ার ছিলেন সব ব্যাপারে কৌতুহলী আর সব সংগ্রামের পেছনে ছিল তাঁর হাত—স্বভাবতই এ হেন ভল্টেয়ার কিছুকালের জন্য জড়িয়ে পড়লেন বিশ্বকোষ উৎসাহীদের দলে। তাঁরাও সানন্দে তাঁকে নেতা বলে করতে লাগলেন অভিহিত তিনি যদিও ওদের ধূপ-ধূনার প্রতি তেমন বিরূপ ছিলেন না কিন্তু মনে করতেন ওদের কোন কোন মতামতের ছাটাইয়ের প্রয়োজন। তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁদের বিশ্বকোষের জন্য কিছু প্রবন্ধ লিখে দিতে। তিনি সাগ্রহে সম্মত হয়ে অতি দ্রুত প্রচুর প্রবন্ধ লিখে দেওয়ায় ওরা খুব খুশী হলেন তাঁর উপর। ওঁদের ফরমাইশী লেখা শেষ করে তিনি নিজেই এবার একটা বিশ্বকোষ রচনার সঙ্কল্প করলেন—আর তার নাম দিলেন 'দার্শনিক অভিধান' (Philosophic Dictionary)—এক অপূর্ব দুঃসাহসের সঙ্গে বর্ণানুক্রমে তিনি লিখতে লাগলেন বিষয়ের পর বিষয় নিয়ে। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান আর বিজ্ঞতা যেন ঢেলে দিতে লাগলেন প্রতিটি শিরোনামার বিষয় বস্তুতে। ভাবতে অবাক লাগে একটা লোক সবকিছু সম্বন্ধেই লিখছেন—আর লিখছেন একটা উন্নতমান বজায় রেখে। গল্প-কাহিনীর বাইরে এ হচ্ছে ভল্টেয়ারের সব চেয়ে সুখপাঠ্য আর সব চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত রচনা। প্রতিটি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ততা, স্বচ্ছতা আর কৌতুকের যেন আদর্শ। রবার্টসন বলেছেন: "কেউ কেউ ক্ষুদ্র এক খণ্ড রচনায়ও যথেষ্ট বাক্-বিস্তার করতে সক্ষম কিন্তু ভল্টেয়ার শত খণ্ড রচনায় ও সংক্ষিপ্ত।" এ গ্রন্থেই ভল্টেয়ার প্রমাণ করেছেন সত্য সত্যই তিনি একজন দার্শনিক।

বেকন, ডেস্‌কার্টেস্‌, লকে ও অন্যান্য আধুনিকদের মতো তিনিও সন্দেহ (সম্ভবত্) আর এক পরিষ্কার স্লেট নিয়েই শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন: "আমি দিদিমাসের সেন্ট থোমাসকেই (St. Thomas of Didynus) আমার পৃষ্ঠপোষক করেছি—তিনিও সব কিছু নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখার জন্য জিদ্ করতেন।" তাঁকে সন্দেহ করার কৌশল শিখিয়েছেন বলে তিনি বেইলিকে (Bayle) ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সব পদ্ধতিই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন আর সন্দিগ্ধ মনে বলতেন

১৯—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দর্শনের সব সম্প্রদায়ের সব নেতাই অল্প-বিস্তর হাতুড়ে (quack)"। অন্যত্র বলেছেন: "যতই আমি এগুই (দর্শনের পথে) ততই আমার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে মেয়েদের পক্ষে যেমন উপন্যাস তেমনি দার্শনিকদের পক্ষে পরা-বিজ্ঞান প্রণালী। সুনিশ্চিত হওয়া ভণ্ড আর হাতুড়েদের পক্ষেই সম্ভব। বিশ্বের প্রাথমিক সূত্রগুলির সম্বন্ধেইত আমরা অজ্ঞ। ঈশ্বর, ফেরেস্তা, মন ইত্যাদির সংজ্ঞা দিতে যাওয়া সত্যই বাড়াবাড়ি—নিজের খেয়াল খুশী মতো আমরা আমাদের বাহু দুটি কেন নাড়ি তাই যেখানে বলতে অক্ষম সেখানে ঈশ্বর কেন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সঠিক-ভাবে তা বলা কি সম্ভব? সন্দেহ খুব তৃপ্তিকর নয় বটে কিন্তু সুনিশ্চয়তা ও হাস্যাস্পদ। আমি জানি না কিভাবে আমাকে বানানো হয়েছে আর কিভাবে হয়েছে আমার জন্ম। আমার জীবনের এক চতুর্থাংশ ধরে আমি জানতামই না কেন এবং কি কারণে আমি দেখতে পাই অথবা শুনতে পাই অথবা পারি অনুভব করতে......যাকে পদার্থ বলা হয় তা আমি দেখেছি সেভাবে দেখেছি লুব্ধক (Sivius) গ্রহকে আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অনুভূত ক্ষুদ্রতম জীবাণুকেও........তবুও আমি জানি না পদার্থ কি।"

তিনি এক "সৎ ব্রাহ্মণের" গল্প বলেছেন, এ ব্রাহ্মণ সব সময় বলতো: "আমার জন্ম না হলেই ভালো হতো"।

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "কেন ওরকম বলছেন?"

ব্রাহ্মণ উত্তরে বল্লেন: "এ চল্লিশ বছর ধরে আমি শুধু অধ্যয়নই করেছি এখন দেখতে পাচ্ছি এ দীর্ঘকাল আমার অনর্থক নষ্ট হয়েছে...... আমার বিশ্বাস আমি পদার্থের তৈয়রী কিন্তু চিন্তার কি করে উৎপত্তি হয় তা আমি আজও আমার মনকে পারিনি বুঝাতে। আমার বোধ শক্তিটা ঠিক হাঁটা অথবা হজম করার মতো এক সহজ প্রক্রিয়া কি না সে সম্বন্ধেও আমি আজো অজ্ঞ অথবা হাত দিয়ে যেমন আমি কোন একটা জিনিস ধরি চিন্তাটাও কি আমার মাথার সাহায্যে সেভাবেই করে থাকি........আমি বক্ বক্ করে অনেক কথাই বলি কিন্তু কথা শেষ হওয়ার পর আমি প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি আর এতক্ষণ ধরে যা বলেছি তার জন্য বোধ করতে থাকি লজ্জা।"

সেদিনই তাঁর প্রতিবেশী এক বৃদ্ধার সঙ্গে আমার আলাপ। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার আত্মাটা কিভাবে তৈয়রী হয়েছে তা না জেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কি খুব অস্বস্তি বোধ কর? সে আমার প্রশ্নটাই যেন বুঝতে পারলো না। যে সব বিষয় নিয়ে সৎ ব্রাহ্মণটি এতকাল ধরে নিজেকে কষ্ট দিয়ে এসেছে, সারাজীবন মুহূর্তের জন্যও বুড়ি সে সম্বন্ধে এতটুকুও ভাবেনি। সে তার অন্তরের অন্তস্থলে বিষ্ণুর রূপান্তরে তথা অবতাররূপ গ্রহণে বিশ্বাস করে যদি গঙ্গার পবিত্র জলে একবার স্নানের সুযোগ পায় তা হলে সে নিজেকে মনে করবে সবচেয়ে সুখী মেয়ে মানুষ। এ দরিদ্র মেয়েটির সুখের কথায় মুগ্ধ হয়ে আমি আমার সে দার্শনিকটির কাছে ফিরে এসে বল্লাম:

"এমন শোচনীয় জীবনযাপন করতে তোমার কি লজ্জা হয় না তখন তোমার থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে একটা বৃদ্ধা কোন বিষয়েই কিছুমাত্র ভাবনা-চিন্তা না করে সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন কাটাচ্ছে?"

তিনি উত্তরে বল্লেন: "তোমার কথা সত্য। আমি আমার মনকে অন্তত হাজার বার বলেছি আমার বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর মত আমিও যদি অজ্ঞ হয়ে থাকি তা হলে আমিও সুখী হতে পারি কিন্তু ঐ রকম সুখে আমার মন সুখী হতে চায় না।"

ব্রাহ্মণের এ উত্তর আমার মনের উপর যেভাবে দাগ কাটলো এর আগে অন্য কিছুই অনুরূপ দাগ কাটতে পারেনি।

যদি মন্টেইনির (Montaigne) "আমি কি জানি?" এ সার্বিক সন্দেহেও দর্শনের সমাপ্তি ঘটে তা হলেও এ যে মানুষের এক সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিযাত্রা তা মানতেই হবে। আমাদের মিথ্যা কল্পনার সাহায্যে চিরকাল ধরে নিত্য নতুন পদ্ধতি বয়নের চেয়ে বরং জ্ঞানের ক্ষেত্রে সামান্যতর অগ্রগতিতেও সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন:

"নতুন নতুন নীতি আবিষ্কার করে তা দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে যাওয়া উচিত নয় বরং উচিত আগে পদার্থের সঠিক বিশ্লেষণ করে নিয়ে তা নীতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কিনা নম্র-চিত্তে তাই যাচাই করা......বিজ্ঞানের কোন্ পথ অনুসরণ করা উচিত তা বেকন দেখিয়ে গেছেন......কিন্তু ডেস-কার্টেস এসে ছিলেন এক বিপরীত পথে: প্রকৃতিকে অধ্যয়নের পরিবর্তে তিনি তাকে করে তুলতে চাইলেন ঐশ্বরিক........এ শ্রেষ্ঠতম গণিতজ্ঞ দর্শন নিয়ে রচনা করেছেন উপাখ্যান।......হিসেব করার, ওজন করে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেপে দেখার আর পর্যবেক্ষণের শক্তি আমাদের দেওয়া হয়েছে আর এ করেই গড়ে ওঠে স্বাভাবিক দর্শন—এ ছাড়া আর প্রায় সবই মিথ্যা কল্পনা।"

জ. পাপকে ধ্বংস করো (Ecrasez L. infamea)

সাধারণ অবস্থায় ভল্টেয়ার হয়তো তাঁর এ ভদ্র সংশয়বাদের দার্শনিক শান্তি ছেড়ে শেষ বয়সে কখনো কঠিন বাদানুবাদে হতেন না লিপ্ত। যে অভিজাত-চক্রে তিনি ঘুরে বেড়াতেন তারা এমন সহজে তাঁর মতামত মেনে নিতো যে তাতে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মতো কোন উৎসাহই যেতো না পাওয়া। এমনকি পুরোহিতরাও ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে যে অসুবিধায় পড়তে হয় তা নিয়ে ভল্টেয়ারের সঙ্গে বসে করতেন হাসাহাসি কার্ডিনেলরা ত ভাবতেন হয়তো অবশেষে তাঁরা তাঁকে একজন সৎ সন্ন্যাসী করেই গড়ে তুলতে পারবেন। কি সব ঘটনার ফলে তিনি ছিলেন এতকাল অজ্ঞেয়বাদের এক ভদ্র ব্যঙ্গ-রসিক তিনি হঠাৎ হয়ে পড়লেন এমন কঠোর আর আপোষহীন যাজকবিরোধী—আর শুরু করলেন যাজক শ্রেণীর পাপকে ধ্বংস করার এক অবিরাম সংগ্রাম?

ফার্ণের অদূরেই ফ্রান্সের সপ্তম নগরী টুলুস্ (Toulous)—ভল্টেয়ারের সময় ঐখানে ছিল ক্যাথলিক পাদ্রীদের সার্বভৌম প্রভুত্ব। নেন্‌টেস্ অনুজ্ঞা (Edict of Nature–এ অনুজ্ঞার দ্বারা প্রোটেস্‌টেন্টদের দেওয়া হয়েছিল উপাসনার স্বাধীনতা) বাতিলকরণকে ঐ নগরে প্রাচীর-চিত্রের দ্বারা করে রাখা হয়েছে স্মরণীয় আর ওখানে ভোজোৎসবের দ্বারা পালিত হতো সেন্ট্ বার্থালগিয়ো হত্যা-দিবস। টুলুসে কোন প্রোটেস্‌টান্টকেই দেওয়া হতো না উকিল কি ডাক্তার হতে, দেওয়া হতো না ঔষধ বিক্রেতা কি ঔষধ প্রস্তুত কারক হতে, মুদি হতে, পুস্তক বিক্রেতা হতে এমনকি মুদ্রাকর হতেও। ক্যাথলিকরা রাখতে পারতো না কোন প্রাটেস্‌টান্ট চাকর কি কেরাণী। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রোটেস্‌টান্ট ধাত্রী নিয়োগ করেছিল বলে এক মহিলাকে জরিমানা করা হয়েছিল তিন হাজার ফ্রাঙ্ক।

জাঁ কেলাস (Jean Calas) নামে টুলুসের এক প্রোটেস্‌টান্টের ছিল এক মেয়ে আর এক ছেলে—মেয়েটি হয়ে গেলো ক্যাথলিক আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি করল আত্মহত্যা। ছেলেটির আত্মহত্যার কারণ মনে হয় ব্যবসায়ে অকৃতকার্যতা। টুলুসের এক আইনানুসারে প্রত্যেকটি আত্ম-হন্তার দেহ উলঙ্গ অবস্থায় একটা তক্তার উপর উপুড় করে রেখে রাস্তায় রাস্তায় টেনে পরে ঝুলানো হতো ফাঁসিকাষ্ঠে। এ নির্মম দৃশ্য এড়াবার জন্যই বোধ করি পিতা আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের এটা যে স্বাভাবিক মৃত্যু তার সাফাই দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। ফলে গুজব রটে পড়লো ছেলে যাতে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিতে না পারে সেজন্য পিতাই পুত্রকে করেছে হত্যা। কেলাসকে গ্রেফতার করে তার উপর এমন নির্যাতন চালানো হলো যে অল্পদিনেই সে গেলো মারা (১৭৬১)। এভাবে তার পরিবার ধ্বংস ও নির্যাতিত হয়ে, অসহায় শিকারের মতো তাড়িত হয়ে অবশেষে ফার্নেতে (Ferney) পালিয়ে গিয়ে করল ভল্টেয়ারের সাহায্য প্রার্থনা। তিনি তাদেরকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন—আর তাদের মুখে এমন মধ্যযুগীয় নির্যাতনের কাহিনী শুনে বিস্ময়ে হয়ে গেলেন হতবাক।

এ সময় (১৭৬২) এলিজাবেথ সার্ভেন্সের (Elizabeth Sirvens) মৃত্যু ঘটে—আবার গুজব রটানো হলো তিনি ক্যাথলিকধর্ম গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন বলেই তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে কূয়ায়। এক ভীরু সংখ্যা-লঘু প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় এমন কাজ করতে সাহস করবে তা যুক্তি বিবেচনার বাইরে—তাই এ গুজবের পরিণতি গড়াতে পারলো না বেশী দূর। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে লা বারে (La Bare) নামক ষোল বছরের এক বালককে ক্রুশ মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগে করা হলো গ্রেপ্তার। নির্যাতনের ফলে সে স্বীকার করলো দোষ। ছেদন করা হলো তার মস্তক আর তার দেহটা নিক্ষিপ্ত হলো আগুনে—এ দৃশ্য দেখে উল্লসিত হলো দর্শকরা। বালকটির দেহে পাওয়া গিয়েছিল ভল্টেয়ারের 'দার্শনিক অভিধানের' একটা কপি ওর দেহের সঙ্গে সেটাকেও হলো পোড়ানো।

জীবনে এ প্রথম বারের মতো ভল্টেয়ার হয়ে গেলেন পুরোপুরি গম্ভীর। যখন দ' এলেমবার্ট (d' Alembert) তাঁকে জানালেন রাষ্ট্র, গীর্জা আর মানুষের উপর সমানে বিরক্ত হয়ে তিনি এখন থেকে সব কিছুকেই শুধু ব্যঙ্গ করে যাবেন তখন ভল্টেয়ার উত্তরে তাঁকে বলে-ছিলেন: "এখন কৌতুক করার সময় নয়, ব্যাপক হত্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতুক হাস্য খাপ খায় না........এ কি দর্শন আর আনন্দের দেশ? বরং এ হচ্ছে সেন্ট বার্থালমিয়ো নিধনের দেশ।" ডেরিফাস্ (Deryfus) ঘটনার সময় জোলা আর আনাতোল ফ্রান্সের যে অবস্থা হয়েছিল এখন ভল্টেয়ারেরও সে দশা—নির্যাতন-অবিচার তাঁকে উর্ধ্বে তুলে ধরলো। এখন তিনি আর শুধু লেখক আর রইলেন না। হয়ে উঠলেন কর্মের মানুষ। সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এবার এক পাশে সরিয়ে রাখলেন দর্শন অথবা বলা যায় তাঁর দর্শনকে এবার তিনি পরিণত করলেন অফুরন্ত ডিনেমাইটে। তিনি নিজেই বলেছেন: "এ সময় আমার ঠোঁটে একটু মৃদু হাসি দেখা দিলে ও আমি এ অপরাধের জন্য নিজেকে তিরস্কার না করে ছাড়িনে।" এবার তিনি গ্রহণ করলেন তাঁর সুবিখ্যাত মটো—"পাপকে ধ্বংস করো।" আর এখন থেকে গীর্জার দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে ফরাসী-আত্মাকে করে তুল্লেন আলোড়িত। বুদ্ধি আর মেধার এমন আগুন আর বারুদ ছড়াতে লাগলেন যে তাতে রাজদণ্ড আর রাজমুকুট গেল গলে, ফ্রান্সে যাজক-শক্তি পড়লো ভেঙ্গে, একটি সিংহাসনের হলো পতন। তিনি তাঁর বন্ধু আর অনুবর্তীদের আহ্বান জানালেন—জারি করলেন যুদ্ধের পরোয়ানা: "এসো দুঃসাহসী দিদারো, এসো নির্ভীক দ' এলেমবার্ট, কর পরস্পর সহযোগিতা......ধর্মান্ধ আর প্রতারকদের নিক্ষেপ কর জলে, ধ্বংস কর যতসব প্রাণহীন বাগাড়ম্বর, হীন কুতর্ক আর মিথ্যা ইতিহাস........ সংখ্যাতীত যত সব অসঙ্গত আর স্ববিরোধিতা। বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিহীনদের দ্বারা শাসিত আর চালিত হতে দিয়ো না—যারা এযুগে জন্মগ্রহণ করেছে তারা যুক্তি আর স্বাধীনতার জন্য আমাদের কাছে থাকবে ঋণী।"

ঠিক এ সময় তাঁকে দলে ভিড়াবার একটা চেষ্টা হলো: ম্যাডাম দে পম্পাডোর মারফৎ গীর্জার সঙ্গে আপোষের পুরস্কার স্বরূপ এসময় তাঁর কাছে এক কার্ডেনেলের একটি টুপি পাঠানো হলো যিনি মননশীল জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট তাঁকে কি করে কয়েকটি বদ্ধমুখপাদ্রীর শাসন কৌতূহলী করে তুলতে পারে? অতএব ভল্টেয়ার তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন আর এখন থেকে কেটোর (Cato) মতো তাঁর প্রত্যেকটি চিঠি—"পাপকে ধ্বংস করো" এ কথা দিয়ে করতে লাগলেন শেষ। তাঁর "সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ" প্রচার করতে লাগলেন এবার। জানালেন পাদ্রীরা যদি তাঁরা যে ধর্মোপদেশ দিয়ে থাকেন সেভাবে যদি নিজেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আটকে রাখবেন তিনি স্বয়ং ভল্টেয়ারের বুদ্ধি দেখে হয়ে গেলেন মুগ্ধ আর আমাদের তরুণ বুদ্ধিজীবীটিকে অচিরে দিলেন পুরোপুরি স্বাধীনতা। অবস্থা জানতে পেরে পিতা এবার তাঁকে দিলেন নির্বাসন, পাঠিয়ে দিলেন হেগে (The Hague) ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে—বলে দিলেন এ মাথা-পাগলা ছেলেটির উপর কড়া নজর রাখতে। ওখানে গিয়েই ফ্রাঙ্কয় কিন্তু পড়ে গেলেন এক তরুণী মহিলার প্রেমে—উভয়ে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগলেন ঘন ঘন। আর উক্ত মহিলাকে তিনি লিখতে লাগলেন খুব আবেগ-বিগলিত চিঠি যা সব সময় শেষ করতেন এ একই পাঠ দিয়ে: 'নিশ্চয়ই তোমাকে চিরকাল ভালোবাসবো।' কিন্তু ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল অল্পদিনে আর তাঁকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বাড়ী। তিনি তাঁর উক্ত প্রণয়িনীকে (যার নাম ছিল Primpette) কয়েক সপ্তাহ পর্যন্তই শুধু রেখেছিলেন মনে।

১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে একুশ বছরের সাবালকত্বের অহঙ্কার নিয়ে তিনি যখন প্যারীতে এলেন তখন সবেমাত্র চতুর্দশ লুইর মৃত্যু ঘটেছে। পরবর্তী লুই এত অল্পবয়স্ক ছিলেন যে তাঁর পক্ষে ফ্রান্স শাসন করা সম্ভব ছিল না, প্যারী শাসন করা তো আরো অসম্ভব। কাজেই ক্ষমতা রিজেন্টের হাতেই হলো অর্পিত। মধ্যবর্তী এ শাসনকালে বিশ্ব-রাজধানী প্যারীতে যেন ফূর্তির দাঙ্গাই শুরু হয়ে গেলো আর তরুণ এরায়েট্ও (অর্থাৎ ভল্টেয়ার) অচিরে তাতে হয়ে পড়লেন শরীক। বুদ্ধিদীপ্ত বে-পরওয়া তরুণ বলে তাঁর নামও ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। খরচ কমাবার জন্য যখন রিজেন্ট রাজ-আস্তাবলের অর্ধেক ঘোড়াই বিক্রি করে দিলেন তখন ফ্রাঙ্কয় মন্তব্য করেছিলেন—রাজ-সভার অর্ধেক গর্দভকে বরখাস্ত করলেই অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হতো। অবশেষে এমন হলো যে প্যারীতে যা কিছু চতুর আর দুষ্ট কানাঘুষা হতো তার সবকিছুর জনক তাঁকেই মনে করা হতে লাগলো। তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে এ সময় রিজেন্ট বে-আইনীভাবে সিংহাসন দখল করতে চায় এমন এক অভিযোগ করে কে বা কারা দু'টি কবিতা লিখে বসেছিল আর তাঁকেই এ দু'টি কবিতার লেখক বলে মনে করা হলো। রিজেন্ট রাগে ফেটে পড়লেন। একদিন পার্কে দেখা হতেই ক্রুদ্ধ রিজেন্ট বল্লেন: "মিঃ এরায়েট, আমি বাজি রেখে বলছি আপনাকে আমি এমন জিনিস দেখাবো যা ইতিপূর্বে আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো দেখেননি।" "সেটা কি?" বিস্মিত ভল্টেয়ার জানতে চাইলেন।

উত্তর হলো : বেস্টিলের অভ্যন্তর', (বেস্টিল্ ফ্রান্সের বিখ্যাত কারাগার) পরদিন, ১৭১৭-এর ১৬ই এপ্রিল এরাওয়েট সত্য সত্যই তা দেখতে পেলেন।

বেস্টিলে (Bastille) থাকতেই, এক অজ্ঞাত কারণে তিনি 'ভল্টেয়ার' এ ছদ্মনাম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই অবশেষে ও আন্তরিকভাবে তিনি হয়ে পড়লেন কবি। জেলে একাদশ মাসপূর্ণ না হতেই তিনি এক দীর্ঘ মহাকাব্য লিখে ফেল্লেন আর তাকে কিছুতেই খুব নিম্নমানের রচনা বলা যায় না। নেভারের হেনরির (Henry of Navarre) কাহিনী নিয়েই ওঠা লেখা আর ঐ কাব্যের নাম দিয়েছেন তিনি হেনরিয়াডে (Henriade)। এখন রিজেন্ট বোধ হয় বুঝতে পারলেন যে তিনি এক নিরপরাধ লোককেই কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন— কাজেই ভল্টেয়ারকে ছেড়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য মঞ্জুর করলেন রাষ্ট্রীয় ভাতা। তাঁর জীবিকার ভার নেওয়ায় ভল্টেয়ার এবার রিজেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখলেন আর অনুমতি চাইলেন এখন থেকে তিনিই যেন পারেন নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজে করতে।

এবার যেন তিনি এক লাফেই পৌঁছে গেলেন কারাগার থেকে রঙ্গ মঞ্চে। তাঁর বিয়োগান্ত নাটক ওয়েডিপে (OEdipe) প্রথম অভিনীত হয় ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে এবং একাক্রমে পঁয়তাল্লিশ রজনী অভিনীত হয়ে প্যারীর পূর্বতন সব রেকর্ডই ভঙ্গ করে। তাঁর বৃদ্ধ পিতা তাঁকে তিরস্কার করতেই এসেছিলেন কিন্তু থিয়েটারের একটা বক্সে বসে পুত্রের নাটকের প্রতি সাফল্যেই "বদমাইসটা, বদমাইসটা" বলে তিনি গজর গজর করেই সময় কাটিয়েছিলেন। কবি ফন্টেনেলির (fontenelle) সঙ্গে নাটকের শেষে যখন ভল্টেয়ারের দেখা হলো, তখন তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বল্লেন: "এ এক অত্যন্ত সার্থক ট্রেজেডি"। ভল্টেয়ার হেসে উত্তর দিয়েছিলেন : "আমাকে দেখছি আবার তোমার যাজক-কাব্য পড়তে হবে।" তরুণ ভল্টেয়ারের মেজাজ তখন সতর্ক হয়ে কথা বলার বা সৌজন্য দেখাবার মতো ছিল না। সে নাটকেই তো তিনি এসব বেপরওয়া উক্তি করেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সরল বিশ্বাসী জনসাধারণ যা মনে করে
আমাদের যাজকেরা কিন্তু তা নয়;
তাঁদের পাণ্ডিত্য মানে আমাদের বিশ্বাস প্রবণতা।"

আরেস্‌প (Araspe) নামক চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি জানিয়েছেন এ যুগান্তকারী আহ্বান :

"চলো আমরা আত্মবিশ্বাসে হই উদ্বুদ্ধ, দেখি সব নিজের চোখ দিয়ে ;
এ হোক আমাদের দৈববাণী, আমাদের বেদি আর আমাদের দেবতা।"

এ নাটক থেকে তিনি চার হাজার ফ্রাঙ্ক পেয়েছিলেন আর সাহিত্যিকের সম্বন্ধে যা কখনো শোনা যায়নি তেমন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এ টাকা তিনি খাটিয়েছিলেন। সব রোগ-শোকের মাঝখানে থেকেও প্রচুর রোজগার আর সে টাকা খাটানোর কৌশল তিনি বজায় রেখেছিলেন। 'দার্শনিকতা করার আগে বাঁচা চাই' এ সুপ্রাচীন প্রবাদ বাক্যের প্রতি তিনি কখনো শ্রদ্ধা হারাননি। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার সরকারী এক লটারির সব টিকেট কিনে নিয়ে প্রচুর টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন যদিও একারণে সরকার বেশ কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছিল তাঁর উপর। কিন্তু ধন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়েছিলেন মুক্ত হস্ত ও আর জীবনের অপরাহ্নের দিকে তিনি যতই অগ্রসর হচ্ছিলেন ততই তাঁর আশ্রিতের সংখ্যাও পাচ্ছিল বৃদ্ধি।

কলমের গ'ল সুলভ (Gallic) তীক্ষ্ণ চাতুর্যের সঙ্গে তার স্বভাবে য়ুহুদী-সুলভ অর্থনীতির সূক্ষ্ম-বুদ্ধিরও যোগাযোগ ঘটেছিল। তাঁর পরবর্তী নাটক আর্টেমায়ার কিন্তু (Artemire) নাটক হিসেবে সফল হলো না। এ অকৃতকার্যতার বেদনা ভল্টেয়ার তীব্রভাবে অনুভব করে-ছিলেন। প্রতি সাফল্য তাঁর পরবর্তী অকৃতকার্যতার দংশনকে করে তুলেছিল তীব্র। জনমতের প্রতি তিনি সব সময় অতিমাত্রায় ছিলেন সচেতন আর পশুদের প্রতি একারণে ঈর্ষাবোধ করতেন যে পশুরা জানে না তাদের সম্বন্ধে কে কি বলাবলী করছে। এমনি ভাগ্য নাটকের ব্যাপারে অকৃতকার্যতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঠোর বসন্ত রোগের হয়ে পড়লেন শিকার। ঔষধের বদলে এক শ' বিশ পাইন্ট লেমোনেড্‌ খেয়েই তিনি নিজেকে করে তুল্লেন নিরাময়। মৃত্যুর ছায়ালোক থেকে ফিরে এসেই তিনি দেখলেন তাঁর হেনরিয়েডে (Henriade) তাঁকে যশস্বী করে তুলেছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বেশ গর্বের সাথে বলতে লাগলেন কবিতাকে তিনি পরিণত করেছেন সখে তাঁর এ দাবী কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। সবাই এবার তাঁকে বরণ করে নিতে লাগলেন—সর্বত্র হতে লাগলেন তিনি সংবর্ধিত। অভিজাতেরাও তাঁকে তাঁদের দলে ভরতি করে নিয়ে রীতিমতো মার্জিত ভদ্রলোক করে তুল্লেন তাঁকে—হয়ে পড়লেন তিনি অতুলনীয় আলাপচারী আর অত্যুৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

আট বছর ধরে এভাবে অভিজাতদের বৈঠকখানার উষ্ণতা ভোগ করার পর ভাগ্য তাঁর প্রতি হলো বিমুখ। কয়েকজন অভিজাত হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন তাঁদের সমাজে আসন আর সম্মান পাওয়ার মতো এ তরুণের কোন পদ বা পদবী-ই নেই—স্রেফ প্রতিভা ছাড়া। তাঁর এ অকারণ খ্যাতি তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। এক অভিজাত-গৃহের ভোজ সভায় ভল্টেয়ার যখন নিজের হাসি, ঠাট্টা আর তীক্ষ্ণ রসিকতায় মুখর হয়ে উঠেছেন তখন কেভেলিয়ার দে রোহান (cheraliw De Rohan কিছুটা নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন: "এত, যে চীৎকার করে কথা বলছে ঐ তরুণটা কে?" ভল্টেয়ার নিজেই ত্বরিৎ উত্তর দিলেন: "জনাব, সে কোন বড় নামের পদবী বহন করে না কিন্তু নিজের নামেই সে সম্মানিত।" কেভেলিয়ারের কথার উত্তর দেওয়াই তো বেয়াদবি—উত্তর-হীন উত্তর দেওয়া তো রাজোদ্রোহের সামিল! মহামান্য লর্ড এবার ভল্টেয়ারকে ধরে রাত্রে মার লাগাবার জন্য কয়েকজন গুণ্ডা লাগালেন কিন্তু তাদেরে সাবধান করে দিয়ে বল্লেন: "ওর মাথায় কিন্তু আঘাত করো না, ওটা থেকে এখনো ভালো কিছু বের হতে পারে।" পরদিন ভল্টেয়ার থিয়েটারে এলেন মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে —রোহানের বক্সের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে করলেন আহ্বান। তার পর বাড়ী ফিরে গিয়ে সারা দিন ধরে তলোয়ারে দিতে লাগলেন শান। কিন্তু ভদ্রলোক কেভেলিয়ারের নেহাৎ একজন প্রতিভাবানের হাতে মরে এত তাড়াতাড়ি স্বর্গে বা অন্যত্র যাওয়ার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না তাই তিনি তাঁর খুড়তুতু ভাই পুলিসমন্ত্রীর কাছে তাঁকে বাঁচাবার জন্য জানালেন আবেদন। ভল্টেয়ারকে গ্রেপ্তার করা হলো—তিনি আবার প্রেরিত হলেন তাঁর পুরাতন বাসস্থান বেস্টিলে (Bastille)—আবার সুযোগ ফেলেন পৃথিবীকে ভিতর থেকে দেখার। তবে দেশ ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনযাপন করেন আর যদি বরদাস্ত করেন মত পার্থক্য তা হলে তিনি অনড় ধর্ম বিশ্বাসের (dogma) অসঙ্গতি সহ্য করতে রাজি আছেন। কিন্তু "যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের কোন চিহ্নও নেই• বাইবেলে, তা নিয়েই ঘটেছে খ্রীস্ট জগতের যত রক্তাক্ত সংগ্রাম। যে লোক আমাকে বলে—'আমি যেমন বিশ্বাস করি, তুমিও তেমনি বিশ্বাস করো, না হয় ঈশ্বর তোমাকে সোজা নরকে পাঠাবেন' সে লোক অবিলম্বে বলতে দ্বিধা করবে না : 'আমি যে রকম বিশ্বাস করি তুমিও সে রকম বিশ্বাস কর না হয় তোমাকে আমি হত্যা করব'। যে মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে সে মানুষকে কোন্ অধিকারে অন্য মানুষ তার মতো করে চিন্তা করার জন্য বাধ্য করতে পারে ও কুসংস্কার আর অজ্ঞতার সহযোগে যে গোঁড়ামী বা ধর্মান্ধতা গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে সব শতাব্দীরই এক ব্যাধি"। (ভল্টেয়ার) যে অবিচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছেন এবে দে সেন্ট পীরে (Able de st. Pierre) তা মানুষ যতদিন পরস্পরের দার্শনিক, রাজনৈতিক আর ধর্মীয় মত-পার্থক্য সহ্য করতে না শিখবে ততদিন তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। সব রকম অসহিষ্ণুতার মূল হচ্ছে যাজক-শক্তি—সামাজিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হবে এ শক্তির ধ্বংস সাধন।

AMARBOI.COM

'সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে প্রবন্ধের' পর এবার শুরু হলো প্রচার-পুস্তিকার নায়গ্রা-প্রপাত—ইতিহাস, কথোপকথন, চিঠি-পত্র, প্রশ্নোত্তরে উপদেশ, বাদানুবাদ, ব্যঙ্গ-কৌতুক, ধর্ম-বক্তৃতা, কবিতা, গল্প, উপকথা, ভাষ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি যত রকম লেখা সম্ভব ভল্টেয়ার স্বনামে আর শত রকম ছদ্ম নামে তা লিখে দেশকে যেন ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। রবার্টসনের ভাষায়—"একা একজন মানুষ প্রচারের (Propaganda) এমন একটা অভূতপূর্ব হুলস্থূল আর কখনো বাধায়নি।" দর্শন এত স্বচ্ছ ভাষায় আর এমন জীবন্তভাবে কখনো প্রকাশ পায়নি ইতিপূর্বে। ভল্টেয়ারের রচনাগুণে কেউ-ই বুঝতেই পারতো না যে তিনি দর্শন লিখছেন। নিজের সম্বন্ধে কিছুটা অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলেছেন : "আমি নিজেকে যথা-সম্ভব স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করে থাকি : আমি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মতো, স্রোতস্বতী যেমন বেশী গভীর নয় বলেই স্বচ্ছ আমিও তাই।" স্বচ্ছ ও সহজ বোধগম্য বলে তাঁর লেখা ব্যাপকভাবে হতো পঠিত—অনতিবিলম্বে সবাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কি পাদ্রীরাও তাঁর পুস্তক পুস্তিকা জোগাড় করতে লাগলেন। যদিও এখনকার তুলনায় তখন পাঠক সংখ্যা ছিল অনেক কম তবুও তাঁর কোন কোন পুস্তিকার তিন লক্ষ কপি পর্যন্ত হয়েছিল বিক্রয়—সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ব্যাপার আর কখনো যায়নি দেখা। তিনি একবার বলেছিলেন: "বৃহদাকার বই এখন বে-রেওয়াজ।" তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ধরে, অশ্রান্ত আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি তাঁর ক্ষুদে সৈন্যদের পাঠাতে লাগলেন সমরক্ষেত্রে, তাঁর চিন্তার উর্বরতা আর সত্তর বছরে মনের এমন বিপুল শক্তি দেখে সেদিন সারা বিশ্ব হয়েছিল বিস্ময়-বিমুগ্ধ। হেলভেটিয়াস (Helvetius) যেমন বলেছেন ভল্টেয়ার রেন রুবিকন (Rubicon—মধ্য ইটালির নদী বিশেষ, জুলিয়াস সিজার এ নদী পার হয়ে রোমে ঢুকেছিলেন) পার হয়ে রোমের সামনে হয়েছেন দণ্ডায়মান। এবার তিনি বাইবেলের প্রামাণ্যতা আর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে 'উচচাঙ্গের সমালোচনা' লিখতে শুরু করলেন—স্পিনোজা থেকেই নিলেন অনেক উপকরণ—অনেক কিছু নিলেন ইংরেজ একেশ্বরবাদীদের কাছ থেকে, সবচেয়ে বেশী উপকরণ নিয়েছেন বেইলির (Bayle 1647–1706) সমালোচনামূলক অভিধান' (Critical Dictionary) থেকে। কিন্তু তাঁর হাতে সে সব উপকরণ কি অনলবর্ষীই না হয়ে উঠেছে। তাঁর এক পুস্তিকার নাম "জেপাটার প্রশ্নাবলী" (The Questions of zapata). জেপাটা পুরোহিত পদপ্রার্থী, সে নেহাৎ সরলভাবে জিজ্ঞাসা করল: "আচ্ছা, যে য়ুহুদীদের শত শত লোককে আমরা পুড়িয়ে মেরেছি তারা চার হাজার বছর ধরে কি করে ঈশ্বরের 'মনোনীত জাতি' ছিলেন তা আমরা কি করে লোককে বুঝাবো?"—এভাবে ও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে যাতে ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত কাহিনী আর কালানুক্রমের অসঙ্গতি অত্যন্ত নগ্ন হয়ে পড়ে। জেপাটার আর এক প্রশ্ন: "যখন দুই পুরোহিত-পরিষদ একে অপরকে অভিসম্পাত দেয়, যা প্রায়ই ঘটে থাকে, কোন্ দলকে অভ্রান্ত মনে করা হবে?" এ সব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে অবশেষে জেপাটা অত্যন্ত সরলভাবেই ঈশ্বরের কথা প্রচার করতে লাগলো। সে জনসাধারণের কাছে বলতে লাগলো ঈশ্বর সর্ব-মানবেরই পিতা—তিনি পুরস্কার আর দণ্ডদাতা এবং ক্ষমাশীল। ও অজস্র মিথ্যা থেকে সত্যকে মুক্ত আর ধর্মান্ধতা থেকে ধর্মকে করে নিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথক—শিক্ষা দিয়েছে পূণ্য আর তা আমল করেছে নিজে। সে ছিল ভদ্র, সদয় আর বিনয়ী। এমন মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয় ভেল্লাডলিডে (valladolid), ১৬৩১-এ।

তাঁর 'দার্শনিক অভিধানে'র 'ভবিষ্যৎবাণী' নামক প্রবন্ধে তিনি রেব্বিন আইসাকের (Rabbin Isaac) 'বিশ্বাসের দুর্গ' (Bulwark of Faith) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—সেখানে বলা হয়েছে হিব্রু ভবিষ্যৎবাণী যিশু খ্রীস্টের বেলায় প্রজোয্য নয়। এর পর ভল্টেয়ার কিছুটা শ্লেষের সঙ্গে বলে চলেছেন: "এভাবে এসব স্বধর্ম ও স্বভাষার অল্প ভাষ্যকারগণ গীর্জার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে আর নেহাৎ জিদের বশবর্তী হয়ে দাবী করেছে কোন রকমেই এসব ভবিষ্যৎবাণীর উদ্দেশ্য যিশু-খ্রীস্ট নয়।" সে এক দুর্দিন গেছে যখন মানুষকে সে যা মনে করে তা না বলে তার বিপরীত কথা বলতে বাধ্য করা হতো আর সংক্ষিপ্ত পথ মানে ছিল সোজা পথের বিপরীত। খ্রীস্টিয় ধর্মবিশ্বাস আর ধর্মীয় আচার-বিচারের উৎস যে গ্রীস, মিসর আর ভারত এ বিশ্বাসের প্রতি ভল্টে-য়ারেরও অনুরাগ ছিল আর তিনি মনে করতেন প্রাচীন কালে খ্রীস্টিয় ধর্মের যে সফলতা তার অনেকখানি এ গ্রহণের ফলে। 'ধর্ম' নামক প্রবন্ধে তিনি কিছুটা চাতুর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছেন: "আমাদের এ পবিত্র এবং নিঃসন্দেহে একমাত্র সৎ ধর্মের পরে, কম আপত্তিকর আর কোন ধর্ম হতে পারে?"—তার পর তিনি ধর্ম বিশ্বাস আর উপাসনা সম্বন্ধে এমন সব বর্ণনা দিলেন যা ছিল সেদিনের ক্যথলিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এক চরম বে-আন্দাজি রসিকতার সঙ্গে তিনি বলেছেন: "এত সব শয়তানী আর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ও যখন খ্রীস্টান ধর্ম সতর শ' বছর টিকে রয়েছে তখন নিশ্চয়ই তা ঐশ্বরিক ধর্ম।" তার পর তিনি প্রমাণ করতে এগিয়ে গেছেন যে প্রায় সব প্রাচীন জাতের মধ্যেই এমন একই রকম উপকথা রয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত করে বসেছেন যে অতএব সব উপকথাই পুরোহিতদের আবিষ্কৃত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলে বসেছেন: "প্রথম ধর্ম-যাজক হচ্ছে প্রথম বদমাইশ যে প্রথম আহম্মকের সঙ্গে মোলাকাত করেছে।" যাই হোক খাঁটি ধর্মের জন্য নয় শাস্ত্রের জন্যই তিনি পুরোহিতদের করেছেন দায়ী। সামান্যতম শাস্ত্রীয় ইতর-বিশেষের জন্যই ঘটেছে এত সব তিক্ত বিরোধ আর ধর্মযুদ্ধ। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছেন : "সাধারণ মানুষ কখনো এসব হাস্যস্পদ আর মারাত্মক ঝগড়া সৃষ্টি করেনি, যে ঝগড়া হয়েছে কত সব ভয়াবহ পরিণতির উৎস ......যে সব লোক তোমাদের শ্রমের ফলে অলস-আরামে দিন কাটাচ্ছে, তোমাদের দুঃখ আর ঘর্মে যারা হয়েছে সম্পদশালী, যারা দল বৃদ্ধি আর দাস সংগ্রহের জন্যই করেছে লড়াই—তারাই তোমাদেরে এ মারাত্মক ধর্মান্ধতায় করেছে অনুপ্রাণিত, করেছে এ কারণে যে তারা যেন হতে পারে তোমাদের মনিব। তারা যে তোমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রেখেছে তার উদ্দেশ্য এ নয় যে তোমরা ভয় করো ঈশ্বরকে বরং তার উদ্দেশ্য তোমরা যেন তাদেরে কর ভয়।"

এ সব থেকে ভল্টেয়ারকে একদম ধর্ম-হীন মনে করা সঙ্গত হবে না। তিনি ছিলেন সন্দেহাতীতভাবেই নাস্তিকতা-বিরোধী। এমন কি কয়েকজন বিশ্বকোষ উদ্যোগী (Encyclopedists) তাঁর বিরোধী হয়ে বলেছিলেন : "ভল্টেয়ার একজন গোঁড়া—তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন।" 'অজ্ঞ দার্শনিক' (The Ignorant philosopher) প্রবন্ধে তিনি স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে প্রায় নাস্তিকতা পরিহারের মতই ওটা থেকেও আসেন ফিরে। তিনি দিদারোকে লেখেন : "সেণ্ডারনস (Sannderson) অন্ধ হয়ে জন্মেছেন বলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করছেন। স্বীকার করছি আমি তাঁর মতের সমর্থক নই। হয়তো আমার ভুল হতে পারে কিন্তু তাঁর অবস্থায়ও আমি এক মহা 'প্রজ্ঞাকে স্বীকৃতি জানাতাম, যে মহা 'প্রজ্ঞা' দৃষ্টি শক্তির পরিবর্তে আমাকে এত কিছু দিয়েছেন। একটু চিন্তা করে দেখলেই উপলব্ধি করা যায় প্রতি বস্তুতেই রয়েছে এক অদ্ভুত সমন্বয়—আমারও সন্দেহ হয় এ সবের পেছনে হয়তো এক অপরিমেয় যোগ্য কারিগর রয়েছে। 'তিনি' কে আর 'তিনি' কেন যে সবের অস্তিত্ব আমরা দেখছি তা সৃষ্টি করেছেন এ সম্বন্ধে অনুমান করা যদি দুঃসাহসিক হয় তা হলে আমার মনে হয় 'তাঁকে' বা 'তাঁর' অস্তিত্বকে অস্বীকার করাটাও দুঃসাহসিক। তোমার সঙ্গে দেখা করে আলাপ করার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক—জানতে চাই তুমি কি তোমার নিজকে 'তাঁর' এক সৃষ্টি বলে মনে কর না কি মনে কর সনাতন অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ থেকে প্রয়োজনের টানে গড়ে ওঠা এক অণুমাত্র। তুমি যাই হও—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি সে বিরাট সমগ্রের এক যোগ্য অংশ, যে সমগ্রের ধারণা করতে আমি অক্ষম।'

হলবাককে (Hollback) তিনি বলেছিলেন তিনি তাঁর বইর নাম যে 'প্রকৃতি পদ্ধতি' (System of Nature) দিয়েছেন তাতেই ত ঐশী সংগঠনী বুদ্ধির রয়েছে ইংগিত। অন্যদিকে তিনি অলৌকিকতায় করতেন না বিশ্বাস আর বিশ্বাস করতেন না উপাসনার অপ্রাকৃত শক্তিতে। তিনি অন্যত্র লিখেছেন: 'আমি যখন কনভেন্টের গেইটে দাঁড়িয়ে তখন সিস্টার ফেস্যু (Sister Fessue) সিস্টার কনফিটেকে (Sister Confite) বল্লেন: আমার প্রতি স্পষ্ট দৈব অনুগ্রহ রয়েছে: তুমি ত জানো আমি আমার চড়ুই পাখিটাকে কত ভালবাসি, ওটা যখন পীড়িত হয়ে পড়েছিল আমি যদি তখন ওটার আরোগ্য কামনা করে নয় বার 'জয় হোক মেরি মাতার' না বলতাম তা হলে ওটা মরেই যেতো এতদিনে'। ....একজন পরাবিজ্ঞানী তাঁকে বল্লেন: "সিস্টার, 'জয় হোক মেরি'র মতো ভালো কিছু হয়তো নেই, বিশেষতঃ যখন একটি বালিকা প্যারীর উপকন্ঠে ল্যাটিন ভাষায় উচ্চারণ করেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে তোমার চড়ুই পাখীটা দেখতে সুন্দর হলেও ঈশ্বর ওটাকে নিয়ে এতখানি মশগুল ছিলেন, আমার অনুরোধ, বিশ্বাস করো তাঁর আরো বহু কিছু করার রয়েছে......"। সিস্টার 'ফেস্যু বল্লেন: জনাব, আপনার এসব কথায় ধর্মদ্রোহিতার গন্ধ রয়েছে......আমার স্বীকারুক্তি গ্রহণকারী (Confessor) পাদ্রী এসব কথা শুনলে বলবে আপনি দৈবে বিশ্বাস করেন না।" পরাবিজ্ঞানী জবাব দিলেন: "প্রিয় সিস্টার, আমি সাধারণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে এমন বিধি রচনা করে রেখেছেন যা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে—যেমন সূর্য থেকে আসে আলো। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না কোন বিশেষ ঈশ্বর তোমার চড়ুই পাখীর খাতিরে বিশ্বের অর্থ-নীতির বদল সাধন করেন বলে।"

এক পত্রে তিনি মন্তব্য করেছেন: "মহামান্য সুপবিত্র আকস্মিকতাই (chance) সবকিছু নির্ধারণ করে থাকে।" প্রাকৃতিক আইন ভঙ্গ করার কামনা কখনো সত্যিকার প্রার্থনা নয় বরং সত্যিকার প্রার্থনা হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনকে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা বলে মেনে নেওয়াই।

অনুরূপভাবে তিনি স্বাধীন ইচ্ছায়ও বিশ্বাস করতেন না। আত্মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। তাঁর মতেঃ "পরাবিজ্ঞানের চার হাজার গ্রন্থও আমাদেরে আত্মা কি তা শেখাতে পারে না।" হয়তো বুড়ো হয়েছেন বলে অমরতায় বিশ্বাস করতে চান কিন্তু পারেন না তা করতে। তিনি লিখেছেনঃ

'মক্ষীকাও অমর আত্মার অধিকারী একথা কেউ-ই মনে করে না—তবে হাতীর কিম্বা বানরের বা আমার খানসামার তা আছে বলে মনে করে কেন? মাতৃ-উদরে আত্মা তার দেহে ঢুকতে না ঢুকতেই শিশুর মৃত্যু ঘটে। ওর যখন পুনরুত্থান ঘটবে তখন সে কি ভ্রূণ হয়ে, নাকি বালক হয়ে নাকি পুরো মানুষ হয়ে উঠবে? যেমন ছিলে তেমন হয়ে উঠতে হলে তোমার স্মৃতি সম্পূর্ণ সতেজ ও অটুট থাকা চাই। কারণ তোমার পরিচয় তোমার স্মৃতির উপরই নির্ভরশীল। স্মৃতি লুপ্ত হলে, তুমি কি করে সে একই মানুষ বলে বিবেচিত হবে?......একমাত্র তারাই এক আধ্যাত্মিক আর অমর নীতির দ্বারা অনুগৃহীত এ কথা ভেবে মানবজাতির এত আত্ম-শ্লাঘার কারণ কি?......সম্ভবতঃ এ তাদের সহজাত অহঙ্কার-বোধেরই ফল। আমার বিশ্বাস যদি ময়ূরের বাকশক্তি থাকতো সেও তার আত্মা নিয়ে বড়াই করতো আর বলতো তার আত্মা তার লেজেই অবস্থান করে।"

AMARBOI.COM

প্রথম দিকের এ মনোভাবের সময় তিনি নীতির জন্য অমরতায় বিশ্বাস, এ ধারণাও ত্যাগ করেছিলেন—প্রাচীন হিব্রুরা যখন "মনোনীত জাতি' ছিলেন তখন তাদেরও এ বিশ্বাস ছিল না আর স্পিনোজা ছিলেন নৈতিকতার চূড়ান্ত।

জীবনের শেষের দিকে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দণ্ড-পুরস্কারের অমরতায় বিশ্বাসের সংযোগ ছাড়া শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। তাই এখন মনে করতে লাগলেন সম্ভবতঃ "সাধারণ মানুষের জন্য পুরস্কার প্রদানকারী আর প্রতিশোধ গ্রহণকারী ঈশ্বর অত্যাবশ্যক।" বেইলে (Bayle) জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'নাস্তিকের সমাজ বাঁচতে পারে কি না?" উত্তরে ভল্টেয়ার বল্লেনঃ "হাঁ, পারে তবে তারা সব দার্শনিক হওয়া চাই।' কিন্তু কদাচিৎ মানুষ দার্শনিক হয়। অভিধানে তিনি বলেছেনঃ "কোন পল্লী বিশেষ ভালো হতে চাইলে তার জন্য ধর্ম অত্যাবশ্যক।" অন্যত্র তাঁর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র বলেছে ঃ "আমি চাই আমার উকিল, আমার দর্জি আর আমার স্ত্রী ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক, তা হলে আমি মনে করি আমি কম ক্ষতিগ্রস্ত হবো আর কম প্রতারিত হবো।" আর এক জায়গায় বলেছেন ঃ "ঈশ্বর যদি নাও থাকেন তবুও তাঁকে আবিষ্কার করার প্রয়োজন হবে।" এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ "আমি সত্য থেকেও সুখ আর জীবনকে মূল্যবান মনে করতে শুরু করেছি"—জ্ঞানালোক আন্দোলনের মাঝখানে এ এক অসাধারণ প্রত্যাশা—পরে এ মতবাদ দিয়েই মানুয়েল কান্টকে উক্ত আন্দোলনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁর নাস্তিক বন্ধুদের বিরুদ্ধে তিনি সবিনয়ে নিজেকে সমর্থন করেছেন—তাঁর অভিধানের 'ঈশ্বর' নামক প্রবন্ধে তিনি তাঁর বন্ধু হলবাককে (Halback) সম্বোধন করে লিখেছেন ঃ

'তুমি নিজেই ত বলে থাক ঈশ্বর-বিশ্বাস কোন কোন মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখে—এটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট। যদি এ বিশ্বাস অন্তত দশটা নর হত্যায় কি দশটা পরনিন্দায়ও বাধা দিতে পারে তা হলে আমার মতে সারা বিশ্বেরই এ বিশ্বাস গ্রহণ করা উচিত। তুমি এও বলে থাকো যে ধর্মই অগণিত দুর্গতির কারণ। এ না বলে বরং বলো আমাদের এ অসুখী পৃথিবীর উপর চলছে এখন কুসংস্কারের রাজত্ব। এ সবই হচ্ছে ঃ 'পরমাত্মার' প্রতি নিষ্কলুষ উপাসনার নিষ্ঠুরতম শত্রু। এ দৈত্য সব সময় তার নিজেরই মাতৃ-বক্ষ বিদীর্ণ করছে—চলো আমরা সবাই মিলে এ দৈত্যকে ঘৃণা করি। যারা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তারা মানব জাতির পরম কল্যাণকারী। এ সর্পই ধর্মকে নিজের বক্ষের নিচে চেপে মারে—যে মাকে (ধর্ম-মা)-ও গিলে খাচ্ছে তার গায়ে আঘাত না করে আমাদের উচিত (কুসংস্কাররূপ) সর্পের মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া।'

ধর্ম আর কুসংস্কারের মাঝে এ যে পার্থক্য এ ছিল ভল্টেয়ারের কাছে মৌল ব্যাপার। তিনি পর্বত-শীর্ষ থেকে খ্রীস্ট (Sermon on the Mount) যে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন তার শাস্ত্র সানন্দে মানতেন আর খ্রীস্ট সম্বন্ধে যে সব গুণাবলী আরোপ করে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন তা সাধু-সন্তদের ধর্মোন্মাদনাকে যেত ছাড়িয়ে। তাঁর নামে যে সব অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে তার জন্য সাধু পরিবৃত হয়ে খ্রীস্ট রোদন করছেন—মনে মনে ভল্টেয়ার এ ছবিই যেন দেখতে পেতেন। অবশেষে তিনি নিজেই এক গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে 'ভল্টেয়ারের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত' বলে ওটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ করেন। তিনি বলতেন সারা য়ুরোপে এ হচ্ছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র গীর্জা। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে তিনি এক চমৎকার প্রার্থনা-ভাষণ দিয়েছিলেন আর তাঁর 'আস্তিক' নামক প্রবন্ধে চূড়ান্তভাবে এবং পরিষ্কার ভাষায় তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস করেছেন তিনি ব্যক্ত :

'আস্তিক এক পরম সত্তার' অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে—এ পরম সত্তা যেমন মঙ্গলময় তেমনি শক্তিমান, যিনি সব কিছুই করেছেন গঠন : ....যিনি সব অপরাধের শাস্তি বিধান করেন বটে কিন্তু নিষ্ঠুর হন না আর মঙ্গল দিয়ে পুরস্কৃত করেন সব পুণ্য কর্মকেই ··· এ নীতিতেই তিনি সারা বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত—তিনি পক্ষাবলম্বন করেন না পরস্পর-বিরোধী কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে। তাঁর ধর্মই আদিম আর সর্বব্যাপ্ত। দুনিয়ার যতসব আচার-পদ্ধতির আগে চাই অতি সরল ঈশ্বরোপসনা। ঈশ্বর কথা বলেন সকল মানুষের সহজবোধ্য ভাষায়—অথচ মানুষ পারে না একে অন্যকে বুঝাতে। পিকিং থেকে কেয়েনি (cayenne) পর্যন্ত সবাই তাঁর ভাই আর সব সাধু-সন্তকেই তিনি মনে করেন তাঁর সঙ্গী-সাথী। তিনি বিশ্বাস করেন ধর্ম যেমন নেই দুর্বোধ্য তত্ত্ব বিদ্যায় তেমনি নেই দণ্ডপূর্ণ জাঁক-জমকে—ধর্ম আছে উপাসনা আর সুবিচারে। সৎকর্ম করাই তাঁর উপাসনা—ঈশ্বরের আনুগত্যই ধর্ম বিশ্বাস। মুসলমানেরা উচ্চকন্ঠে বলে : "মক্কায় গিয়ে হজ্ব করতে ভুলো না", খ্রীস্ট যাজকেরা বলে : "নটরডাম দে লরেটে ঘুরে না এলে তোমার উপর বর্ষিত হবে গজব"।

ভল্টেয়ার লরেটে আর মক্কার কথা শুনে হাসেন কিন্তু সাহায্য করেন দীন-দরিদ্রকে আর রক্ষা করেন নির্যাতিতকে।

ঝ : ভল্টেয়ার আর রুশো

যাজকীয় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভল্টেয়ার এত বেশী নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে শেষ বয়সে রাজনৈতিক নির্যাতন আর দুর্নীতির লড়াই থেকে সরে পড়তে তিনি হয়েছিলেন বাধ্য। তিনি বলেছেন : "আমি রাজনীতির মানুষ নই : আমি সব সময় আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মানুষের বোকামি দূর করতে আর তাকে করে তুলতে অধিকতর সম্মানিত।" রাজনৈতিক দর্শন যে কত জটিল হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠতে পারে তা তাঁর অজ্ঞানা ছিল না—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বহু স্থির সিদ্ধান্তই করেছিলেন ত্যাগ। তিনি লিখেছেন: "যারা নিজেদের চিলে-কোটার নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে রাষ্ট্র শাসন করে তাদেরে আমি সহ্য করতে পারি না" অন্যত্র "বিধান-সভার এসব সদস্যরা দু'পয়সার এক ফর্দ কাগজের সাহায্যেই শাসন করে বিশ্ব.......যারা নিজেদের স্ত্রী আর ঘর-সংসার শাসনেই অক্ষম তারাই আবার পৃথিবী শাসনে পেয়ে থাকে অসীম আনন্দ।" এসব বিষয় খুব সহজে আর সরল বাঁধা-ধরা নিয়মে সমাধান করা সম্ভব নয়—সম্ভম নয় সব মানুষকে একদিকে আহাম্মক-জুয়াচোর আর একদিকে আমরা—এ দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া। ভল্টেয়ার ভোডেনার্গকে লিখেছিলেন: "কোন দলেরই নাম সত্য নয়। তোমার মত লোকের পসন্দ থাকা ভালো কিন্তু গণ্ডীবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।"

ক্ষুধাই মানুষকে করে তোলে পরিবর্তন প্রবণ—ভল্টেয়ার ধনী ছিলেন তাই হয়ে পড়েছিলেন রক্ষণশীল। তাঁর মতে সম্পত্তির প্রসারই সব রোগের প্রতিষেধক: মালিকানা মানুষকে দিয়ে থাকে ব্যক্তিত্ব আর আত্ম-মর্যাদাবোধ। তিনি লিখেছেন: সম্পত্তি চেতনা মানুষকে দ্বিগুণ শক্তি জুগিয়ে থাকে। এটা সুনিশ্চিত যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মালিক অন্যের চেয়ে ভালোভাবেই তার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে, কর্ষণও করবে অন্যের চেয়ে উত্তম রূপে।"

কি ধরনের সরকার হবে এ নিয়ে তিনি তেমন উৎসাহ দেখাননি। নীতিগতভাবে তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু তার ত্রুটি সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল—এতে এমন দলাদলির সম্ভাবনা রয়েছে যে, গৃহ-যুদ্ধ যদি নাও ঘটে অন্তত জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পুরোপুরি। একমাত্র ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে—যা এখনো ধনের দ্বারা হয়নি কলুষিত আর খণ্ড বিচ্ছিন্ন, সেখানেই শুধু প্রজাতন্ত্র সরকার সম্ভব। তাঁর মতে: "কদাচিত মানুষ নিজেকে শাসন করতে সক্ষম।" প্রজাতন্ত্রকে বড় জোর বলা যায় একটা স্বল্প-মেয়াদী ব্যবস্থা—কয়েকটি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত সমাজের প্রথম রূপ। আমেরিকান-ভারতীয়রা এক প্রকার গোষ্ঠীবদ্ধ প্রজাতন্ত্রেই বাস করে আর আফ্রিকায় এমন ধারা গণতন্ত্র প্রচুর। কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য যে সামাজিক তারতম্যের সৃষ্টি করে তা ক্রমে এসব সাম্যবাদী সরকারের ধ্বংসের কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে দাঁড়ায় আর উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে বৈষম্য। ভল্টেয়ারের জিজ্ঞাসা: "কোন্‌টা ভালো—রাজতন্ত্র না প্রজাতন্ত্র?" তিনি নিজেই দিচ্ছেন উত্তর: "চার হাজার বছর ধরে এ প্রশ্ন ঘুরে ফিরে করা হয়েছে। ধনীদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তারা সকলে একবাক্যে অভিজাততন্ত্রের সপক্ষেই দেবে মত। জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে তারা চায় গণতন্ত্র। শুধু রাজারাই চায় রাজতন্ত্র। এ সত্ত্বেও প্রায় সমগ্র পৃথিবী রাজারা কি করে শাসন করছে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে চেয়েছিল যে সব ইঁদুর তাদেরেই জিজ্ঞাসা করো এ প্রশ্নের উত্তর।" একজন পত্রলেখক যখন রাজতন্ত্রই সবচেয়ে উত্তম বলে তাঁর কাছে যুক্তি দিয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন এ বলে: "অবশ্য যদি মার্কাস আরেলিয়াসের মতো রাজা হন আর না হয় একজন গরীবের পক্ষে তাকে একটা সিংহে গিলে খাওয়ায় আর শত ইঁদুরে খাওয়ায় কি বেশ কম?"

ভ্রাম্যমান মানুষের মতো জাতীয়তা সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন উদাসীন—সাধারণ অর্থে যাকে স্বদেশ-প্রেম বলা হয় তাঁর মধ্যে তা ছিল খুব কমই। তাঁর মতে, 'সাধারণ লোকে স্বদেশ প্রেম অর্থে মনে করে নিজের দেশ ছাড়া অন্য সব দেশকে ঘৃণা করা। যদি কেউ অন্য দেশের ক্ষতি না করে নিজের দেশের উন্নতি কামনা করে তাহলে তিনি একই সঙ্গে বিজ্ঞ স্বদেশ প্রেমিক আর বিশ্ব নাগরিক।' যখন ফ্রান্স একই সঙ্গে ইংলেণ্ড আর আর ফ্রাসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত তখনো তিনি 'সৎ য়ুরোপীয় নাগরিকে'র মতো ইংলেণ্ডের সাহিত্য আর ফ্রাসিয়ার রাজার করতেন প্রশংসা কীর্তন। তাঁর মতে যেখানে সবজাতি যুদ্ধে অভ্যস্ত সেখানে ভালো-মন্দ নির্বাচনের কিছুই নেই।

কারণ সব চাইতে তিনি বেশী ঘৃণা করতেন যুদ্ধকেই। তিনি লিখেছেন: "সবচেয়ে ঘৃণ্যতম অপরাধ হচ্ছে যুদ্ধ, তবু এমন কোন আক্রমণকারী নেই যে সুবিচারের দোহাই দিয়ে নিজের অপরাধ চায় না ঢাকতে। হত্যা নিষেধ তাই সব খুনীকেই শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু বিজয়-বাদ্য বাজিয়ে যখন অগণিত মানুষকে করা হয় হত্যা তখন আর শাস্তির প্রশ্নই ওঠে না।" তাঁর অভিধানে 'মানুষ' নামক প্রবন্ধে বেশ কিছুটা ভয়াবহভাবে তিনি 'মানুষ সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ ধারণা' করেছেন লিপিবদ্ধ:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কুড়ি বছর লাগে মানুষকে উদ্ভিদ অবস্থা থেকে—যা কাটে মাতৃ উদরে আর পশু অবস্থা থেকে যা কাটে শৈশবে—মুক্তি বিবেচনার অনুভবযোগ্য পরিণতিতে পেঁাচতে। দেহ গঠনের সামান্য জ্ঞান-লাভের জন্য প্রয়োজন ত্রিশ শতাব্দী। আত্মা সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞানের জন্যও দরকার অনন্ত-কালের। কিন্তু এক মুহূর্তেই খতম করে দেওয়া যায় একটা মানুষকে—'একটা জীবনকে'। তাই বলে তিনি কি বিপ্লবকেই এ সবের প্রতিকার মনে করতেন? না। কারণ, প্রথমতঃ তিনি জনগণকেই করতেন না বিশ্বাস—তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন: "যখন জনগণ যুক্তি তর্কের আশ্রয় নেয় তখনই ঘটে সবকিছুর ভরাডুবি।" যখন অবস্থার হেরফেরে তাদের কল্পিত সত্য প্রমাণিত হয় ভুল তখন ছাড়া তার আগে ব্যস্তবাগীশ জনগণের অধিকাংশই সত্য উপলব্ধি করতেই অক্ষম। আর তাদের মননশীলতার ইতিহাস হচ্ছে স্রেফ এক উপকথার যায়গায় অন্য উপকথাকে স্থান ছেড়ে দেওয়া। তিনি লিখেছেন: "পুরোনো মিথ্যা যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখনই রাজনীতি তাকে ব্যবহার করে খাদ্য হিসেবে আর জনগণ তাই পুরে দেয় নিজেদের মুখে—এ চলতে থাকে যতদিন না আর এক কুসংস্কার এসে এটাকে না করে ধ্বংস আর রাজনীতি প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় ভুল থেকেও হয় উপকৃত।" তখন আবার সমাজ-দেহে বৈষম্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং যতদিন মানুষ রয়ে যাচ্ছে মানুষ আর জীবন থেকে যাচ্ছে সংগ্রাম ততদিন এ বৈষম্য দূর হওয়া এক রকম অসম্ভব। তিনি অন্যত্র লিখেছেন: "যারা বলে সব মানুষ সমান তারা চরম সত্য কথাই বলে যদি সমান অর্থে, স্বাধীনতায়, নিজ সম্পত্তির মালিকানায় আর আইনের আশ্রয়ের সম অধিকার মনে করা হয় কিন্তু পৃথিবীতে সমতা একদিকে যেমন খুবই স্বাভাবিক অন্যদিকে তেমনি অলীক ব্যাপার—অধিকার সম্পর্কে চেতনা সীমিত থাকলেই তা খুব স্বাভাবিক কিন্তু মঙ্গল আর ক্ষমতার সমতার চেষ্টা করলেই তা হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক। সব নাগরিক সমান শক্তিমান হতেই পারে না কিন্তু হতে পারে সমান স্বাধীন। ইংরেজরা এ সমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে........স্বাধীন মানে আইনের ছাড়া অন্য কিছুর অধীন না হওয়া।" এ হচ্ছে উদারনৈতিকদেরও কথা—টার্গট (Turgot) কনডর্সেট্ (Conrced), মিরাবো (Mirabeau) এবং ভল্টেয়ারের অন্যান্য উদারনৈতিক অনুসারীরা এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লবেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা পোষণ করছিলেন কিন্তু এতে নির্যাতিতরা সন্তুষ্ট নয়, তারা স্বাধীনতার চেয়েও বেশী করে চায় সমতা, এমন কি স্বাধীনতার বিনিময়ে হলেও। রুশোর কন্ঠেই ধ্বনিত হলো সাধারণ মানুষের দাবী। প্রতি স্তরেই তিনি নিজে শ্রেণী বৈষম্যের চেহারা দেখেছেন তাই এ বিষয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন তীক্ষ্ণ সচেতন—তিনি দাবী জানালেন সমতার। যখন তাঁর অনুসারীরাই হলেন বিপ্লবের পরিচালক, যেমন মেরাট (Merat) আর রবস্পিয়র (Robespierre)—তখন সমতার জয় হলো বটে কিন্তু স্বাধীনতাকে প্রাণ দিতে হলো ফাঁসির রজ্জুতে।

মানুষ আইন-প্রণেতারা নিজের কল্পনা থেকে একটা আস্ত নয়া দুনিয়া সৃষ্টি করে তাকে যুটোপিয়া করে তুলবে এ বিষয়ে ভল্টেয়ারের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সমাজ লজিকের অনুমান-বাক্য নয়, তার গড়ে ওঠা সময় সাপেক্ষ—অতীতকে দ্বার পথে বের করে দিলেও তা ফিরে এসে জানালা পথে ঢুকবেই। তাঁর মতে আমরা যে সমাজে বাস করছি সে সমাজে দুঃখ ও অবিচার কি কি রদবদলের সাহায্যে আমরা কমাতে পারি তাই হচ্ছে আসল সমস্যা। "যুক্তির ঐতিহাসিক প্রশংসা" নামক রচনায় দেখা যায়, যুক্তি-দুহিতা সত্য ষোড়শ লুইর সিংহাসনারোহণে খুব আনন্দ-মুখর হয়ে এবার বেশ বড় বড় সব সংস্কার সাধিত হবে এ প্রত্যাশা জানালে মা যুক্তি উত্তর দিচ্ছে: "প্রিয় কন্যা, তুমি জানো এসব সংস্কার আমিও চাই, বরং এর চেয়েও বেশী চাই কিন্তু এসবের জন্য চাই প্রচুর সময় আর চিন্তা। বহুবার নিরাশ হয়েও যে সব সুযোগ-সুবিধা আমি চাই তার কিছুটা পেলেও আমি খুব খুশী হবো।" তবুও টার্গট (Turgot) ক্ষমতাসীন হলে ভল্টেয়ার খুব খুশী হয়ে লিখেছিলেন: "সোনালী যুগ-এখন আমাদের গলায় গলায়।" তিনি যে সব সংস্কার চান, যেমন জুরী প্রথা, যাজক টেক্সের বিলোপ, গরীবদের সব রকম টেক্স থেকে অব্যাহতি ইত্যাদি—তাঁর আশা এবার সে সবই সাধিত হবে। তিনি কি লেখেননি এ বিখ্যাত চিঠিখানি?—

"দেখছি সব কিছুই চারদিকে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে, যে বিপ্লব একদিন আসবেই আসবে কিন্তু তা দেখার আনন্দ থেকে আমি থাকবো বঞ্চিত। যে কোন ব্যাপারেই ফরাসীরা কিছুটা বিলম্ব করে থাকে কিন্তু শেষে হলেও তারা আসেই। এক জায়গা থেকে আর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় আলো যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথম সুযোগেই চমৎকার বিস্ফোরণ ঘটবে বলে মনে হয় তখন শুরু হবে এক দুর্লভ হট্টগোল! তরুণেরা ভাগ্যবান—তারা চমৎকার সব জিনিস দেখতে পাবে।"

কিন্তু তাঁর চারদিকে কি ঘটছে তা তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতেই পারেননি। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি মনে করেননি এক চমৎকার বিস্ফোরণের মারফৎ সারা ফ্রান্স সানন্দে জাঁ জেকোয়েস রুশোর মতো এক অদ্ভুত মানুষের দর্শনকে নেবে বরণ করে। রুশো তখন জেনেভা আর প্যারী থেকে ভাবাবেগপূর্ণ রোমান্স আর বৈপ্লবিক পুস্তিকার মারফৎ সারা পৃথিবীকে তুলেছেন মাতিয়ে। মনে হয় ফ্রান্সের জটিল আত্মা দু'জনে (ভল্টেয়ার আর রুশো) বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—এত বৈপরিত্য সত্ত্বেও উভয়ে ছিলেন পুরোপুরি ফরাসী। নীটশে যখন বলেন: "দ্রুত পা, ব্যঙ্গ, আগুন, কমনীয়, সবল যুক্তি বা লজিক, একগুঁয়ে মননশীলতা, তারকাদের নৃত্য"—তখন নিঃসন্দেহে তিনি ভল্টেয়ারের কথাই ভাবছিলেন। ভল্টেয়ারের পাশে রুশোকে স্থাপন করলে দেখা যাবে: সব যেন আগুন আর অসম্ভব কল্পনা, মহৎ অথচ [illegible] দৃষ্টি, বুর্জোয়া মহিলাদের প্রতিমা-স্বরূপ (এ. রুশা) প্যাসকেলের (Pascal) মতই ঘোষণা করছেন হৃদয়েরও যুক্তি আছে কিন্তু সে যুক্তি মস্তিষ্ক কখনো বুঝতে পারে না।

এ দু'জনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই মননশীলতা আর সহজ প্রবৃত্তির এক সংঘর্ষ। ভল্টেয়ার সব সময় যুক্তিতে ছিলেন বিশ্বাসী। তিনি বলতেন: "কথা আর লেখা দিয়ে আমরা মানুষকে ভালো করে তুলতে পারি, মানুষের মনকে করতে পারি আলোকিত।" যুক্তির উপর রুশোর বিশ্বাস ছিল না আদৌ, তাঁর বিশ্বাস ছিল একমাত্র কর্মে। বিপ্লবের বিপদের কথা ভেবে তিনি মোটেও হতেন না ভীত। তাঁর আস্থা ছিল গণ্ডগোল আর পুরোনো আচার অভ্যাসের উৎখাতের ফলে সামাজিক যে সব উপাদান বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে ভ্রাতৃত্বের আবেশ দিয়েই তিনি সে সবকে নতুন করে করতে পারবেন ঐক্যবদ্ধ। দূর করে দেয়া যাক আইনকানুন—তা হলে মানুষ সমতা আর সুবিচারের রাজ্যে গিয়ে পেঁ'ছবে। এ ছিল তাঁর বিশ্বাস রুশো। যখন তাঁর 'অসাম্যের মূল সম্বন্ধে আলোচনা' (Discourse on the origin of Inequality) নামক বই, যাতে সভ্যতার বিরুদ্ধে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীব-জন্তুর মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার তাগিদ জানিয়েছেন তিনি তা ভল্টেয়ারকে পাঠিয়েছিলেন তখন ভল্টেয়ার উত্তরে লিখেছিলেন : "মহাশয়, মানবজাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার নতুন বইটি পেয়েছি, তার জন্য আমার ধন্যবাদ জানবেন। আমাদেরে পশু বানাবার চেষ্টায় আপনি যে কৌতুক বোধের পরিচয় দিয়েছেন তার কোন তুলনা নেই—আপনার বইটি পড়লেই মনে স্বভাবতঃই চার পেয়ে হওয়ার বাসনা জাগে। যাই হোক আমি যে অভ্যাস প্রায় ষাট বছর আগে ছেড়েছি, দুঃখের বিষয় মনে হচ্ছে আমার পক্ষে আবার সে অভ্যাস গ্রহণ এখন আর সম্ভব হবে না।" রুশোর পাশবিকতা তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract) গ্রন্থেও অনুসৃত হয়েছে দেখে তিনি খুব বিরক্তি বোধ করেছিলেন—মঁসিয়ে বোর্ডস্‌কে (M. Bordes) লিখেছিলেন: "মঁসিয়ে, এখন দেখতেই পাচ্ছেন মানুষের সঙ্গে বানরের সাদৃশ্য যতখানি জাঁ জেকোয়েসের সঙ্গে দার্শনিকের সাদৃশ্যও ততখানি। তিনি যেন ডায়োজিনিসের (Diogenes) পাগলা কুত্তা।" তবুও এ বই পোড়ানোর জন্য তিনি সুইস্ কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি—তখনো তিনি তাঁর বিখ্যাত নীতিতে ছিলেন অটল: "তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু তোমার বলার অধিকার রক্ষায় প্রয়োজন হলে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।" যখন শত শত্রু দ্বারা তাড়িত হয়ে রুশো পলায়ন করছিল তখন ভল্টেয়ারই তাঁকে তাঁর সঙ্গে 'লেস্ ডেলিকেসেস'—(Les delices) ভবনে বাস করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এ নিমন্ত্রণ গৃহীত হলে কি চমৎকার দৃশ্যই না হতো দেখতে!

ভল্টেয়ারের বিশ্বাস সভ্যতার বিরুদ্ধে এত সব যে নিন্দা তা সবই বালকোচিত আহাম্মকি—না হয় পাশবিকতা থেকে সভ্যতার আওতায় মানুষ অনেক গুণ বেশী ভালো অবস্থায় আছে। তিনি রুশোকে বলেছিলেন স্বভাবতঃই মানুষ শিকারী পশু আর সভ্য সমাজ মানে এ পশুকে শৃঙ্খলিত করা, তার পাশবিকতাকে প্রশমিত করা, সামাজিক শৃঙ্খলার সাহায্যে, বুদ্ধি আর আনন্দের ভিতর দিয়ে তার বিকাশের সম্ভাবনা গড়ে তোলা। এখন যে অবস্থা নেহাৎ মন্দ তা তিনি মানতেন: "যে শাসন আমলে একটা বিশেষ শ্রেণীকে 'এমন কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়—' যারা কাজ করে তারাই টেক্স দিক্, আমরা যখন কাজ করি না তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা টেক্সও দেব না'—এমন শাসন হটেনটট্‌দের শাসন থেকে কিছুমাত্র ভালো নয়।" এত সব দুর্নীতির মাঝখানেও প্যারী জীবনেও আশার আলো ছিল। তাঁর 'পৃথিবী যেভাবে চলছে'তে (The world As It goes) ভল্টেয়ার বলেছেন এক ফেরেস্তা বেবৌসকে (Babous) পাঠিয়েছিলেন পার্সেপলিস (Persepolish) নগরটা ধ্বংস করা উচিত কি না সে সম্বন্ধে তাঁর কাছে রিপোর্ট করতে। বেবৌস পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানে পাপের যে বিচিত্র রুপ দেখলেন তাতে তিনি রীতিমতো ঘাবড়িয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে এ নগরের প্রতি তাঁর মনে একটা আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছিল। দেখলেন লোকগুলি ভদ্র, অমায়িক আর পরোপকারী যদিও তারা লঘুচিত্ত, নিন্দুক আর দাম্ভিক। তাঁর ভয় হলো পার্সেপলিস নগরীকে যদি দণ্ড দেওয়া হয়—এমন কি সে কথা ভেবে নিজের রিপোর্টটা দিতেও ভয় পেলেন। শেষে অবশ্য রিপোর্ট একটা তিনি এ মর্মে দিয়েছিলেন: নানা ধাতু, মাটি আর পাথর (সবচেয়ে মূল্যবান আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট) দিয়ে শহরের সর্বোত্তম কারিগরদের দ্বারা একটা মূর্তি তৈয়ের করিয়ে তা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন উক্ত ফেরেস্তার কাছে। মূর্তিটি দেখিয়ে বল্লেন: 'এ সুন্দর মূর্তিটি পুরোপুরি সোনা আর হীরের তৈয়েরী নয় বলে আপনি কি ভেঙ্গে ফেলবেন?' এবার ফেরেস্তাটি পার্সেপলিস ধ্বংস করার চিন্তা ত্যাগ করে 'পৃথিবীকে যেমন চলছে তেমন চলতে দেওয়ার' সংকল্প গ্রহণ করলেন। মোটকথা মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন না করে প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন করতে গেলে শেষে অপরিবর্তিত স্বভাব সে প্রতিষ্ঠানগুলোকেই পুর্ণজীবিত করে ছাড়বে।

সে পুরোনো পাপ-চক্র—মানুষ প্রতিষ্ঠানকে গড়ে না প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে মানুষ, পরিবর্তন শুরু হবে কোথায়? ভল্টেয়ার আর উদার নৈতিকদের ধারণা মননশীলতা ধীরে ধীরে শান্তির পথে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে আর মানুষের স্বভাবে রদবদল ঘটিয়ে এ চক্র ভাঙ্গতে সক্ষম। রুশো আর উগ্রপন্থীরা মনে করতেন এ চক্র ভাঙ্গা যাবে স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি আর আবেগী কর্মের দ্বারা—এ পথেই পুরোনো প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে হৃদয়ের তাগাদায় গড়া যাবে নতুন প্রতিষ্ঠান—যে প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্ব। মনে হয় এ দুই বিভক্ত রেখার বাইরেই রয়েছে সত্য: সহজাত প্রবৃত্তি পুরোনোকে ধ্বংস করার তা সত্য কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র মননই গড়ে তুলতে পারে নতুনকে। রুশোর উগ্রপন্থায় প্রতিক্রিয়ার বীজ যে একটা উর্বর ক্ষেত্র পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সহজাত প্রবৃত্তি আর আবেগ পরিণামে হয়ে পড়ে যে অতীতের থেকে তাদের জন্ম সে অতীতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকে সে সবেরই ছাঁচে ঢালাই। বিপ্লবের পরিশুদ্ধির পর হৃদয় আবার অলৌকিক ধর্ম আর 'পুরোনো সুদিনের' নিয়ম-নিষ্ঠা আর শান্তির আশ্রয় সন্ধান করবেই—ফলে রুশোর পরেই আবির্ভাব ঘটবে চেটোব্রিয়েণ্ড (Chateanbriand) দে স্টেল্ (De stael) দে ম্যস্টার (De Maister) আর কান্টের (Kant).

ঞঃ উপসংহার

এর মধ্যে বৃদ্ধ "হাস্য-মুখ দার্শনিক" সব সময় ফার্ণেতে তাঁর উদ্যান-কর্ষণায় ছিলেন রত—তাঁর মতে "দুনিয়ায় এ হচ্ছে আমাদের সর্বোত্তম কাজ"। তিনি দীর্ঘ জীবন পেতে চেয়েছিলেন, কারণ "আমার ভয় যে মানুষের কোন উপকার সাধনের আগেই যদি আমি মরে যাই"—নিঃসন্দেহে এখন তিনি তাঁর ভূমিকা পালন করে শেষ করেছেন। তাঁর উপকার সাধনের কোন সীমা নেই—দূরের হোক, কাছের হোক সবাই তাঁর সাহায্য চাইতেন, লোকে তাঁর পরামর্শ নিতেন, কেউ অত্যাচার উৎপীড়নের শিকার হলে তাঁর কাছে এসেই নিজের দুঃখের কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতো তাঁর কলম আর সুনামের। দুষ্কর্মের জন্য অভিযুক্তদের প্রতি তাঁর দরদ ছিল সবচেয়ে বেশী, তাদের জন্য ক্ষমা আদায় করে তাদেরে তিনি কোন সৎ পেশায় দিতেন লাগিয়ে আর সব সময় নজর রাখতেন তাদের উপর। দিতেন পরামর্শ। একবার এক নবদম্পতি তাঁর কিছু অর্থ চুরি করে ধরা পড়েছিল—ধরা পড়ার পর ওরা নতজানু হয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি নিজেও নতজানু হয়ে ওদেরে তুলে ধরে বল্লেন তিনি সানন্দে তাদেরে ক্ষমা করেছেন তবে তারা যেন ঈশ্বরের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে কখনো নতজানু না হয়। কর্ণেলির (Corneille ফরাসী বিয়োগান্ত নাট্যকার) অনাথ ভাইঝির প্রতিপালন, লেখা-পড়া আর তার বিয়ের যৌতুকের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছিলেন—সত্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ছিল এক বিশিষ্ট দায়িত্ব। তিনি নিজেই বলেছেন: "যা কিছু সামান্য সৎ কাজ আমি করেছি তার মধ্যে এটি সর্বোত্তম.......আক্রান্ত হলে আমি দৈত্যের মতো যুজে থাকি, কারো কাছে স্বীকার করি না পরাজয় কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমি সৎ শয়তান আর আমি সবকিছু শেষ করি হাসি মুখে।" ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বন্ধুরা চাঁদা করে তাঁর একটি প্রস্তর-মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন। হাজার হাজার লোক চাঁদা দিয়ে এ সম্মানের ভাগী হতে চেয়েছিলো তাই ধনীদের এক কপর্দকের বেশী চাঁদা দিতে করা হয়েছিল নিষেধ। ফ্রেডেরিক যখন জানতে চাইলেন তিনি কত দেবেন তখন তাঁকে বলা হয়েছিল: "দেবেন আপনার নাম আর একটি মুদ্রাই শুধু।" অন্যান্য বিজ্ঞানচর্চার উপর এক নর কঙ্কালের প্রস্তর-মূর্তি নির্মাণে চাঁদা দিয়ে তিনি দেহ-বিজ্ঞানকেও (Anatomy) উৎসাহিত করছেন বলে ভল্টেয়ার তাঁকে করেছিলেন অভিনন্দিত। খোদাই করার মতো তাঁর কোন চেহারাই এখন নেই বলে তিনি বন্ধুদের এ প্রস্তাবে তেমন খুশী ছিলেন না। তাঁর মন্তব্য: "এ যে কি রকম হবে তা তোমরা ভাবতেই পারো না। আমার চোখ দু'টি প্রায় তিন ইঞ্চি গর্তে ঢুকে গেছে, গাল খানি হয়ে পড়েছে পুরোনো চর্ম-নির্মিত কাগজের মতো......যে কয়টি দাঁত ছিল তাও সব আজ নিশ্চিহ্ন।" এ কথার উত্তরে দ' এলেমবার্ট (d' Alembert)) বলেছিলেন: "প্রতিভার একটা চেহারা সব সময়ই থাকে যা প্রতিভার সহোদর অন্য প্রতিভা সহজেই খুঁজে পাবে।" তাঁর আদরের কুকুরটি তাঁকে চুমু খেলে তিনি বলেছিলেন: "এ যেন জীবন চুমু দিচ্ছে মৃত্যুকে।"

তাঁর বয়স এখন তিরাশি। মৃত্যুর আগে আর একবার প্যারী দেখতে তাঁর সখ হলো। কিন্তু তাঁর ডাক্তারেরা তাঁকে এমন কষ্টকর ভ্রমণের ঝুঁকি নিতে নিষেধ করলেন—উত্তরে তিনি বল্লেন: "আমি যদি কোন বোকামী করতে চাই কিছুই আমাকে দিতে পারবে না বাধা।" তিনি এত দীর্ঘকাল বেঁচেছেন আর করেছেন এত কঠোর শ্রম—তাই হয়তো ভেবেছেন তিনি যেভাবে চান সেভাবে মৃত্যুবরণ করার তাঁর একটি অধিকার রয়েছে, যে প্রাণ-চঞ্চল প্যারী থেকে তিনি নির্বাসিত তিনি চান সেখানেই মৃত্যুবরণ করতে। তাই তিনি রওয়ানা দিলেন—ফ্রান্সের উপর দিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ী যখন রাজধানীতে প্রবেশ করলো তখন তাঁর হাড়গুলি যেন সব হয়ে পড়েছে আলগা। তিনি অবিলম্বে তাঁর যৌবনের বন্ধু দ' আর্জেন্টেলের (d' Argental) কাছে গিয়ে বল্লেন: "আমি মৃত্যুকে পেছনে ফেলে তোমাকে দেখতে এসেছি। পরদিন প্রায় তিন শ' দর্শক তাঁর ঘরে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাঁকে রাজোচিত সংবর্ধনা জানালো। এসব দেখে শুনে ক্ষুব্ধ ঈর্ষায় ষোড়শ লুই জ্বলতে লাগলেন। দর্শন প্রার্থীদের মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনও ছিলেন, ভল্টেয়ারের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য তিনি তাঁর নাতিকেও এনেছিলেন সঙ্গে করে—বৃদ্ধ ভল্টেয়ার তাঁর শীর্ণ হাতখানি যুবকের মাথার উপর রেখে তাকে নির্দেশ দিলেন সে যেন নিজেকে "ঈশ্বর আর স্বাধীনতার" জন্য করে উৎসর্গ। তাঁর রোগ বেড়ে যাওয়ার পর তাঁকে 'পাপ-মুক্ত' করার জন্য এক পাদ্রীকে আনা হলো ডেকে। ভল্টেয়ার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "মসিঁয়ে ল' আবে (M. l'Abbe) আপনি কার কাছ থেকে এসেছেন? পাদ্রী বল্লেন: "স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই"। ভল্টেয়ার "বেশ, বেশ, তা হলে মশাইর পরিচয়পত্র?" পাদ্রী তাঁর ফি না নিয়েই পালালেন। পরে ভল্টেয়ার গথিয়ার নামক আর এক পুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন তাঁর 'পাপের স্বীকৃতি' (Cnofession) শোনার জন্য। গথিয়ার এলেন বটে কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসের স্বীকৃতি পত্রে স্বাক্ষর ছাড়া ভল্টেয়ারের 'পাপ-বিমোচনে' তিনি স্বীকৃত হলেন না। এবার ভল্টেয়ার বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন, কয়েক পঙতির একটা বিবৃতি রচনা করে তা তাঁর সেক্রেটারী ওয়াগনারের (Wagner) হাতে দিয়েছিলেন: "ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে বন্ধুদের ভালোবেসে, শত্রুদের প্রতি কোন ঘৃণা পোষণ না করে আর কুসংস্কারের প্রতি হিংসা নিয়েই আমি মৃত্যুবরণ করছি। স্বাক্ষর: ভল্টেয়ার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৮"। রুগ্ন আর থুত্থুড়ে অবস্থায় তাঁকে যখন উল্লসিত জনতার ভিতর দিয়ে একাডেমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন উৎফুল্ল জনতা তাঁর গাড়ীর উপর উঠে পড়ে রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিন প্রদত্ত মূল্যবান রেশমী পোষাক ছিঁড়ে ছিঁড়ে স্মৃতি চিহ্ন সংগ্রহ করেছিল। মরলি (Morley) লিখেছেন: "শতাব্দীর ঐ ছিল অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা। দীর্ঘ ও বিপজ্জনক কঠোর সংগ্রাম শেষে বিজয়ের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক মুকুটে ভূষিত হয়ে এসেও এমন অদ্ভুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আনন্দ-মুখর অভ্যর্থনা কোন বিখ্যাত সেনাপতিও কোন দিন লাভ করেননি।" একাডেমীর সভ্যদের কাছে তিনি প্রস্তাব করলেন ফরাসী অভিধান সংশোধনের বক্তৃতা দিলেন তারুণ্যের উদ্দীপনার সাথে—অ (A) হরফের আওতায় যত রকমের বিষয় আছে তা লেখার দায়িত্ব তিনি নিজে নেবেন বলেও জানালেন। সভাশেষে বল্লেন: "আমি হরফের নামে আপনাদেরে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" উত্তরে সভাপতি চেস্টেলাক্সও (Chas-tellux) বল্লেন: "আর আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাহিত্যের নামে।"

এর মধ্যে আয়োজন হয়েছে তাঁর নাটক আইরেনের (Irene) থিয়েটারে অভিনয়ের। ডাক্তারদের পরামর্শ উপেক্ষা করে এবারও তিনি থিয়েটারে যাওয়ার জন্য ধরলেন জিদ এবং গেলেনও। নাটকটি ভালো হয়নি কিন্তু দর্শকরা তিরাশি বছরের এক বৃদ্ধ যে খারাপ নাটক লিখেছে তাই বলে নয় এ বয়সে যে আদৌ নাটক লেখা সম্ভব এ ভেবেই উল্লসিত—লেখকের উদ্দেশ্যে তাদের পুনঃ পুনঃ আনন্দ ধ্বনিতে অভিনেতা অভিনেত্রী-দের সব কথাই তলিয়ে গেলো এক বিপুল হট্টগোলে। একজন নবাগত হলে ঢুকেই ওটাকে একটা পাগলা গারদ মনে করে পালিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়।

AMARBOI.COM

সে সন্ধ্যায় বৃদ্ধ জ্ঞানচার্য যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে প্রায় আপোষ করে নিয়েছেন। বুঝতে পারলেন তিনি এখন নিঃ-শেষিত শক্তি—প্রকৃতি যে অসাধারণ ও বেপরওয়া শক্তি তাঁকে দিয়েছিলেন, যা হয়তো আর কাকেও দেওয়া হয়নি, সে শক্তির তিনি পুরোপুরিই ব্যবহার করেছেন। জীবন তাঁর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে এ তিনি বুঝতে পারলেন—চল্লো এবার জীবন-মৃত্যুর অব্যাহত সংগ্রাম। কিন্তু মৃত্যু ভল্টোয়ারের মত মানুষকেও পরাস্ত করতে সক্ষম। তাঁর জীবনের পূর্ণ সমাপ্তি নেমে এলো ১৭৭৮-রের ৩০শে মে।

প্যারীতে তাঁর খ্রীস্টিয় সমাধি অস্বীকৃত হলো কিন্তু তাঁর বন্ধুরা বিকৃত মুখো মৃত ভল্টেয়ারকে এক গাড়িতে তুলে তিনি যে এখনো বেঁচে আছেন এ ভান করে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। শেলিয়ার্সে (Scellieses) তাঁরা এক পুরোহিতকে পেলেন যিনি অন্তত এটুকু বুঝতেন যে নিয়ম-কানুন প্রতিভাবানের জন্য তৈয়রী করা হয়নি। তাঁর দেহ এবার পবিত্র মাটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাধিস্থ হলো। বিপ্লবের সাফল্যের পর জাতীয় পরিষদ ষোড়শ লুইকে ভল্টেয়ারের দেহাবশেষ দেব-মন্দির সংলগ্ন মহৎ ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে আসার জন্য বাধ্য করলো। প্রায় লক্ষ নরনারীর মিছিল যে মহান শিখা একদিন জ্বলেছিল তার মৃত ভস্মরাশি প্যারীর রাস্তা দিয়ে নিতে এলো —ছ' লক্ষ নরনারী রাস্তায় নেমে এলো তাকে বরণ করে নিতে। শবাধারের উপর শুধু লেখা ছিল: "তিনি মানব-মনকে দিয়েছেন এক মহাপ্রেরণা: আমাদের তৈয়রী করেছেন স্বাধীনতার জন্য।" তাঁর সমাধি ফলকে এ তিনটি শব্দই যথেষ্ট: "এখানে শুইয়ে আছেন ভল্টেয়ার"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমানুয়েল কান্ট এবং আদর্শবাদ

১ কান্টে পৌঁছার পথ-রচনা

উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার উপর ইমানুয়েল কান্টের দর্শনের যে কর্তৃত্ব দেখা যায় তার মতো আর কখনো কোন চিন্তা পদ্ধতি এমন করে কোন যুগকেই করেনি প্রভাবিত। প্রায় তিন কুড়ি বছরের শান্ত আর নির্জন মানসিক বিকাশের পর ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে কনিস্‌বার্গের (Konigsberg) এ ভয়ঙ্কর স্কট সন্তানটি তাঁর 'নিখুঁত যুক্তির সমালোচনা (critique of pure reason) দিয়ে পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলেছিল 'স্থির বিশ্বাসের সুখ-নিদ্রা' থেকে। সে থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর 'সমালোচনামূলক দর্শনই' য়ুরোপীয় কল্প-পাখীর ঝাঁকের উপর চালাচ্ছে শাসন। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে যে রোমাণ্টিক ঢেউ উঠেছিল তার উপর শোপেন হাওয়ারের দর্শন অতি স্বল্পকালের জন্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বটে কিন্তু ১৮৫৯-এর পর থেকে বিবর্তনবাদ সব কিছুকেই দিলে ভাসিয়ে; আর শতাব্দী শেষে দেখা গেলো দার্শনিক রঙ্গ মঞ্চের কেন্দ্র স্থান দখল করে বসেছে নীট্‌শের (Nietzsche) প্রতিমা ভঙ্গের আনন্দজনক দর্শন। কিন্তু এসব হলো গৌণ আর বাহ্য বিকাশমাত্র—এ সবের অন্তরালে এক প্রবল ও স্থির কান্টীয় চিন্তা-স্রোত সব সময় ছিল প্রবাহিত, এ স্রোত যেমন ছিল গভীর তেমনি ব্যাপক। আজকের দিনেও এর প্রধান উপপাদ্যগুলিই সব পরিণত দর্শনেরই স্বতসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। নীটশে কান্টকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বটে কিন্তু গেছেন তাঁকে ছাড়িয়ে, শোপেনহাওয়ার কান্টের বিশ্লেষণী সমালোচনাকে (Critique) "জার্মেন সাহিত্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে অতিহিত করেছেন আর মনে করতেন কান্টকে যে বোঝেনি সে ত শিশুমাত্র। স্পেন্সার (Spencer) কান্ট বুঝতেন না, সম্ভবত সে কারণেই তিনি পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক হতে পারেননি। স্পিনোজা সম্বন্ধে হেগেলের এ কথাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেও উল্লেখ করা যায়ঃ 'দার্শনিক হতে হলে সর্বাগ্রে কান্টপড়া অত্যাবশ্যক।'

কান্টকে বুঝতে হলে আমাদেরও কান্টের অনুসারী হতে হবে। কিন্তু বস্তুত তা এক মুহূর্তে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ রাজনীতির মতো দর্শনেও দুই বিন্দুর দীর্ঘতম দূরত্ব হচ্ছে এক সরল রেখা। কান্টকে বুঝতে হলে কান্টের কাছে যেতে হবে সকলের শেষে। জেহোভার সঙ্গে এ দার্শনিকটির যেমন আছে সাদৃশ্য তেমনি আছে বৈসাদৃশ্যও, তিনি মেঘের আড়াল থেকেই কথা বলেন কিন্তু তাতে নেই বিদ্যুৎ ঝলকের আলো। তাঁর অপছন্দ ছিল দৃষ্টান্ত আর বস্তুনিষ্ঠতা—তা করলে, তাঁর যুক্তি অর্থাৎ লজিকের বইটি অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়তো। (তাই সংক্ষেপিত করা হয়েছে, এখন পৃষ্ঠা হয়েছে ৮০০)। আশা, তাঁর রচনা পাঠ করবে শুধু পেশাদার দার্শনিকরাই আর তাঁদের দরকার নেই দৃষ্টান্তের। তবুও কল্প দর্শনে সুপণ্ডিত তাঁর বন্ধু হার্জকে (Herz) যখন কান্ট তাঁর ক্রিটিকের (Critique) পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছিলেন তখন আর্ধেক মাত্র পড়ে হার্জ পাণ্ডুলিপিটি এ বলে ফেরৎ দিয়েছিলেন: 'আমার ভয় সবটা পড়লে আমি পাগল হয়ে যাবো!' এমন দার্শনিককে নিয়ে আমরা কি করতে পারি? তাঁর থেকে কিছুটা সম্মানজনক দূরত্বে আর নিরাপদে থেকেই করতে হবে শুরু, তাঁর দিকে এগুতে হবে সাবধানে আর ঘুরণ পথে। বিষয়-বস্তুর চারদিকে যে সব বিচিত্র কথা রয়েছে তা দিয়েই করতে হবে আরম্ভ তার পর ধীরে ধীরে, হাৎড়িয়ে হাৎড়িয়ে এগুতে হবে সে সূক্ষ্ম কেন্দ্র বিন্দুর দিকে যেখানে সব চেয়ে কঠিতম দর্শনের সম্পদ আর রহস্য রয়েছে লুক্কায়িত।

ক. ভল্টেয়ার থেকে কান্ট

এ হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসহীন কাল্পনিকযুক্তি থেকে কাল্পনিক যুক্তিহীন ধর্ম-বিশ্বাসে উত্তরণের পথ। ভল্টেয়ার মানে জ্ঞানালোক, বিশ্বকোষ আর যুক্তির যুগ। ফ্র্যান্সিস্ বেকনের উৎসাহ-উদ্দীপনার উত্তাপ মানুষের 'অসীম পূর্ণতা' আর সব সমস্যা সমাধানে লজিক আর বিজ্ঞানের যে শক্তি তার উপর প্রশ্নাতীত বিশ্বাসে যারা য়ূরোপকে (রুশো ব্যতীত) করে তুলেছিল অনপ্রাণীত। কণ্ডোর্সেট (Condorcet) জেলে বসেই লিখলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর 'Historical Tableau of the Progress of the Human spirit) (১৭৯৩খ্রীঃ)—জ্ঞান ও যুক্তির উপর অস্টাদশ শতাব্দীর যে আন্তরিক আস্থা ও বিশ্বাস তাই বর্ণিত হয়েছে এ বইতে, তিনি বলেছেন য়ুটোপিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বজনীন শিক্ষা ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। এমন কি তখন জার্মেনদের মত অমন অচঞ্চল জাতিরও ছিল খ্রীস্টিয়ান উল্‌ফের (Christian Wolff) মতো যুক্তিবাদী আর লেসিঙের (Lessing) মতো আশাবাদী। মননশীলতায় দেবত্ব আরোপ করে বিপ্লব-যুগের প্যারীর উত্তেজিত জনতা, রাস্তা থেকে এক সুন্দরী তরুণীকে ধরে এনে—'যুক্তির দেবী' আখ্যা দিয়ে তারই শুরু করে দিয়েছিল উপাসনা।

যুক্তির উপর এ অবিচলিত আস্থা, স্পিনোজাকে লজিক আর জ্যামিতির এক চমৎকার কাঠামো নির্মাণে করেছে সহায়তা: বিশ্ব হচ্ছে এক গাণিতিক পদ্ধতি। স্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধকে স্রেফ বাদ দিয়েই পৌঁছানো যায় এ যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্তে। বেকনের যুক্তিবাদ হব্‌সে (Hobbes) এসে পরিণত হয়েছে এক আপোষহীন নাস্তিক্য আর বস্তুবাদে—'অণু আর শূন্যতা' ছাড়া আর কিছুরই নাকি অস্তিত্ব নেই। স্পিনোজা থেকে দিদারো পর্যন্ত ধর্ম-বিশ্বাসের যে ভাঙ্গন আমরা দেখতে পাই তা যুক্তির অগ্রগতিরই ফল—একে একে অনেক অনড় বিশ্বাসই (Dogma) হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন, ভেঙ্গে পড়ল মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের গথিক গির্জা তার চমৎকার সব কারুকার্য আর অপরূপ গঠন নিয়ে, বুরবন রাজাদের মতো পুরোনো ঈশ্বরও হলো সিংহাসনচ্যুত, স্বর্গ পরিণত হলো স্রেফ আকাশে আর নরক হয়ে গেল শুধু এক আবেগী প্রকাশ। হেলভেটিয়াস (Helvetius) আর হলবাক (Holvach) ফ্রান্সের সেলনে সেলনে নাস্তিক্যকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে পাদ্রীরা পর্যন্ত তা গ্রহণ করে বসেছিল—ফ্রাসিয়া-রাজের আনুকূল্যে লা মেট্রি তা নিয়ে গেলেন জার্মেনিতেও বিক্রয় করতে। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে লেসিঙ্‌ নিজেকে স্পিনোজাপন্থী বলে ঘোষণা করে জেকোবিকে (Jacobic) অবাক করে দিয়েছিলেন—এসব ধর্ম বিশ্বাসের চরম অধঃপতনের লক্ষণ আর যুক্তি যে বিজয়ের পথে তারই পরিচয়-চিহ্ন।

অলৌকিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের আঘাত হানায় ডেভিড় হিউম (David hume) গ্রহণ করেছিলেন এক প্রবল ও গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা—হিউম বলেছেন যুক্তি যার বিরুদ্ধে অচিরে সে যুক্তিবিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আশা, য়ূরোপ-ভূমির সর্বত্র গজানো হাজার হাজার গির্জা চূড়া থেকে যা হয়েছে ধ্বনিত তা মানুষের হৃদয়ে আর সামাজিক সংস্থায় এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে যে তা যুক্তির বিরুদ্ধ রায়ের কাছে অত সহজে কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না আর এ ধিকৃত বিশ্বাস আর আশা যে বিচারকের যোগ্যতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুলবে তাও অনিবার্য এবং জানাবে যুক্তিকে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও পরীক্ষা করে দেখার দাবী। যে মেধা বা মনন হাজার হাজার বছরের আর লাখ লাখ মানুষের বিশ্বাসকে স্রেফ অনুমান বাক্যের সাহায্যে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাচ্ছে তার স্বরূপ কি? তা কি নির্ভুল, ভ্রান্তি-মুক্ত? না কি তাও মানবদেহের অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মতো আর এক প্রত্যঙ্গ নির্দিষ্ট কাজ ও শক্তিতে কঠোরভাবে সীমিত? এ বিচারককে বিচার করে দেখার সময় এসেছে—বিপ্লবের যে নির্মম বিচারকমণ্ডলী প্রাচীন সব আশা-ভরসার প্রতি এমন বেপরওয়া মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দিচ্ছে তাকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। সময় এসেছে যুক্তির সমালোচকের আবির্ভাবের।

খ. লকে (Locke) থেকে কান্ট

এ রকম পরীক্ষার পথ রচনা করেছে লকে, বার্কলে (Berkla) আর হিউমের রচনা—তবুও দেখা গেছে এর পরিণতিও হয়ে পড়েছে ধর্ম-বিরোধী। জন লকে (১৬৩২—১৭০৪) ফ্রান্সিস্ বেকনের আরোহ পরীক্ষা আর পদ্ধতিকে মনস্তত্বের বেলায় ও প্রয়োগ করার প্রস্তাব করে-ছিলেন—তাঁর সুবিখ্যাত 'Essay On Human Understanding (১৬৮৯) গ্রন্থেই সর্বপ্রথম আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে দেখা যায় যুক্তি ফিরে দাঁড়িয়েছে যুক্তির বিরুদ্ধে আর যে সব উপায় পদ্ধতিকে এতকাল বিশ্বাস করা হয়েছে এবার দর্শন শুরু করে দিলে তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দর্শনে এ আত্মপরীক্ষার আন্দোলন রিচার্ডসন আর রুশোর আত্মপরীক্ষামূলক উপ-ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে হয়েছে বর্ধিত—যেমন Clarissa Harlowe আর La Nouvella Heloise-এর আবেগ আর প্রবৃত্তির বর্ণাঢ্যতার বিপরীত দিকে বেড়ে উঠেছিল যুক্তি আর মননের উর্ধ্বে সহজাত-বৃত্তি আর অনুভূতির দার্শনিক গুণ-কীর্তন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানের উদয় হয় কি ভাবে? কোন কোন সৎলোক যে মনে করেন ন্যায়-অনায় বোধ আর ঈশ্বরের ধারণা মানুষের সহজাত, কোন রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আগে একেবারে জন্ম থেকেই এগুলি বিদ্যমান, এ কি সত্য? এখনো কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও ঈশ্বরকে দেখা যায়নি ফলে মানুষের মন থেকে পাছে ঈশ্বর বিশ্বাস তিরোহিত হয়ে যায় এ ভয়ে শাস্ত্রবিদরা ভাবলেন যদি কেন্দ্রীয় আর মৌলিক ধারণাগুলো প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষের মনে সহজাত বলে দেখিয়ে দেওয়া যায় তা হলে ধর্ম-বিশ্বাস আর নৈতিকবোধ হয়তো মজবুত হয়ে উঠবে। সৎ খ্রীস্টান হিসেবে লকে যদিও অত্যন্ত উচ্ছ্বাসিত ভাষায় খ্রীস্ট ধর্মের যুক্তি যৌক্তিকতার সপক্ষে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হতেন বটে কিন্তু তিনিও শাস্ত্রবিদদের ঐ সব অনুমান মানতেন না—বেশ শান্তচিত্তে ঘোষণা করেছেন আমাদের সব রকম জ্ঞানই অভিজ্ঞতা-লব্ধ আর ইন্দ্রিয়জাত। তিনি বলেছেন: "যা কিছু প্রথমে ইন্দ্রিয়-লব্ধ তা ছাড়া মনে আর কিছুই নেই।" জন্মের সময় মন থাকে স্রেফ এক ফর্দ সাদা কাগজ—অলিখিত এক ফলক, পরে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা তার উপর লিখতে থাকে হাজারো রকমের লেখা, যাকে সচেতনতা পরিণত করে স্মৃতিতে আর স্মৃতি থেকেই জন্মলাভ করে ভাব আর ধারণা। মনে হয় এসবই নিয়ে যায় এ চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে যে যেহেতু শুধু বস্তুই আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। অতএব বস্তু ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না, তাই বস্তু-তান্ত্রিক দর্শনই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। যদি চেতনাই চিন্তার উপকরণ হয়ে থাকে তা হলে বস্তু নিশ্চয়ই মনের উপাদান-ব্যস্তবাগীশদের এ হচ্ছে যুক্তি।

বিশপ জর্জ বার্কলে (১৬৮৪—১৭৫৩) বলেছেন মোটেও তা নয়। বরং জ্ঞানের লকীয় (Lockian) বিশ্লেষণ এ কথাই প্রমাণ করে যে মনের আকারে ছাড়া বস্তুর কোন অস্তিত্বই নেই। এক অতি সরল যুক্তি-সঙ্গত উপায়ে বস্তু বলে কোন কিছুই যে আমরা জানতে পারি না তা দেখিয়ে দিয়ে বস্তুবাদকে নস্যাৎ করার এ এক চমৎকার ধারণা—সারা য়ূরোপে একমাত্র গেলিক (Gaelic) কল্পনাই এমন পরা-বিজ্ঞানী যাদু বিদ্যার ধারণায় পৌঁছতে সক্ষম। বিশপ বলেছেন: এ ত এক পরিষ্কার কথা, স্বয়ং লকেই (Locke) কি বলেননি আমাদের সব জ্ঞান চেতনা-জাত? তাই যে কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যা জ্ঞান তা সে বস্তু সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের চেতনা আর সে সব চেতনা থেকে লব্ধ ভাব বা ধারণাই। যে কোন 'বস্তু' মানে কতকগুলি চেতনারই সমষ্টি অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ আর ব্যাখ্যাকরা চেতনাই। তুমি আপত্তি জানিয়ে বলতে পারো তোমার সকালের নাস্তাটা এক বোঝা চেতনা থেকে অনেক বেশী বাস্তব ও মূল্যবান আর যে হাতুড়িটা তোমাকে সূতোরের কাজ শিখতে সাহায্য করে সেটার বস্তু-রূপ অনেক বেশী চমৎকার। কিন্তু তোমার নাস্তাটা প্রথমে দৃশ্য, গন্ধ আর স্পর্শের চেতনা-স্তূপ ছাড়া ও কিছুই না। তারপর পাও স্বাদ এবং পরে আভ্যন্তরীণ আরাম আর উত্তাপ। তেমনি হাতুড়ি ও রঙ, আকার অবয়ব, ওজন আর স্পর্শ ইত্যাদির চেতনা-স্তূপ ছাড়া আর কি ওটা বস্তুরূপ তোমার জন্য কিছুমাত্র বাস্তব নয় বরং তোমার আঙুলের ভিতর দিয়ে যে চেতনা সঞ্চারিত হয় তাতেই নিহিত তার বাস্তব-সত্তা। তোমার কাছে অচেতন অবস্থায় হাতুড়ির অস্তিত্বও অনুপস্থিত। তোমার মৃত আঙুলে চিরকাল ধরে হাতুড়ি-পেটা হলেও তোমার সামান্যতম মনোযোগও ওটা আকর্ষণ করতে অক্ষম। শুধু চেতনা-স্তূপ বা স্মৃতি-স্তূপেরই যা কিছু মূল্য—আর এ হচ্ছে মনেরই অবস্থা। যতদূর আমরা জানি, মানসিক অবস্থারই নাম বস্তু—সাক্ষাতভাবে একমাত্র যে বাস্তবকে আমরা জানি তা হচ্ছে মন। বস্তুবাদ সম্বন্ধে এ পর্যন্তই।

আইরিশ বিশপটি কিন্তু স্কস্-সংশয়বাদীকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ডেভিড হিউম (১৭১১—১৭৭৬) 'মানব স্বভাব' (**Treatire on Human Nature**) নামে এক ধর্মোদ্রোহী গ্রন্থ লিখে সারা খ্রীস্টিয় জগতকে হতচকিত করে দিয়েছিল। এ গ্রন্থ আধুনিক দর্শনের এক চমৎকার ক্লাসিক। হিউম বলেছেন—বস্তুকে আমরা যেভাবে জানি, মনকেও জানি সেভাবে অর্থাৎ উপলব্ধির দ্বারা, অবশ্য এটি সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক। 'মন' বলে কোন পৃথক অস্তিত্বেরই আমরা ধারণা করতে পারি না—আমরা পৃথক পৃথকভাবে উপলব্ধি করি ভাব, স্মৃতি, অনুভূতি ইত্যাদি। মন কোন রকম বস্তু নয়, এমন কোন যন্ত্রও নয় যার মধ্যে নানা রকম ভাব সব নিহিত রয়েছে বরং ঐ হচ্ছে কতকগুলি ভাব-সমষ্টির এক বিমূর্ত নাম মন হচ্ছে উপলব্ধি, স্মৃতি আর অনুভূতি। চিন্তা প্রক্রিয়ার অন্তরালে দৃশ্যমান কোন 'আত্মা'ই নেই। ফল হলো এ যে বার্কলে যেমন বস্তুকে করেছেন সম্পূর্ণ ধ্বংস তেমনি হিউম করলেন মনকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই রইল না বাকি—দর্শন এখন নিক্ষিপ্ত হলো নিজের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে। জনৈক রসিক ব্যক্তি যে এ বলে এ বিতর্ক ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই : 'বস্তু নেই, মনে করার কারণ নেই।'

কিন্তু হিউম আত্মার ধারণা বিনষ্ট করে গোঁড়া ধর্ম-মতকে খতম করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হননি, আইন বা বিধি বিধানের যে ধারণা তা ভেঙ্গে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানকেও ধ্বংস করতে। ব্রুনো (Bruno) আর গেলেলিয়োর (Galileo) সময় থেকে বিজ্ঞান আর দর্শন সমভাবে প্রাকৃতিক বিধিকে 'কারণের' উপর প্রভাবের 'অত্যাবশ্যক' শর্ত বলে প্রয়োগ করে এসেছেন। এ গর্বিত উপলব্ধির উপর স্পিনোজা ও তাঁর মহান পরাবিজ্ঞানকে তুলেছেন গড়ে। হিউমের মতে আমরা কারণ বা বিধি-বিধান উপলব্ধি করি না আমরা উপলব্ধি করি ঘটনা আর পরিণতি, পরে অনুমান করে নিই, কারণ আর প্রয়োজন। ঘটনা কোন বিশেষ বিধি-বিধানের আনুগত্য মেনে চলবে এমন কোন চিরন্তন আর অত্যাবশ্যক নির্দেশ নেই—বরং ঐ হচ্ছে আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার এক সংক্ষিপ্ত-সার ও সংকেত লেখন। এ বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র সুনিশ্চিত নয় যে এ যাবৎ যে সব পরিণতি আমরা দেখেছি তা আমাদের ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতায়ও অবিকল তেমনিই দেখা যাবে। 'আইন' মানে ঘটনা পরম্পরার মধ্যে একটা রীতি মাত্র কিন্তু রীতিতে 'অত্যাবশ্যকতা' বলে কিছু নেই। অত্যাবশ্যকতার স্থান আছে শুধু গাণিতিক সূত্রে বা ফরমূলায়—ঐ সবই স্বাভাবিক আর অপরিবর্তিত ভাবে সত্য। কারণ এসব স্রেফ পুনরাবৃত্তি—বিধেয় আগে থেকেই নিহিত রয়েছে কর্তৃপদে—৩ × ৩ = ৯, এ যে চিরন্তন আর 'অত্যাবশ্যক'' সত্য তার কারণ ৩ × ৩ আর ৯ একই, শুধু ভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে—বিধেয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগ করে না কিছুই। বিজ্ঞানের তাই উচিত গণিতে আর সাক্ষাত অভিজ্ঞতায় সীমিত হয়ে থাকা—'আইন' বা বিধি-বিধানের অপরিমীত অনুমানের উপর তা নির্ভর করতে পারে না কিছুতেই। আমাদের এ সাংঘাতিক সংশয়বাদীটি লিখলেন : ''এসব নীতির তাড়নায় আমরা যদি পাঠাগারে ঢুকে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করি, কি সর্বনাশই না আমরা করে বসব। স্কুল-পরাবিজ্ঞানের যে কোন বই হাতে তুলে নিয়ে আমরা যদি প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা করি : 'সংখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা পরিমাণ সম্বন্ধে এখানে কোন বিমূর্ত যুক্তির সন্ধান মিলবে কি?' না। "ঘটনা আর অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষিত কোন যুক্তি আছে কি এখানে?' না। তা হলে এটাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর—কারণ, এতে মায়া আর কুতর্ক ছাড়া আর কিছুই নেই।"

এসব কথা শুনে গোঁড়াদের কান কিভাবে ঝাঁ ঝাঁ করেছিল তা অনুমান করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ঐতিহ্য অর্থাৎ জ্ঞানের স্বভাব। উৎস আর সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের যে কথা এখানে বলা হলো তা কিছুতেই ধর্মের সহায়ক নয়—যে তরবারি দিয়ে বিশপ বার্কলে বস্তুবাদের দৈত্য-মূর্তিকে নিহত করেছিল তা এখন বস্তুহীন মন আর অমর আত্মার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো—এ সংঘর্ষে বিজ্ঞানও আহত হলো ভীষণভাবে। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইমানুয়েল কান্ট্ যখন সর্বপ্রথম ডেভিড হিউমের রচনার জার্মেন অনুবাদ পাঠ করলেন তখন তার ফলাফল দেখে তিনি যে ভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই—ধর্মের মূল কথা আর বিজ্ঞানের ভিত্তি সম্বন্ধে বিনা প্রশ্নে এতকাল 'যে স্থির-বিশ্বাসের সুখ-নিদ্রার' তিনি ছিলেন, তাঁর ভাষায় তিনি হঠাৎ তার থেকে জেগে উঠলেন। বিজ্ঞান আর ধর্ম বিশ্বাস এ দুইকি শেষকালে সংশয়বাদীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে? এদের বাঁচানো যায় কি করে?

গ. রুশো থেকে কান্ট

যুক্তি যে বস্তুবাদের সমর্থক, জ্ঞানপন্থীদের এ দাবীর উত্তরে বার্কলের দাবী হচ্ছে বস্তুর কোন অস্তিত্বই নেই। এ যুক্তির অনুসরণে হিউমের পাল্টা দাবী হলো তা হলে মন বলেও কিছুর অস্তিত্ব নাস্তি। সম্ভাব্য আর একটা উত্তর হলো—একমাত্র যুক্তিই শেষ পরীক্ষা নয়। এমন অনেক চিন্তাগত সিদ্ধান্ত আছে যার বিরুদ্ধে আমাদের সর্বসত্তা বিদ্রোহ জানায়—আমাদের স্বভাবের এসব দাবীকে লজিক বা যুক্তিবিদ্যার নির্দেশে পঙ্গু করে দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ লজিকও ত অতি হালে আমাদের নেহাৎ নাজুক আর ভ্রান্তিজনক অংশেরই এক গঠন। কত বারই আমাদের সহজ প্রবৃত্তি আর অনুভূতি প্রত্যাখান করে হটিয়ে দিয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুমান বাক্যকে, যে অনুমান-বাক্য চায় আমরা জ্যামিতির চিত্রের মতো ব্যবহার করি আর গাণিতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভুলতার সঙ্গে করি প্রেম সময় সময় অবশ্য—যেমন অভিনব নাগরিক জটিলতা আর কৃত্রিমতার ব্যাপারে যুক্তিই যে উত্তম পথ-নির্দেশক তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু জীবনের বড় বড় সঙ্কটে, মহৎ বিশ্বাস ও আচরণের সময় আমরা বিশ্বাস ন্যস্ত করি কোন রকম চিত্রের উপর নয় বরং আমাদের অনুভূতির উপর। যুক্তি যদি ধর্ম বিরোধী হয় তা যুক্তিরই মন্দ ভাগ্য। ফলত এ ছিল জাঁ জেকোয়েস রুশোর (১৭১২—১৭৭৮) যুক্তি। ফ্রান্সে তিনি প্রায় একক জ্ঞান-পন্থীদের বস্তুবাদ আর নাস্তিক্যের বিরুদ্ধে করেছেন সংগ্রাম। এক অতি দুর্বল-দেহ স্নায়বিক প্রবণের এ কি ভাগ্য—তাঁকে সংগ্রামে নামতে হয়েছে সবল যুক্তিবাদ আর বিশ্বকোষপন্থীদের প্রায় পাশবিক সুখবাদের বিরুদ্ধে! রুশো ছিল এক রোগা তরুণ, শারিরীক দুর্বলতা, পিতামাতা আর শিক্ষকের উপেক্ষা ও সহানুভূতিহীন ব্যবহার যাকে ঠেলে দিয়েছে অন্তর্মুখীন চিন্তার জাবর কাটায়। বাস্তব-জীবনের দংশনের হাত এড়াবার জন্যই তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বপ্নরাজ্যের উষ্ণগৃহে—যে জয় ও প্রেম থেকে তিনি জীবনে বঞ্চিত হয়েছেন সেখানে বসে অন্ততঃ তা কল্পনায় ভোগ করতে পারতেন এ আশায়। এক অতি সূক্ষ্ম ভাবালুতার সঙ্গে সম্মান আর শোভনতার স্থূল চেতনার এক আপোষহীন জটিলতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'জবানবন্দী'তে (Confessions)—যার সর্বত্র ফুটে উঠেছে তাঁর নৈতিক প্রাধান্যের উপর এক অকৃত্রিম বিশ্বাস।

১৭৪৯-এ ডিজনের একাডেমী (The Academy of Digjon) "বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্রমোন্নতি মানুষের নৈতিক বিশুদ্ধি সাধনে না অধঃপাত ঘটনে সহায়তা করেছে?" এ বিষয়ে একটি রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। রুশোর রচনাই পেয়েছিল পুরস্কার। সংস্কৃতি মানুষের যত না ভালো করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী করেছে মন্দ—সংস্কৃতি যার নাগালের বাইরে তেমন লোক যে তীব্র আন্তরিকতার সঙ্গে সংস্কৃতির অসারতা প্রমাণ করতে যায় তিনি ও সে রকমভাবে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি পেশ করেছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র য়ূরোপে যে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল তা এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। যেখানেই দর্শনের ক্রমোন্নতি ঘটেছে সেখানেই অবনতি ঘটেছে জাতির নৈতিক স্বাস্থ্যের। "এমন কি দার্শনিক-দের মধ্যেও একথা চলতি ছিল যে শিক্ষিত পণ্ডিতদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মানুষ হয়েছে অদৃশ্য, দুষ্প্রাপ্য।" "আমি বলছি বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে স্রেফ ধ্যান করা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ স্রেফ চিন্তাশীল (এখন যাকে আমরা 'বুদ্ধিজীবী' বলছি) হচ্ছে এক বিকৃত পশু।" মননশীলতার অত বেশী দ্রুত উন্নয়ন ছেড়ে হৃদয় আর স্নেহ-বৃত্তির চর্চা করাই ভালো। শিক্ষা মানুষকে সৎ করে তোলে না করে তোলে শুধু চালাক—তাও প্রধানতঃ দুষ্কর্মের জন্য। যুক্তির চেয়ে সহজ-প্রবৃত্তি আর অনুভূতি অধিকতর নির্ভরশীল।

বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতি যে শ্রেষ্ঠ একথা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস **La Nouvell Heloise**-এ (১৭৬১) রুশো সবিস্তার বর্ণনা করেছেন—অভিজাত মহিলা আর কোন কোন পুরুষের মধ্যেও ভাবালুতা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় এক শতাব্দী ধরে ফরাসীতে সিঞ্চিত হয়েছিল সাহিত্যিক জল। পরে সত্যিকার অশ্রু। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মননশীলতার যে 'মহৎ আন্দোলন' তা এবার নতি স্বীকার করলো ভাবালুতার এক রোমান্টিক সাহিত্যে (১৭৮৯—১৮৪৮)। এ স্রোতই নিয়ে এলো ধর্ম-চেতনার এক প্রবল পুনর্জীবন। শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর যুগান্তকারী রচনা **Emile**-এ (১৭৬২) তিনি "**Confession of faith of the Savoyard Vicar**" অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, এরই প্রতিধ্বনি হচ্ছে **Chateaubriand**-এর **Ginie du christianisme**-এর ধর্মোন্মত্ততা। সংক্ষেপে রুশোর 'জবানবন্দীর যুক্তি হচ্ছে এই: যদি যুক্তি ঈশ্বর আর অমরতায় বিশ্বাসের পরিপন্থী কিন্তু অনুভূতি প্রবলভাবে তার সপক্ষে—এ ব্যাপারে আমরা সহজাত-প্রবৃত্তিকে বিশ্বাস না করে কেন নীরস সংশয়বাদের নৈরাশ্যে আত্মসমর্পণ করতে যাবো?

কান্ট যখন **Emile** পড়তে শুরু করেন তখন বইটি এক বৈঠকে শেষ করার জন্য তিনি বৃক্ষ ছায়ায় তাঁর প্রাত্যহিক পদ-চারণা বন্ধ রেখেছিলেন। এখানে তিনি আর একজনকে খুঁজে পেলেন যিনিও নাস্তিকতার অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছেন—যিনি এসব অতিন্দ্রীয় ব্যাপারে কাল্পনিক যুক্তির ও অনুভূতির শ্রেষ্ঠত্ব সজোরে ঘোষণা করেছেন। ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে এখানে অন্ততঃ দ্বিতীয় উত্তর পাওয়া গেলো। শেষে ধারণা হলো এখন ধর্মের প্রতি অবজ্ঞাকারী আর সংশয়ীদের করা যাবে বিতাড়িত। যুক্তির এসব সূত্রকে একত্র গ্রথিত করে, বার্কলের আর হিউমের ভাবের সঙ্গে রুশোর অনুভূতিকে মিলিয়ে ধর্মকে যুক্তির হাত থেকে রক্ষা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেও সংশয়বাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা—এ হলো ইমানুয়েল কান্টের মিশন বা ব্রত।

২. কান্টের পরিচয়

১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়ার অন্তর্গত কনিস্‌বার্গে ইমানুয়েল কান্টের জন্ম। স্বল্পকালের জন্য নিকটবর্তী এক গ্রামে শিক্ষকতা করতে যাওয়া ছাড়া এ ক্ষুদ্রকায় শান্ত প্রকৃতির অধ্যাপকটি যিনি দূর দেশের ভূগোল আর নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে ভালোবাসতেন—তাঁর স্বগ্রাম ছেড়ে কখনো বাইরে পা বাড়াননি। তিনি এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান—ইমানুয়েলের জন্মের প্রায় শত বছর আগে তাঁদের পরিবার স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করে আসেন। তাঁর মা ছিলেন যাকে বলে পরহেজগারপন্থী (**Pictist**)—অর্থাৎ এমন এক ধর্ম সম্প্রদায়ের সদস্য যারা ইংলণ্ডের মেথোডিস্টদের মতো ধর্ম বিশ্বাস আর ধর্মানুষ্ঠান পালনে দাবী করতো কঠোর নিষ্ঠা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের দার্শনিক প্রবরকে এত বেশী ধর্মে ডুবে থাকতে হতো যে তার ফলে একদিকে তাঁর মনে এমন এক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয় যে সারা বয়স্ক-জীবনে তিনি গির্জার ত্রি-সীমাও আর মাড়াননি অন্যদিকে শেষ পর্যন্ত জার্মান পিউরিটানের বিষণ্ণতার চাপ তাঁর মধ্যে হয়েছিল স্থায়ী। আর যতই বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ততই তাঁর মা তাঁর মনে যে গভীর ধর্ম-বিশ্বাস সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন অন্ততঃ তার সারটুকু নিজের আর বিশ্বের জন্য রক্ষায় তিনি এক প্রবল আকাংক্ষা বোধ করেছিলেন।

কিন্তু ফ্রেডেরিক আর ভল্টেয়ারের যুগে যে তরুণের জন্ম তার পক্ষে যুগের সংশয়বাদের স্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে যাঁদেরে খণ্ডন করাই তাঁর লক্ষ্য তাঁদের দ্বারাই তিনি বেশী করে হয়েছেন প্রভাবিত—সম্ভবত তাঁর প্রিয় শত্রু হিউমের দ্বারা হয়েছেন অধিকতর প্রভাবিত। একজন দার্শনিক তাঁর প্রবীন বয়সের রক্ষণশীলতার সীমা ছাড়িয়ে তাঁর শেষ রচনায়, প্রায় সত্তর বছর বয়সে এমন এক প্রবল উদারতায় পেঁৗচেছিলেন যে বয়স আর খ্যাতি তাঁর সহায়ক না হলে যা তাঁর জন্য নিয়ে আসতো শহিদী—শেষকালে এমন অত্যাশ্চর্য ব্যাপারও আমরা দেখেছি। এমন কি ধর্মের পুর্ণজীবন চেষ্টার সময় আমরা এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কান্টের কন্ঠস্বর শুনেছি যাকে সহজেই ভল্টেয়ারের বলে ভুল করা সম্ভব। শোপেনহাওয়ারের ভাষায়—"এটা মহান ফ্রেডেরিকের জন্য কম প্রশংসার কথা নয় যে তাঁর রাজত্বের সময়ই কান্ট নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছেন আর সাহস করেছেন Critique of pure reason-এর মতো বই প্রকাশ করতে। অন্য কোন গভর্ণমেন্টের আমলেই একজন বেতনভোগী অধ্যাপক (অর্থাৎ জার্মানীতে সরকারী চাকুরে) এমন কাজ করতে সাহসই করতো না। মহান সম্রাটের অব্যবহিত ওয়ারিশকে তিনি আর কোন বই লিখবেন না বলে এ প্রতিশ্রুতি দিতে কান্ট বাধ্য হয়েছিলেন।" এ স্বাধীনতার স্বীকৃতি স্বরূপই কান্ট ফ্রেডেরিকের দূরদর্শী ও প্রগতিশীল শিক্ষামন্ত্রী জেড্লিট্জ্কে (Zedlistz) তাঁর ক্রিটিক (critique) উৎসর্গ করেছিলেন।

১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে কান্টের কর্ম-জীবনের শুরু কনিজ্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বে-সরকারী লেক্চারার হিসেবে। প্রায় পনের বছর ধরে তাঁকে রেখে দেওয়া হয় এ স্বল্পবেতনের চাকুরীতে—অধ্যাপক পদের জন্য দুই দুইবার দরখাস্ত করে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। অবশেষে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে নিয়োগ করা হলো লজিক আর পরাবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে। শিক্ষক-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি এক পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেন—ঐ বই সম্বন্ধে তিনি বলতেন ঐ বইতে অনেক চমৎকার চমৎকার উপদেশ আছে তবে তার একটিও তিনি নিজে কখনো প্রয়োগ করেন নি। তবুও মনে হয় লেখকের চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন শিক্ষক হিসেবে—দুই প্রজনন ছাত্রসমাজ তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর একটি ব্যবহারিক নীতি ছিল এই: তিনি মাঝারি ছাত্রদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতেন। তাঁর মতে বোকাদের সাহায্য করে কোন লাভ নেই আর প্রতিভাবানেরা নিজেরাই সক্ষম নিজেদের সাহায্য করতে।

পরাবিজ্ঞানের নবতর কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তিনি পৃথিবীকে চমকে দেবেন এ কেউ আশা করেনি—মনে হয় এ রকম নেহাৎ ভীরু ও বিনয়ী অধ্যাপকের পক্ষে কাকেও চমকে দেওয়ার মতো অপরাধ করা সম্ভব এ কল্পনা করাও যায় না। এ বিষয়ে তাঁর নিজেরও কোন প্রত্যাশা ছিল না—বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি লিখেছিলেন: "পরাবিজ্ঞানী প্রেমিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া আমার এক ভাগ্য বটে কিন্তু আমার নায়িকা এযাবৎ আমার প্রতি অতি সামান্য অনুগ্রহই বর্ষন করেছেন।" সে সময় তিনি বলতেন—পরাবিজ্ঞানের অতল গহ্বর"আর পরাবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর উক্তি হচ্ছে—কূলহীন আর বাতিঘরবিহীন এক কালো সমুদ্র" যাতে ছড়িয়ে আছে বহু দর্শন-তরীর ভগ্নাবশেষ। কল্পনার মিনার-চূড়ে যে সব পরাবিজ্ঞানের বাস তাদেরে আক্রমণ করতেও তিনি ছাড়তেন না, বলতেন "সাধারণতঃ ওখানে বেশী করে বইতে থাকে হাওয়া।" তিনি আগাম দেখতে পাননি যে পরাবিজ্ঞানী বৃহত্তম ঝড়ের হাওয়া তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন বইয়ে। জীবনের এ শান্ত দিনগুলিতে তত্ত্ব বিজ্ঞানের চেয়ে তিনি অধিকতর কৌতূহলী ছিলেন পদার্থিক ব্যাপারে। তিনি গ্রহ, ভূমিকম্প, আগুন, বাতাস, আকাশ, ভূগোল, নৃতত্ত্ব এবং আরো শত শত বিষয়ে লিখেছেন যার সঙ্গে কোন যোগাযোগই নেই পরা-বিদ্যার। তিনি তাঁর **Theory of the Heavens**-এ (১৭৫৫) যে সব কথা বলেছেন তার সঙ্গে লাপলেসের **(Laplace)** নীহারিকা সম্বন্ধীয় কল্পনার রয়েছে সাদৃশ্য এবং সব রকম নাক্ষত্রিক গতি আর তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তিনি একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতেও করেছিলেন চেষ্টা। কান্টের ধারণা সব গ্রহেই বসতি আছে অথবা হবে বসতি স্থাপিত, আর যে সব গ্রহ সূর্য থেকে দূরতম স্থানে রয়েছে, তাদের সৃষ্টি হতে দীর্ঘতম সময় লেগেছে বলে খুব সম্ভব সে সবে আমাদের গ্রহ থেকেও উন্নততর বুদ্ধির অধিকারী জীব রয়েছে। তাঁর মানব-পুরাতত্ত্ব (**Anthropology**) নাম দিয়ে ১৭৯৮তে তাঁর সারা জীবনের বক্তৃতাবলীর যে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে) পশু থেকেই মানব-আবির্ভাবের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও তিনি ইংগিত করেছেন। কান্টের যুক্তিঃ আদিম যুগে মানব-শিশু যদি এখনকার মতো জন্মাবার পর চীৎকার দিয়ে কেঁদে উঠতো তা হলে বন্যপশুরা সহজে সন্ধান পেয়ে তাদের খেয়েই সাবাড় করে দিতো কারণ তখনো মানুষ অনেকখানি নির্ভর করতো এ সব হিংস্রপ্রাণীর করুণার উপর। কাজেই সভ্যতার ফলে মানুষ এখন যা হয়েছে খুব সম্ভব আদি করলে সে রকম ছিল না—ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। এর পর কিছুটা সূক্ষ্মভাবে কান্ট বলেছেনঃ "প্রকৃতি কিভাবে এ বিকাশ সাধন করেছে আর কি কি তার সহায়ক হয়েছিল তা আমাদের অজ্ঞাত। এ মন্তব্য খুব সুদূরপ্রসারী। এ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে এ চিন্তার উদয় হয় যে, ইতিহাসের এ বর্তমান অধ্যায়, এক বিরাট আধিভৌতিক বিপ্লবের সময়, যার তৃতীয় পুনরাবৃত্তি নাও ঘটতে পারে—বানর, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদিরও এমন সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজাবে যা দিয়ে হাঁটা যায়, যায় স্পর্শ করা ও কথা বলা, স্পষ্টভাবে যা হয়ে দাঁড়াবে মানব-গঠনের মতো—তারা তখন অধিকারী হবে বোধ-শক্তির কেন্দ্রীয় যন্ত্রেরও, তারপর সামাজিক সব সংস্কার শিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণে তারা ক্রমশঃ এগিয়ে যাবে উন্নতির পথে।" মানুষের উদ্ভব যে পশু থেকে হয়েছে অপ্রত্যক্ষভাবে এ কথাটা বলতে গিয়ে সতর্কতার খাতিরেই কি কান্ট ভবিষ্যৎকালের (Future tence) ব্যবহার করেছেন? এ সোজা-সরল ক্ষুদ্র লোকটির বিকাশ খুব ধীরে ধীরেই হয়েছে—লম্বায় তিনি পাঁচ ফিটও ছিলেন না, ছিলেন লাজুক আর সঙ্কোচিত স্বভাব কিন্তু তাঁর মগজে ছিল বা তার থেকে নির্গত হয়েছে আধুনিক দর্শনের সবচেয়ে সুদূর প্রসারী বিপ্লব। কান্টের এক জীবনীকার বলেছেন—কান্টের জীবন ছিল সময়নিষ্ঠ ক্রিয়ার (Verbs) মধ্যেও সবচেয়ে সময়নিষ্ঠ। হেউনে (Heine) বলেছেন: "ঘুম থেকে ওঠা, কফি খাওয়া, লেখা, ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়া, খাওয়া, হাঁটা প্রত্যেকটা কাজের নির্দিষ্ট সময় ছিল-তাঁর। যখন কান্ট তাঁর ধূসর কোটটা গায়ে চাপিয়ে, হাতে ছড়ি নিয়ে তাঁর ঘরের দুয়ারে দেখা দিতেন আর শুরু করতেন ছায়া-ঢাকা ছোট্ট সড়কে হাঁটা—যে পথটাকে এখনো লোকে 'দার্শনিকের হাঁটা-পথ' বলে অভিহিত করে, তখন প্রতিবেশীরা ধরে নিত এখন ঠিক বেলা সাড়ে তিনটা। এভাবে সব ঋতুতে তিনি উপরে-নীচে পায়চারি করে বেড়াতেন। আবহাওয়া থম থমে থাকলে অথবা মেঘ-ঢাকা আকাশ থেকে বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে তখন দেখা যেতো তাঁর পুরোনো ভৃত্য লেম্পে (Lampe) যেন পরিণামদর্শিতার প্রতীক হিসেবে বগলে একটা বড় ছাতা নিয়ে ত্রস্তপদে তাঁর অনুসরণ করছেন।"

তিনি এত দুর্বল দেহ ছিলেন যে নিজেই অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজের পথ্যাপথ্য নিয়ন্ত্রণ করে চলতেন—ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার চেয়ে এটাই তিনি অধিকতর নিরাপদ মনে করতেন। এভাবে তিনি জীবনের আশি বছর কাটিয়েছেন। সত্তর বছর বয়সে তিনি "সংকল্পের জোরে রোগানুভূতি আয়ত্তে মনের শক্তি" এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি প্রিয় নীতি ছিল, বিশেষ করে যখন ঘরের বাইরে থাকতেন—শুধু নাক দিয়ে নিশ্বাস নেওয়া। তাই শরতে, শীতে আর বসন্তে পায়চারি করার সময় তিনি কাকেও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দিতেন না। তাঁর মতে ঠাণ্ডা হয়ে থাকার চেয়ে চুপ করে থাকা অনেক ভালো। পায়ে মোজা ঠিক রাখায়ও তিনি দর্শন প্রয়োগ করতেন—মৌজার বন্ধনীর এক প্রান্ত পেন্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখতেন আর পকেটে থাকতো ছোট্ট একটা বাক্সে স্প্রিং লাগানো, এ স্প্রিংগের সঙ্গে মৌজার বন্ধনীর থাকতো যোগাযোগ যে কোন কাজ করার আগে সযত্নে অনেক কিছু ভেবে নিতেন—ফলে দীর্ঘজীবনে তিনি রয়ে গেছেন চিরকুমার। দুই দুইবার বিয়ের সঙ্কল্প করেছিলেন—কিন্তু তিনি এত বেশী ভাবতে লাগলেন যে প্রথমবারের মহিলাটি তাঁকে ছেড়ে অধিকতর সাহসী অন্য একজনকে বিয়ে করে ফেল্লেন তাড়াতাড়ি দ্বিতীয়বারে দার্শনিক প্রবর সিদ্ধান্ত গ্রহণে এত বেশী গড়িমসি করছেন দেখে মহিলাটি বিরক্ত হয়ে কনিজবার্গ ছেড়ে চলেই গেলেন অন্যত্র। সম্ভবতঃ নীটশের মতো তিনিও মনে করতেন বিয়ে সত্যানু-সন্ধানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। টেলিরেণ্ড (Talleyrand) প্রায়ই বলতেন: "বিবাহিত লোক অর্থের জন্য যা তা করতে সক্ষম।" আর মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে এক অসীমশক্তিমান তরুণের উচ্ছ্বসিত উদ্দীপনার সাথে কান্ট লিখেছেন: "আমার পথ আমি ঠিক করে নিয়েছি, আমার সঙ্কল্প সে পথ ধরেই চলা। আমি আমার কাজ করতে থাকবো কিছুই আমাকে তার থেকে পারবে না নিবৃত্ত করতে।"

লোকচক্ষুর অন্তরালে আর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেও তিনি নিজের অধ্যবসায় অটুট রেখে প্রায় পনর বছর ধরে পরিকল্পনা করেছেন। লিখেছেন, কেটে নতুন করে আবার লিখেছেন, তাঁর সব চেয়ে স্মরণীয় গ্রন্থ শেষ করেছেন মাত্র ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি পৌঁচেছেন সাতান্ন বছর বয়সে। কেউ বোধ করি কোনদিন এত ধীরে ধীরে প্রবীণতায় পৌঁচেননি আর কোন গ্রন্থই কোনদিন দার্শনিক জগতে সৃষ্টি করেনি এমন আলোড়ন, ঘটায়নি এমন বিপর্যয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. বিশুদ্ধ যুক্তির বিশ্লেষণী সমালোচনা (The Critique of pure reason)

এ শিরোনামার অর্থ কি? ক্রিটিক (Critique) মানে সঠিক সমালোচনা নয় বরং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ। একেবারে শেষের দিকে ছাড়া কান্ট বিশুদ্ধ যুক্তিকে আক্রমণ করেননি, তাও করেছেন তার সীমাবদ্ধতা দেখাবার জন্যই। উপরন্ত তার সম্ভাবনা দেখার আশাই তিনি করেছিলেন বেশী—ইন্দ্রিয়ের বিকৃত পথে যে অশুদ্ধ জ্ঞান আমরা লাভ করি তার উপর চেয়েছিলেন বিশুদ্ধ যুক্তিকে তুলে ধরতে। বিশুদ্ধ যুক্তি মানে যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়পথে লব্ধ নয়—যা সব রকম ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন। যে জ্ঞান জন্মগত স্বভাব আর মনের গঠনের এলেকাধীন।

কান্ট শুরুতেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন ল'কেকে আর ঐ মতাবলম্বী ইংরেজি স্কুলকে—তাঁর মতে সব জ্ঞান ইন্দ্রিয়পথে আহৃত হয় না। হিউম মনে করতেন আত্মা নেই, বিজ্ঞান নেই, এ তিনি দেখাতে পেরেছেন—আমাদের মন হচ্ছে আমাদের সহযোগ আর ভাবের মিছিল মাত্র আর যা সুনিশ্চিত বলে আমরা মনে করি তা সব সময় বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কাজনক সম্ভাবনা মাত্র। কান্টের মতে এসব ভুল সিদ্ধান্ত ভুল প্রস্তাবেরই ফল: তোমরা আগেই ধরে নাও যে সব জ্ঞানের উৎস হচ্ছে "পৃথক আর বিশিষ্ট" ইন্দ্রিয়-বোধ। স্বভাবতই এসব এমন কোন প্রয়োজনীয় অথবা অপরিবর্তিত পরিণতি দিতে পারে না যার সম্বন্ধে তুমি চির-সুনিশ্চিত থাকতে পারো। স্বভাবতই এমনকি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও তুমি আত্মাকে 'দেখতে পাবে' তা আশা করতে পারো না। এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে যদি সব জ্ঞান ইন্দ্রিয় পথেই আসে, আসে একটা বাইরের স্বাধীন জগত থেকে যা সম ও নিয়মিত ব্যবহারের কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না তা হলে জ্ঞানের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়া যদি আমরা জ্ঞান পেতে পারি, যে জ্ঞানের সত্যতা সম্বন্ধে পূর্ব অনুমান বা অভিজ্ঞতার আগে থেকেই নিশ্চিত হতে পারি তা হলে কেমন হয়? তা হলেই পূর্ণ সত্য আর পূর্ণ বিজ্ঞান সম্ভব, তা নয় কি? পরিপূর্ণ জ্ঞান বলে কিছু আছে কি? প্রথম ক্রিটিকের এটিই সমস্যা। "অভিজ্ঞতার সব বিষয়বস্তু আর সহায়তা যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা হলে যুক্তি দিয়ে আমরা কি পাওয়ার আশা করতে পারি। এ হচ্ছে আমার প্রশ্ন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিটিক হয়ে উঠেছে চিন্তার এক শারীর-বিজ্ঞান করা হয়েছে ওটাকে উপলব্ধির মূল আর বিবর্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা আর মনের জন্মগত গঠন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ। কান্টের বিশ্বাস এসবই পরাবিজ্ঞানের সমস্যা। "এ গ্রন্থে প্রধানতঃ আমি একটা পরিপূর্ণতায় পৌঁচতে চেয়েছি—আমি জোর দিয়ে বলতে চাই পরাবিজ্ঞানের এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান এখানে বাৎলানো হয়নি—অন্তত তার সমাধানের চাবিটা করা হয়নি এখানে সরবরাহ।" প্রকৃতি আমাদের এমন অহংবোধকেই দিয়ে থাকে স্থষ্টির প্রেরণা।

ক্রিটিক অনতিবিলম্বে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। "আমাদের বোধ-শক্তিকে সীমিত করে রাখার জন্য কিছুতেই অভিজ্ঞতা একমাত্র ক্ষেত্র নয়। অভিজ্ঞতা যা আছে তাই শুধু জানায় কিন্তু তার বহির্ভুত যা তা বা অন্য কিছু জানায় না। কাজেই তা কখনো যা যথার্থ সাধারণ সত্য তা আমাদের জানায় না—ঐ রকম জ্ঞানের জন্যই আমাদের যুক্তি-বোধ উৎসুক, এ আমাদের ঔৎসুক্যকে জাগায় বটে কিন্তু তৃপ্ত করে না। যা সাধারণ সত্য তাতে আভ্যন্তরিণ প্রয়োজনের এমনি চরিত্র নিহিত থাকে—এমন সত্যকে নিশ্চয়ই হতে হবে অভিজ্ঞতামুক্ত, পরিচ্ছন্ন আর আত্মপ্রত্যয়ী।" অর্থাৎ আমাদের পরবর্তী অভিজ্ঞতা যাই হোক তারা যেন সত্য থাকে, এমনকি অভিজ্ঞতার আগেও যেন থাকে সত্য—পূর্ব অনুমানসিদ্ধ সত্য।" কারণ কার্য জ্ঞানের পথে সব অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারি গণিতশাস্ত্রই ত দেখিয়েছে তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। গাণিতিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক আর সুনিশ্চিত—ভবিষ্যত অভিজ্ঞতা তার নীতি-লংঘনে সমর্থ তা আমরা ভাবতেই পারি না। আগামী কাল সূর্য উঠবে না এমন কথাও হয়তো আমরা বিশ্বাস করতে পারি অথবা বিশ্বাস করতে পারি কোন এক সময়, কল্পনায় এক অদাহ্য পৃথিবীতে আগুনে দগ্ধ হবে না কাঠ কিন্তু আমরা আমাদের জীবদশায় দুইয়ে দুইয়ে (২ + ২) চার না হয়ে আর কিছু হবে তা ভাবতেই পারি না। এ সব সত্য অভিজ্ঞতার আগেও সত্য—তা নির্ভর করে না অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন অভিজ্ঞতার উপর। কাজেই এগুলিই হচ্ছে পূর্ণ আর অত্যাবশ্যক সত্য—এসব সত্য কখনো মিথ্যা প্রমাণিত হবে তা ভাবাই যায় না কিন্তু এ পূর্ণতা আর অত্যা-বশ্যকের চরিত্র আমরা কোথায় পাই? নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা থেকে নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পেয়ে থাকি পৃথক পৃথক চেতনা আর ঘটনা, ভবিষ্যতে যার পরিণামে পরিবর্তন ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আমাদের মনের সহজাত গঠন থেকেই এসব সত্য তার প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে তোলে—মন যে স্বাভাবিক আর অনিবার্য উপায়ে কাজ করে যায় তার থেকে। কারণ মানুষের মন (কান্টের প্রধান প্রতিপাদ্যই এটি) নিষ্ক্রিয় মোম নয় যে তার উপর চেতনা আর অভিজ্ঞতা নিজের সম্পূর্ণ খেয়ালখুশী মতো যা তা লিখে যাবে অথবা ওটা কতকগুলি মানসিক অবস্থা পরম্পরার শ্রেণী বা দলের এক বিমূর্ত নামও নয়। বরং ওটা এমন এক সক্রিয় যন্ত্র যা মানুষের চেতনাকে গড়ে, মিলিয়ে নিয়ে ভাবে করে রূপায়িত—সে যন্ত্র অগণিত বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতাকে পরিণত করে এক সুশৃঙ্খল চিন্তায়।

কঃ তুরীয় বা সর্বোত্তম নন্দন-তত্ত্ব

এ প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টায়, মনের সহজাত গঠন অথবা চিন্তার স্বাভাবিক নিয়ম-পদ্ধতি অধ্যয়নকেই কান্ট 'সর্বোত্তম দর্শন' বলে অভিহিত করেছেন—কারণ এ সমস্যা ছাড়িয়ে যায় ইন্দ্রিয় উপলব্ধিকে। "যে জ্ঞান বস্তু বা উদ্দেশ্য-নির্ভর নয় তাকেই আমি তুরীয় বা সর্বোত্তম বলেছি—এ জ্ঞান আমাদের বস্তুর কারণ-কার্য-উপলব্ধির সহায়ক।"—আমাদের অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধনের ফলে যা পরিণত হয় জ্ঞানে। চেতনার কাঁচা মালকে চিন্তার তৈয়রী মালে পরিণত করার পদ্ধতিতে দুটো স্তর বা ভাগ রয়েছে। প্রথম স্তর হলো উপলব্ধির যে রূপ যেমন স্থান ও কালকে চেতনার সংযোগ সাধনের বেলায় প্রয়োগ করা। দ্বিতীয় স্তর হলো উপলব্ধির রূপ চিন্তার 'শ্রেণী বিন্যাস'কে প্রয়োগ করে বিকশিত উপলব্ধির মধ্যে সংযোগ বিধান। কান্ট Esthetic বা নন্দনতত্ত্ব শব্দটাকে মূল আর ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার করে, চেতনা বা অনুভূতির গুণসমন্বিত ভেবে এর প্রথম স্তরের অধ্যয়নকেই 'সর্বোত্তম নন্দন-তত্ত্ব' বলেছেন আর লজিককে চিন্তার বিজ্ঞান অর্থে ধরে নিয়ে দ্বিতীয় স্তরের অধ্যয়নকে বলেছেন তিনি 'সর্বোত্তম লজিক' এগুলি অত্যন্ত ভীতিকর শব্দ—যুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই এগুলির অর্থ বোধগম্য হবে। এ পর্বতের দুর্গম শীর্ষে একবার আরোহণ করতে পারলে কান্ট অনেকখানি সহজ হয়ে উঠবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কথা হচ্ছে 'চেতনা' আর 'উপলব্ধির' অর্থ কি? আর মন কি করে চেতনাকে উপলব্ধিতে করে পরিবর্তিত? সাধারণভাবে চেতনা মানে ত শুধু উদ্দীপক (stimulus) সম্বন্ধে সজাগ হওয়া যেমন আমরা জিহ্বায় স্বাদ, নাকে গন্ধ, কানে শব্দ, চামড়ায় তাপ, চোখে আলোর ঝলকানি, আঙুলে চাপ বুঝতে পেরে থাকি—অভিজ্ঞতার এ হচ্ছে অত্যন্ত স্থূল আর কাঁচা সূচনা মাত্র, এ প্রায় সদ্যোজাত শিশুর মানসিক জীবন খোঁজার মতো ব্যাপার—একে কিছুতেই জ্ঞান বলা যায় না। কিন্তু এসব বিচিত্র শ্রেণীর চেতনা যদি কোন একটা বিশেষ বস্তু যেমন আপেলকে কেন্দ্র করে স্থান, কালে একত্রিত হয়—এখন যদি নাকে গন্ধ আসে, রসনায় পাওয়া যায় স্বাদ, চোখে আলো, যে অবয়ব হাতে আর আঙুলে দেয় চাপ এসব যদি এ বস্তু তথা আপেলকে কেন্দ্র করে মিলিত হয় তখন এ আর স্রেফ উদ্দীপক থাকে না, এক বিশেষ বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। একে এখন বলা যায় উপলব্ধি। চেতনা এখন জ্ঞানে পরিণত। কিন্তু এ যে উত্তরণ আর সংযোজন তা কি সহজাত, আপনাআপনি ঘটে? এসব চেতনা কি স্বাভাবিক আর নেহাৎ স্বেচ্ছাপ্রসূতভাবে একত্রিত সংঘবদ্ধ হয়ে উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে? লকে আর হিউম বলে হাঁ আর কান্ট বলে 'না'।

AMARBOI.COM

এসব চেতনা আমরা পেয়ে থাকি ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র পথে, মস্তিষ্কে পৌঁচে তা হাজারো রকম 'যাতায়াতী স্নায়ু' দ্বারা, যে স্নায়ুর যাতায়াত চামড়া, চোখ, কান আর জিহ্বার পথেই ঘটে। এসব যখন মনের কক্ষে জমায়েৎ হয়ে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবে তখন তা কি এক বিচিত্র দূতের সমাবেশই না হয়ে উঠবে! প্লেটো যে এমন অবস্থাকে 'ইন্দ্রিয়ের এক ইতর-জনতা' বলেছেন তা মোটেও বিচিত্র নয়। অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় তারা সত্যই ইতর-জনতা, বিচিত্র এক বিশৃঙ্খলা—অর্থপূর্ণ ভূমিকা, উদ্দেশ্য আর ক্ষমতা লাভের আদেশের প্রতীক্ষামান। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রের হাজারো অংশ থেকে মুহূর্তে সেনাপতির কাছে বিচিত্র সব সংবাদ নিয়ে আসা আর তা অন্য নিরপেক্ষভাবে বোধগম্য রূপ নিয়ে নির্দিষ্ট আদেশ-নির্দেশে পরিণত হওয়া! না, এ জনতার শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য এমন এক শক্তিও আছে, যে শক্তি শুধু গ্রহণ (সংবাদ) করে না, নির্দেশ আর পারস্পরিক সংযোগ সাধনেও সক্ষম—চেতনার এ অনুগুলিকে নিয়ে তা করে তোলে অর্থপূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব সংবাদ কিন্তু তা গ্রহণ করে না। এ মুহূর্তে অসংখ্যশক্তি তোমার দেহের উপর ক্রিয়া করছে—এমিবা সদৃশ স্নায়ু-প্রান্তে যে অসংখ্য উদ্দীপক এসে আঘাত করে তাই সঞ্চয় করে বহির্জগতের অভিজ্ঞতা—কিন্তু সব চেতনা হয়না গৃহীত। যে সব চেতনাকে বর্তমান উদ্দেশ্যের উপযোগী উপলব্ধিতে রূপান্তরিত করা যাবে তাই শুধু হয় গৃহীত অথবা গৃহীত হয় সম্পর্কিত ঐ সব চেতনা যা নিয়ে আসে অদম্য সব বিপদ-সংকেত। ঘড়িটা ত টিক্ টিক্ করে চলতে থাকে। তুমি কিন্তু শুনতে পাওনা; কিন্তু সে একই রকমের টিক্ টিক্ শব্দ, প্রয়োজন মতো ইচ্ছা করলেই তুমি মুহূর্তে শুনতে পাও। শিশুর পার্শ্বে নিদ্রিতা মা বহির্জগতের কোন গোলমালই পায় না শুনতে কিন্তু শিশু একটুখানি নড়ে উঠতেই ডুবুরি যেমন দ্রুত জলের উপর ভেসে উঠে তেমনি মাও মুহূর্তে জাগ্রত-চেতনায় হাতড়িয়ে শিশুকে ধরে জড়িয়ে। যদি যোগ করাই উদ্দেশ্য হয় আর "দুই আর তিন" যদি হয় উদ্দীপক (**Stimulus**) তা হলে পরিণতি "পাঁচ" হবেই আর গুণ করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলে সে একই উদ্দীপক অর্থাৎ দুই আর তিন, তা হলে পরিণতি হবে "ছয়ে"। স্রেফ মাত্র স্থান কালের সংলগ্নতা বা সাদৃশ্য বা সাম্প্রতিকতা কিম্বা পৌনপুণিকতা বা অভিজ্ঞতার তীব্রতার ফলে চেতনার সহযোগ বা ভাবের উদয় ঘটে না—সর্বোপরি মনের উদ্দেশ্যই তাকে গড়ে তোলে। চেতনা আর চিন্তা হলো আমাদের নৌকর-চাকর আমাদের আহবানেই তারা সাড়া দেয়। আমাদের বিনা আহ্বানে তাদের আবির্ভাব ঘটে না। যে তাদেরে ব্যবহার করে সে-ই তাদের কর্তা, সে তাদের নির্বাচন করার মালিক, সে করে তাদের পরিচালিত। চেতনা আর ভাবের অতিরিক্ত হচ্ছে মন।

কান্টের মতে এ নির্বাচন আর সংযোগ সাধনের যে প্রতিভূ সে সামনে পেশ করা বস্তু নিচয়ের বাছাইয়ের জন্য দু'টি সরল পদ্ধতির করে অনুসরণ —অর্থাৎ স্থান-চেতনা আর কাল-চেতনা। সেনাপতি যেমন যে স্থান থেকে খবর এসেছে আর যে সময়ে খবরটা লেখা হয়েছে তা দেখে নিয়ে আগে সবটা সাজিয়ে নেন এবং তার পরই খুঁজে পান সবটার পরম্পরা আর পদ্ধতি তেমনি মনও সব চেতনাকে স্থান ও কালে স্থাপন করে তবে এটার এ উদ্দেশ্য ওটার ঐ উদ্দেশ্য, এটা বর্তমান কাল আর ওটা অতীত কাল বলে নির্দেশ দেন। স্থান আর কাল ত উপলব্ধ বস্তু নয় কিন্তু উপলব্ধির প্রক্রিয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধকে চেতনায় স্থাপনের উপায় মাত্র—স্থান আর কাল উপলব্ধির যন্ত্র বিশেষ।

ঐ সব ত কারণ-কার্য বা পূর্ব অনুমিত—কারণ সব নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতাই আগাম কল্পিত। তা ছাড়া চেতনা কখনো উপলব্ধিতে পরিণত হতে পারে না। তারা কারণ-কার্য এ জন্য যে তার সঙ্গে সম্পর্কহীন আমরা কোন রকম ভবিষ্যত অভিজ্ঞতাই লাভ করতে পারি না। তারা কারণ-কার্য বলে তাদের বিধিবিধানও গণিতেরই বিধানের বলে তারাও সম্পূর্ণভাবে অত্যাবশ্যকীয়—আর এর কোন শেষ নেই। এটা শুধু সম্ভব নয় বরং সুনিশ্চিত যে আমরা এমন কোন সরল রেখা খুঁজে পাবো না যা দুই বিন্দু থেকে সব চেয়ে ন্যূনতম দূরত্ব নয়। অন্ততপক্ষে গণিত রক্ষা পেয়েছে ডেভিড হিউমের ক্ষয়শীল সংশয়বাদ থেকে। সব বিজ্ঞানকে কি এভাবে রক্ষা করা সম্ভব? হাঁ, সম্ভব, যদি তাদের মূল নীতি, হেতুত্বের বিধি-বিধান (Law) অর্থাৎ যদি সব সময় নির্দিষ্ট কার্য-কারণ নীতি, স্থান আর কালের মতো দেখানো যায়। বোধগম্যতার সব প্রক্রিয়ায় এ নীতি এমন সহজাতভাবে বিদ্যমান যে ভবিষ্যত কোন অভিজ্ঞতায় তা লংঘিত হবে ভাবা যায় না। হেতুত্বও কি সব চিন্তার এক অপরিহার্য আগাম শর্ত?

AMARBOI.COM

খঃ সর্বোত্তম বিশ্লেষক

এবার আমাদের উত্তরণ চেতনা আর উপলব্ধির বিস্তৃত এলেকা থেকে চিন্তার সংকীর্ণ আর অন্ধকার কক্ষে—'সর্বোত্তম নন্দনতত্ব' থেকে 'সর্বোত্তম লজিকে'। প্রথমে আমাদের চিন্তার ঐ সব উপকরণের নাম আর বিশ্লেষণ দরকার যা মন উপলব্ধি থেকে পায়নি বরং মন থেকে পেয়েছে উপলব্ধি—জানা দরকার ঐ সব ভারোত্তলন যন্ত্রকে যা 'উপলব্ধিজাত'কে ধারণাজাত' জ্ঞানের সম্বন্ধে, পরম্পরায় আর বিধি-বিধানে উত্তোলিত করে, মনের ঐ সব হাতিয়ারকে জানা দরকার যা অভিজ্ঞতাকে সংস্কৃত করে বিজ্ঞানে করে পরিণত। ঠিক যেভাবে উপলব্ধি স্থান-কালের চারদিকে বস্তুবিশেষের চেতনাকে সাজিয়ে নেয় তেমনি ধারণা আর উপলব্ধিও কারণ, ঐক্য, পারস্পরিক সম্বন্ধ, প্রয়োজন, ও আকস্মিকতা ইত্যাদির ভাবকে সাজিয়ে নেয়—এসব এবং অন্য 'শ্রেণীবিভাগে' যে গঠন তাতেই গৃহীত হয় উপলব্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তা দিয়েই ঐ সবকে করা হয় শ্রেণীবদ্ধ আর করা হয় রূপায়িত চিন্তার সুশৃঙ্খল উপলব্ধিতে। এসব হচ্ছে মনের আসল স্বরূপ আর চরিত্র আর মন মানে অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন।

এখানে মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, ল'কে আর হিউমের কাছে যে মন স্রেফ "নিষ্ক্রিয় মোম" যার উপর এসে পড়ে চেতনা-অভিজ্ঞতার ধাক্কা। এরিস্টটলের চিন্তা পদ্ধতিও বিবেচ্য। সব স্বীকৃত সত্য বা সংখ্যা নিজে নিজে এক বিশৃঙ্খল স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে এক জাগতিক শৃঙ্খলা লাভ করেছে তা কি কল্পনা করা যায়। লাইব্রেরীতে বিরাট বিরাট যে কার্ড ক্যাটালগ্ রয়েছে—মানবীয় উদ্দেশ্য অনুসারেই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সে সবকে সাজানো হয়েছে। যদি কার্ড-ভরতি তাকগুলিকে সারা মেঝে উপুড় করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় আর কার্ডগুলি সব ইতস্তত এলোমেলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন কি কল্পনা করা যায় যে এসব ইতস্তত ছড়িয়ে পড়া কার্ডগুলি নিজে নিজেই এসব সব বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উঠে এসে ধীরে ধীরে বিষয় আর বর্ণানুসারে নিজ নিজ খোপে বা বাক্সে গিয়ে আশ্রয় নেবে আর সব বাক্স নিজ নিজ তাকে যথাস্থানে নেবে আসন? এ ভাবে সবাই ফিরে যাবে পূর্বাবস্থায় যখন একটা শৃঙ্খলা ছিল, বুঝাতে পারা যেতো অর্থ আর উদ্দেশ্য? সংশয়বাদীরা এ ধরনের কত অলৌকিক গল্পই না পরিবেশন করেছেন।

চেতনা হচ্ছে বিশৃঙ্খল উদ্দীপক (Stimulus), উপলব্ধি মানে সুশৃঙ্খল চেতনা, সুশৃঙ্খল উপলব্ধিরই নাম ধারণা—বিজ্ঞান মানে সুশৃঙ্খল জ্ঞান আর সুশৃঙ্খল জীবন মানে বিবেকী জ্ঞান বা Wisdom —শৃঙ্খলা, পরম্পরা আর ঐক্য একটা থেকে আর একটা উচ্চতর পর্যায়ের। এ শৃঙ্খলা, পরম্পরা আর ঐক্য কোথা থেকে আসে। নিশ্চয় বস্তু থেকে নয় —কারণ ঐ সবের পরিচয় আমরা পাই মুহূর্তে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় আর হাজারো ভাবে, হাজারো পথে। একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্যই এ বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যের মধ্যে নিয়ে আসে শৃঙ্খলা, পরম্পরা আর ঐক্য। এ সমুদ্রে আলোকপাত করে আমাদের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আমরাই নিয়ে আসি আলো। ল'কে যে বলেন: "চেতনায় যা প্রথম থেকে উপস্থিত তা ছাড়া মন-মানসে আর কিছুই নেই" তা সত্য নয়। লিব্নিট্জের এ কথা অবশ্য সত্য: "মন-মানস ছাড়া আর কিছুই নেই।" কান্টের মতে: "সঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা ছাড়া উপলব্ধি স্রেফ অন্ধ," উপলব্ধি যদি নিজে নিজে সুশৃঙ্খল চিন্তা হয়ে উঠতে পারতো আর মন যদি সক্রিয়ভাবে বিশৃঙ্খলকে সুশৃঙ্খল না করতো তা হলে একই অভিজ্ঞতা একজনকে কেন রেখে দেয় মাঝারি করে আবার অন্যজনকে যে অধিকতর কর্মঠ ও অশ্রান্ত কেন করে তোলে জ্ঞানী আর চমৎকার যুক্তিবাদী করে? কাজেই বুঝতে হবে দুনিয়া নিজে নিজে সুশৃঙ্খল হয়ে উঠেনি—দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত চিন্তাই এ শৃঙ্খলার মূল। অভিজ্ঞতার শ্রেণী বিভাগের প্রথম স্তরই হচ্ছে বিজ্ঞান আর দর্শন। চিন্তার বিধি-বিধান যা বস্তুরও বিধি-বিধান তাই। সে কারণে যে চিন্তার মারফৎ বস্তুকে আমরা জানি সে চিন্তাকেও এ বিধি-বিধান মানতে হয়—এরা এক আর একই। হেগেলের মতেও প্রকৃতির বিধি-বিধান আর লজিকের বিধি-বিধান একই আর লজিক আর পরাবিজ্ঞান এক সামিল। বিজ্ঞানের জন্য সাধারণীকরণ নীতি প্রয়োজন কারণ শেষ পর্যন্ত তাই হচ্ছে চিন্তার বিধি-বিধান যা অতীত-বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতার বেলায় জড়িত ও পূর্ব-কল্পিত। বিজ্ঞান স্বাধীন, বা স্বেচ্ছাচারী আর সত্য চিরন্তন।

AMARBOI.COM

গঃ সর্বোত্তম তর্ক-শাস্ত্রীয় আলোচনা

লজিক আর বিজ্ঞানের যে উচচতম সাধারণীকরণ তারও স্থির নিশ্চয় অনন্যতা অনেকখানি সীমিত আর আপেক্ষিক—বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে তা সীমিত আর তা কঠোরভাবে আপেক্ষিক আমাদের মানবীয় প্রকাশ রীতির বেলায়। আমাদের বিশ্লেষণ যদি সত্য হয় তা হলে বলতে হবে আমাদের এ পৃথিবী একটা গঠন মাত্র। প্রায় একটা তৈরী মাল বলা যায়। এর গঠনে বস্তুগত উদ্দীপনের যে অবদান মনের সাংগঠনী শক্তির অবদান তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। (তাই টেবিলের উপরি-ভাগকে আমরা গোল উপলব্ধি করি অর্থচ আমাদের চেতনা হচ্ছে বৃত্তা-ভাসের)। আমাদের সামনে বস্তুর যেভাবে আবির্ভাব ঘটে তা একটা দৃশ্যমাত্র--একটা চেহারা শুধু, হয়তো আমাদের চেতনার গোচরীভূত হওয়ার আগ্ পর্যন্ত বস্তুর বাহ্যিক রূপের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্যই ছিল না—মূল বস্তুটা আমাদের কখনো জানাই হয় না। হয়তো 'বস্তুটা স্বরূপে' একটা চিন্তা বা অনুমান মাত্র, ওটা অভিজ্ঞতা কিছুতেই নয়। কারণ অভিজ্ঞতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে হলে চেতনা আর চিন্তার পথ-উত্তরণের সময় তার পরিবর্তন ঘটবেই। "আমাদের চেতনার গ্রহণশীলতা ছাড়া বস্তুর আসল স্বরূপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যায়। আমরা যেভাবে উপলব্ধি করি এ ছাড়া আমরা কিছুই জানি না—কিন্তু এ উপলব্ধির ধরন প্রত্যেকের আলাদা, নিসন্দেহে প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র।" (হিউম যেমন দেখেছেন) চাঁদকে আমরা যেভাবে জানি তা স্রেফ একবোঝা চেতনা মাত্র কিন্তু (হিউম যা দেখেননি) বিস্তৃত চেতনার সাহায্যে আমাদের মনের সহজাত গঠন তাকে ঐক্যবদ্ধ করে রূপান্তরিত করেছে ধারণায়, এগুলিই পরিণত হয়েছে উপলব্ধি বা ভাবে। ফলে চাঁদ আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের এক ভাব-সমষ্টিমাত্র।

বাহ্যিক জগৎ আর পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কান্ট যে সন্দেহ পোষণ করেন তা নয় কিন্তু তাঁর বক্তব্য : সে সব আছে সত্য তবে সুনিশ্চিতভাবে তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আমরা শুধু ওদের চেহারা, ওদের দৃশ্য আর ওরা আমাদের মনে যে চেতনা প্রচার করে তাই শুধু সবিস্তার জানি। উপলব্ধ বস্তুর বাইরে আর কিছু নেই সাধারণ মানুষের এ ধারণা আদর্শবাদ নয়—বরং প্রতি বস্তুর এক বড় অংশ উপলব্ধি আর বোধগম্যতার রূপ-কল্পই গড়ে তোলে : বস্তু যখন ভাবে রূপ নেয় তখনই আমরা তা জানতে পারি, এ রূপান্তরের আগে তা আমাদের কাছে থাকে অজ্ঞাত। মোটের উপর বিজ্ঞান এক সরল অকপট ব্যাপার, বিজ্ঞানের ধারণা বস্তুর পরিপূর্ণ ও অকৃত্রিম বাহ্যিক স্বরূপ আর বাস্তবতা নিয়েই তার কারবার, দর্শন আরো কিছু জটিল ও বিমিশ্র ব্যাপার, দর্শন মনে করে বস্তু ছাড়া বিজ্ঞানের সার্বিক বিষয় বস্তু হলো চেতনা, ধারণা আর উপলব্ধি। শোপেনহাওয়ারের মতে "কান্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আসল বস্তু থেকে দৃশ্যের বিশিষ্টীকরণ।"

কাজেই বাস্তবতার শেষ পরিণতি কি এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান বা ধর্ম যাই বলতে চেষ্টা করুক তা অনুমান বা কাল্পনিক বলেই ধরতে হবে—"বোধগম্যতা কখনো চেতনার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এ রকম অস্পষ্ট বিজ্ঞান নিজেকে হারিয়ে ফেলে 'স্ববিরোধিতায়' আর এ রকম অস্পষ্ট শাস্ত্র নিজেকে হারিয়ে বসে 'ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে'। শ্রেষ্ঠ তর্কশাস্ত্রীয় আলোচনার নিষ্ঠুর কাজ হচ্ছে চেতনা আর দৃশ্যের গণ্ডী ছেড়ে অজানা বস্তুজগতকে স্ব স্বরূপে জানার যুক্তির যে সব চেষ্টা তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান অভিজ্ঞতাকে ডিঙিয়ে যেতে চায় বলেই এ সব সমাধান-হীন স্ববিরোধী সব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। যেমন জ্ঞান যখন শূন্যমণ্ডলে পৃথিবী অসীম তা মীমাংসা করতে চেষ্টা করে তখন চিন্তা এ দুই ধারণার বিরুদ্ধেই করে বসে বিদ্রোহ—সীমা ছাড়িয়ে অন্য কিছুর, যার কোন শেষ নেই, ধারণায় পৌঁছার দিকে আমাদের নিয়ে যায়। তবুও অসীম কথাটাই ধারণাতীত। আবার, সময়ের দিক থেকে পৃথিবীর কোন সূচনা ছিল কি? চিরন্তনতার ধারণা করতে আমরা অক্ষম। তবুও তার আগেও কিছু ছিল এ অনুভূতি ছাড়া আমরা অতীতের কোন কিছুই ধারণা করতে পারি না। বিজ্ঞান যে কারণ পরম্পরা অধ্যয়ন করে তারও কোন সূচনা—একটা প্রথম কারণ, ছিল কি? হ্যাঁ ছিল, কারণ অশেষ পরম্পরা-শৃঙ্খল ধারণাতীত: না, প্রথম কারণের জন্যও কারণ-হীনতা অকল্পনীয়। চিন্তার এ সব অন্ধ-গলি থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই? কান্টের মতে আছে—অবশ্য যদি আমরা স্মরণ রাখি যে স্থান, কাল আর কারণ হচ্ছে ধারণা আর উপলব্ধির উপায় মাত্র, এগুলি অভিজ্ঞতার গঠন আর গাথুনি বলে আমাদের অভিজ্ঞতায় তার অনুপ্রবেশ ঘটবেই, স্থান, কাল আর কারণকে উপলব্ধি নিরপেক্ষ বাহ্যিক বস্তু মনে করা হয় বলেই সৃষ্টি হয় ধাঁধার। স্থান, কাল আর কারণের পরিপ্রেক্ষিতে যা ব্যাখ্যা করা যায় না তেমন কোন অভিজ্ঞতা লাভ আমাদের ঘটে না কিন্তু এগুলি বস্তু নয়, ব্যাখ্যা আর বোধগম্যতার উপায় মাত্র এ মনে না রাখলে আমরা কিছুতেই দর্শনের নাগাল পাবো না।

তথাকথিত "যুক্তিসঙ্গত" শাস্ত্রীয় ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সন্ধানও সে একই কথা—এ শাস্ত্রও কাল্পনিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে আত্মা এক কলুষ-মুক্ত বস্তু, স্বাধীন-ইচ্ছা আর কার্য-কারণ আইনের উর্ধে, ঈশ্বর নামে "এক অত্যাবশ্যকীয় প্রাণী'র অস্তিত্ব আগাম মেনে নেওয়াই সব বাস্তবতার শর্ত। তর্ক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিচার পদ্ধতির উচিত ধর্ম-শাস্ত্রকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে বস্তু, কারণ আর আবশ্যকতা সসীম শ্রেণীবিভাগ মাত্র, মন ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার বিন্যাস আর ব্যবস্থার সময় তা প্রয়োগ করে থাকে বটে কিন্তু অনুরূপ অভিজ্ঞতার বেলাতেই কেবল তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রয়োগসিদ্ধ এ সব ধারণাকে আমরা নেহাৎ কাল্পনিক আর অনুমেয় জগতে প্রয়োগ করতে পারি না। কাল্পনিক যুক্তি দিয়ে ধর্ম প্রমাণিত হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেই প্রথম ক্রিটিকের সমাপ্তি। কৌতুক হাসির সঙ্গে ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বলা যায় কান্টের তুলনায় ডেবিড্ হিউম অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। আট শ' পৃষ্ঠার এ এক দারুন বই, গুরুভার পরিভাষায় ভারাক্রান্ত—চেয়েছেন তিনি এখানে পরা-বিজ্ঞানের সব সমস্যার সমাধান করতে আর প্রসঙ্গত চেয়েছেন ধর্মের প্রকৃত সত্য আর বিজ্ঞানের অনন্য-তাকে বাঁচাতে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বইটি কি সাধন করেছে? বিজ্ঞানের সরল ও অকপট বিশ্বটাকে করেছে ধ্বংস, পরিমাণে না হলেও তার পরিধিকে করেছে সীমিত—যে বিশ্বকে শুধু উপরিতল আর বাহ্যিক একটা অবয়ব বলে মেনে তার অতিরিক্তকে একটা 'স্ববিরোধিতার' প্রহসনই শুধু করা হয়েছে—এ ভাবেই 'রক্ষা' করা হয়েছে বিজ্ঞানকে। গ্রন্থটির খুব উচ্ছ্বসিত আর ধারাল অংশে ধর্ম-বিশ্বাসের সমর্থনে এ যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে—স্বাধীন আর অমর আত্মা এবং মঙ্গলময় স্রষ্টা, যুক্তির দ্বারা কখনো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অতএব এভাবেই ধর্মকেও করা হয়েছে রক্ষা। কাজেই জার্মেনির পুরোহিত শ্রেণী এ ভাবের মুক্তি বা নজাত সম্বন্ধে যে আপত্তি করেছিলেন তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই—নিজেদের কুকুরের নাম ইমানুয়েল কান্ট রেখে তারা তাঁর উপর নিয়েছিলেন প্রতিশোধ।

এও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কনিজ্‌বার্গের এ ক্ষুদ্র অধ্যাপকটিকে হ্যেনে (Heine) তুলনা করেছেন রবস্‌পিয়রের (Robespierre) মতো ভয়ঙ্কর মানুষের সঙ্গে, রবস্‌পিয়র ত হত্যা করেছেন একজন রাজা আর মাত্র কয়েক হাজার ফরাসীকে, যা জার্মানরা সহজে মাফ করে দিতে পারে কিন্তু হ্যেনের মতে কান্ট ত হত্যা করেছেন স্বয়ং ঈশ্বরকে—ধর্ম শাস্ত্রের সপক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান যুক্তিকে করেছেন খাটো। হ্যেন লিখেছেন: "এ লোকটার বাহ্যিক জীবন আর ধ্বংসকরও বিশ্ব-আলোড়নকারী চিন্তার মধ্যে কি অদ্ভুত বৈপরিত্য! এসব চিন্তার তাৎপর্য যদি কনিজ্‌বার্গের নাগরিকরা আন্দাজ করতে পারতো তা হলে একটা জল্লাদের সামনে ওরা যত না ভীত সন্ত্রস্ত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী সন্ত্রস্ত হতো এঁকে দেখে—জল্লাদ ত শুধু মানুষকেই দিয়ে থাকে ফাঁসী (কিন্তু কান্ট ত ঈশ্বরকে করে দিয়েছেন খতম!) কিন্তু সজ্জনেরা তাঁকে দেখেছেন শুধু এক দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে এবং যখন তিনি বেড়াতে বেরুতেন তারা মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেড়ে তাঁকে জানাতেন বন্ধু-সুলভ অভিবাদন আর নিজেদের ঘড়িটা নিতেন মিলিয়ে।"

একি এক ব্যঙ্গ-চিত্র না সত্যের অভিব্যক্তি?

৪. ব্যবহারিক যুক্তির বিশ্লেষণ (Critique)

যদি ধর্মকে বিজ্ঞান আর শাস্ত্রের উপর দাঁড় করানো না যায়, তা হলে কিসের উপর করা যাবে? নীতির উপর। শাস্ত্রীয় ভিত্তি কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়—বরং ওটা ত্যাগ করাই ভালো, এমন কি ধ্বংস করা উচিত। ধর্ম বিশ্বাসকে স্থাপন করতে হবে যুক্তির এলেকার উর্ধে। তাই ধর্মের নৈতিক ভিৎ-টা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্য-নিরপেক্ষ হওয়া চাই—চাই সন্দেহজনক ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা অনিশ্চিত অনুমান-নির্ভর না হওয়া, ভ্রান্তিশীল যুক্তির সংমিশ্রণে তা যেন না হয় কলুষিত—তার উৎপত্তি হওয়া চাই অন্তরের অন্তস্থলের সাক্ষাৎ উপলব্ধি আর সহজাত প্রবৃত্তি থেকে। এমন এক প্রয়োজনীয় ও বিশ্বজনীন নীতি আমাদের খুঁজে নিতে হবে—খুঁজে নিতে হবে গণিতের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুনিশ্চিত নৈতিক বিধান। আমাদের দেখাতে হবে— খাঁটি যুক্তির ব্যবহারিক হতে বাধা নেই অর্থাৎ কোন রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্বাধীনভাবে তা ইচ্ছা শক্তি নির্ধারণে সক্ষম।'—নৈতিকবোধ সহজাত তা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। ধর্মের ভিত্তি হিসেবে আমরা যে নৈতিক কর্তৃত্ব চাই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুস্পষ্ট আর জোরদার হওয়া চাই।

আমাদের সব রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের নৈতিকবোধ—সব রকম প্রলোভন সত্ত্বেও কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ এ অনুভূতি। প্রলোভনের কাছে আমরা হয়তো আত্মসমর্পণ করতেও পারি কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ অনুভূতির মৃত্যু নেই। 'সকালে আমি সৎ-সঙ্কল্প গ্রহণ করি কিন্তু সন্ধ্যায় হয়ে পড়ি আহাম্মকির শিকার'— কিন্তু আমরা জানি আহাম্মকি স্রেফ আহাম্মকি-ই—তাই আবার নতুন করে নিয়ে থাকি সঙ্কল্প। অনুতাপের দংশন আর নতুন সঙ্কল্পের কারণ কি, কিসের ফলে আমাদের মনে এ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার? এ হচ্ছে আমাদের বিবেকের শর্তহীন নির্দেশ যা আমাদের ভিতরের এক সুস্পষ্ট শক্তি—যে চায় "আমাদের কর্মের সূত্র যেন আমাদের ইচ্ছায় একটা বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক বিধানে হয় পরিণত।" আমাদের যে সব ব্যবহারের ফলে সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন বিপন্ন হবে তেমন সব কাজ পরিহার করা উচিত এ সত্য আমরা যুক্তির সাহায্যে লাভ করি না বরং লাভ করি সুস্পষ্ট ও তাৎক্ষণিক অনুভূতি থেকে। আমি কি মিথ্যার সাহায্যে বিপদ থেকে বাঁচতে চাই? "কিন্তু আমি মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করলেও মিথ্যা একটা বিশ্বজনীন বিধান হোক এ আমি কখনো চাই না; কারণ এ রকম আইন বা বিধানের দ্বারা কোন রকম আশার আলোই দেখতে পাওয়া যাবে না।" তাই আমার সচেতনতা বা বুদ্ধি বলে, নিজের কিছুটা সুবিধা হলেও আমার পক্ষে উচিত নয় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। বিচার-বিবেচনা অনেকখানি অনুমানসিদ্ধ ব্যাপার—ওটার নীতি হলো, যখন উপায়টা উত্তম তখনই সততা মূল্যবান কিন্তু আমাদের অন্তরের নৈতিক বিধান শর্তহীন আর অনন্য।

কোন কাজের ফল ভালো হলেই বা বিজ্ঞতার সঙ্গে সাধিত হলেই যে তা ভালো তা নয় কিন্তু তা যদি ভিতরের কর্তব্যের তাগাদায়, যে নৈতিক বিধান কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল নয় যা আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব ব্যবহারের এক অপ্রতিরোধ্য নির্দেশ হয়ে দাঁড়ায় তার ফলে করা হয়, তাই ভালো। নিজের ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কথা না ভেবে, নৈতিক বিধান অনুসরণের যে সঙ্কল্প এ পৃথিবীতে একমাত্র তাকেই সৎ-সঙ্কল্প বলা যায়। নিজের সুখের চিন্তা করো না—স্রেফ করে যাও নিজের কর্তব্য। "নিজেদের কিভাবে সুখী করবো তার স্থির-বিশ্বাসের নাম নৈতিকতা নয়, নৈতিকতা মানে কি করে আমি নিজেকে সুখের উপযুক্ত করবো তাই।" আমরা অন্যের জন্য চাইব সুখ কিন্তু নিজের জন্য নিখুঁত পূর্ণতা—তাতে সুখ দুঃখ যাই আসুক। নিজের জন্য পূর্ণতা আর অপরের জন্য সুখ পেতে হলে "নিজের জন্য কি অপরের জন্য এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন লক্ষ্যটা থাকে মানবতায়,—সব সময় উপায়ের দিকে নয় একটা লক্ষ্যের দিকে রাখতে হবে নজর", আমরা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারি এও ভিতরের অপ্রতিরোধ্য নির্দেশ। এ নীতি অনুসরণ করেই যদি আমরা জীবন যাপন করি তা হলে অচিরে আমরা বিবেচক ও যুক্তিবাদী মানুষের এক আদর্শ সমাজ গড়তে সক্ষম হবো। তা গড়ার জন্য একমাত্র করণীয় হচ্ছে সে সমাজের বাসিন্দা হিসেবে এখন থেকেই কাজ করে যাওয়া—ত্রুটিপূর্ণ রাষ্ট্রে আমাদের প্রয়োগ করতে হবে ত্রুটিহীন আইন। হয়তো বলা হবে সৌন্দর্যের উপরে কর্তব্যকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সুখের উপরে নৈতিকতাকে স্থান দেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। কিন্তু একমাত্র এভাবেই আমরা পশুত্বকে জয় করতে আর দেবত্বের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

এটাও লক্ষ্যযোগ্য—এ যে কর্তব্যের অনন্য তাগাদা তাও আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাই প্রমাণ করে। আমরা নিজেরা স্বাধীনভাবে অনুভব করতে না পারলে কর্তব্যের ধারণা আমাদের মধ্যে এলো কি করে? ঐ স্বাধীনতা অবশ্য কাল্পনিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না কিন্তু প্রমাণ করতে পারি নৈতিক সঙ্কটের সময় প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে। এ স্বাধীনতাকে আমরা অনুভব করি আমাদের অন্তর-পুরুষের সত্যিকার স্বরূপ, খাঁটি 'অহং' হিসেবে, নিজেদের মধ্যে আমরা অনুভব করতে পারি মন মুহূর্তে অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে লক্ষ্য নির্বাচনে কিভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। একবার শুরু করে দিলে আমাদের সব কর্ম মনে হয় একটা স্থির ও অপরিবর্তীয় বিধান অনুসরণ করেই চলতে থাকে, তার ফলটা অবশ্য আমরা ইন্দ্রিয় পথেই করি উপলব্ধি, আমাদের মনের তৈয়রী এ সবকে ওরা কার্য-কারণে বিধান-সজ্জিত করেই করে প্রচার। তা সত্ত্বেও আমাদের অভিজ্ঞতার জগতকে বোঝার জন্য আমরা যে বিধি বিধান তৈয়রী করেছি আমরা নিজেরা কিন্তু তার বাড়া ও তার ঊর্ধ্বে—আমরা প্রত্যেকই এক একটি সূচনার উৎস-কেন্দ্র আর সৃষ্টিশীল শক্তি। আমরা প্রত্যেকেই স্বাধীন—একভাবে না একভাবে এটা আমরা অনুভব করি কিন্তু পারি না প্রমাণ করতে।

যদিও প্রমাণ করতে পারি না কিন্তু আমরা অনুভব করি আমরা অমর। আমরা বুঝতে পারি জীবন ঐ রকম কোন জনপ্রিয় নাটক নয়, যে নাটকে প্রতি শয়তান পেয়ে থাকে শাস্তি আর প্রতিটি পুণ্য কাজের মিলে পুরস্কার—প্রতি দিনই আমরা নতুন করে জানতে পারি ঘুঘুর ভদ্র স্বভাবের চেয়ে এখানে সর্পের কুবুদ্ধিই হয়ে থাকে জয়ী আর প্রচুর তস্কর-বৃত্তি চালাতে পারলে প্রতিটি চোরেরই হয় ভাগ্য সুপ্রসন্ন। শুধু সাংসারিক প্রয়োজন আর সুবিধাই যদি পুণ্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য হয় তা হলে অতিরিক্ত ভালো হওয়া কিছুমাত্র বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। এসব জেনেশুনেও আর পৌনপুণিকভাবে আমাদের এ সবের আবির্ভাব সত্ত্বেও আমরা এখনো সৎকর্মের তাগাদা অনুভব করে থাকি, আমরা জানি অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ লাভহীন সৎকর্ম আমাদের করতেই হবে। ভিতরে ন্যায়-বোধের অস্তিত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না থাকলে তা আমরা অনুভব করি কি করে? আমরা জানি এ জীবন অন্য একটা জীবনের অংশ মাত্র। এ জাগতিক স্বপ্ন আর এক নব-জন্মের, নব জাগরণের ভ্রূণাবস্থা শুধু। পরবর্তী দীর্ঘতর জীবনে বকেয়া পরিশোধ করা হবে, সদয়ভাবে এক পাত্র জলও যদি দান করা হয় তার শতগুণ দেওয়া হবে ফিরিয়ে। এসব অনুভূতি অন্তরের সহজাত ন্যায়-বোধেরই ফল।

পরিশেষে আরো বলা যায় ঈশ্বর একজন আছেন। যদি কর্তব্য-বোধ আর ভবিষ্যৎ পুরস্কারে বিশ্বাস করা হয়—"অমরতাকে স্বতসিদ্ধ ধরা হয়......তা হলে এর জন্য যথোপযুক্ত কারণের বিদ্যমানতা মানতে হবে অর্থাৎ মেনে নিতে হবে ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বতসিদ্ধ বলে।" এও অবশ্য যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নয়—আমাদের কর্ম-জগতের সঙ্গে যে নৈতিক বোধের সম্পর্ক রয়েছে কাল্পনিক লজিকের উপরে তাকেই দিতে হবে অগ্রাধিকার—কারণ লজিকের উদ্ভাবনা স্রেফ ইন্দ্রিয়গত দৃশ্যের জন্যই। আমাদের যুক্তি আমাদের বস্তুর আসল স্বরূপের পশ্চাতে যে একজন ন্যায়বান ঈশ্বর আছেন তা বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে —আমাদের নৈতিক-বোধ নির্দেশ দেয় একে বিশ্বাস করার জন্য। রুশো ঠিক কথাই বলেছেন: হৃদয়ের অনুভূতির স্থান মস্তিষ্কের লজিকের উর্ধ্বে। প্যাসকেলের (Pascal) কথাও সত্য: হৃদয়ের নিজস্ব যুক্তি আছে, যা মস্তিষ্ক কখনো পারে না বুঝাতে।

AMARBOI.COM

৫. ধর্ম আর যুক্তি

একে কি খুব জীর্ণ, ভীরু আর রক্ষণশীল মনে হয়? তা নয় কিন্তু—বরং 'যুক্তিবাদী' শাস্ত্রকে যে দুঃসাহসের সঙ্গে কান্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন আর ধর্মকে পষ্টাপষ্টি যেভাবে নৈতিক বিশ্বাস আর আশায় অবনমিত করেছেন তার বিরুদ্ধে জার্মেনির তাবৎ গোঁড়া সম্প্রদায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কান্টের নামের সঙ্গে যেটুকু সাহস সাধারণত সংযোজিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী সাহসের প্রয়োজন ছিল এ "চল্লিশ-পুরোহিত শক্তির" (বায়রনের ভাষায়) বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য।

তিনি যে নির্ভীক ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ: ছেষট্টি বছর বয়সে তিনি তাঁর **Critique of Judgment** আর উনসত্তর বছর বয়সে তাঁর **Religion**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

within the limits of Pure Reason প্রকাশ করেন। প্রথমোক্ত বইতে তিনি আবার সে যুক্তিতে ফিরে এসেছেন যা প্রথম ক্রিটিকে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে যথোপযুক্ত নয় বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একথা আর সৌন্দর্যের সম্পর্ক নির্ণয় দিয়েই তিনি শুরু করেছেন—যার গঠনে সামঞ্জস্য আর ঐক্য এমনভাবে প্রকাশিত যেন তা বুদ্ধি দ্বারা আঁকা হয়েছে বলেই মনে হয় তাকেই তিনি মনে করেন সুন্দর। প্রসঙ্গক্রমে তিনি একবার বলেছিলেন সুডৌল নকশার চিন্তাই আমাদের সব সময় দিয়ে থাকে নিঃস্বার্থ আনন্দ (শোপেন হাওয়ার তাঁর শিল্প মতবাদে এ কথার করেছেন পুরোপুরি ব্যবহার) আর তাঁর মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়াও এক সৎ লক্ষণ।” প্রকৃতির বহু জিনিসে এমন সৌন্দর্য, এমন সামঞ্জস্য আর ঐক্য দেখা যায় যে মনে হয় এ যেন এক অলৌকিক শক্তির পরিকল্পনা। কান্ট বলেছেন আবার অন্যদিকে প্রকৃতিতে বহু অপচয় আর বিশৃঙ্খলার নিদর্শনেরও অভাব নেই, দেখা যায় অকারণ ও বেফায়দা পুনরাবৃত্তি আর বহুগুণিতকরণ—প্রকৃতি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে বটে কিন্তু কত কষ্ট, ভোগ আর মৃত্যুর বিনিময়ে। তা হলে বাহ্যিক পরিকল্পনার যে চেহারা আমরা দেখতে পাই তা কিছুতেই দৈব-শক্তির নিঃসন্দেহ বা শেষ প্রমাণ নয়। যে শাস্ত্রবিদরা এ চিন্তাটাকে প্রচুরভাবে ব্যবহার করেছে তাদের উচিত এটা এখন পরিহার করা আর যে বৈজ্ঞানিকরা এতকাল এটাকে এড়িয়ে এসেছে তাদের উচিত এটাকে এখন কাজে লাগানো—এ এক চমৎকার ইংগিত, এ নিয়ে যেতে পারে শত সহস্র প্রকাশ আর আবিষ্কারের পথে। নিঃসন্দেহে তাতে পরিকল্পনা বা নক্শা আছে, তবে তা হচ্ছে আভ্যন্তরিণ নক্শা, সমগ্রের দ্বারা অংশের বা খণ্ডের নক্শা। তা হলে আবিষ্কারের অন্য যে নীতি অর্থাৎ জীবনের যান্ত্রিক ধারণা সম্বন্ধে ভারসাম্য তা খুঁজে পাবে। আবিষ্কারের জন্য শেষোক্ত নীতিরও সার্থকতা আছে বটে কিন্তু একক তা একটা ঘাসের জন্যও ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

উনসত্তর বছর বয়সে ধর্ম সম্পর্কে তিনি যে রচনা লিখেছেন তা অতুলনীয়—মনে হয় কান্টের রচনাবলীর মধ্যে এটিই সবচেয়ে দুঃসাহসিক। ধর্মকে যখন কাল্পনিক যুক্তির উপর দাঁড় করানো যায় না বরং দাঁড় করাতে হবে নৈতিক বোধের ব্যবহারিক যুক্তির উপর তখন বাইবেল বা অবতীর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মগ্রন্থকে নৈতিকতার মূল্য দিয়েই বিচার করা উচিত—ওটা নিজেই নীতির বিধানদাতা হতে পারে না। গির্জা আর ধর্ম বিশ্বাস জাতির নৈতিক উন্নয়নে যতটুকু সাহায্য করে তার মূল্যও ততটুকু। ধর্মের পরীক্ষা হিসেবে যখন শুধু বিশ্বাস আর অনুষ্ঠান নীতির উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন বুঝতে হবে ধর্ম নিশ্চিহ্ন। সত্যিকার গির্জা হচ্ছে যেখানে একটা সাধারণ নৈতিক বিধানের আনুগত্যে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা সমাজ-সংস্থায় হয় পরিণত। এরকম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই যিশুর জীবন আর মৃত্যু—এ গির্জাকেই তিনি তুলে ধরেছেন পাদ্রী পুরোহিতদের যাজক বৃত্তির বিপরীত দিকে। কিন্তু এ মহৎ ধারণাকে আর এক রকম যাজকীয়তা প্রায় রেখেছে অভিভূত করে। "খ্রীস্ট ঈশ্বরের সাম্রাজ্যকে পৃথিবীর নিকটতর করে এনেছেন কিন্তু তাঁকে ভুল বুঝা হয়েছে, ফলে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের পরিবর্তে আমাদের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরোহিত-রাজ।" সজ্জীবনের পরিবর্তে আবার প্রতিষ্ঠিত হলো ধর্ম-বিশ্বাস আর আচার-অনুষ্ঠান—ধর্মের দ্বারা মানুষ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এখন হয়ে পড়েছে হাজারো সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আর প্রচার করা হয়েছে হরেক রকম "পবিত্র আনুষ্ঠানিকি"—পূর্ণ সংস্কার সব "যা দিয়ে নাকি নানা খোশামোদ তোষামোদ করে আদায় করা যায় স্বর্গ-রাজের অনুগ্রহ—ঐ যেন এক স্বর্গীয় আদালত।" অলৌকিকতা কখনো ধর্মের প্রমাণ নয়—অলৌকিকতার সপক্ষে যে সব সাক্ষ্য তা মোটেও নয় নির্ভরযোগ্য—অভিজ্ঞতার সমর্থক প্রাকৃতিক বিধি বিধানকে বাতেল করা যে উপাসনার লক্ষ্য তা নেহাৎ ব্যর্থ। অবশেষে গির্জা যখন প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের হাতিয়ারে হয় পরিণত তখন তা পৌঁচে বিকৃতির নিম্নতম স্তরে—তখন যে ধর্মযাজকদের কাজ হলো দুঃখী মানবতাকে সান্ত্বনা দেওয়া আর ধর্মীয় বিশ্বাস, আশা আর বদান্যতার দ্বারা মানুষকে পরিচালিত করা সে যাজকরা তখন হয়ে পড়ে শাস্ত্রীয় দুর্বোধ্যতা আর রাজনৈতিক নির্যাতনের হাতিয়ার।

এ রকম একটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের কারণ তখন প্রশিয়ার অবস্থা প্রায় এরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহান ফ্রেডেরিকের মৃত্যু হয় ১৭৮৬-তে—দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম হলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত, তিনি মনে করতেন তাঁর পূর্ববর্তীর উদারনীতি ফরাসী 'জ্ঞান-চর্চা'রই ফল আর ওটা এক রকম স্বদেশ-প্রেমহীনতা। ফ্রেডেরিকের আমলের শিক্ষা-মন্ত্রী জেড্‌লিজকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি পদচ্যুত করে সে যায়গায় নিয়োগ করলেন উলনার নামক এক ধর্ম-গোঁড়াকে। ফ্রেডোরিকের মতে এ উলনার হচ্ছে "এক বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী পুরোহিত"—যার সময় কাটতো অপরসায়ন আর এক রকম যাদুবিদ্যার চর্চায়। নতুন রাজার বলপূর্বক গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ নিজেকে 'এক অযোগ্য হাতিয়ার' বলে রাজ সেবায় আত্মসমর্পণ করেই ক্ষমতায় করেছিল আরোহণ। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে উলনার এক ফরমান জারী করে স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে লুথার প্রচারিত প্রোটেস্‌টেন্ট মতবাদের যা অনুকূল নয় তা পড়াতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেন্সার বসালেন সব রকম প্রকাশনার উপর—আর আদেশ দিলেন ধর্মোদ্রোহিতার সন্দেহ থাকলে যে কোন শিক্ষককে বরখাস্ত করতে। বয়োবৃদ্ধ বলে প্রথমে কান্টকে কোন আঘাত করা হয়নি। আর একজন রাজকীয় উপদেষ্টা বলেও ছিলেন, খুব অল্পসংখ্যক লোকেই কান্ট পড়ে থাকে আবার যারা পড়ে তারা তা বোঝেও না। কিন্তু তাঁর ধর্মের উপর লেখাটি ছিল সহজবোধ্য, যদিও একটা ধর্মানুভূতির সুর তাতে ধ্বনিত হয়েছিল সত্য তবুও সেন্সার কর্তৃপক্ষের পক্ষে ওতে প্রবল ভল্টেরীয় প্রবণতা খুঁজে পেতেও বেগ পেতে হয়নি। ফলে বার্লিনের যে প্রকাশক সংস্থা বইটি ছাপবার পরিকল্পনা করেছিল তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো।

সত্তর বছরের এক বৃদ্ধের পক্ষে যা অকল্পনীয় তেমন শক্তি ও সাহসের সঙ্গে এবার কান্ট কাজে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি রচনাটি জেনায় কয়েকজন বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন—তাঁদের সহায়তায় লেখাটি এবার সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হলো প্রকাশিত। জেনা প্রাশিয়ার বাইরে আর ছিল গ্যেটে অনুরাগী উদার মতাবলম্বী ভাইমারের ডিউকের অধীনে। ফলে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে কান্ট প্রাশিয়া রাজের কাছ থেকে তাঁর মন্ত্রীসভার নিম্নলিখিত আদেশটি পান: "তোমার দর্শনের অপব্যবহার করে তুমি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আর খ্রীস্ট ধর্মের অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ মৌল বিশ্বাস-গুলিকে যেভাবে খাটো করেছো তা দেখেআমাদের সর্বোচচ ব্যক্তি অত্যন্ত অসন্তু হয়েছেন। আমরা তোমার কাছ থেকে অবিলম্বে একটা কৈফিয়ৎ দাবী করছি আর আশা করছি ভবিষ্যতে তুমি আর কখনো এমন অপরাধ করবে না। উপরন্তু তোমার কর্তব্য তোমার সব মেধা আর শক্তি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের পৈত্রিক (অর্থাৎ ঐশ্বরিক) উদ্দেশ্যকে অধিকতর সফল করে তোলা। এ আদেশের অন্যথা করলে তোমাকে অপ্রিয় পরিণতি ভোগ করতে হবে।" উত্তরে কান্ট জানিয়েছিলেন ধর্ম ব্যাপারে প্রত্যেক পণ্ডিতেরই স্বাধীন মতামতের অধিকার রয়েছে আর অধিকার রয়েছে মত প্রকাশের। তবে বর্তমান রাজার শাসন আমলে তিনি চুপ করে থাকবেন। গরহাজির অবস্থায় সাহসী এমন কোন কোন জীবনীকার এ সম্মতির জন্য তাঁর নিন্দা করেছেন—কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তখন কান্টের বয়স সত্তর, ভগ্ন-স্বাস্থ্য—সংগ্রামের শক্তি তখন তাঁর শূন্য আর তাঁর বাণী ত তিনি এর মধ্যে জগতকে শুনিয়ে দিয়েছেনই।

৬. রাজনীতি আর চিরন্তন শান্তি

রাজনৈতিক বিদ্রোহের অপরাধেও অপরাধী না হলে হয়ত প্রাশিয়ান সরকার কান্টের ধর্মমতকে ক্ষমা করতে পারতেন। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের সিংহাসন আরোহনের তিন বছর পরেই ফরাসী বিপ্লবের ফলে য়ূরোপের তাবৎ সিংহাসন কাঁপতে শুরু করল। যখন প্রাশিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী খাঁটি উত্তরাধিকার-রাজতন্ত্রের সমর্থনে ছুটে গেল তখন পঁয়ষট্টি বছরের তরুণ কান্ট বিপ্লবকে জানানো স্বাগত সম্ভাষণ আর অশ্রু গদগদ কন্ঠে বন্ধুদের বল্লেন: "এখন আমি সাইমিয়নের (Simeon) মতো বলতে পারি—'প্রভু, এবার তোমার দাসকে শান্তিতে সংসার ত্যাগ করতে দাও কারণ তোমার মুক্তি আমি দেখতে পেয়েছি'।"

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে এ দীর্ঘ শিরোনামায় "The Natural Principle of the Political Order considered in connection with the idea of a Universal Cosmopolitical History" তিনি সংক্ষেপে তাঁর রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেছেন। সকলের বিরুদ্ধে প্রতিজনের যে সংগ্রাম দেখে হব্‌স্ শঙ্কিত হয়েছিলেন তাকে কান্ট জীবনের সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করে তোলার প্রকৃতির এক পদ্ধতি বলেই সর্বাগ্রে জানিয়েছেন স্বীকৃতি, বলেছেন—সংগ্রাম অগ্রগতির এক অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ। সব মানুষ যদি পরিপূর্ণভাবে সামাজিক হতো তা হলে সমাজ অচল হয়ে থাকতো—মানবজাতির বিকাশ আর টিকে থাকার জন্য কিছুটা প্রতিযোগিতা আর ব্যক্তি প্রবণতার খাদের প্রয়োজন রয়েছে। "কিছুটা অসামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণ ছাড়া....মানুষের জীবন হয়তো গেঁয়ো মেষপালকের জীবনে হতো পরিণত, থাকতো সবাই সম্পূর্ণ মিলেমিশে, সন্তুষ্টচিত্তে, একে অন্যকে ভালোবেসে—কিন্তু এ রকম অবস্থায় তাদের সব শক্তি চিরকাল বীজের অন্তরালে থাকতো লুকিয়ে।" (কান্ট কিন্তু রুশোর অন্ধ অনুকারক ছিলেন না)।" অতএব এ অসামাজিকতা, হিংসা, দম্ভ আর ক্ষমতা এবং সঞ্চয়ের যে অতৃপ্তি তার জন্য প্রকৃতির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ......। মানুষ ত চায় এক মত হতে কিন্তু তার সৃষ্ট প্রাণীর জন্য কি ভালো তা প্রকৃতিই ভালো জানে। প্রকৃতি চায় অমিল, মতভেদ—কারণ তা হলে মানুষ নতুন করে তার শক্তিকে খাটাতে বাধ্য হবে এবং এভাবে চেষ্টা করবে তার প্রকৃতি-দত্ত শক্তির বিকাশ সাধনের জন্য।

তা হলে অস্তিত্ব রক্ষার যে সংগ্রাম পুরোপুরি মন্দ নয়। তবে মানুষ অচিরে বুঝতে পারে এ সংগ্রামকে সীমা বিশেষে আটকে রাখতে হয় এবং করতে হবে নিয়ম, আচার আর আইনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ— এ হচ্ছে সভ্য সমাজের মূল উৎস আর তার বিকাশের গোড়া পত্তন। কিন্তু এখন— "সেই একই অসামাজিকতা যা মানুষকে একদিন সমাজবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিল তা আবার প্রতিটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় এক অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতামুখী করে তুলেছে অর্থাৎ এক রাষ্ট্র এখন অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবহার করছে যথেচ্ছভাবে। ফলে যে কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকেও পেতে পারে একই দুর্ব্যবহার যেমন আগে নির্যাতিত ব্যক্তিরা পেতো। কাজেই সমাজ যেভাবে গঠিত হয়েছে—এখন রাষ্ট্রও সেভাবে আইনের দ্বারা পরিচালিত পরস্পর একটা ভদ্র সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য।" ব্যক্তির মতো, জাতিসমূহেরও এখন উচিত প্রকৃতির জন্য স্বভাব ছেড়ে পরস্পর শান্তি রক্ষায় চুক্তিবদ্ধ হওয়া। ইতিহাসের সামগ্রিক অর্থ আর গতি হচ্ছে কলহ আর হানাহানিকে অধিকতর সীমিত করা আর ক্রমাগত প্রসারিত করা শান্তির এলাকা। "মানব জাতির ইতিহাসের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকালে বুঝতে পারা যাবে প্রকৃতির যে এক গোপন পরিকল্পনা রয়েছে ভিতরে বাইরে পূর্ণাঙ্গ এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন বা শাসনতন্ত্র গড়ে তোলা যাতে প্রকৃতি মানবজাতির মধ্যে যে শক্তির বীজ বপন করে দিয়েছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব, সে পরিকল্পনাকে সফল ও সার্থক করে তোলাই এ ইতিহাসের লক্ষ্য।" এমন অগ্রগতি না ঘটলে একের পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সব সভ্যতার সব শ্রমই সিসিপাসের অবস্থায় পৌঁছতে বাধ্য—'যে সিসিপাস অতিকষ্টে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরকে পর্বত চূড়ায় তুলতে না তুলতেই দেখতে পেতো তা গড়িয়ে আবার পাদদেশে চলে গেছে।' এ অবস্থা ঘটলে ইতিহাস পরিণত হবে এক অশেষ ও ঘূর্ণায়মান নির্বুদ্ধিতায়।" তা হলে হিন্দুদের মতো আমাদেরও মনে করতে হবে পৃথিবীটা হচ্ছে অতীত আর বিস্মৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক্ষেত্র"।

"চিরন্তন শান্তি" সম্বন্ধে যে রচনা (১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে, কান্টের একাত্তর বছর বয়সে প্রকাশিত) তা এ বিষয় বস্তুরই এক মহৎ বিকাশ। বাগ্‌বিধিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যে কত সহজ তা কান্ট জানতেন—এ শিরোনামায় তিনি লিখেছেন: "এ কথাগুলো এক সময় এক ডাস্ হোটেল-মালিক এক গির্জা-সংলগ্ন কাবরখানার প্রতিবাদের উত্তরে তার সাইনবোর্ডে ব্যঙ্গ-রচনার নিদর্শন হিসেবে লিখে রেখেছিল।" প্রতি প্রজননের মতো এর আগে কান্টও অভিযোগ করেছিল যে—"জনশিক্ষার খাতে ব্যয় করার জন্য আমাদের শাসকদের হাতে কোন অর্থই থাকে না....কারণ তাদের সব অর্থ-সম্পদই আগামী যুদ্ধের হিসেবের খাতায় করা হয়েছে ন্যস্ত।" সব সৈন্যবাহিনীর বিলোপ সাধন না করলে জাতিসমূহ কখনো সত্যকার-ভাবে সভ্য হবে না। (এ যে কত বড় দুঃসাহসিক প্রস্তাব তা স্পষ্টতর হবে যদি আমরা স্মরণ করি মহান ফ্রেডেরিকের পিতাই প্রাশিয়ায় সর্ব প্রথম বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে লোক গ্রহণের রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা করেন।) "সুসজ্জিত সৈন্যদল নিজ নিজ সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বাড়ায় একে অপরকে সৈন্য-সংখ্যায় ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য যার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই, কেবলই উস্কাতে থাকে। এ কারণে যে অর্থ ব্যয় হয় তাতে শেষে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের চেয়ে শান্তি অধিকতর উৎ-পীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়—ফলে এ দুঃসহ ভার এড়াবার জন্য সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী আক্রমণাত্মক যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" কারণ যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনী নিজেদের প্রয়োজনে ঘরবাড়ী, বসতস্থান হুকুম দখল করবে, লুটতরাজ করবে—সম্ভব হলে শত্রু দেশেই এসব চালাবে কিন্তু প্রয়োজন হলে নিজের দেশকেও রেহাই দেবে না। সরকারী অর্থে এদেরে প্রতিপালনের চেয়ে এ বরং ভালো।

কান্টের মতে এ সামরিকতার প্রধান কারণ আমেরিকা, আফ্রিকা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসিয়ায় য়ুরোপের সম্প্রসারণ—নতুন চোরাই মাল নিয়ে এ যেন চোরে চোরে কলহ। "আমরা যদি বর্বরদের অনাথিয়তার দৃষ্টান্তের সঙ্গে.... সভ্যদের, বিশেষ করে আমাদের মহাদেশের বণিক রাষ্ট্রগুলির অমানুষিক ব্যবহারের তুলনা করি, এমন কি বিদেশ ও বিদেশীদের সঙ্গে প্রথম সং-যোগের সময়ও তারা যে অবিচার করেছে তা ভেবে দেখি তা হলে ঘৃণায় আমাদের ভিতরটা কেঁপে ওঠে—এসব জাতিদের শুধু দেখতে শুনতে বা ওদের দেশ পরিদর্শন করতে যাওয়াকেও এরা বিজয়ের সমতুল্য ধরে নিয়েছে। আমেরিকা ও নিগ্রোদের দেখ। মসলা-দ্বীপ, উত্তমাশা অন্তরীপ ইত্যাদিকে আবিষ্কারের পর এগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যেন এগুলির কোন মালিকই নেই—আদিম অধিবাসীদের মানুষ বলেই গণ্য করা হয়নি....এসব করেছে ঐ সব জাতি যারা নিজেদের সাধুতার করে থাকে বড়াই, এরা একদিকে পাপকে জলের মতো পান করে অন্যদিকে নিজেদের মনে করে গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসের প্রতিভূ।"—এত সব লেখার পরেও কনিজবার্গের বুড়ো শৃগালটাকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়নি।

কান্টের মতে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির শ্রেণীভিত্তিক শাসনতন্ত্রই এ সাম্রাজ্য-বাদী লোভের জন্য দায়ী—এ লুটের মাল মাত্র মুষ্টিমেয়ের হাতে গিয়ে পেঁ†চে, বাঁটোয়ারার পরও এক একজনের হাতে প্রচুর থেকে যায়। যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতো, সকলেই যদি হতো রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগীদার তা হলে এ আন্তর্জাতিক ডাকাতির মাল এত বেশী বিভক্ত হতো যে ফলে তা নিজেই লোভের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত। তাই "চিরন্তন শান্তির প্রথম সুনির্দিষ্ট শর্তই হচ্ছে এটা : সব বেসামরিক শাসনতন্ত্র হবে প্রজাতন্ত্রী আর সব নাগরিকের গণভোট ছাড়া কোন রকম যুদ্ধই হতে পারবে না ঘোষিত। যাদের যুদ্ধ করতে হবে তাদেরে যদি যুদ্ধ আর শান্তি যে কোন একটা বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় তা হলে ইতিহাস আর রক্তাক্ষরে লেখা হবে না। "কিন্তু যে শাসনতন্ত্রে প্রজার ভোটাধিকার নেই, তা প্রজাতন্ত্র নয়—সেখানে যুদ্ধ একটা তুচ্ছ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় শাসক স্রেফ একজন নাগরিক নন, তিনি রাষ্ট্রের মালিকও—যুদ্ধে তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, তাঁকে ত্যাগ করতে হয় না খাওয়া বা শিকারের আনন্দ, ছাড়তে হয় না সুখের রাজপ্রাসাদ, আনন্দ-উৎসব ইত্যাদি। কাজেই সামান্যতম কারণেও তিনি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন—তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এটা যেন শিকার-অভিযান। এসব অভিযানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সাফাই দেওয়ার ভার তিনি নির্বিকারভাবে কূটনৈতিকদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন আর এ করার জন্য ওরা ত সদা প্রস্তুত।" সাম্প্রতিক সত্যের কি এক নির্ভেজাল চিত্র!

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর উপর যখন বিপ্লবের নিঃসন্দিগ্ধ জয়লাভ ঘটে তখন কান্টের মনে আশা হলো এবার সারা য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রজাতন্ত্র আর গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এমন এক আন্তর্জাতিক শাসন যাতে দাসত্ব আর অপরের শ্রম-সম্পদের অন্যায় সুযোগ নিয়ে বড় হওয়ার প্রবৃত্তি হ্রাস পাবে—আর এ শাসন শপথ নেবে শান্তির। আসলে সরকারের উদ্দেশ্য ত ব্যক্তির বিকাশের সহায়তা করা, তার ব্যবহার বা অপব্যবহার নয়। "প্রতিটি মানুষকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে করতে হবে শ্রদ্ধা—বাইরের কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হলে মানুষ হিসেবে তার যে আত্মমর্যাদা তার প্রতি করা হয় আঘাত হানা"। এও মানুষের অসন্দিগ্ধ অন্তর নির্দেশের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এ ছাড়া ধর্ম হয়ে পড়ে এক কপট প্রহসন। তাই কান্টের দাবী ঐক্য, সাম্য—যোগ্যতার সাম্য নয় বরং যোগ্যতা বিকাশের সুযোগের সাম্যই তিনি চান। জন্মগত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার তিনি মানেন না—জন্মগত সব সুযোগ-সুবিধা যে অতীতের কোন রক্তাক্ত বিজয়ের ফল তাই তিনি বলতে চান। দুর্বোধ্যতা আর প্রতিক্রিয়াশীলতার মাঝখানে, যখন য়ুরোপের সমস্ত রাজতন্ত্র বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য ঐক্যবদ্ধ বয়স সত্তর হওয়া সত্ত্বেও তখন তিনি সর্বত্র গণতন্ত্র, স্বাধীনতা আর নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দণ্ডায়মান। ইতিপূর্বে কখনো বার্ধক্য এমন তারুণ্যের কন্ঠে আওয়াজ তোলেনি।

কিন্তু এখন তিনি প্রায় ফতুর। তাঁর দৌড় তিনি শেষ করেছেন, শেষ করেছেন তাঁর সংগ্রাম। এবার ধীরে ধীরে তিনি শুকিয়ে যেতে লাগলেন শিশুর মতো নিষ্ক্রিয়তায়। অবশেষে দেখা দিলো উন্মাদ-দশা—একে একে তাঁর সব শক্তি আর ইন্দ্রিয়বোধ হয়ে এলো নিস্তেজ। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে উনাশী বছর বয়সে স্বাভাবিক শান্তির মধ্যেই ঘটলো তাঁর মৃত্যু—মৃত্যু নয় এ যেন গাছ থেকে একটি পাতা খসে পড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. সমালোচনা আর মূল্যায়ন

শতাব্দীব্যাপী দার্শনিক ঝড়-ঝন্ঞার আঘাতের পর এসব লজিক, পরা-বিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, নীতিকথা আর রাজনীতির জটিল গঠন-সংস্থার এখন কি অবস্থা ? সুখের বিষয় যে এ মহান ইমারতের অনেকখানি আজো অটুট রয়েছে আর সমালোচনামূলক দর্শন' চিন্তার ইতিহাসে মনে হয় এ এক স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েই থাকবে। কিন্তু এ ইমারতের বাইরের অনেক কিছু, অনেক অপ্রধান বিষয়ের ভিৎ-আজ অনেকখানি নড় বড়ে হয়ে এসেছে।

এখন প্রথম জিজ্ঞাস্য শূন্যমণ্ডল কি শুধু "সচেতনতার রূপ", অনুভূতিশীল মনের বাইরে তার কি স্বাধীন কোন বস্তুগত বাস্তবতা নেই ? হাঁ এবং না —এ প্রশ্নের এ দুই বিপরীত উত্তর। হাঁ—উপলব্ধ বস্তু ছাড়া শূন্যস্থান শুধু শূন্যের ধারণা মাত্র। "স্থান" শুধু একথাটাই বুঝায় যে অন্য উপলব্ধ বস্তুর তুলনায় এ এ অবস্থায়, এ দূরত্বে অন্য কতকগুলি বস্তু রয়েছে যা উপলব্ধিশীল মনে ধরা পড়ে—স্থানিক বস্তু ছাড়া বাহ্যিক কোন উপলব্ধি সম্ভব নয়। কাজেই শূন্যস্থান "বাহ্যিক চেতনার এক অত্যাবশ্যক রূপ।" আর না হচ্ছে—নিঃসন্দেহে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বার্ষিক ঘূর্ণায়নের যে স্থানিক সত্য যা মনের প্রেক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব হলেও তা সব রকম উপলব্ধি নিরপেক্ষ। বায়রণ বলার আগে থেকে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও গভীর নীল সমুদ্র তেমনি প্রবাহিত ছিল ও আছে। স্থান-শূন্য চেতনার সংযোগে মনের দ্বারা 'শূন্যস্থান' গড়ে ওঠেনি—একই সময় বিভিন্ন বস্তু ও বিভিন্ন বিষয়ের উপলব্ধি দিয়েই আমরা সরাসরি শূন্যস্থান' উপলব্ধি করতে সক্ষম হই—যেমন, যখন দেখি এক নীরব পটভূমির উপর দিয়ে একটা পোকা হেঁটে চলেছে। তেমনি সময়ের আগে পরের যে চেতনা অথবা গতির পরিমাপ এসবই মন্ময় ব্যাপার আর অতিবেশী আপেক্ষিক কিন্তু বিগত সময়ের মাপ আমরা নিই বা না নিই, উপলব্ধি করি বা না করি গাছ বিশেষের বয়স বাড়বে ওটা জীর্ণ হবে এবং ক্ষয় পাবেই। সত্য কথা এযে বস্তুবাদ এড়াবার জন্য শূন্যস্থানের মন্ময়তা প্রমাণের জন্য কান্ট বডড বেশী ব্যস্ত ছিলেন—তিনি শূন্যস্থান মন্ময় আর বিশ্বজনীন এ যুক্তিকে এ কারণে ভয় পেতেন যে তা হলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই ঐ শূন্যমণ্ডলে বিরাজ করছেন, তা হলে ঈশ্বরও হয়ে পড়েন স্থানিক আর পদার্থিক। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনামূলক আদর্শবাদ বলে সব রকম বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে চেতনা আর ভাবের মারফৎ—এ নিয়ে কান্ট সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন। বৃদ্ধ শৃগাল যতখানি গিলতে পারবে তার অনেক বেশিই মুখে পুরেছেন।

অনন্যের মরিচীকার পেছনে শক্তি ক্ষয় না করে তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যের আপেক্ষিকতায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেতন। ইংলেণ্ডের পিয়ারসন, জার্মেনির ম্যক্ আর ফ্রান্সের হেন্‌রি পঁয়কার যে গবেষণা করেছেন তা কান্টের চেয়ে হিউমেরই বরং বেশী সমর্থন করে—সব বিজ্ঞান, এমন কি গণিতের মতো কঠিনতম বিষয়ও, সত্যের ব্যাপারে আপেক্ষিক। এ বিষয়ে বিজ্ঞানের নিজের কোন দুর্ভাবনা নেই—সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা নিয়েই বিজ্ঞান সন্তুষ্ট। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত "আবশ্যকীয়" জ্ঞানও তেমন আবশ্যক নয়।

কান্টের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তিনিই চরমভাবে দেখিয়েছেন বাহ্যিক জগতকে আমরা জানি স্রেফ চেতনার সাহায্যে—আমাদের মন চেতনার এক অসহায় নিষ্ক্রিয় শিকার মাত্র নয়। বরং এক সক্রিয় প্রতিনিধি যে সব রকম অভিজ্ঞতাকে নির্বাচন করে পুনর্গঠন করে। এর মহত্তকে কিছুমাত্র খর্ব না করেও এ সাফল্য থেকে বিয়োগ সাধন করা যায়। শোপেন হাওয়ারের সঙ্গে তাঁর এ রুটিওয়ালাসুলভ ডজনখানেক বিভিন্ন শ্রেণীকে বাক্সে ভরে ত্রিমূর্তিদান, তারপর সম্প্রসারণ আর সঙ্কোচন করে নিয়ে ভ্রান্ত ব্যাখ্যার সাহায্যে নির্মমভাবে সব কিছুর যোগ্য আর আয়ত্তাধীন করা দেখে হাসতে পারি। এবং আমরা এ প্রশ্নও তুলতে পারি এসব শ্রেণীবিভাগ অথবা চিন্তার ব্যাখ্যামূলক যে রূপ তা সহজাত কি না? চেতনা আর অভিজ্ঞতার আগেও তার অস্তিত্ব ছিল কি না? স্পেন্সার যেমন মনে করতেন, হয়ত ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে, যদিও তা জাতির দ্বারাই অর্জিত—আবার ব্যক্তির দ্বারা অর্জিতও ত হতে পারে। হয়ত চিন্তা-গুচ্ছই শ্রেণী-বিভাগ—চেতনা আর উপলব্ধি ক্রমাগত নিজে থেকে এগুলিকে সাজিয়ে ধারণা আর চেতনার অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। প্রথমে বিশৃঙ্খলভাবে, পরে স্বাভাবিক নির্বাচনী শক্তি দিয়ে করে তুলেছে সুশৃঙ্খল, সহনীয় আর বোধগম্য স্মৃতিই সাজিয়ে, ব্যাখ্যা করে চেতনাকে উপলব্ধিতে আর উপলব্ধিকে ভাবে পরিণত করে। কিন্তু স্মৃতি হচ্ছে বর্ধিত ব্যাপার। মনের যে ঐক্যকে কান্ট সহজাত মনে করেন তা কিন্তু অর্জিত—তাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাইর পক্ষে সম্ভব নয়। আর তা অর্জন যেমন করা যায় তেমনি যায় হারানোও—স্মৃতি লোপ পেলে, ব্যক্তিত্ব বৈপরিত্যে বা উন্মাদ অবস্থার ফলেও তা ঘটে। ধারণাশক্তি অর্জিত সম্পদ, দৈব-দান নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দী, কান্টেরনীতি, তাঁর সহজাত ও অনন্য নৈতিক-বোধের প্রতি কঠিন আঘাত হেনেছে। বিবর্তন দর্শনের অকাট্য ধারণা ব্যক্তি-মনে কর্তব্য বোধ সমাজেরই দান, বিবেকের বিষয়বস্তু অর্জিত, যদিও সামাজিক ব্যবহারের প্রতি যে অনির্দিষ্ট মনোভাব তা অনেকখানি জন্মগত। নীতিবিদ সামাজিক মানুষ—ঈশ্বরের রহস্যময় হাতের "বিশেষ সৃষ্টি নয়"—বরং বিবর্তনের পরবর্তী অবস্থায় ধীরে সুস্থে সৃষ্টি হয়েছে বলে বলা যায়। নৈতিক-বোধ অনন্য নয়—এগুলি শ্রেণী বিশেষের টিকে থাকার প্রয়োজনে ব্যবহার বিধি হিসেবে আর অনেকখানি এলোমেলোভাবে গড়ে তোলা হয়েছে—তাই শ্রেণীর স্বভাব আর অবস্থানুসারে তা বিভিন্ন। শত্রু বেষ্টিত জাতি অলস আমোদ-প্রমোদকে ভাবে নীতিহীন কিন্তু ধনসম্পদ আর নিরাপদ বিচ্ছিন্নতায় যে যৌবন-দীপ্ত জাতি বাস করছে সে এসবকে হয়ত মনে করবে জাতীয় চরিত্র গঠন আর প্রাকৃতিক সম্পদ সন্ধানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বলে। কান্টের মতে কোন কাজই শুধু কাজ হিসেবে ভালো নয়।

তাঁর যৌবনের সাধুতা, অশেষ কর্তব্যের কঠোর জীবন আর বিরল আমোদ প্রমোদ তাঁকে করে তুলেছিল নীতিবাদী করে—অবশেষে তিনি কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য সে কথা বলতেও শুরু করেছিলেন—ফলে অজ্ঞাতসারে প্রাশিয়ান অনন্যতাবাদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন। আনন্দের বিরুদ্ধে কর্তব্যের যে বিরোধিতা তা স্কট্ দেশীয় ক্যালভিনিজমেরই নিদর্শন—ভল্টেয়ার যেমন মন্টেইনী আর সুখবাদী রেনেসাঁসের অনুসারী ছিলেন তেমনি কান্ট ছিলেন লুথার আর বিষয়বিরাগী সংস্কার আন্দোলনের অনুসারী। একদিন ভূমধ্যসাগরীয় ইটালীর অলস বিলাসিতার বিরুদ্ধে যেমন লুথারের মনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়েছিল তেমনি অহংবোধ আর আনন্দেই সর্ব মঙ্গল' বাদের বল্গাহারা যে যুগ-জীবনকে হেলভেটিয়াম আর হলবাক রূপায়িত করেছিল তার বিরুদ্ধে কান্টের মনেও প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কান্টের নীতিকথার অনন্যতার বিরুদ্ধে এক শতাব্দীর প্রতিক্রিয়ার পরেও আজ আমরা আবার নিজেদের নাগরিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আর নীতিহীনতার পক্ষেই দেখতে পাচ্ছি—দেখতে পাচ্ছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মম ব্যক্তিত্ববাদ যা আভিজাত্য বোধ বা গণতান্ত্রিক চেতনায় কিছুমাত্র সংযত নয়। হয়ত এমনদিন আসবে যখন এ বিচ্ছিন্নমুখী সভ্যতা কান্টের কর্তব্যের প্রতি আহ্বানকে আবার স্বাগত জানাবে।

ঈশ্বর, স্বাধীনতা আর অমরতা ইত্যাদি যে সব ধর্ম ভাবকে তিনি তাঁর প্রথম ক্রিটিকে প্রায় নস্যাৎ করে ছেড়েছেন দ্বিতীয় ক্রিটিকে সেগুলিকেই আবার যে প্রবল যুক্তি দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন কান্টীয় দর্শনে তা হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর। নীট্‌শের সমালোচক-বন্ধু পল রি (Poul Ree) বলেছেন: "কান্টের রচনা পড়তে পড়তে তোমার মনে হবে তুমি যেন এক গ্রাম্য মেলায় এসেছ। তাঁর কাছে যা চাও তাই কিনতে পাবে—ইচ্ছার স্বাধীনতা আর ইচ্ছার দাসত্ব, আদর্শবাদ আর আদর্শবাদের বিরোধিতা, নাস্তিকতা আর সদাপ্রভু সবই পাবে। যাদুগীর যেমন শূন্য টুপি থেকে সবকিছু বের করে তেমনি কান্টও কর্তব্যবোধ থেকে ঈশ্বর, অমরতা, স্বাধীনতা বের করে তাঁর পাঠকদের তাক লাগিয়ে দেন।" পুরস্কারের প্রয়োজনে অমরতা গড়ে তোলায় শোপেন হাওয়ারও তাঁর প্রতি বিদ্রূপ হেনেছেন: "প্রথমে কান্টের পুণ্য বেশ সাহসের সঙ্গে তাঁকে সুখের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। পরে স্বাধীনতা হারিয়ে তা বখশিসের জন্য দিয়েছে হাত বাড়িয়ে।" ঐ মহান নৈরাশ্যবাদীর বিশ্বাস, কান্ট আসলে এক সংশয়বাদী। যিনি নিজে ধর্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করে জনসাধারণের ধর্ম-বিশ্বাস নষ্ট করতে ভয় পেয়েছেন—জনসাধারণের নৈতিক পরিণতির কথা ভেবেই এ ভয়। "কান্ট কল্পনা-নির্ভর ধর্ম শাস্ত্রের অসারতা খুলে দেখিয়েছেন কিন্তু চলতি শাস্ত্রকে স্পর্শ করেননি, বরং নৈতিকবোধের উপর ভিত্তি করে তাকে আরো মহৎভাবে করেছেন প্রতিষ্ঠা।" পরে এটাকে নকল দার্শনিকরা বিকৃত করে যুক্তিবোধ আর ঈশ্বরের ধারণা ইত্যাদিতে নিয়ে গেছেন....। কান্ট পুরোনো ও পবিত্র ভুল-ভ্রান্তির যখন বিনাশ সাধন করছিলেন তখন এর বিপদ সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল, নৈতিক শাস্ত্র দিয়ে তিনি যেন ঐ সবের কিছু অস্থায়ী ও দুর্বল স্থলাভিষিক্ত জুগিয়েছিলেন এ ভেবে যে বিপদটা যেন তাঁর মাথায় এসে না পড়ে আর তিনি যেন পান পলায়নের সময়।

নিঃসন্দেহে কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই হেইনেও কান্টের এ ব্যঙ্গ চিত্র এঁকেছেন—ধর্মকে ধ্বংস করে একদিন কান্ট তাঁর চাকর লেম্পেকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়াতে বেরিয়েছেন, হঠাৎ বুঝতে পারলেন বুড়োর চোখ দু'টা জলে ভরে এসেছে: "ইমানুয়েল কান্টের মনে দয়ার সঞ্চার হলো, দেখালেন তিনি শুধু বড় দার্শনিক নন একজন সৎলোকও কন্ঠে ব্যঙ্গ আর দয়া মিশিয়ে মনে মনে বল্লেন: 'ব্যবহারিক যুক্তি বলছে বুড়ো লেম্পের একজন ঈশ্বর চাই না হয় সে কিছুতেই সুখী হতে পারবে না, তা হলেই আমার জন্যও ব্যবহারিক যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দানে সক্ষম।" এসব ব্যাখ্যাকে যদি সত্য বলে মানতে হয় তা হলে কান্টের দ্বিতীয় ক্রিটিককে এক উত্তম দুঃখ-চেতনা বিলোপী (Anesthetic) দাওয়াই বলতে হবে।

কিন্তু ভিতরের কান্টের এসব দুঃসাহসী গঠনকে অত বেশী গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। যে উৎসাহ নিয়ে তিনি তাঁর "Religion within the limits of Pure Reason" লিখেছেন তাতে যে তীব্র আন্তরিকতা দেখা যায় তাতে তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই আর ধর্মের পাদ-ভূমি শাস্ত্র থেকে নৈতিকতায়, বিশ্বাসে থেকে আচারে তিনি যে ভাবে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন তাতে এক গভীর ধর্মবোধেরই পরিচয় রয়েছে। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি মোসেস মেন্ডেলসন নামক এক বন্ধুকে লিখেছিলেন: "আমি অনেক বিষয়ে পরিষ্কার বিশ্বাস নিয়েই যে চিন্তা করি তা অত্যন্ত সত্য কথা....সব কথা প্রকাশ্যে বলার সাহস আমার নেই কিন্তু কোনদিন না ভেবে আমি কোন কথা বলব না।" স্বভাবতই ক্রিটিকের মতো অত দীর্ঘ ও দুর্বোধ্য রচনায় পরস্পর বিরোধী ভাষ্যের সুযোগ রয়েছে। বইটি প্রকাশের কয়েক বছর পরে প্রাথমিক সমালোচকদের অন্যতম রেন হোল্ড (Reinhold) যা বলেছিলেন আজকের দিনেও তা আমরা বলতে পারি: "অনড় ধর্মবিশ্বাসীরা বলেছেন 'The critique of Pure Reason'-এ এক সংশয়বাদী সব রকম জ্ঞানের নিশ্চয়তাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছেন—সংশয়বাদীদের এমন একগুঁয়ে বিশ্বাস যে তাঁরা পূর্বতন পদ্ধতির ধ্বংসের উপর নতুন রকমের এক অনড় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করবেন,—এক অতি সূক্ষ্ম কৌশলে অতি প্রকৃতিবাদীরা ধর্মের ঐতিহাসিক ভিত্তিটাকে স্থানচ্যুত করে চেষ্টা করছেন বিনা তর্ক-বিতর্কে প্রকৃতিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে,—ধর্ম-বিশ্বাসের মরনোন্মুখ দর্শনটার গায়ে একটা নতুন খুঁটি লাগাতে চান প্রকৃতিবাদীরা,—বস্তুবাদীরা চান বস্তুর বাস্তবতাকে এক আদর্শবাদী স্ববিরোধিতা বলতে,—অধ্যাত্মবাদীরা বলেন সব বাস্তবতা দৈহিক জগতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমিত ভাবা অযৌক্তিক, এসব কিছুর আত্মগোপন ঘটেছে অভিজ্ঞতার এলেকা নামের আড়ালে।" সত্যই বইটার গৌরবও এসব বিষয়ের মূল্যায়নের জন্যই। কান্টের মতো বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্যই এসবের মধ্যে তিনি সমঝোতা সাধনে সক্ষম হয়েছেন আর এসবকে এমন এক জটিল সত্যে মিশিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছেন যে দর্শনের পূর্ববর্তী ইতিহাসে তার কোন নজির নেই।

তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে এটুকু বলা যায় যে তাঁর কল্পলোককে কেন্দ্র করেই ঊনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় দার্শনিক চিন্তা আবর্তিত হয়েছে। কান্টের পরে সমগ্র জার্মেনি পরা-বিজ্ঞানমুখর হয়ে ওঠে, তাঁকে অধ্যয়ন করলেন শিলার আর গ্যেটে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে বিথোবেন জীবনের দুই অত্যাশ্চর্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তিঃ "মাথার উপরে তারকাখচিত আকাশ আর ভিতরে নৈতিক বিধি"—উধৃত করেছেন, কনিজ্‌বার্গের বৃদ্ধ সাধুর আদর্শবাদ লালিত চিন্তাধারা নিয়ে ফিস্‌টে, শেলিং, হেগেল আর শোপেনহাওয়ার দ্রুত বড় বড় সব চিন্তা পদ্ধতি প্রকাশ করলেন জার্মেন পরাবিদ্যার এ সৌরভিত যুগে জঁা পল রিস্‌টার লিখেছিলেনঃ "ঈশ্বর ফরাসীদের দিয়েছেন ভূমি, ইংরেজদের দিয়েছেন সমুদ্র আর জার্মেনদের দিয়েছেন বায়ুমণ্ডলের সাম্রাজ্য।" কান্টের যুক্তি সমালোচনা আর অনুভূতির প্রতি সপ্রশংস সমর্থন রয়েছে শোপেনহাওয়ার আর নীট্‌শের স্বেচ্ছা-নির্ভরতায়', বার্গসঁর সহজাত বৃদ্ধিবাদ আর উইলিয়াম জেমসের বাস্তবতা-বাদের পথ রচনায়; তাঁর চিন্তার বিধি-বিধান আর বাস্তবতার বিধি-বিধান যে এক এ ধারণা হেগেলকে দিয়েছে দর্শনের একটা পূর্ণ পদ্ধতি আর তাঁর জ্ঞানাতীত 'বস্তুর নিজস্বতা' স্পেনসারকে যে কত খানি প্রভাবিত করেছিল স্পেন্‌সার নিজেও তা জানতেন না। বিভিন্ন ধর্ম আর দর্শন যে চিরন্তন সত্যের স্রেফ বস্ত্র-বদল গ্যেটে আর কান্টের এ দুর্বোধ্যতায় কার্লাইলের অনেক রূপক রচনার দুর্বোধ্যতার যে উৎস তা জানা যায়। কেয়ার্ড, গ্রীন, ওয়ালেস্‌ আর ওয়ার্টসন এবং ব্রেডলে প্রভৃতি ইংলণ্ডের আরো অনেকে প্রথম ক্রিটিকের' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, এমন কি বেপরওয়া সংস্কারবাদী নীটশে যিনি "কনিজ্‌বার্গের মহান চীনাম্যনের" স্থিতিশীল নীতিবাদকে পরম উৎসাহে নিন্দা করতেন তিনিও তাঁর কাছ থেকে নিয়েছেন তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানবাদের সূত্র। কান্টের আদর্শবাদ, যা নানাভাবে সংস্কৃত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে আর বহুলভাবে সংশোধিত জ্ঞানালোক আন্দোলনের বস্তুবাদের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পর মনে হয় কান্টেরই হয়েছে বিজয়। এমন কি হেলভেটিয়াসের মতো বিখ্যাত বস্তুবাদীও এ অসম্ভব উক্তি করেছেন "দুঃসাহসিক হলেও আমি বলতে চাই মানুষই পদার্থের স্রস্টা।" সরল ও আদি যুগের মতো দর্শন আর কখনো এতখানি সহজ হবে না—এর পর থেকে দর্শন ভিন্নতর ও গভীরতর হবে, কারণ কান্ট জন্মেছিলেন।

৮. হেগেল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

খুব বেশীদিনের কথা নয়, দর্শনের ঐতিহাসিকরা কান্টের অব্যবহিত পরবর্তী ফিস্‌টে, শেলিং আর হেগেলকে যে স্থান ও সম্মান দিতেন তাঁর পূর্ববর্তী বেকন, ডেসকার্টেস্‌ থেকে ভল্টেয়ার, হিউমকেও আধুনিক চিন্তা-চর্চার ক্ষেত্রে সে একই স্থান দিতেন। আমাদের পরিপ্রেক্ষিত এখন কিছুটা ভিন্নতর—পেশাগত পদের প্রতিযোগিতায় তাঁর সফল প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি শোফেনহাওয়ার যে নিন্দা বর্ষণ করেছেন সম্ভবতঃ খুব বেশী করে আমরা তাই উপভোগ করেছি। কান্ট পড়ে শোফেন হাওয়ার বলেছিলেন: "যা দুর্বোধ্য তা যে সব সময় অর্থহীন নয় তা দেখতে এখানে জনসাধারণকে করা হয়েছে বাধ্য।" ফিস্‌টে আর শেলিং-এর সুযোগ নিয়ে পরাবিদ্যার চমৎকার সব মাকড়সার জাল উদ্ভাবন করেছিলেন। "নির্বুদ্ধিতার সমর্থনে চরম দুঃসাহসের সঙ্গে অর্থহীন যথেচ্ছ শব্দের ধাঁধাঁ একসঙ্গে গাঁথার এমন দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে পাগলা-গারদে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়নি—এর চরম পরিণতি ঘটেছে হেগেলে, যা হয়ে পড়েছে সার্বিক দুর্জ্ঞেয়তার এক নির্লজ্জ হাতিয়ার। ফলে পরবর্তী বংশধরদের কাছে তা মনে হবে কল্পিত কাহিনী আর থাকবে জার্মেন বোকামির এক কীর্তি স্তম্ভ হয়ে।" কেয়ার্ভের (Pythogoriou) এসব কথা কি যুক্তি সঙ্গত?

AMARBOI.COM

১৭৭০-এ, স্টাটগার্টে জর্জ উইলহেল্‌ম ফ্রিড্‌রিক হেগেলের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন উরটেমবার্গ সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগে এক অধঃস্তন কর্মচারী—হেগেল ঐ সব প্রশাসনিক কর্মচারীদের, যাদের সবিনয় যোগ্যতা জার্মেনিকে বিশ্বের সবচেয়ে সুশাসিত নগরীর দৃষ্টান্ত করে তুলেছিল, তাদের সংযত ও সুশৃঙ্খল অভ্যাসের মধ্যেই হয়েছেন বর্ধিত। ছাত্র হিসেবে হেগেল ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী—যত সব গুরুত্বপূর্ণ বই পড়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবেরই তিনি পূর্ণ বিশ্লেষণ করতেন আর নকল করে নিতেন দীর্ঘ দীর্ঘ অনুচ্ছেদ। তিনি বলতেন সুকঠোর আত্মবিলোপের মধ্যেই সত্যিকার সংস্কৃতির সূচনা হওয়া চাই—পিথাগোরীয় (**Pythagorean**) শিক্ষা-নীতিরও নির্দেশ প্রথম পাঁচ বৎসর সব ছাত্রকেই জীবনযাপন করতে হবে পরম শান্তির মধ্যে।

তিনি গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন গভীরভাবে, এ অধ্যয়নের ফলে হয়ে পড়েন এথেনীয় সংস্কৃতির অনুরাগী, অন্যসব রকম অনুরাগের মৃত্যুর পরও এ অনুরাগ কিন্তু তাঁর জীবনে হয়েছিল অবিচ্ছিন্ন। তিনি লিখেছেন ঃ "সংস্কৃতিমনা জার্মেনরা গ্রীসের নামে একটা আত্মীয়তা বোধ করে থাকেন। য়ুরোপীয়েরা, অনেক দূরের প্রাচ্য থেকেই পেয়েছে তাদের ধর্ম....কিন্তু এখানে বর্তমানে যে বিজ্ঞান আর শিল্প জীবনকে তৃপ্তিকর, উন্নত আর সুশোভিত করে তুলেছে তা আমরা পরোক্ষভাবে কিম্বা প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করেছি গ্রীসের কাছ থেকেই।" কিছুকাল ত তিনি খ্রীস্ট ধর্মের চেয়ে গ্রীসের ধর্মকেই অধিকতর পছন্দ করতেন আর ষ্ট্রাউস আর রেনার আবির্ভাবের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন 'যিশু খ্রীস্টের' এক জীবনী লিখে যাতে তিনি যিশুকে মেরি আর যোসেফের ছেলে বলেই উল্লেখ করেছিলেন আর অলৌকিক ঘটনাগুলিকে দিয়েছিলেন বিসর্জন। পরে এ বই তিনি নষ্ট করে ফেলেন।

রাজনীতিতেও তিনি এমন বিপ্লব প্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন যে তাঁর পরবর্তী জীবনের 'অবস্থা যেমন আছে তেমনকে' পবিত্রীকরণের কথা ভাবাই যায় না। যখন টুবিনজেনে যাজক বৃত্তি সম্বন্ধে অধ্যয়নরত ছিলেন তখন তিনি আর শেলিং একদিন অতি প্রত্যুষে স্থানীয় হাটখোলায় একটা 'স্বাধীনতা বৃক্ষ' (অর্থাৎ স্বাধীনতার স্মরণে) রোপণ করতে গিয়ে-ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ "ফরাসী জাতি বিপ্লব-স্নাত হওয়ার ফলে এমন বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছেন, যা মানবাত্মা শিশু-পায়ের জুতোর মতো পেছনে ফেলে এসেছে, কারণ তা ছিল এক অকারণ বোঝা, আজো যা নেহাৎ মরা পালকের মতো অন্যদের উপর রয়েছে চেপে।" যখন তিনি মনে করতেন "যৌবনটাই একটা স্বর্গ" সে উৎসাহ-উদ্দীপনার দিনে, ফিস্টের মতো তিনিও এক রকম অভিজাত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে হাবভাব জমিয়েছিলেন আর তখন যে রোমান্টিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবধারা সমগ্র য়ুরোপকে গ্রাস করে বসেছিল তাঁর স্বভাব-সুলভ উত্তেজনার সঙ্গে তিনিও তাতে হয়ে পড়েছিলেন শরীক।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি টুবিনজেন থেকে গ্রেজুয়েট হলেন—সার্টিফিকেটে লেখা হলো তাঁর মেধা আর চরিত্র ভালো, শাস্ত্র আর ভাষাতত্ত্বে তিনি পারদর্শী কিন্তু দর্শনে তাঁর কোন যোগ্যতা নেই। তখনো তিনি খুব দরীদ্র—বার্ণ আর ফ্রাঙ্কফোর্টে ছেলে পড়িয়ে তাঁকে উপার্জন করতে হতো জীবিকা। এ বছরগুলি হচ্ছে তাঁর গুটিকা-জীবন-জাতীয়তার অন্তর্দ্বন্দ্বে য়ূরোপ যখন খণ্ড বিখণ্ড, তখন হেগেল নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সংহত হয়ে উঠলেন বেড়ে। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রায় পনর শ' ডলারের উত্তরাধিকারী হলেন—এবার নিজেকে মনে করলেন ধনী, ছেড়ে দিলেন ছেলে পড়ানো। বন্ধু শেলিঙের পরামর্শ চাইলেন কোথায় গিয়ে বসতি স্থাপন করবেন, এমন একটা জায়গার নাম বলতে বল্লেন যেখানে পাওয়া যাবে সাদাসিদা খাবার, প্রচুর বই-পুস্তক আর "একটি ভালো শবাধার"। শেলিং জেনার কথা সুপারিশ করলেন—ওটা বিশ্ববিদ্যালয় শহর আর ছিল ভাইমারের ডিউকের শাসনাধীনে। জেনায় শিলার ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক আর রোমান্টিক ভাব-ধারা প্রচার করছিলেন টিয়েক, নোভালিস্ আর শ্লেগেলস্ এবং ফিস্টে আর শেলিং নিজ নিজ দর্শন। হেগেল ওখানে গিয়ে পৌঁছলেন ১৮০১-এ আর ১৮০৩-এ নিযুক্ত হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে।

১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের বিজয় বাহিনীর হাতে যখন প্রাশিয়ানদের পরাজয় ঘটলো তখন জ্ঞান-সাধনা রত এ ক্ষুদ্র নগরটিও অত্যন্ত ভয়-ভীতি ও বিশৃঙ্খলার শিকারে হলো পরিণত। হেগেল তখনো সেখানে। ফরাসী সৈন্যরা হেগেলের বাড়ী আক্রমণ করলো, প্রকৃত দার্শনিকের মতো হেগেল পলালেন বাড়ী ছেড়ে, সঙ্গে নিলেন নিজের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'The Phenomenology of spirit'-এর পাণ্ডুলিপিখানি। কিছুদিন তিনি এত বেশী অভাবগ্রস্ত ছিলেন যে স্বয়ং গ্যেটে নেবেলকে (Knebel) বলেছিলেন এ বিপদের সময় হেগেলকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে। হেগেল অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে নেবেলকে লিখে পাঠালেন: "বাইবেলের—'প্রথমে খাদ্য ও বস্ত্রের সন্ধান কর, তা হলে স্বর্গ রাজ্য এসে তার সঙ্গে যোগ হবে'—একথার সত্যতা আমি অভিজ্ঞতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বারা শিখেছি আর এটাকে আমি করেছি আমার জীবনের ধ্রুবতারা।" কিছুদিনের জন্য বাসবার্গে তিনি একটা কাগজও সম্পাদনা করেছিলেন, পরে ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি নূরনবার্গের জিমনেসিয়াম প্রধানের পদেও অধিষ্ঠিত হন। বোধ হয় সেখানেই প্রশাসনিক কর্তব্যের নীরস প্রয়োজনের চাপে পড়ে তাঁর ভিতরের রোমান্টিকতার আগুনটা এসেছিল ঠাণ্ডা হয়ে এবং নেপোলিয়ন আর গ্যেটের মতো তাঁকেও তা সে রোমান্টিক যুগের এক স্মরণীয় নিদর্শন করেই ছেড়েছিল। সেখানেই তিনি লেখেন তাঁর 'Logic' (১৮১২—১৬), স্রেফ দুর্বোধ্যতার জন্যই তা সারা জার্মেনিকে করে সম্মোহিত আর তাঁর জন্য নিয়ে আসে হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন অধ্যাপকের পদ। হেইডেলবার্গে বসেই তিনি লেখেন তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ (Encyclopaedia of the Plilosophical Scinces' (১৮১৭), এ গ্রন্থ রচনার ফলে তাঁর পদোন্নতি ঘটে—১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিযুক্ত হন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে। এ সময় থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত দার্শনিক জগতে ছিল তাঁর একাধিপত্য—যেমন একাধিপত্য ছিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্যেটের আর সংগীতের রাজ্যে বিথোবেনের। গ্যেটের পর দিনই পড়ে তাঁর জন্মদিবস—গর্বিত জার্মেনি প্রতি বছর ভোগ করে যুগ্ম ছুটি।

এক ফরাসী ভদ্রলোক হেগেলকে বলেছিলেন তাঁর দর্শন কি তা এক বাক্যে বুঝিয়ে দিতে—কিন্তু যে সন্ন্যাসীকে হয়েছিল এক পায়ের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় খ্রীষ্ট ধর্মের সংজ্ঞা দিতে বলা হলে তিনি যেমন স্রেফ বলেছিলেন: "প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো।"—হেগেল কিন্তু এমন সংক্ষিপ্ত উত্তরদানে হননি সমর্থ। হেগেল উত্তর দিয়েছেন দশখণ্ড গ্রন্থ লিখে—ওটা লেখা আর প্রকাশের পর, ওটা যখন সারা বিশ্বের আলোচ্য বিষয় হয়ে গড়লো তখন তিনি অভিযোগ করলেন: "শুধু এক জনই আমাকে বুঝতে পারেন, তবুও তিনিও পারেন না।" এরিস্টোটলের মতো তাঁরও অধিকাংশ লেখা তাঁর ক্লাসে দেওয়া নোট—তাঁরগুলো অধিকতর মন্দ এ কারণে যে এসব ছাত্রদের দ্বারা তাঁর বক্তৃতার শ্রুতি-লিখন মাত্র। শুধু 'Logic' আর (Phenomenoloy) বই দুটাই তিনি নিজের হাতে লিখেছেন—আর এগুলো হচ্ছে দুর্বোধ্যতার সেরা নিদর্শন। মৌলিক সব পরিভাষার যাদু দিয়ে ভাষাকে এমন সংক্ষিপ্ত আর বিমূর্ত করা হয়েছে যে তার আঁধারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপা পড়ে গেছে সব কিছুর অর্থ আর ভাব, প্রত্যেকটা বক্তব্যকে গথিক সুলভ সীমিত বাক্যাংশে এমন অতি যত্নে পরিবর্তিত করা হয়েছে যে তা দুর্বোধ্য না হয়ে পারে না। হেগেল নিজেই তাঁর রচনা সম্বন্ধে বলেছেন "তা হচ্ছেঃ জার্মান ভাষায় দর্শন শিক্ষা দেওয়ার একটা চেষ্টা মাত্র।" এ চেষ্টায় তিনি সফল হয়েছেন।

'লজিকে' তিনি যুক্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেননি, বিশ্লেষণ করেছেন যে উপলব্ধিকে যুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তারই। কান্ট বর্ণিত যে শ্রেণী বিভাগ, যেমন—অস্তিত্ব, গুণ, পরিমাণ, সম্পর্ক ইত্যাদি, হেগেল ও এসবকেই গ্রহণ করেছেন। দর্শনের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যে সব মৌল ধারণা আমাদের সব রকম চিন্তাকে চারদিক থেকে আঘাত করছে তার ব্যবচ্ছেদ সাধন। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে-অনুপ্রবেশ প্রবণ হচ্ছে 'সম্পর্ক' —প্রতিটি ভাবই কতকগুলি সম্পর্কের সমষ্টি, অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে নিয়েই তবে আমরা কোন কিছু সম্বন্ধে ভাবতে পারি—তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারি উভয়ের সমতা আর বৈপরিত্য। কোন কিছুর সম্পর্কহীন ভাব স্রেফ-শূন্য' ছাড়া আর কিছুই না—এ কথাটাই বুঝানো হয়েছে এভাবে—"নির্মম অস্তিত্ব আর 'কিছুইনা' একই রকম বা একই কথা"। একেবারে সম্পর্ক রহিত অথবা সম্পূর্ণ গুণহীন এমন অস্তিত্বের কোন অস্তিত্বই নেই, এবং তার কোন রকম অর্থও হয় না। এমত ব্যঙ্গ পরিহাসের অশেষ বংশধরের জন্ম দিয়েছে আজো যার বংশ বৃদ্ধি অব্যাহত —যা একই সঙ্গে হেগেল-চিন্তাধারার অধ্যয়নে হয়ে পড়েছে বাধা আর আকর্ষণ।

সব সরম সম্পর্কের মধ্যে, সবচেয়ে সার্বজনীন হচ্ছে বৈপরিত্য অথবা বিরুদ্ধতা। চিন্তা বা বস্তুর প্রতিটি অবস্থা—পৃথিবীর প্রতিটি চিন্তা এবং প্রতিটি অবস্থা, অনিবার্যভাবে নিয়ে যায় তার বৈপরিত্যের দিকে, তারপর তার সঙ্গে মিলে অধিকতর উচ্চ ও জটিলতর একটা সমগ্রতা বা একটা অখণ্ড কিছু গড়ে তোলে। হেগেলের সমস্ত রচনায় এ "দ্বান্দ্বিক গতিরই" পরিচয় ফুটে উঠেছে। অবশ্য এটি খুব পুরোনো চিন্তা, এম্পডোক্লসে (Empidocles) দেখা যায় এর পূর্বাভাস, এরিস্টটলের "সোনালী মধ্য-পন্থায়"-ও এ পেয়েছে স্থান—এরিস্টটলও লিখেই গেছেন: "বিপরীতের জ্ঞান এক ও একই রকম"। সত্য হচ্ছে (ইলেকট্রনের মতো) অনেক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলো বিপরীত অংশের এক ঐক্যবদ্ধ গঠন। রক্ষণশীলতা আর উগ্র সংস্কারবাদিতার সত্য পরিণতি হলো উদারনৈতিকতা—খোলা মন আর সাবধানী হাত, খোলা হাত আর সাবধানী মন ; বড় বড় সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের মতামত গঠন মানে দুই বিপরীত চরমের মাঝখানের দোদুল্যমান অবস্থানে কমিয়ে আনা আর সব বিতর্কমূলক প্রশ্নে মধ্যপন্থা গ্রহণ। বিপরীতের অবিরাম বিকাশ তাদের একত্রিকরণ আর আপোষ সাধনই ত বিবর্তনের অনিবার্য গতিধারা। শেলিং যে বলেছেন : "বিপরীতের অন্তরালে একটা মিল বা সমতা নিহিত আছে" তা মিথ্যা নয়,—ফিস্‌টেও বলেছেন : প্রস্তাব, বিপরীত প্রস্তাব আর সংশ্লেষণ হচ্ছে সব রকম বিকাশ আর সব বাস্তবতার রহস্য আর সূত্র।

এ "দ্বান্দ্বিক গতিধারার" ফলে শুধু যে চিন্তার উৎপত্তি আর বিকাশ ঘটে তা নয়, একইভাবে বস্তুর পরিবর্তন ঘটে—সব ব্যাপারের সব অবস্থায় একটা বৈপরিত্য বিরাজ করে, বিবর্তনের এক অনিবার্য কাজ হলো তাতে সমঝোতা বিধান করে ঐক্য সাধন। যদিও আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটা আত্ম-বিনাশী স্ববিরোধিতা ছড়িয়ে আছে, তবুও অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি আর অনাবিষ্কৃত সম্পদের দিনে যে ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে পরবর্তী যুগে তার মনে সহযোগিতা ইচ্ছুক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভীপ্সা জাগবেই, ভবিষ্যতে,—বর্তমানিক বাস্তবতার যেমন অবসান ঘটবে তেমনি অবসান ঘটবে স্বাপ্নিক আদর্শবাদেরও, বরং এমন সংশ্লেষণ ঘটবে যাতে দুয়েরই কিছু মিলিত হয়ে জন্ম দেবে উচ্চতর এক জীবনের। সে উচ্চতর অবস্থাও পরে উৎপাদন-বৈপরিত্যে বিভক্ত হয়ে গঠনে, জটিলতায় আর ঐক্যে আরো উচ্চতর স্তরে যাবে পৌঁছে। বস্তুর গতিধারার মতো চিন্তার গতিধারাও একই। প্রত্যেকের বেলায় তাই ঐক্য থেকে বৈচিত্র্যে আবার বৈচিত্র্যে-ঐক্য এ দ্বান্দ্বিক ক্রম বা অগ্রগতি রয়েছে। চিন্তা আর অস্তিত্ব একই বিধি-বিধানের অনুসারী—লজিক আর পরাবিদ্যাও একই। এ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া আর এ বৈচিত্রে ঐক্য উপলব্ধির জন্য মন অত্যাবশ্যক বাহন। মনের কাজ আর দর্শনের কর্তব্য হচ্ছে বৈচিত্র্যের অন্তরালে সম্ভাবনাময় যে ঐক্য তাকে আবিষ্কার করা—নীতি ধর্মের কর্তব্য হচ্ছে চরিত্র আর আচরণে ঐক্য সাধন আর রাজনীতির কর্তব্য ব্যক্তিকে এক রাষ্ট্রীয় বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করা। ধর্মের কাজ যতসব বিপরীত কিছু যে পরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তা অনুভব করা আর তাতে পৌঁছানো—অস্তিত্বের যে সাফল্যে বস্তু আর মন, কর্তা আর কর্ম, ভালো আর মন্দ এক তা উপলব্ধি করা। ঈশ্বর এমন এক সম্পর্ক-সাধন পদ্ধতি যার দিকে সবকিছুর গতি, যাতে সবকিছু পায় অস্তিত্ব আর সবকিছু হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। মানুষের মধ্যে অনন্য (Absolute) আত্মসচেতনায় উপনীত হয় এবং পরিণত হয় অনন্য ভাবে—অর্থাৎ চিন্তাটা যে নিজে অনন্যের অংশ তা উপলব্ধি করে অতিক্রম করে যায় ব্যক্তিগত গণ্ডীবদ্ধতা ও উদ্দেশ্য আর বুঝতে সক্ষম হয় সার্বজনীন দ্বন্দ্বের অন্তরালে সবকিছুর মধ্যেই আছে একটা সুপ্ত মিল ও সংগতি "বিশ্বের সারবস্তু হচ্ছে যুক্তি......বিশ্ব পরিকল্পনা সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত।"

দ্বন্দ্ব আর পাপ স্রেফ নেতিবাচক কল্পনা নয়—তারা বাস্তব সত্য। জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তারা হচ্ছে ভালো ও পূর্ণতায় পৌঁছার সোপান মাত্র। দ্বন্দ্ব উৎপত্তি আর বিকাশের এক নিয়ম (Law), সাংসারিক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেই গড়ে ওঠে চরিত্র—মানুষ তার চরম মহিমায় পৌঁছে বাধা-বাধকতা, দায়িত্বশীলতা আর কষ্টভোগের ভিতর দিয়ে। এমন কি বেদনা ও যুক্তিহীন নয়—তাও জীবনের লক্ষণ আর পূর্ণগঠনের উদ্দীপক। যুক্তি-বিশ্বে প্রবৃত্তিরও স্থান আছে: "প্রবল প্রবৃত্তি ছাড়া বিশ্বে বড় কিছুই সাধিত হয়নি"—এমন কি নেপোলিয়নের আত্মসর্বস্ব উচচাকাংক্ষাও অজ্ঞাতে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করেছে। জীবনটা সুখের জন্য সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে সাফল্য অর্জনের জন্য।" "বিশ্বের ইতিহাস সুখের রঙ্গমঞ্চ নয়—ঐ ইতিহাসে সুখের অধ্যায়গুলি হচ্ছে খালি পাতা কারণ ঐগুলো হচ্ছে স্রেফ মিলমিশের অধ্যায়"—আর এসব নীরস বিষয় বস্তু মোটেও উপযুক্ত নয় মানুষের। যৌবনের ইতস্তত আর বিসদৃশতা যেমন প্রবীণতার শান্ত শৃঙ্খালয় পরিণত হয় তেমনি ইতিহাসও রচিত হয় তখন যখন বাস্তবের যত সব স্ববিরোধিতা বিকাশের উপাদানে হয় পরিণত। ইতিহাস মানে একটা দ্বান্দ্বিক গতি-প্রবাহ—প্রায় ধারাবাহিক বিপ্লব বল্লেই চলে, যাতে অনন্য পরম সত্তার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে জাতির পর জাতি, প্রতিভার পর প্রতিভা। ধাত্রীর মতো মহামানবেরা ভবিষ্যতের প্রসবকারিণী নয়—তাঁরা যা সৃষ্টি করেন যুগের প্রাণ-শক্তি তাকে মায়ের মতো লালিত-পালিত করে তোলে। অন্যের মতো প্রতিভা ও গাঁথুনির উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটা ইট স্থাপন করেন শুধু—"যে ভাবেই হোক তিনি শুধু শেষে আসার ভাগ্য নিয়েই এসেছেন, তাঁর ইটটি স্থাপন করায় এবার খিলানটি স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলো। যে সার্বজনীন মহৎভাবের উন্মোচন তাঁরা করে গেলেন সে সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরা হয়ত সচেতন ছিলেন না....কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যুগের চাহিদা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন আর বুঝেছিলেন কি বিকাশ সাধনের এখন উপযুক্ত সময়। তাঁদের যুগ আর তাঁদের বিশ্বের জন্য এ ছিল পরম সত্য—সময়ের গর্ভে যে জাতি এখনো ভ্রূণাবস্থায় কাল-ক্রমে তাদের ঘটবে আবির্ভাব।

মনে হয় ইতিহাসে এমন দর্শনের শেষ পরিণতি ঘটবে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া জীবনের মৌল নীতিতেই নিয়ে এসেছে পরিবর্তন—কোন অবস্থাই স্থায়ী নয়—সবকিছুর প্রতি স্তরেই এমন স্ববিরোধিতা রয়েছে যে যার সমাধান নাকি একমাত্র বিপরীতের দ্বন্দ্বের" দ্বারাই সম্ভব। তা হলে রাজনীতির গভীরতম বিধান হলো স্বাধীনতা—পরিবর্তন সাধনের একটা সদর রাস্তা। স্বাধীনতার বিকাশের নামই ইতিহাস আর রাষ্ট্রকে হতে হবে সংগঠিত স্বাধীনতা। অন্যদিকে "বাস্তব যা তাই যুক্তিসঙ্গত" এ মতবাদে যেন মনে হয় রক্ষণশীলতার রঙ লেগেছে—একদিন বিলীন হয়ে যাবে সত্য তবুও প্রতিটি অবস্থাকে বিবর্তনের অত্যা-বশ্যকীয় এক ঐশী বিধান মনে করতে হবে—অন্য অর্থে এ এক নির্মম সত্য যে "যা কিছু আছে, তাই ঠিক"। যেমন বিকাশের লক্ষ্য ঐক্য তেমনি স্বাধীনতারও প্রথম শর্ত শৃঙ্খলা।

শেষ বয়সে হেগেল যদি তাঁর দর্শনের পুরোপুরি প্রয়োগের পরিবর্তে কিছুটা রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকে থাকেন তার আংশিক কারণ যুগ-প্রবণতার অতি বেশী পরিবর্তন বিমুখতা। ১৮৩০-শের বিপ্লবের পর তিনি লিখেছিলেন: "অবশেষে, চল্লিশ বছরের যুদ্ধ আর অসীম বিশৃঙ্খলার পর, তার অবসান দেখে এবার এক শান্তিময় পরিতৃপ্তির যুগের সূচনা হবে ভেবে এক বৃদ্ধ হৃদয় নিশ্চয়ই খুশী হয়ে উঠতে পারে।" দ্বান্দ্বিক বিকাশের জন্য যিনি দ্বন্দ্ব-দর্শনের অত্যাবশ্যকতায় বিশ্বাসী তাঁর পক্ষে পরিতৃপ্তি বা সন্তুষ্টির ওকালতি করা হয়ত মানায় না কিন্তু একজন ষাট বছর বয়স্ক বৃদ্ধের পক্ষে শান্তি চাওয়ার অধিকার মানতেই হবে। তা সত্ত্বেও হেগেলের চিন্তায় স্ববিরোধিতা এত গভীর যে তা শান্তির দাবীকেও ছাড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় এবং পরবর্তী প্রজননে তাঁর অনুবর্তীরা 'দক্ষিণপন্থী হেগেলীয়ান' আর 'বামপন্থী হেগেলীয়ান' এ দু' দলে বিভক্ত হয়ে এক দ্বান্দ্বিক মৃত্যুর শিকারে হয়েছিল পরিণত। ওয়াইসে (Weisse) আর তরুণ ফিস্‌টে (Fichte) বাস্তব যে যুক্তিসঙ্গত এ মতবাদে দেখতে পেলেন ঐশী বিশ্বাসেরই দার্শনিক প্রকাশ আর দেখতে পেলেন সার্বিক আনুগত্যে রাজ-নীতির সাফাই। ফিউরবাক, মলেসট, বাউয়ার আর মার্ক্স ফিরে গেলেন সংশয়বাদ আর হেগেলের তরুণ বয়সের "উচ্চতর সমালোচনার" দিকে এবং ইতিহাসের দর্শনকে নিয়ে গেলেন শ্রেণী-সংগ্রাম মতবাদে আর হেগেলীয় অত্যাবশ্যকতার সাহায্যে "অনিবার্য সমাজতন্ত্রবাদে"। যুগের তাড়নায় অনন্য শক্তির ইতিহাসের গতি-ধারা নির্ণয়ের পরিবর্তে, মার্ক্স আমদানী করলেন গণ-আন্দোলন আর প্রত্যেক মৌল পরিবর্তনের প্রধান কারণ যে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ, জাগতিক ব্যাপারে যেমন চিন্তার ক্ষেত্রেও তাই বলে ঘোষণা করলেন। এভাবে রাজ্য বেতনভুখ অধ্যাপক হেগেল তা দিয়ে বসলেন সমাজতান্ত্রিক ডিমে।

বৃদ্ধ দার্শনিক উগ্র সংস্কারকদের হঠাৎ স্বাপ্নিক বলে করলেন অভিহিত এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখলেন তাঁর আগের দিনের লেখা রচনাগুলো। পক্ষ নিলেন প্রাশিয়ান সরকারের অনন্য-শক্তির আধুনিকতম প্রকাশ বলে তার প্রতি জানালেন তাঁর শুভকামনা এবং ভোগ করতে লাগলেন—অধ্যপনা অনুগ্রহের সূর্যোত্তাপ। শত্রুরা এবার তাঁকে বলতে লাগলেন "সরকারী দার্শনিক"। হেগেলীয় পদ্ধতিকে তিনি এখন ভাবতে লাগলেন বিশ্ব-বিধানের অংশ। ভুলে গেলেন যে তাঁর নিজের দ্বান্দ্বিক-তত্ত্বই ত তাঁর চিন্তাকেও অস্থায়ী আর অবক্ষয়শীল দণ্ডে করে রেখেছে দণ্ডিত। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে বার্লিনে "দর্শন যে উচ্চ তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর তা যে ভাবে রাজকীয় সম্মানের দ্বারা হয়েছিল স্বীকৃত আর সুরক্ষিত তেমন আর কখনো হয়নি।"

কিন্তু সে সুখের দিনে হেগেল দ্রুত এগিয়ে গেলেন বার্ধক্যের পথে। প্রায় গল্প-কাহিনীতে বর্ণিত প্রতিভাবানের মতই তিনি হয়ে পড়লেন অন্য-মনস্ক। একবার ত একপায়ে জুতো পরেই তিনি ঢুকে পড়েছিলেন ক্লাসে আর একপাটি যে কাদায় আটকে রয়ে গেছে তা খেয়ালই করেননি। ১৮৩১-এ যখন বার্লিনে কলেরা দেখা দিলে মহামারী আকারে তখন তাঁর

WWW.AMARBOI.COM

দুর্বল দেহ-ই হয়ে পড়ল তার প্রাথমিক শিকারদের অন্যতম। মাত্র একদিনের অসুখেই হঠাৎ নীরবে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় তিনি গেলেন মারা। যেমন একই বছরের মধ্যে নেপোলিয়ন, বিথোবেন আর হেগেলের জন্ম হয়েছিল তেমনি ১৮২৭ থেকে ১৮৩২-এর মাঝখানের এ ক' বছরে জার্মানি হারালো গ্যেটে, বিথোবেন আর হেগেলকে। এমন একটি যুগের সমাপ্তি হলো—যাকে জার্মেনির শ্রেষ্ঠতম যুগের শেষ মনোরম প্রচেষ্টা বলে করা যায় অভিহিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়

শোপেনহাওয়ার

১. যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যুগের কন্ঠস্বর হয়ে কেন একদল নৈরাশ্যবাদী কবির যেমন, ইংলণ্ডে বায়রণ, ফ্রান্সে দে মাসেট, জার্মানীতে হাইনে, ইটালীতে লিয়োপার্ডি, রাশিয়ায় পুশ্‌কিন আর লেরমন্টপের এবং কেন একদল নৈরাশ্যবাদী সঙ্গীতকারের যেমন, শুবার্ট, শুম্যন, চোপিন এমন কি পরবর্তী বিথোবেনের (যিনি নৈরাশ্যবাদী হয়েও নিজেকে মনে করতেন আশাবাদী) আর সর্বোপরি আর্থার শোপেন হাওয়ারের মতো এক গভীর নৈরাশ্যবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটলো?

শোকের বিরাট সঙ্কলন 'The world as will and Idea' প্রকাশিত হলো ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। ঐ ছিল তথাকথিত "পবিত্র" মিত্রতার যুগ। ওয়াটারলু শেষ হয়ে গেছে, বিপ্লবের ঘটেছে মৃত্যু—দূর এক সমুদ্রের ক্ষুদ্র এক পর্বতগুহায় দিন দিন ক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে "বিপ্লবের সন্তান।" ইচ্ছা-শক্তির (Will) যে রক্তাক্ত ও মহান ছায়া-মূর্তি ক্ষুদ্রকায় কর্সিকা-সন্তানে রক্তমাংসে রূপ নিয়েছিল তাই যেন জুগিয়েছিল শোপেন-হাওয়ারের ইচ্ছা-শক্তিতে দেবত্ব-আরোপের প্রেরণা আর জীবনের প্রতি যে হতাশা তা তিনি পেয়েছিলেন সকরুণ আর সুদূর সেন্ট হেলেনা থেকেই। অবশেষে ইচ্ছা-শক্তির ঘটলো পরাজয় সব সংগ্রামের একমাত্র বিজয়ী অন্ধকার মৃত্যু। বুরবঁ-রাজারা সিংহাসনে পুনরাভিষিক্ত হলেন—জমিদারির দাবী নিয়ে সামন্তরা সব একে একে আসতে লাগলেন ফিরে। আলেকজেণ্ডারের শান্তিবাদী আদর্শবাদ নিজের অজ্ঞাতেই এমন এক সংস্থার পোষণ করে কালো যা সর্বত্র সবরকম প্রগতির হয়ে দাঁড়ালো বাধা। এভাবেই অবসান ঘটলো এক মহৎ যুগের। গ্যেটে বলেছেনঃ "এমন বিরাট পৃথিবীতে আমি যে তরুণ নই এ জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত য়ূরোপ ভূলুণ্ঠিত। ধ্বংস হয়েছে লক্ষ লক্ষ সবল তরুণ। উপেক্ষিত বা পতিত হয়ে পড়ে আছে লাখ লাখ একর জমি—মহাদেশের সর্বত্র আবার জীবনকে একেবারে গোড়া থেকে, নীচে থেকেই হচ্ছে শুরু করতে, সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য যে আর্থিক সংগতি অত্যাবশ্যক যা এতদিনের যুদ্ধ বিগ্রহ একদম গিলে শেষ করে দিয়েছে, ধীরে ধীরে বহু পরিশ্রমে তাকে আবার করতে হচ্ছে পুনরুদ্ধার। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে শোপেন হাওয়ার ফ্রান্স আর অষ্ট্রিয়া ভ্রমণ করে, অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল গ্রাম, কৃষকদের দুঃসহ দারিদ্র্য আর শহরগুলিতে অশান্তি আর নিদারুণ অভাব অনটন দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। নেপোলিয়ন আর নেপোলিয়ন-বিরোধী সৈন্যবাহিনী যে পথেই গেছে সে পথে সব দেশের চেহারায় নির্যাতনের ক্ষত-চিহ্ন দিয়েছে এঁকে। মস্কো তো ভস্মে পরিণত। ইংলণ্ড যুদ্ধে বিজয়ী বটে কিন্তু গমের দাম পড়ে যাওয়ায় তার কৃষককূল এখন ধ্বংসের সম্মুখীন আর অনিয়ন্ত্রিত কারখানা পদ্ধতি ও ক্রমবর্ধমান শিল্প-সংস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে শ্রমিক সম্প্রদায়, ওদের ভোগ করতে হচ্ছে অকথ্য সব নির্যাতন। সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়ায় বেকার সমস্যা হয়েছে তীব্রতর। কার্লাইল লিখেছেন: "আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, যে বছর এক স্টোন জইয়ের আটার (Oatmeal) দাম দশ শিলিং-এ উঠেছিল সেবার তিনি নিজে দেখেছেন শ্রমিকরা একা একা নদীর দিকে এগিয়ে যায় আর খাদ্যের পরিবর্তে খায় নদীর পানি—একের অভাব অন্যের কাছ থেকে গোপন রাখার জন্যই শুধু থাকে ব্যস্ত সন্ত্রস্ত।" এর আগে জীবন কখনো এমন নীচ ও অর্থহীন হয়ে পড়েনি।

হাঁ, বিপ্লবের মৃত্যু হয়েছে—মনে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে য়ূরোপের আত্মাও হয়ে পড়েছে জীবন-শূন্য। য়ুটোপিয়া নামের যে নতুন স্বর্গ একদিন দেবতাদের প্রদোষ-আলোকেও ম্লান করে দিয়েছিল তা এখন এমন এক দুর্নিরীক্ষ ভবিষ্যতে অপসৃত যে একমাত্র তরুণ-চক্ষুই হয়তো তা দেখতে পায়—বৃদ্ধরা তার মায়ার পেছনে বেশ সুদীর্ঘ কাল ঘুরে ঘুরে এখন বুঝতে পেরেছে ওটা মানুষের আশা-মরিচীকার স্রেফ এক পরিহাস-মাত্র। তাই সে বিশ্বাসও তারা এখন হারিয়ে বসেছে। শুধু তরুণরাই ভবিষ্যৎ নিয়ে বাঁচতে পারে আর বৃদ্ধরা বাঁচতে পারে অতীত নিয়ে কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকাংশ মানুষ বর্তমান নিয়েই বাঁচতে বাধ্য তবে বর্তমান ত এক ধ্বংস-স্তূপ। কত হাজার হাজার বীর আর 'বিশ্বাসী'ই না বিপ্লবের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। য়ুরোপের কত তরুণ হৃদয়-ই না এই নবীন প্রজাতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল—তার আলো-আশা নিয়েই ওরা ছিল বেঁচে। স্বপ্ন-ভঙ্গ হলো তখনই যখন বিথোবেন যে বিপ্লব-সন্তানকে তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক সিম্পনি উৎসর্গ করেছিলেন এখন তাঁকে প্রতিক্রিয়ার জামাতায় পরিণত হতে দেখে সে উৎসর্গ পত্রটাই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পেল্লেন। তবুও কত উচ্চাশা আর কত সুনিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস বুকে নিয়ে কতজনেই না শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন? এ এক চরম সমাপ্তি: ওয়াটারলু, সেন্ট হেলেনা আর ভিয়েনা—ভূলুণ্ঠিত ফ্রান্সের সিংহাসনে চড়ে বসেছে এমন এক বুরবঁ যে কিছুই শেখেনি আর ভুলেনি কিছুই। মানব-ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব আশা-উদ্যমের গৌরবময় সমাপ্তি ঘটল এভাবে। যাদের হাসি এখনো অশ্রুজলে তিক্ত তাদের জন্য এ ট্রেজেডি কি কমেডিই না হয়ে দাঁড়িয়েছে!

এ স্বপ্ন-ভঙ্গ আর দুঃখের দিনে অনেক দরিদ্র সান্ত্বনা পেতে চাইল ধর্মীয় আশ্বাসে কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর এক বিরাট অংশ হারিয়ে বসলো সব আশা-ভরসা, এ বিনষ্ট পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তারা এমন কোন উৎসাহ-উদ্দীপক বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখতে পেলো না যে জীবনের সৌন্দর্য আর শেষ বিচারে এ কুৎসিত দুঃখ-গ্লানির অবসান ঘটবে। বস্তুত ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে মানুষ আমাদের এ গ্রহের যে দুরবস্থা দেখেছে তাতে কোন বিবেচক ও সদয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন তার পক্ষে কঠিন ছিল। ঘোষিত হলো মেফেস্টফিলেসের জয় আর প্রতিটি ফাউস্ট হলো নৈরাশ্যের শিকার। ভলটেয়ার বপন করেছিলেন ঝড়ের বীজ যার ফসল আহরণের সুযোগ ঘটলো শোপেনহাওয়ারের।

কদাচিৎ পাপ সমস্যাকে এমন নগ্নভাবে এতো জেদের সাথে দর্শন আর ধর্মের মুখে ছুঁড়ে মারা হয়েছে। উদাসীন তারকারাজির প্রতি বোলন (**Boulogne**) থেকে মস্কো পর্যন্ত প্রতিটি সামরিক কবর আর পীরামিড থেকে এক বোবা প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল।—হে প্রভু! কতকাল আর কেন? যুক্তি বিবেচনা আর অবিশ্বাসের যুগের প্রতি এ সার্বজনীন বিপদ কি এক ন্যায়বিচারক ঈশ্বরেরই প্রতিশোধ গ্রহণ? বিশ্বাস, আশা আর দানশীলতার পুরোনো পূণ্যের প্রতি নতমস্তক হওয়ার জন্য একি অনুতপ্ত বুদ্ধির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি আহ্বান ? তাই মনে করতেন শ্লেগেল, নোভালিস, চেটোব্র্যায়াণ্ড, দে মাসেট, সাউদি, ওয়াডস্‌ওয়ার্থ আর গোগোল—বখাটে উড়নচণ্ডী ছেলে বাড়ী ফিরে এসে যেমন খুশী হয় তাঁরাও সেভাবে, সে খুশী নিয়ে পুরোনো বিশ্বাসে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যরা দিয়েছেন কঠোর উত্তর : য়ুরোপের যে বিশৃঙ্খলা তা তো বিশ্ব বিশৃঙ্খলারই প্রতিফলন—মোটের উপর কোন ঐশী শৃঙ্খলা নেই কোথাও, নেই কোন স্বর্গীয় আশা-ভরসাও। ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তিনি চোখে দেখতে পান না অর্থাৎ অন্ধ আর পৃথিবীর বুকের উপর অনবরত তা দিচ্ছে পাপ। এ হচ্ছে বায়রণ, হাইনে, লেরমনটফ্, লিয়োপার্ডি আর আমাদের দার্শনিকের (অর্থাৎ শোপেন হাওয়ারের) বক্তব্য।

২. ব্যক্তি শোপেনহাওয়ার

১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ডেন্টজিগে (Dantzig) শোপেন হাওয়ারের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন সওদাগর—একাধারে যোগ্যতা, খিটখিটে মেজাজ, স্বাধীন চরিত্র আর স্বাধীনতা প্রীতির জন্য তিনি ছিলেন খ্যাত, শোপেন হাওয়ারের পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতা ডেন্টজিগ্ ছেড়ে হামবুর্গে চলে যান—কারণ ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে পোলাণ্ডের অন্তর্ভুক্তির ফলে ডেন্টজিগের স্বাধীনতার ঘটে বিলোপ। কাজেই বালক শোপেন হাওয়ার বেড়ে ওঠে কাজ-কারবার আর অর্থনীতির মাঝখানে—যদিও যে বণিক জীবনের দিকে তাঁর পিতা তাঁকে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি তা অনতিবিলম্বে করেছিলেন ত্যাগ তবুও তাঁর উপর ঐ পেশার প্রভাব যেমন, ব্যবহারে স্থূলতা, মনের বাস্তবমুখীনতা, সংসার আর মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান থেকে গিয়েছিল। এর ফলে তিনি হয়ে পড়েছিলেন যে বিচ্ছিন্ন আর কেতাবী জ্ঞান সর্বস্ব দার্শনিককে তিনি ঘৃণা করতেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে—খুব সম্ভব আত্মহত্যার ফলে। তাঁর পিতামহীর মৃত্যু ঘটে উন্মাদ অবস্থায়।

শোপেন হাওয়ারের ধারণা : "উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার কাছ থেকেই মানুষ পেয়ে থাকে চরিত্র বা ইচ্ছাশক্তি আর মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে মেধা।" তাঁর মায়ের ছিল মেধা, তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকা ; কিন্তু তাঁর যেমন ছিল মেজাজ তেমনি তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন বদরাগী। এক গদ্য-মনা স্বামীকে নিয়ে তিনি মোটেও খুশী ছিলেন না —কাজেই স্বামীর মৃত্যুর পর এবার তিনি স্বাধীন-প্রেমের পথ ধরলেন আর চলে গেলেন সে রকম জীবনের উপযুক্ততম ক্ষেত্র ভাইমারে। মায়ের পূর্ণবিবাহের ব্যাপারে হ্যামলেটের যে প্রতিক্রিয়া, অবিকল আর্থার শোপেন হাওয়ারেরও সে রকম প্রতিক্রিয়াই হলো। তাঁর দর্শনে মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব অর্ধ-সত্য যুক্তির অবতারণা তিনি করেছেন তার পাঠ গ্রহণ করেছেন তিনি তাঁদের মাতা-পুত্রের এ ঝগড়া থেকেই। তাঁদের সম্পর্কের পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর মায়ের এক চিঠিতে : "তোমার সঙ্গ এক অসহ্য বোঝাস্বরূপ—তোমার সঙ্গে বাস করাই কঠিন, তোমার সব সৎগুণই চাপা পড়ে গেছে তোমার অহঙ্কারের নীচে আর অপরের ছিদ্রান্বেষণে বিরত থাকতে পারো না বলেই সব হয়ে পড়েছে অকেজো।" ফলে তাঁরা পৃথক থাকতেই সাব্যস্ত করলেন—তিনি মার কাছে আসতেন স্রেফ তাঁর ঘরোয়া ভোজে', অন্যের মতো আর এক অতিথি হয়েই, তখনই মাত্র তাঁরা আত্মীয়ের মতো পরস্পরকে ঘৃণা না করে অপরিচিতের বা আগন্তুকের মতো একে অন্যের প্রতি ভদ্র হতে পারতেন। তাঁর প্রেয়সী ক্রিস্টিয়ানাকে সঙ্গে আনতে ম্যদাম শোপেন হাওয়ার আপত্তি করতেন না বলে গ্যেটে ম্যদামকে খুব পছন্দ করতেন কিন্তু তাঁর ছেলে একদিন খুব বিখ্যাত হবে একথা বলে গ্যেটে সৃষ্টি করলেন এক বিপদ। শোপেন হাওয়ার-জননী এক পরিবারে দুই প্রতিভার কথা জীবনে কখনো শোনেননি। সবশেষে এক চরম ঝগড়ার ফলে মা সিঁড়ির বার করে দিলেন নিজের পুত্র আর প্রতিদ্বন্দ্বীকে—এবার আমাদের দার্শনিক প্রবর অত্যন্ত তিক্ত-কন্ঠে মাকে জানিয়ে দিলেন : ভবিষ্যতে তুমি শুধু পরিচিত হবে আমার মা বলেই। সঙ্গে সঙ্গে শোপেন হাওয়ার ভাইমার ছেড়ে চলে গেলেন—এর পরেও তাঁর মা আরো চব্বিশ বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু পুত্র আর কখনো তাঁকে দেখতে আসেননি। বায়রণও ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের সন্তান, মনে হয় মায়ের ব্যাপারে তাঁর ভাগ্যও ছিল অনুরূপ। এ অবস্থার ফলেই এসব লোক নৈরাশ্যবাদী হতে বাধ্য হয়েছেন। যে শুধু মাতৃ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকেনি বরং মায়ের ঈর্ষারও হয়েছে শিকার তার পক্ষে পৃথিবী সম্পর্কে হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই।

এর মধ্যে শোপেনহাওয়ার শেষ করেছেন 'জিমনোসিয়াম'-স্কুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ। পাঠ্যসূচীর বাইরেও শিখেছেন অনেক কিছু। প্রেম আর পৃথিবীর প্রতি তাঁর যে শরাঘাত তা প্রভাবিত করেছে একই সঙ্গে তাঁর চরিত্র আর দর্শনকেও। তিনি হয়ে পড়েছেন বিষণ্ন, বদমেজাজি আর সন্দিগ্ধ স্বভাব, তাঁকে পেয়ে বসলো যত সব ভয় আর কু-কল্পনা, ধূম-পানের পাইপটা পর্যন্ত বন্ধ করে রাখতেন তালা-চাবি দিয়ে, বিশ্বাস করতেন না নাপিতের ক্ষুরকেও। শুতেন বিছানার পাশে গুলি-ভরা পিস্তল রেখে সম্ভবতঃ চোরের ভয়েই। তিনি সহ্য করতে পারতেন না কোন রকম গোলমাল, এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য "আমার বহুদিনের বিশ্বাস যে যতখানি নির্বিবাদে হৈ হুল্লোড় সহ্য করতে পারে তার মানসিক শক্তির বিপরীত মানও যে সে অনুপাতে তাই ধরেই নেওয়াই ন্যায়সঙ্গত......হৈ হুল্লোড় বা গোলমাল সব বুদ্ধিজীবীর জন্যই এক নির্যাতন বিশেষ....সারা-জীবন ধরেই প্রত্যহ আমাকে অতিরিক্ত শক্তি-উদ্দীপনার যে আস্ফালন এখানে ওখানে ধাক্কা লাগাচ্ছে, চালাচ্ছে মুগুর আর এটা ওটাকে তছনছ করে ছাড়ছে তার নির্যাতন করতেই হয়েছে সহ্য।" নিজের অস্বীকৃত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রায় উদ্ভট-বিশ্বাসে হয়েছিল পরিণত—খ্যাতি আর সফলতায় পৌঁচতে না পেরে তিনি হয়ে পড়েছিলেন অন্তর্মুখীন এবং নিজেই যেন দংশন করতে লাগলেন নিজের আত্মাকে।

শোপেন হাওয়ারের না ছিল মা, না ছিল স্ত্রী, না ছিল ছেলেমেয়ে বা পরিবার, এমন কি ছিল না কোন দেশও। নীট্‌শে বলেছেন: "তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলেন, বন্ধু ছিল না একটিও—এক আর কেউ না থাকার মধ্যে বিরাজ করছে অসীমতা।" এমন কি গ্যেটের চাইতেও তিনি তাঁর যুগের জাতীয়তা রূপ ব্যাধি থেকে ছিলেন মুক্ত। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফিস্‌টের (Fichte) নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনায় এতখানি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে নিজেও সে যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য করেছিলেন সঙ্কল্প এবং সত্য সত্যেই এক প্রস্ত অস্ত্র-শস্ত্র তিনি কিনেও নিয়েছিলেন। যাক্ সময়ে সুবুদ্ধি তাঁর ফিরে এসেছিল এবং মনে মনে এ যুক্তিও খাড়া করে বসলেন: 'যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার কামনা আর অধিকতর জীবন-লালসা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিরাও অনুভব করে থাকে কিন্তু সাহসে কুলোয় না বলে রাখে গোপন করে নেপোলিয়নে তারই ত প্রকাশ ঘটেছে বেপরওয়া আর একাগ্রতার সাথে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই যুদ্ধের পরিবর্তে তিনি এবার ফিরে গেলেন গ্রামে আর লিখলেন দর্শনের উপর তাঁর থীসিস।

১৮১৩-য় "On the fourfold Root of Sufficient Reason"—এ রচনাটি শেষ করে শোপেন হাওয়ার এবার তাঁর সব সময় ও শক্তি নিয়োগ করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা 'The World Will and Idea' লেখায়। নিজেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন প্রকাশকের কাছে বল্লেন, এখানে পুরোনো চিন্তার জাবরকাটা হয়নি বরং মৌলিক চিন্তার এক অতি সুসংগত কাঠামো করা হয়েছে রচনা, স্বচ্ছ আর সহজবোধ্য ভাষায়, জোরালো কিন্তু শ্রীহীন ভাবে নয়, ভবিষ্যতে এ বই হবে আরো শত শত বইর উৎসস্বরূপ। এসব কথা যদিও অশোভনভাবেই আত্মপরায়ণ কিন্তু আসলে কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। বহু বৎসর পরে দর্শনের সর্বপ্রধান সমস্যার সমাধানে তিনি সক্ষম হয়েছেন এ বিশ্বাস তাঁর মনে এত সুনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তিনি মনস্থ করলেন তাঁর নামাঙ্কিত আংটিতে স্পিংসের (Sphinx) মূর্তি খোদাই করে অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন (জনশ্রুতি) কারণ তিনি অর্থাৎ স্পিংস নাকি নিজেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁর ধাঁধাঁর উত্তর কেউ দিতে পারলে তিনি সমুদ্র জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

তবুও বইটির প্রতি তখন কারো মনোযোগ আকৃষ্ট হলো না—এক দরিদ্র আর ক্লান্ত পৃথিবীর পক্ষে নিজের দারিদ্র্য আর ক্লান্তি সম্বন্ধে পড়ার কোন আগ্রহই যেন হলো না। বইটি প্রকাশের ষোল বছর পরে প্রকাশক শোপেন হাওয়ারকে জানালেন অধিকাংশ বই বাজে কাগজের মতো ওজন দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর "The Wisdom of life" নামক গ্রন্থের 'Fame' বা খ্যাতি শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তাঁর ঐ গ্রন্থের কথা মনে করেই লিস্‌টেনবারর্জারের (Lichtenberger) নিম্নলিখিত দু'টি কথা উদ্ধৃত করেছেন: "এ রকম রচনা দর্পণের মতো, কোন একটা গাধা যদি এতে মুখ দেখতে শুরু করে তা হলে কোন ফেরেস্তা যে বাইরের দিকে তাকাবে তা আশা করা যায় না" আর "যদি কোন মাথার সঙ্গে কোন বইয়ের সংঘর্ষ হয় আর তার কোন একটা থেকে যদি ফাঁকা আওয়াজ বের হয়, তা হলে তা কি সব সময় বই থেকে?" এভাবেই চল্লো তাঁর আহত অহঙ্কারের অভিব্যক্তি: "যতই কোন মানুষ ভবিষ্যতের অগ্রকথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণভাবে মানবতার উত্তরাধিকারী, তিনি ততই তাঁর সমকালীনদের কাছে থেকে যান অপরিচিত ও অজ্ঞাত—তাঁর রচনা তাদের জন্য নয়, তারা বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর একটা অংশ বটে কিন্তু এ রচনায় তাদের পরিচিত স্থানিক রং না থাকায় এ তাদের মনে কোন আবেদনই জাগায় না।" এর পর তিনি কথামালার শৃগালের মতই মুখর হয়ে উঠলেন: "কোন সংগীতকার কি শ্রোতাদের আনন্দোচ্ছ্বাসে কিছুমাত্র খুশী হতে পারেন যদি জানেন যে শ্রোতারা সবাই বধির আর তাদের বধিরতা ঢাকবার জন্যই তাদের দু'একজন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে দেখতে পান? যদি জানতে পারেন ঐ দু' একজনও প্রায় ঘুষ নিয়ে নিকৃষ্টতম গায়কের জন্যও প্রশংসায় স্বোচচার হয়ে থাকেন—তখন তিনি কি আর বলবেন?"—কারো কারো ক্ষেত্রে অহংবোধ হচ্ছে খ্যাতিহীনতারই এক রকম ক্ষতিপূরণ, অন্যদের বেলায় অহংবোধ বর্তমানের সঙ্গে দরাজ সহযোগিতারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শোপেন হাওয়ার এ বইতে নিজের সর্বশক্তি এমন নিঃশেষে দান করেছেন যে তাঁর পরবর্তী রচনাগুলো মনে হয় এটারই শুধু ভাষ্য তাঁর তৌরাতের তিনিই যেন হয়েছেন তালমুদ, নিজের শোক-গাথার এক ভাষ্যকার। ১৮৩৬-এ তিনি 'On the will in Nature' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা পরে তিনি ১৮৪৪-এ 'The World as Will and Idea'র বর্ধিত সংস্করণ বেরিয়েছিল তাতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৪১এ তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'The Two Ground-problems of Ethics' আর ১৮৫১'য় প্রকাশ করেন 'Parenga et Partiapomena' যার শব্দগত অর্থ "By-products and Leavings" যা ইংরেজিতে "Essays" নামে অনূদিত হয়েছে। তাঁর এ দু' খণ্ড রচনাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সবচেয়ে সুখপাঠ্য এসব সরস আর জ্ঞানগর্ভ রচনার সর্বমোট পারিশ্রমিক হিসেবে শোপেনহাওয়ার পেয়েছিলেন বিনিপসায় স্রেফ দশ কপি বই মাত্র! এ অবস্থায় আশাবাদ আশা করাই তো বাতুলতা! ভাইমার ত্যাগের পর তাঁর নির্জন অধ্যয়ন-জীবনের একঘেয়েমিতে একবারই মাত্র ছেদ পড়েছিল। তাঁর ইচ্ছা জার্মেনির কোন এক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর দর্শন উপস্থাপিত করার সুযোগ পেলে ভালো হতো—১৮২২-এ সত্য সত্যই এ সুযোগ এলো, অবৈতনিক অধ্যাপক হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি আমন্ত্রণ এলো বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি ইচ্ছা করেই মহাপ্রতাপশালী হেগেলের ক্লাসের সময়টাই নিজেরও বক্তৃতার সময় ঠিক করে নিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ছাত্ররা তাঁর আর হেগেলের প্রতি উত্তরাধিকারীর দৃষ্টিতেই থাকাবে। কিন্তু ছাত্ররা তা বুঝতে পারলো না। ফলে শোপেন হাওয়ারকে খালি বেঞ্চগুলিকেই শোনাতে হলো তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতা। কালে তিনি পদত্যাগ করলেন—হেগেলের উপর প্রতিশোধ নিলেন এমন এক তিক্ত আক্রমণ করে ফলে হেগেলের প্রধানতম রচনার পরবর্তী সংস্করণগুলির যথেষ্টই ক্ষতি হলো। ১৮৩১-এ বার্লিন শহরে কলেরার এক মহামারী শুরু হলো, হেগেল আর শোপেন হাওয়ার উভয়ে পালালেন বার্লিন ছেড়ে কিন্তু মহামারীর প্রকোপ না থামতেই হেগেল ফিরে এলেন এবং হলেন রোগের শিকার—ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই গেলেন মারা। শোপেন হাওয়ার কিন্তু একেবারে ফ্রাঙ্ক ফোর্টে গিয়েই থামলেন, আর জীবনের বাকি বাহাত্তর বছর কাটিয়ে দিলেন ওখানে।

আশাবাদীরা কলমের সাহায্যে জীবিকা অর্জনের যে আশা করে থাকেন বুদ্ধিমান নৈরাশ্যবাদীর মতোই শোপেন হাওয়ার তেমন ভ্রান্ত আশা কখনো করেননি। তাঁর পিতার সম্পত্তির যেটুকু উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন তার আয় দিয়েই তিনি পরিমিত আরামেই থাকতেন। অদার্শনিক বুদ্ধিমত্তার সাথেই তিনি তাঁর টাকা খাটাতে জানতেন। তিনিও অংশীদার ছিলেন এমন এক কোম্পানী ফেল মারলে অন্যান্য অংশীদারেরা শতকরা সত্তর ভাগ নিয়ে একটা মীমাংসায় আসতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু শোপেন হাওয়ার তাঁর অংশের পুরো দাম ছাড়া কিছুতেই রাজি হননি এবং শেষকালে কোম্পানীর সঙ্গে লড়াইয়ে তিনিই জিতেছিলেন। এক আবাসিক হোটেলে দু'টা রুম ভাড়া করে তিনি থাকতেন, জীবনের শেষ ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন ওখানেই একটা কুকুর ছাড়া তাঁর আর কোন সঙ্গীই ছিল না। তাঁর কুকুরটার তিনি নাম দিয়েছিলেন 'আত্মা' (ব্রাহ্মণেরা বিশ্ব-আত্মা অর্থে যে শব্দের ব্যবহার করে থাকেন) কিন্তু শহরের রসিক ছোকরারা ওটাকে বলতো 'তরুণ শোপেন হাওয়ার'। '**Englischer Hof**' নামক এক রেস্টুরেন্টেই তিনি নিয়মিত আহার করতেন। প্রতিবেলা খাওয়ার সময় তিনি পকেট থেকে বের করে একটা স্বর্ণ-মুদ্রা তাঁর সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের উপর রেখে দিতেন আবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলেই টাকাটা তুলে নিয়ে আবার পকেটস্থ করতেন। বোধকরি কিছুটা বিরক্ত হয়েই একদিন এক বেয়াধা এ রছম' পালনের কারণ কি জানতে চাইলো। শোপেন হাওয়ার বল্লেন এটা আমার এক নীরব বাজি রাখা—যে সব ইংরেজ অফিসার এখানে খানা খায় তারা যদি কোনদিন ঘোড়া, নারী আর কুকুর এ তিনটা বাদ দিয়ে অন্য কথা আলাপ করে তা হলে এটা আমি গরিবের জন্য রক্ষিত 'দান-বাক্সে' দিয়ে দেবো মনে মনে এ বাজি ধরতাম। সব বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিই তাঁকে আর তাঁর বইকে দিলো না কোন পাত্তা—দর্শনের সব অগ্রগতি বিদ্যায়তনের প্রাচীরের বাইরেই গড়ে উঠেছে শোপেন হাওয়ারের এ দাবীরই যেন এ এক সমর্থন। নীটশে বলেছেন: "শোপেন হাওয়ারের সঙ্গে তাঁদের কোনদিক দিয়েই কোন মিল ছিল না বলেই জার্মেন পণ্ডিতগণ তাঁর উপর ছিলেন বিরক্ত।" কিন্তু ধৈর্যের পাঠ তাঁর নেওয়া ছিল—তাঁর বিশ্বাস যতই বিলম্বে হোক স্বীকৃতি পাবেনই তিনি। অবশেষে, অবশ্য ধীরে ধীরে স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন। মধ্যবিত্তরা অর্থাৎ উকিল, ডাক্তার বণিকরা দেখতে পেলো তাঁর দর্শনে বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীরই এক সহজবোধ্য প্রকাশ, তাতে নেই অবাস্তব পরাবিদ্যার শব্দারম্ভরপূর্ণ মিথ্যা দাবী। আদর্শ নিয়ে য়ুরোপের স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়েছে আগেই—১৮১৫র যে হতাশা ১৮৪৮এর দর্শনে তার প্রকাশ ও পরিচয় পেয়ে সবাই স-উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সেদিকে। শাস্ত্রের উপর বিজ্ঞানের হামলা, যুদ্ধ আর দারিদ্র্যের উপর সমাজতান্ত্রিকের ধিক্কার, বেঁচে থাকার সংগ্রামের উপর জীব-বিজ্ঞানের প্রভাব—এসবও শোপেন হাওয়ারের খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার মূলে কম সাহায্য করেনি।

জনপ্রিয়তার আনন্দ উপভোগ করতে না পারার মতো বয়সে এখনো তিনি পৌঁচেননি—তাঁর সম্বন্ধে যে সব লেখা বের হতো সবই তিনি সাগ্রহে পড়তেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের বলে রেখেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে যা কিছুই বের হয় না কেন তা যেন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—সব ডাক খরচ তিনিই বহন করবেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ওয়েগনার (Wagner) তাঁকে এক কপি 'Der Ringder Nibeluger' পাঠিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর সংগীত-দর্শন সম্বন্ধে করেছিলেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কাজেই দেখা যাচ্ছে এ অতি বড় নৈরাশ্যবাদীও শেষ বয়সে প্রায় হয়ে পড়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশাবাদী—রাত্রে খাওয়ার পর নিয়মিত তিনি বাঁশী বাজাতেন আর যৌবনের অগ্নি-দহনের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ায় সময়ের প্রতি জানাতেন কৃতজ্ঞতা। পৃথিবীর চারদিক থেকেই লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো—১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্মদিবসে সব খান থেকে, সব মহাদেশ থেকেই তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছিল অভিনন্দন। এরপর আর মাত্র দু' বছর তিনি বেঁচেছিলেন। ১৮৬০-এর ২১শে সেপ্টেম্বর, সকাল বেলার নাস্তা খেতে বসেছেন তিনি একাকী, মনে হয় তিনি ভালোই আছেন। মাত্র ঘন্টা-খানেক পরে তাঁর গৃহ-স্বামিনী এসে দেখতে পেলেন তিনি এখনো টেবিলের সামনে বসা কিন্তু মৃত।

৩. ভাবরূপ পৃথিবী (The World as Idea)

সর্বাগ্রে 'The World as Will and Idea'র যা পাঠককে মুগ্ধ করে তা হচ্ছে তার রচনাশৈলী এখানে দেখতে পাওয়া যাবে না কান্টীয় পরিভাষার চৈনিক ধাঁধাঁ অথবা হেগেলীয় হতবুদ্ধিতা, স্পিনোজার জ্যামিতিও এখানে অনুপস্থিত—সব কিছু স্বচ্ছ আর সুশৃঙ্খল, পৃথিবীটা যে ইচ্ছাধীন, অত্যাশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে এ প্রধান ধারণাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু গড়ে তোলা হয়েছে। এবং এ কারণেই যত সব দ্বন্দ্ব আর যত সব দুঃখ। কি বেপরওয়া সাধুতা, কি মনমুগ্ধকর তেজস্বিতা আর কি অনাপোষ প্রত্যক্ষতা। তাঁর পূর্ববর্তীরা যেখানে প্রায় দুর্নীরিক্ষভাবে বিমূর্ত, বাস্তব জগতের কোন রকম দৃষ্টান্তের জানালা পথে তাঁরা যেখানে তাঁদের মতবাদকে কিছুমাত্র খোলাসা করেননি সেখানে শোপেনহাওয়ার খাঁটি বণিক পুত্রের মতো তাঁর মতবাদকে মূর্ত করে তুলেছেন দৃষ্টান্ত, প্রয়োগ আর হাস্য-রসের সাহায্যে। কান্টের পরে দর্শনে হাস্য-রসের আমদানি এক চমকপ্রদ নতুনত্ব।

তবুও বইটি পাত্তা পেলো না কেন? অংশত বিশ্ববিদ্যালয়ের যেন অধ্যাপকরা বইটির প্রচারে সাহায্য করতে পারতেন ওটাতে তাঁদেরই করা হয়েছে আক্রমণ। ১৮১৮য় হেগেল ছিলেন জার্মেনির দার্শনিক ডিক্টেটর —তবুও শোপেনহাওয়ার তাঁকে নিন্দা করতেও ছাড়েন নি। তাঁর বইর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখছেন:

"যে যুগে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দর্শনকে একদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিলের অন্যদিকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবেই ব্যবহার করা হয় সে যুগ মোটেও দর্শন-চর্চার অনুকূল নয়........'আগে বাঁচো পরে দর্শন চর্চা করতে চাও করো' এ আপ্তবাক্যের প্রতিকূলে তা হলে কিছুই কি করার নেই ? এসব ভদ্রলোকেরা বাঁচতে চান বটে তবে বাঁচতে চান দর্শন দিয়ে অর্থাৎ দর্শনকে জীবিকা অর্জনের উপায় করে নিয়ে। তাঁরা দর্শনের প্রতি বরাদ্দ হয়েছেন স্ত্রী-পুত্র আর সন্তান সন্ততিসহ।......"যার নুন খাই তার গুণ গাই"—এঁরা এ নীতির সমর্থক। প্রাচীনরা মনে করতেন দর্শনের সাহায্যে টাকা রোজগার কুতর্কীদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য......সোনা দিয়ে মাঝারিপনা ছাড়া আর কিছুই আয়ত্ত হয় না। যে যুগ কুড়ি বছর ধরে হেগেলের মতো এক বুদ্ধিজীবী ক্যালিবেনকে (Caliban) শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকের মর্যাদা দিয়ে আসছে আর যুগের সমর্থনই যার একমাত্র কাম্য সে যুগের পক্ষে তার বেশী অন্য কিছু করা সম্ভব নয়....কিন্তু সত্য সব সময় স্বল্প সংখ্যকের জন্যই, কাজেই নীরবে আর সবিনয়ে সত্যকে সে স্বল্প সংখ্যকের অপেক্ষায় থাকতেই হবে যাঁদের অভিনব চিন্তা পদ্ধতির যা হবে আনন্দের সামগ্রী।........জীবন সংক্ষিপ্ত কিন্তু সত্যের ব্যাপ্তি সুদূর আর সত্য দীর্ঘজীবী, চলুন আমরা সত্য বলি।"

এসব সমাপ্তি-বাক্য মহত্ত্বের উক্তিরই নিদর্শন কিন্তু এসবের অন্তরালে 'আঙুরটকের' আমেজও কিছুটা আছে বইকি। কারণ শোপেনহাওয়ার নিজেও যুগের সমর্থাকাংক্ষী কিছুমাত্র কম ছিলেন না। মনে হয় হেগেলের বিরুদ্ধে কোন নিন্দা-উক্তি না করাই অধিকতর মহত্তের পরিচায়ক হতো— যেমন কথায় আছে 'জীবিতদের সম্বন্ধে ভালো ছাড়া অন্য কিছু বলা উচিত নয়।' আর সবিনয়ে স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকা সম্বন্ধে শোপেনহাওয়ারের নিজের দাবীর উদ্ধৃতিই যথেষ্ট : "আমার আর কান্টের মধ্যবর্তী সময়ে দর্শন সম্বন্ধে কিছুই যে করা হয়েছে তা তো আমি দেখছি না।" অন্যত্র "পৃথিবীটা ইচ্ছাগতই, এ আমার বিশ্বাস ও মতবাদ দীর্ঘকাল দর্শনের নামে এরই করা হয়েছে সন্ধান, যারা এ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তারা এতকাল বিশ্বাস করে এসেছে কষ্টিপাথর আবিষ্কারের মতই এও এক অসম্ভবের সাধনা। এ এক চিন্তা পরিবেশনই ছিল আমার ইচ্ছা। তবুও, আমার সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও এ একটা গোটা বই না লিখে আমার এ চিন্তাটাকে অন্য কোন সংক্ষিপ্ত উপায়ে প্রকাশ করতে পারিনি........

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটি অন্তত দুইবার করে পড়ো, প্রথমবার খুব ধৈর্য সহকারে।" এরি নাম বিনয়! তিনি লিখছেন: "বিনয় কি? স্রেফ কপট নম্রতা, এ ঈর্ষা-স্ফীত জগতে গুণী ব্যক্তিরা তাদের গুণ আর প্রতিভার জন্য ক্ষমা পেতে চায় সর্বগুণ বর্জিতদের কাছে এ নম্রতার সাহায্যে। নম্রতাকে যখন একটা বিশেষ গুণ হিসেবে গণ্য করা হতো তখন এটা যে আহাম্মকদের জন্য খুব একটা সুযোগ-সুবিধার ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কারণ প্রত্যেকেই নিজে একজন কেউ কেটা এটা বলা হোক তাই আশা করে থাকতো।"

শোপেনহাওয়ারের বইর প্রথম বাক্যে অবশ্য কোন বিনয় নেই। "আমার ভাবই পৃথিবী—এ বলেই তিনি শুরু করেছেন। ফিস্‌টে (Fichte) যখন অনুরূপ কথা বলেছিলেন তখন পরা-বিদ্যায় বিজ্ঞ জার্মানরাও প্রশ্ন করেছিলেন: "এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী কি বলেন?" কিন্তু শোপেন হাওয়ারের কোন বৌ ছিল না। তাঁর কথার অর্থ অবশ্য খুবই সহজ—তিনি সূচনায় শুধু ভাব আর চেতনার সাহায্যেই আমরা বহির্জগতকে জানতে পারি কান্টের এ মতবাদকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তারপর বেশ জোর আর স্বচ্ছতার সঙ্গে তিনি আদর্শবাদের ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু গ্রন্থটির এটা তেমন মৌলিক অংশ নয়—এ বরং প্রথমদিকে স্থান না পেয়ে শেষের দিকে স্থান পেলেই ভালো হতো। ভুল পদক্ষেপের জন্যই শোপেন-হাওয়ারকে আবিষ্কার করতে পৃথিবীর লেগেছে এক প্রজনন—তাঁর নিজস্ব চিন্তাকে তিনি দু'শ পৃষ্ঠাব্যাপী পুরোনো আদর্শবাদের এক দুর্বোধ্য পর্দার আড়ালেই রেখেছেন লুকিয়ে।

প্রথম ভাগের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বস্তুবাদের প্রতি আক্রমণ। যখন আমরা বস্তুমাত্রকে স্রেফ মনের সাহায্যে জানতে পারি তখন মনকেও বস্তু বলে কি করে বুঝাবো? "একটা স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে আমরা যদি এ পর্যন্ত বস্তুবাদের অনুসরণ করতাম আর পৌঁচে যেতাম তার উচচ শিখরে তা হলে মুহূর্তে অলিম্পিয়াবাসীদের অফুরন্ত হাসি আমাদেরেও পেয়ে বসতো। হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতো আমরা মুহূর্তে তার মারাত্মক ফল যে জ্ঞান তা জেনে পেলতাম—যে জ্ঞান অতিকষ্টে আয়ত্ত করা হয়েছে তা যে সূচনা-বিন্দুর এক অপরিহার্য শর্ত তা পূর্ব নির্ধারিত। শুধুই বস্তু........

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যখন শুধু বস্তু সম্বন্ধেই ভেবেছি এ কল্পনা করেছি তখন বস্তুত আমরা ভেবেছি যে কর্তার সাহায্যে বস্তুকে উপলব্ধি করা হয় তাকেই ঃ যে চক্ষু তাকে দেখে, যে হাত তাকে অনুভব করে আর যে বোধ-শক্তি তাকে জানে, সে সবকেই। এভাবে নেহাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে যা প্রমাণ করতে হবে তা মেনে নেওয়া' (Petitis Principii) মানুষের এ প্রচণ্ড স্বভাব নিজেকে জাহির করে বসে—মুহূর্তে দেখা যায় যা শেষ গ্রন্থি তাই সূচনা-বিন্দু—একটি চক্রেরই যেন শৃঙ্খল। বস্তুবাদী ব্যরণ মানসৌসেনের (Baron Munchacusen) মতো যিনি ঘোড়ায় চড়ে সাঁতার দিতে গিয়ে নিজের পায়ের সাহায্যে ঘোড়াটাকে উপরে হাওয়ায় তুলে ধরতেন আর নিজেকে তুলে ধরতেন ঘোড়ার কেশরের সাহায্যে ......স্থূল বস্তুবাদ, আজকের দিনে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানেও নিজের মৌলিকতার দাবী সম্পর্কে এক অজ্ঞ বিভ্রান্তিতেই ভুগছে......যা আদৎ শক্তি বোকামী তাকেই অস্বীকার করে বসে আর সর্বাগ্রে জীবনের ঘটনাবলীকে শারিরীক আর রাসায়নিক শক্তির সাহায্যেই চায় ব্যাখ্যা করতে, আবার সে সবকে ব্যাখ্যা করতে চায় বস্তুর যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে। ....কিন্তু এ আমি কখনো বিশ্বাস করব না যে অতি সরল রাসায়নিক সংমিশ্রণেরও যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনো সম্ভব—আলো, উত্তাপ আর বিদ্যুতের উপাদানের সম্ভাবনা তো আরো কম। এসবের জন্য সব সময় গতি-বৈজ্ঞানিক বা (Dynamical) ব্যাখ্যাই দরকার।" না। বাস্তবতার গোপন সারসত্তা আবিষ্কারের জন্য পরাবিদ্যার ধাঁধার সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়—প্রথমে বস্তুর পরীক্ষা সেরে তবে অগ্রসর হতে হবে চিন্তার পরীক্ষায় এ করার জন্য আমাদের শুরু করতে হবে যা আমরা প্রত্যক্ষ আর অন্তরঙ্গ ভাবে জানি তা দিয়ে অর্থাৎ আমাদের নিজেদের দিয়ে। "বাইর থেকে আমরা কোন জিনিসেরই আদৎ স্বভাবে পৌঁচতে পারি না। যত অনুসন্ধানই করি না কেন আমরা কোন কিছুর কল্প-মূর্তি (Image) আর নামে ছাড়া আর কোথাও পৌঁচি না। আমাদের অবস্থা কোন দুর্গে প্রবেশ-ইচ্ছুকের দুর্গ পরিক্রমণের মতই—যে সময় সময় দুর্গ-মুখের নকশাই শুধু আঁকছেন।" চল আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। আমাদের মন-কন্দরের চরম স্বরূপ যদি আমরা জানতে পারি তা হলে খুব সম্ভব বহির্জগতের চাবিও আমরা পেয়ে যাবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. ইচ্ছা দিয়ে গড়া পৃথিবী (The World as Will)

ক. বেঁচে থাকার ইচ্ছা

ব্যতিক্রমহীন ভাবে প্রায় সব দার্শনিকই মনের সার-সত্তাকে (Essence) স্থান দিয়েছেন চিন্তা আর চেতনায়—মানুষই একমাত্র জীব যে জানতে পারে, মানুষকে বলাও হয় 'যুক্তিবাদী জীব। "এ হচ্ছে এক সার্বজনীন পুরোনো আর সবচেয়ে চরম মিথ্যা—এ আদি মিথ্যা আর প্রাথমিক বিরাট ভুলটাকেই আগে অপসারিত করা চাই। সচেতনতা হচ্ছে আমাদের মনের স্রেফ উপরিতল, যেমনি পৃথিবীর কঠিন আবরণ ছাড়া তার ভিতরটা সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ তেমনি মনের ব্যাপারেও তাই।" সচেতন মেধা বা বুদ্ধির অন্তরালে সচেতন কি অচেতন একটা ইচ্ছা-শক্তি রয়েছে, যা সদা সচেষ্ট আর অক্লান্ত শক্তি আর স্বয়ংক্রিয় এক প্রবল ও অদম্য কামনা। সময় সময় মনে হয় যে বুদ্ধিই বুঝি ইচ্ছাকে পরিচালিত করছে কিন্তু এ পরিচালনা হচ্ছে পথ-প্রদর্শকের প্রভুকে পরিচালনার মতই—ইচ্ছা হচ্ছে : "এক সবল অন্ধ যে চক্ষুষ্মান খোঁড়াকে নিজের কাঁধে বহন করে চলে। কোন কিছু সম্বন্ধে যুক্তি খুঁজে পেয়েছি বলেই যে আমরা তা চাই তা নয় বরং আমরা ওটা পেতে চাই বলেই তার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকি—এমনকি আমাদের কামনাকে ঢাকবার জন্য আমরা দর্শন আর ধর্মশাস্ত্রেরও দরাজ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। এ কারণে শোপেনহাওয়ার মানুষকে 'তত্ত্বজ্ঞানী জীব' আখ্যা দিয়েছেন—অন্য জীবেরাও কামনা করে থাকে কিন্তু তত্ত্ব-বিদ্যার দোহাই দেয় না। "এর চেয়ে বিরক্তিকর কিছুই হতে পারে না যখন আমরা দেখি যে যতই আমরা যুক্তি ব্যাখ্যার সাহায্যে কাকেও কিছু একটা বুঝাতে চাই না কেন শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে ইচ্ছাই করবে না—অতএব তার ইচ্ছার (Will) সঙ্গেই আমাদের করতে হবে বোঝাপড়া।" কাজেই লজিকও এখানে ব্যর্থ—লজিকের সাহায্যে কেউ কোনদিন কারো মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারেনি। এমনকি তর্ক শাস্ত্রবিদরাও (Logicians) লজিকের ব্যবহার করে থাকেন উপার্জনের উৎস হিসেবে। কাজেই কারও মনে বিশ্বাস জন্মাতে হলে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ, তার কামনা আর ইচ্ছার প্রতিই আবেদন করতে হবে। বহুকাল ধরে আমরা মনে রাখি আমাদের বিজয়ের কথা আর অনতিবিলম্বে ভুলে যাই আমাদের পরাজয়ের গ্লানি—স্মৃতি হচ্ছে ইচ্ছার গোলাম। "হিসেব করতে বসলে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায়ই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ভুলই করে থাকি বেশী। আমাদের পক্ষে লোকসানজনক ভুলের চাইতে—সামান্যতম অসাধু ইচ্ছা ব্যতিরেকেই এমন ঘটে থাকে। এমন কি নিজের ইচ্ছা কি কামনার সঙ্গে জড়িত ব্যাপারে চরম আহাম্মকেরও বোধশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে"। সাধারণত বিপদে বুদ্ধির খোলতাই হয়, যেমন শৃগালের বেলায় অথবা অভাবেও তা ঘটে যেমন অপরাধীর বেলায়। কিন্তু সব সময় তা অর্থাৎ বুদ্ধি ইচ্ছার অনুগত আর তারই যে হাতিয়ার—ইচ্ছাকে স্থানচ্যুত করতে গেলেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। অন্যের তুলনায় যে শুধুমাত্র চিন্তা বা কল্পনা দিয়েই কিছু করতে চায় তারই ভুল করার সম্ভাবনা বেশী।

খাদ্যের জন্য, সঙ্গী-সন্ধানী আর সন্তান-সন্ততির জন্য মানুষের উত্তেজিত সংগ্রামের কথা ভেবে দেখুন—এসব কি চিন্তা ভাবনার ফল? নিশ্চয়ই না—এ হচ্ছে অর্ধ-সচেতন বেঁচে থাকার আর পূর্ণজীবন যাপন করার ইচ্ছারই পরিণতি। "মনে হয় বটে মানুষের সামনের দিকটাই আকৃষ্ট হচ্ছে—আসলে কিন্তু তাদেরে ঠেলা দেওয়া হয় পেছনের দিক থেকেই।" তারা মনে করে চোখ দিয়ে যা দেখতে পায় তাই তাদেরে চালাচ্ছে আসলে অনুভূতিই তাদেরে করে চালিত—এ সহজাত অনুভূতি সম্বন্ধে তারা প্রায় জীবনের অর্ধেক কাল এক রকম অচেতনই থাকে। বুদ্ধি শুধুমাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রী—"প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেছে ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণের জন্যই। কাজেই ইচ্ছার উদ্দেশ্য হাসিলের উপযোগী করেই তাকে গড়া হয়েছে। ঐ সবের গভীরতার খোঁজ নেওয়ার কিম্বা সত্যকার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য নয়। মনে একমাত্র স্থায়ী আর অপরিবর্তনীয় উপাদান হচ্ছে ইচ্ছা——ইচ্ছাই উদ্দেশ্যের ক্রমগতি রক্ষা করে চেতনাকে দিয়ে থাকে ঐক্য আর সব চিন্তা আর ভাবকে একত্রিত করে এক ক্রমিক সংগতির মতো তার সঙ্গ নিয়ে থাকে।" ঐ হচ্ছে চিন্তার যান্ত্রিক বিন্দু।

বুদ্ধিতে নয় ইচ্ছাতেই নিহিত চরিত্র—উদ্দেশ্য আর মনোভাবের ধারাবাহিকতাই চরিত্র—আর এসবই ইচ্ছা। "মস্তিষ্ক" থেকে "হৃদয়ের" শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জনশ্রুতি মনে হয় নির্ভুল—জনশ্রুতির জানা আছে কারণ এ নিয়ে সে কোন যুক্তির অবতারণা করেনি) 'সৎ ইচ্ছা' স্বচ্ছ মনের চেয়ে বিজ্ঞতর, যখন সে কাজেও 'চালাক'; সব জান্তা' বা 'ধূর্ত' বলে অভিহিত করে তখন বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে তার যথেষ্ট সন্দেহ ও অপসন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। "মনের অতি বুদ্ধি দীপ্ত গুণাবলী প্রশংসিত হয় বটে কিন্তু কেউ তা ভালোবাসে না। আর সব ধর্মই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি জানায় ইচ্ছা বা হৃদয়ের গুণাবলীর জন্যই কিন্তু কোন ধর্মই মস্তিষ্কের বা বোধশক্তির উৎকর্ষের জন্য দেয় না কোন রকম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।"

এমনকি শরীরও ইচ্ছারই সন্তান—যাকে আমরা অনির্দিষ্ট ভাবে জীবন বলে থাকি সে ইচ্ছাই রক্তকে ঠেলা দিয়ে ভ্রূণদেহে প্রণালীর রেখা টেনে তাকে নিজের রক্তবহ করে তোলে। এ প্রণালী রেখাগুলোই গভীর আর সংহত শিরা উপশিরায় হয় পরিণত। ধরবার ইচ্ছা যেমন হাতের সৃষ্টি করেছে তেমনি জানবার ইচ্ছা সৃষ্টি করেছে মস্তিষ্ক অথবা যেভাবে খাদ্য গ্রহণেচ্ছাই গড়ে তুলেছে হজমের স্থান অর্থাৎ তার উপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বস্তুত এ দুই অর্থাৎ ইচ্ছা আর মাংসের তথা দেহের রূপ আর অবয়ব একই নিয়ম আর বাস্তবের দু'টা দিকমাত্র। এ সম্পর্কটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে যখন প্রবল আবেগ-মুহূর্তে অনুভূতি আর আভ্যন্তরীণ শারীরিক পরিবর্তন লাভ করে জটিল একাত্মতা। "ইচ্ছার কাজ আর দৈহিক গতি কার্য কারণ সূত্রে গ্রথিত দু'টি আলাদা জিনিস নয় যে তন্ন্যায়ভাবে জানা সম্ভব, কার্য বা কারণের সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা এক এবং একই কিন্তু তাদের দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি—তাৎক্ষণিক ভাবে এবং পুনরায় উপলব্ধিতেও।....দৈহিক কর্ম ইচ্ছাকেই কর্মে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর কিছুই না। প্রত্যেক শারীরিক গতির ব্যাপারেই এ সত্য........সমস্ত দেহটাই ইচ্ছারই কর্মময়রূপ....তাই দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উচিত যে প্রধান কামনাসমূহের মারফৎ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে তার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিধান করা—এসব কামনার তারা হবে বাহ্য অর্থাৎ দৃশ্যমান প্রকাশ মাত্র। দাঁত, কন্ঠনালী আর উদর ক্ষুধারই কর্ম-রূপ, যৌন-কামনা কর্ম-রূপ নেয় প্রজনন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে...... সমস্ত স্নায়ু-যন্ত্র হচ্ছে ইচ্ছারই শুভ বা সূচীমুখ—যা নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে দেহের বাইরে ও ভিতরে। ....সাধারণভাবে মানব-দেহ যেমন মোটামুটি ইচ্ছার সঙ্গেই সংগতি রক্ষা করে তেমনি ব্যক্তিগত শারীর গঠন আর ব্যক্তিগত পরিবর্তিত ইচ্ছার তথা চরিত্রের সঙ্গেও সংগতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা করবেই।"

মনন বা বুদ্ধির আসে ক্লান্তি কিন্তু ইচ্ছার তা কখনো আসে না—বুদ্ধির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন হয় ঘুমের কিন্তু ইচ্ছা ঘুমের মধ্যেও কাজ করে চলে। বেদনার মতো ক্লান্তিরও আসন হচ্ছে মস্তিষ্ক—যে সব পেশীর গুরু মস্তিষ্কের (Cerebram) সঙ্গে সম্পর্ক নেই (যেমন হৃদযন্ত্রের) তারা কখনো ক্লান্ত হয় না। ঘুমে মস্তিষ্ক আহার্য গ্রহণ করে কিন্তু ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না কোন রকম খাদ্যের। তাই মস্তিষ্ক-জীবীদের ঘুমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। (এ কথার এ অর্থ নয় যে আমাদের মাত্রাধিক ঘুমাতে হবে, তা করতে গেলে মস্তিষ্কের ধার কমে যায় আর তা হয়ে দাঁড়ায় স্রেফ সময় হরণ।) ঘুমের সময় মানুষের জীবন উদ্ভিদের মতো বর্ধনশীল অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে আর তখনই ইচ্ছা বাইরের কোন রকম বাধা বন্ধন ছাড়া তার মৌল আর অত্যাবশ্যক স্বভাবানুসারে কাজ করতে সক্ষম—মস্তিষ্ক ক্রিয়া আর জানার উদ্যম হচ্ছে সবচেয়ে কঠোরতম অবয়বিক কর্ম এতে যে শক্তির হ্রাস হয় ঘুমে তার হাত থেকেও বাঁচা যায়। ফলে ঘুমেই ঘটে সব রকম রোগ-মুক্তি আর অনকূল সংঘটন।" ঘুমই আদি বা মৌল অবস্থা বুরডকের (Burdach) এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ভ্রূণ প্রায় সব সময় ঘুমিয়ে থাকে আর শিশু অধিকাংশ সময়।" জীবন হচ্ছে ঘুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম: প্রথমে আমাদের কিছুটা জয় হয় বটে কিন্তু শেষে বিজয় তারই হয় করায়ত্ত। দিনের বেলা জীবনের যে অংশটা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাকে বাঁচাবার আর পুনর্জীবিত করার জন্য ঘুম হচ্ছে ধার করে আনা এক টুকরা মৃত্যুই। ঐ হচ্ছে আমাদের চিরন্তন শত্রু—এমনকি জাগ্রত অবস্থায়ও ওটা আমাদের আংশিকভাবে দখল করে বসে। বিজ্ঞতম মস্তিষ্কও যেখানে প্রতি রাত যত সব অদ্ভুত আর যুক্তিহীন স্বপ্নের আডডায় পরিণত হয় আবার জেগে উঠেই যার সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তায় বসতে হয় সে মস্তিষ্কের কাছে, শেষ পর্যন্ত কি আর আশা করা যেতে পারে? তা হলে ইচ্ছাই হচ্ছে মানুষের মৌল সত্তা। এখন যদি তাকে জীবনের সবদিকের, এমন কি 'জড়বস্তুর' ও সার মনে করা হয় তা হলে কি হয়? বস্তুর নিজস্বতা তথা সব জিনিসের গোপন সার-সত্তা বা চরম আভ্যন্তরিণ বাস্তবতা যা দীর্ঘকালের সন্ধানের বস্তু অথচ যা না পেয়ে আমাদের সুদীর্ঘ হতাশা তাকে ইচ্ছা বলেই যদি গণ্য করা হয় তা হলে কেমন হয়?

এবার আমরা বাহ্যিক জগতকে ইচ্ছার আলোয় বিচার করে দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই। একেবারে তলদেশ থেকেই শুরু করা যাক—অন্যেরা যেখানে ইচ্ছাকে শক্তিরই একরূপ বলে অবিহিত করেছেন আমরা সেখানে বলতে চাই বরং শক্তিই ইচ্ছার রূপান্তর। হিউমের যে প্রশ্ন : কারণত্ব বা হেতুত্ব কি ? তার উত্তরে আমরা বলতে পারি : ইচ্ছা। আমাদের মধ্যে যেমন ইচ্ছাই সার্বজনীন কারণ, তেমনি বস্তুর ব্যাপারেও তাই—এভাবে আমরা যদি কারণকে ইচ্ছা রূপে বুঝতে না চাই তা হলে কারণত্ব স্রেফ অর্থহীন এক মিস্টিক যাদুমন্ত্রে পরিণত হয়। এ রহস্য-জ্ঞান ছাড়া আমরা 'শক্তি', 'আকর্ষণ' অথবা 'সাদৃশ্য' ইত্যাদি অজ্ঞাত বা দুর্জ্ঞেয় গুণাবলীর দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হই—এসব শক্তি যে কি বস্তু তা আমরা জানি না কিন্তু 'ইচ্ছা' যে কি তার সম্বন্ধে আমাদের অন্তত কিছুটা পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। তা হলে আমাদের বলা উচিত—বিতৃষ্ণা আর আকর্ষণ, সংযোগ আর বিশ্লেষণ বা বিগলন, চৌম্বক শক্তি আর বিদ্যুৎ, মাধ্যকর্ষণ আর স্বচ্ছতাসাধন এ সবই "ইচ্ছা'। এ ভাবটাকেই গ্যেটে তাঁর এক উপন্যাসের নামেই প্রকাশ করেছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার অদম্য আকর্ষণকে তিনি বলেছেন 'রাসায়নিক আকর্ষণী শক্তি' (Electrine affinity)। যে শক্তি প্রেমিকদের আকর্ষণ করে সে একই শক্তি গ্রহপুঞ্জকেও করে আকর্ষণ।

উদ্ভিদজীবনেও তাই। জীবনের যত নিম্নস্তরে আমরা যাই ততই দেখি বুদ্ধি বা মননের অনুপস্থিতি। কিন্তু 'ইচ্ছা'র বেলায় তা নয়।

"আমাদের মধ্যে যা জ্ঞানের আলোয় তার উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় ....কিন্তু এখানে........যা শুধু অন্ধভাবে নীরবে একই অপরিবর্তনীয় রূপে চেষ্টা করে। এ দুই-ই 'ইচ্ছা'র আয়ত্তাধীনে আসতে বাধ্য।......অচেতনতা হচ্ছে সবকিছুর আদি আর স্বাভাবিক অবস্থা কাজেই এ মূল ভিত্তিভূমি থেকেই, বিশেষ বিশেষ অস্তিত্ব শ্রেণীর সর্বোচচ বিকাশ ঘটেছে চেতনায়, এ কারণেই অচেতনতার একটা প্রাধান্য সব সময় থেকে যায়। ফলে বহু অস্তিত্ব বা বস্তুই থেকে যায় অচেতন কিন্তু তবুও তারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী অর্থাৎ তাদের 'ইচ্ছা' অনুযায়ীই কাজ করে। চেতনার সঙ্গে উদ্ভিদের সাদৃশ্য অতি ক্ষীণ—নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় তার সূচনা মাত্র। এমন কি পশু থেকে বহু পর্যায়ক্রম আর স্তর পার হয়ে মানুষে আর যুক্তিতে পৌঁছার পরও, যে উদ্ভিদ থেকে তার যাত্রা শুরু সে উদ্ভিদের অচেতনতার ভিত্তি–ভূমি থেকেই যায় এবং হয়ত ঘুমের অত্যাবশ্যক–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে এর সত্যতা।"

এরিস্টোটল যে বলেছেন : সব কিছুর ভিতরে এমন একটা শক্তি রয়েছে যা রূপায়িত করে উদ্ভিদ, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু আর মানুষকে—এ কথা সত্য।" "প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যবিদ্যা এখনো কতটুকু অবশিষ্ট আছে তার চমৎকার পরিচয় দেখতে পাওয়া যায় সাধারণভাবে পশুর সহজাত প্রবৃত্তিতে। সহজাত প্রবৃত্তির কাজের সঙ্গে উদ্দেশ্য চালিত কাজের মিল রয়েছে যদিও তার পেছনে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই প্রকৃতির সব গঠনকেই মনে হয় যেন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অথচ কোন উদ্দেশ্যই তাতে নেই।" পশুদের মধ্যে অদ্ভুত যান্ত্রিক নৈপুণ্যই প্রমাণ করে যে বুদ্ধির আগেই ইচ্ছার' স্থান। যে হাতীকে সারা য়ুরোপ ঘোরানো হয়েছে, যে পার হয়েছে শত শত পোল, সে নড়বড়ে পোল দেখলেই থমকে দাঁড়ায়, রাজি হয় না কিছুতেই পা বাড়াতে যদিও দেখে যে বহু ঘোড়া, মানুষ ওটা পার হয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট কুকুর ছানা টেবিলের উপর থেকে লাফ দিতে ভয় পায়—পড়ে গেলে তার কি দশা হবে এটা সে যুক্তি দিয়ে আগাম দেখতে পায়নি (কারণ এ রকম পতনের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতাই তার নেই) বরং দেখতে পেয়েছে তার সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই। আগুন দেখলেই বানরেরা তা পোয়াতে শুরু করে কিন্তু আগুনটাকে জিইয়ে রাখতে দেয় না কোন খড়কুটো, কাজেই এটা যে সহজাত প্রবৃত্তির ফল কোন যুক্তি-বিবেচনার নয় তা পরিষ্কার বুঝা যায়—এসব বুদ্ধির নয় ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। ইচ্ছা মানে বাঁচার ইচ্ছা—দীর্ঘতম জীবনের ইচ্ছা। প্রাণীর কাছে জীবন কতই না প্রিয়। আর কি নীরব ধৈর্যের সাথেই না সে নিজের সুবিধা সন্ধান করে বেড়ায়। "হাজার হাজার বছর ধরে তাড়িত শক্তি ঘুমিয়ে-ছিল তামা আর দস্তায় আর তারা নীরবে পড়েছিল রূপার পার্শ্বে-প্রয়োজনীয় অবস্থায় এ তিনকে যে মুহূর্তে একত্রিত করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে তখন তা নিশ্চয়ই অগ্নিসাৎ হয়ে যাবে। এমনকি উদ্ভিদ জগতেও দেখা যায় শুষ্ক একটা বীজও তিন হাজার বছর ধরে জীবনের ঘুমন্ত শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে, অনুকূল অবস্থা এলেই তা অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে।" চুনাপাথরে জীবন্ত বেঙের সন্ধান থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে এমনকি প্রাণীও হাজার হাজার বছর নির্জীব অবস্থায় থাকতে সক্ষম। ইচ্ছা মানে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আর তার চিরন্তন শত্রু হচ্ছে মৃত্যু।

কিন্তু হয়ত তা মৃত্যুকেও পরাজিত করতে সক্ষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

. প্রজনন ইচ্ছা

প্রজননের শহিদী আর তার কলা-কৌশলেই দেখা দেয় এ ইচ্ছা অর্থাৎ এ ইচ্ছা তাতেই হয় রূপায়িত।

প্রত্যেক স্বাভাবিক জীবই প্রবীণতায় পৌঁছে দ্রুত—আর নিজেকে উৎসর্গ করে প্রজননের কাজে। কীটপতঙ্গ থেকে মানুষ সবারই এ এক গতি—যে মাকড়সা মেয়ে মাকড়শা গর্ভেরই কারণ তাকেই খেয়ে ফেলে মেয়েটা, যে সন্তানের মুখ সে কখনো দেখবে না তাদের জন্যই যে বোলতা আহার্য সংগ্রহ করে (তারাই তাকে খেয়ে সাবাড় করে দেয়) আর মানুষ ত নিজের সন্তান-সন্ততির খাদ্য বস্ত্র জোগাতে আর তাদেরে লেখা-পড়া শিখাতেই নিজেকে ক্ষয় করে খতম করে ফেলে। প্রত্যেক জীবরেই চরম উদ্দেশ্য প্রজনন আর এ হচ্ছে তার প্রবলতম সহজাত প্রবৃত্তি—কারণ ইচ্ছা একমাত্র এভাবেই জয় করতে পারে মৃত্যু। মৃত্যুর উপর এ বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্যই, প্রজনন-ইচ্ছাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জ্ঞান আর চিন্তা-ভাবনার নিয়ন্ত্রণাতীত করা হয়েছে। এমনকি, সময় সময় দার্শনিকদেরও সন্তান-সন্ততি হয়ে থাকে।

"এখানে দেখানো হয়েছে অচেতন প্রকৃতির মতোই ইচ্ছা ও জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে অন্ধের মতো কাজ করে যায়....তাই ইচ্ছার কেন্দ্রস্থল হলো প্রজনন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মস্তিষ্ক হলো জ্ঞানের প্রতিনিধি আর তার বিপরীত মেরুতে স্থান প্রজনন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের....শেষোক্তের নীতি জীবন-রক্ষার নীতি, তারাই বজায় রাখে জীবনের ধারাবাহিকতা। এ কারণেই গ্রীকরা পুরুষাঙ্গের (Phallus) আর হিন্দুরা লিঙ্গ-পূজা করতো।......প্রেমের দেবতাই আদি আর এই স্রষ্টা, এ থেকেই সব কিছুর গতি-হেসিয়ড্ আর পারমেনিডেসের (Hesiod and Parmenides) এ কথা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সব কাজ আর আচরণের সত্যকার অদৃশ্য কেন্দ্রবিন্দু হলো যৌন সম্পর্ক—যতই ঢাকা দেওয়া হোক না সর্বত্র তা মাথা চাড়া দেবেই। ঐ যুদ্ধের কারণ আর ঐ শান্তির শেষ। একদিকে যা গম্ভীর তার বুনিয়াদ অন্যদিকে তা হাস্য রসের লক্ষ্য, রসিকতার অফুরন্ত উৎস যেমন তেমনি সব রকম মায়ারও চাবি-কাঠি আর সব রকম রহস্যময় ইংগিতেরও অর্থ ঐ সম্পর্কেই নিহিত।...... আমরা প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাই পৈত্রিক সিংহাসনের উপর ঐ যেন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণশক্তি নিয়ে বিশ্বের সত্যকার প্রভুত্বের উত্তরাধিকারী হয়ে বসে আছে, আর ওখান থেকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নীচে তাকিয়ে আছে—আর তাকে বাঁধবার জন্য বা কয়েদ করার জন্য অথবা সীমিত করার জন্য, যেখানে সম্ভব লুকাবার জন্য—এভাবে তার উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে তাকে জীবনের অধীন ও প্রধান করে রাখার যতসব আয়োজন করা হয় সে সবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তা হাসতে থাকে।”

“প্রেমের তত্ত্ববিদ্যা” ঘুরপাক খায় পিতার মায়ের নিকট, পিতা-মাতার সন্তানের নিকট আর ব্যক্তির জাতের নিকট এ বশ্যতার চারদিকে। যৌনাকর্ষণের প্রথম সূত্রই হলো সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচনে যতই অজ্ঞাতসারেই হোক, পারস্পরিক প্রজনন যোগ্যতাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। “পাছে সন্তান-সন্ততিতে বর্তায় এ জন্য প্রত্যেকে এমন সঙ্গী-সঙ্গিনী চায় যাতে তার ত্রুটিগুলির বিলোপ ঘটে......দুর্বল-দেহ মানুষ পেতে চায় সবল-দেহা নারী......যে-সব গুণ নিজের নেই বিশেষ করে অন্যের সেসব গুণকেই মানুষের কাছে সুন্দর মনে হয়, এমনকি তার বিপরীত দোষগুলিকেও তাই মনে করে। ....দুই ব্যক্তির দৈহিক গুণ এমন হতে পারে যে স্বজাতের (Species) যথাযথ উৎপাদনে, একে অন্যের সম্পূর্ণ পরিপূরক—তখন এরা একে অন্যকে একান্তভাবে পেতে চায়......দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত গভীর সচেতনতার সঙ্গেই ভেবে চিন্তে দেখি......যে মেয়েকে দেখে আমরা খুশী হই তার প্রতি তাকাই এক সমালোচনী সঙ্কোচের দৃষ্টিতে......এরকম অবস্থায় ব্যক্তি অজ্ঞাতভাবেই তার চেয়ে উচ্চতর তাগিদেই হয় পরিচালিত...... সন্তান-ধারণ বা সন্তান প্রজনন শক্তি যার যে পরিমাণে কমে এসেছে তার প্রতি বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণও সে অনুপাতে হ্রাস পায়....সৌন্দর্যহীন যৌবনের আকর্ষণ সব সময় অব্যাহত কিন্তু যৌবন-বর্জিত সৌন্দর্যের আকর্ষণ তিরোহিত।....প্রেমে-পড়ার প্রতি ঘটনায় দেখা গেছে....একে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি চরিত্রের ফল হিসেবেই যে শুধু দেখা হয় তার সমর্থন পাওয়া যায় যখন দেখি আসল ব্যাপার ভালোবাসার পারস্পরিক আদান-প্রদান নয় বরং অধিকার অর্থাৎ একজন আর একজনকে পাওয়াই বড় কথা।”

এতদসত্ত্বেও প্রেমের বিয়েই হয়ে পড়ে সবচেয়ে অসুখী মিলন। কারণ বিয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্তির সুখ নয় বরং জাতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই। একটি স্পেনদেশীয় প্রবাদ বাক্যে বলাই হয়েছে : “প্রেমে পড়ে যে বিয়ে করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার জীবনটাই কাটে দুঃখে।" বিয়েটাকে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার একটা উপায় মনে না করে তাকে স্রেফ দৈহিক মিলন মাত্র মনে করে বিয়ের সমস্যা নিয়ে লেখা সব সাহিত্যই তাই একটা খামখেয়ালী ব্যাপার হয়ে উঠেছে। প্রজননের কাজ সারলেই হলো তা ছাড়া পিতামাতা 'এর পর চির-সুখী হলো' না মাত্র একদিনের জন্য সুখী হলো তা নিয়ে প্রকৃতির কোন মাথাব্যথা নেই। দেখা গেছে প্রেমের বিয়ের চেয়ে মা-বাপ সুযোগ-সুবিধা দেখে যে বিয়ের ব্যবস্থা করেন অধিকাংশ সময় সেসব বিয়েই অধিকতর সুখের হয়ে থাকে। তবুও পিতামাতার নির্দেশ না মেনে যে মেয়ে প্রেমের খাতিরে বিয়ে করে একদিক থেকে তাকে এ কারণে প্রশংসা করা যায় যে সে স্বভাবের অনুসরণ করে (সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত জাতের স্বার্থই অনুসরণ করে) যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাই বেছে নিয়েছে—অন্যদিকে পিতামাতার নির্দেশ ছিল অনেকখানি তাদের ব্যক্তিগত অহংবোধের দিক থেকেই।" প্রেম হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম প্রজনন-বিজ্ঞান।

যেহেতু প্রেম হচ্ছে প্রকৃতির এক ছলনামাত্র—বিয়ের ফলে তার ক্ষয় অনিবার্য এবং মোহভঙ্গ ঘটতে বাধ্য। বিয়েতে একমাত্র দার্শনিকরাই সুখী হতে পারে কিন্তু দার্শনিকরা তো বিয়ে করেন না। "ব্যক্তির জন্য যা মূল্যবান তা জাতের জন্যও মূল্যবান দেখিয়ে যে প্রবৃত্তিকে এমন ছলনার উপর নির্ভর করতে হয়, জাতের উদ্দেশ্য হাসিল হলেই সে ছলনার বিলোপ ঘটবেই। ব্যক্তি তখন বুঝতে পারে সে জাতের ছলনার শিকারে পরিণত হয়েছে। পেট্রারকের (Petrarch) কামনার যদি তৃপ্তি হতো তা হলে তার গানও যেতো থেমে।" জাতের ধারাবাহিকতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তির যে অধীন ভূমিকা তা যেভাবে ব্যক্তিগত জীবনী শক্তি আর প্রজনন কোষের উপর নির্ভরশীল তাতেই প্রভাবিত। এ প্রসঙ্গে শোপেনহাওয়ারের মন্তব্য :

'যৌন প্রবৃত্তিকে বৃক্ষের তথা জাতের আভ্যন্তরীণ জীবন বলেই গ্রহণ করতে হবে যার উপর ভর করে ব্যক্তি-জীবন গড়ে ওঠে—পাতা যেমন বৃক্ষের দ্বারাই সজীব হয় আবার বৃক্ষকেও রাখে সজীব এও সে রকম। একারণেই এ প্রবৃত্তি এত প্রবল আর আমাদের স্বভাবের গভীরতা থেকেই তার উৎপত্তি। কোন মানুষকে খোজা বানিয়ে দিলে জাতের যে-বৃক্ষ থেকে তার উৎপত্তি তার থেকেই তাকে কেটে ফেলা হয়, এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সে শুকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়, ফলে তার শারীরিক আর মানসিক অবনতি ঘটে। জাতকে বাঁচিয়ে রাখার যে কাজ অর্থাৎ গর্ভোৎপাদন ব্যাপারে প্রতিটি জীবেরই সাময়িক ক্লান্তি আর সব শক্তির যেন একটা অবসাদ এসে যায়—অধিকাংশ কীট-পতঙ্গের ত এর পর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। এ কারণেই সেলসাস্ (Celsus) বলেছেন : মানুষের বেলায় দেখা যায় প্রজনন শক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, যে কোন বয়সে এ শক্তির অত্যাধিক ব্যবহার আয়ুকে সংক্ষিপ্ত করে আনে আবার এ ব্যাপারে সংযম এক্তেয়ার করতে পারলে সবদিকে শক্তি বাড়ে বিশেষ করে পেশীগত শক্তি, এ কারণে গ্রীক ক্রীড়াবিদদের শিক্ষার এটি একটি অঙ্গ ছিল। এমনকি এ সংযমের ফলে কীটপতঙ্গের আয়ু পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত বেড়ে যায়। এ সব ঘটনা এ প্রমাণ করে যে ব্যক্তির জীবন মূলতঃ জাতের তথা তার প্রাণী গোষ্ঠী থেকে ধার করা বস্তু......প্রজননই সর্বোচ্চ ব্যাপার, ঐটি সমাধা করার পর ধীরে ধীরে অথবা ক্ষীপ্রগতিতে প্রথম ব্যক্তির জীবন ডুবতে অর্থাৎ ক্ষয় হতে শুরু করে আর তখন নতুন এক জীবন জাত বা গোষ্ঠী রক্ষার প্রতিশ্রুতি জানায় প্রকৃতিকে এবং করতে থাকে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি....এভাবে পর্যায়ক্রমে মৃত্যু আর প্রজনন হচ্ছে জাত বা গোষ্ঠীর জীবন-স্পন্দন।......ব্যক্তির জন্য যা ঘুম জাতির জন্য তা মৃত্যু...... ব্যক্তির বেলায় এ হচ্ছে প্রকৃতির অমরতার অক্ষয় নীতি......সমস্ত বিশ্বের জন্য, তার সব অপূর্ব দৃশ্যাবলীসহ, একই অবিভক্ত ইচ্ছা তথা ভাবেরই অভিব্যক্তি বা বাহ্য প্রকাশ—এভাব অন্য সব ভাবের সঙ্গে এমনভাবে মিলে যায় যেমন ভাবে একক কন্ঠস্বর মিলে যায় সুরের সঙ্গে......। 'গ্যেটের সঙ্গে একারম্যানের কথোপকথনে' গ্যেটে বলেছেন : "আমাদের আত্মা এক অবিনশ্বর প্রকৃতিরই অংশ আর তার কর্মধারা চলছে চিরন্তন থেকে চিরন্তন অবধি। এ প্রায় সূর্যের মতই, আমাদের চর্ম-চক্ষে ওটা অস্ত যায় মনে হলেও আসলে সূর্য কখনো অস্ত যায় না বরং অবিরাম তা আলো বিকীরণ করতেই থাকে। এ উপমা গ্যেটে আমার কাছ থেকেই নিয়েছেন, আমি তাঁর কাছ থেকে নিইনি।"

শুধু স্থান আর কালেই আমরা পৃথক পৃথক সত্তা—প্রাণ যে বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট আর সব জীব-মূর্তিতে পৃথকভাবে বিভক্ত হয় ঐ সবই হচ্ছে তার "পৃথকীকরণের নীতি"—স্থান আর কাল হচ্ছে মায়ারই আবরণ—বস্তুর ঐক্যকে লুকিয়ে রাখার ঐ এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি। আসলে শুধু জীব-শ্রেণী বা speciesই আছে, আছে শুধু প্রাণ আর ইচ্ছা। "ব্যক্তি যে স্রেফ বাহ্য-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য তার আসল-স্বরূপ নয় তা পরিষ্কার বুঝতে পারা আর বস্তুর অবিরাম পরিবর্তনই যে তার সুনির্দিষ্ট স্থায়ী রূপ তা দেখতে পাওয়াই দর্শনের সারমর্ম। ইতিহাসের মতো হওয়া উচিত ঃ "একই বস্তু বটে কিন্তু ভিন্ন রূপে"। বস্তু যতই পরিবর্তিত হয় ততই তারা একই রকম থাকে। "যার কাছে মানুষ আর সবকিছু সব সময় একটা অপছায়া বা মায়া মনে হয়নি তার দার্শনিক হওয়ার মতো কোন যোগ্যতাই নেই......ইতিহাসের সত্যকার দর্শন নির্ভর করছে এটুকু বুঝতে পারার উপর যে অশেষ পরিবর্তন আর বিচিত্র ও জটিল ঘটনা-প্রবাহেও সে একই অপরিবর্তনশীল সত্তাই আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি—তা আজ যে লক্ষ্যের অনুসরণ করছে, গতকালও তাই করেছিল এবং চিরকাল তাই করবে। ঐতিহাসিক দার্শনিককে তাই সব ঘটনায় সম-চরিত্রকে চিনে নিতে হয়........বিশেষ বিশেষ ঘটনার নানা বৈচিত্র্য, পোষাক-পরিচ্ছদ আর আচার ব্যবহারের পার্থক্য সত্ত্বেও সর্বত্র একই মানবতাকে চিনে নিতে হয়...... দর্শনের দিক থেকে হেরোডোটাসকে (Herodotus) অধ্যয়ন মানে যথেষ্ট ইতিহাস অধ্যয়ন......সব সময় আর সর্বত্র প্রকৃতির সত্যকার প্রতীক হচ্ছে বৃত্ত কারণ ঐ হচ্ছে আদর্শ বা পুনরাবর্তনের নমুনা।

আমরা এ বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত যে, যে মহত্তর যুগের আমরাই নায়ক আর আমরাই শ্রেষ্ঠজন সব ইতিহাসই তার প্রস্তুতিতে অত্যন্ত মন্থরগতি আর অপূর্ণ—কিন্তু উন্নতির এরকম ধারণা হচ্ছে স্রেফ দম্ভ আর বোকামী। "যাই হোক যুগে যুগে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা একই কথা বলে এসেছেন আর নির্বোধেরা, যারা সব সময় দলে ভারী তারাও তাদের মতোই চলেছে সব সময় আর করেছে বিজ্ঞদের কথার বিপরীত আচরণ—আর এ ভাবেই চলবে চিরকাল। এ কারণেই ভল্টেয়ার বলেছেন; আমরা পৃথিবীটাকে যেমন বদ আর বোকা পেয়েছিলাম ছেড়েও যাবো তেমনি।"

এ সবের আলোয় আমরা প্রাক্তনের অব্যর্থ বাস্তবতার এক নতুন আর কদর্যতর ধারণা পেয়ে থাকি। "স্পিনোজা বলেন যে প্রস্তর খণ্ডকে হাওয়ায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তার যদি চেতনা থাকতো তা হলে ওটা মনে করতো সে তার স্বাধীন ইচ্ছায় ঘুরছে। আমি শুধু এ বলতে চাই প্রস্তর খণ্ড ঐ মনে করলে তা ভুল হতো না। পাথরটাকে যা গতি দিয়েছে তাই আমার পক্ষে উদ্দেশ্য—পাথরে যেটাকে সংহতি, মাধ্যাকর্ষণ, কাঠিন্য মনে হয় তা তার আভ্যন্তরীণ স্বভাবে, আমি যা আমার নিজের মধ্যে বুঝতে পারি তা একই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি পাথরের জ্ঞান থাকতো তা হলে সেটাকে সে 'ইচ্ছা' বলেই বুঝতো বা জানতো।" কিন্তু ইচ্ছা পাথর বা দার্শনিক কারো বেলায় "স্বাধীন" নয়। সামগ্রিকভাবে ইচ্ছা স্বাধীন কারণ তা ছাড়া তাকে সীমিত করতে পারে এমন কোন ইচ্ছাই নেই—কিন্তু সার্বজনীন 'ইচ্ছার' প্রতিটি অংশ, প্রতিটি জীব-শ্রেণী (Species), প্রতিটি জীব, প্রতিটি অঙ্গ অপরিবর্তনীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট হয় সমগ্রের দ্বারা।

"প্রত্যেকে বিশ্বাস করে পরিপূর্ণ স্বাধীন হওয়ার তার যুক্তিসঙ্গত অধিকার আছে, এমনকি ব্যক্তিগত কার্যকলাপেও, আর ভাবে প্রতি মুহূর্তে সে অন্য একটা জীবন-প্রণালী গ্রহণ করতে সক্ষম—যার অর্থ সে অন্য আর একজন হয়ে যাওয়া। কিন্তু অভিজ্ঞতার পর সে এ দেখে অবাক হয় যে সে মোটেও স্বাধীন নয়, বরং প্রয়োজনের দাস। সব রকম সংকল্প আর চিন্তা ভাবনা সত্ত্বেও সে তার স্বভাব বদলাতে পারে না—জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, যে চরিত্রকে সে নিজেই নিন্দা করে এসেছে সে চরিত্রই তাকে বহন করতে হচ্ছে, এ যেন (নাটকের) যে ভূমিকায় সে নেমেছে শেষ পর্যন্ত তা অভিনয় করে যাওয়া।"

৫. পাপ পৃথিবী (The World As Evil)

যেমন ইচ্ছা তেমন যদি পৃথিবী হয়, তা হলে এ পৃথিবী দুঃখের না হয়ে যায় না।

প্রথমত ইচ্ছা মানে অভাব আর যতটুকু তার ধরা যায় তার থেকে বেশী ধরা বা পাওয়ার ইচ্ছাটা অনেক বড়। একটা ইচ্ছা পূরণ হলে দশটা ইচ্ছা থেকে যায় অপূর্ণ। কামনা অসীম কিন্তু তার পূর্ণতা সীমিত—"ওটা ভিক্ষুকের প্রতি ভিক্ষার পয়সা ছুঁড়ে দেওয়ার মতই, ওটা ওকে আজ বাঁচিয়ে রাখে স্রেফ তার অভাবটাকে আগামী কাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার জন্যই.......যতকাল ইচ্ছার দ্বারা আমাদের চেতনা পূর্ণ হয়ে থাকবে, যতদিন নানা বাসনা-কামনার অবিরাম আশা আর ভয়-ভীতির ভিড়ে আমরা আত্মসমর্পণ করবো আর যতদিন আমরা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে থাকবো ততদিন আমরা কখনো স্থায়ী সুখ বা শান্তি পাবো না।" আর পাওয়ার ত কোন অন্ত নেই—আদর্শে পৌঁছে যাওয়ার মতো আদর্শের পক্ষে মারাত্মক কিছুই হতে পারে না। "পরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি অনেক সময় সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী করে নিয়ে আসে। কারণ তার দাবী ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থের সঙ্গে এমন সংঘর্ষ বাধিয়ে বসে যে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে তা প্রায় চাপা পড়ে যায়।" প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরই একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী স্ববিরোধিতা রয়েছে : এক বাসনা পূরণ হলেই সেটা আবার আর একটা নতুন বাসনা জাগিয়ে তোলে—এভাবে চলতে থাকে, তার আর শেষ দেখা যায় না।" এর মূল কারণ ইচ্ছাকে ইচ্ছার উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হয়, কারণ তা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই আর ইচ্ছা হচ্ছে ক্ষুধিত।"

"অত্যাবশ্যকীয় বেদনার আয়তন ব্যক্তির স্বভাবানুযায়ীই চির নির্দিষ্টতা লাভ করে : এ আয়তন শূন্য যেমন থাকতে পারে না তেমনি আয়তন ছাড়িয়েও তা যায় না পূর্ণ করা....প্রবল আর আশু কোন দুশ্চিন্তা যদি দূর হয় আর আমাদের বুকটা যদি হালকা হয়ে যায়.....তা হলে মুহূর্তেই আর এক দুশ্চিন্তা এসে তা দখল করে বসে, তার সব উপকরণই আগে থেকে ওখানে ছিল কিন্তু খালি জায়গা বা অতিরিক্ত বহনশক্তির অভাবে তা আমাদের চেতনায় দুশ্চিন্তা হয়ে আসন নিতে পারেনি এতকাল.....কিন্তু এখন তার জন্য স্থান শূন্য হওয়ায় সে এসে সিংহাসন দখল করে নিয়েছে।"

জীবনটাই পাপ, কারণ বেদনা হলো তার মূল প্রেরণা আর বাস্তবতা—আর সুখ মানে দুঃখের নেতিবাচক বিরতি। এরিস্টোটল সত্য কথাই বলেছেন বিজ্ঞ ব্যক্তি সুখের সন্ধান করেন না কিন্তু তিনি চান দুঃখ আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি।

"সব রকম তৃপ্তি অথবা সাধারণভাবে যাকে সুখ বলা হয়, আসলে আর মূলত তা হচ্ছে স্রেফ নেতিবাচক......যে করুণা আর সুখ-সুবিধা প্রকৃতই আমাদের করায়ত্ত তার সম্বন্ধে আমরা মোটেও সঠিকভাবে সচেতন নই, ঐগুলিকে তেমন মূল্যও দিই না—এমনি শুধু সাধারণ ঘটনা হিসেবেই ঐগুলোকে মনে করে থাকি কারণ দুঃখ নিবারণ করে তারা আমাদের শুধু নেতিবাচক তৃপ্তিই দিয়ে থাকে। যখন ঐ সবকে আমরা হারাই তখনই কেবল তার মূল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠি। কারণ অভাব, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি খুবই স্পষ্ট আর সুনিশ্চিত আর ঐগুলি আমাদের প্রভাবিত করে প্রত্যক্ষভাবে......দুঃখ অল্প বিস্তর সুখের সঙ্গে সব সময় জড়িত না থাকলে সুখ-বিদ্বেষীরা (Cynics) সব রকমের সুখকে অস্বীকার করার কারণ কি ? ......এ চমৎকার ফরাসী প্রবাদে সে সত্যেরই প্রকাশ ঘটেছে : 'উত্তম হচ্ছে ভালোর শত্রু'—যা ভালো তা একাই থাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনটা যে পাপ তার কারণ—"যে মাত্র দুঃখ-কষ্টের ফলে মানুষের অবসর জোটে তখনই অবসাদ এমনিই ঘনিয়ে আসে যে তার মানস পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে"—তার মানে অধিকতর দুঃখ-ভোগ। এমন কি সমাজতান্ত্রিক য়ুটোপিয়াও যদি অর্জিত হয় তবুও বহু পাপ থেকে যাবে কারণ তার কোন কোনটা, যেমন সংগ্রাম—জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। যদি সব পাপ দূরীভূত হয় আর সব সংগ্রামের সম্পূর্ণ ইতি ঘটে তখন বেদনার মতই অবসাদই অসহ্য হয়ে উঠবে। তাই "জীবন দুঃখ আর অবসাদের মাঝখানে পেণ্ডুলামের মতো আগে-পিছে দুলতে থাকে......সব দুঃখ-যন্ত্রণাকে মানুষ নরকের ধারণায় পরিণত করার পর স্বর্গের জন্য স্রেফ অবসাদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।" যতই সফল হই ততই আমরা অবসাদের শিকারে পরিণত হই। "অভাব যেমন মানুষের জন্য অবিরাম কশাঘাত তেমনি বিলাস-প্রিয়দের জন্য কশাঘাত হচ্ছে অবসাদ ও বিষণ্ণতা। মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর অবসাদের প্রতীক হচ্ছে রবিবার আর সপ্তাহের বাকি দিনগুলি অভাবের।"

জীবন পাপ—কারণ জীব যতই উচ্চ-শ্রেণীর হবে দুঃখও তার তত বেশী। জ্ঞানের উন্নয়ন এর কোন সমাধান নয়।

"কারণ ইচ্ছার প্রকাশ যতই জটিল হতে থাকবে ততই যন্ত্রণাভোগও হবে স্পষ্টতর। উদ্ভিদের কোন চেতনা নেই বলে দুঃখও নেই। অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রাণীরা অতি সামান্য দুঃখই অনুভব করতে সক্ষম—এমনকি কীট-পতঙ্গের অনুভব বা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের শক্তি আজো অত্যন্ত সীমিত। যে সব মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীর স্নায়ু পদ্ধতি পুরোপুরি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম এর আবির্ভাব ঘটেছে বেশী করে—বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় তারও বিকাশ ঘটেছে অধিকতর। এ ভাবে জ্ঞানের বৃদ্ধির অনুপাতে চেতনারও উন্নয়ন ঘটে, দুঃখও বাড়তে থাকে আর মানুষেই ঘটে তার চরম পরিণতি। আবার যে মানুষ যত বেশী জানে, তার বুদ্ধিও সে অনুপাতে বাড়ে—ফলে তার দুঃখও বেশী। যে প্রতিভার অধিকারী সে-ই সবচেয়ে বেশী দুঃখ ভোগ করে।" যে জ্ঞান বাড়ায়, কাজে কাজেই সে দুঃখও বাড়ায়। এমনকি স্মৃতি আর দূরদর্শিতাও মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে পড়ে—কারণ আমাদের বেশীর ভাগ দুঃখ হয় অতীত চিন্তা না হয় আগাম প্রত্যাশারই ফল। না হয় দুঃখ নিজে স্বল্পায়ু। মৃত্যুর চেয়েও মৃত্যু-চিন্তাই না মানুষের জন্য কত অপরিমিত দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশেষে, সর্বোপরি জীবন পাপ এ কারণে যে জীবন একটা যুক্ত। প্রকৃতির সর্বত্রই আমরা দেখি শুধু সংগ্রাম। প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ আর পর্যায়ক্রমে আত্মঘাতী জয় আর পরাজয়। প্রত্যেক জীব শ্রেণীই "লড়াই করছে অপরের বস্তু, স্থান আর সময়ের জন্য।"

"মায়ের দেহ থেকে যে শিশু-হাইড্রা (বহু মস্তকবিশিষ্ট সর্প) ফুল কলির মতো বেরিয়ে আসে আর পরে নিজেকে নেয় বিচ্ছিন্ন করে, সেও যুক্ত থাকা অবস্থায় শিকার নিয়ে মায়ের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে, কার আগে কে খাবারটা কেড়ে নিয়ে মুখে পুরবে এ নিয়ে করে লড়াই। এর সবচেয়ে চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় অষ্ট্রেলিয়ার এক জাতীয় হিংস্র পিঁপড়ের মধ্যে—কেটে দু' টুকরা করলে, মাথা আর লেজে বেঁধে যায় লড়াই। মাথা দাঁত দিয়ে লেজটাকে কামড়ে ধরে আর লেজ অসম সাহসের সঙ্গে আত্মরক্ষা করে মাথায় হুল ফুটিয়ে দিয়ে। এ যুদ্ধ প্রায় আধ ঘন্টা স্থায়ী হয়—হয় এভাবে তারা মরে না হয় অন্য পিঁপড়েরা এসে ওদেরে দেয় ছাড়িয়ে। এ পরীক্ষা যতবারই করা হয়েছে ততবারই এমন ঘটতে দেখা গেছে......য়ুঙহান (younghahon) বলেছেন তিনি জাভায় এমন এক সমতল ভূমি দেখেছেন যদ্দূর চোখ যায় যার সবটাই কঙ্কালে ভরা, তিনি ওটাকে যুদ্ধক্ষেত্র বলেই মনে করেন। কিন্তু আসলে ঐগুলি হচ্ছে বড় বড় কচ্ছপের কঙ্কাল...... ওরা সমুদ্র থেকে এখানে আসে ডিম পাড়ার জন্যই, তখন বন্য কুকুরেরা এসে ওদের সদলবলে আক্রমণ করে, সবাই মিলে ওদের চিৎ করে ফেলে পেট ছিঁড়ে, খোলটা ছাড়িয়ে নিয়ে জ্যান্ত খেয়ে ফেলে। কিন্তু প্রায় সময় বাঘ এসে আবার কুকুরদের উপর করে বসে হামলা।......এ উদ্দেশ্যেই এসব কচ্ছপের জন্ম।......এভাবে বাঁচার ইচ্ছাই জীবনকে (অর্থাৎ প্রাণী বিশেষকে) শিকারে পরিণত করে আর বিভিন্ন রূপে হয়ে পড়ে নিজেরই জীবিকা। অবশেষে যখন মানব জাতির আবির্ভাব ঘটলো, তারা অন্য সব কিছুকে অধীন করে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনের কারখানায় পরিণত করে নিলে। তা সত্বেও মানব জাতিতেও এ সংঘর্ষ, নিজের মধ্যেই ইচ্ছার ঐ বৈচিত্র্য ভয়ঙ্কর ভাবে পেয়েছে প্রাধান্য। ফলে আমরা দেখতে পাই: 'মানুষই মানুষের কাছে নেকড়ে হয়ে ওঠে।"

ভেবে দেখতে গেলে জীবনের সার্বিক চিত্র অত্যন্ত বেদনাদায়ক: জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী না জানার ফলেই আমরা বেঁচে আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সব সময় জীবনকে যে রকম ভয়াবহ দুঃখকষ্ট আর নির্যাতনের ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় তা যদি ভালো করে মানুষের চোখের সামনে খুলে ধরা হয় তা হলে সে ভয়েই মুষড়ে পড়বে। খুব পাকাপোক্ত আশা-বাদীকেও যদি হাসপাতাল, রুগ্নাবাস, অস্ত্রোপচার-গৃহ অথবা কয়েদখানা, নির্যাতন-কক্ষ, ক্রীতদাসদের আস্তানা, যুদ্ধক্ষেত্র আর বধ্য ভূমি দেখিয়ে আনা হয় আর দুঃখ-দুর্দশার অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলো, যেখানে মানুষের শীতল কৌতূহলী দৃষ্টির বাইরে তা আত্মগোপন করে আছে তা যদি উন্মুক্ত করে দেখানো হয় আর শেষে দেখাতো দেওয়া হয় উগুলিনুর (Ugolino) উপবাস-গুহাগুলো তা হলে সেও "সম্ভাব্য এ সর্বোত্তম পৃথিবীর" স্বরূপ বুঝতে পারবে। আমাদের এ বাস্তব জগৎ থেকে না নিলে দান্তে তাঁর নরক বর্ণনার উপকরণ কোথা থেকে নিয়েছেন? ঐ দিয়েই তিনি নরকের এক যথাযথ চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু তিনি যখন স্বর্গের বর্ণনা দিতে গিয়েছেন তখনই অনতিক্রম্য বাধার হয়েছেন সম্মুখীন; কারণ আমাদের এ বিশ্বে স্বর্গের কোন উপকরণই নেই। যে কোন মহাকাব্য বা নাট্য কাব্য শুধু দেখাতে পারে সুখের জন্য সংগ্রাম, লড়াই আর চেষ্টাটুকুই মাত্র—পরিপূর্ণ আর স্থায়ীসুখ তার পরিধির বাইরে। গন্তব্যের পথে তারা তাদের নায়ক-নায়িকাকে হাজারো বিপদ-আপদের ভিতর দিয়ে নিয়ে যায় বটে কিন্তু লক্ষ্যে পোঁছার উপক্রম হলেই দ্রুত টেনে দেয় যবনিকাটা। কারণ তখন তার আর কিছুই করার থাকে না স্রেফ নায়ক যে উজ্জ্বল গন্তব্যে পোঁছে সুখের সন্ধানের আশা করেছিল তা বিলীন হয়ে গেছে এটুকু দেখানো ছাড়া—এখানে পোঁছে সে দেখে তার অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং।"

বিয়ে করে যেমন আমরা অসুখী তেমনি বিয়ে না করেও অসুখী। একা থাকলেও অসুখী আবার সমাজে থেকেও পাই না সুখ। আমরা শজারুর মতো গাটা একটু গরম করার জন্য একত্রিত হই বটে কিন্তু অস্বস্তি বোধ করি যখন একে অপরের বেশী কাছাকাছি এসে পড়ি আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও করি কষ্টবোধ। এ এক বিরাট পরিহাস এবং "প্রতিটি মানুষের জীবন যদি সামগ্রিক ভাবে দেখা যায়......আর যদি জোর দেওয়া হয় খালি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর তা হলে মনে হবে সত্যিই সব সময় এ এক বিয়োগান্ত ব্যাপার কিন্তু সবটা পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলে মনে হবে এর চরিত্র মিলনাত্মক অর্থাৎ কমেডিই।" ভেবে দেখুন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পাঁচ বছর বয়সে একটা ছেলে ঢোকে কোন সুতাকল কি কারখানায়। সে থেকে তাকে রোজ সেখানে বসে থাকতে হয় প্রথমে দশ ঘন্টা, তারপর বারো ঘন্টা, শেষে চৌদ্দ ঘন্টা আর করতে হয় একই ধরনের যান্ত্রিক শ্রম—এ মূল্য দিয়ে তাকে কিনতে হয় শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার সন্তুষ্টি। এ হচ্ছে লাখ লাখ মানুষের ভাগ্য এবং আরো লাখ লাখ মানুষের ভাগ্যও অবিকল এ রকমই।....আবার আমাদের এ গ্রহের শক্ত আবরণের নীচে এমন শক্তিশালী প্রাকৃতিক শক্তি রয়েছে যে, যে কোন দুর্ঘটনায় তারা যদি একবার ছাড়া পায় তা হলে এ গ্রহের পিঠের উপর যা আছে সবশুদ্ধ ওটাকে ধ্বংস করে ছাড়ে। এর আগে অন্তত তিন তিনবার এ ধ্বংস সাধিত হয়েছে—সামনে হয়ত আরো ঘন ঘন এ ঘটতে থাকবে। লিসবনের ভূমিকম্প, হাইতির ভূমিকম্প আর পম্পেইর ধ্বংস যা ঘটতে পারে খেলাচ্ছলে তার সামান্যতম ইশারা মাত্র।"

এ সবের সামনে 'আশাবাদ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি এক তিক্ত পরিহাস ছাড়া আর কিছুই না আর আমরা লিবনিটজের (Libnitzs) ঈশ্বর বিশ্বাসকে "সুশৃঙ্খলভাবে আশাবাদের এক উদার প্রকাশ বলে" কিছুতেই মনে করতে পারি না, বড় জোর মহান ভল্টেয়ারের অমর গ্রন্থ ক্যানডিডের (Candid) রচনার এই কারণ জুগিয়েছিল এটুকুইমাত্র স্বীকার করে নিতে পারি। যেখানে দুনিয়ার পাপের সপক্ষে লিবনিটজের যে পুনরুক্তি আর যে দুর্বল যুক্তি—সময় সময় মন্দ ও ভালোর কারণ হয়, এ মতবাদ পেয়েছে এক অপ্রত্যাশিত সমর্থন। সংক্ষেপে বলা যায়: "জীবনের যে স্বভাব সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় তার উদ্দেশ্য আমাদের মনে এ ধারণাটাই জাগিয়ে তোলা যে কিছুই আমাদের চেষ্টা, শ্রম আর সংগ্রামের উপযুক্ত নয়, সব ভালোই আত্মম্ভরিতা, পৃথিবীর সব কিছুরই দেউলিয়াপনায় সমাপ্তি আর জীবনটা এমনই এক কারবার যাতে খরচই পোষায় না।"

সুখী হতে হলে তরুণ বয়সের মতই অজ্ঞ হতে হবে। তরুণেরা মনে করে বাসনা কামনা আর চেষ্টা করাতেই রয়েছে আনন্দ—তারা এখনো অতৃপ্ত কামনার ক্লান্তির সন্ধান পায়নি আর সন্ধান পায়নি আশা পূর্ণতা বা তৃপ্তির নিষ্ফলতার। তারা এখনো দেখতে পায়নি অনিবার্য পরাজয়ের চেহারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যৌবনের হর্ষোৎফুল্লতা বা চাঞ্চল্যের আংশিক কারণ এ জন্যে যে আমরা যখন জীবনের পর্বত-চূড়ায় উঠতে থাকি তখন মৃত্যু থাকে অদৃশ্য। ওটা থাকে জীবনের অন্যপ্রান্তের তলদেশে। জীবনের শেষদিকে প্রতিটি দিন আমাদের মনে অবিকল ঐ রকম চেতনাই জাগায় যে চেতনা ফাঁসীর আসামী ফাঁসীকাষ্ঠের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিপদক্ষেপে অনুভব করে থাকে। জীবনটা যে কত সংক্ষিপ্ত তা জানার জন্য দীর্ঘ-জীবনের অধিকারী হতে হয়।......জীবনের ছত্রিশ বছর পর্যন্ত আমরা কিভাবে আমাদের মূল শক্তিকে ক্ষয় করে থাকি তার তুলনা করা চলে যে ব্যক্তি স্রেফ তার টাকার সুদের উপর বেঁচে থাকে তার সঙ্গে—তারা আজ যা খরচ করে আগামীকাল তা আবার পেয়ে যায়। কিন্তু ছত্রিশ বছরের পর থেকে আমাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় যে পুঁজি ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলে তার মতো। ......এ বিপদাশঙ্কায় মানুষ শেষ বয়সে অধিকতর সম্পদ-লোলুপ হয়ে পড়ে।......যৌবন থেকে দূরবর্তী জীবনের এ কালটাই সবচেয়ে সুখের বলে প্লেটো তাঁর রিপাবলিকের সূচনায় যে মন্তব্য করেছেন পুরস্কার যদি দিতে হয় তা বৃদ্ধ বয়সেই দেওয়া উচিত—কথাটা সমীচীন বলেই মনে হয়। কারণ তখনই যাত্র মানুষ পশু-প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, যা এতকাল তাঁকে দেয়নি এতটুকু শান্তি। তা হলেও মনে রাখতে হবে এ প্রবৃত্তির নির্বান ঘটলে জীবনের সত্যিকার শাঁসটুকুও চলে যায়। ফাঁকা খোলস ছাড়া আর কিছুই থাকে না অবশিষ্ট অথবা অন্যদিক থেকে দেখলে জীবন হয়ে পড়ে এমন এক কমেডি যা সত্যিকার অভিনেতাদের দ্বারাই শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু তাকে চালিয়ে নিয়ে শেষ করা হয় অভিনেতাদের পোষাকে সজ্জিত স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক পুতুলের সাহায্যে।"

মৃত্যুই আমাদের শেষ পরিণতি। অভিজ্ঞতা যখন বিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে তখনই দেহ আর মস্তিষ্কেরও শুরু হয় অবক্ষয়। "সব কিছুই কিছুটা দেরি করে বটে কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য কিন্তু মৃত্যুর প্রতি গতি হয় দ্রুত।" মৃত্যু যদি কখনো দেরি করে বা সময় কাটায় তা হচ্ছে অসহায় ইন্দুরকে নিয়ে বিড়াল যেমন খেলা করে আমাদের নিয়ে মৃত্যুরও ঐ হচ্ছে অনুরূপ খেলা। "এ খুবই স্পষ্ট যে আমাদের হাঁটা তো কিছুই না বরং পড়ে যাওয়ার হাত থেকে অবিরাম আত্মরক্ষার চেষ্টাই। তেমনি আমাদের জৈব-জীবনও স্রেফ মৃত্যুকে অবিরাম বাধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়াই শুধু—মৃত্যুটাকে বিলম্বিত করারই এক চির-চেষ্টা। প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের দামী দামী অলঙ্কার আর অঙ্গ-ভূষণের সঙ্গে বেশ মূল্যবান বিষের শিশিও একটা থাকে।" প্রাচ্য-দর্শন মৃত্যুর সর্ব-ব্যাপ্তী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাই তার ছাত্রদের দিয়েছে এক শান্ত আর শোভন মন্থরতা যার উৎপত্তি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সংক্ষিপ্ততার চেতনা থেকেই। মৃত্যু-ভয়েই দর্শনের শুরু আর তাই ধর্মেরও মূল কারণ। সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে পারে না, তাই সে বানায় সংখ্যাতীত দর্শন আর শাস্ত্র—অমরতায় বিশ্বাসের প্রচলন ভীষণ মৃত্যু-ভয়েরই পরিচায়ক।

শাস্ত্র যেমন মৃত্যু থেকে পলায়ন তেমনি উন্মাদ অবস্থাও বেদনা থেকে পলায়ন। "পাগলামি আসে বেদনার স্মৃতিকে পরিহার করার উপায় হিসেবেই"—এ যেন চেতনার সূতায় আত্ম-রক্ষামূলক ছেদ। কোন কোন অভিজ্ঞতা বা ভয়-ভীতিকে স্রেফ ভুলে গিয়েই আমরা পারি বাঁচতে।

"যা অতিমাত্রায় আমাদের স্বার্থ-হানি করে, আমাদের অহঙ্কারবোধকে আঘাত করে বা আমাদের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সে সবকে কত অনিচ্ছার সাথেই না আমরা স্মরণ করে থাকি। সযত্নে আর গভীরভাবে যাচাই করে দেখার জন্য এসবকে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার সামনে তুলে ধরতে কি বেগই না পেতে হয়।......ইচ্ছা তার বিপরীত যা কিছু তাকে মন বা বুদ্ধির সামনে স্থাপনে যে বাধা দেয় সে বাধা যদি এতখানি প্রবল হয় যে তাতে বোধ শক্তির সার্বিক ক্রিয়া ব্যাহত হয় তা হলে কোন কিছু বা কোন অবস্থা বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের কাছে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায় কারণ ইচ্ছা তার চেহারা সহ্য করতে পারে না। এর পরই প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ যোজনার জন্য—যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিল তখন তা ইচ্ছামতো পূরণ করা হয়। এ অবস্থায় দেখা দেয় পাগলামি। কারণ বুদ্ধি এখন ইচ্ছার ইচ্ছা-পূরণেই ত্যাগ করেছে নিজের স্বভাব—তাই লোকটা এখন যার কোন অস্তিত্ব নেই তা কল্পনা করতে থাকে। তবুও এভাবে যে পাগলামির শুরু তাই হচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণার এক বিস্মৃতি সাগর, এ হচ্ছে বিব্রত স্বভাব তথা ইচ্ছার অন্তিম দাওয়াই।"

চরম আশ্রয় হচ্ছে আত্মহত্যা। তাজ্জবের বিষয়, অবশেষে এখানে এসে চিন্তা আর কল্পনা সহজাত প্রবৃত্তিকে জয় করে বসে। ডায়োজেনিস (Diogenes) নাকি স্রেফ শ্বাস গ্রহণ করতে অস্বীকার করেই বরণ

২৬—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন মৃত্যু—বাঁচার কামনার উপর কি এক বিজয়। কিন্তু এ জয় তো শুধু ব্যক্তিগত—প্রজাতির (Species) মধ্যে বাঁচার ইচ্ছা চির অব্যাহত। জীবন আত্মহত্যা সম্বন্ধে হাস্যমুখর হয়ে ওঠে আর মৃত্যুকেও উড়িয়ে দেয় হেসে। কারণ একটা ইচ্ছাকৃত মৃত্যুর মোকাবিলায় হাজার হাজার অনিচ্ছাকৃত জন্ম ঘটছেই। "আত্মহত্যা তথা একটি বিশেষ অস্তিত্বের বিনাশ স্রেফ এক অনর্থক নিবুদ্ধিতা-কারণ জাতি, জীবন আর ইচ্ছা এর দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হয় না আর এগুলিই হচ্ছে সার-বস্তু। এমন কি যে জল-ফোঁটার ফলে রামধনুর সৃষ্টি সে জল ফোঁটার দ্রুত পতন সম্ভাবনার সামনেও সে মুহূর্তে রামধনু টিকে থাকে।" ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও দুঃখ-দুর্দশা আর সংগ্রাম চলতেই থাকে এবং যতদিন ইচ্ছার প্রাধান্য থাকবে ততদিন চলতেই থাকবে। ইচ্ছা যতদিন জ্ঞান আর বুদ্ধির পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার না করবে ততদিন জীবনের এ দুঃখ দুর্গতির উপর জয়লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়।

AMARBOI.COM

৬ : জীবনের বিজ্ঞতা (The Wisdom of Life)

ক. দর্শন

পার্থিব সম্পদলিপ্সার অসঙ্গতিটাই সর্বাগ্রে ভেবে দেখা যাক। ধন-সম্পদের অধিকারী হলেই তাদের সব বাসনা চরিতার্থ হবে এ শুধু আহাম্মকেরই বিশ্বাস—সম্পদের অধিকারীকে মনে করা হয় সব রকম বাসনা পূরণেরও মালিক বলে। "যে সব কিছুর চেয়ে টাকাই চায় আর টাকাকেই বেশী ভালোবাসে লোকে তার নিন্দা করে থাকে কিন্তু এটা স্বাভাবিক আর অনিবার্য যে এমন লোকেরা বস্তুকে ভালোবাসবেই যা অক্লান্ত প্রোটিউসের (proteus—গ্রীক সমুদ্র দেবতা) মতো মানুষের বিচিত্র আর এলোমেলো যা তা ইচ্ছা যখন তখন পূরণে সক্ষম অর্থাৎ যে টাকা দিয়ে মানুষ যা চায় তা-ই পেতে পারে, সে টাকাকে মানুষ না ভালোবেসে পারে না। অন্য সব কিছু মানুষের কোন একটা ইচ্ছাই মাত্র পূরণ করতে সক্ষম : অর্থ এ কারণে পরিপূর্ণ মঙ্গল যে তা দিয়ে সব ইচ্ছাই হয় পূরণ—সব বাসনা পূরণের ঐ এক মূর্ত প্রতীক।" তা হলেও টাকাকে আনন্দে রূপান্তরিত করার কৌশল জানা না থাকলে যে জীবন শুধু অর্থ সংগ্রহেই নিয়োজিত সে জীবনকে ব্যর্থই বলতে হবে—এটা রীতিমতো এক শিল্প,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর জন্য চাই বিজ্ঞতা আর সংস্কৃতিবোধ। ক্রমাগত ইন্দ্রিয়চর্চা কখনো দীর্ঘকাল ধরে তৃপ্তি দিতে পারে না—মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাতেই হবে আর বুঝতে হবে উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় আয়ত্তের কলা-কৌশল। "মানুষ সংস্কৃতিবান হতে যত না চেষ্টা করে তার হাজার বার বেশী চেষ্টা করে ধনী হওয়ার জন্য অথচ মানুষের যা আছে (অর্থাৎ ধন-সম্পদ) তা মানুষকে সুখী করে না বরং মানুষটা যে রকম তাই তার সুখের কারণ হয়। যে মানুষের কোন মানসিক দাবী নেই তাকেই বলা হয় অশিক্ষিত সংকীর্ণ-মনা"—এমন লোক অবসর কি করে কাটাবে তাই জানে না। এমন লোকের পক্ষে: "অবসর সময় শান্ত থাকাই কঠিন"—অত্যন্ত লুব্ধ-চিত্তে সে স্থান থেকে স্থানান্তরে নব নব ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের সন্ধান করে ফিরে। অবশেষে তাকে পেয়ে বসে অলস ধনী বা বেপরওয়া লম্পটের নিয়তি—যার নাম বিষণ্ন-অবসাদ।

ধন নয় বিজ্ঞতাই জীবনের পথ। "মানুষ একই সঙ্গে ইচ্ছার এক প্রচণ্ড সংগ্রামী মূর্তি (যার প্রধান কেন্দ্র-বিন্দু প্রজনন-প্রক্রিয়া) আর খাঁটি জ্ঞানের চিরন্তন, স্বাধীন ও শোভন প্রতিমূর্তি (যার কেন্দ্র বিন্দু মস্তিষ্ক)।" আশ্চর্য, ইচ্ছা থেকেই যে জ্ঞানের উৎপত্তি সে জ্ঞানই আবার ইচ্ছার উপর চালায় শাসন। জ্ঞানের স্বাধীনসত্তার সম্ভাব্যতার প্রথম পরিচয় দেখা গেলো যখন ইচ্ছা বা বাসনার নির্দেশের প্রতি সময় সময় বুদ্ধির ঔদাসিন্য হলো লক্ষ্য-গোচর। "সময় সময় বুদ্ধি ইচ্ছার তাঁবেদারি করতেই অস্বীকার করে বসে: যেমন, কোন বিষয়ে মন বসাতে চেষ্টা করে আমরা ব্যর্থ হয়ে থাকি অথবা স্মরণ রাখা এমন বিষয়ও যখন চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারি না। এ রকম অবস্থায় মন বা বুদ্ধির উপর ইচ্ছার যে ক্রোধ তা থেকেই উভয়ের সম্পর্ক আর তাদের পার্থক্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বস্তুত এ ক্রোধের ফলে বিরক্ত হয়েই যেন বুদ্ধি সময় সময় যা চাওয়া হয়েছিল তা অসময়ে কয়েক ঘন্টা পরে নেহাৎ অনধিকারীর মতই এনে হাজির করে—এমন কি অপ্রত্যাশিতভাবেও অকারণে হয়ত নিয়ে এলো পরদিন ভোরে।" এ অসম্পূর্ণ বশ্যতার সীমা ছাড়া বুদ্ধি প্রাধান্যও অর্জন করতে পারে। "অনেক সময় কোন পূর্ব চিন্তার ফলে অথবা স্বীকৃত কোন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষ এমন সব নির্যাতন ভোগ করে অথবা শান্ত-চিত্তে এমন কিছু করে বসে যার ফল তার পক্ষে ভীষণ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠেঃ আত্মহত্যা, ফাঁসী, দ্বৈত-যুদ্ধ, জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে, এমন সব উদ্যোগ গ্রহণ এবং সাধারণভাবে যার বিরুদ্ধে তার সমগ্র জৈব-স্বভাব বিদ্রোহ করে। এ রকম অবস্থায় যুক্তি জৈব-স্বভাবকে কতখানি দমিত করতে সক্ষম তা আমরা দেখতে পাই।"

ইচ্ছার উপর বুদ্ধির বা মননের প্রাধান্য পরিকল্পিত উন্নয়নের সহায়ক—জ্ঞানের দ্বারা বাসনাকে সংযত বা শান্ত করা যায়। সর্বোপরি তা করা যায় প্রাক্তনবাদী দর্শনের দ্বারা, যে দর্শনের বিশ্বাস সব কিছুই অনিবার্য পূর্বতন কর্ম-ফল। "যা কিছু আমাদের মনে বিরক্তির সঞ্চার করে তার সব কারণ যদি আমরা ভাল করে জানতাম তা হলে তার দশ ভাগের ন' ভাগই তা করতো না, ফলে আমরা তাদের প্রয়োজন আর সত্যকার স্বভাবও বুঝতে পারতাম।......অবাধ্য ঘোড়ার পক্ষে লাগাম আর বল্গা যেমন তেমনি ইচ্ছার পক্ষে বুদ্ধি বা মনন। ভিতর আর বাইরের যে কোন প্রয়োজনে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই আমাদেরে পুরোপুরি পোষ মানাতে পারে না।" প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে আমাদের উপর তাদের কর্তৃত্বও ততই কমে যাবে আর "আত্ম-সংযম ছাড়া বাহ্যিক বিষয়ের প্রভুত্ব থেকে আর কিছুই আমাদেরে রক্ষা করতে পারবে না।" সেনেকা (Seneca) বলেছেন: "যদি সব কিছুকে তোমার অধীন করতে চাও তা হলে নিজেকে যুক্তির অধীন কর।" পৃথিবীর সব চেয়ে পরমাশ্চর্য মানুষ বিশ্ববিজয়ী নয় বরং আত্মজয়ী।

কাজেই দর্শনই বাসনাকে নির্মল করে। কিন্তু দর্শনকে চিন্তা আর অভিজ্ঞতার মত করেই বুঝতে হয়—শুধু বই পড়ে বা নিষ্ক্রিয় অধ্যয়নে কোন লাভ নেই।

"সব সময় অন্যের চিন্তা স্রোত আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকলে স্বভাবতই তা আমাদের চিন্তাকে সীমিত করে চেপে রাখবে। শেষকালে তা আমাদের চিন্তাশক্তিকে পর্যন্ত পঙ্গু করে ফেলবে।......মনের দারিদ্র্যের ফলে অনেক পণ্ডিতের মনটা হয়ে পড়ে যেন এক শোষণযন্ত্র, ফলে তা নিজের দিকে সজোরে টেনে নেয় অপরের সব চিন্তা।......কোন বিষয়ে আগে চিন্তা না করে সে সম্বন্ধে পড়তে যাওয়া বিপজ্জনক।......আমাদের পড়তে যাওয়া মানে অপরকে আমাদের হয়ে চিন্তা করতে দেওয়া, আমরা শুধু তার বা তাদের মানসক্রিয়াটারই পুনরাবৃত্তি করি।......কাজেই সিদ্ধান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ায় এ যে—যদি কেউ সারাদিন ধরে পড়তে থাকে....আস্তে আস্তে সে চিন্তা করার শক্তিই হারিয়ে বসে।....পৃথিবীর অভিজ্ঞতাকে মনে করা যায় মূলগ্রন্থ আর চিন্তা আর জ্ঞানকে তার ভাষ্য। অভিজ্ঞতা ছাড়া যদি অতিরিক্ত চিন্তা আর মানসিক জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে তার ফল ঐ রকম বইর সঙ্গেই তুলনা করা যায় যে বইর প্রতি পৃষ্ঠায় থাকে দু' লাইন মাত্র মূল রচনা আর চল্লিশ লাইন ভাষ্য।"

তাই প্রথম কথা : বইর আগে জীবন। দ্বিতীয় কথা : ভাষ্যের আগে মূলগ্রন্থ। সমালোচক আর ভাষ্যকারদের না পড়ে বরং স্রষ্টাদের পড়ো। "কেবলমাত্র গ্রন্থকারদের থেকেই আমরা দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পেতে পারি। কাজেই যিনি দর্শনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন তাঁর উচিত দর্শনের অমর শিক্ষকদের তাঁদের রচনার প্রশান্ত পবিত্রতার মধ্য থেকেই খুঁজে বের করা।" প্রতিভাবানের একটি রচনা হাজারো ভাষ্যের সমতুল্য।

এ সীমিত পরিবেশে বইপুস্তকের মারফত যে সংস্কৃতিচর্চা তাও মূল্যবান বই কি, কারণ আমাদের সুখ নির্ভর করে আমাদের পকেটে যা আছে তার উপর নয় বরং আমাদের মাথায় যা আছে তার উপর। এমন কি খ্যাতিও একরকম নির্বুদ্ধিতা : "অপরের মস্তিষ্ক কারো সত্যিকার সুখের উপযুক্ত স্থান নয়।"

"একজনের কাছে আর একজন কতখানি তা খুব গুরুতর ব্যাপার নয়—পরিণামে সকলকেই একা, নিসঙ্গ দাঁড়াতে হয়। যিনি একা দাঁড়িয়েছেন তিনি কে—এটাই গুরুত্বপূর্ণ।......আমাদের চারদিকের পরিবেশ থেকে যে সুখ আমরা পাই তার চেয়ে নিজের থেকে যে সুখ পাই তা অনেক বড়। যে পৃথিবীতে আমি বাস করছি আমার দৃষ্টিভঙ্গী মতই তা গড়ে ওঠে।....যা কিছু আছে বা যা কিছু ঘটে তার অস্তিত্ব মানুষের চেতনায় আর তা ঘটে লোকের একক জীবনে তাই মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার চেতনার গঠনতন্ত্র।....কাজেই এরিস্টোটল পরম সত্য কথাই বলেছেন : "সুখী হওয়া মানে আত্মনির্ভর হওয়া।"

অশেষ বাসনার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধির সাথে ভাবা আর সব দেশের সব কালের মহৎজনের সাফল্য আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহত্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়া—এসব মহৎ ব্যক্তিদের জীবন এমন অনুরাগী-দের জন্যই উৎসর্গিত। "এ বাসনাময় পৃথিবীর নিবুদ্ধিতার যত সব ত্রুটির উর্ধ্বে নিস্বার্থ বুদ্ধি যেন সুরভির মতো উঠতে থাকে।" অধিকাংশ মানুষ কাম্য বস্তু হিসেবে ছাড়া কিছুর দিকেই তাকাতে পারে না—এ কারণেই তাদের এত দুঃখ দুর্গতি। কিন্তু কোন বস্তুর প্রতি যদি স্রেফ বুঝবার বস্তু হিসেবেই তাকানো যায় তা হলেই নাগাল পাওয়া যায় স্বাধীন-তার। "যখন কোন বাহ্যিক কারণ বা আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইচ্ছার অসীম স্রোত থেকে আমাদেরে উপরে তুলে নেয় আর ইচ্ছার দাসত্ব-মুক্ত করে দেয় জ্ঞানের সন্ধান তখন আমাদের মন আর ইচ্ছার উদ্দেশ্য হাসিলের দিকে তাকায় না বরং বাসনা-মুক্ত হয়েই বুঝতে চায় কোন কিছু। এভাবে স্বার্থ আর ব্যক্তিমুখী দৃষ্টির বন্ধন কেটে সম্পূর্ণ বস্তুগতভাবেই গ্রহণ করা হয় তাকে তখন উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে এ সবকে স্রেফ ভাবের প্রতীক হিসেবে নিয়ে তাতেই পুরোপুরি ন্যস্ত হয় মনোযোগ। তখনই যে শান্তির ব্যর্থ সন্ধানে আমরা এতকাল বাসনার পথে বিচরণ করেছি সে শান্তি এখন আমাদের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় এবং এখন তা আমাদেরও হয়ে ওঠে প্রিয়। এ দুঃখহীন অবস্থাকেই ইপিকুরাস (Epicurus) সর্বোত্তম কাম্য আর দেবতুল্য বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ সময় আমরা হয়েছি বাসনার দুঃসহ সংগ্রাম-মুক্ত, ইচ্ছা বা বাসনার দাসত্বের দণ্ড-ভোগ থেকে 'বিশ্রাম দিবস' (বা Sabbath) পালনের পেয়েছি অধিকার: এবার থেমে পড়েছে ইক্সিয়নের (Ixion)* ঘূর্ণায়মান চাকা।"

খ ঃ প্রতিভা

প্রতিভা মানে বাসনাহীন জ্ঞানের উচ্চতম রূপ। জ্ঞানহীন বাসনা-সর্বস্ব হচ্ছে সবচেয়ে নিম্নতম পর্যায়ের। সাধারণত মানুষ বড্ড বেশী বাসনাময়। এমন মানুষে জ্ঞানের সন্ধান মিলে খুব কম। কিন্তু প্রতিভাবান হলো এর বিপরীত—তাঁদের মধ্যে দেখা যায় জ্ঞানের আধিক্য আর বাসনার স্বল্পতা। "বাসনার দাবীকে ছাড়িয়ে যাঁর মধ্যে জানবার বৃত্তি অধিকতর

* Ixion : গ্রীক পুরান মতে ইক্সিয়ন জুপিটারের কাছ থেকে জুনোকে (junno) কেড়ে নিতে চেয়েছিল এ অপরাধের দণ্ড হিসেবে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এক চির ঘূর্ণায়মান চাকার সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকাশ লাভ করেছে তিনিই প্রতিভা বা প্রভিতাবান।” এর জন্য প্রয়োজন প্রজনন-শক্তির কিছুটা অংশ মননশীল ক্রিয়া-কলাপে স্থানান্তর। “প্রতিভার এক মৌলিক শর্তই হলো প্রজনন-শক্তির উপর অনুভূতি আর উদ্দীপনার প্রাধান্য।” এ কারণেই প্রতিভা আর নারীর মধ্যে বিরাজ করছে এক চির-শত্রুতা—নারী হলো প্রজনন আর মননশীলতাকে বাসনার অধীন করে বাঁচার হাতিয়ারে পরিণত করার প্রতীক। “মেয়েরা মেধাবী হতে পারে কিন্তু কখনো হতে পারে না প্রতিভার অধিকারী। কারণ তারা সব সময় থাকে অধীন”—তাদের কাছে সবই ব্যক্তিগত আর মনে করে সব কিছুকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবে। অন্যদিকে—

“প্রতিভা মানে তন্ময়তা (Objectivity) অর্থাৎ ঐ হচ্ছে মনের বস্তুমুখীনতারই এক নাম।······নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ,বাসনা আর উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারার শক্তিই প্রতিভা, নিজের জানার শক্তিটাকে নিষ্কলুষ আর পৃথিবী সম্বন্ধে দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রেখে সাময়িকভাবে নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারাই প্রতিভার ধর্ম।....প্রতিভার বাহ্যিক চেহারায় প্রকাশ ঘটে বাসনার উপর জ্ঞানের সুস্পষ্ট ও লক্ষ্যযোগ্য প্রাধান্যের অভিব্যক্তি। আর সাধারণের চেহারায় দেখা যায় বাসনারই প্রাধান্যের চাপ আর দেখা যায় জ্ঞান তাদের নিকট সক্রিয় হয়ে ওঠে একমাত্র বাসনার তাগাদায় আর তা পরিচালিতও হয় স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থ আর সুযোগ-সুবিধার খাতিরে।”

একমাত্র বাসনা-মুক্ত হলেই বুদ্ধি বস্তুকে স্ব-স্বরূপে দেখতে পায়—“প্রতিভা যেন আমাদের সামনে তুলে ধরে এমন এক যাদু দর্পণ যাতে যা কিছু অত্যাবশ্যক আর গুরুত্বপূর্ণ তাই সংগৃহীত হয়ে একসঙ্গে প্রতিফলিত হয় স্বচ্ছ আলোয় এবং যা অনাবশ্যক আর আকস্মিক তা হয় পরিত্যক্ত।” সূর্যকিরণ যেমন মেঘ রাশিকে বিদীর্ণ করে আলো ছড়ায় চিন্তাও তেমনি প্রবৃত্তিকে বিদীর্ণ করে বস্তুর অন্তরটাই করে দেয় প্রকাশিত। ব্যক্তি আর বিশেষ কোন ‘অনাসক্ত ভাবের’ অর্থাৎ বিশ্বজনীন সারবস্তুর পশ্চাতে থেকে চিন্তা তার স্বরূপকেই করে উদঘাটন যেমন চিত্রকর যে ব্যক্তির ছবি আঁকে শুধু তার ব্যক্তিগত চরিত্র আর চেহারাই দেখে না দেখে বিশ্বজনীন কোন গুণ আর স্থায়ী বাস্তবতা যার প্রকাশের জন্য ব্যক্তিকে স্রেফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপায় হিসেবেই সে করে ব্যবহার। যে কোন উদ্দেশ্যের সার ও সার্বজনীন সত্যের নিরপেক্ষ আর স্বচ্ছ উপলব্ধিতেই নিহিত প্রতিভার রহস্য।

এ ব্যক্তিগত আকর্ষণ-নিরপেক্ষ বলেই এ ইচ্ছাময়, বাস্তব আর ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত পৃথিবীতে প্রতিভা নিজেকে খাপ খাওয়াতে অক্ষম হয়। বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পায় বলে নিকটকে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না —তিনি অবিবেচক আর "অদ্ভুত", দৃষ্টি তাঁর তারকায় নিবদ্ধ বলে তাঁর পতন হয় কুঁয়ায়। এর ফলেই প্রতিভা অনেকখানি অসামাজিক—তিনি ভাবেন যা মৌলিক যা চিরন্তন আর সার্বজনীন তার কথা আর অন্যরা ভাবে ঐ সব বিষয় যা অস্থায়ী, সুনির্দিষ্ট আর আশু-লভ্য। এ দুই মনের কোন সাধারণ ক্ষেত্র নেই বলে তাদের কখনো মিলন ঘটে না। "সাধারণত যারা মননশীলতায় দরিদ্র আর ইতর-স্বভাব তারাই সে অনুপাতে হয়ে থাকে সামাজিক।" প্রতিভা নিজের ক্ষতিপূরণে সক্ষম—যে সব লোক বাহ্য জগতের উপর চির নির্ভরশীল তাদের মতো তার হয় না সঙ্গের প্রয়োজন। "সব রকম সৌন্দর্য থেকে তিনি পান আনন্দ, শিল্প তাঁকে দেয় সান্ত্বনা আর শিল্পীদের উদ্দীপনা তাঁকে জীবনের দুশ্চিন্তা ভুলতে সহায়তা করে" আর "চেতনার স্বচ্ছতার সঙ্গে সঙ্গে যে অনুপাতে তাঁর দুর্ভোগ বেড়ে যায় তার এবং বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে তাঁর যে মরুভূমির নির্জনতা এ সবেরও ক্ষতিপূরণ হয় তাতে।"

AMARBOI.COM

ফলে অনেক সময় প্রতিভা নির্জন বাসে বাধ্য হন—এমন কি কোন কোন সময় তিনি হয়ে পড়েন উন্মত্ততার শিকার। যে অত্যধিক অনুভূতিশীলতা কল্পনা আর সহজাত-প্রবৃত্তির সহযোগে তাঁকে বেদনার্ত করে তোলে তার সঙ্গে নির্জনতা আর বেখাপ জীবনের সম্মিলন ঘটে তখন তাঁর মনের সব বাস্তব-বন্ধনই হয়ে যায় ছিন্ন। এরিস্টোটলের একথাও সত্য : "যে সব লোক দর্শনে, রাজনীতিতে, কাব্যে অথবা শিল্পে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে তারা সবাই বিষণ্ন-স্বভাবের লোক।" প্রতিভার সঙ্গে যে পাগলামির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে "তার প্রমাণ তো রুশো, বায়রণ, আলফাইরি (Alfieri) প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিদের জীবনীতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।" "পাগলা-গারদে বেশ অধ্যবসায়ী গবেষণা চালিয়ে আমি এমন বহু ব্যক্তিগত রোগীকেই দেখেছি যাদের মধ্যে নিঃসন্দেহ মেধার পরিচয় আমি পেয়েছি এবং তাদের প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে পাগলামিতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও বলতে হবে মানবজাতির সত্যকার আভিজাত্য এ আধ-পাগলা প্রতিভাবানদের মধ্যেই নিহিত। "বুদ্ধির ব্যাপারে প্রকৃতি অতি বেশী আভিজাত্য সচেতন। সব দেশেই জন্ম, পদ, সম্পদ বা জাতিগত যে কৌলিন্য তার চেয়ে অনেক বেশী উর্ধ্বে স্থাপিত বুদ্ধি তথা প্রতিভার কৌলিন্য। প্রকৃতি অতি অল্পসংখ্যককেই করেছে প্রতিভার অধিকারী কারণ এরকম মনমেজাজ সাধারণ জীবন-যাপনের প্রতিবন্ধক, যে জীবন যাপনের প্রয়োজন নির্দিষ্ট ও আশু বিষয়ে মনসংযোগ। "বস্তুত প্রকৃতির উদ্দেশ্য এমন যে—পণ্ডিতেরাও করুক ভূমি কর্ষণ। সত্যই দর্শনের অধ্যাপকের মূল্যায়ন এ মানদণ্ডেই হওয়া উচিত। তা হলেই তাঁদের সাফল্য যে সব রকম যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশায় গিয়ে পেঁ ৗচেছে তা দেখা যাবে।"

গ ঃ শিল্প (Art)

জ্ঞানকে ইচ্ছার দাসত্ব থেকেমুক্ত করে, ব্যক্তির অহংবোধ ও পার্থিব স্বার্থের বিস্মৃতি সাধন করে মনকে সত্যের ইচ্ছা-হীন তথা নিঃস্বার্থ ধ্যানে উন্নীত করাই শিল্পের কাজ। যে বৈশ্বিক ব্যাপারে বহু সবিশেষের স্থান রয়েছে তাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আর শিল্পের উদ্দেশ্য এমন সবিশেষের যাতে রয়েছে সার্বজনীনতা। যেমন উইঙেকলম্যন (Winckelman) বলেছেন "এমন কি প্রতিকৃতিটাও ব্যক্তির আদর্শ হওয়া চাই।" জীব-জন্তুর চিত্রেও প্রধানতম বৈশিষ্ট্যকেই অধিকতম সুন্দর মনে করা হয় কারণ জাতি বা শ্রেণী গুণ তাতেই অধিকতর প্রকাশিত। কোন শিল্প-কর্ম তখনই সার্থক যখন এবং যে অনুপাতে তাতে তার শ্রেণী বা জাতের সার্বিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ প্রতিফলিত হয়। মানুষের ছবি আঁকতে হলে যতদূর সম্ভব মানুষের বিশেষ বা সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বা গুণ ফুটিয়ে তুলতে হয়—নিখুঁত ফটোগ্রাফীর সাহায্যে তা সম্ভব নয় এবং সেটা ছবি আঁকার লক্ষ্যও হওয়া উচিত নয়। শিল্প বিজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কারণে যে—বিজ্ঞান বহু পরিশ্রমে, বহু যুক্তিপ্রমাণ জড়ো করে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে কিন্তু শিল্প সহজাত বৃত্তি ও উপলব্ধির সাহায্যে মুহূর্তে পেঁৗছে যায় লক্ষ্যে। কিছুটা মানসিক মেধা থাকলেই বিজ্ঞানের চলে কিন্তু শিল্পের জন্য চাই প্রতিভা।

কবিতা এবং চিত্র-শিল্পের আনন্দের মতো, প্রকৃতি কল্পনা থেকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তেমন আনন্দ পেতে পারি যদি তার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার মিশ্রণ না ঘটে। শিল্পীর কাছে রাইন নদী মনোমুগ্ধকর বিচিত্র দৃশ্য পরম্পরা হয়েই দেখা দেয়, জাগিয়ে তোলে তার অনুভূতি ও কল্পনায় সৌন্দর্যবোধ কিন্তু যে পথিক তার ব্যক্তিগত বৈষয়িক নিয়েই মগ্ন তার কাছে—"রাইন আর তার দুই তীর সে দেখবে স্রেফ লাইন হিসেবেই—আর সেতুগুলিকে মনে হবে লাইন ভঙ্গ।" শিল্পী ব্যক্তিগত বিষয় থেকে নিজেকে এতখানি মুক্ত রাখতে সক্ষম যে—"সূর্য্যাস্তকে সে কারাগার থেকে দেখুক কি রাজপ্রাসাদ থেকে তার শিল্পীসত্তার কাছে তার আবেদন একই। ইচ্ছা-বিমুক্ত এ উপলব্ধির করুণার ফলেই অতীত আর দূরতম ও মোহনীয় হয়ে উঠে আর আমাদের সামনে তাকে করে তোলে আলোকোজ্জ্বল।" এমন কি বিরুদ্ধ বস্তু সম্বন্ধেও যদি আমরা নির্লিপ্তভাবে ভাবতে থাকি আর আকস্মিক বিপদের যদি কোন আশঙ্কা না থাকে তা হলে তাও আমাদের কাছে মহৎ মনে হয়। অনুরূপভাবে ট্রেজেডি বা বিয়োগান্ত ঘটনা ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টিতে সক্ষম—কারণ তা ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের দুঃখ-কষ্টকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখার সুযোগ দিয়ে থাকে। যা ক্ষণস্থায়ী ও ব্যক্তিগত তার পেছনে যে চিরন্তনতা ও সার্বজনীনতা আছে তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে শিল্প জীবনের দুঃখ দূর করে থাকে। স্পিনোজার এ উক্তি মিথ্যা নয়ঃ "মন যে কোন কিছুর চিরন্তন দিক যতখানি দেখতে পায় ততটুকু অংশই সে গ্রহণ করে চিরন্তনতায়।"

মানুষকে ইচ্ছা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার শিল্পের এ যে শক্তি তা পুরোপুরি রয়েছে সংগীতের "সংগীত অন্য শিল্পের মতো শুধু ভাবের অনুকরণ নয়" বা বস্তুর আসল স্বরূপও তা নয় কিন্তু তা "ইচ্ছারই নকল"—চিরন্তর গতিশীল, প্রয়াসী, ভ্রাম্যমান ইচ্ছাকেই তা আমাদের সামনে তুলে ধরে—যে ইচ্ছা বার বারই নিজের কাছে ফিরে এসে আবার নতুনভাবে হয়ে ওঠে প্রয়াসশীল। "এ কারণেই অন্য শিল্পের তুলনায় সংগীত অধিকতর শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী—অন্য শিল্প প্রকাশ করে স্রেফ ছায়া কিন্তু সংগীত প্রকাশ করে স্বয়ং বস্তুটাকে অর্থাৎ ইচ্ছাকেই।" সংগীত প্রত্যক্ষভাবে আমাদের অনুভূতিকেই প্রভাবিত করে ভাবের পথে নয়—এও অন্য শিল্পের সঙ্গে তার এক বড় পার্থক্য। তার আবেদন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মননের চেয়ে সূক্ষ্মতর এমন কিছুর প্রতি। গঠন-শিল্পে যেমন সামঞ্জস্য, সংগীতে তেমনি ছন্দ বা তাল লয়—তাই সংগীত আর স্থাপত্য দুই বিপরীত প্রান্তে দণ্ডায়মান। গ্যেটে বলেছেন—স্থাপত্য হচ্ছে ঘনীভূত সংগীত, নীরবে দণ্ডায়মান ছন্দেরই নাম সামঞ্জস্য।

ঘ : ধর্ম

পরিণত বুদ্ধি শোপেনহাওয়ার বুঝতে পেরেছিলেন শিল্প সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা—ইচ্ছা বিমুক্ত হয়ে যা চিরন্তন আর সার্বজনীন তারই ধ্যান করা—ধর্মেরও সে একই রকম ধারণা ও উপলব্ধি। প্রথম বয়সে তিনি মোটেও ধর্ম শিক্ষা পাননি—তাঁর যুগের যাজকীয় ও শাস্ত্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিও তাঁর মনে কোন শ্রদ্ধারভাব ছিল না। শাস্ত্র ব্যবসায়ীদের তিনি রীতিমতো অশ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মতে বিভিন্ন জাতিতে দেখা যায় "এ শাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই যেন ধর্মের এক চরম গড়পড়তা মানদণ্ড বা খুঁটি" আর তিনি বলেছেন ধর্ম হচ্ছে "জনগণের পরাবিদ্যা।" কিন্তু জীবনের শেষের দিকে তিনি ধর্মের কোন কোন বিশ্বাস আর অনুষ্ঠানের যে একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন: "আমাদের সময় যুক্তিবাদী আর অলৌকিকতাবাদীদের মধ্যে সুদীর্ঘ এক অধ্যবসায়ী বিতর্ক চলেছিল তার কারণ হচ্ছে ধর্মের রূপক-স্বভাব বুঝতে না পারারই ফল।" খ্রীস্টধর্ম এক গভীর দুঃখবাদেরই দর্শন—"আদি পাপে বিশ্বাস (ইচ্ছা বা বাসনার আত্মঘোষণা) আর মোক্ষ বা বাসনার অস্বীকৃতি), এ দুই সত্য নিয়েই খ্রীস্টধর্ম।" যে সব বাসনা কামনার পরিণতি সুখ নয় বরং যা মোহভঙ্গের বা বাসনা-বৃদ্ধির কারণ সে সবকে দুর্বল ও হতবল করার এক প্রধান উপায় হচ্ছে উপবাস। "যে শক্তির বলে খ্রীস্টধর্ম প্রথমে য়ুহুদী ধর্মের, পরে গ্রীস-রোমের পৌত্তলিকতার উপর জয়ী হতে সক্ষম হয়েছিল তা পুরোপুরি এ দুঃখবাদেই নিহিত, নিহিত নিজের দুর্দশা ও পাপের স্বীকৃতিতে। য়ূহুদীধর্ম আর পৌত্তলিকতা উভয়ে আশাবাদী" তারা মনে করে ধর্ম হচ্ছে এ পার্থিব জীবনে সাফল্যের জন্য স্বর্গীয় শক্তিকে স্রেফ ঘুষ দান আর খ্রীস্টধর্ম মনে করে ধর্মের উদ্দেশ্য অনাবশ্যক পার্থিব সুখ-সন্ধানের প্রবৃত্তিকে সংযত করা, বাধা দেওয়া। সব রকম পার্থিব ক্ষমতা আর বিলাসের মাঝখানে তা সাধু-সন্তের আদর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে—"আহম্মক যিশু খ্রীস্টকেই তুলে ধরেছে, যিনি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছেন আর সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেছেন ব্যক্তিগত বাসনা-কামনাকে। বৌদ্ধধর্ম খ্রীস্টধর্ম থেকেও গভীরতর এ কারণে যে তার সার্বিক ধর্মবোধের ভিত্তিই বাসনার বিনাশসাধন আর ঐ ধর্মে সব রকম আত্মোন্নতির লক্ষ্যই হচ্ছে নির্বান। হিন্দুরা য়ুরোপীয় চিন্তাবিদদের থেকে গভীরতর, কারণ তাদের বিশ্ব-ব্যাখ্যা আভ্যন্তরীণ ও সহজাত-বৃত্তিনির্ভর, বাহ্যিক বা বুদ্ধি নির্ভর নয়। বুদ্ধি সব কিছুকেই বিভক্ত করে আর সহজাতবৃত্তি করে ঐক্যবদ্ধ। হিন্দু মতে "আমি" একটা মায়া মাত্র, ব্যক্তি একটা বহিঃ-দৃশ্যমাত্র, তার কাছে 'এক অসীম' "তুমিই অবস্থিত" এ হচ্ছে একমাত্র বাস্তবতা। প্রতি জীবের সম্পর্ক যে নিজেকে এমন কথা বলতে পারে, যার দৃষ্টি আর আত্মা এমন নির্মল ও স্বচ্ছ যে আমরা যে একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা সে দেখতে পায়, দেখতে পায় আমরা সবাই একই ইচ্ছাসমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত মাত্র—তেমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে পুণ্যবান ও করুণাপ্রাপ্ত আর মোক্ষপথের পথিক।" খ্রীস্টধর্ম যে কোনদিন প্রাচ্যে বৌদ্ধ ধর্মকে স্থানচ্যুত করতে পারবে তেমন বিশ্বাস শোপেন হাওয়ারের ছিল না—ওটা যেন "একটা পর্বত-শৃঙ্গ লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া।" তাঁর বিশ্বাস উল্টো বরং ভারতীয় দর্শন-স্রোত য়ুরোপে ঢুকে পড়ে আমাদের জ্ঞান আর চিন্তাকে ভীষণভাবে পাল্টে দেবে। "পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রীক-সাহিত্যের পূর্ণজীবনের যে প্রভাব দেখা দিয়েছিল, সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুপ্রবেশের প্রভাব তার চেয়ে কিছুমাত্র কম হবে না।"

কাজেই চরম জ্ঞান হচ্ছে: নির্বান—নিজের বাসনা-কামনাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের বাসনার চেয়ে বিশ্ব-বাসনা প্রবলতর—অবিলম্বে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত। "বাসনার উদ্রেক যত কম হবে তত কমে আসবে আমাদের দুঃখও।" বিশ্বের সেরা চিত্রগুলি আমাদের সামনে এমন সব চেহারা তুলে ধরে, যে চেহারায় "আমরা দেখতে পাই পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভিব্যক্তি, কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি নেই যার আকর্ষণ বরং যাতে সব বাসনা-কামনা হয়েছে প্রশান্ত। যুক্তির ঊর্ধ্বে যে শান্তি, আত্মার যে প্রশান্তি, যে গভীর বিশ্রাম, নির্বিঘ্ন প্রত্যয় ও পবিত্রতা...... রাফায়েল আর করেজিয়োর (Raphael & Correggio) চিত্রে যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবিম্বিত। তাই এক পূর্ণাঙ্গ ও নিশ্চিত ধর্ম-বাণী যেখানে শুধু টিকে আছে জ্ঞান, বিলোপ ঘটেছে সব বাসনার।"

৭ : মৃত্যুর বিজ্ঞতা

এখানেই শেষ নয়, আরো কিছু থেকে যায় বাকি। নির্বানের সাহায্যে ব্যক্তি মোক্ষলাভ করে, পেয়ে থাকে বাসনা-মুক্তির শান্তি। কিন্তু ব্যক্তির পরে? ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তো জীবনের হাসি থামে না—জীবন ত টিকে থাকবে তার বা অন্যের সন্তান-সন্ততিতে। তার নিজের ক্ষুদ্র জীবন-স্রোত থেমে গেলেও প্রতিপ্রজননে আরো হাজার হাজার জীবন-স্রোত বাড়তে থাকবে, গভীরতর হতে থাকবে। 'মানুষকে কি ভাবে রক্ষা করা যায়? ব্যক্তির মতো জাতিরও কি নির্বান সম্ভব?

জীবনের যে উৎস অর্থাৎ প্রজননের ইচ্ছাটাই যদি খতম করে দেওয়া যায় তা হলেই মাত্র বাসনা-কামনাকে সমূলে বিনাশ করে দিয়ে তার উপর পূর্ণ বিজয় সম্ভব। "প্রজনন প্রেরণার তৃপ্তি সন্তান জীবন-তৃষ্ণার প্রবলতম আকর্ষণ বলেই ওটা স্বভাবতই সবচেয়ে নিন্দার্হ।" এসব শিশুরা এমন কি অপরাধ করেছে যে তাদের জন্ম দিয়ে এ পৃথিবীতে আনতে হবে?

এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য: "জীবনের দুঃখ-বিপর্যয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই—সবাই যার যার অভাব আর দুঃখ-ধান্দা নিয়েই মশগুল, জীবনের অশেষ চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োগ করেছে সর্বশক্তি, সর্বাত্মক চেষ্টা করছে বিভিন্ন শোক-দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেতে তবুও এ দুর্ভোগ ক্লিষ্ট অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বল্পকালীন জীবন ছাড়া অন্য কিছুর আশা করতেই এদের সাহসে কুলোয় না। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে এমন দুঃখ-বিপর্যয়ের মধ্যেও দেখি প্রেমিক-প্রেমিকা সাগ্রহে মিলিত হচ্ছে—কেন এত গোপনে, এত ভয়ে ভয়ে আর চুরি করে? কারণ এ প্রেমিক-প্রেমিকারা হচ্ছে বিশ্বাস-ঘাতক, যে দুঃখ-কষ্টের দ্রুত বিলোপ ঘটতো তাকেই এরা চায় চিরস্থায়ী করে রাখতে।......প্রজনন ক্রিয়ার সঙ্গে লজ্জা-শরমের সম্পর্কের এ হচ্ছে প্রধান কারণ!"

এ ব্যাপারে মেয়েরাই দোষী। কারণ জ্ঞান যখন বাসনা-হীন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে তখন মেয়েদের যুক্তিহীন রূপাকর্ষণ পুরুষদের ভুলিয়ে দেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজনন-ক্রিয়ায় করায় রত। এসব মোহ যে কত ক্ষণস্থায়ী তা বুঝবার মতো বুদ্ধি যৌবনের নেই—সে বুদ্ধি আসে বড্ড দেরীতে।

"তরুণীদের বেলায় প্রকৃতি যেন, যাকে নাটকের ভাষায় 'মর্মস্পর্শী প্রভাব' সৃষ্টি বলা হয়, সে রকম কিছু দিতে চেয়েছে, ওদের বাকি জীবনের বিনিময়ে কয়েক বছরের জন্যও তাদের দিয়ে থাকে প্রচুর সৌন্দর্য ও অপর্যাপ্ত মোহিনী শক্তি—যা দিয়ে তারা যে কয় বছর ধরে কোন কোন পুরুষকে এমন মুগ্ধ করে যে তাদের বাকি জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ওরা (পুরুষরা) আসে ছুটে। মানুষ যদি যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হতো তা হলে এমন করার কোন কারণই সে খুঁজে পেতো না। সব ক্ষেত্রের মতো এখানেও প্রকৃতি তার স্বভাবসিদ্ধ মিতব্যয়িতার সঙ্গেই অগ্রসর হয়। নারী-পিপীলিকা যেমন গর্ভধারণের পর পাখা হারিয়ে বসে—কারণ তখন ওগুলো শুধু যে ফালতু বিবেচিত হয় তা নয়, বরং প্রজননের কাজে বিপজ্জনক হয়ে পড়ে, তেমনি একটি কি দুটো সন্তান-জন্মের পর নারীরাও সাধারণতঃ সৌন্দর্য হারিয়ে বসে, হয়তো সে একই কারণে।" তরুণদের চিন্তা করে দেখা উচিত: "যাকে দেখে তারা আজ গীতি কবিতা আর সনেট লেখার প্রেরণা পাচ্ছে সে যদি আঠারো বছর আগে জন্মগ্রহণ করতো তারা তার প্রতি এক নজর ফিরেও তাকাতো না।" আসলে শরীরের দিক দিয়ে পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর।

"যৌনাবেগে যার বুদ্ধি মেঘাচ্ছন্ন একমাত্র সেই অমন বে-সাইজ, সংকীর্ণ-স্কন্ধা, প্রশস্ত-নিতম্ব আর খাটো-পায়া জাতকে 'সুন্দর' বলে অভিহিত করতে পারে—রমণীর সব সৌন্দর্য এ যৌনাবেগের সঙ্গেই জড়িত। মেয়েদের সুন্দর বলার চেয়ে বরং ওদের কোন সৌন্দর্য বোধই নেই তাই বলা উচিত। সংগীত, কাব্য আর বিভিন্ন ললিতকলা সম্বন্ধে ওদের সত্যকার ও খাঁটি কোন রকম সূক্ষ্ম চেতনাই নেই। অন্যকে খুশী করার জন্য এ সব ললিতকলা সম্বন্ধে তারা যা ভান করে তা স্রেফ প্রহসন। কোন বিষয়ে নিরপেক্ষ ধারণা করতেই তারা অক্ষম। নারী সমাজের সবচেয়ে বিশিষ্টা ও খ্যাতিশীলারাও ললিতকলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে একটিও সত্যকার মৌলিক অবদান সৃষ্টি করতে পারেনি এযাবৎ বা কোন ক্ষেত্রে দিতে পারেনি পৃথিবীকে কোন স্থায়ী সম্পদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের প্রতি এ যে শ্রদ্ধা তা খ্রীস্ট-ধর্ম আর জার্মান খেয়ালিপনারই ফসল—যা পরে হয়ে দাঁড়িয়েছে রোমান্টিক আন্দোলনের কারণ, যাতে বুদ্ধির উপরে স্থান পেয়েছে আবেগ, অনুভূতি আর বাসনা-কামনা। এশিয়াবাসীরাই বুদ্ধিমান—তারা অকপটে মেয়েদের দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়েছে। শোপেনহাওয়ারের মতেঃ "আইন যখন মেয়েদেরে পুরুষদের সঙ্গে সমানাধিকার দিয়েছিল তখন উচিত ছিল ওদেরে পৌরুষ মননশীলতারও অধিকারী করা।" বিয়ের বেলায়ও এশিয়াবাসীরা আমাদের তুলনায় অধিকতর সততার পরিচয় দিয়েছে—তারা বহু-বিবাহ প্রথাকে মেনে নিয়েছে স্বাভাবিক আর আইনসম্মত বলে, আমাদের মধ্যে তা যদিও ব্যাপকভাবে চলতি তবুও তাকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে তুচ্ছ সব বাক্য-জালের আড়ালে। "সত্যিকার এক স্ত্রীগত মানুষ কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?" শোপেনহাওয়ারের এও এক জিজ্ঞাসা।

মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়াও এক অসম্ভব আর অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁর মতেঃ "দু' একজন বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সব মেয়েই অমিতব্যয়ী", কারণ তারা শুধু বর্তমান নিয়েই বেঁচে থাকে আর তাদের ঘরের বাইরে প্রধান ক্রীড়া হচ্ছে সওদা করা। "মেয়েদের ধারণা টাকা রোজগার পুরুষদেরই কাজ আর তাদের কাজ ঐ টাকা খরচ করা"—শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে এ তাদের ধারণা। এ সম্পর্কে শোপেনহাওয়ারের স্পষ্ট উক্তিঃ "আমার মত হচ্ছে মেয়েদেরে কখনো ওদের নিজেদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, পুরুষদের তত্ত্বাবধানেই ওদের রাখা ভালো। সে পুরুষ পিতা, স্বামী, পুত্র বা রাষ্ট্র যাই হোক। যেমন হিন্দুস্তানে রয়েছে। আর যে সম্পত্তি তারা নিজেরা অর্জন করেনি তা হস্তান্তরের পূর্ণ অধিকারও যেন তাদেরে দেওয়া না হয়।" সম্ভবত ত্রয়োদশ লুই'র রাজপ্রাসাদবাসিনীদের বিলাস আর ব্যয়বহুলতাই সরকারী দুর্নীতির মূল কারণ—যার পরিণতি ফরাসী বিপ্লব।

মেয়েদের যতখানি বাদ দিয়ে চলা যায় ততই ভালো। "অত্যাবশ্যকীয় আপদের" মর্যাদাও ওদেরে দেওয়া যায় না—ওদের ছাড়াই জীবন নিরাপদ ও সহজতর। নারী-সৌন্দর্যের ফাঁদ সম্বন্ধে পুরুষদের অবহিত থাকা উচিত—তা হলেই প্রজননের এ অদ্ভুত প্রহসনের ঘটবে সমাপ্তি। বুদ্ধির বিকাশের ফলে প্রজনন-স্পৃহা কমে আসবে বা বিলোপ ঘটবে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে অবশেষে জাতিরও ঘটবে বিলুপ্তি। অস্থির বাসনার উন্মত্ত ট্রেজেডির এর চেয়ে চমৎকার সমাপ্তি কল্পনা করা যায় না—মৃত্যু আর পরাজয়ের উপর এ যে যবনিকা নেমে এলো কেন সব সময় তা আবার নতুন নতুন জীবনে, নতুন সংগ্রামেও নতুন পরাজয়ে উত্তোলিত করা ? এ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় আমরা কতদিন প্রতারিত হবো, কতদিন এ অশেষ যন্ত্রণা যার শেষ ও যন্ত্রণায় তা আমাদের আকর্ষণ করবে ? কখন আমরা বাসনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহসে সাহসী হবো ? কবে বলতে পারবো জীবন মনোরম এ স্রেফ মিথ্যা বুলি, সবকিছুর শ্রেষ্ঠতম বর হচ্ছে মৃত্যু ?

৮ ঃ সমালোচনা

যে দর্শনের পরিচয় আমরা লাভ করলাম তাকে বুঝতে হলে যুগ আর স্বয়ং দার্শনিকটির কিছুটা ডাক্তারী পরীক্ষার দরকার।

বুঝতে হবে এখানে আমরা এমন এক অবস্থার সম্মুখীন যার সঙ্গে আলেকজেণ্ডার আর সীজারের পর গ্রীস আর রোমের যে অবস্থা হয়েছিল তার রয়েছে সাদৃশ্য—গ্রীস আর রোমও তখন প্রাচ্য-বিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গীতে হয়েছিল প্লাবিত। প্রাচ্যের ঐ এক বৈশিষ্ট্য মনের ইচ্ছা শক্তির চেয়ে প্রকৃতিতে যে বাহ্যিক 'ইচ্ছা শক্তি' দেখতে পাওয়া যায় তাকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করে এক হতাশ আত্মসমর্পণে অনড় বিশ্বাসী হয়ে পড়া। গ্রীসের পতনের পর তার মুখমণ্ডলে যেমন একদিকে দেখা দিয়েছিল বিষয়-বৈরাগ্যের পাণ্ডুরতা অন্যদিকে সুখান্বেষীর ক্ষয়িষ্ণু ঔজ্জ্বল্য, তেমনি নেপোলীয়ানীয় যুদ্ধের বিশৃঙ্খলা য়ুরোপীয় আত্মায় যে বিষণ্ণ ক্লান্তি নিয়ে এসেছিল তাই শোপেনহাওয়ারকে করে তুলেছিল তার দার্শনিক কন্ঠস্বর ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে য়ুরোপ ভুগছিল এক ভীষণ মাথা-ব্যথায়।

শোপেনহাওয়ারের মতে মানুষের সুখ সে যা তার উপরই নির্ভর করে—বাহ্যিক অবস্থার উপর মোটেও নয়। তাঁর এ স্বীকারুক্তির সাহায্যে তাঁকেও বিচার করে দেখা যায়। বিশ্বনিন্দুকের একমাত্র অভিযোগ বিশ্ব-নিন্দা। রোগা দেহ, স্নায়ু-রুগ্ন মন, জীবনভর ফাঁকা অবসর গোমরা মুখ বিষণ্ণতা—এ সবই উপাদান যুগিয়েছে শোপেনহাওয়ারের দর্শন-গঠনে। বিশ্বনিন্দুক বা দুঃখবাদী হওয়ার জন্য অবসরের প্রয়োজন—কর্মময় জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় সব সময়ই দেহ-মনকে উৎফুল্ল করে তোলে। সীমিত আশা আর মন্থর জীবনের যে প্রশান্তি শোপেনহাওয়ার সব সময় তার প্রশংসামুখর ছিলেন বটে কিন্তু এসব কখনো তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি নয়। অবিরাম অবসর ভোগের মতো টাকা তাঁর ছিল—অবিরাম কর্মব্যস্ত থাকার চেয়ে অবিরাম অবসর যে অধিকতর অসহ্য তাও তিনি বুঝতে পেরেছিছিলেন। মনে হয় দার্শনিকদের বিষাদমুখীনতার কারণ তাঁদের অস্বাভাবিক কর্মবিমুখ জীবন—জীবনের প্রতি প্রায়শঃ যে আক্রমণ দেখা যায় তা হজম-শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ারই ফল।

নির্বাণ হচ্ছে নিস্পৃহ লোকের আদর্শ, যেমন চাইল্ড হেরল্ড কি রেনের (Rene)—যার জীবনের শুরু অত্যধিক আশায়, একটি মাত্র কামনা হাসিলে নিবিষ্ট, ব্যর্থকাম হলে এমন লোক বাকিজীবন কাটিয়ে দেয় এক নিষ্কাম আর প্রগলভ আলস্যে। ইচ্ছাশক্তির সেবক হিসেবেই যদি বুদ্ধির উদ্ভব ঘটে তা হলে বুদ্ধির যে বিশেষ সৃষ্টি, যাকে আমরা শোপেনহাওয়ারের দর্শন বলেই জানি তা হলে তাকে এক অলস ও রুগ্ন ইচ্ছারই আবরণ আর সাফাই বলেই গণ্য করা যায়। নিঃসন্দেহে পুরুষ আর মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর যে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা তাই তাঁকে করে তুলেছিল অতিমাত্রায় সংশয়ী আর অভিমানী—যেমন ঘটেছিল স্টেণ্ডহল (Stendhal), ফ্লুবার্ট আর নীট্‌শের বেলায়। তিনি হয়ে পড়েছিলেন বদমেজাজী আর নিঃসঙ্গ। তাঁর মতে: "প্রয়োজনের সময় বন্ধু বন্ধুই নয়—স্রেফ এক ধার-গ্রহীতা" আর "যা তুমি তোমার শত্রু থেকে গোপন করো বন্ধুর কাছেও তা কখনো প্রকাশ করো না।" তিনি শান্ত, একঘেয়ে, আশ্রম জীবনেরই পক্ষপাতী—ভয় করতেন সঙ্গ আর সমাজকে। মানব-সঙ্গের মূল্য বা আনন্দ সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু অন্যের সঙ্গে বে-শরীক যে আনন্দ তার অকালমৃত্যু অনিবার্য।

দুঃখবাদের এক বড় অংশ দখল করে আছে অহংবোধ—সংসারটাকে আমরা খুব ভালো চোখে দেখি না তাই তার প্রতি উঁচিয়ে থাকি আমরা আমাদের দার্শনিক নাক। কিন্তু স্পিনোজার কথাও ভুলে থাকা সঙ্গত নয়—তিনি বলেছেন যে কোন ব্যাপারে আমাদের যে নৈতিক সমর্থন বা নিন্দা তা স্রেফ মানবীয় বিচারমাত্র, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করলে তার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো জীবন সম্বন্ধে

২৭—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সমস্ত বিরক্তি, নিজেদের উপর আমাদের নিজেদের যে গোপন বিরক্তি রয়েছে তা ঢেকে রাখারই এক পর্দা মাত্র। আমরা নিজেরাই জীবনকে কদর্যভাবে জোড়া-তালি দিয়েছি অথচ তার জন্য দোষারোপ করি 'পরিবেশ' আর 'দুনিয়াকে'—বেচারা 'পরিবেশ' আর 'দুনিয়ার' ভাষা নেই বলে পারছে না প্রতিবাদ জানাতে। জ্ঞান-প্রবীণ মানুষ জীবনের স্বাভাবিক সীমারেখা সহজে মেনে নেয়—ভাগ্য তাঁর অনুকূলে পক্ষপাত করুক এমন আশা তিনি পোষণ করেন না, জীবনের খেলায় দাবার পাশা আপনা থেকেই তাঁর অনুকূলে ভারী হয়ে উঠুক এ তিনি চান না। কার্লাইলের মতো তিনিও জানেন সূর্য আমাদের সিগারেটটা জ্বালিয়ে দেয় না বলে সূর্য নিন্দায় পঞ্চমুখ হওয়ার কোন মানে হয় না। আমরা যদি আরো চালাক হয়ে ওর সহায়তায় এগিয়ে যাই তা হলে সূর্য হয়তো একদিন তাও করবে। আমরা নিজেরা যদি একটুখানি সূর্যালোক নিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়াই তা হলে এ বিরাট নিরপেক্ষ পৃথিবীটা হয়তো একদিন সুখ নিকেতন হয়ে উঠবে। আসলে পৃথিবী আমাদের সপক্ষে যেমন নয় তেমনি নয় বিপক্ষে। বরং পৃথিবী হচ্ছে আমাদের হাতের কাঁচামাল, আমরা যে রকম যেভাবে আমরা তাকে গড়ে তুলি স্বর্গ কি নরকে।

AMARBOI.COM

শোপেনহাওয়ার আর তাঁর সমসাময়িকদের দুঃখবাদের আংশিক কারণ তাঁদের মনের রোমান্টিক আশা ও প্রবণতা। তরুণরা পৃথিবীর কাছে অনেক বেশী আশা করে থাকে—দুঃখবাদ যেন আশাবাদেরই ভোর-বেলা, যেমন ১৭৮৯'র ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছে ১৮১৫-কে। অনুভূতি, সহজাত বৃত্তি ও বাসনা-কামনার রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ও মুক্তির আর বুদ্ধি, সংযম ও শৃঙ্খলার প্রতি রোমান্টিক তাচ্ছিল্যের স্বাভাবিক দণ্ড ভোগ করতেই হবে, কারণ, হোরেস ওয়ালপোলের (Horace Walpole) মতে "যারা চিন্তা করে তাদের কাছে পৃথিবী হচ্ছে কমেডি কিন্তু যারা স্রেফ অনুভব করে তাদের কাছে ওটা ট্রেজেডি।" বেবিট্ (Babbit) বলেছেন: "সম্ভবত আবেগ-নির্ভর রোমান্টিক আন্দোলনের মতো এমন ফলপ্রসূ বিষণ্ণতা আর কিছুতেই সম্ভব নয়।......যখন রোমান্টিকধর্মী দেখতে পায় তার যে সুখের আদর্শ তা বাস্তবে দুঃখ হয়েই রূপ নিয়েছে—তবুও সে তার জন্য তার নিজের আদর্শকে দায়ী করে না। তার ধারণা তার মতো এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমৎকারভাবে সংঘটিত মানুষের উপযুক্ত স্থানই নয় এ পৃথিবী।" খেয়ালী মানুষকে খেয়ালী বিশ্ব কি করে সন্তুষ্ট করবে?

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য দখলের দৃশ্য, রুশোর সর্বাত্মক নিন্দা আর কান্টের বুদ্ধি বা মননের বিশ্লেষণী সমালোচনা আর তাঁর নিজের প্রবৃত্তি-মুখীন মেজাজ আর অভিজ্ঞতা—এ সবই যেন একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শোপেন-হাওয়ারকে ইচ্ছাশক্তিই যে চরম ও পরম এ পাঠ শিখিয়ে দিয়েছিল। মনে হয় জীবনের দণ্ড আর দংশনের যে তিক্ত ব্যক্তিগত সংসর্গ তাঁর মনে দুঃখবাদের জন্ম দিয়েছিল ওয়াটারলু আর সেন্ট হেলেনা নিঃসন্দেহে তাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। এখানে নেপোলিয়নে তিনি দেখতে পেলেন ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তিগত ইচ্ছা-মূর্তিকেই—যে মূর্তি সদম্ভ কর্তৃত্ব চালাচ্ছে মহাদেশগুলোর উপর। তবু একটা পোকা যেমন জন্মের সঙ্গেই নিয়ে আসে মৃত্যু এর মৃত্যুও তেমনি অবধারিত আর অসম্মানের। শোপেনহাওয়ারের মনে একথা কোনদিন উদয় হয়নি যে একেবারে কোন রকম সংগ্রাম না করার চেয়ে সংগ্রাম করে হেরে যাওয়াও অনেক ভালো। অধিকতর পৌরুষ আর শক্তির অধিকারী হেগেলের মতে সংগ্রামের প্রয়োজন আর গৌরব তিনি কোনদিন অনুভবও করেননি। তিনি শান্তির জন্য লালায়িত ছিলেন কিন্তু বাস করেছেন যুদ্ধের মাঝখানে। সর্বত্রই তিনি দেখেছেন দ্বন্দ্ব-কলহ—কিন্তু এ দ্বন্দ্ব-বিরোধের পেছনে প্রতি-বেশীর বন্ধুসুলভ সাহায্য, শিশু ও তরুণের অট্টহাস্য, প্রাণচঞ্চল তরুণীদের নৃত্য, পিতা-মাতা আর প্রেমিক-প্রেমিকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মত্যাগ, ধরিত্রীর সহিষ্ণু প্রাচুর্য আর বসন্তের নবজন্মও যে আছে তা তিনি দেখেও দেখেননি।

বাসনারও বা শেষ কোথায়? এক বাসনা পূর্ণ হলেই মনে আর এক বাসনা জেগে ওঠে। হয়তো একদম সন্তুষ্ট না হওয়াই আমাদের জন্য ভালো। এক পুরোনো লোককথায় বলা হয়েছে 'সুখ পাওয়ায় বা তৃপ্তিতে নয় বরং প্রয়াস বা অর্জনেই নিহিত'। স্বাস্থ্যবান লোক সুখ যত না চায় তার চেয়ে বেশী চায় তার শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োগের সুযোগ-সুবিধা—এ শক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তাকে যদি দুঃখ-যন্ত্রণার মূল্য দিতেই হয় সে সানন্দেই তা দিয়ে থাকে। এ মূল্য না দেওয়ার মতো নয়। বাধা ডিঙিয়েই আমাদের উপরে উঠতে হয় যেমন হাওয়াই জাহাজ বা পাখী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে থাকে। বাধার প্রয়োজন আছে—বাধার বিরুদ্ধেই আমাদের শক্তি ধারাল হয়ে ওঠে আর বাধাই জোগায় আমাদেরে বেড়ে ওঠার প্রেরণা। ট্রেজেডি বা দুঃখ ছাড়া জীবনটাই মানুষের যোগ্য হতো না।

এ কি সত্য "যার জ্ঞান বৃদ্ধি পায় তার দুঃখও পায় বৃদ্ধি?" আর সর্বোচচ গঠনে গঠিত জীবেরাই বেশী করে দুঃখ ভোগ করে থাকে? হাঁ। তবে এও সত্য, জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ যেমন বাড়ে তেমনি সুখও বাড়ে—সূক্ষ্মতম আনন্দ আর তীব্রতম দুঃখের একমাত্র অধিকারী উন্নত আত্মা। কৃষক-রমণীর অজ্ঞতার আনন্দের চেয়ে ভল্টেয়ার যে ব্রাহ্মণের "অসুখী" বিজ্ঞতার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন তার যাথার্থ্য মানতেই হবে। দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হলেও আমরা জীবনের গভীর আর তীব্র অভিজ্ঞতা পেতে চাই—আমরা চাই জীবনের গভীর রহস্যে প্রবেশ করতে, এমনকি হতাশ হতে হলেও। যে ভার্জিল জীবনের সব সুখেরই আস্বাদ গ্রহণ করেছেন, রাজকীয় অনুগ্রহের বিলাস যাঁর অজানা ছিল না—অবশেষে সবকিছু থেকে "ক্লান্ত" হয়ে শুধু বোধশক্তির বা বুঝতে পারার যে আনন্দ তাই পেতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্রিয় যখন আর তৃপ্তি দিতে পারে না, যতই দুঃসাধ্য হোক তখন মানুষ এমন সব শিল্পী, কবি ও দার্শনিকের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব কামনা করে যাদেরে বুঝবার জন্য প্রবীণ-মন অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞতা হচ্ছে এক রকম তিক্ত-মধুর আনন্দ—যার সঙ্গতির মধ্যে অসঙ্গতি প্রবেশ করে তাকে আরো গভীরতর করে তোলে।

আনন্দ কি নঞর্থক? একমাত্র অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত চিত্ত, যে সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে সেই জীবনের বিরুদ্ধে এমন একটা মৌলিক ধর্মহীন উক্তি করতে সক্ষম। আমাদের সব বৃত্তির সুসঙ্গত কর্মসাধন ছাড়া আনন্দ আর কি? আনন্দ কি করে নেতিবাচক হতে পারে যদিনা কর্মরত বৃত্তিটা অগ্রসর না হয়ে পশ্চাদ-পসরণ করে? পলায়ন আর বিশ্রামের, আত্মসমর্পণ আর নিরাপত্তার, নির্জনতা আর নীরবতার যে আনন্দ নিঃসন্দেহে তা নেতিবাচক কারণ যে বৃত্তিগুলি এসব বিষয়ে আমাদেরে বাধ্য করে তা মূলতঃ নেতিবাচক—এগুলি ভয় আর পলায়নেরই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু এ কথা কি আমরা হাঁ-বাচক বৃত্তিগুলি সক্রিয় হলে যে আনন্দ পাই সে আনন্দ সম্বন্ধে বলা যায়?—যেমন অর্জন আর পাওয়ার, যুযুৎসা আর কর্তৃত্বের, কর্ম আর ক্রীড়ার, সঙ্গ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমের? হাসির যে আনন্দ তা কি নেতিবাচক? অথবা শিশুর নর্তন-কুর্দন? অথবা মিথুনরত পাখীর কূজন? অথবা মোরগের ডাক? বা শিল্পের যে সৃষ্টিশীল আনন্দ এসব কি নেতিবাচক? জীবন নিজেই এক হাঁ-বাচক শক্তি—তার সব রকম স্বাভাবিক ক্রিয়াই কিছু না কিছু আনন্দ দিয়ে থাকে।

তবুও মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর তাও সত্য। তবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করলে তার ভয় অনেকখানি দূর হয়ে যায়—ভালোভাবে মৃত্যুর জন্য তাই ভালোভাবে জীবনযাপন করা দরকার। মৃত্যুহীনতা কি আমাদের জন্য আনন্দের কারণ হবে? মানুষের প্রতি সব চেয়ে যে কঠোরতম দণ্ড দেওয়া সম্ভব সে চির অমরতার দণ্ডে যখন আহাসুয়েরাসকে (Aha-suerus) দণ্ডিত করা হয়েছিল তখন তার ভাগ্য দেখে কে তার প্রতি ঈর্ষা বোধ করবে? জীবন মধুর বলেই নয়কি মৃত্যু এত ভয়ঙ্কর? নেপোলিয়নের মতো আমরা এ কথা বলতে চাই না যে যারা মৃত্যু ভয়ে ভীত তারা মনে মনে নিরীশ্বরবাদী, তবে সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি সত্তর বছর ধরে জীবন যাপনের পর কেউ আর দুঃখবাদী থাকে না। গ্যেটে বলেছেন: ত্রিশের পর কেউই দুঃখবাদী নয়। কদাচিৎ হয় কুড়ির আগে—দুঃখবাদ হচ্ছে আত্মম্ভরি আর আত্মসচেতন তরুণেরই এক বিলাস—যে তরুণ সাম্যবাদী পারিবারিক উষ্ণ বক্ষ ছেড়ে ব্যক্তিসর্বস্ব লোভ আর প্রতিযোগিতার হিম-শীতল পরিবেশে এসে দাঁড়িয়েছে আর চাচ্ছে মাতৃ-বক্ষে ফিরে যেতে আবার, যে তরুণ বিশ্বের ঝড়-ঝঞ্ঝা আর পাপ অন্যায়ের মাঝখানে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলেছিল আর বছর বছর নিজের সুখ-স্বপ্ন আর আদর্শকে দুঃখিত মনে বিসর্জন দিয়েছে সেই হয় দুঃখবাদী। কুড়ির আগে থাকে দেহের আনন্দ—ত্রিশের পরে মনের আনন্দ, কুড়ির আগে আশ্রয় আর নিরাপত্তার আনন্দ, ত্রিশের পর পিতৃত্ব আর ঘরের আরাম।

যে মানুষ সারাজীবন বোর্ডিং বাড়িতে কাটিয়েছেন তিনি দুঃখবাদ কি করে এড়াবেন? আর যে নিজের একমাত্র সন্তানকে জারজের নাম-হীনতায় করেছে নিক্ষেপ? শোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদের অন্তরালে রয়েছে তাঁর স্বাভাবিক জীবন-বিমুখতা আর নারী, বিয়ে এবং সন্তান বর্জন। যে পিতৃত্বে সুস্থ মানুষ জীবনের চরম তৃপ্তির সন্ধান পায় সে পিতৃত্বকে তিনি মনে করতেন প্রধানতম পাপ। প্রেমের গোপনীয়তাকে তিনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করতেন জাতির ধারাবাহিকতা রক্ষারই লজ্জার নিদর্শন! এর চেয়ে অসম্ভব পণ্ডিতী উক্তি আর কি হতে পারে? প্রেমে তিনি শুধু জাতির জন্য ব্যক্তির আত্মত্যাগই দেখেন—ত্যাগের বিনিময়ে সহজাত বৃত্তি যে আনন্দ দিয়ে থাকে তিনি তা আমলেই আনেন না। এ আনন্দ এত বিরাট বলেই তো তা জুগিয়েছে অধিকাংশ কাব্যের প্রেরণা। তিনি মেয়েদের শুধু ঝগড়াটে আর পাপিয়সী হিসেবেই দেখেছেন—নারীর অন্যরূপ কখনো কল্পনাই করেননি। তাঁর ধারণা, যে স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে সে একটা আস্ত আহাম্মক। অথচ এসব লোক আমাদের এ আবেগী একক হতভাগ্য জীবনধর্মীর চেয়ে মোটেও বেশী অসুখী ছিলো না। তদুপরি (ব্যলজাকের ভাষায়) পরিবার পালনে যা খরচ, পাপ-পোষণে তার চেয়ে কম খরচ হয় না। নারী-সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর এক গভীর বিতৃষ্ণা—তিনি চান সব সৌন্দর্যকে আমরা পরিহার করি, প্রশ্রয় না দিই জীবনের বর্ণ-গন্ধকে। নারী-বিদ্বেষ কি দুর্ভাগ্যই না সঞ্চারিত করে দিয়েছিল এ হতভাগ্য ব্যক্তিটির অন্তরে।

এ অসাধারণ ও উদ্দীপক দর্শনে আরো বহু ত্রুটি রয়েছে তা অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, অনেকখানি পারিভাষিক। যে বিশ্বে বাঁচার ইচ্ছাই আসল শক্তি সেখানে আত্মহত্যার কথা আসে কি করে? যে মননশক্তি বা বুদ্ধিকে ইচ্ছার অনুগত ভৃত্য হিসেবেই জন্ম দেওয়া হয়েছে, করা হয়েছে লালনপালন সে কি করে স্বাধীন আর নিরপেক্ষ হতে সক্ষম হবে? ইচ্ছা-বর্জিত জ্ঞানেই কি প্রতিভা নিহিত না কি তা ইচ্ছার অসীম শক্তি আর তারই দ্বারা পরিচালিত এমনকি ব্যক্তিগত উচ্চাশা আর অহঙ্কার-বোধের এক বিরাট মিশ্রণ? সাধারণভাবে প্রতিভার সঙ্গে কি পাগলামির সম্পর্ক আছে না কি শুধু 'রোমান্টিক' ধরনের ভাবালুদের সঙ্গে (যেমন বায়রন, শেলী, পো, হেয়েইনে, সুইনবার্ন, ষ্ট্রিনবার্গ, দস্তভয়স্কি ইত্যাদি) আর 'ক্লাসিক' ও গভীর ধরনের প্রতিভারা (যেমন, সক্রেটিস, প্লেটো, স্পিনোজা, বেকন, নিউটন, ভল্টেয়ার, গ্যেটে, ডারউইন, হুইটম্যান ইত্যাদি) এরা অত্যন্ত সুস্থ মানসিকতার অধিকারী নন? যদি বুদ্ধি আর দর্শনের যথাযথ কাজ ইচ্ছাকে অস্বীকার করা না হয়ে বাসনা-কামনাকে এক সমঝোতায় এনে সঙ্গতি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করা হয় তা হলে কেমন হয়? ইচ্ছা যদি এমন ঐক্যসাধনা শক্তির ফসল না হয় তা কি এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌরাণিক বিমূর্ত কথা হয়ে পড়ে না—"শক্তি" কথাটার মতই প্রায় ছায়া ছায়া ?

তবু এ দর্শনে এমন এক অকুন্ঠ সততা রয়েছে যে এর পাশে অত্যন্ত আশাবাদী বিশ্বাসকেও মনে হয় এক ঘুমপাড়ানী কপটতা। স্পিনোজার মতো এ বলাই হয়তো ভালো যে ভালো আর মন্দ স্রেফ ব্যক্তি-নির্ভর কথা—মানুষেরই পছন্দ অপছন্দেরই অভিব্যক্তি, তবুও এ পৃথিবীকে আমরা বিচার করতে বাধ্য হই, কোন "নিরপেক্ষ" দৃষ্টি দিয়ে নয় বরং বাস্তব মানবীয় দুঃখভোগ আর প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই। পাপের যে একদম কাঁচা বাস্তবতা তার সম্মুখীন হতে দর্শনকে যেভাবে শোপেনহাওয়ার বাধ্য করেছেন তা মূল্যবান—লঘুকরণের (পাপের) মানবীয় কর্তব্যের দিকে চিন্তাকে ফেরানো উচিত। তাঁর কাল থেকে এক লজিকখণ্ডিত পরাবিদ্যার অবাস্তব পরিবেশে আজ দর্শনের জীবন বা অস্তিত্ব কঠোরতর হয়ে উঠেছে। চিন্তাশীলরা এখন বুঝতে পেরেছেন কর্মহীন চিন্তা এক ব্যাধি বিশেষ।

যাই হোক, শোপেনহাওয়ার সহজাতবৃত্তির সূক্ষ্ম গভীরতা আর তার সর্বব্যাপী শক্তির দিকে মনস্তত্ত্ববিদদের চোখ খুলে দিয়েছেন। মনন-শীলতা—সব কিছুর উপরে মানুষ যে এক চিন্তাশীল জীব, যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য হাসিলের জন্য যে সচেতনভাবে উপায় নির্ধারণে সক্ষম, রুশো সম্বন্ধে তা এখন বিতৃষ্ণ, কান্টকে নিয়ে তার এখন বিছানা আশ্রয় আর শোপেন-হাওয়ারকে নিয়ে সে বরণ করেছে মৃত্যু। দুই শতাব্দীর আত্মপরীক্ষা আর বিশ্লেষণের ফলে দর্শন বুঝতে পেরেছে সব চিন্তার অন্তরালে বিরাজ করছে বাসনা আর মেধা বা বুদ্ধির পেছনে সহজাতবৃত্তি,—যেমন শতাব্দী-ব্যাপী বস্তুবাদের পরে পদার্থবিদ্যা দেখতে পেয়েছে বস্তুর পেছনে রয়েছে শক্তি (Energy)। আমাদের অন্তর-আত্মাকে আমাদের কাছে খুলে ধরার জন্য আমরা শোপেনহাওয়ারের কাছে ঋণী—আমাদের বাসনা যে আমাদের দর্শনেরই স্বতসিদ্ধ কথা আর চিন্তা যে নৈর্ব্যক্তিক ঘটনার শুধু বিমূর্ত হিসাব নয় তা বুঝবার পথও তিনি খোলাসা করে দিয়েছেন আমাদের কাছে এবং তা যে বাসনা আর কর্মের এক নমনীয় হাতিয়ার তা বুঝতে করেছেন সহায়তা।

অবশেষে, কিছুটা অতিরঞ্জন ঘটলেও শোপেনহাওয়ার ফের আমাদের প্রতিভার প্রয়োজনীয়তা আর শিল্পের মূল্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলেছেন। তিনি দেখেছেন চরম শ্রেয় হচ্ছে সৌন্দর্য আর চরম আনন্দ নিহিত সৃষ্টিতে অথবা সৌন্দর্য সাধনায়। মানব-ইতিহাসে প্রতিভা যে এক মৌলিক উপাদান এ ধারণা বিলোপ সাধনায় হেগেল, মার্ক্স, আর বার্কলের যে উদ্যম তার বিরুদ্ধে গ্যেটে আর কার্লাইলের মতো তিনিও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যে যুগে মনে হয় সব মহতের মৃত্যু ঘটেছে তখন একমাত্র তিনিই মহত্ত্বের প্রেরণা-সঞ্চারী বীর পূজার সপক্ষে জানিয়েছেন আহ্বান। আর নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও সে মহতদের নামের সঙ্গে তিনি আর একটি নাম (অর্থাৎ তাঁর নিজের নাম) যোগ করতে হয়েছেন সক্ষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

হার্বার্ট স্পেন্সার

১. কঁতে আর ডারউইন (Comte and Darwin)

"সব রকম ভবিষ্যৎ পরাবিদ্যার প্রাথমিক অধ্যয়ন" বলে কান্টীয় দর্শনের নিজের যে দাবী তা গতানুগতিক চিন্তা-পদ্ধতির প্রতি এক মারাত্মক ধাক্কা—তেমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হলেও পরিণামে কিন্তু তাই হয়েছে যে কোন পরাবিদ্যার প্রতি এক সর্বনাশা আঘাত। কারণ চিন্তার ইতিহাসে পরাবিদ্যা হচ্ছে বাস্তবতার চরম স্বভাব আবিষ্কারেরই এক চেষ্টা। মানুষ এখন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞ থেকে জানতে পারছে বাস্তবতা কিছুতেই অভিজ্ঞতালব্ধ নয়—তা এমন এক 'চরম বাস্তবতা' যা অনুভব করা যায় বটে কিন্তু জানা যায় না। এমনকি সূক্ষ্মতম মানব-মনীষাও দৃশ্যের সীমা পেরিয়ে মায়ার আবরণ বিদ্ধ করতে অক্ষম। ফিংটে (Fichte), হেগেল (Hegel) আর শেলিঙের (Schelling) পরাবিদ্যার অতিরঞ্জন, তাঁদের বহুরকমের পুরোনো ধাঁধার অধ্যয়ন, তাদের 'অহং', 'ভাব' আর 'ইচ্ছা'—পরস্পর কাটাকাটি করে পরিণত হলো শূন্যে। ফলে ১৮৩০-এ সবাইর ধারণা হলো পৃথিবীর গোপন-রহস্য আজো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পুরো এক প্রজনন ধরে 'পরম' মাতলামির পর য়ূরোপীয় মনে এমন এক প্রতিক্রিয়া হলো যার ফলে তা সব রকম পরাবিদ্যা বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো।

ফরাসীরা সংশয়বাদে এমন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল যে স্বভাবতই তাদের ভিতর থেকেই 'বিজ্ঞানভিত্তিক' দর্শন আন্দোলনের প্রবর্তকের আবির্ভাবও সঙ্গত (অবশ্য যে দর্শনে প্রত্যেকটা ভাবকেই কালের বিচারে পবিত্র মনে করা হয় সেখানে 'প্রবর্তক' কথাটা যদি ব্যবহার করা যায়)। অগাস্টে কঁতে—যাঁর পিতা-মাতা প্রদত্ত নাম হচ্ছে, ইসিডোর অগাস্টে মেরি ফ্রাঙ্কোয় এক্সেভিয়ার কঁতে (Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte) ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে মন্টপেলিয়ারে (Montpellier)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তাঁর আদর্শ ছিল বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, যাঁকে তিনি আধুনিক সক্রেটিস বলে অভিহিত করতেন। তাঁর কথা : "সকলেই জানে তিনি মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানী হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন আর সে পরিকল্পনা তিনি করে তুলেছিলেন সফল। যদিও আমার বয়স এখনো কুড়ি হয়নি তবুও আমি তেমন পরিকল্পনা গ্রহণের সাহস করেছি।" বিখ্যাত য়ূটোপিয়াবাদী সেন্ট্ সাইমনের সেক্রেটারির পদাভিষিক্ত হয়ে তিনি এ পথে ভালো রকম সূচনাই করেছিলেন—যিনি টার্গট (Turgot) আর কনডর্সেটের (Condorcet) সংস্কারী উদ্দীপনায় তাঁকে উদ্দীপিত করে শারীরিক ব্যাপারের মতো সমাজকেও যে আইন আর বিজ্ঞানে পরিণত করা সম্ভব এ ভাবটাও তাঁর মনে দিয়েছিলেন সঞ্চারিত করে আর এ ধারণাও তাঁর মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে সব দর্শনকে মানবজাতির নৈতিকবোধ আর রাজনৈতিক উন্নতিই রাখতে হবে লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের অনেকের মতো—কঁতেও বিশ্ব পৃথিবীর সংস্কারে উদ্যত ছিলেন বটে কিন্তু নিজের ঘর সামলাতেই হয়েছেন ব্যর্থ—দু' বছর ধরে প্রতিকূল স্বামী-জীবনের দুর্ভোগে তাঁর স্নায়ু-যন্ত্র হয়ে পড়েছিল বিকল এবং ১৮২৭শে সীন নদীতে ডুবে তিনি আত্মহত্যা করতেও চেয়েছিলেন। কাজেই তাঁর উদ্ধারকর্তার কাছে আমরা তাঁর পাঁচখণ্ডে লিখিত **Positive Philosophy** যা ১৮৩০ থেকে ১৮৪২-এর মধ্যে হয়েছে প্রকাশিত আর চারখণ্ডে লিখিত **Positive Polity** যা প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫১ থেকে ১৮৫৪-এর মধ্যে তার জন্য ঋণী।

এ দায়িত্বের যে পরিধি আর তার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন বর্তমান যুগে তার একমাত্র তুলনা স্পেন্সারের **Synthetic Philosophy**। এখানে বিষয়বস্তুর সাধারণীকরণ আর ক্ষীয়মান সারল্য অনুসারে বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভক্তি সাধিত হয়েছে, যেমন অঙ্ক, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব আর সমাজতত্ত্ব পূর্ববর্তী সব বিজ্ঞানের ফলাফলের উপর এর প্রত্যেকটিই নির্ভরশীল। সমাজতত্ত্ব হচ্ছে সব বিজ্ঞানেরই চূড়া আর অন্যান্য বিজ্ঞানও সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নয়নে যতটুকু সহায়তা করতে সক্ষম তাদের অস্তিত্বের সার্থকতাও ততটুকু। বিজ্ঞান, খাঁটি আর সুনির্দিষ্ট জ্ঞান হিসেবে উল্লেখিত পর্যায়ানুসারে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে হয়েছে প্রসারিত। স্বভাবতই শেষ পর্যায়েই সমাজ-জীবনের জটিল অবস্থা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওতায় এসে দিয়েছে ধরা। ভাবজগতের ঐতিহাসিকরা চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিন পর্যায়ের বিধি-বিধান দেখতে পায়ঃ প্রথমে বিষয়টাকে করা হয় শাস্ত্রীয়ভাবে উপলব্ধি, সব সমস্যাকে তখন ব্যাখ্যা করা হয় কোন না কোন দেবদেবীর অভিপ্রায় বলে, যেমন তারকারাজিকে যখন মনে করা হতো দেবদেবী বা তাদের বাহন রথ বলে। পরে এ একই বিষয় হয়ে দাঁড়ায় পরাবিদ্যা আর বিমূর্ত পরাবিদ্যা দিয়েই চলতে থাকে তার ব্যাখ্যা, যেমন তারকারাজি বৃত্তাকারেই হয়ে উঠে গতিশীল কারণ বৃত্ত হচ্ছে পূর্ণতম চিত্র। অবশেষে বিষয়টা পরিণতি লাভ করে প্রামাণ্য বিজ্ঞানে—নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ, কল্প-চিত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আর তার অবস্থাসমূহ ব্যাখ্যা করা হয় স্বাভাবিক কার্য কারণের নিয়মানুবর্তিতার সাহায্যে। "ঈশ্বরের ইচ্ছা" প্লেটোয় "ভাবসমূহে" আর হেগেলে "পরম ভাবে"র হাওয়াই অস্তিত্বে এসে পায় আশ্রয় আর এ সবই যথাসময় পরিণতি লাভ করে বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধানে।

নিরুদ্ধ উন্নয়ন অবস্থারই নাম পরাবিদ্যা, কঁতের মতে এসব শিশুসুলভ ধারণা ত্যাগ করার সময় এসেছে। দর্শন বিজ্ঞান থেকে আলাদা কিছু নয়—এ হচ্ছে মানব জীবনের উন্নতির উদ্দেশ্যে সব বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন।

এ প্রমেয়তা নিয়ে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল এক রকম অটল-বিশ্বাসী মননশীলতা, হয়তো বিচ্ছিন্ন হতাশ জীবনেরই এ প্রতিক্রিয়া। ১৮৪৫-এ যখন মিসেস ক্লটিল্ডে দে ভক্স (যাঁর স্বামী তখন জেলে) তাঁর প্রণয়িনী, তখন প্রেমের ফলে তাঁর চিন্তা হয়ে ওঠে উষ্ণ ও রঞ্জিত। এ প্রতিক্রিয়ায় সংস্কার সাধনী শক্তি হিসেবে এখন থেকে অনুভূতিকেই তিনি স্থান দিতে লাগলেন বুদ্ধির উপরে। আর পেঁৗছলেন এ সিদ্ধান্তে যে পৃথিবীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য চাই এক নতুন ধর্ম, যার কাজ হবে মানবতাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজ্য করে মানব-স্বভাবের দুর্বল পরোপকার বৃত্তিকে পরিপুষ্ট ও সবল করে তোলা। এ মানবতা-ধর্মের জটিল পৌরহিত্য, ধর্মীয় কার্যকলাপ, উপাসনা আর নিয়ম-কানুন রচনায় অতিবাহিত করেছিলেন কঁতে তাঁর শেষ বয়স। পৌত্তলিক দেবদেবী আর মধ্যযুগীয় সন্তদের নামধাম বাদ দিয়ে সে জায়গায় মানব-প্রগতির বীরদের নাম লিখে নতুন এক ক্যালেণ্ডার রচনার প্রস্তাবও তিনি করেছিলেন। একজন রসিক লোক বলেছেন, কঁতে সব রকম উদার ধর্মেরই প্রচারক ছিলেন, স্রেফ খ্রীস্ট-ধর্ম ছাড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজি চিন্তা প্রবাহের সঙ্গেই 'প্রামাণ্যবাদী' আন্দোলনের ছিল বেশী সঙ্গতি—প্রথমোক্ত চিন্তাধারা শক্তি লাভ করেছিল শিল্প আর ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আর তা হয়ে উঠেছিল বস্তুগত ঘটনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বেকনীয় চিন্তার ঐতিহ্য স্বভাবতই ইংরেজি চিন্তাকে করে তোলে বস্তুমুখীন আর মনকে নিয়ে যায় পার্থিবের দিকে। হব্সের (Hobbes) বস্তুবাদ, লকের (Locke) চেতনাবাদ, হিউমের (Hume) সংশয়বাদ, বেন্থামের (Bentham) ব্যবহারবাদ এসবই হচ্ছে এক ব্যবহারিক আর ব্যস্ত জীবনেরই নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি। এ ঘরোয়া সিম্ফনিতে বার্কলে (Berkley) হচ্ছেন এক বিরুদ্ধ সুর। দৈহিক বা বাহ্যিক আর রাসায়নিক যন্ত্রকে 'দার্শনিক হাতিয়ার' নাম দিয়ে সম্মান দেখাবার ইংরেজদের এ অভ্যাসের প্রতি হেগেল বিদ্রূপের হাসি হাসতেন। কিন্তু এ নাম যাঁরা কঁতে আর স্পেন্সারের মতো দর্শন যে সব বিজ্ঞানের সাধারণীকরণেরই ফল এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাঁদের কাছে মোটেও অস্বাভাবিক মনে হতো না। এ কারণেই 'প্রামাণ্যবাদী আন্দোলন' তাঁর জন্মভূমির চেয়ে ইংলণ্ডেই বেশী পেয়েছিল সমর্থন। তবে সহৃদয় লিটারের (Littri) মতো অত উৎসাহী তাঁরা ছিলেন না বটে কিন্তু ইংরেজ চরিত্রের নাছোড়বান্দা ভাবের জন্য হয়তো স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬—৭৩) আর ফ্রেডেরিক হ্যারিসন (১৮৩১—১৯২৩) কঁতের দর্শনের প্রতি সারাজীবন ছিলেন বিশ্বস্ত। অবশ্য তাঁদের ইংরেজসুলভ স্বাভাবিক সাবধানতা তাঁদের কঁতের আনুষ্ঠানিক ধর্ম থেকে রেখেছিল দূরে।

ইত্যবসরে, সামান্য বিজ্ঞান-চেতনা যে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করেছিল বিনিময়ে বিজ্ঞানকে তাই জোগালে অধিকতর প্রেরণা। নিউটন আর হার্সেল (Herschel) নক্ষত্রমণ্ডলকে নিয়ে এলো ইংলণ্ডে, বয়লে (Boyle) আর ডেভি (Davy) খুলে দিলে রসায়নের ভাণ্ডার-দ্বার। ফেরাডে (Faraday) যে সব আবিষ্কার করছিলেন তা বৈদ্যুতিকায়ত্ত করে তুলবে পৃথিবীকে, রামফোর্ড (Ramford) আর জাউল (Joule) দেখাচ্ছিলেন কি করে শক্তিকে রূপান্তরিত করতে হয় আর কি করে তার সমতা বিধান করে শক্তি বা এনার্জি সংরক্ষণের করতে হয় ব্যবস্থা। বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছিল এক জটিল অবস্থার দিকে তাই হতবুদ্ধি পৃথিবী যেন চাচ্ছিল এক সমন্বয়। কিন্তু এসব মননশীলতার প্রভাবের চেয়েও হার্বাট স্পেন্সারের তরুণ বয়সে ইংলণ্ডকে বেশী মাতিয়ে তুলেছিল জীববিদ্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমোন্নতি আর বিবর্তনবাদ। এ মতবাদের বিকাশের বেলায় বিজ্ঞান সব সময় বজায় রেখেছে তার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগী: কান্ট বলেছিলেন বানরেরও মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, গ্যেটে লিখেছেন উদ্ভিদের রূপান্তর সম্বন্ধে, ইরেস্‌মাস ডারউইন (**Erosmas Darwin**) আর লেমার্ক (**Lamarch**) যে মতবাদের প্রবক্তা সে মতবাদ অনুসারে খুব সরল অবয়ব থেকে, ব্যবহার ও অব্যবহারের জন্মলব্ধ প্রভাবের ফলেই সব প্রাণীর উৎপত্তি। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে সেন্ট্‌ হিলেয়ার (**St. Hilaire**) বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে এক স্মরণীয় বিতর্কে কিউভারের (**Cuvier**) উপর জয়লাভ করে সারা য়ুরোপকে বিস্মিত আর বৃদ্ধ গ্যটেকে করে দিয়েছিলেন খুশী—ঐ ছিল যেন অপরিবর্তনীয় নিয়মকানুন আর অপরিবর্তনীয় বিশ্ব-বিধানের ধারণার বিরুদ্ধে আর এক বিদ্রোহ।

আঠারো শতকের পঞ্চ দশকে বিবর্তনের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে বাতাসে। ডারউইনের অনেক আগেই স্পেন্সার **The Development of Hypothesis** নামক এক প্রবন্ধে যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২তে আর ১৮৫৫য় প্রকাশিত তাঁর **Principles of Psychology** গ্রন্থে এ মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে লিনায়িন সমিতির (**Linnaean Society**) সামনে ডারউইন আর ওয়ালেস (**Wallace**) তাঁদের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম পাঠ করেন আর ১৮৫৯-এ যখন **Origin of Species** প্রকাশিত হলো তখন সব সৎ পাদ্রীদের ধারণা হলো এবার পুরোনো পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন। এবার আর বিবর্তন সম্বন্ধে অস্পষ্ট আর অনির্দিষ্ট অনুমান নয়—কিভাবে যেন নিম্নতর প্রাণী থেকে উচ্চতর প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেছে এমন সব আন্দাজী কথার স্থান আর নেই এখন। বরং "প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা অথবা জীবন-যুদ্ধে অনুগৃহীত শ্রেণীর আত্মরক্ষার" যে প্রকৃত ও বাস্তব পদ্ধতির ফলে বিবর্তন ঘটে এখানে সে মতই প্রতিষ্ঠা পেলো বিস্তৃততার প্রচুর প্রামাণ্য দলিলের সাহায্যে। এক দশকের মধ্যেই সারা পৃথিবী বলতে শুরু করলো বিবর্তনের কথা। চিন্তার এ তরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় স্পেন্সারের স্থান হওয়ার বড় কারণ এক আশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গে তিনি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের ভাবধারাকে প্রয়োগের দিয়েছেন নির্দেশ আর তাঁর মনের পরিধি এত বিশাল ছিল যে প্রায় সব জ্ঞানকেই তিনি তাঁর এ মতের অনুগত করে নিতে হয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্ষম। সপ্তদশ শতাব্দীতে যেমন অঙ্কেরই কর্তৃত্ব ছিল দর্শনের উপর, যার ফলে পৃথিবী পেয়েছে ডেস্‌কার্টেস (Descartes), হব্‌স (Hobbes), স্পিনোজা (Spinoza), লিব্‌নিটজ্ (Leibnitz) আর প্যাসকেলকে (Pascal) আর যেমন মনস্তত্ব বার্কলে (Berkely), হিউম (Hume), কণ্ডিলাক (Condillac) আর কান্টকে (Kant) জুগিয়েছে দর্শনের প্রেরণা তেমনি উনবিংশ শতাব্দীতে জীববিদ্যা হয়েছে শেলিং (Schelling) আর শোপেনহাওয়ারের (Schopenhauer), স্পেন্সার (Spencer), নীট্‌শে (Nietzsche) আর বার্গসঁর (Bergson) দার্শনিক চিন্তার পটভূমি। প্রতিক্ষেত্রেই যুগীয় ভাবধারার বিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপেরই ঘটেছে প্রকাশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির মাধ্যমে—কম আর বেশী অস্পষ্টভাবে। কিন্তু যাঁরা এ ভাবাধারার সমন্বয় সাধন করে তাকে উজ্জ্বলতর করতে চেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে এসব ভাবের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে আছে যেমন নতুন পৃথিবীর একটি মানচিত্র এঁকেছিলেন বলে সে পৃথিবী আজও আমেরিগো ভেস্‌পুচ্চির (Amerigo Vespucci) নামে হয়ে আছে পরিচিত। হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন ডারউইন যুগের ভেস্‌পুচ্চি এবং কিছুটা তার কলাম্বাসও।

AMARBOI.COM

২. স্পেন্সারে মানস-বিকাশ

১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ডার্বিতে তাঁর জন্ম। মা আর বাবা দুই দিকের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী (Non-conformist of Dissenter)। তাঁর পিতামহী জন ওয়েসলির (John Wesley) গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। তাঁর পিতৃব্য থোমাস, যদিও ইংলণ্ডের চার্চ মতাবলম্বী পাদ্রী ছিলেন কিন্তু চার্চের অভ্যন্তরে চালাতেন ওয়েসেলীয় (Wesleyan) আন্দোলন, তিনি কোনদিন দেখতে যাননি কন্‌সার্ট বা নাটক আর সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ করতেন রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনে। ধর্ম-দ্রোহের প্রতি প্রবণতা তাঁর পিতার ক্ষেত্রে আরো প্রবল হয়ে ওঠে যা হার্বার্ট স্পেন্সারে পরিণতি লাভ করে উগ্র আর অদম্য ব্যক্তিত্ববাদে। কোন কিছুর ব্যাখ্যায় তাঁর পিতা অপ্রাকৃতের আশ্রয় নেননি, তাঁর সম্বন্ধে এক পরিচিতজনের মন্তব্য (যদিও হার্বার্টের মতে এ স্রেফ অতিরঞ্জন): "যতখানি বুঝতে পারা যায় তাতে মনে হয় তাঁর বিশ্বাস বা ধর্ম কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না।" বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর মতি ছিল, লিখেছিলেন এক **Inventional Geometry**। রাজনীতিতে তিনি পুত্রের মতই ছিলেন ব্যক্তিত্ববাদী এবং "যত বড় পদ আর পদবীরই হোক না তিনি কারো কাছে নোয়াতেন না মাথা। মা যখন তাঁকে কোন প্রশ্ন করতেন, বুঝতে না পারলে তিনি চুপ করে থাকতেন, প্রশ্নটা ফিরে আর করতেন না জিজ্ঞাসা, ছেড়ে দিতেন নিরুত্তরে। নিরর্থক হলেও সারাজীবন এই তিনি করতেন—এতে অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি।" এ থেকে আমাদের স্মরণে জাগে শেষ বয়সে হার্বার্ট স্পেন্সার নিজে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদির প্রসারের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন সে সব কথা (অবশ্য নীরবতা ছাড়া)।

তাঁর পিতা, পিতামহ আর এক চাচা বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন—তবুও যে ছেলে একদিন ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতির অধিকারী হবেন তিনি প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত এক রকম অশিক্ষিতই থেকে গিয়েছিলেন। হার্বার্ট ছিল অলস আর বাবা দিতেন প্রশ্রয়। তের বছর বয়সে, লেখাপড়া করার জন্য তাঁকে হিন্টনে (**Hinton**) তাঁর চাচার কাছে, সে চাচার আবার খুব কড়া বলে সুনাম ছিল, পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হার্বার্ট কিন্তু অবিলম্বে চাচাকে ছেড়ে পালালেন, সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে, সামান্য রুটি আর বিয়ার সম্বল করে ডার্বিতে মা-বাপের কাছে এসে হলেন হাজির। ডার্বি পেঁছিতে তিনি নাকি প্রথম দিন ৪৮ মাইল দ্বিতীয় দিন ৪৭ মাইল আর তৃতীয় দিন কুড়ি মাইল হেঁটেছিলেন। যাই হোক কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি হিন্টন ফিরে এসেছিলেন এবং ছিলেন তিন বছর। ঐ ছিল তাঁর একমাত্র নিয়মিত স্কুলে পড়া। পরে, তিনি বলতে পারেননি কি তিনি শিখেছিলেন ওখানে—শিখেননি ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান অথবা সাধারণভাবে সাহিত্য। কিছুটা যে দম্ভের সঙ্গে তিনি বলেছেন: "শৈশবে কি যৌবনে ইংরেজিতে আমার একটা পাঠ গ্রহণও হয়নি, এখন পর্যন্ত, বাক্যগঠন সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র সাধারণ শিক্ষালাভও ঘটেনি। এটা জানা দরকার, কারণ এর ফলাফল সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম সার্বিকভাবে স্বীকৃত সব অনুমানসিদ্ধ ধারণা রয়েছে।" চল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইলিয়াড্ (**Iliad**) পড়তে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু "ষষ্ঠ বই পর্যন্ত পড়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে হলো এটা শেষ করা কি এক কঠিন কাজ—এ বই শেষ পর্যন্ত পড়ার চেয়ে বেশ কিছু মোটা টাকা দান করে দেওয়াই সহজ।" তাঁর অন্যতম সেক্রেটারী কলিয়ার (Kollier) বলেছেন স্পেন্সার বিজ্ঞানের কোন বই-ই শেষ পর্যন্ত পড়েন নি। যেটা তাঁর প্রিয় বিষয় তাতেও তিনি কোন রকম ধারাবাহিক শিক্ষা পাননি। রসায়ন চর্চা করতে গিয়ে কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন আর পুড়িয়েছেন নিজের আঙুল। বাড়ীতে আর স্কুলে ছারপোকার মধ্যে বসে কীটতত্ত্ব করতে গিয়ে তিনি তৃণ-পল্লব খেয়েও দেখেছেন—শেষের দিকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে মাটির স্তর-বিন্যাস আর ফসিল বা শিলাভূত বস্তু সম্বন্ধেও কিছু শিখেছিলেন। বাদবাকি বিজ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছেন তাঁর কাজের মধ্যে থেকেই। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি কিছু ভাবেনইনি। পরে তিনি লিউয়েসকে (Lewes) পড়ে নিয়ে কান্ট পড়তে করেছিলেন শুরু কিন্তু যখন দেখতে পেলেন তন্ময় (Objective) বস্তু বাদ দিয়ে কান্ট স্থান আর কালকেই সচেতন-উপলব্ধি মনে করে নিয়েছেন তখন তাঁর ধারণা হলো কান্ট নেহাত মূর্খ আর বইটা ফেল্লেন ছুঁড়ে। তাঁর সেক্রেটারী বলেছেন স্পেন্সার যখন তাঁর প্রথম বই Social Statics লেখেন তখন তিনি জোনাথন ডায়মণ্ড (Jonathan Dymond) লিখিত এক অতি পুরোনো আর এখন বিস্মৃতনাম এক রচনা ছাড়া নীতিকথা সম্বন্ধীয় আর কোন কিছুই পড়েননি।" শুধু হিউম (Hume), ম্যানসেল (Mansel) আর রীড্‌কে (Reid) পড়ার পরই তিনি তাঁর Psychology লিখেছেন, আর তাঁর Biology লিখেছেন স্রেফ কার্পেন্টারের (Carpenter) Comparative Physiology পড়েই (এমনকি Origin of Speciesও না পড়ে)—তাঁর Sociology লিখেছেন কঁতে (Comte) বা টেলার (Tylor) পড়া ছাড়াই আর তাঁর Ethics লিখেছেন কান্ট্ বা মিল অথবা এক সেজভিক (Sedgwik) ছাড়া অন্য কোন নীতিবিদের রচনা না পড়েই। জন স্টুয়ার্ট মিলের গভীর আর ব্যাপক অধ্যয়নের সঙ্গে কি এক চমৎকার বৈপরীত্য!

তা হলে তাঁর সহস্র রকমের যুক্তিকে দাঁড় করাবার জন্য এত ঘটনা বা উপকরণ তিনি কোথায় পেলেন? তার অধিকাংশই তিনি অধীত বিদ্যা থেকে সংগ্রহ না করে 'কুড়িয়ে নিয়েছেন' প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাঁর কৌতূহল ছিল সদা-জাগ্রত, কোন বিশেষ দৃশ্যের প্রতি, যা এতক্ষণ ধরে তিনি একাই হয়তো দেখছিলেন, তাঁর সঙ্গীর মনোযোগ আকর্ষণ করতেন সব সময়।" এথেনিয়াম ক্লাবে (Athenaeum Club) বসে তিনি হাক্সলী আর তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে তাঁদের বিশেষজ্ঞ-সুলভ জ্ঞান যেন চুষে নিতেন। চোখ বুলাতেন ক্লাবের সব সাময়িকীর উপর, তাঁর পিতার হাত হয়ে ডার্বির দার্শনিক সমিতিতে যে সব পত্র-পত্রিকা আসতো তা না পড়েও ছাড়তেন না তিনি—"তাঁর জাঁতায় যা কিছু পেষনীয় বোধ করতেন তেমন প্রত্যেকটা উপকরণ তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে নিতেন।" তাঁর লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে আর কেন্দ্র-ভাব হিসেবে বিবর্তনের সন্ধান পেয়ে যার দিকে তাঁর সব রচনার হয়েছে আবর্তন, এবার তাঁর মস্তিষ্ক হয়ে উঠল যেন প্রয়োজনীয় সব উপকরণের এক চুম্বক আর তাঁর চিন্তার অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধ সব উপকরণকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাজিয়ে নিতে হতো সক্ষম। এটা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নয় যে গরীব, বণিক সবাই তাঁর কথা শুনে খুশী হতো, তারা তাঁর কাছে এমন এক মনের সন্ধান পেতো যা তাদের মনের সঙ্গে অভিন্ন—যিনি কেতাবী-বিদ্যার সঙ্গে অপরিচিত আর তথা-কথিত 'সংস্কৃতি'রও যিনি শিকার নন্ অথচ যেসব লোক কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে করতেই জ্ঞান লাভ করে তাদের মতো তাঁরও রয়েছে এক স্বাভাবিক আর বাস্তব জ্ঞান আহরণের শক্তি।

কারণ তিনি নিজেও কাজ করে জীবিকা অর্জন করতেন—তাঁর পেশা তাঁর চিন্তার ব্যবহারিক দিকটাকে করে তুলতো অনুপ্রাণিত। তিনি রেল লাইন আর পোলের সার্ভেয়ার, পরিদর্শক আর নক্শা-রচয়িতা অর্থাৎ সাধারণ কথায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সুযোগ পেলেই আবিষ্কারে মেতে উঠতেন, কিন্তু সবই হতো ব্যর্থ—তাঁর আত্মজীবনীতে এসব ব্যর্থ-কর্মের দিকে তিনি অবাধ্য সন্তানের প্রতি পিতৃ-স্নেহের যে মমতা সে মমতার সঙ্গেই তাকিয়ে দেখেছেন। তাঁর জীবন-স্মৃতির পাতায় পাতায় ভূগর্ভে লবণ-ভাণ্ডার, জাগ্ বাতি নির্বাপক, পঙ্গু-চেয়ার এ ধরনের আরো বহু কিছুর পরিকল্পনার কথা ছড়িয়ে আছে। আমাদের অনেকে যেমন করে থাকেন তেমনি তিনিও যৌবনে নতুন নতুন খাদ্য আবিষ্কার করেছিলেন। কিছু দিনের জন্য তিনি নিরামিষাশীও হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু যখন দেখতে পেলেন তাঁর সঙ্গী এক নিরামিষাশী রক্তহীন হয়ে পড়েছেন আর তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেও দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন তখন ছেড়ে দিলেন নিরামিষ ভক্ষণ। তিনি লিখেছেন, "দেখছি নিরামিষালী থাকা অবস্থায় যা লিখেছি তা এত প্রাণ-হীন যে সেসবকে আবার নতুন করে লিখতে হচ্ছে।" সে সময় তিনি সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখতে চাইতেন, এমন কি তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডে গিয়ে বসতি স্থাপন করতেও। একটুও ভাবেননি যে অমন নতুন দেশে দার্শনিকের কোন প্রয়োজনই হবে না। এও হয়তো তাঁর এক বৈশিষ্ট্য—যাওয়ার পক্ষে আর বিপক্ষে তিনি পাশাপাশি যুক্তির দু'টি তালিকা করে প্রত্যেক যুক্তির পাশে নম্বর দিয়ে তা যোগ করে দেখলেন লণ্ডনে থাকার পক্ষে নম্বর হয়েছে ১১০ আর লণ্ডন ত্যাগ করে যাওয়ার পক্ষে হয়েছে ৩০১, কিন্তু তিনি থেকেই গেলেন।

তাঁর চরিত্রের গুণাবলীর মধ্যে ত্রুটিও নিহিত ছিল না তা নয়; কঠোর বাস্তব-বোধ আর অতিমাত্রায় ব্যবহারিক চেতনার কাছে তাঁকে বিকাতে হয়েছে কাব্য আর শিল্প রস। তাঁর রচিত বিশ খণ্ড গ্রন্থে কবিত্বের একটুমাত্র যে ছোঁয়া লেগেছে তাও এক মুদ্রাকরেরই কল্যাণে: "বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ কথনের দৈনিক কাব্যায়ন।" তাঁর অধ্যবসায় এত বেশী ছিল যে যা পরিণামে হয়ে দাঁড়াতো মূর্খামিতে একগুঁয়েমি, তাঁর কাল্পনিক প্রতি-পাদ্যের প্রমাণের খোঁজে তিনি সারা পৃথিবী চষে বেড়াতেন কিন্তু অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধির কোন অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর ছিল না। তাঁর অহংবোধ 'প্রচলিত ধর্ম-বিরোধী'রই যেন পরিচয় চিহ্ন—তাঁর মহত্ত্বের সঙ্গে মিশেছিল কিছুটা দম্ভও যেন। পথিকৃতের গণ্ডীবদ্ধতা তাঁর ছিল—গভীর মৌলিকতা আর অপক্ষপাত দুঃসাহসের সঙ্গে তাঁর মধ্যে মিশেছিল অটল-বিশ্বাসী সংকীর্ণতাও। কঠোরভাবে দূরে সরিয়ে রাখতেন সব রকম স্তুতিবাদ। প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রস্তাবিত সরকারী সম্মান, কিছুটা নির্জনতায় থেকে, চির ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁর নিজের দুঃসহ কাজ তিনি করে গেছেন। তবুও কোন কোন মস্তিষ্কতত্ত্ববিদ, যাঁদের তাঁর কাছে প্রবেশাধিকার ছিল, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন তিনি "অত্যন্ত বেশী আত্মমর্যাদা সচেতন" ছিলেন। শিক্ষকের ছেলে আর শিক্ষকের নাতি নিজের বইতে বেত চালাতে কসুর করেননি আর সর্বত্র ফুটে উঠেছে উচচ উপদেশের স্বর। তিনি নিজেই বলেছেন: "আমি কখনো হইনি হতবুদ্ধি।" তাঁর একক কুমার জীবনে মানবীয় গুণাবলীর উত্তাপের অভাব ছিল অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছা করলে তিনি প্রায় বিরক্তিকরভাবে মানবীয় হতেও পারতেন। সুবিখ্যাত ইংরেজ মহিলা জর্জ ইলিয়টের সঙ্গে তাঁর একবার কিছুটা প্রণয় ব্যাপার ঘটেছিল কিন্তু অত বেশী মননশীলার পক্ষে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারার কথা নয়। তাঁর কোন রসবোধ ছিল না—তাঁর রচনা শৈলীতেও তাই সূক্ষ্মতার ছিল অভাব। তাঁর প্রিয় খেলা বিলিয়ার্ড আর তাতে হেরে গেলে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে এ বলে নিন্দা করতেন যে, এমন একটা বাজে খেলায় দক্ষ হওয়ার জন্য এত সময় নষ্ট করতে আছে। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর প্রথম দিকের বইগুলির আলোচনা করেছেন কিভাবে আলোচনা করতে হয় তা দেখাবার জন্য।

তাঁর কাজের বিশালত্বই হয়তো তাঁকে জীবনের প্রতি করে তুলেছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত গম্ভীর। তিনি প্যারিস থেকে একবার লিখেছিলেন: "রবিবার আমি সেন্ট্ ক্লাউড (St. Cloud) উৎসবে গিয়েছিলাম। বয়স্কদের ছেলেমি দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। ফরাসিরা দেখছি সব সময় ছেলেই রয়ে গেল—আমরা যেমন (ছোটকালে) আমাদের মেলা ইত্যাদিতে করতাম, দেখলাম এখানে পক্ককেশ বুড়োরাও তেমনি নাগরদোলায় চড়ছে।" জীবনকে বিশ্লেষণ করতে আর ব্যাখ্যা করতে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে তা যাপন করার সময়ই পাননি। নায়াগ্রা জল-প্রপাত দেখে এসে তিনি তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন: "আমি যেমন আশা করেছিলাম প্রায় তেমনই।" খুব তুচ্ছ ঘটনাও তিনি অত্যন্ত পণ্ডিতি ভাষায় প্রকাশ করতেন। যেমন জীবনে একবার যে শপথ করেছিলেন তার বর্ণনার বেলায়। তিনি তেমন কোন সংকটে পড়েননি, পড়েননি প্রেমেও। (অবশ্য তাঁর স্মৃতিকথা যদি সঠিক হয়ে থাকে)—কিছুটা অন্তরঙ্গতা যে ঘটেনি তা নয় তবে তিনি তারও বর্ণনা দিয়েছেন একদম গাণিতিকভাবে। তাঁর নিরুত্তাপ বন্ধুত্বের খিলান রচনা করতেন তিনি কোন রকম উর্ধ্বায়িত আবেগের ছোঁয়া ছাড়াই। তাঁর এক বন্ধু তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি তরুণী স্টেনোগ্রাফারদের কখনো ভালো শ্রুতিলিপি দিতে পারতেন না। স্পেন্সার বলতেন ঐ সম্বন্ধে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। তাঁর সেক্রেটারী বলেছেন: "তাঁর আবেগবিহীন সরু ঠোঁট দেখেই বোঝা যায় তাঁর মধ্যে প্রবৃত্তির একান্তই অভাব, আর হাল্কা চোখ প্রমাণ দেয় তাঁর মধ্যে গভীর আবেগও অনুপস্থিত।" এ কারণেই তাঁর রচনাশৈলীতেও দেখা যায় একঘেঁয়ে সমতলতা, তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো উর্ধ্বগামী নন, কোন বিস্ময়বোধক চিহ্নও নেই তাঁর রচনায়। এক রোমান্টিক শতাব্দীতে তিনি যেন আত্মমর্যাদা আর গাম্ভীর্যের এক প্রস্তরীভূত পাঠ হয়েই দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁর মন ছিল অসাধারণ যুক্তিশীল। তিনি তাঁর যুক্তিকে সাধারণ থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে আর পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে দক্ষ দাবা খেলোয়াড়ের মতো নির্ভুলভাবে চালাতে পারতেন। আধুনিক ইতিহাসের সব জটিল বিষয়েরই তিনি ছিলেন স্বচ্ছতম ভাষ্যকার। সব কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে তিনি এমন এক প্রাঞ্জল ভাষায় লিখেছেন যে এক প্রজনন ধরে সবাই যেন দর্শন-প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন: "বলা হয়েছে আমার নাকি ব্যাখ্যা করার অসাধারণ শক্তি আছে—আর আছে আমার সংখ্যাগুলো সাজিয়ে নিয়ে, যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার এক অসাধারণ স্বচ্ছতা আর সংহতি"। তিনি ব্যাপক সাধারণীকরণ ভালোবাসতেন, তাঁর রচনাকে আকর্ষণীয় করে তুলতেন প্রমাণের চেয়ে কল্প সিদ্ধান্তের দ্বারা। হাক্সলী (Huxley) বলেছেন, স্পেন্সারের মতে ট্রেজেডি মানে ঘটনার দ্বারা মতবাদের (Theory) বিনাশ আর স্পেন্সারের মনে এত বেশী মতবাদ ছিল যে প্রতিদিনই তাঁর পক্ষে এক একটি ট্রেজেডির সাক্ষাৎ পাওয়া অনিবার্য। বাকলের (Buckle) দুর্বল আর দ্বিধান্বিত পদক্ষেপ দেখে হাক্সলী স্পেন্সারকে বলেছিলেন: "এমন একটা লোককে দেখতে পাচ্ছি যিনি মাথা-ভারী।" তার সঙ্গে স্পেন্সার যোগ করলেন: "বাকলে তাঁর গঠন-ক্ষমতার অনেক বেশী বস্তু গলাধঃকরণ করেছেন।" স্পেন্সার ছিলেন এর বিপরীত, তিনি যা গ্রহণ করেছিলেন তার অনেক বেশী গঠন করেছেন। তিনি সংযোগ আর সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন—এর বিপরীত ছিলেন বলে তিনি কার্লাইলের প্রতি ছিলেন বিমুখ। অতিমাত্রায় শৃঙ্খলা-প্রীতি তাঁর যেন এক বাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তাঁকে যেন পেয়ে বসেছিল। --নিখুঁতভাবে সাধারণীকরণ স্পৃহা। পৃথিবীও যেন এমন মনেরই প্রত্যাশী ছিল—যে মন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীকে সূর্যালোকের স্বচ্ছতায় রূপান্তরিত করে একটা সভ্য অর্থ দিতে সক্ষম। তাঁর সমসাময়িক যুগকে তিনি যে অবদান দিয়ে গেছেন তার ত্রুটি তাঁর মানবীয় সত্তারই প্রমাণ। তাঁর ছবিটা এখানে কিছুটা মেলাখোলাভাবে তুলে ধরার কারণ, যে মহৎ ব্যক্তির ত্রুটি সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল তাঁকেই আমরা বেশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ভালবাসি, দোষ-ক্রটি মুক্ত দীপ্তিমান নিখুঁত মানুষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি কিছুটা সন্দেহজনক আর অপসন্দের।

চল্লিশ বছর বয়সে স্পেন্সার লিখেছেন : "এ পর্যন্ত আমার জীবনটাকে সঠিকভাবে বল্লে এক পাঁচ মিশেলিই বলা যায়।" এমন চঞ্চল অস্থির-চিত্ততা দার্শনিকদের জীবনে কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি লিখেছেন : "এ সময় (তাঁর বয়স তখন তেইশ) আমার মন একবার ঘড়ি তৈরীর দিকে ঝুঁকেছিল।" ধীরে ধীরে তিনি নিজেও আপন ক্ষেত্র পেয়েছিলেন খুঁজে এবং অত্যন্ত আন্তরিক সততার সঙ্গে তারই করেছেন কর্ষণ। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'Non-Conformist' পত্রিকায় (বাহন বা মাধ্যমটি লক্ষ্য করার মতো) 'সরকারের যথাযথ এলাকা' (The Proper Sphere of Government) সম্বন্ধে কতকগুলি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন, তাতে তাঁর পরবর্তী দর্শন প্রায় অপরিবর্তিতভাবেই বিধৃত ছিল ভ্রূণাবস্থায়। ছ' বছর পরে 'The Economist' পত্রিকা সম্পাদনা করার জন্য তিনি তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা ছেড়ে এসেছিলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি যখন জোনাথন ডাইমণ্ডের (Jonathan Dymound) 'Essays on the Principles of Morality' সম্বন্ধে খুব বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন তখন তাঁর বাবা বিরক্ত কণ্ঠে তাঁকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন, এ রকম আর একটা নিজে লেখ দেখি। এক দুঃসাহসে ভর করে তিনি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন আর লেখেন তাঁর 'Social statics'। ঐ বই বেশী বিক্রি হয়নি বটে কিন্তু তার ফলে সব সাময়িকীর দ্বার হলো তাঁর জন্য উন্মুক্ত। ১৮৫২-তে তিনি লেখেন তাঁর 'The Theory of Population' প্রবন্ধ (উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যালথাসের চিন্তার প্রভাব যে কতখানি ছিল তার অন্যতম নিদর্শন), এ প্রবন্ধে তিনি জীবন-যুদ্ধে যোগ্যতমেরই জয় হয়ে থাকে' এ মত প্রকাশ করেছিলেন, গঠন করেছিলেন ঐ সব ঐতিহাসিক প্রবাদ বাক্য। সে একই বছর তিনি তাঁর 'The Development of Hypothesis প্রবন্ধে সাধারণ যে আপত্তি : প্রাচীন প্রজাতির ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি-স্থল সৃষ্টি হয় এ কখনো দেখা যায়নি, তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, এ যুক্তি বরং ঈশ্বরের "বিশেষ সৃষ্টি" হিসেবে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির যে মতবাদ তার বিরুদ্ধেই বেশী করে প্রয়োগ করা যায় আর তিনি দেখিয়েছেন নতুন প্রজাতির উদ্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা জীবকোষ বা শুক্রাণু থেকে একটা মানুষ বা একটা বীজ থেকে একটা বৃক্ষের উৎপত্তির চেয়ে কিছুমাত্র আজগুবী বা অবিশ্বাস্য নয়। ১৮৫৫-তে তিনি তাঁর 'The Principles of Psychology'-তে মনের বিবর্তনধারা অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছেন ; তারপর ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'Progress, Its Law and Cause' প্রবন্ধে তিনি ভন বেয়ারের (Von Bear) সব জীবিত পদার্থ সমজাতীয় সূচনা থেকে ধীরে ধীরে বিচিত্র জাতীয় হয়ে ওঠার মতটাকে গ্রহণ করে তাকে ইতিহাস আর প্রগতির সাধারণ সূত্রে উন্নীত করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, স্পেন্সার যুগ-ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে উঠেছেন এবং এখন বিশ্ব-বিবর্তনের দার্শনিক হওয়ার জন্য হয়েছেন প্রস্তুত। ১৮৫৮-তে তিনি যখন সংকলন আকারে তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রকাশের জন্য আবার পড়ে দেখেছিলেন তখন লেখাগুলির মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য আর ধারাবাহিকতা দেখে তিনি নিজেই হয়েছিলেন বিস্মিত। উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশের মতো হঠাৎ তাঁর মনে জাগলো বিবর্তন-বাদ জীব-বিদ্যার মতো সব বিজ্ঞানেইত প্রয়োগ করা সম্ভব। এ দিয়ে শুধু যে প্রজাতি আর প্রজনন ব্যাখ্যা করা যায় তা নয়, গ্রহ-নক্ষত্র, স্তর-বিন্যাস, সামাজিক আর রাজনৈতিক ইতিহাস, নীতি আর সৌন্দর্য উপলব্ধি সব কিছুরই করা যায় ব্যাখ্যা। এ গ্রন্থ-মালা রচনার কল্পনায় তিনি হয়ে উঠলেন উদ্দীপিত যাতে তিনি মন আর পদার্থের বিবর্তন নীহারিকা থেকে মানুষে আর বর্বর থেকে শেক্সপিয়রে কি করে ঘটেছে তা দেখাবেন। কিন্তু যখন মনে হলো তিনি প্রায় চল্লিশে এসে পৌঁছেছেন তখন অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। কি করে এমন এক বৃদ্ধ আর পঙ্গু মানুষের পক্ষে মৃত্যুর আগে সব মানববিদ্যা পরিক্রম সম্ভব হবে? মাত্র তিন বছর আগে তাঁর শরীর সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল, আঠারো মাস তিনি অথর্ব আর পঙ্গু হয়েছিলেন, স্থান থেকে স্থানান্তরে আশাহীন, লক্ষ্যহীনভাবে ভগ্ন মনে, ভগ্ন সাহসে বেড়িয়েছেন ঘুরে ঘুরে নিজের সুপ্ত শক্তির সচেতনতা তাঁর অক্ষমতাকে করে তুলেছিল আরো তিক্ত। তাঁর বিশ্বাস তিনি আর কখনো সুস্থ হবেন না—এক ঘণ্টার বেশী তিনি কোন রকম চিন্তা-চর্চাই করতে পারতেন না একাধিক্রমে। যে কাজের সঙ্কল্প করেছেন তার পথে এমন বাধার সম্মুখীন বোধহয় কেউই কোনদিন হননি আর এমন শেষ বয়সে এত বড় কাজের সঙ্কল্পও বোধ করি কেউ কোনদিন করেননি গ্রহণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি দরিদ্র ছিলেন। জীবিকা সম্বন্ধে তেমন কোন চিন্তা করেননি কোনদিন। নিজেই বলেছেন: "জীবন চলার কথা আমি তেমন ভাবিনি। ঐ নিয়ে খুব দুর্ভাবনার বিশেষ মূল্য আছে বলেও আমি মনে করি না।" এক চাচার থেকে ২,৫০০ ডলারের মিরাছ পাওয়ার পর তিনি 'The Economist'-এর সম্পাদক পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন—আলস্যের দরুন এ টাকাও শেষ হয়ে যেতে দেরী লাগেনি। এ সময় তিনি ভাবলেন তাঁর পরিকল্পিত গ্রন্থমালার জন্য তিনি হয়তো আগাম চাঁদা নিয়ে তা দিয়ে কোন রকমে পেট চালিয়ে কাজে এগিয়ে যেতে পারবেন। সঙ্কল্পিত বইগুলির একটি রেখা-চিত্র তৈরী করে তা হাক্সলী, লিউয়েস্ ও অন্যান্য বন্ধুদের দিলেন—তাঁরা প্রাথমিক গ্রাহকদের একটা দীর্ঘ তালিকা তৈয়ের করে নিয়ে তাঁকে বল্লেন 'প্রস্তাবনায়' এঁদের নাম প্রকাশ করা যেতে পারবে। ঐ তালিকায় কিংস্‌লে, লায়েল, হুকার, টিণ্ডেল, বাকলে, ফ্রুড্, বেইন, হার্সেল এবং আরো অনেক নাম ছিল। ১৮৬০-এ ঐ প্রস্তাবনা প্রকাশের পর য়ুরোপ থেকে ৪৪০ আর আমেরিকা থেকে ২০০ গ্রাহক পাওয়া গেলো—এতে বছরে সর্বমোট, ১,৫০০ ডলারের প্রতিশ্রুতি মিল্লো। স্পেন্সার এতেই খুশী—তিনি সাগ্রহে মনোনিবেশ করলেন কাজে।

কিন্তু ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে 'First Principles' প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক গ্রাহকই নাম প্রত্যাহার করলেন কারণ এ বিখ্যাত "প্রথম খণ্ডে" বিজ্ঞান আর ধর্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দেখে পাদ্রী আর পণ্ডিতেরা একযোগে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আপোষ সাধন হয়ে দাঁড়ালো কঠিন। বিরাট এক গ্রন্থ-যুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো 'First Principles' আর 'The Origin of Species-এ যুদ্ধে ডারউইনবাদ আর অজ্ঞেয়বাদের পক্ষে প্রধান সেনাপতির ভূমিকা নিলেন হাক্সলী। কিছুদিনের জন্য ভদ্রসমাজ বিবর্তনবাদীদের প্রায় একঘরে করে রাখলেন। তাঁরা নিন্দিত হতে লাগলেন নীতিহীন দানব বলে, ওঁদেরে প্রকাশ্যে অপমান করা হয়ে দাঁড়ালো প্রশংসার বিষয়। স্পেন্সারের গ্রাহক কমতে লাগলো—অনেকে কিস্তি মতো বই পাওয়ার পরও চাঁদা দিলেন না। প্রতি সংখ্যায় যা ক্ষতি হচ্ছিল নিজের পকেট থেকে তা মিটিয়ে যতদিন পারলেন স্পেন্সার চালিয়ে গেলেন। অবশেষে নিজের পুঁজি আর সাহস দুই-ই খতম হয়ে এলো—অবশিষ্ট গ্রাহকদের জানিয়ে ছিলেন তাঁর অক্ষমতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় ঘটলো ইতিহাসের এক চমৎকার উৎসাহ-উদ্দীপক ঘটনা। স্পেন্সারের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী, 'First Principles' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইংরেজ দর্শনের যিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়, তিনি যখন দেখতে পেলেন বিবর্তনের দার্শনিকটি তাঁকে এবার ছাড়িয়ে গেলো, তখন ১৮৬৬-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, তিনি হঠাৎ এ চিঠিখানি লিখে বসলেন :

প্রিয় মহাশয়,

গত সপ্তাহে এখানে পৌঁছে আমি আপনার 'জীব-বিদ্যা'র ডিসেম্বর সংখ্যা দেখতে পেলাম। এ সঙ্গে আপনার বিশেষ ঘোষণাটি পড়ে আমি যে কতখানি মর্মাহত হয়েছি তা ভাষায় বলতে পারব না।....আমার অনুরোধ আপনি আপনার পরবর্তী সংখ্যাগুলো লিখে যান, প্রকাশকের ক্ষতিপূরণের দায়িত্বভার আমিই নেবো......আমার এ প্রস্তাবকে দয়া করে কোন রকম ব্যক্তিগত অনুগ্রহ মনে করবেন না। তা যদি মনে করেনও, তা হলেও আশা করি এটুকু করার অনুমতি আমাকে দেবেন। বস্তুতঃ এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য মোটেও তা নয়—বরং একটি জন-স্বার্থমূলক কাজে সহযোগি-তারই প্রস্তাব, শুধু যার জন্য আপনি আপনার শ্রম আর স্বাস্থ্য দুইই দিয়েছেন।

আমি, প্রিয় মহাশয়
আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত
জে. এস. মিল

স্পেন্সার সৌজন্যের সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু মিল তাঁর বন্ধু মহলে ঘুরে ফিরে অনেককে প্রত্যেকে আড়াই শ' করে বই (স্পেন্সারের বই) কেনার জন্য রাজি করিয়েছিলেন। এবারও স্পেন্সার আপত্তি করলেন—তাঁকে রাজি করানো গেল না কিছুতেই। এ সময় হঠাৎ অধ্যাপক য়ূমেনস (Youmans) এক চিঠি লিখে জানালেন স্পেন্সারের আমেরিকাবাসী অনুরাগী বন্ধুরা মিলে তাঁর নামে ৭ হাজার ডলারের 'জননিরাপত্তা' হেণ্ডনোট কিনেছেন যার সুদ বা লভ্যাংশ তিনি পাবেন। এবার তিনি রাজি হলেন। এ উপহারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে তুল্লো—তিনি নব-উদ্যমে শুরু করলেন কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চল্লিশ বছর ধরে কাঁধ লাগিয়ে রাখলেন চাকায়—যতদিন না সমগ্র 'Synthetic Philosophy' নিরাপদে মুদ্রিত হয়ে এসেছিল। রোগ শোক আর হাজারো বাধা-বিঘ্নের উপর মন আর সঙ্কল্পের এ বিজয় মানব-গ্রন্থে অন্যতম সূর্যকরোজ্জ্বল স্থান।

৩. প্রথম নীতিসমূহ (First principles)

ক. যা অজ্ঞেয়

সূচনায় স্পেন্সারের মন্তব্যঃ "আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে 'যাকে আমরা মন্দ বস্তু বলে থাকি তাতেও যে এক শুভ আত্মা' আছে তা শুধু নয় বরং ভুল বস্তুর মধ্যে সাধারণভাবে সত্যাত্মাও থাকে নিহিত।" তাই তাঁর সঙ্কল্প বিভিন্ন ধর্মমত পরীক্ষা করে সত্যের সে মর্ম কথাটুকুর সন্ধান করা, যা ধর্ম-বিশ্বাসের অনেক রকম রূপান্তর সত্ত্বেও ধর্মকে দিয়েছে মানব-মনের উপর অবিচ্ছিন্ন কর্তৃত্বের ক্ষমতা।

মুহূর্তে তিনি দেখতে পেলেন বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মতবাদই আমাদের নিয়ে পৌঁছায় ধারণাতীতে। নাস্তিক অকারণ, সূচনা-বিহীন এক স্বয়ম্ভু পৃথিবী ভাবতে চেষ্টা করে কিন্তু আমরা সূচনা-বিহীন আর অকারণ এমন কিছু ধারণা করতেই অক্ষম। ব্যাপারটিকে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা আরো এক ধাপ কঠিন করে তোলেন আর যে সব শাস্ত্র-বিদ বলেনঃ "ঈশ্বরই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন" তাঁদের প্রতি শিশুর নিরুত্তর প্রশ্ন হচ্ছেঃ "ঈশ্বরকে কে বানিয়েছেন?" অবশেষে দেখা যায় ধর্মীয় সব চরম মতামত যুক্তিসঙ্গত ধারণাতীতে গিয়েই ঠেকে।

সমভাবে সব বৈজ্ঞানিক মতামতও থেকে যায় যুক্তিসঙ্গত ধারণার বাইরে। পদার্থ কি? তাকে আমরা পরমাণুতে পরিণত করি তার পর অণুকে যে ভাবে আমরা ভাগ করেছি সেভাবে পরমাণুকেও বিভক্ত করতে বাধ্য হই। এভাবে আমরা বস্তুর অসীম বিভক্তিকরণের এক ধাঁধার সামনে গিয়ে পড়ি—তাও কিন্তু ধারণাতীত আবার তার বিভক্তিকরণও যে একটা সীমা রেখা আছে তাও করা যায় না ধারণা। একথা স্থান-কালের বিভক্তিকরণ সম্বন্ধেও সত্য—এ দুই-ইও শেষ পর্যন্ত এক অযৌক্তিক ধারণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতি ও মৈত্রেয়ী সবোধ্যতায় আবৃত—কারণ তা বস্তুর স্থান, কাল আর অবস্থায় ঘটায় পরিবর্তন। স্থিরভাবে যদি বস্তুকে বিশ্লেষণ করে দেখি তা হলে শক্তি ছাড়া আমরা আর কিছুই দেখিনা—যে শক্তি আমাদের বোধ-ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে তোলে অথবা যে শক্তি আমাদের কর্ম-ইন্দ্রিয়ে বাধার সৃষ্টি করে। শক্তি যে কি তা কে বলতে পারে? পদার্থ ছেড়ে মনস্তত্ত্বের কথা ভাবলে আমরা মনের আর চেতনার নাগাল পাই—এখানে পূর্বের চেয়েও অধিকতর ধাঁধার উৎপত্তি। "তা হলে চরম বৈজ্ঞানিক মতামত-গুলো সবই এমন সব বাস্তবতার প্রতিরূপ যা বোধগম্য নয়.......সব দিকেই বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান তাঁকে এমন এক হেঁয়ালীর সামনাসামনি এনে দাঁড় করায় যে যার কোন সমাধান নেই। এখন তিনি আরো বেশী করে বুঝতে পারেন সত্যই এ এক হেঁয়ালী, যে হেঁয়ালীর কোন সমাধান নেই। মানবীয় মননশক্তি যে একই সঙ্গে কত বড় আর কত ছোট তা তিনি মুহূর্তে বুঝতে পারেন—অভিজ্ঞতার এলেকায় যা আসে সে ব্যাপারে তার শক্তি আর যা অভিজ্ঞতা বহির্ভূত সে ব্যাপারে তার দুর্বলতা বা অক্ষমতা তিনি জানতে পারেন। অন্যের চেয়ে তিনিই ভালো করে জানেন যে কোন কিছুরই সত্যিকার স্বরূপ জানা যায় না।" হাক্সলীর ভাষায় অজ্ঞেয়-বাদ (অর্থাৎ জানি না বলাই) হচ্ছে একমাত্র সৎ দর্শন।

এ সব অস্পষ্টতার সাধারণ কারণ হচ্ছে সব জ্ঞানের আপেক্ষিকতা। "চিন্তা মানে সম্পর্ক স্থাপন, সম্পর্ক ছাড়া কোন চিন্তারই প্রকাশ সম্ভব নয়, মনন-শক্তি গড়ে ওঠে শুধু দৃশ্যমানের দ্বারা আর দৃশ্যমানের সঙ্গে আলাপের সাহায্যে, দৃশ্যমানের বাইরে তাকে প্রয়োগ করতে গেলেই লাভ হয় অর্থ-হীনতা।" তবুও আপেক্ষিক আর দৃশ্যমানতা তাদের নাম আর স্বভাবের অতিরিক্তও কিছু বুঝিয়ে থাকে—বুঝিয়ে থাকে এমন কিছু যা চরম আর স্বয়ংসম্পূর্ণ। "আমাদের নিজের চিন্তার কথা ভেবে দেখলেই দেখতে পাই দৃশ্যমানের পেছনে যে একটা যাথার্থ (Actuality) আছে তা ভুলে থাকা কি রকম অসম্ভব আর এ অক্ষমতার ফলেই সে যাথার্থ সম্বন্ধে একটা অটুট বিশ্বাস আমাদের মনে গড়ে ওঠে।" কিন্তু সে যাথার্থ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারি না।

এদিক থেকে দেখলে ধর্ম আর বিজ্ঞানের সমন্বয় তেমন আর কঠিন থাকে না। "সাধারণত সত্য দুই বিপরীত মতামতের সমন্বয়েই নিহিত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করলেই পারে যে তার "বিধি-বিধান" শুধু আপেক্ষিক আর দৃশ্যমানেই প্রয়োজ্য আর ধর্মেরও স্বীকার করা উচিত তার শাস্ত্র ধারণাতীত বিশ্বাসেরই এক যুক্তি দায়িনী উপকথা। ধর্মের উচিত নয় 'পরম সত্তাকে' অতি মানবরূপে চিত্রিত করা, নিষ্ঠুর, রক্ত-পিপাসু প্রবঞ্চক দানব হিসেবে চিত্রিত করা তো আরো জঘন্য—মানব-চরিত্রে যে তোষামোদ ঘৃণ্য বিবেচিত হয় সে তোষামোদ প্রিয়তায় সে আক্রান্ত।" বিজ্ঞানেরও উচিত নয় দেব-সত্তাকে অস্বীকার করা আর বস্তুবাদকে মনে করা অভ্রান্ত। মন আর বস্তু সমভাবে আপেক্ষিক দৃশ্য—এমন এক চরম কারণেরই দ্বৈত ক্রিয়া, যার স্বভাব চির অজ্ঞাত। এ দুর্জ্ঞেয় শক্তির স্বীকৃতিই সব ধর্মের সত্য-সার আর সব দর্শনেরও এতেই সূচনা।

খ. বিবর্তনবাদ

দুর্জ্ঞেয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দর্শন তা ছেড়ে এখন মনোনিবেশ করে যা জানা যায় তার প্রতি। পরী-বিদ্যা হচ্ছে স্রেফ মরীচিকা—মিসেলেটের (Michelet) ভাষায়: "ওটা হচ্ছে সুশৃঙ্খলভাবে নিজেকে বোকা বানাবার কলা-কৌশল (Art)।" দর্শনের যথাযথ ক্ষেত্র আর কাজ হচ্ছে বিজ্ঞানের ফলাফলকে ঐক্যবদ্ধ করে সমষ্টিগত রূপ দেওয়া। "বিশৃঙ্খল-জ্ঞান জ্ঞানের নিম্নতম ধাপ—বিজ্ঞান আংশিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান আর দর্শন মানে পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ বা সুশৃঙ্খল জ্ঞান।" এ রকম পরিপূর্ণ ঐক্য সাধনের জন্য এমন এক উদার আর সার্বজনীন নীতির প্রয়োজন যাতে স্থান পাবে সব রকম অভিজ্ঞতা আর যা বর্ণনা করতে সক্ষম জ্ঞানের সব অত্যাবশ্যকীয় দিক। এরকম কোন নীতি আছে কি?

হয়তো পদার্থ-বিজ্ঞানের উচ্চতম সাধারণীকরণে ঐক্য সাধনের চেষ্টা করলেই আমরা এমন নীতির নিকটবর্তী হতে পারি। যেমন, পদার্থের অবিনশ্বরতা, শক্তির সংরক্ষণতা, গতির ধারাবাহিকতা, শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ রক্ষায় ঐকান্তিকতা (অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইনের অলংঘনীয়তা), শক্তিসমূহের সাম্য আর রূপান্তরণ (এমন কি মানসিক আর শারীরিক শক্তিসমূহেরও) আর গতির ছন্দ। শেষোক্ত সাধারণীকরণ যদিও সাধারণত স্বীকৃত নয় তবুও সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। সমস্ত প্রকৃতিই ছন্দময়—উত্তাপের গতি থেকে ভায়োলিনের তারের ঝঙ্কার, আলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তাপ আর শব্দের আন্দোলন থেকে সমুদ্রের জোয়ার ভাটা পর্যন্ত, যৌন সাময়িকতা থেকে গ্রহ-নক্ষত্র আর ধূমকেতুর সাময়িকতায়, দিন-রাত্রির বৈপরীত্য থেকে ঋতু অনুবর্তনে আর সম্ভবত আবহাওয়ার পরিবর্তনে সর্বত্রই বিরাজ করছে ছন্দ, ছন্দ আছে অণুর দোল খাওয়া থেকে জাতির উত্থান-পতনে আর নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যুতে। "জ্ঞাত বিষয়ের এসব বিধি বিধানকে" সহজে কমিয়ে এনে (বিশ্লেষণের দ্বারা, যার সবিস্তার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক) গতির ঐকান্তিকতার চরম বিধানে পরিণত করা যায়। কিন্তু নীতিতে রয়েছে কিছুটা নিষ্ক্রিয়তা আর নিশ্চলতা—জীবন-রহস্য সম্বন্ধে এ তেমন কোন ইংগিত নয়। বাস্তবতার জীবন্ত আর গতিশীল নীতি তা হলে কি? সব জিনিসের বৃদ্ধি আর ক্ষয়ের সূত্র কি? এটা বিবর্তন আর বিলয়ের সূত্র হতে হবেই, কারণ "কোন কিছুর সার্বিক ইতিহাসে তার আবির্ভাব যে ধারণাতীত থেকে, তার বিলয়ও যে সে ধারণাতীতে এ তথ্যের স্থান থাকতেই হবে।"

এভাবে স্পেন্সার বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত সূত্র তুলে ধরলেন আমাদের সামনে—যা পড়ে যুরোপের বুদ্ধিজীবীরা হলো রুদ্ধশ্বাস আর তার ব্যাখ্যায় প্রয়োজন হলো স্পেন্সারের চল্লিশ বছরের শ্রম আর লিখতে হলো দশ খণ্ড বই। "বিবর্তন মানে বস্তুর সংহতিসাধন আর গতির আনুষঙ্গিক বিচ্ছিন্নতা—যে সময় বস্তু অনির্দিষ্ট, অসংলগ্ন সমজাতীয়তা থেকে নির্দিষ্ট আর সংলগ্ন অসমজাতীয় হয়ে ওঠে আর সে সময় রক্ষিত গতির ঘটে সমপর্যায়ের রূপান্তর।" এসবের অর্থ কি? নীহারিকা থেকে গ্রহের উৎপত্তি, পৃথিবীতে সাগর আর পাহাড়ের গঠন, উদ্ভিদের পঞ্চভূত আর মানুষের জৈব-দেহ ভক্ষণ আর তার বিপাক, ভ্রূণে প্রাণের সঞ্চার, জন্মের পর হাড়ের সংযোজন, চেতনা আর স্মৃতি মিলে জ্ঞান আর চিন্তায় পরিণত হওয়া আর জ্ঞান পরিণত হওয়া বিজ্ঞান আর দর্শনে, পরিবার গোষ্ঠীতে, ভদ্রসমাজে, নগর আর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া—পরে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলা "এক সংযুক্ত বিশ্ব সরকার"। এ হচ্ছে বস্তুর সংহতি সাধন—ভিন্ন ভিন্ন দফাকে জনতায়। শ্রেণীতে আর সমগ্র-ভাবে একত্রীকরণে। অবশ্য এ ভাবের সংহতির ফলে পৃথকভাবে অংশ-গুলির গতি-শক্তি হ্রাস পাবেই যেমন রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শক্তি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে করে থাকে খর্ব। তবে সে সঙ্গে তা অংশগুলিকে দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে পারস্পরিক নির্ভরতা আর আত্মরক্ষামূলক সম্পর্কের বন্ধন, যার ফলে "সংহতি" গড়ে ওঠে আর বৃদ্ধি পায় সামাজিক উর্ধ্বতন। এ প্রক্রিয়ার ফলে কাজে আর রূপে এসে যায় অধিকতর নির্দিষ্টতা। নীহারিকা অবয়ব শূন্য, অস্পষ্ট আর মেঘাচ্ছন্ন—তবুও তার থেকেই গড়ে ওঠে গ্রহের বৃত্তাকার নিয়মানুবর্তিতা, পর্বত-মালার স্পষ্ট রেখা, জীব আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশিষ্ট আকার আর চরিত্র, কর্ম-বিভাগ, রাজনৈতিক গঠন আর শারীরবৃত্তীয় কাজের বিশিষ্টতা ইত্যাদি। এ সংহতি প্রাপ্ত সমগ্রের অংশগুলি শুধু যে সুনির্দিষ্টতা লাভ করে তা নয় বরং স্বভাবে আর কাজ-কর্মে তারা বিচিত্র আর বিভিন্ন রকমেরও হয়ে ওঠে। আদি অবস্থায় নীহারিকা ছিল সমজাতীয় অর্থাৎ তার সব অংশই একই রকম ছিল—অনতিবিলম্বে তা বিভক্ত হয়ে পড়লে গ্যাসে, তরলে আর কঠিনে। পৃথিবীর কোথাও দেখা দিলে সবুজ ঘাস, কোথাও সাদা পর্বত-শৃঙ্গ অথবা অসীম নীল সমুদ্র, উৎপত্তি হলো আপেক্ষিকভাবে সমজাতীয় জৈবনিক (protoplasm) থেকে জীবনদায়িনী প্রজনন শক্তি, খাদ্য গ্রহণ, প্রজনন, গতিময়তা আর উপলব্ধির বিচিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এক সরল ভাষা সারা মহাদেশে রূপ নিয়েছে অসংখ্য কথ্য-বুলির, এক বিজ্ঞানই ভাগ হয়ে গেছে শত ভাগে, জাতি বিশেষের এ লোক-সংগীত থেকে বিকাশ লাভ করেছে সাহিত্য-শিল্পের হাজারো রূপ। গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব, দেখা দেয় চরিত্রের বিশিষ্টতা, বিকশিত হয়ে ওঠে প্রতি জাতি আর গোষ্ঠীতে নিজস্ব প্রতিভা। সংহতি আর বিভিন্নতা বা অসমতা, অংশের সমষ্টির সাহায্যে বৃহত্তর সমগ্রতা আবার অংশের বিভিন্নতা থেকে বিচিত্র সব রূপের উৎপত্তি এসব হচ্ছে বিবর্তনবাদের বৃত্ত-রেখার উজ্জ্বলতম বিন্দু। সব কিছু বিচ্ছিন্নতা থেকে সংহতি আর ঐক্যের দিকে আর সমধর্মী সরলতা থেকে জটিল বিভক্তি-করণের দিকে অগ্রসরমান (তুঃ আমেরিকা ১৬০০—১৯০০)। ধরে নিতে হবে তার গতি বিবর্তনের দিকে, আর যা কিছু সংহতি থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকে আর জটিলতা থেকে সরলতার দিকে অগ্রসরমান (তুঃ য়ূরোপ ২০০—৬০০ খ্রীঃ) বুঝতে হবে সে ভেসে চলেছে বিনাশের স্রোতে।

এ সমন্বয়ী সূত্রেও খুশী না হয়ে স্পেন্সার দেখাতে চেষ্টা করেছেন যান্ত্রিক শক্তির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারও এ এক অনিবার্য পরিণতি। প্রথমতঃ তাতে রয়েছে "সমজাতীয়ের কিছুটা অস্থিরতা" অর্থাৎ সমজাতীয় অংশগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘকাল একই রকম থাকতে পারে না কারণ তাদের উপর বাহ্যিক শক্তির যে আঘাত এসে পড়ে তা অসমান, উদাহরণত বাহ্যিক অংশগুলির উপর আঘাত এসে লাগে সর্বাগ্রে, যেমন যুদ্ধের সময় সর্বাগ্রে আক্রান্ত হয় উপকূল-বর্তী শহরগুলি। বিচিত্র সব পেশা সমজাতীয় মানুষকেও নানাভাবে শত রকম পেশা আর ব্যবসানুসারে ভিন্নতর করে গড়ে তোলে। তার উপর আছেঃ "প্রভাবের গুণন ক্রিয়া" একই কারণ সৃষ্টি করতে পারে বহু বিচিত্র পরিণতির, পারে পৃথিবীকে বদলে দিতে, মেরি এন্টোনিয়টের একটি ভ্রান্ত উক্তি, এমসে (Ems) একটি পরিবর্তিত টেলিগ্রাম, অথবা সেলামিসে (Salamis) একটা ঝড় তুফান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অভিনয় করতে সক্ষম এক অসীম ভূমিকার। তারপরও আছে "বিচ্ছিন্নতা"র বিধি বিধানঃ আপেক্ষিকভাবে সমজাতীয় সমগ্রের কিছুটা অংশ যদি বিচ্ছিন্ন করে ভিন্নতর এলেকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় তা হলে পরিবেশের বৈচিত্র তাদেরে ভিন্নতরভাবে গড়ে তুলবেই, যেমন ইংরেজ যদি আমেরিকায়, কি কেনাডায় বা অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে স্থানের প্রকৃতি অনুসারে মাতৃভূমির ইংরেজ থেকে তারা স্বভাবতই হয়ে উঠবে স্বতন্ত্র। এ ধরনের বহু রকমে প্রাকৃতিক শক্তি এ বিকশন্মুখ পৃথিবীকে বিচিত্র করে তোলে। অবশেষে অনিবার্যভাবে আসে "স্থিতিশীলতা ও ভার-সাম্যের" কথা। প্রত্যেক গতিকেই বাধার মধ্যেই গতিশীল থাকতে হয় বলে শীঘ্র বা দেরিতে তার সমাপ্তি ঘটবেই। প্রত্যেক ছন্দ দোলার (যদি বাইর থেকে নতুন শক্তি সঞ্চারিত না হয়) পরিমাণ আর বিস্তৃতিতে কিছুনা কিছু ক্ষতি হবেই অর্থাৎ কমে আসবেই। গ্রহের বৃত্ত ক্রমশ কমে আসে অথবা একই বৃত্তেই থাকে ঘুরতে শতাব্দী যতই পার হতে থাকবে সূর্যের আলো আর উত্তাপও ততই আসবে কমে, জোয়ার-ভাটার সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর গতিও হবে মন্দীভূত। এ পৃথিবী যা আজ লক্ষ লক্ষ গতিতে স্পন্দিত আর মুখরিত, জীবন প্রজননে উদ্দীপিত আর লক্ষ রূপে বর্ধিষ্ণু, একদিন তার বৃত্তাবর্তন হবে মন্থর, তার অংশগুলিও হবে মন্থর-গতি, আমাদের শুকিয়ে আসা শিরা-উপশিরায় রক্ত হয়ে আসবে ঠাণ্ডা, গতিও আসবে কমে। কোন কিছুতেই আর আমরা ছুটে যাবো না, মরণোন্মুখ জাতির মতো আমরা স্বর্গের কথা ভাববো জীবনের নয় বিশ্রামের ক্ষেত্র হিসেবেই আমাদের স্বপ্ন হবে তখন নির্বান। ধীরে ধীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে দ্রুত স্থিতিশীলতার ঘটবে বিনাশ, নেমে আসবে বিবর্তনের নিরানন্দময় যবনিকা। সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, জনসাধারণ দেশ ছেড়ে যাবে, শহরগুলি নিষ্প্রভ হয়ে পরিণত হবে অন্ধকারময় কৃষক পল্লীতে, বিচ্ছিন্ন এলেকাগুলিকে একত্র রাখার তেমন শক্তিই থাকবে না কোন সরকারের, সামাজিক ব্যবস্থা বেঁচে থাকবে না স্মৃতি হয়েও। ব্যক্তি-জীবনেও দেখা দেবে বিচ্ছিন্নতা, যে সমন্বয়কে জীবন বলা হয় তা পথ ছেড়ে দেবে ক্ষয়শীল বিশৃঙ্খলাকে, যার নাম মৃত্যু। এ পৃথিবী হবে ধ্বংসের এক বিশৃঙ্খল রঙ্গ-মঞ্চ, অপ্রতিরোধ্য পতনে শক্তির এ এক শোকাবহ নাটক। যে ধূলা আর নীহারিকা থেকে তার উৎপত্তি পৃথিবীর নিজের গতিই হবে এখন তার দিকে। এভাবে বিবর্তন আর বিনাশের কালাবর্ত পাবে পূর্ণতা। শুরু হবে আবার কালাবর্ত—পার হবে অসীম কাল, কিন্তু এ হচ্ছে চির-পরিণতি। 'মৃত্যুকে স্মরণ করো' একথা আঁকা আছে জীবনের চেহারায়, প্রতিটি জন্মই ক্ষয় আর মৃত্যুরই সৌরচন্দ্রিকা।

'প্রথম নীতিগুলো' (First principles) এক চমৎকার নাটক, এখানে এক পৌরাণিক শান্ত গাম্ভীর্যের সাথে বলা হয়েছে গ্রহ-নক্ষত্র, জীবন আর মানুষের উত্থাপন-পতন, বিবর্তন আর ধ্বংসের অপরূপ কাহিনী। কিন্তু এ হচ্ছে বিয়োগান্ত নাটক, যার উপযুক্ততম অন্তিম বাণী হচ্ছে হ্যমলেটের ভাষায়: "এর পর নিস্তব্ধতা।" যে নর-নারী আশা আর বিশ্বাসে প্রতিপালিত জীবনের এ সংক্ষিপ্ত সারের বিরুদ্ধে তারা যে বিদ্রোহ করবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে? একদিন মৃত্যু যে হবে তা আমরা সবাই জানি কিন্তু ঐ এমন এক ব্যাপার যে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছুই নেই—আমরা চাই জীবন সম্বন্ধে ভাবতে। মানব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতা সম্বন্ধে স্পেন্সারের ধারণাও প্রায় শোপেন হাওয়ারের মতই। তাঁর বিজয়ী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে জীবন, যাপন করবার মতো এমন লোভনীয় কিছুই নয়। অনেক দূর ভবিষ্যৎ দেখার দার্শনিক রোগ তাঁরও ছিল, ফলে বেঁচে থাকার যে সব ছোট ছোট আনন্দময় রূপ-রঙ প্রতি মুহূর্তে জীবনের পাশ ঘেঁসে চলে তা তিনি দেখতেই পেতেন না।

যে দর্শনের শেষ কথা ঈশ্বর আর স্বর্গের পরিবর্তে ভার-সাম্য আর ধ্বংস সে দর্শন যে জনসাধারণের প্রিয় হবে না তা তিনি জানতেন। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও যে অনুজ্জ্বল সত্য তিনি দেখেছেন তা বলার অধিকারের সমর্থনে, অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ওজস্বিতার সাথে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করে তাঁর রচনার প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন।

'যা সর্বোচচ সত্য বলে মনে করা হয় তা পাছে কালের অত্যন্ত আগাম বিবেচিত হয় এ ভেবে তা বলতে যিনি ইতস্তত করেন তিনি যেন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখেন তা হলে নিশ্চয়ই আশ্বস্তবোধ করবেন। তাঁর পক্ষে স্মরণীয় মতামত হচ্ছে এমন এক বাহন যার দ্বারা চরিত্রের বাহ্যিক রূপায়ন ঘটে, তাঁর মতামতও জোগায় এ বাহন গঠনের উপাদান। এ হচ্ছে এক শক্তি কেন্দ্র অন্যান্য শক্তি কেন্দ্রের সঙ্গে মিলে এ ঘটায় সামাজিক পরিবর্তন, তাই তাঁর উচিত নিজের সঠিক অন্তরতম বিশ্বাসকে প্রকাশ করা—ফলাফল যা ঘটবার তা ঘটবেই। এ নেহাৎ অকারণ নয় যে তিনি কোন কিছুর প্রতি সহানুভূতিশীল আর অন্য কিছুর প্রতি বিমুখ অর্থাৎ যা তাঁর কাছে বিরক্তিকর। তাঁর সব শক্তি, আশা-অভীপ্সা আর বিশ্বাস নিয়ে কিছুতেই আকস্মিক স্পৃষ্টি নন বরং তিনি কাল বা যুগেরই সন্তান। তিনি অতীতের উত্তরাধিকারী বটে কিন্তু ভবিষ্যতের জনক, তাঁর চিন্তারাশিই তাঁর সন্তান—অযত্নে সে সবকে মরতে দেওয়া উচিত নয়। প্রতিটি মানুষের মতো তিনিও যথার্থই ভাবতে পারেন যে 'অবগত কারণ' অসংখ্য বাহন মারফৎ কাজ করে যাচ্ছে তিনি তাঁর অন্যতম। যখন সে 'অজ্ঞাত কারণ' তাঁর মনে কোন বিশ্বাস স্পৃষ্টি করেন তখন বুঝতে হবে সে বিশ্বাস তাঁকে প্রচার করতে হবে, কাজে রূপান্তরিত করতে হবে সে বিশ্বাসকে। কাজেই বিজ্ঞজন কখনো তাঁর অন্তরের বিশ্বাসকে আকস্মিক বা বহিরাগত মনে করতে পারে না। যে সর্বোচচ সত্যের উপলব্ধি তাঁর ঘটে তা তিনি নির্ভয়ে প্রকাশ করবেনই, তার ফল যাই হোক তিনি জানেন পৃথিবীতে এ তাঁর সত্যকার ভূমিকা, এও তিনি জানেন যে পরিবর্তন তাঁর লক্ষ্য তা তিনি সাধন করতে পারেন ভালো, যদি না পারেন তাও মন্দের ভালো।

৪. জীব-বিদ্যা : জীবনের বিবর্তন

'Principle of Biology'-এ নামে 'Synthetic philosophy'র দ্বিতীয় আর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্র তাতে দার্শনিকের আক্রমণ ঘটলে স্বভাবতই তার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্যগোচর না হয়ে পারে না, স্পেন্সারের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু তাঁর অত্যুজ্জ্বল সাধারণীকরণ জীব-বিদ্যার এক বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে ঐক্য আর বোধগম্যতা সঞ্চার করেছে তাতে সবিশেষ বর্ণনার ভুল ত্রুটির যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়েছে।

এ প্রখ্যাত সংজ্ঞা দিয়েই স্পেন্সার শুরু করেছেন: "বাইর আর ভিতরের সম্পর্কের অবিরাম সমঝোতা আর সমন্বয়েরই নাম জীবন।" এ আদান-প্রদান বা সহযোগিতার সম্পূর্ণতার উপর নির্ভর করে জীবনের-ও সম্পূর্ণতা—এ আদান-প্রদান নিখুঁত হলে জীবনও হয় নিখুঁত। এ আদান-প্রদান নিষ্ক্রিয় ব্যাপার নয়—জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যিক ঘটনার পরিবর্তন আগাম আঁচ করে নিয়ে সেভাবে ভিতরের সম্পর্কটায় আপোষ করে নেওয়া, যেমন উদ্যত আঘাত এড়াবার জন্য পশুর সরে যাওয়া বা খাদ্য গরম করার জন্য মানুষের আগুন জ্বালানো। তাঁর এ সংজ্ঞার এক ত্রুটি হচ্ছে পরিবেশের উপর জীবের পূর্ণবিন্যাস ক্রিয়াকে আমল না দেওয়ার প্রবণতা তার উপর যে সূক্ষ্ম ক্ষমতার বলে জীবের পক্ষে আগাম সমন্বয় বা সমঝোতা সম্ভব হয়েছে যা জীবনী-শক্তিরূপে বিশিষ্ট তার ব্যাখ্যা দানে তাঁর ব্যর্থতা। পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত এক অধ্যায়ে স্পেন্সার "The Dynamic Element in life" সম্বন্ধে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন আর বাধ্য হয়েছেন স্বীকার করতে যে তাঁর সংজ্ঞা জীবনের প্রকৃতি ঠিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। "আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে যার-সত্তায় জীবনকে শারীর-রাসায়নিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না।" তিনি বুঝতে পারেননি যে এ স্বীকৃতি তাঁর পদ্ধতির ঐক্য আর সম্পূর্ণতার পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর।

স্পেন্সার ব্যক্তির বেলায় যেমন বাইর আর ভিতরের সমন্বয়কে জীবন মনে করতেন তেমনি প্রজাতির জীবনেও তিনি বাসস্থানের অবস্থানুসারে প্রজনন-উর্বরতার এক অপূর্ব সমন্বয় অবলোকন করেছেন। প্রজননের মূল কারণ পুষ্টিসাধক উপরিতলের সঙ্গে পরিপুষ্ট পিণ্ডের নতুন করে সমন্বয় সাধন চেষ্টা। উদাহরণত জীবাণুর পিণ্ড, যে উপরিতলের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তার তুলনায় অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিভক্তিকরণ, অঙ্কুরিত হওয়া, রেণু-গঠন আর যৌন প্রজনন এ ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমপর্যায়ের—উপরিভাগের তুলনায় পিণ্ডের আনুপাতিক হ্রাস অনিবার্য, এভাবে পুষ্টি-সাধক ভার-সাম্য হয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। এ কারণে কোন বিশেষ প্রাণীর বৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া বিপজ্জনক, সাধারণতঃ কিছুকাল পরে, বৃদ্ধির স্থান দখল করে প্রজনন।

গড়ে শক্তি ক্ষয়ের অনুপাতে বিপরীত দিক থেকেই বৃদ্ধিতে বেশকম ঘটে আর বৃদ্ধির অনুপাতে প্রজননেও বিভিন্নতা ঘটে উল্টো দিক থেকেই। "প্রজনন-বিশারদদের কাছে এটা ভালো করেই জানা আছে যে যদি অপরিণত বা অল্প বয়স্কা ঘোটকীকে বাচ্চা প্রসব করতে দেওয়া হয় তা হলে তার বৃদ্ধি স্বাভাবিক আকারে পৌঁছতে বিঘ্নিত হয়....আবার বিপরীত দিকে খাসি করা জন্তু-জানোয়ার যেমন খাসি মোরগ, বিশেষত বিড়াল অন্যগুলোর তুলনায় হয়ে থাকে আকারে অনেক বড়।" ব্যক্তিগত উন্নতির কর্মক্ষমতা আর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রজনন অনুপাতও আসে কমে। "সাংগঠনিক দুর্বলতার ফলে যেখানে বাহ্যিক বিপদের মোকাবিলার শক্তি কম থাকে সেখানে অপরিহার্য মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের জন্যই বোধ করি উর্বরতাও বেশী থাকে, তা না হলে প্রজাতির বিনাশ অনিবার্য। অন্যদিকে আত্মরক্ষার সবল ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে সেখানে উর্বরতার প্রয়োজন থাকে কম"—পাছে জনসংখ্যাবৃদ্ধি খাদ্যাভাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত জন্ম আর পৃথকীকরণের মধ্যে একটা বিরোধ আছে অথবা বিরোধ আছে ব্যক্তিগত বিকাশ আর উর্বরতাশক্তির মধ্যে। ব্যক্তি থেকেও এ নিয়ম শ্রেণী আর প্রজাতির বেলায় অধিকতর প্রজোয্য—প্রজাতি বা শ্রেণী যতই উন্নত হবে তার জন্মের হারও তত কম হবে। গড়ে ব্যক্তির বেলায়ও এ নিয়ম খাটে। যেমন দেখা যায় মানসিক বিকাশ যেন উর্বরতার পরিপন্থী। "অত্যধিক উর্বরতা যেখানে সেখানে দেখা যায় মনের কুঁড়েমি—শিক্ষা-জীবনে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের ফলে প্রায় সম্পূর্ণ কি আংশিক অনুর্বরতাই দিয়ে থাকে দেখা। কাজেই এর পরে মানুষের যদি আরো অন্য রকম বিবর্তন ঘটে, তা হলে অন্য কারণ ছাড়া, এর ফলেও মানুষের প্রজনন-শক্তি কমে যাওয়ারই সম্ভাবনা।" দার্শনিকরা পিতৃত্ব বিমুখ বলে বেশ বদনামি আছে। মেয়েদের বেলায় সাধারণত মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে মননশীল ক্রিয়া-কর্ম কমে আসে—কিছুটা বেশী আগে থেকেই মেয়েরা মাতৃত্বের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে বলেই হয়তো তাদের কৈশোর হয় স্বল্পস্থায়ী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটামুটি শ্রেণীর বেঁচে থাকার প্রয়োজনের সঙ্গে জন্ম-হারের সমন্বয় করা হলেও সমন্বয় কখনো পুরোপুরি হয় না। তাই মনে হয় ম্যলথাসের যে সাধারণ বিধি—জন-সংখ্যা খাদ্য-সরবরাহ ছাড়িয়ে যায় তাই সত্য। "গোড়া থেকেই জনসংখ্যার এ যে চাপ তা হচ্ছে উন্নতির সমীপগত কারণ। গোড়ায় এর ফলেই প্রজাতির ঘটেছে সম্প্রসারণ। এ-ই, মানুষকে কেড়ে বা লুটপাট করে খাওয়ার অভ্যাস ছাড়িয়ে ভূমি-কর্ষণে করেছে বাধ্য। ফলে পৃথিবীর উপরিতল হয়েছে পরিষ্কার। মানুষকে তা বাধ্য করেছে সামাজিক জীবন গ্রহণ করতে........আর বিকশিত করে তুলতে সামাজিক আবেগ অনুভূতিকে। তা উৎপাদন-পদ্ধতির ক্রমোন্নতির জুগিয়েছে প্রেরণা, প্রেরণা জুগিয়েছে দক্ষতা আর বুদ্ধিকে বাড়িয়ে তুলতে" আত্মরক্ষার যে সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে এ হচ্ছে তার প্রধান কারণ—এর ফলেই ঘটে জাতির জীবন-মানের উন্নয়ন।

যোগ্যতমের উদ্বর্তন কি প্রধানত আকস্মিক অনুকূল অবস্থান্তরের ফলেই ঘটে না কি জন্ম-সূত্রে প্রাপ্ত আংশিক চরিত্র বা শক্তিসমূহ যা অর্জিত হয়েছে পরবর্তী প্রজননের মারফত বারে বারে তার পুনরাবৃত্তির দ্বারা এ প্রশ্নের কোন দৃঢ় উত্তর স্পেন্সার দেননি, তিনি সানন্দে ডারউইনের মত গ্রহণ করেছেন তবে বুঝতে পেরেছিলেন এমন অনেক ঘটনা আছে যার ব্যাখ্যা দিতে তা অপারগ—তাই কিছুটা পরিবর্তিত আকারে লেমার্কীয় (Lamarckian) মতামত গ্রহণে তিনি হয়েছিলেন বাধ্য। ওয়েজম্যানের (Weisman) সঙ্গে বাদানুবাদের সময় তিনি সজোরে লেমার্কের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন ডারউইন মতবাদের কিছু কিছু ত্রুটি। সে সময় একমাত্র স্পেন্সারই লেমার্কের সমর্থনে এসেছিলেন এগিয়ে। এটা বেশ কৌতূহলের বিষয় যে আজকের দিনে লেমার্কের নব-ভক্তদের মধ্যে ডারউইন পন্থীও আছেন আবার এ যুগের সবচেয়ে বড় ইংরেজ জীব-বিদ্যাবিদ (Sir Wm. Bateson) প্রজনন-বিদ্যার সমকালীন বিশেষজ্ঞদের মত বলে এ রায় দিয়েছেন যে ডারউইনের বিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ মতবাদ (অবশ্য সাধারণ মতবাদ নয়) এখন ত্যাগ করতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. মনোবিদ্যা : মনের বিবর্তন

স্পেন্সারের গ্রন্থমালার মধ্যে 'The principles of psychology' (১৮৭৩) সম্বন্ধে দু' খণ্ডই মনে হয় কিছুটা দুর্বল সংযোজন। এ বিষয়ে এর আগে (১৮৫৫) তিনি আর এক খণ্ড বই লিখেছিলেন—তাতে তরুণ বয়সের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তিনি বস্তুবাদ আর নিয়তিবাদের প্রতি জানিয়েছিলেন জোর সমর্থন। কিন্তু বয়স আর অধিকতর চিন্তার ফলে তাঁর পূর্বমত বদলে কিছুটা কোমল হয়ে এসেছিল, এ সম্পর্কে বহু কষ্টে শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী বিনম্র বিশ্লেষণ তিনি করেছেন বটে কিন্তু তাতেও বিষয়টি কিছুমাত্র স্বচ্ছ হয়নি। অনুপাতে মতবাদের দিক দিয়ে স্পেন্সার এখানে অনেক সমৃদ্ধ কিন্তু প্রমাণের বেলায় দরিদ্র। আন্তকৌষিক সংযোজনী পেশীই স্নায়ুর মূল এ ছিল তাঁর মত আর সহজাত-বৃত্তির প্রজনন যে প্রতিবর্তের সংযোজন আর অর্জিত চরিত্রের সংক্রমণ এও ছিল তাঁর ধারণা—প্রজাতির অভিজ্ঞতাই যে মানসিক শ্রেণীবিন্যাসের মূল এ যেমন তাঁর মত তেমনি 'রূপান্তরিত বাস্তবতায়''ও ছিলেন তিনি বিশ্বাসী। এমনি শত রকম মতবাদের কথা তিনি বলেছেন যাতে পরাবিদ্যার বিভ্রান্তি-কর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু ব্যবহারিক মনোবিদ্যার স্বচ্ছতা গুণের কোন নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যায় না তাতে। এসব গ্রন্থে আমরা বাস্তববাদী ইংলণ্ডকে দেখতে পাই আর ফিরে যাই কান্টে। এখানে মুহূর্তে যা দেখে আমরা বিস্মিত হই তা হচ্ছে এ যে—মনোবিদ্যার ইতিহাসে এ সর্বপ্রথম আমরা বিবর্তনবাদীর সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পেলাম, চেষ্টা করা হয়েছে এ দিয়ে জন্মসূত্রের ব্যাখ্যা করার আর চিন্তার বিভ্রান্তিকর জটিলতার করা হয়েছে সন্ধান সরল স্নায়ুক্রিয়ায় অবশেষে বস্তুর গতি পর্যন্ত খোঁজা হয়েছে এখানে। অবশ্য তাঁর চেষ্টা যে সফল হয়নি তা সত্য, তবে এমন ব্যাপারে কার চেষ্টাই বা সফল হয়েছে? চেতনার উৎপত্তি সন্ধানে স্পেন্সার এক চমৎকার কার্যসূচী গ্রহণ করে যাত্রা শুরু করেছিলেন, চেতনার উদ্ভাবনের জন্য শেষে সর্বত্র চেতনার অস্তিত্ব অনুমান করতেই যেন তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নীহারিকা থেকে মন পর্যন্ত এক অবিরাম বিবর্তন চলছেই—অবশেষে মনের সাহায্যেই যে বস্তুকে জানা যায় এ তিনি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্ভবত এসব গ্রন্থে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ হচ্ছে যেখানে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাখ্যান করেছেন জড়বাদী দর্শন :

'একটা পরমাণুর নর্তন কি একটা স্নায়ুবিক কম্পনের সাথে চেতনায় পাশাপাশি স্থান পেতে পারে আর উভয়কে কি এক বলে চেনা সম্ভব? এ ব্যাপারে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। গতির একটা সংস্থার সঙ্গে অনুভূতির একটা সংস্থার যে কোন সাদৃশ্য নেই তা উভয়কে পাশাপাশি নিয়ে এলেই তা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে মুহূর্তে চেতনা যে রায় দিয়ে থাকে বৈশ্লেষিকভাবে তা হয়তো ঠিক........ কারণ হয়তো এটা দেখানো সম্ভব যে নর্তিত বা আন্দোলিত অনুটা গঠিত হয়েছে অনুভূতির অনেক সংস্থা থেকেই (অর্থাৎ মনের যে সব সংস্থা, যেমন চেতনা, অনুভূতি আর ভাবসমূহ তার থেকেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান গড়ে উঠেছে)। আমরা যদি মনের অবস্থাকে ব্যবহারিক অবস্থায় আর ব্যবহারিক অবস্থাকে মানসিক অবস্থায় রূপান্তরিত করতে এ দু'য়ের কোন একটাকে নির্বাচন করে নিতে বাধ্য হই, মনে হয় শেষোক্তটাই আমরা গ্রহণ করতে চাইব।'

সে যাই হোক মনেরও বিবর্তন ঘটে তাতে সন্দেহ নেই—মন সাড়া দেয় সরল থেকে যৌগিকে, যৌগিক থেকে জটিলতায়, প্রতিবর্ত থেকে চিহ্নে, চিহ্ন থেকে সহজাত প্রবৃত্তিতে—যা স্মৃতি আর কল্পনার সাহায্যে পরিণত হয় মননশীলতা আর যুক্তিতে। যে পাঠক এ চৌদ্দ শ' পৃষ্ঠার শারীরবৃত্তীয় আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সচেতন মনে পড়ে যাবেন তিনি জীবন আর মনের ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করে নিশ্চয় অভিভূত হবেন, তিনি বিলম্বিত চলচিচত্রের মতোই দেখতে পাবেন স্নায়ুর গঠন, গ্রহণশীল প্রতিবর্ত আর প্রবৃত্তির বিকাশ, আবেগ-অনুভূতির সংঘর্ষে কি করে চেতনা আর চিন্তার হচ্ছে উদ্ভব। "বুদ্ধির কোন বিশিষ্ট স্তর নেই, সত্যিকার স্বাধীন কোন মানস শক্তির দ্বারাও তা গঠিত হয়নি বরং তার উচচতম বিকাশ ঘটেছে এমন সব জটিলতা থেকে যা সরলতম উপকরণেরই নেহাৎ নির্বোধ পদক্ষেপেরই ফল।" যুক্তি আর প্রবৃত্তির মধ্যে কোন ছেদ নেই—এরা প্রত্যেকে ভিতর বাইরের সম্পর্কেরই সমন্বয়, পরিমাণগত পার্থক্য ছাড়া এদের মধ্যে আর কোন পার্থক্যই নেই। তবে প্রবৃত্তির যে সাড়া তা অনেকখানি সরল আর বাঁধাধরা আর যুক্তির যে সাড়া তা তুলনীয়ভাবে অভিনব আর জটিল। যুক্তিসঙ্গত কাজ মানে স্রেফ প্রবৃত্তিরই সাড়া যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থার হেরফেরে জেগে-ওঠা অন্যান্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে টিকে রয়েছে—"গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা" বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির মারাত্মক সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই না। আসলে, ভিতরে যুক্তি আর প্রবৃত্তি, মন আর জীবন একই।

'সঙ্কল্প' একটি বিমূর্ত কথা, আমাদের সব সক্রিয় ইচ্ছারই ঐ এক যোগফল আর ইচ্ছাশক্তি বা প্রবৃত্তি মানে কর্মের পথে ভাবের বাধাযুক্ত স্বাভাবিক এক স্রোত-ধারা। ভাব হচ্ছে কর্মের পথে প্রথম পদক্ষেপ—ভাবের শেষ পদক্ষেপ কর্ম। তেমনি সহজাত-কর্মের প্রথম ধাপ হলো আবেগ, আবেগের প্রকাশ হচ্ছে পরিপূর্ণ সাড়ার অত্যাবশ্যক প্রস্তাবনা। ক্রোধের সময় দন্ত-দর্শন মানে শত্রুকে ছিঁড়ে ফেলারই ইংগিত, এরকম সূচনার যা স্বাভাবিক পরিণতি। "চিন্তার রূপ" ও স্থান-কাল উপলব্ধির মতই অথবা কারণ আর পরিমাণের মতই, যা কান্ট মনে করতেন সহজাত এবং সহজাত চিন্তা পদ্ধতি মাত্র। প্রজাতির পক্ষে সহজাত প্রবৃত্তি অর্জিত অভ্যাস কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তা জন্মগত। কাজেই এসব মানসিক অভ্যাস ধীরে ধীরে বিবর্তনের পথেই অর্জিত হয়ে এখন আমাদের মননশীল ঐতিহ্যের অংশ হয়ে পড়েছে। মনোবিদ্যার সুদীর্ঘকালের এসব ধাঁধাঁ—"অবিরাম-সঞ্চয়ী রদবদলের যে উত্তরাধিকার" তা দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। তবে এ সার্বিক ধরে নেওয়াটাই বহুশ্রমে রচিত এ গ্রন্থগুলিকে প্রশ্নের বিষয় করে তুলেছে—হয়তো এ কারণে এগুলি ব্যর্থও।

৬. সমাজ-বিজ্ঞান : সমাজ-বিবর্তন

সমাজ-বিজ্ঞানের বেলায় তাঁর রায় হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ বছর ধরে প্রকাশিত এ স্থূল খণ্ডগুলি হচ্ছে স্পেন্সারের সবচেয়ে মূল্যবান রচনা, এর পরিধিও তাঁর প্রিয় ক্ষেত্র—রাজনৈতিক দর্শন আর সাধারণীকরণের ইংগিতে তাঁর প্রতিভার এ যেন সর্বোত্তম পরিচয়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'Social statics থেকে 'The principles of sociology'র শেষ পুষ্পগুচ্ছ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এর প্রধান আলোচ্য ছিলো সরকার আর অর্থনীতির সমস্যা। প্লেটোর মতো নৈতিক আর রাজনৈতিক সুবিচারই ছিল তাঁর আলোচনার আদি আর অন্ত। আর কেউ এমনকি কঁতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(যিনি এ বিজ্ঞানের প্রবর্তক আর এ শব্দের জনক) সমাজ-বিজ্ঞানের জন্য এতখানি করেননি।

'The Study of Sociology' নামক একটি জনপ্রিয় অবতরণিকা খণ্ডে এ নতুন বিজ্ঞানের স্বীকৃতি আর বিকাশের জন্য উচ্ছ্বসিত ভাষায় ওকালতি করেছেন তিনি। যদি মনো-বিজ্ঞানে নিয়তিবাদ সত্য হয় তা হলে সামাজিক ঘটনায় কার্য কারণের নিয়মানুবর্তিতা থাকতেই হবে। আর যে গভীরভাবে মানুষ আর সমাজকে অধ্যয়ন করতে চায় সে কখনো লিভির (Livy) মতো শুধু ইতিহাসের কাল-ক্রম অনুসরণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না অথবা খুশী থাকতে পারে না কার্লাইলের মতো শুধু জীবন-ইতিহাস পাঠ করেই সে চায় মানব-ইতিহাসের সাধারণ ধারা অধ্যয়ন করতে, জানতে কারণগত ঘটনা পরিণতি আর যে সব সূক্ষ্ম পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক চিত্রে রূপান্তরিত করে সে সব তথ্য। মনুষ্য বিজ্ঞানে যেমন জীবনী-গ্রন্থ তেমনি সমাজ-বিজ্ঞানে ইতিহাস অপরিহার্য। অবশ্য সমাজ-বিদ্যা পুরোপুরি বিজ্ঞান নামের অধিকারী হয়ে উঠতে আরো হাজারো বাধা অতিক্রম করে আসতে হবে। এ তরুণবিদ্যা ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত, শাস্ত্রীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি অসংখ্য বাধার দ্বারা আজো বিঘ্নিত। তার উপর এক বড় বাধা অজ্ঞ নাওয়াকেবদের উপস্থিত সর্বজ্ঞতা—যারা কিছু না জেনেই মনে করে তারা সব জানে।" এক ফরাসী ভদ্রলোক সম্বন্ধে গল্প আছে তিনি এখানে তিন সপ্তাহ থেকেই নাকি সঙ্কল্প করে বসেন তিনি ইংলেণ্ড সম্বন্ধে একটি বই লিখবেন কিন্তু তিন মাস পরে দেখলেন যে তিনি মোটেও প্রস্তুত হতে পারেননি আর তিন বছর পরে এ সিদ্ধান্তে এলেন যে তিনি ইংলেণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।" এমন মানুষই সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করার উপযুক্ত। সারাজীবন ধরে অধ্যয়নের পর পদার্থ-বিজ্ঞানে বা রসায়ন বিজ্ঞানে অথবা জীব-বিজ্ঞানে পারদর্শী বা বিশেষজ্ঞ হতে মানুষ নিজেকে তৈয়রী করে কিন্তু সামাজিক আর রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রতিটি মুদির ছেলেই মনে করে সে বিশেষজ্ঞ, সব সমাধান তার নখদর্পণে তার কথা সবাইকে শুনতেই হবে।

এ ব্যাপারে স্পেন্সারের নিজের প্রস্তুতি ছিল মননশীল বিবেকের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তিনজন সেক্রেটারী নিযুক্ত করেছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য জাতির ঘরোয়া যাজকীয়, পেশাদারী, রাজনৈতিক আর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পাশাপাশি শ্রেণী বিভাগ করে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য। নিজের খরচে এ সব সংগ্রহ মোটা মোটা আট খণ্ডে তিনি প্রকাশ করেছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে তা হলে অন্য ছাত্ররা তাঁর সিদ্ধান্ত যাচাই করে প্রয়োজন মতো সংশোধন করে নিতে সক্ষম হবে। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রকাশ অসম্পূর্ণ ছিল বলে তাঁর যৎ-সামান্য সঞ্চয় তিনি এ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অসমাপ্ত প্রকাশনাকে সমাপ্ত করার জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে সাত বছর ধরে প্রস্তুতির পর ১৮৭৬এ 'সমাজবিজ্ঞানের' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় কিন্তু শেষ খণ্ডের প্রস্তুতি ১৮৯৬র আগে শেষই হয়নি। যখন স্পেন্সারের অন্য সব কিছু পুরাতত্ত্বের শামিল হয়ে যাবে তখনো সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রের কাছে এ তিনখণ্ড গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হবে।

তা হলেও স্পেন্সারের ত্বরিত সাধারণীকরণের যে অভ্যাস তা এর প্রাথমিক পরিকল্পনায়ও লক্ষ্য-গোচর। তাঁর বিশ্বাস সমাজও একটা জীব-দেহ ব্যক্তির মতো তারও রয়েছে পুষ্টি গ্রহণের, রক্ত-চলাচলের, সমন্বয়-সাধন আর প্রজননের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অবশ্য এ কথা সত্য যে ব্যক্তিতে চেতনা স্থানিক কিন্তু সমাজে প্রতিটি অংশেরই রয়েছে নিজস্ব চেতনা আর ইচ্ছাশক্তি তবে সরকার আর কর্তৃত্ব যদি এককেন্দ্রিক হয় তা হলে এ বিশিষ্টতা তথা নিজস্বতার সুযোগ হ্রাস পায়। "সমাজ দেহও প্রায় ব্যক্তি দেহের মতো—তারও বৃদ্ধি আছে আর বৃদ্ধির সময় তা আরো জটিল হয়ে ওঠে, এসব প্রয়োজনীয় স্বভাবে উভয়েই এক। বেড়ে জটিল হওয়ার সময় তার খণ্ডাংশগুলির পারস্পরিক নির্ভরতাও পায় বৃদ্ধি আর যে অংশগুলির সমবায়ে তার (অর্থাৎ সমাজের) গঠন সে সবের অনুপাতে সমাজের আয়ু অনেক বেশী দীর্ঘ।........উভয় ক্ষেত্রেই সংহতি আর সমন্বয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যও পায় বৃদ্ধি।" তাই সামাজিক বিকাশে বিবর্তন সূত্রের এক দরাজ ভূমিকা লক্ষ্য গোচর: দেখা যায় পরিবার থেকে রাষ্ট্র আর জাতিসংঘ হয়ে রাজনৈতিক সংস্থার ক্রমবর্ধমান আয়তন, সেভাবে সামান্য ঘরোয়া শিল্প বেড়ে এক চেটিয়া আর শ্রেণী বা বংশগত সম্পদ মালিকানা হয়ে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক রূপ করে গ্রহণ, ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার আকার গ্রাম থেকে শহরে নগরে যেভাবে বেড়ে চলে এসবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই সমন্বয়ের সুনিশ্চিত ক্রিয়া-পদ্ধতি দেখা যায়। শ্রম-বিভাগ, পেশা আর ব্যবসার বহুগুণন আর শহরের দেশের (গ্রামদেশের) উপর, একজাতি অন্য জাতির উপর পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতার ক্রম-বৃদ্ধি সংহতি আর বৈপরিত্যের ক্রমবিকাশেরই তো জুগিয়ে থাকে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

সংহতি আর বৈপরিত্যের যে একই বিধি সামাজিক সব অবস্থায়—ধর্ম, রাষ্ট্র থেকে শিল্প বিজ্ঞান পর্যন্ত সর্বত্র প্রযোজ্য। ধর্ম আদিতে ছিল অসংখ্য দেবদেবী আর ভূতপ্রেতের উপাসনা এ ব্যাপারে কম-বেশী সব জাতেই একটা ঐক্য রয়েছে। একটা কেন্দ্রীয় ঐশীশক্তি, যা সব ক্ষমতায় ক্ষমতাবান আর অন্য সব অশরীরী শক্তিকে স্ব স্ব কাজে নিযুক্ত রেখে শাসন করছে এ ধারণা থেকেই বিকাশ ঘটেছে ধর্মের। সম্ভবত প্রথম দেব-দেবীর ধারণা স্বপ্ন আর ভূত-প্রেত থেকেই এসেছে। অশরীরী শক্তি তথা Spirit শব্দটি দেবতা আর ভূত-প্রেত উভয়কে সমান বুঝিয়ে থাকে। আদিম মন বিশ্বাস করতো মৃত্যু বা ঘুম অথবা সমাধি অবস্থায় ভূত অথবা স্পিরিট দেহ ছেড়ে চলে যায়—এমনকি হাঁচি দিলে শ্বাস-বায়ুর প্রবল ধাক্কায়ও স্পিরিট বেরিয়ে পড়ে, কাজেই আত্মরক্ষামূলক "আল্লাহ্ রহম করে" এ ধরনের কথার আশ্রয় নিতে হয়। আর এ সব কথা ক্রমে হয়ে পড়েছে এমন বিপ-বিপজ্জনক অবস্থার অঙ্গ। মনে করা হতো প্রতিধ্বনি আর প্রতিবিম্ব হচ্ছে নিজের ভূত বা দ্বৈতরূপ'—বাসুতোরা ((Basuto)) নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে অস্বীকার করতো পাছে কুমিরে তাদের ছায়াটা ধরে খেয়ে ফেলে। প্রথম প্রথম "এক চিরস্থায়ী ভূতকেই" ঈশ্বর মনে করা হতো। মনে করা হতো যে পার্থিব জীবনে শক্তিমান ছিল মৃত্যুর পর সে তার প্রেতমূর্তিতেও সে শক্তি অব্যাহত রাখতে সক্ষম। টেনেসি (Tannese) ভাষায় দেবতা শব্দের শব্দগত অর্থই হচ্ছে মৃত মানুষ। জেহোভা (Jehovah) শব্দের অর্থ ছিল "শক্তিমান", "যোদ্ধা", হয়তো তিনি স্থানীয় নরপতি ছিলেন, মৃত্যুর পরই "অনুবর্তী দলের দেবতা" হিসেবে হয়েছেন পূজিত। এমন সব মারাত্মক প্রেত-মূর্তিকে প্রসন্ন রাখতে হয়—ফলে মৃতের সৎকার হয়ে পড়েছে পূজা-উপাসনা, পার্থিব দলপতির কাছ থেকে অনুগ্রহ আদায়ের জন্য যে সব উপায় পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো তা এখন আড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা আর দেবতার মনস্তুষ্টিতে করা হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োগ। যাজকীয় করের আদি উৎস হচ্ছে দেবতাকে দেয় উপহার যেমন রাষ্ট্রীয় করের উৎস দলপতিকে দেয় উপহার। রাজাদের প্রতি প্রণিপাত থেকেই দেব-মন্দিরের বেদিতে মাথা ঠেকিয়ে উপাসনার সূচনা। মৃত রাজাকেই যে দেবতা বানানো হয়েছে তা রোমানদের বেলায় সুস্পষ্ট, তারা মৃত্যুর আগেই রাজাকে দেবতা মনে করতো। মনে হয় সব ধর্মের মূল এ ধরনের পূর্বপুরুষ-পূজা। এ প্রথা যে কতখানি প্রবল ছিল তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে দলপতি খৃস্টীয় ধর্ম-দীক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল স্রেফ এ কারণে যে স্বর্গে তার অ-দীক্ষিত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তার দেখা হবে কিনা এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পায়নি বলেই। (অনুরূপ বিশ্বাসের মতো কিছুটা ভাব ১৯০৫এর যুদ্ধে জাপানী বীরত্বে যেন ঢুকে পড়েছিল—আকাশ থেকে পূর্বপুরুষরা তাদের দিকে তাকিয়ে আছে এ চিন্তা মৃত্যুকে তাদের কাজে করে তুলেছিল সহজতর।)

সম্ভবত আদিম মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ধর্ম—তখন জীবন এত বিপজ্জনক আর অসহায় ছিল যে যে বাস্তবতা চোখের সামনে দেখছে তার চেয়ে ভবিষ্যতে যা আসবে তার আশায় আশায় যেন তাদের আত্মা বেঁচেছিল। অলৌকিক ধর্ম জঙ্গী সমাজেরই যেন কিছুটা আনুষঙ্গিক, যুদ্ধ যখন শিল্প বাণিজ্যকে পথ ছেড়ে দেয়, তখন মৃত্যু ছেড়ে চিন্তা হয়ে ওঠে জীবনমুখী। তখন জীবন পূজ্য কর্তৃত্বের গুহা ছেড়ে উদ্যোগ আর স্বাধীনতার মুক্ত পথে আসে ছুটে। সত্যই পশ্চিমী সমাজগুলির সমগ্র ইতিহাসে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে তার কারণ জঙ্গী শাসনের বদলে ধীরে ধীরে শিল্প-শাসন প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ছাত্ররা রাষ্ট্রের রূপ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র বা গণতন্ত্র এ বিচার করেই সাধারণত সমাজের ও শ্রেণী বিভাগ করে থাকেন কিন্তু বিভক্তিকরণের প্রধান রেখা হচ্ছে জঙ্গী আর শিল্প-সমাজের পার্থক্য ও ভেদ—যুদ্ধনির্ভর জাতির সঙ্গে কর্ম-নির্ভর জাতির ব্যবধান দুস্তর।

জঙ্গী রাষ্ট্র প্রায়ই এককেন্দ্রিক সরকার আর হয়ে থাকে রাজতান্ত্রিক—এ ধরনের রাষ্ট্র যে সহযোগিতার নির্দেশ দেয় তা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত আর বাধ্যতামূলক, এ উৎসাহও দেয় কর্তৃত্বমূলক ধর্ম আর যোদ্ধা দেবতার উপাসনা বিকশিত করে তোলে কঠোর শ্রেণী পার্থক্য আর শ্রেণীগত আদব কায়দা, ধরে রাখতে চায় পুরুষের স্বাভাবিক ঘরোয়া একাধিপত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জঙ্গী সমাজে মৃত্যুহার বেশী বলে সেখানে বহুবিবাহ প্রশ্রয় পায় আর মেয়েদের মর্যাদা পায় হ্রাস। যুদ্ধের ফলে কেন্দ্রশক্তি অধিকতর মজবুত হয় বলে অনেক রাষ্ট্র জঙ্গী হয়ে পড়ে আর তখন সব রকম স্বার্থ জলাঞ্জলী দিতে হয় রাষ্ট্রের স্বার্থের কাছে। ফলে "ইতিহাস হয়ে পড়ে জাতিসমূহের নিউ গেটপঞ্জী" (Newgate-লণ্ডনের বিখ্যাত কারাগার। নিউ গেটপঞ্জী মানে সে কারাগারের কয়দী আর তাদের অপরাধের খতিয়ান) তাদের ডাকাতি, শটতা, হত্যা আর জাতীয় আত্মহত্যারই বিবরণ। আদিম সমাজের এক কলঙ্ক হচ্ছে নরমাংস ভক্ষণ কিন্তু কোন কোন আধুনিক সমাজও হয়ে পড়েছে সামাজিক-খুন—এরাও মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বেঁধে গোটা জাতিকেই গ্রাস করে বসে। যতদিন যুদ্ধকে বেআইনী ঘোষণা করে নস্যাৎ করা না হবে ততদিন সভ্যতাকে ধ্বংসের মাঝখানে এক বিপজ্জনক মধ্যাহ্ন হয়েই থাকতে হবে: "উচচ সামাজিক অবস্থা সব রকম যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।"

এ পরিণতি মানুষের হৃদয়ের আধ্যাত্মিক বিবর্তনের উপর (কারণ মানুষ পরিবেশেরই সন্তান) যতখানি না নির্ভর করে তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে শৈল্পিক সমাজের বিকাশের উপর। শিল্প গণতন্ত্র আর শান্তির পথ রচনা করে: জীবন যদি যুদ্ধের কর্তৃত্ব মুক্ত হয় তা হলে অর্থনৈতিক উন্নতির সহস্র পথ দেবে দেখা আর মঙ্গলকর শক্তিসমূহ সমাজের অধিকতর সংখ্যক মানুষের মধ্যে লাভ করবে বিস্তার। যেহেতু স্বাধীন উদ্যোগই উৎপাদন-বৃদ্ধির সহায়ক শৈল্পিক সমাজ কর্তৃত্বের পৌরহিতের, সম্প্রদায়ের যে সব ঐতিহ্য জঙ্গী রাষ্ট্রে বেড়ে ওঠে আর যার সহায়তায় জঙ্গী রাষ্ট্রও হয়ে ওঠে প্রবল, তা ভেঙ্গে দেয়, করে দেয় সে সবকে হীনবল। তখন সৈনিক বৃত্তিকে কেউ আর সম্মানের চোখে দেখে না—অন্য সব দেশকে ঘৃণা করার পরিবর্তে তখন নিজের দেশকে ভালোবাসারই নাম হয়ে পড়ে স্বদেশপ্রেম সমৃদ্ধির প্রথম শর্ত হলো ঘরে অর্থাৎ নিজ দেশে শান্তি—পুঁজি যতই আন্তর্জাতিক হবে নিয়োগের পথও হাজারো সীমান্ত পার হয়ে যাবে তখন আন্তর্জাতিক শান্তিও হয়ে পড়বে অত্যাবশ্যক। বৈদেশিক যুদ্ধ কমে এলে, স্বদেশেও নির্যাতন কমে আসবে, মেয়ে পুরুষের বয়স-সীমা প্রায় সমান হয়ে যাবে বলে বহু বিয়ের পরিবর্তে এক-বিয়ের অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করার নিয়ম হবে চলতি, মেয়েদের মর্যাদা বাড়বে, কালক্রমে সাধিত হবে "নারীর সর্বাঙ্গীন মুক্তি"। ধর্মীয় কুসংস্কারের পরিবর্তে উদার-বিশ্বাসের আবির্ভাব ঘটবে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন আর চরিত্রকে উন্নত আর মহৎ করে তোলা। শিল্পের কলাকৌশল মানুষকে শেখাবে বিশ্বেরও কলাকৌশল আর শেখাবে কার্য-কারণের অমোঘ পরিণতি। সহজ অলৌকিক ব্যাখ্যার স্থান দখল করবে তখন প্রাকৃতিক কারণের যথাযথ অনুসন্ধান। ইতিহাস তখন যুদ্ধরত রাজাদের পরিবর্তে কর্মরত মানুষের অধ্যয়ন শুরু করবে—ব্যক্তির জীবন-পঞ্জী না হয়ে তখন তা হবে বড় বড় আবিষ্কার আর মহৎ ভাবের ইতিহাস। সরকারের শক্তি কমে আসবে কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্গত উৎপাদক শ্রেণীর শক্তি যাবে বেড়ে—"পদ-মর্যাদা থেকে চুক্তি বদ্ধতায়", বশ্যতার সমতা থেকে উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতায়, বাধ্যতামূলক সহযোগিতা থেকে স্বাধীন সহযোগিতায় উত্তরণের যে একটা পথ আছে তা সবাই দেখতে পাবে। "ব্যক্তির অস্তিত্ব রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই এ বিশ্বাসটা ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এ বিশ্বাসে রূপান্তরিত করা যায়" তা হলে জঙ্গী সমাজ আর শৈল্পিক সমাজের তুলনা বুঝতে পারা যাবে।

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী সামরিকতা বিকাশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েও স্পেন্সার তাঁর স্বদেশকেই শৈল্পিক সমাজের কাছাকাছি আদর্শ বলে করেছেন নির্দেশ আর জঙ্গী রাষ্ট্রের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ফ্রান্স আর জার্মেনির নাম।

'জার্মেনি আর ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার কথা সংবাদপত্রগুলি প্রায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকে। প্রত্যেকেই ওরা দাঁত আর থাবা জন্মানোতেই নিজের অধিকাংশ শক্তি করে থাকে ব্যয়—একদিকে একটার বৃদ্ধি ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকও আর একটা বৃদ্ধির প্রেরণা পেয়ে থাকে। সম্প্রতি ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রী তিউনিসিয়া টংকিং (Tongking), কংগো আর ম্যাডাগাস্কার সম্পর্কে উল্লেখ করে সেখানে অন্যান্য জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক তস্কর-বৃত্তির প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীতা স্বীকার করে বলেছেন যে সব এলাকা দুর্বল আর হীন জাতিদের অধিকার ছিল তা জোর করে দখল করে নিয়ে "পূর্ববর্তী শতাব্দীতে ফ্রান্স বহু মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করে যে গৌরব অর্জন করেছিল তার কিয়দংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।" এ কারণেই আমরা দেখতে পাই ফ্রান্সে যেমন জার্মানিতেও তেমনি সামাজিক পুনর্গঠনের এক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে, যাতে প্রত্যেকে সমাজ দ্বারা প্রতিপালিত হবে আর ওদের প্রত্যেককে খাটতেও হবে সমাজের জন্য। এ পদ্ধতি এত বেশী প্রসার লাভ করেছে যে তা এক প্রবল রাজনৈতিক সংস্থায় হয়েছে পরিণত এ কারণেই ফ্রান্সে দেখা যায় সেন্ট সাইমন (St. Simon), ফাউরিয়ার (Fowrier), প্রাউডন (Prowdhon), কেবেট (Cabet), লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blank) পিয়ারে লেরুক্স (Piere Lerox) প্রভৃতি কখনো কথায় কখনো কাজে কোন না কোন রকমের সাম্যবাদী জীবন আর কাজের প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন।....যাচাই করে দেখা গেছে ফ্রান্স আর জার্মেনির তুলনায় ইংলণ্ডে যেখানে অন্যের মালিকানার সমপ্রসারণ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে এমন ভাব ও আবেগের অর্থাৎ অন্যের মালিকানার যার অর্থ সমাজতন্ত্র, তার তেমন প্রসার ঘটেনি।"

এ উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ থেকে বুঝা যায় স্পেন্সারের ধারণা জঙ্গী আর সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই ফলশ্রুতি সমাজতন্ত্র—তার সঙ্গে শিল্পের কোন স্বাভাবিক মিতালিই নেই। সামরিকতার মতো সমাজতন্ত্র ও এককেন্দ্রিকতার বিকাশে, সরকারী ক্ষমতার প্রসারণে, ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিনাশে আর ব্যক্তির বশ্যতায় সহায়তা করে থাকে। "রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দিকে রাজকুমার বিস্‌মার্ক আগ্রহ ও প্রবণতা দেখাতে পারেন কিন্তু সব সংগঠনেরই আইন হচ্ছে তা যেই সম্পূর্ণতা পায় তখনই তা কঠিন ও অনমনীয় হয়ে পড়ে।" শিল্পে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা মানে পশুর সহজাত প্রবৃত্তির হাতিয়ারকে কঠোর করে তোলা, এ মানুষকে পিঁপড়ে আর মৌমাছির জাতিতে পরিণত করবে এখনকার যে অবস্থা তার তুলনায় তা হয়ে দাঁড়াবে অধিকতর নিরানন্দময় ও এক হতাশাময় দাসত্ব।

"সমাজতন্ত্রে বাধ্যতামূলক আপোষ নিষ্পত্তির প্রয়োজন হবেই........পরিচালকরা যখন ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুসরণ করবে, শ্রমিকের সম্মিলিত শক্তি ও তার মোকাবেলা করতে পারবে না, এখন যেমন স্রেফ আইনানুগ শর্ত ছাড়া কাজ করতে অস্বীকার করে তাদের ক্ষমতা রোধ করা যায় না বরং আরো বেড়ে, ছড়িয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে অদম্য হয়ে ওঠে মালিকরা ....আমলাতন্ত্র কর্তৃক শ্রমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যখন তাদেরে কিভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা জানতে আমলাতন্ত্রের নিকট জিজ্ঞাসু হই তখন কোন সন্তোষজনক উত্তরই মেলে না,........এ অবস্থায় আর এক নতুন অভিজাতের আবির্ভাব অনিবার্য আর তাদের পোষণের জন্য জনসাধারণকে করতে হবে শ্রম আর এ যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তখন ক্ষমতা প্রয়োগে অতীতের সব অভিজাততন্ত্রকে এ যাবে ছাড়িয়ে।"

রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক অনেকখানি আলাদা এবং অধিকতর জটিল ও—লোককে দাসত্বে বেঁধে রাখতে সক্ষম এমন আমলাতন্ত্র ছাড়া কোন সরকারের পক্ষেই একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সরকারী হস্তক্ষেপ সব সময় শৈল্পিক অবস্থার কোন না কোন দিকের অবহেলা করে থাকে এবং যখনই হস্তক্ষেপের চেষ্টা চলেছে তা হয়েছে ব্যর্থ। মধ্যযুগে ইংলেণ্ডে বেতন-ধার্যের যে আইন করা হয়েছিল আর বিপ্লবী ফ্রান্সে মূল্যনিয়ন্ত্রণের যে বিধি-বিধান রচিত হয়েছিল এ প্রসঙ্গে সে সব স্মরণীয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক চাহিদা আর সরবরাহের স্বয়ংক্রিয় বোঝা-পড়ার উপর ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত (যদিও তা নিখুঁত নয়)। যার প্রয়োজন বেশী তার দামও বেশী দেবে সমাজ—যদি কোন মানুষ অথবা কোন কাজ অধিকতর পুরস্কার পেয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে তারা অধিকতর ঝুঁকি নিয়েছে অথবা ভোগ করেছে বেশী কষ্ট। মানুষ যেভাবে এখন তৈরী হয়েছে বাধ্যতামূলক সাম্য সে কখনো বরদাস্ত করবে না। যতদিন না এক স্বয়ং-পরিবর্তিত পরিবেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানব-চরিত্রে পরিবর্তন সাধন না করে ততদিন আইনের সাহায্যে কৃত্রিম পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা জ্যোতিষশাস্ত্রের মতই হবে ব্যর্থ।

শ্রমিক বা বেতনভুখ শ্রেণী পৃথিবী শাসন করবে এ কথা স্পেন্সার ভাবতেই পারতেন না। লণ্ডনের অদম্য টাইমস্ পত্রিকার মারফত ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের সম্বন্ধে তিনি যতদূর জানতে পেরেছিলেন তাতে ওদের প্রতি তাঁর মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বা প্রশংসার উদ্রেক হয়নি। অধিকাংশ ধর্মঘট ব্যর্থ না হলে তা মূল্যহীন, কারণ সব শ্রমিক যদি বিভিন্ন সময় ধর্মঘট করে আর ধর্মঘট সফল হয় তা হলে বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অনুপাতে মূল্য বৃদ্ধিও অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে আর তা হলে অবস্থা যথাপূর্বং তথা পরং হবেই। "তা হলে অবিলম্বে আমরা দেখবো যে অবিচার একদিন মালিকরা করতো এখন সে একই অবিচার শ্রমিকরাই করছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হোক তাঁর সিদ্ধান্ত একেবারে অন্ধভাবে রক্ষণশীল ছিল না। তাঁর চারদিকে যে সমাজ ছিল সে সমাজে বিশৃঙ্খলা আর নির্মম নির্যাতনের চেহারা তিনি দেখেছিলেন, করেছিলেন উপলব্ধি সাগ্রহে চেয়েছিলেন তাকে বদলাতে। শেষে তিনি ঝুঁকে পড়েছিলেন সমবায় আন্দোলনের দিকে। এতেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন পদমর্যাদা থেকে চুক্তিনামায় উত্তরণের পথ আর যাতে স্যার হেনরি মেইন (Sir Henry Main), খুঁজে পেয়েছিলেন অর্থনৈতিক ইতিহাসের সারমর্ম। "সমাজের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আইনের কঠোরতাও কমে এসেছিল। এখানে আমরা এমন এক অবস্থায় এসে পেঁৗছেছি যেখানে ঐক্যবদ্ধ কাজের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নির্যাতন একদম সর্বনিম্নস্তরে নেমে এসেছে। যে যে কাজ করে সে কাজে সেই সর্বময় কর্তা, শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে বেশী সংখ্যক লোক যে আইনকানুন রচনা করেছে সে থাকবে স্রেফ সে সবের শাসনাধীন। বাধ্যতা-মূলক সামরিক সহযোগিতা থেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শৈল্পিক সহযোগিতার অবস্থান্তর এবার সম্পূর্ণতা পেয়েছে।" অবশ্য মনে মনে তাঁর সন্দেহ ছিল শিল্পের মতো এমন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য মানুষ এতখানি সৎ ও যোগ্য হয়েছে কিনা ? তবে তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করে দেখার পক্ষপাতী। তিনি এমন সময়ের কল্পনা করতেন যখন শিল্পের উপর মালিকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকবে না আর যা তা বাজে জিনিস উৎপন্নে মানুষ নিজেকে দেবে না বিসর্জন। জঙ্গী আর শৈল্পিক সমাজের যেমন তুলনা করা হয়েছিল ব্যক্তি রাষ্ট্রের স্বার্থে বাঁচে এ বিশ্বাসকে পাল্টে ব্যক্তির কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এ বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে তেমনি শৈল্পিক আদর্শের সঙ্গে ভবিষ্যতে যে আদর্শের উদ্ভবের সম্ভাবনা রয়েছে তার তুলনা দেয়া হয়েছে জীবন কর্মের জন্য এ বিশ্বাসকে পাল্টে জীবনের জন্যই কর্ম এ বিশ্বাসের সঙ্গে।"

৭. নীতি বিদ্যা ঃ নৈতিকবোধের বিবর্তন

শৈল্পিক পুর্নগঠন সমস্যা স্পেন্সারের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তিনি আবার তাঁর 'The Principles of Ethics(১৮৯৩)-এর এক প্রধান অংশও এ আলোচনায় নিয়োগ করেছেন—"এটি আমার শেষ কাজ....এর পূর্ববর্তী অংশগুলিকে আমি এর সহায়িকা বলেই মনে করি।" নীতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে স্পেন্সার ছিলেন মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের কঠোরতার প্রতীক—ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসেবে যে নীতিবোধ তার পরিবর্তে নতুন এক স্বাভাবিক নীতি-প্রতিষ্ঠা ও তার সন্ধানে তিনি ছিলেন সচেতন ও সচেষ্ট। "সদাচারের অলৌকিক নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলেও কোন শূন্যতা সৃষ্টি হয় না। কারণ স্বাভাবিক নীতি-চেতনার দাবীও কিছুমাত্র কম প্রবল নয় আর তার প্রসার বিস্তৃততর এলাকাব্যাপী।" নতুন নীতি বোধের প্রতিষ্ঠা জীব-বিদ্যার উপর হওয়া চাই। "জীবের বিবর্তন মেনে নেওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন নীতিবোধের ধারণার প্রতিও স্বীকৃতি জানানো।" ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে হাক্সলী অক্সফোর্ডে যে রোমানেস্ (Romanes Lectures) বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে বলেছেন জীববিদ্যাকে কিছুতেই নীতি-নির্দেশক মনে করা যায় না, (টেনিসনের কথায়) "প্রকৃতির দাঁত আর থাবা হচ্ছে রক্তরঞ্জিত", প্রকৃতি প্রেম আর সুবিচারের পরিবর্তে নিষ্ঠুরতা আর ধূর্তামিরই প্রশংসমান। কিন্তু স্পেন্সারের ধারণা যে নীতি কথা প্রাকৃতিক নির্বাচন আর জীবন-যুদ্ধের মোকাবিলা করতে অক্ষম তা সূচনা থেকেই মৌখিক বুলি আর রিক্ততায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। জীবনের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যে আচার-আচরণ খাপ খায় তাই ভালো যা খাপ খায় না তাই মন্দ—অন্য সব কিছুর মতো আচার-আচরণেরও এ মাপকাঠি। "দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বাড়িয়ে জীবনকে সুসম্পূর্ণ হতে যে আচার-আচরণ সহায়তা করে তাই সর্বোত্তম আচার-আচরণ।" অথবা বিবর্তনের সূত্র হিসেবে বল্লে বলতে হয় বিচিত্র সব লক্ষ্যের মাঝখানে যে আচার ব্যবহার ব্যক্তি বা শ্রেণীকে অধিকতর সমন্বিত আর সংহত হতে সাহায্য করে তা-ই নৈতিক বলে মানতে হবে। কলাশিল্পের মতো নৈতিকতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি—তিনিই সর্বোচ্চ তথা সর্বোত্তম মানুষ যিনি বহু বিস্তৃত বৈচিত্র্য, জটিলতা আর জীবনের সম্পূর্ণতাকে নিজের মধ্যে সক্রিয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম।

এ অবশ্য এক ধোঁয়াটে সংজ্ঞা, তা না হয়ে উপায়ও নেই কারণ গ্রহণোপযোগী বিশিষ্ট প্রয়োজনের মতো স্থান-কাল অনুসারে এতো বৈচিত্র্য আর কিছুতেই লক্ষ্যগোচর নয়—ফলে ভালোর যে বিশিষ্ট উপাদান তাতেও বৈচিত্র্যবোধ অনিবার্য। কোন কোন আচার ব্যবহারকে যে ভালো বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তা সত্য, সাধারণভাবে পূর্ণতর জীবনে তা গৃহীতও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, গৃহীত হয়েছে এ কারণে যে এ সব ব্যয়বহুল আর আত্মরক্ষণশীল কর্মের সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচন আনন্দ-চেতনাও জুড়ে দিয়েছে। যদিও আধুনিক জীবনের জটিলতা ব্যতিক্রমের সংখ্যা বহুগুণ করেছে, তবুও সাধারণতঃ আনন্দ জৈবিক-জীবনে খুবই প্রয়োজনীয় আর যন্ত্রণা জৈবিক-জীবনে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও, এ নীতির ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ভালো সম্বন্ধে নানা ধারণা, পরস্পরবিরোধী ধারণাই দেখতে পাই। পশ্চিমী এমন কোন নৈতিক ধারণা নেই যা অন্যত্র নীতিহীন বলে বিবেচিত হয় না—শুধু যে বহু বিবাহ তা নয়, এমন কি আত্মহত্যা, নিজের দেশের মানুষকে খুন করা, এমন কি পিতামাতাকে পর্যন্ত—এ জাতি কি ঐ জাতির মধ্যে এক উচচ নৈতিক কর্ম বলে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে?

"ফিজি দ্বীপের সর্দারদের স্ত্রীরা স্বামীর মৃত্যু-শয্যায় শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে তাদের এক পবিত্র কর্তব্য মনে করে থাকে।" একবার এ রকম স্ত্রীলোককে উইলিয়ামস্ (Williams) উদ্ধার করেছিলেন কিন্তু "স্ত্রীলোকটি রাত্রে পালিয়ে গিয়ে নদী সাঁতরে পার হয়ে তার স্বজাতীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করে দাবী জানিয়েছিল তাকে উৎসর্গ করার জন্য। বলেছিল এক দুর্বল মুহূর্তে নেহাৎ অনিচ্ছায় সে সাহেবটার কথায় রাজি হয়ে এমন পবিত্র কর্তব্যে অবহেলা করেছিল।" উইলকেস্ (Willkes) এ রকম আর এক স্ত্রীলোকের কথা বলেছিলেন যে তার উদ্ধারকর্তাকে শুধু যে গালাগালি দিয়েছিল তা নয় বরং চিরকাল তার প্রতি পোষণ করে রেখেছিল তীব্র বিদ্বেষ। লিভিংস্টোন (Livingstone) জাম্বেজি নদীর উপকূলবাসী মেকোলোলো (Makololo) মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন ইংলণ্ডে পুরুষদের একটিমাত্র স্ত্রী একথা শুনে তারা রীতিমতো অবাক হয়েছিল—তাদের ধারণা এক স্ত্রী 'আভিজাত্যের' খেলাপ। রীডের (Reade) মতে নিরক্ষীয় (Equatorial) আফ্রিকায় "যদি কেউ বিয়ে করে আর তার স্ত্রী যদি জানে আরো একটি স্ত্রী পোষণের তার সম্বল রয়েছে তা হলে আর একটি বিয়ে করার জন্য স্বামীকে সে তাগাদা দিতে থাকে, আর সে যদি তা করতে অস্বীকার করে তা হলে তাকে মনে করে একটা আস্ত কৃপণ।" এ সব ঘটনার সঙ্গে অবশ্য মানুষের মধ্যে যে একটা সহজাত নৈতিক চেতনা রয়েছে যা তাকে কোন্‌টা ভালো আর কোনটা মন্দ তা বলে দেয় তার যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে। কিন্তু সৎ আর অসৎ

৩০—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারের সঙ্গে গড়ে কিছুটা যে সুখ আর দুঃখের সহযোগ রয়েছে এ ধারণায় যথেষ্ট সত্য আছে। আর এ হয়তো সম্ভব যে জাতির দ্বারা অর্জিত কোন কোন নৈতিক ধারণা উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যক্তিও পেয়ে থাকে। এখানে স্পেন্সার তাঁর প্রিয় সূত্রের প্রয়োগ করেছেন সহজাত-বৃত্তির সঙ্গে উপযোগবাদের আপোষ সাধনে এবং আবার নির্ভর করেছেন অর্জিত চরিত্রের উত্তরাধিকারের উপর।

বস্তুতঃ সহজাত নৈতিকবোধ যদি কিছু থাকে তা আজ বিপদের সম্মুখীন, কারণ নৈতিক চেতনার এমন জগাখিচুড়ি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা দেয়নি। এ কুখ্যাতি আর কারো অজানা নয় যে আমরা গির্জায় আর বই-পুস্তকে যে নীতিকথা প্রচার আর প্রচারণা করে থাকি তার ঠিক বিপরীত আচরণ করে থাকি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে। য়ূরোপ আমেরিকায় এখন যে ধরণের নীতিকথা মুখে মানা হয় তা হচ্ছে এক রকম নিষ্ক্রিয় খ্রীষ্টিয়ানী কিন্তু বাস্তবে যে নীতি দেখা যায় তা হচ্ছে লুণ্ঠনবাজ টিউটনদের নীতি, যে টিউটন থেকে য়ূরোপের প্রায় তাবৎ শাসকগোষ্ঠীর উদ্ভব। এ নীতি মানে জঙ্গী জীবন-নীতি। ক্যাথলিক ফ্রান্স আর প্রোটেস্টেণ্ট জার্মেনিতে এখনো যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলছে তা তো টিউটনিক জীবন-নীতিরই লুপ্তবিশেষ স্মৃতি-চিহ্ন। আমাদের নীতিবাগিশরা এখন এসব স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যা দিতেই ব্যস্ত, যেমন পরবর্তী গ্রীস আর ভারতীয় একক-বিবাহবাদীরা আধা-লাম্পট্য যুগের দেবদেবীদের আচার-আচরণের ব্যাখ্যা দিতেই হয়েছিলেন গলদঘর্ম।

শিল্প না যুদ্ধ এর কোন্‌টাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এ নীতি নির্বাচনের উপরই নির্ভর করছে জাতির নৈতিক বোধের আদর্শ খ্রীস্টীয় হবে না টিউটনীয় হবে তার। জঙ্গী সমাজ এমন সব গুণের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে যাকে অন্য জাতি হয়তো অপরাধ বলেই করবে গণ্য। যুদ্ধের ফলে যে সব জাতি আক্রমণে, দস্যুতায় আর শঠতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এগুলিকে তারা অপরাধ বলে কিছুমাত্র নিন্দাই করে না, কিন্তু যে সব জাতি শিল্প আর শান্তিকে জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছে আর তাতে হয়েছে অভ্যস্ত তারা এসবকে অত্যন্ত নিন্দার চোখেই দেখে। যুদ্ধ যদি বিরল ঘটনায় পরিণত হয় তা হলেই উদারতা, মানবতা ইত্যাদি সৎগুণের বিকাশ সম্ভব—পারস্পরিক সহায়তার সুযোগ-সুবিধার চর্চা দীর্ঘ সৃজনীমূলক শান্তির যুগেই সম্ভব। জঙ্গী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের স্বদেশপ্রেমিক সদস্য শৌর্য্য-বীর্যকেই মনে করে মানুষের সর্বোত্তম গুণ, আনুগত্যকে মনে করে যে-কোন নাগরিকের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় আর নারীর সর্বোত্তম গুণ মনে করে বহু-মাতৃত্বের কাছে নীরবে বশ্যতা স্বীকার-কেই। কায়জর ঈশ্বরকে মনে করতেন জার্মেন-সৈন্যাধ্যক্ষ—আর দ্বন্দ-যুদ্ধের প্রতি তাঁর সমর্থন জানাতেন উপাসনায় হাজির হয়ে। উত্তর আমেরিকার ভারতীয়রা "তীর ধনুক আর বর্শা-বল্লমের ব্যবহারকেই মানুষের সর্বোত্তম পেশা মনে করতো....কৃষি আর যান্ত্রিক শ্রমকে দেখতো অত্যন্ত হীন পেশা হিসেবে। মাত্র সম্প্রতিকালে—যখন মঙ্গল রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে উৎপাদনের উন্নততর শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে আর যখন দেখছে এসবের জন্য চাই উন্নত মানসিক বৃত্তির বিকাশ তখনই তারা জঙ্গী থেকে অন্যান্য পেশাকে সম্মানজনক মনে করতে শুরু করেছে।"

যুদ্ধ হচ্ছে নৃশংসতার চরম—একে নরমাংস ভক্ষণের সমতুল্য বিবেচনা করে অসন্দিগ্ধ কণ্ঠে ধিক্কার না দেওয়ার কোন কারণ নেই। "সুবিচার—ভাব আর আবেগ হিসেবে দ্রুত বৃদ্ধির জন্য চাই সমাজে সমাজে বাহ্যিক বিরোধের অবসান আর পারস্পরিক আভ্যন্তরীণ সহযোগিতার দ্রুত প্রসার।" এ সহযোগিতা কি করে বাড়ানো যায়? আমরা দেখেছি ক্ষমতা প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণের চেয়ে স্বাধীনতার পথেই এ হয়ে ওঠে অধিকতর সহজলভ্য। সুবিচারের সূত্র হওয়া উচিত "নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকবে, তবে অন্যের সম-স্বাধীনতায় যেন হস্তক্ষেপ না ঘটে এ শর্তে।" এ সূত্র যুদ্ধের তথা কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ আর বশ্যতার পরিপন্থী, কিন্তু শান্তিময় শিল্প কারখানার অধিকতর অনুকূল কারণ মানুষকে এ দিয়ে থাকে সমান সুযোগ-সুবিধার সাথে সর্বোচ্চ কর্ম-প্রেরণা। খ্রীস্টীয় নীতি ধর্মের সঙ্গেও রয়েছে এর মিল, কারণ এ নীতি সব মানুষকেই মনে করে পবিত্র আর তাকে দেয় নির্যাতন আর আক্রমণের হাত থেকে মুক্তি। প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে চরম বিচারক—এর প্রতি সে চরম বিচারকেরও রয়েছে সম্মতি—কারণ বিশ্বের সব সম্পদের দ্বার এ সকলের সামনে সমভাবে দেয় উন্মুক্ত করে আর সুযোগ দেয় প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ কর্ম আর যোগ্যতানুসারে উন্নতি করার।

প্রথমে এটাকে খুব কঠোর নীতি মনে হতে পারে—অনেকে জাতীয় সম্প্রসারণে সক্ষম আর যার যা সামর্থ আর উৎপাদন সে অনুপাতে না দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনানুসারে দেওয়ার যে পারিবারিক নীতি তার পরিপন্থী বলে এর বিরোধিতাও করবে। কিন্তু এ নীতিতে পরিচালিত সমাজ অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। "অপরিণত অবস্থায় শক্তি সামর্থের উল্টো অনুপাতেই উপকার বিতরণ করতে হয়। মূল্য দিয়েই যদি মরুভূমির পরিমাপ করা হয় তা হলে পারিবারিক মহলে সব চেয়ে অযোগ্যকেই দিতে হয় সবচেয়ে বেশী। আবার পরিণতকালে করতে হয় এর বিপরীত—তখন যোগ্যতা-নুসারে উপকারেও তারতম্য ঘটবেই, তখন জীবন-ধারণের অবস্থানুযায়ীই যোগ্যতার মুল্য হবে মাপা। অবস্থার সঙ্গে যে খাপ খাওয়াতে পারেনা তাকে অযোগ্যতার জন্য ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে আর যে যথাযথভাবে খাপ খাওয়াতে পারে তার যোগ্যতা হবে পুরস্কৃত। বাঁচতে হলে সব প্রজাতিকেই এ দুই নীতি মেনে চলতে হবে।......যদি অল্প বয়সে, অপরিণত অবস্থায় যোগ্যতার মাপে উপকার বিতরণ করা হয় তা হলে অচিরে প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আবার যদি প্রবীণদের উপকার সাধন করা হয় অযোগ্য-তার অনুপাতে তা হলে কয়েক প্রজননের মধ্যেই অবক্ষয়ের ফলে প্রজাতির ঘটবে ধ্বংস।....পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের যে সম্পর্ক সরকার আর জন-সাধারণের সম্পর্কও অনুরূপ এমন উপমা দেওয়া মানে নিজের শৈশব-বৃত্তির পরিচয় দেওয়া।"

AMARBOI.COM

স্পেন্সারের সহানুভূতিতে অগ্রাধিকার লাভের কারণে স্বাধীনতা আর বিবর্তনের যে দ্বন্দ্ব তাতে স্বাধীনতারই হয়েছে জয়। তাঁর ধারণা যুদ্ধের আশঙ্কা কমে এলে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অজুহাতও হয়ে পড়বে হীনবল এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্র জেফারসন (Thomas Jefferson) পরিকল্পিত সীমা মেনে চলবে—অর্থাৎ সম-স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটলেই শুধু রাষ্ট্র এগিয়ে আসবে হস্তক্ষেপ করতে। এ রকম সুবিচার নিখরচা হওয়া চাই—তা হলে অপরাধী বুঝতে পারবে নির্যাতিতের দারিদ্র্য তার অব্যাহতির কোন রক্ষাকবচ নয়। রাষ্ট্রের সব ব্যয় প্রত্যক্ষ করের দ্বারাই মেটানো উচিত তা না হলে, অর্থাৎ ধার্য কর যদি অদৃশ্য হয় তা হলে জন-সাধারণের দৃষ্টি সরকারী অমিতব্যয়িতা ছাড়িয়ে অন্যদিকেই হবে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু "ন্যায় বিচার রক্ষা করা ছাড়া সরকার ন্যায় বিচারের সীমা লংঘন না করে আর কিছুই করতে পারে না" কারণ তখন যোগ্যতা আর পুরস্কারের অযোগ্যতা এবং দণ্ডের যে স্বাভাবিক বিভাগ যার উপর শ্রেণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা জাতির উদ্‌বর্তন আর সমৃদ্ধির নির্ভরশীলতা ডিঙিয়ে নিম্নমানের লোকদের দিতে হবে আত্মরক্ষার সুযোগ।

জমির ক্রমোন্নতি সাধনকে যদি বিচ্ছিন্ন করা যায় তা হলে সুবিচার নীতির সাফল্যের জন্য জমির সাধারণ মালিকানার প্রয়োজন হবে। স্পেন্সার তাঁর প্রথম গ্রন্থে অর্থনৈতিক সুযোগে সমতা বিধানের জন্য ভূমি জাতীয়করণের সুপারিশ করেছেন, পরে অবশ্য তিনি তাঁর এ মত প্রত্যাহার করেন (এ জন্যে হেনরি জর্জ বিরক্ত হয়ে তাঁকে 'হতবুদ্ধি দার্শনিক' বলে অভিহিত করেছিলেন) কারণ তাঁর ধারণা যে-পরিবার জমির মালিক একমাত্র তারাই সযত্নে জমির উৎকর্ষ সাধন করে থাকে আর এ জন্য তাদের পরিশ্রমের ফল তারা যে তাদের উত্তরাধিকারীদের দিয়ে যেতে পারবে তেমন নিশ্চয়তাও থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে সুবিচার আইনেরই আশু পরিণতি—কারণ প্রত্যেকেরই নিজের মিতব্যয়িতার ফল ভোগের সম-স্বাধীনতা থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু মিরাছ সম্বন্ধে সুবিচার এত স্পষ্ট নয়। কিন্তু "মালিকানার যে অধিকার তাতে মিরাছেরও অধিকার নিহিত রয়েছে তা না হলে মালিকানা কথাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।" জাতিতে জাতিতে যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়া চাই। সুবিচারের আইন শুধু গোষ্ঠীগত বিধিনিষেধ না হয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক অলংঘনীয় স্বতসিদ্ধ বিধান হওয়া চাই।

সংক্ষেপে এ হচ্ছে "মানুষের অধিকার"—জীবনের স্বাধীনতার আর সকলের সঙ্গে সমভাবে সুখাণ্বেষণের অধিকার। এসব অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক অধিকার গুরুত্বহীন এক অবাস্তব ব্যাপার। অর্থনৈতিক জীবন স্বাধীন না হলে সরকার বদলে কিছু যায় আসে না। নিরপেক্ষ ও নির্বিরোধী রাজতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র থেকে অনেক ভালো।

'ভোট তো স্রেফ অধিকার রক্ষার একটা হাতিয়ার মাত্র, তবে কথা হচ্ছে সার্বজনীন প্রয়োগের দ্বারা অধিকার রক্ষার সর্বোত্তম হাতিয়ারের কাজ ভোটের দ্বারা সাধিত হবে কিনা। দেখা গেছে উদ্দেশ্য হাসিলে এ তেমন কার্যকরী হয়নি।........অভিজ্ঞতা ছাড়াই যা সুষ্ঠু হওয়া উচিত ছিল এখন অভিজ্ঞতা দিয়ে তা আমরা বুঝতে পেরেছি যে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে স্বল্প সংখ্যকের স্বার্থহানির বিনিময়ে অধিক সংখ্যকরাই উপকৃত হবে।....যে শৈল্পিক সমাজে পুরোপুরি ঐক্য স্বীকৃত তার উপযোগী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে শাসনতন্ত্র রচিত হবে তাতে ব্যক্তির প্রতিনিধি না থেকে স্বার্থের প্রতিনিধি থাকাই বাঞ্ছনীয়।........হয়তো শৈল্পিক আদর্শে গঠিত সমাজে, সমবায় সংগঠনের উন্নয়নের ফলে, যা এখন কল্পনায় বা লেখাজোখায় থাকলেও বাস্তবায়িত হয়নি—চাকর আর মনিবে বা শ্রমিক আর মালিকে কোন পার্থক্যই থাকবে না—হয়তো তখন এমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যেখানে প্রতিকূল শ্রেণীস্বার্থের হয় কোন অস্তিত্বই থাকবে না, না হয় তা এমনভাবে প্রদমিত হবে যে তাতে তেমন মারাত্মক জটিলতার করবে না সৃষ্টি।........কিন্তু এখন মানবসমাজ যে অবস্থায় আছে এবং আরো সুদীর্ঘকাল যে অবস্থায় থাকবে তাতে সমানাধিকার বলতে যা সঠিকভাবে বোঝায় তা আয়ত্তের বাইরে ও তা রক্ষার সমান সুযোগের কোন নিশ্চয়তা নেই।'

শুধু অর্থনৈতিক অধিকারেরই যা কিছু মূল্য, রাজনৈতিক অধিকার যেখানে মরীচিকা সেখানে ভোটাধিকার লাভের জন্য মেয়েদের অনর্থক এত সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। স্পেন্সারের আশঙ্কা, যেহেতু অসহায়কে সাহায্য করা মাতৃত্বের এক সহজাত প্রবৃত্তি সেহেতু মেয়েরা হয়তো রাষ্ট্রকে পৈত্রিক সম্পত্তি করে তুলতেও চাইতে পারে। মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা যথেষ্ট বিশৃঙ্খল ছিল—তিনি একদিকে বলছেন রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন গুরুত্ব নেই অন্যদিকে বলছেন মেয়েদের ঐসব অধিকার দেওয়া উচিত নয়। তিনি যুদ্ধ-বিরোধী, নিন্দা করে, আবার বলছেন মেয়েদের ভোট থাকা উচিত নয় কারণ তারা যুদ্ধে গিয়ে জীবন বিপন্ন করতে অক্ষম। মেয়েদের অশেষ গর্ভ যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যার জন্ম, তেমন যে কোন মানুষের পক্ষে এ এক লজ্জাকর যুক্তি। তাঁর আশঙ্কা মেয়েরা বড্ড বেশী পরোপকারী হয়ে উঠবে অথচ তাঁর গ্রন্থের চরম কথা হলো শিল্প আর শান্তির ফলে মানুষের মধ্যে এমন পরোপকার বৃত্তির বিকাশ ঘটবে যার ফলে মানুষের অহংবোধ ভার-সাম্য লাভ করবে আর দার্শনিক নৈরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে নিয়ম-শৃঙ্খলা।

অহংবোধ আর পরোপকার-বৃত্তির যে সংঘর্ষ (স্পেন্সার এ শব্দ আর এ জাতীয় ভাব জেনে বা না জেনে কঁতের কাছ থেকেই নিয়েছেন) তার উৎপত্তি ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবার, তার দেশ বা শ্রেণী আর তার প্রজাতির সঙ্গে সংঘর্ষ থেকেই। মনে হয় অহং-এর প্রাধান্যই থাকবে, হয়তো তা সঙ্গতও। যদি সবাই নিজের কথা বাদ দিয়ে শুধু অপরের স্বার্থের কথাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে থাকে তা হলে আমরা শুধু সৌজন্য আর পলায়নেরই শিকারে পরিণত হবো। "মনে হয় প্রচুরতম সাধারণ সুখ আয়ত্তের প্রথম শর্ত হচ্ছে সমাজের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, সমান-অনুমোদিত সীমায় থেকে ব্যক্তিগত সুখানুসন্ধান।" তা হলেও আমাদের আশা সহানুভূতির দিগন্ত বাড়ানো আর পরোপকার বৃত্তির অধিকতর বিকাশসাধন। এখনো পিতামাতা সানন্দেই ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। "নিঃসন্তানদের সন্তান-স্পৃহা আর কোন কোন ক্ষেত্রে পোষ্য গ্রহণ থেকে দেখা যায় এক রকম অহংবোধের চরিতার্থতার জন্য এরকম পরোপকারমূলক কার্যকলাপের প্রয়োজন কতখানি।" এ ব্যাপারে নিজের আশু লাভ লোকসানের কথা ভুলে বৃহত্তর স্বার্থে মানুষ যে তীব্র স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে থাকে তা আর এক নজির। সামাজিক জীবন প্রতি প্রজননেই পারস্পরিক সহায়তা প্রবৃত্তিটাকে গভীর করে তোলে। অবিচ্ছিন্ন সামাজিক শৃঙ্খলা মানব-স্বভাবকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যে পরিণামে হয়তো সহানুভূতি-সঞ্জাত যে আনন্দ তার চর্চা পরিপূর্ণ আর স্বতঃস্ফূর্ত হবে আর তা সকলের সার্বিক মঙ্গলেরই হবে অনুসারী।

কর্তব্যজ্ঞান—বহু প্রজন্মের বাক্যগত সামাজিক ব্যবহারেরই যা প্রতিধ্বনি, তার তখন আর প্রয়োজন থাকবে না বলে বিদায় নেবে। সামাজিক উপযোগিতার জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে পরোপকার বৃত্তি তখন সহজাত হয়ে উঠবে, আর সব সহজাত-বৃত্তির মতো বিনা বাধ্যবাধকতায় তাও স্বয়ংক্রিয় আর আনন্দময় হবে। মানব-সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তন এভাবে আমাদের ক্রমাগত নিখুঁত রাষ্ট্রের কাছাকাছি নিয়ে যাবে।

৮. সমালোচনা

এ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই তাঁর যুক্তিতে কিছু কিছু ত্রুটি দেখতে পেয়েছেন—কোথায় কোথায় অসম্পূর্ণতা রয়েছে বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে ওখানে তা স্মরণ করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই আমাদের। সমালোচনা সব সময় অপ্রীতিকর—বিরাট সাফল্যের সামনে তা আরো বেশী। কিন্তু আমাদের কর্তব্যের একটা অংশ হচ্ছে কালের প্রভাবে স্পেন্সারের বিশ্লেষণের কি দশা ঘটেছে তা দেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ক) প্রথম নীতিসমূহ (First prinicples)

অজ্ঞেয় কথাটাই গোড়াতে একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মেনে নেওয়া যায় মানবজ্ঞানের সম্ভাব্য সীমা ও অস্তিত্বের যে বিরাট সমুদ্রে আমরা শুধু ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ মাত্র, তার পরিমাপ আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে আমাদের অনড় বিশ্বাসী হওয়া উচিত নয়, কারণ কঠোর লজিকে কোন কিছুকে অজ্ঞেয় মনে করা মানে তার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অন্ততঃ মেনে নেওয়া। বস্তুতঃ তাঁর দশ খণ্ড গ্রন্থমালার ভিতর দিয়ে স্পেন্সারের প্রাগ্রসর-মানতা প্রমাণ করে যে তিনি অজ্ঞেয় সম্বন্ধে বিস্ময়কর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।" হেগেলের ভাষায়ঃ যুক্তি দিয়ে যুক্তি প্রয়োগকে সীমিত করার চেষ্টা মানে জলে না নেমে সাঁতার দিতে চেষ্টা করা। "অনুপলব্ধ" সম্বন্ধে এসব তর্কশাস্ত্রীয় তর্ক আজ আমাদের কাছ থেকে কত দূর মনে হয়, মনে করিয়ে দেয় কলেজীয় জীবনের কথা। তখন দ্বিতীয় বর্ষে উঠেই মনে হতো বেঁচে থাকা মানে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া। এ কারণে 'প্রথম কারণ' থেকে একটা চালকহীন যন্ত্র কিছুমাত্র বেশী বোধগম্য নয়, যেহেতু এর দ্বারা সব কারণ আর সব শক্তির সমাহার বোঝানো হয়ে থাকে। যন্ত্রযুগের বাসিন্দা ছিলেন বলে স্পেন্সার যান্ত্রিকতাকে স্বীকৃত সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। যেমন ডারুউইন কঠোর ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার দিনের মানুষ বলে একমাত্র সংগ্রামকেই অস্তিত্বের তথা জীবনের নিয়ামক বলে করেছিলেন গ্রহণ।

বিবর্তনের প্রবল সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমরা কি বলতে পারি? এর দ্বারা কিছুরই কি ব্যাখ্যা করা হলো? জনৈক সমালোচক বলেছেনঃ "প্রথমে সব কিছু সরল ছিল তারপর তার থেকে জটিলতার হয়েছে উদ্ভব—এ বলা আর এরকম আরো বলতে থাকার দ্বারা প্রকৃতির কোন ব্যাখ্যাই করা হয় না।" বার্গসঁ (Bergson) বলেছেন স্পেন্সার জোড়াতালি দেন, ব্যাখ্যা করেন না কিছুই। বিশ্বের মূল উপাদানের ধারণায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই তিনি তা হারিয়ে বসেন। বুঝাতে পারা যায় তাঁর সংজ্ঞাই সমালোচকদের বিরক্তির কারণ—যে লোক ল্যাটিন পড়ার বিরোধী আর যাঁর ধারণা সহজবোধ্যতাই উত্তম রচনাশৈলীর লক্ষণ তাঁর ল্যাটিন ভারাক্রান্ত ইংরেজি শ্লথগতি হতে বাধ্য। তবুও স্পেন্সারের কিছু মূল্য স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য নিঃসন্দেহে সমস্ত অস্তিত্বের ধারাটাকে অতি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংক্ষিপ্ত একটি বিবৃতিতে সংহত করতে গিয়ে তিনি আশু স্বচ্ছতা বা বোধগম্যতা দিয়েছেন বিসর্জন। এ কথা অবশ্য সত্য যে তাঁর সংজ্ঞাটি তাঁর অতিপ্রিয় ছিল—সুখাদ্যের মতো মুখে নিয়ে তিনি তা নাড়াচাড়া করতেন, বিচ্ছিন্ন করে পরে ফাঁকে ফাঁকে একত্র করে মুখে পুরতেন। অনুমিত "সম-শ্রেণীয়তার অস্থিরতাই" হচ্ছে তাঁর সংজ্ঞার দুর্বলতম কথা। অসম বস্তুর দ্বারা গঠিত সমগ্রের চেয়ে সমবস্তুর দ্বারা গঠিত সমগ্র কি অধিক-তর অস্থির বা অনস্থায়ী? মনে হয় সরল সমজাতীয়তার তুলনায় জটিল অসমজাতীয়তা অনেক বেশী অস্থির বা নশ্বর। নৃতত্ত্ব আর রাজনীতিতে অসমজাতীয়তা যে অস্থিরতার কারণ তা এক স্বীকৃত-সত্য আর সব বিদেশাগতদের একই জাতীয়তার আদর্শে মিলিয়ে একাকার করে নিতে পারলে সমাজ যে সবল আর দৃঢ় হয় তাও স্বীকৃত। টার্ডের (Tard) মতে বহু প্রজননের পারস্পরিক অনুকরণের ফলে যদি কোন শ্রেণী বা জাতির অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে সমতার বৃদ্ধি ঘটে তা হলেই সভ্যতার উৎপত্তি হয় সহজ। বিবর্তনের গতি যে সমজাতীয়তার দিকে সে ধারণার এখানেই উপলব্ধি। গ্রীক স্থাপত্য থেকে গথিক স্থাপত্য নিশ্চয়ই জটিল কিন্তু তাই বলে তাকে শৈল্পিক বিবর্তনের উচ্চতর পর্যায় বলা যায় না। স্পেন্সার বড্ড ত্বরিৎ এ সিদ্ধান্ত করে বসতেন যে যা যত পূর্ববর্তী তা ততো সরলতর। আদিম মানুষের বুদ্ধি আর প্রোটোপ্লাজমের (Protoplasm) জটিলতাকে তিনি মোটেও গুরুত্ব দিতেন না। তার চেয়ে বড় কথা যে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে অধিকাংশ মানুষ বিবর্তনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে মনে করেন তাঁর সংজ্ঞায় তার কোন স্থান নেই। সম্ভবতঃ সংহত আর অসংহত, সমজাতীয়তা আর অসমজাতীয়তা, বিচ্ছিন্নতা আর সংঘ-বদ্ধতার যে সূত্র তার থেকে ইতিহাসকে যদি বেঁচে থাকার সংগ্রাম আর যোগ্যতমের উদ্বর্তনের বর্ণনা অর্থাৎ যোগ্যতম জীবের, যোগ্যতম সমাজের, যোগ্যতম নীতির, যোগ্যতম ভাষা ও ভাব আর দর্শনের উদ্বর্তনের কাহিনী হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তা হলে বিষয়টি অধিকতর স্বচ্ছতা লাভ করে না কি? স্পেন্সার বলেছেন: "আমি অতিবেশী নির্মূর্ত ভ্রমণে নিজেকে ছেড়ে দিই বলে আমি মূর্ত-মানবতার এক মন্দ পর্যবেক্ষক।" এ এক বিপজ্জনক সততা। অবশ্য স্পেন্সারের পদ্ধতি হচ্ছে উপদেশাত্মক আর সাধারণ প্রতিজ্ঞার যুক্তির সাহায্যে তিনি গ্রহণ করে বসেন বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্ধতি বেকনের আদর্শ তথা বৈজ্ঞানিক চিন্তার বাস্তব নিয়মের খেলাপ। তাঁর সেক্রেটারির মতে "প্রতিজ্ঞা থেকে নির্দিষ্ট আর পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিকাশ সাধনের এক অক্ষয় মানসিক শক্তির তিনি ছিলেন অধিকারী—যে কোন কাল্পনিক প্রতিষ্ঠার সমর্থনে তিনি আরোহ আর অবরোহ যুক্তি পেশ করতেন। "তবে সর্বাগ্রে তিনি প্রতিজ্ঞা থেকে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তই করে বসতেন।" স্পেন্সার খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতো পর্যবেক্ষণ দিয়েই শুরু করেছিলেন—বৈজ্ঞানিকের মত তিনি অনুমানের পথেও হয়েছেন অগ্রসর—কিন্তু এ পর্যন্তই। তারপর অবৈজ্ঞানিকের মতো তিনি কোন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, করেননি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ। শুধু সংগ্রহ আর সঞ্চয় করেছেন অনুকূল বস্তু-তালিকা। "বিপরীত নজিরের" কোন ধারণাই তাঁর ছিল না। এর সঙ্গে ডারউইনের পদ্ধতি তুলনা করলে দেখা যায় যখনই তাঁর মতের বিরুদ্ধ কোন নজিরের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তখনই তা টুকে রেখেছেন, কারণ তিনি জানতেন অনুকূল বিষয়ের তুলনায় প্রতিকূল বিষয় সহজেই স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

(খ) জীববিদ্যা আর মনোবিদ্যা

তাঁর "উন্নতি" নামক প্রবন্ধের পাদ-টীকায় তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের ভিত্তি লেমার্কের **(Lamark)** অর্জিত 'চরিত্রের উত্তরাধিকার সম্ভাবনা' মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত—ডারউইন মতবাদের যে মূল কথা প্রাকৃতিক নির্বাচন তার সম্ভাব্যতার উপর মোটেও নয়। তিনি লেমার্কীয় মতবাদেরই দার্শনিক—ডারউইন মতবাদের নয়। ডারউইনের **Origin of Species** যখন প্রকাশিত হয় তখন স্পেন্সারের বয়স চল্লিশ। চল্লিশে মানুষের মতামত সাধারণত: অনড়-অটল হয়ে পড়ে।

তাঁর মতবাদে ছোটখাটো ত্রুটি ত আছেই—যেমন উন্নয়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রজনন কমে আসে। তাঁর এ মতের সঙ্গে সভ্য য়ুরোপের জন্মের হার অসভ্য জাতিদের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ার কারণ তিনি বিশ্লেষণ করেননি। জীব-বিদ্যায় তাঁর মতবাদের প্রধান ত্রুটি এ যে তিনি লেমার্কের উপর নির্ভর করেছেন—জীবনের কোন বলিষ্ঠ ধারণায় পৌছতে হয়েছেন ব্যর্থ। জীবনের জৈব রাসায়নিক উপলব্ধি সম্ভব নয় "তাঁর এ স্বীকা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুক্তিই তাঁর বিবর্তন সূত্রের প্রতি এক মারাত্মক আঘাত। শুধু বিবর্তন সূত্রের প্রতি নয় তাঁর জীবনের সংজ্ঞা আর সমণ্বয় দর্শনের প্রতিও।” জীবনের রহস্যসন্ধান করতে হবে পরিবেশের সঙ্গে জীবের নিষ্ক্রিয় বোঝাপড়ায় নয়, বরং বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের আপোষ সাধনে মনের ক্ষমতা আর শক্তিতে। স্পেন্সারের যে সিদ্ধান্ত তার পুরোপুরি অভিযোজন মানে মৃত্যু।

মনোবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর বইগুলিতে স্রেফ সূত্রই রচনা করা হয়েছে, ঐ থেকে কিছুই জানা যায় না। আমাদের জানা বস্তুকেই তিনি প্রায় বর্বরোচিত জটিল পরিভাষায় পুনর্গঠন করেছেন মাত্র—যা দরকার ছিল সহজবোধ্য করার তাকে তিনি করে তুলেছেন দুর্বোধ্য। তাঁর যত সব সূত্র, সংজ্ঞা আর মনোবিজ্ঞানের বিষয়কে নিরপেক্ষ গঠনের এক রকম সংশয়জনক সংক্ষিপ্তসাধনে পাঠক মন অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ না করে পারে না—এতদসত্ত্বেও তিনি বুঝতে পারেননি যে মন আর চেতনার মূল উৎস যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে, করা হয়নি তার কোন ব্যাখ্যা। এ অবশ্য সত্য যে স্পেন্সার তাঁর চিন্তার এ ফাঁক ঢাকতে চেয়েছিলেন এ বলে যে আদিম নীহারিকা অবস্থা থেকে এক যান্ত্রিক নিয়মে স্নায়ু প্রক্রিয়ার সহযোগী হিসেবেই মনের উৎপত্তি আর তা মন্ময় ভাবেই ঘটেছে। কিন্তু নিরপেক্ষ সামগ্রিকতার উপর এ মন্ময় সহযোগিতা কেন সে সম্বন্ধে স্পেন্সার নিরুত্তর। হয়তো সব মনোবিদ্যার এই কেন্দ্রবিন্দু বা আলোচ্য বিষয়।

(গ) সমাজবিজ্ঞান আর নীতিশাস্ত্র (Sociology and Ethics)

স্পেন্সারের দু' হাজার পৃষ্ঠার 'সমাজবিজ্ঞান' অত্যন্ত চমৎকার রচনা বটে কিন্তু তাতেও সমালোচনাযোগ্য যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে। আর এ রচনার সর্বত্রই ফুটে উঠেছে বিবর্তন আর উন্নতি যে সমার্থক তাঁর এ ধারণা। এ যদি বিবর্তন হয় তা হলে মানুষের বিরুদ্ধে কীটপতঙ্গ আর বীজাণুর অবিরাম সংগ্রামে তাদেরই তো চরম জয়ের সম্ভাবনা। পূর্ববর্তী 'জঙ্গী' সামন্ততন্ত্র থেকে শৈল্পিক রাষ্ট্র অধিকতর শান্তিপ্রিয় বা নৈতিক কিনা তাও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট নয়। এথেন্সের প্রায় সব ধ্বংসকর যুদ্ধই তো সংঘটিত হয়েছে বুর্জোয়া বণিকতন্ত্রের কাছে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের পরাজয় বরণের অনেক কাল পরে। বর্তমান য়ুরোপের দেশগুলোও যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তারাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো তখন রাষ্ট্রবিশেষ শৈল্পিক কি অশৈল্পিক তা মোটেও বিবেচনায় আনে না। ভূমি-লিপ্সু রাজতন্ত্র থেকে শৈল্পিক সাম্রাজ্যবাদ কিছুমাত্র কম যুদ্ধবাজ নয়। পৃথিবীতে শিল্প-বাণিজ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী দুই জাতিই তো বর্তমানে সর্বাপেক্ষা যুদ্ধবাজ। যানবাহন আর বাণিজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ জার্মেনির দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা না হয়ে বরং সহায়ক হয়েছে। সমাজতন্ত্র সামরিকতার নয় বরং শৈল্পিকতারই উন্নয়ন। স্পেন্সারের রচনার সময় তখন ইংলণ্ড অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন ছিল (য়ূরোপে) বলে কিছুটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল আর ব্যবসা-বাণিজ্য একাধিপত্যের ফলে হয়ে পড়েছিল 'মুক্ত বাণিজ্যে' বিশ্বাসী। বেঁচে থাকলে দেখে তিনি নিশ্চয়ই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন শিল্পবাণিজ্যে একাধিপত্য অর্জনের ফলে 'মুক্তবাণিজ্য নীতির' কিভাবে দ্রুত অবলুপ্তি ঘটেছে আর জার্মেনির বেলজিয়াম আক্রমনে ইংলণ্ডের 'বিচ্ছিন্নতা'র অবসানের আশঙ্কায় কিভাবে তার নিষ্ক্রিয়তারও ঘটেছে অবসান। অবশ্য স্পেন্সার শৈল্পিক শাসন ব্যবস্থার কিছুটা মাত্রাতিরিক্ত গুণকীর্তন করেছেন। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে যে পৈশাচিক শোষণ আর নির্যাতন চলছিল তার প্রতি তিনি প্রায় অন্ধ ছিলেন। তিনি শুধু দেখেছেন: "আমাদের এ শতাব্দীর মাঝখানে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে, অতীতের চেয়ে অনেক বেশী ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল।" শৈল্পিকতার বিরুদ্ধে নীট্‌জের বিরাগ আর প্রবল প্রতিক্রিয়া অকারণ নয়—ফলে তিনি মাত্রাধিক গুণ-কীর্তন করে বসেছেন সামরিক জীবনের। তাঁর অনুভূতি থেকে তাঁর যুক্তি যদি প্রবলতর হতো তা হলে সামাজিক জীবের উপমা স্পেন্সারকে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে নিয়েই পৌঁছাতো, কারণ বর্তমান অবিচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রই অসমতায় সংহতি আনয়নের অধিকতর অনুকূল। তাঁর নিজের সূত্রের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে স্পেন্সার বলতে বাধ্য হতেন যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জার্মেনিই সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র। এ যুক্তি তিনি খণ্ডাতে চেয়েছেন অসম-বৈচিত্র্যে অংশগুলি অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে, আর এ রকম স্বাধীনতা মানে ন্যূনতম সরকারী আধিপত্য, একথা বা যুক্তি দিয়ে। কিন্তু তাঁর "সংহত অসমতা বা বৈচিত্র্য" থেকে এ যেন এক নতুন সুর। মানবদেহে সংহতি আর বিবর্তন অংশের অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায় স্বাধীনতাকে মোটেও স্বীকৃতি দেয় না। স্পেন্সারের উত্তর: সমাজের বেলায় অংশ বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খণ্ডেই চেতনা বিরাজ করে আর দেহের বেলায় তা বিরাজ করে স্রেফ সমগ্রে। কিন্তু সামাজিক চেতনা অর্থাৎ শ্রেণীগত স্বার্থ আর প্রক্রিয়া চেতনা ও ব্যক্তিগত চেতনা যেমন ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত তাও তেমনি সমাজেই কেন্দ্রীভূত। "রাষ্ট্রচেতনা" আমাদের খুব কম লোকেরই আছে। স্পেন্সার রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে আমাদের বাঁচতে সহায়তা করেছেন তবে তাঁর যুক্তি আর মতামতের প্রতি নিষ্ঠার বিনিময়ে। ব্যক্তি-তান্ত্রিক অতিরঞ্জনের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি দুই যুগের সন্ধিক্ষণে পড়েছিলেন বাঁধা—তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা স্থিতিশীলতার যুগে, এডাম স্মীথের (Adam Smith) প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল আর তাঁর জীবনের পরবর্তী কাল কেটেছে যখন ইংলণ্ডে শৈল্পিক শাসনের অপকর্মকে সামাজিক শাসনের দ্বারা শোধরাতে সংগ্রাম করছিল। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করেছেন। রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষারও তিনি বিরোধী ছিলেন—অসৎ অর্থনীতির হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এক সময় তিনি যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নয়, বরং ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট ব্যাপার বলেই মত দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, ওয়েলসের (Wells) ভাষায়ঃ "জনগণের অসহায়তাকে জাতীয় আত্ম-মর্যাদার নীতিতে উন্নীত করতে।" তাঁর পাণ্ডুলিপি তিনি নিজেই মুদ্রা-করের কাছে নিয়ে যেতেন, সরকারী সংস্থা বলে ডাকঘরের উপর তাঁর আদৌ আস্থা ছিল না। মানুষ হিসেবে তিনি তীব্র ব্যক্তিবাদী ছিলেন, থাকতে চাইতেন একা, নির্জনতা ভঙ্গের আশঙ্কা দেখলে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। যে কোন নতুন আইন প্রবর্তন হতে দেখলে মনে করতেন তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় এ এক নতুন আক্রমণ। বেঞ্জামিন কিড (Benjamin Kidd) বলতেন শ্রেণী বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন দল বা উপদলে যতই সক্রিয় হয়ে উঠবে, আর ব্যক্তিতে যতই কমতে থাকবে, ততই তা বিস্তৃতভাবে পারিবারিক নীতিতে (যার মানে, সকল দুর্বলকে সহায়তা করা) প্রয়োগ করতে হবে—এ করা দলীয় ঐক্য আর শক্তির জন্য অপরিহার্য। স্পেন্সার কিন্তু কিডের এ যুক্তি বুঝতেই পারেননি। অসামাজিক দৈহিক শক্তির হাত থেকে রাষ্ট্র কেন তার নাগরিকদের রক্ষা করবে আর অসামাজিক অর্থনীতির হাত থেকে বাঁচাতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা কেন অস্বীকার করবে এসব কথাকে স্পেন্সার কোন আমলই দেননি। সরকার আর নাগরিকদের সম্পর্ক বিষয়ে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের উপমাকে ছেলেমানুষী মত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন—তাঁর মতে সত্যিকার উপমা হচ্ছে ভাই ভাইকে সাহায্য করার সঙ্গে। তাঁর জীব-বিদ্যা থেকে রাজনীতিই ছিল অধিকতর ডারউইনবাদী। সমালোচনা এখন থাক। মানুষটার দিকে আবার ফিরে দেখা যাক, দেখা যাক তাঁর কর্মের গৌরব আর মাহাত্ম্য অধিকতর উদার পরিপ্রেক্ষিত থেকে।

৯. উপসংহার

"প্রথম নীতিসমূহ (First principles) সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে তাঁর যুগের দার্শনিকদের শীর্ষস্থানে পৌঁছে দেয়'। অনতিবিলম্বে তা য়ূরোপের তাবৎ ভাষায়, এমনকি রুশ ভাষায়ও, অনুদিত হয়েছে। রাশিয়ায় বইটিকে সরকারী অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয় বটে, কিন্তু বিচারে সরকারেরই ঘটে পরাজয়। তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন যুগের দার্শনিক ভাষ্যকার হিসেবে—য়ূরোপীয় চিন্তার সর্বত্রই যে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল শুধু তা নয়, সাহিত্য শিল্পের বস্তুবাদী আন্দোলনকেও তা জোরদার করে তুলেছিল। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ডে তাঁর 'নীতিসমূহ'কে পাঠ্য করা হয়েছে দেখে তিনি রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন। আরো চমৎকার কথা—১৮৭০ এর পর থেকে তিনি তাঁর বই থেকে যে টাকা পেতে শুরু করলেন তাতে লাভ হলো তাঁর আর্থিক নিরাপত্তা। কোন কোন গুণগ্রাহী তাঁকে মূল্যবান উপহারও পাঠাতে লাগলেন, যা অবশ্য তিনি ফেরৎ দিয়ে দিতেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যখন ইংলণ্ডে বেড়াতে এলেন তখন লর্ড ডার্বির কাছে (Lord Derby) ইংল্যাণ্ডের এ খ্যাতনামা পণ্ডিতটির সঙ্গে দেখা করার বাসনা তিনি জানিয়েছিলেন। ডার্বি স্পেন্সার, হাক্সলী, টিণ্ডেল প্রভৃতিকে দাওয়াৎ দিয়েছিলেন। অন্যেরা দাওয়াতে হাজির হয়েছিলেন—স্পেন্সার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি স্রেফ কয়েকজন অন্তরঙ্গের সঙ্গেই মিশতেন। তিনি লিখেছেন: "কেউই তাঁর লেখা গ্রন্থের সমান নয়। মানসিক প্রক্রিয়ার সব সর্বোত্তম ফসলই তাঁর বইতে বিধৃত হয়। দৈনিক আলাপ আলোচনা যে-সব নিকৃষ্ট ফসলের স্তূপের সঙ্গে তার মিশ্রণ ঘটায় সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই উত্তম ভাবরাশি তাঁর গ্রন্থে স্থান গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে।" লোকেরা যখন জেদ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন তিনি কানে ছিপি এঁটে নির্বিকারভাবে তাদের আলাপ আলোচন শুনতেন।

আশ্চর্য, যেমন দ্রুত তিনি চড়ে বসেছিলেন খ্যাতির উচচ চূড়ায়, তেমনি তার থেকে পতনও হলো তাঁর দ্রুত। খ্যাতির উচচতায় পৌঁছেও তিনি বেঁচে রইলেন। এবং শেষ বয়সে 'মুরুব্বিয়ানা' গোছের আইন-কানুনের বিরুদ্ধে বাধা দানে তাঁর অক্ষমতা দেখে তিনি খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি হয়ে পড়লেন সব শ্রেণীর কাছে অপ্রিয়। বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণের ধারণা তিনি তাঁদের খাসতালুকে অনধিকার প্রবেশ করেছেন—তাঁর অবদানের কোন মূল্য না দিয়ে তাঁরা স্রেফ তাঁর ভুলের উপর জোর দিয়ে কপট প্রশংসার আড়ালে তাঁর নিন্দাই শুধু করেছেন। আর সব সম্প্রদায়ের পাদ্রীরা ব্যবস্থা দিয়েছেন তাঁর অনন্ত নরকবাসের। শ্রমিক শ্রেণী তাঁর যুদ্ধ বিরোধিতা পছন্দ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্র আর ট্রেড য়ুনিয়ান-রাজনীতি নিন্দায় তাঁর প্রতি হয়ে উঠেছিলেন ক্ষিপ্ত। আবার রক্ষণশীলরা তাঁর সমাজতন্ত্র নিন্দায় খুশী ছিলেন বটে, কিন্তু নিরীশ্বর-বাদিতার জন্য তাঁর প্রতি ছিলেন বিমুখ। গম্ভীর কণ্ঠে একবার তিনি বলেছিলেন: "আমি যে কোন রক্ষণশীল থেকে অধিকতর রক্ষণশীল আর যে কোন প্রগতিবাদী থেকে অধিকতর প্রগতিবাদী।" অকপটে সব বিষয়ে কথা বলে তিনি হয়েছিলেন সকল দলের বিরাগভাজন—তিনি ছিলেন অবিচলিতভাবে সরল। শ্রমিকরা মালিকের শিকারে পরিণত এ কথা বলে তিনি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছেন শ্রমিকরা মালিক হয়ে বসলেও অবস্থা এর বিপরীত হবে না। মেয়েরা পুরুষদের হাতে নির্যাতিত বলে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তিনি একথা যোগ করতেও ছাড়েন নি যে যতখানি সম্ভব মেয়েরাও পুরুষ-দের উপর নির্যাতন কম করেন না। তাঁর বার্ধক্য কেটেছে একদম নিঃসঙ্গতায়।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরোধিতার তীব্রতা কমে এসেছিল, মতামতও হয়ে এসেছিল সংযত। ইংলণ্ডের পোশাকী আর সাক্ষীগোপাল রাজাকে নিয়ে তিনি সব সময় হাসিঠাট্টা করে এসেছেন, কিন্তু এখন বলছেন শিশুকে তার পুতুল থেকে বঞ্চিত করা যেমন উচিত নয়, তেমনি উচিত নয় জনসাধারণকে বঞ্চিত করা তাদের রাজা থেকে। ধর্মব্যাপারেও এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মত হচ্ছে যে ঐতিহ্যগত বিশ্বাসে মানুষ উপকার আর আনন্দের সন্ধান পেয়েছে তাকে নষ্ট করতে যাওয়া বাতুলতা ও নির্দয়তা মাত্র। তিনি বুঝতে পারলেন ধর্মীয় বিশ্বাস আর রাজনৈতিক আন্দোলন এমন এক আবেগ আর প্রয়োজনে গড়ে ওঠে যা বুদ্ধিগত আক্রমনের নাগালের বাইরে —তাঁর স্তূপাকার বইগুলির বক্তব্যের প্রতি বিশেষ কান না দিয়ে পৃথিবী যে অব্যাহত গতিতে চলছে তা দেখে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। নিজের দুঃসাধ্য জীবনের দিকে পেছন ফিরে দেখে তাঁর মনে হলো জীবনের ছোট ছোট সহজ আনন্দের পরিবর্তে তাঁর পক্ষে সাহিত্যখ্যাতির সন্ধান নেহাৎ আহাম্মকের কাজ হয়েছে। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর শ্রম ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা এখন জানি—না, তাঁর শ্রম ব্যর্থ হয়নি। বিজ্ঞান-ভিত্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে ইংরেজ-হেগেলপন্থীদের প্রতিক্রিয়ার আংশিক কারণেই তাঁর খ্যাতি রাহুগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু উদারতার পুনরুজ্জীবন ঘটলে তাঁর যুগে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ দার্শনিক ছিলেন তা আবার নতুন করে স্বীকৃত হবে। বস্তুর সঙ্গে দর্শনের এক নতুন সম্পর্ক তিনি স্থাপন করেছেন আর তাতে নিয়ে এসেছেন এমন এক বাস্তবতা যার তুলনায় জার্মেন দর্শনকে মনে হয় দুর্বল, পাণ্ডুর আর ভীরুতার এক বিমূর্ত মূর্তি। দান্তের পরে তাঁর মতো আর কেউই নিজের যুগকে এমনভাবে সংহত করে প্রকাশ করতে পারেনি—জ্ঞানের এক বিরাট ক্ষেত্রকে যে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি সমণ্বিত করেছেন তার সাফল্যের সামনে সমালোচনা লজ্জায় নতমুখ হতে বাধ্য। আমরা এখন যে উচ্চ-চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি তা তাঁর শ্রম আর সংগ্রামেরই ফল—তিনি আমাদেরে কাঁধে তুলে নিয়েছেন বলেই আজ আমাদের মনে হচ্ছে আমরা উচ্চতায় তাঁকে ছাড়িয়ে গেছি। তাঁর আক্রমনের দংশন জ্বালা যদি আমরা কোনদিন ভুলে যেতে পারি তা হলেই তাঁর প্রতি সুবিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়

ফ্রেড্রিক নীট্শে (Friedrick Nietzsche)

১. নীটশের চিন্তা-সূত্র

নীট্শে ছিলেন ডারউইন-সন্তান আর বিসমার্ক-ভ্রাতা। তিনি যে ইংরেজ অভিব্যক্তিবাদী আর জার্মেন জাতীয়তাবাদীদের উপহাস করেছেন এ ধর্তব্যের মধ্যে নয়, যাঁরা তাঁকে সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছেন তাঁদের নিন্দা করায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন—ঋণ ঢাকবার এ ছিল তাঁর মনের অগোচর বা অচেতন নিয়ম। স্পেন্সারের নীতিবাদী দর্শনকে বিবর্তনবাদের খুব স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত একথা বলা যায় না। যদি সংগ্রামই জীবন আর সে সংগ্রামকে যোগ্যতমের উদ্বর্তন মেনে নেওয়া হয় তা হলে শক্তিকেই চরম গুণ আর দুর্বলতাকেই একমাত্র ত্রুটি স্বীকার না করে উপায় নেই। তা হলে যা টিকে থাকে আর জয়ী হয় তাই ভালো আর যা হেরে যায়, অকৃতকার্য হয় তাই মন্দ। একমাত্র ইংরেজ ডারউইনপন্থীদের মধ্য-ভিক্টোরিয় ভীরুতা, ফরাসী দৃষ্টবাদীদের বুর্জোয়া আভিজাত্য আর জার্মেন সমাজতন্ত্রীরাই এ অনিবার্য সিদ্ধান্তকে চাপা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারে। এসব লোক খ্রীস্টীয় ধর্ম-শাস্ত্রকে প্রত্যাখ্যানের দুঃসাহস দেখিয়েছেন কিন্তু দেখাতে পারেননি যুক্তিবাদী হওয়ার সাহস, তাই সে শাস্ত্র থেকে উদ্ভূত নৈতিক ধারণা, বিনয়, ভদ্রতা আর পরোপকার স্পৃহাকে তারা পারেননি করতে প্রত্যাখ্যান। তাঁরা এ্যাংলিকান কি ক্যাথলিক বা লুথারপন্থী হতে চাননি। অথচ সাহস করেননি খ্রীস্ট ধর্ম ত্যাগ করে অ-খ্রীস্টান হতে। তাই ফ্রেড্রিক নীট্শের মন্তব্য: "ভল্টেয়ার থেকে অগাস্ট কঁতে পর্যন্ত সব ফরাসী স্বাধীন চিন্তাবিদ্দের এক গুপ্ত প্রেরণা ছিল খ্রীস্টীয় আদর্শকে সমর্থন না করা....তবে সম্ভব হলে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া। কঁতে যখন বলেন: 'অন্যের জন্যই বাঁচো' তখন তিনি খ্রীস্ট ধর্মকেও এক ধাপ ছাড়িয়ে যান। জার্মেনিতে শোপেনহাওয়ার আর ইংলণ্ডে জন স্টুয়ার্ট মিলই অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ভালোবাসা,

৩১—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুণা আর উপকার সাধনের কর্মনীতিকে সবচেয়ে সুপরিচিত করে তুলেছিলেন। এসব নীতির এক সাধারণ ক্ষেত্রের উপর সব সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই তাঁরা এক রকম অজ্ঞাতেই করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত।"

ডারউইন নিজের অজ্ঞাতেই যেন বিশ্বকোষবাদীদের (Encyclopaedists) কাজটা করে দিয়েছেন: তাঁরা আধুনিক নীতিবাদের শাস্ত্রীয় বুনিয়াদটা নির্মূল করেছেন সত্য কিন্তু স্বয়ং নৈতিকতাকে অক্ষত আর অস্পর্শ ছেড়ে দিয়েছেন, রেখেছেন হাওয়ায় ঝুলিয়ে—জীববিদ্যার একটুখানি হাওয়া লাগলেই প্রতারণার এ ভগ্নাংশটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। স্বচ্ছতার সঙ্গে চিন্তা করতে সক্ষম ব্যক্তিরা অনতিবিলম্বে বুঝতে পারলো যা সব যুগের গভীরমনাদের জানা ছিল: যে সংগ্রামকে আমরা জীবন বলে অভিহিত করছি তাতে ভালোর চেয়ে শক্তির, বিনয়ের চেয়ে অহঙ্কারের, নিঃস্বার্থ পরোপকারের চেয়ে অটল বুদ্ধিরই প্রয়োজন বেশী আর সাম্য গণতন্ত্র ইত্যাদি হচ্ছে নির্বাচন আর উদ্বর্তনের পরিপন্থী। এবং বিবর্তনের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিভাবান জনসাধারণ নয় আর সব বৈষম্য আর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে মালিক 'সুবিচার' নয় বরং ক্ষমতা। ফ্রেড্রিক নীট্শেরও তাই মনে হলো।

এসব যদি সত্য হয় তা হলে বিস্মার্কের চেয়ে মহৎ আর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। এ লোকটির বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তাই সোজা বলতে পেরেছিলেন: "জাতিতে জাতিতে নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে কিছু নেই", বর্তমানের সব সমস্যার সমাধান ভোট আর বাগ্মিতার দ্বারা হবে না, হবে রক্ত আর অস্ত্রের দ্বারা। 'আদর্শবাদ', গণতন্ত্র আর বিভ্রান্তির ঘূণে-ধরা য়ুরোপের জন্য কি এক নির্মলীকরণ ঘূর্ণিঝড়ই না তিনি ছিলেন! সংক্ষিপ্ত কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি অবক্ষয়িত অষ্ট্রিয়াকে বাধ্য করেছিলেন তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে—আর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মাসের মধ্যে নেপোলিয়ন কিংবদন্তীর নেশায় মত্ত ফ্রান্সকে করলেন পর্যুদস্ত। আর ঐ সংক্ষিপ্ত কয় মাসে তিনি কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মেন 'রাষ্ট্রগুলি'কে ক্ষুদে রাজা আর সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের মিলিয়ে, সংঘবদ্ধ করে এক মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেননি?—এ তো শক্তি আর ক্ষমতার নব-নৈতিকতার প্রতীক। এ নতুন জার্মেনির ক্রমবর্ধমান সামরিক আর শৈল্পিক শক্তির চাই কণ্ঠস্বর ও নতুন আওয়াজ—যুদ্ধ সিদ্ধান্তের সাফাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাওয়ার জন্য চাই নতুন দর্শন। খ্রীস্টীয় ধর্ম এ কাজ করতে পারে না কিন্তু ডারউইনবাদ তথা বিবর্তন তা করতে সক্ষম। একটু দুঃসাহস সঞ্চয় করতে পারলেই অনায়াসে এ করা যায়। নীট্শের সে দুঃসাহস ছিল তাই তিনিই হলেন সে আওয়াজ বা সে দর্শনের উদ্গাতা।

২. যৌবন-কাল

তাঁর পিতা মন্ত্রী ছিলেন। পিতা-মাতা উভয়ের পূর্বপুরুষদের অনেকেই ছিলেন পাদ্রী—তিনি নিজেও শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছেন প্রচারক। খ্রীস্ট-ধর্মের নৈতিক চেতনা তাঁর মধ্যে প্রচুর ছিল বলেই হয়তো তিনি চালিয়েছেন খ্রীস্ট-ধর্মের উপর আক্রমণ। তাঁর দর্শন হচ্ছে প্রচণ্ড স্ব-বিরোধিতার সাহায্যে সংশোধন আর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠারই এক প্রচেষ্টা—তাঁর দর্শনে ফুটে উঠেছে দয়া, শান্তি আর নম্রতার প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা। জেনোয়ার সৎ নাগরিকরা যে তাঁকে 'সাধু' বলে অভিহিত করতেন তা কি তাঁর প্রতি এক চরম অপমান নয়? ইমানুয়েল কাণ্টের জননীর মতো তাঁর মাও খুব ধার্মিক আর নির্মল-চরিত্রা ছিলেন। কাণ্টের সঙ্গে তুলনায় এ ব্যতিক্রমটুকু তাঁর ছিল। নীট্শে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সৎ আর নির্মল আর প্রস্তরমূর্তির মতই ছিলেন কুমার—হয়তো এ কারণেই তিনি আক্রমণ চালিয়েছেন সততা আর ধর্মীয় পবিত্রতার প্রতি। এ অসংশোধনীয় সাধুটির পাপ করার কি উদগ্র বাসনাই না ছিল!

১৮৪৪-এর ১৫ই অক্টোবরে প্রাশিয়ার রোকেনে (Rocken) তিনি জন্মগ্রহণ করেন—ঐ একই তারিখেই তখনকার প্রাশিয়া-রাজ চতুর্থ ফ্রেড্রিক উইলিয়ামও জন্মেছিলেন। নীট্সের পিতা ছিলেন রাজপরিবারের অনেকেরই গৃহ-শিক্ষক—রাজার জন্ম-দিবসে আকস্মিকভাবে নিজের ছেলের জন্ম হওয়ায় তিনি খুব খুশী হয়ে রাজার নামেই ছেলেরও নামকরণ করলেন। নীট্শে বলতেনঃ "ঐদিনে আমার জন্ম হওয়ায় এ এক মস্ত সুবিধা হয়েছিল যে আমার সারা শৈশব ধরেই আমার জন্মদিনে দেশ-ব্যাপী সাধারণ উৎসব পালিত হতো।"

পিতার অকাল-মৃত্যুর ফলে তিনি হয়ে পড়লেন বাড়ীর সব 'পবিত্র' মেয়েদের শিকার—যারা তাঁকে সাদরে করে তুললো মেয়েদের মতো আবেগপ্রবণ আর অনুভূতিশীল। প্রতিবেশী যে সব বদ্ছেলেরা পাখীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছানা চুরি করতো, অন্যের ফলের বাগান করতো তচ্নচ্, খেলা করতো সিপাই-লস্কর সেজে আর বলতো মিথ্যা, তাদের তিনি দু' চোখে দেখতে পারতেন না। সহপাঠিরা তাঁকে 'ক্ষুদে মন্ত্রী' বলে ঠাট্টা করতো, একবার ত একজন তাঁকে "মন্দিরবাসী এক খৃষ্ট" বলে অভিহিত করে বসেছিল। নির্জনে একাকী থাকাতেই ছিল তাঁর আনন্দ আর আনন্দ পেতেন বাইবেল পড়ে আর এমন আবেগের সঙ্গে অন্যকে পড়ে শোনাতেন যে তাদের চোখে প্রায় জল এসে যেতো। কিন্তু ভিতরে তাঁর মনে এক সুপ্ত স্নায়বিক বৈরাগ্য আর অহঙ্কারবোধ ছিল। তাঁর সহপাঠিরা যখন মিউটিয়াস্ স্কেভোলা (Mutius Scaevola) কাহিনী সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলো, তখন তিনি তাঁর হাতের তালুতে একগুচ্ছ দেশলাইর কাটি নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে ঐগুলি জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ধরেই রাখলেন। এ ঘটনা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক—সারা জীবন ধরেই এমন সব দৈহিক আর মানসিক পথ আর পদ্ধতির সন্ধান করেছেন তিনি যাতে পৌঁছতে পারেন আদর্শ পুরুষ। "আমি যা নই তা-ই হচ্ছে আমার জন্য ঈশ্বর আর পুণ্য।" এ হচ্ছে তাঁর মত।

আঠারো বৎসর বয়সে তিনি হারিয়ে বসেন পিতৃ-পুরুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস আর বাকী জীবন কাটিয়েছেন এক নতুন দেবতার সন্ধানে। তাঁর বিশ্বাস 'অতি মানবে (Superman)' পেয়েছেন তিনি তার সন্ধান। পরে তিনি বলেছিলেন—বেশ সহজেই এ পরিবর্তন তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল নিজেকে সহজে প্রতারিত করা—আত্মজীবনীকার হিসেবে তিনি খুব বিশ্বস্ত নন। সর্বস্বের ঝুঁকি নিয়ে যে একটি মাত্র পাশা ছুঁড়ে হেরে যায় তেমন মানুষের মতই তিনি হয়ে পড়েছিলেন নৈরাশ্যবাদী। ধর্ম ছিল তাঁর মজ্জাগত—এখন মনে হতে লাগলো জীবন অর্থহীন আর ফাঁকা। হঠাৎ তিনি বন (Bonn) আর লিপজিগে (Leipzig) সহ-পাঠিদের সঙ্গে জুটে উন্মত্ত ইন্দ্রিয়-চর্চায় মেতে উঠলেন, এমনকি পুরুষসুলভ মদ্য আর ধূমপানের প্রতি তাঁর যে একটা খুঁতখুঁতে ভাব ছিল সেটাও যেন উঠলেন কাটিয়ে। কিন্তু অনতিবিলম্বে মদ, নারী আর তামাক তাঁর কাছে হয়ে উঠলো বিরক্তিকর, তাঁর মনে প্রবল এক বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হলো তাঁর দেশ আর যুগের সমস্ত 'সামাজিকতার' উপর। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা যারা বিয়ার খায় আর ধূমপান করে তারা স্বচ্ছ উপলব্ধি বা সূক্ষ্ম চিন্তা করতে অক্ষম।

এ সময় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি শোপেনহাওয়ারের 'World As Will and Idea'র সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন, আর তাতে খুঁজে পেলেন: "এ যেন একটি দর্পণ যাতে আমি দেখতে পেলাম এক ভয়ঙ্কর মহিমার সঙ্গে পৃথিবী, জীবন আর আমার নিজের স্বভাব-অঙ্কিত।" বইটি নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে তিনি ক্ষুধিতের মতো গলাধঃকরণ করলেন তার প্রতিটি শব্দ। "মনে হলো শোপেনহাওয়ার যেন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সম্বোধন করেই সব কথা বলেছেন। তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা আমি নিজেই অনুভব করতে লাগলাম আর যেন তাঁকে দেখতে লাগলাম আমার চোখের সামনে। প্রতিটি পংক্তি যেন ত্যাগ, অস্বীকার আর আত্মসমর্পণের জন্য উচ্চস্বরে ডাক দিচ্ছে।" শোপেনহাওয়ার-দর্শনের কালো রং যেন তাঁর চিন্তার উপর স্থায়ী ছায়া ফেলেছিল—শুধু যে তিনি যখন "শিক্ষাবিদ শোপেনহাওয়ারের" (তাঁর একটি প্রবন্ধের নাম) ভক্ত অনুসরণকারী ছিলেন তখন নয় এমন কি যখন নৈরাশ্যবাদকে অবক্ষয়ের লক্ষণ বলে নিন্দা করছেন তখনো তিনি অন্তরে অসুখী মানুষই থেকে গেছেন—মনে হয় তাঁর স্নায়ুতন্ত্র দুঃখভোগের উপযোগী করেই গড়া হয়েছে। ট্র্যাজেডিকে জীবনের আনন্দ বলে যে তিনি উল্লাস প্রকাশ করেছেন তাও এক রকম আত্ম-প্রতারণা। হয়তো গ্যেটে বা স্পিনোজাই শোপেনহাওয়ারকে বাঁচাতে পারতেন কিন্তু 'পরিমিতিবোধ' আর 'নিয়তি'র কথা তিনি খুব করে প্রচার করলেও তিনি নিজের বেলায় তা কখনো প্রয়োগ করেননি। সাধু-সন্তের প্রশান্তি আর সুসমন্বিত মনের স্থৈর্য কখনো তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল না।

তেইশ বছর বয়সে তাঁকে জোর করে সামরিক বিভাগে ভর্তি করে নেওয়া হয়। তিনি হ্রস্ব দৃষ্টি আর বিধবার একমাত্র ছেলে বলে সামরিক কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে তিনি খুশী হতেন কিন্তু সামরিক বিভাগ নাছোড়বান্দা। সেডোয়া (Sadow) আর সেডানের (Sedan) সে গৌরবের দিনে দার্শনিকদেরও হতে হতো কামানের খোরাক। কিন্তু ঘোড়া থেকে পতনের ফলে তাঁর বুকের পেশী এমনি মচকে আর মুচড়ে গেলো যে শেষকালে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সামরিক বিভাগ। এ আঘাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর তিনি আর কখনো পুরোপুরি সুস্থ হননি। তাঁর সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে তাতে ঢোকার সময় যেমন তাঁর মনে সৈন্যদের সম্বন্ধে বহু বিভ্রান্তিকর মায়া-কল্পনা ছিল, ছেড়ে আসার সময়ও তা ছিল অবিকল অব্যাহত—আদেশ দেওয়া আর আদেশ পালন, ধৈর্য আর শৃঙ্খলার এসব স্পার্টান-সুলভ কঠোর জীবন নিজে যাপনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় এসব আদর্শ এখন তাঁর কল্পনায় আরো বেশী আবেদনের সৃষ্টি করলো। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি নিজে সৈনিক হতে পারেননি বলে সৈনিক হয়ে পড়লো এখন তাঁর পূজ্য।

সামরিক জীবন থেকে এবার তিনি তার বিপরীতপ্রান্তে ভাষাতাত্ত্বিকের কেতাবী জীবনে গেলেন ফিরে—যোদ্ধা না হয়ে এবার হলেন পণ্ডিত, পি. এচ্. ডি.। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি নিযুক্ত হলেন বেস্‌লে (Basle) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে বিসমার্কের রক্তাক্ত ভাগ্য দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ অলস দুঃসাহসহীন কাজের ভার নিয়েছেন বলে তাঁর মনে এক অদ্ভুত অনুশোচনাও ছিল—একদিকে ভাবতেন চিকিৎসা ইত্যাদির মতো ব্যবহারিক আর সক্রিয় কোন পেশা গ্রহণ করলেই ভালো হতো আবার অন্যদিকে তখনই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন সংগীতের দিকে। হয়ে পড়লেন পিয়ানো-বাদক। লিখলেন সোনাটা। বলেছেন: "সংগীত ছাড়া জীবন এক অর্থহীন বিভ্রান্তি।"

বেসলের অনতিদূরে, ট্রিবসেনে (Tribschen) অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে সংগীত-যাদুকর রিচার্ড ওয়েগনার (Richard Wagner) বাস করতেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে, ওখানে এসে বড়দিনের ছুটিটা কাটাবার জন্য ওয়েগনার নীট্‌শেকে আমন্ত্রণ জানালেন। নীট্‌শে আগামী দিনের সংগীত সম্বন্ধে খুব উৎসাহী ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আর পাণ্ডিত্যের এমন খ্যাতি নিয়ে যদি কেউ এসে তাঁর আদর্শের প্রতি সমর্থন জানায় তা হলে ওয়েগনারের তাঁর প্রতি অনাগ্রহী হওয়ার কথা নয়। এ মহৎ সংগীত-রচয়িতার প্রভাবেই নীট্‌শে তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা শুরু করেন—উদ্দেশ্য ছিল গ্রীক নাটক দিয়ে শুরু করে 'The Ring of the Nibelungs' দিয়ে শেষ করবেন আর ওয়েগনারকে তুলে ধরবেন আধুনিক ইস্কিলাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Aeschylus) বলে। শান্তিতে বসে লিখবেন বলে চলে গেলেন আল্পস পাহাড়ে জনতার কলকোলাহল থেকে দূরে—সেখানেই ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কাছে খবর গেলো জার্মেনি আর ফ্রান্স হয়েছে যুদ্ধে লিপ্ত। তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। গ্রীসের ভাবাদর্শ, কবিতা, নাটক, দর্শন আর সংগীতের দেবীরা তাঁদের নির্মল কর স্থাপন করেছেন তাঁর উপর। কিন্তু দেশের আহ্বানে সাড়া না দিয়েও পারলেন না—এখানেও কবিত্ব ছিল বই কি। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেনঃ "মূলে যতই লজ্জাকর হোক এ তোমার রাষ্ট্র—অধিকাংশ মানুষের জন্য এ এক দুঃখের অতল কূয়া—এ এক অগ্নিকুণ্ড, সংকটের সময় তারাই বারে বারে পুড়ে মরে। তবুও যখনই তার ডাক আসে আমরা নিজেদের ভুলে যাই—তার রক্তাক্ত সংগ্রাম মুহূর্তের আবেদন অসংখ্য নাগরিককে সাহসে উদ্দীপিত করে উন্নীত করে বীরত্বে।" যুদ্ধ-সীমান্তে যাওয়ার পথে ফ্রাঙ্কফোর্টে একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে শহরের ভিতর দিয়ে অশ্বক্ষুর ধ্বনি তুলে সাড়ম্বরে যেতে তিনি দেখেছিলেন, তিনি বলেছেনঃ সেখানে তখনই তাঁর মনে এমন এক উপলব্ধি আর দিব্যদৃষ্টির উৎপত্তি হলো যা থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর সমগ্র দর্শন। "এ সর্বপ্রথম আমি বুঝতে পারলাম প্রবলতম আর উচচতম জীবন বেচে থাকার তুচ্ছ সংগ্রামে নিহিত নয় বরং তা নিহিত রয়েছে যুদ্ধ কামনায়, ক্ষমতা-বাসনায়, আধিপত্যের ইচ্ছায়।" ক্ষীণ-দৃষ্টি বলে তাঁকে সৈন্যদলে নেওয়া হয়নি—তাই নার্সিং বা সেবা-কাজেই তাঁকে হয়েছিল সন্তুষ্ট থাকতে। যদিও যুদ্ধের যথেষ্ট বিভীষিকা দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব পাশবিকতার সঙ্গে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি—এ কারণেই অনভিজ্ঞতার কাল্পনিক তীব্রতার সব শক্তি দিয়েই তিনি পরে যুদ্ধের এক আদর্শায়িত রূপ বর্ণনা করেছেন। এমনকি সেবা-কাজের জন্য তিনি অতিমাত্রায় লাজুক ও অনুভূতিশীল ছিলেন—রক্ত দেখলেই তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। তাই তাঁকে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিলো চারদিকের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বাড়ীতে। এরপর সব সময় তিনি পরিচয় দিয়েছেন শেলীর স্নায়ুর আর কার্লাইলের উদরের। কিন্তু তাঁর আত্মাটি ছিল যোদ্ধার—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক বালিকার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. নীট্শে আর ওয়েগ্নার

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর প্রথম আর একমাত্র সম্পূর্ণভাবে লেখা বই 'The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music প্রকাশ করেন।

ইতিপূর্বে কোন ভাষাতাত্ত্বিকই নিজেকে এমন গীতিময় ভাষায় প্রকাশ করেননি। গ্রীক কলা-শিল্পের পূজ্য দুই দেবতা সম্বন্ধেই তিনি লিখেছেন—প্রথমে উল্লেখ করেছেন ডায়োনিসস (Dionysus) বা বেক্কাসের (Bacchus) কথা, যিনি মদ, পানোল্লাস, উন্নতিশীল জীবন, কর্মানন্দ উন্মত্ত আবেগ, প্রেরণা, সহজাত-প্রবৃত্তি, দুঃসাহস আর অদম্য দুঃখ-ভোগের দেবতা ছিলেন আর দেবতা ছিলেন গান আর সংগীত, নৃত্য আর নাটকের। পরে বলেছেন তিনি এপোলোর (Apollo) কথা, যিনি ছিলেন শান্তি, অবসর আর বিশ্রামের সৌন্দর্য-প্রেরণা, মননশীল ধ্যানের যুক্তিবাদী শৃঙ্খলা আর দার্শনিক প্রশান্তির দেবতা, আর ছিলেন চিত্রকলা, স্থাপত্য আর মহাকাব্যের প্রতীক। এ দুই আদর্শের মিলন আর সমন্বয়েরই ফল মহত্তম গ্রীক-শিল্প—এ শিল্পে মিলন ঘটেছে ডায়োনিসসের অস্থির পৌরুষ-শক্তির সঙ্গে এপোলোর শান্ত-মধুর রমণীয় সৌন্দর্যের। নাটকে ডায়োনিসস জুগিয়েছে ঐক্যতান আর এপোলো সংলাপ। অর্ধ মানুষ আর অর্ধছাগ-বনদেবতার পোশাকে সজ্জিত ডায়োনিসস ভক্তদের মিছিল থেকেই ঐক-তানের উৎপত্তি, সংলাপ পরবর্তী চিন্তা বা সংযোজনা। এক আবেগী অভিজ্ঞ-তার ঐ হচ্ছে চিন্তাশীল পরিশিষ্ট বা উপাঙ্গ।

গ্রীক নাটকের গভীরতর দিক হচ্ছে শিল্পের সাহায্যে নৈরাশ্যবাদের উপর ডায়োনিসীয় বিজয়। আজকের দিনে আনন্দ-উল্লসিত পরিবেশে যে গ্রীকদের আমরা দেখি তাদের মতো প্রাচীন যুগের গ্রীকরা অতখানি আনন্দ-মুখর আর আশাবাদী ছিলেন না। জীবনের দংশনের সাথে তাঁদের পরিচয় ছিল নিবিড় আর পরিচয় ছিল জীবনের বিয়োগান্ত সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে। মানুষের জন্য কোন ভাগ্যই সর্বোত্তম নয়। যখন মিডাস (Midas) সাইলেনাসের (Silenus) কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন সাইলেনাস উত্তর দিয়েছিলেনঃ "ওহে একদিনের হতভাগ্য জাতি, দুঃখ আর দুর্ঘটনার সন্তান, যা না শোনাই ভালো তা বলার জন্য আমাকে কেন বাধ্য করছ? সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে না জন্মানো, কিছুই না হওয়া কিন্তু তাতো অলভ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় উত্তম হচ্ছে দ্রুত মৃত্যু।” বস্তুত এসব লোকের শোপেনহাওয়ার বা হিন্দুদের কাছ থেকে শেখার কিছুই ছিল না। কিন্তু গ্রীকেরা তাদের শিল্প-সম্পদের দ্বারা আশা-ভঙ্গের যে নৈরাশ্য তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। নিজেদের দুঃখ-নির্যাতনকে তাঁরা করেছিলেন নাটকের দৃশ্য উপকরণ। বুঝতে পারলেন এ হচ্ছে “শুধু সৌন্দর্যের এক দৃশ্যমান চিত্র”, শৈল্পিক ধ্যান বা পুনর্গঠনই এর লক্ষ্য, বুঝতে পারলেন “অস্তিত্ব আর পৃথিবী” নিরর্থক নয়। “যা কিছু ভীতিপ্রদ শৈল্পিক সৌন্দর্যের দ্বারা তাকে পরাভূত করাই হচ্ছে মহৎ ও মহান।” নৈরাশ্য বা দুঃখবাদ হচ্ছে অবক্ষয়ের চিহ্ন আর আশাবাদ হচ্ছে কৃত্রিমতার চিহ্ন: ‘বিয়োগান্তিক আশাবাদ” হচ্ছে সবলের মনোভাব, যিনি তীব্রতা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তির সন্ধান করেন, এমনকি দুঃখের বিনিময়ে হলেও। দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম যে জীবনের অলংঘনীয় বিধি তা জেনে তিনি খুশী হয়ে ওঠেন। “ট্র্যাজেডিই প্রমাণ করে গ্রীকরা নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না।” যে যুগে এ মনোভাব ইস্কিলীয় নাটক আর সক্রেটিস-পূর্ববর্তী দর্শনের জন্ম দিয়েছিল সে ছিল “গ্রীসের এক প্রবল প্রতাপের যুগ।”

“কল্পনা-নির্ভর মানুষের প্রতীক”—সক্রেটিস্ হচ্ছেন গ্রীক-চরিত্রের শৈথিল্যেরই লক্ষণ—“দেহমনের প্রাচীন সে ম্যারাথনীয় যৌবন-শক্তিকে ক্রমশঃ বিসর্জন দেওয়া হলো এক সংশয়িত জানা-লোকের নিকট, যার ফলে ধীরে ধীরে পতন ঘটলো দৈহিক আর মানসিক শক্তির।” সক্রেটিস পূর্ববর্তী দার্শনিক-কাব্যের স্থান দখল করলো সমালোচনামূলক দর্শন, শিল্পকলার স্থান নিলো বিজ্ঞান। সহজাত বৃত্তির জায়গা নিলো মননশীলতা, ক্রীড়ার বদলে আসন পেলো তর্কশাস্ত্র। সক্রেটিসের প্রভাবে পড়ে ক্রীড়াবিদ প্লেটো হয়ে পড়লেন নন্দনতাত্ত্বিক, নাট্যকার প্লেটো কিনা হয়ে পড়লেন তার্কিক, প্রবৃত্তির শত্রু, কবিদের নির্বাসন-দণ্ডদাতা, “খৃষ্টের আগে খ্রীষ্টান’ আর জ্ঞান-সাধক। ডেলফির (Delphi) এপোলো মন্দির-গাত্রে খোদিত হয়েছে এসব আবেগবর্জিত জ্ঞান-বাক্য: “নিজেকে জানো” আর “কোন ব্যাপারে মাত্রা ছাড়িয়ো না”—যা সক্রেটিস আর প্লেটোতে সৃষ্টি করেছে এ বিভ্রান্তি যে জ্ঞানই চরম গুণ আর এরিষ্টোটলে তা রূপ নিয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারী এক সোনালী মাধ্যমে। জাতি যৌবনেই সৃষ্টি করে পুরাকাহিনী আর কাব্য, অবক্ষয়ের যুগে সৃষ্টি করে দর্শন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তর্কশাস্ত্র। যৌবনে গ্রীস জন্ম দিয়েছিল হোমার আর ইস্কিলাসের, অবক্ষয়ের সময় দিয়েছে ইউরিপিডিসকে—নাট্যকার হয়ে গেলেন তর্কশাস্ত্রবিদ, যুক্তিবাদী ধ্বংস করে দিল পুরাকাহিনী আর প্রতীক, পৌরুষ যুগের বিয়োগান্তিক আশাবাদকে বিনষ্ট করে দিল ভাবালুতা। এ সক্রেটিস বন্ধুটিই ডায়োনিসীয় ঐকতানের জায়গায় সমাগম ঘটাল এপোলীয় তার্কিক আর বাগ্মীদের।

ডেলফির দৈব-বাণীতে সক্রেটিসকে যে সবচেয়ে জ্ঞানী গ্রীক এবং তাঁর পরে ইউরিপিডিসকে যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী বলা হয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। আরও কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নয় যে "এরিস্টোফেনিসের (Aristophanes) নির্ভুল সহজাত বৃত্তি সক্রেটিস আর ইউরিপিডিসকে একই ঘৃণাব্যঞ্জক অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত করেছে আর দেখেছে উভয়ের মধ্যে এক অবক্ষয়ী সংস্কৃতিরই লক্ষণ।" অবশ্য এ কথা সত্য যে তাঁরা তাঁদের পূর্ব ভূমিকা প্রত্যাহার করেছিলেন—ইউরিপিডিস তাঁর অন্তিম নাটক 'The Bacchai'তে ডায়োনিসসেই আত্মসমর্পণ করেছেন আর ঐ হচ্ছে তাঁর আত্মহত্যার উপসংহার। সক্রেটিস কারাগারে নিজের বিবেকের শান্তির জন্য ডায়োনিসসের সংগীত অভ্যাসে হয়েছিলেন রত। ফলে নিজেকে নিজে বলতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেনঃ "সম্ভবত যা আমার কাছে অবোধ্য তা অযৌক্তিক নয়? শিল্পকলা হয়তো বিজ্ঞানেরই প্রয়োজনীয় সহযোগী আর পরিপূরক।" কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে—তার্কিক আর যুক্তিবাদীর কর্মফল নস্যাৎ করা আর সম্ভব নয়। ঠেকানো গেলো না গ্রীক নাটক আর গ্রীক চরিত্রের অবক্ষয়। আশ্চর্যের বিষয় যখন কবি আর দার্শনিক তাঁদের ভূমিকা বদল করেছেন তখন তাঁদের পূর্ব ভাবধারার বিজয় হয়েই গেছে। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বীর-যুগের আর ডায়োনিসীয় কলা-শিল্পেরও ঘটেছে সমাপ্তি।

হয়তো ডায়োনিসসের যুগ ফিরেও আসতে পারে। কাণ্ট কি কেতাবী যুক্তি আর কেতাবী (Theoretical) মানুষকে চিরতরে ধ্বংস করে মারেননি? আর শোপেনহাওয়ার কি আবার আমাদের সহজাত-বৃত্তির গভীরতা আর চিন্তার বিয়োগান্ত দিক শেখাননি? আর এক ইস্কিলাস রিচার্ড ওয়েগ্নার প্রতীক আর পুরাকাহিনীকে পুনরুদ্ধার করে একরকম ডায়োনিসীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আবার কি সংগীত আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাটকের সমন্বয় সাধন করেননি ? "জার্মান প্রাণ-শক্তির ডায়োনিসীয় মূল থেকে এমন এক শক্তির—যার নাম জার্মান সংগীত—উদ্ভব হয়েছে, যা বাখ (Bach) থেকে বিঠোফেন আর বিঠোফেন থেকে ওয়েগনার পর্যন্ত এক বিশাল সূর্যাবর্তন। এর সঙ্গে সক্রেটিয় সংস্কৃতির আদিম অবস্থার কিছুমাত্র মিল নেই।" জার্মান ভাবধারা নীরবে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করেছে ইটালী আর ফ্রান্সের এপোলীয় শিল্পকলাকে। জার্মানদের বোঝা উচিত তাদের সহজাতবৃত্তি এসব অবক্ষয়িত সংস্কৃতি থেকে অনেক বেশী সুস্থ ও সবল—ধর্মের মতো সংগীতেও তাদের আর এক সংস্কার (Reformation) নিয়ে আসা উচিত, শিল্প আর জীবনে আবার সঞ্চারিত করা উচিত লুথারের বেপরওয়া প্রাণশক্তি। কে জানে হয়তো জার্মান-জাতির যুদ্ধ-যন্ত্রণা থেকেই জন্ম নেবে আর এক বীর-যুগের আর সংগীতের প্রাণশক্তি থেকেই হয়তো পুনর্জন্ম ঘটবে ট্র্যাজেডির ?

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে নীট্শে বেসলেতে ফিরে এলেন, শরীর তখনো দুর্বল, কিন্তু ভিতরের প্রাণশক্তি উচচাশার আগুনে জলছিল তখনো ধিকিধিকি —নিরানন্দকর বক্তৃতা দিয়ে তার অপচয় সাধনে তাঁর মনে জাগলো অনীহা। "আমার সামনে অন্তত পঞ্চাশ বছরের কাজ রয়েছে। আমাকে কর্মের জোয়াল কাঁধেই সময়-গুণে চলতে হবে।" ইত্যবসরে যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে—তিনি লিখেছেন: "জার্মান-সাম্রাজ্যই জার্মান প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করছে।" ১৮৭১-এর বিজয় জার্মান আত্মায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এক স্থূল অহমিকা—আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে এর চেয়ে বড় অন্তরায় আর হতে পারে না। নীট্শের ভিতরের এক খলস্বভাব প্রত্যেক প্রতিমা বা আদর্শের সামনেই তাঁকে অস্থির করে তুলতো। এ জড় সন্তুষ্টির প্রধান ও সবচেয়ে সম্মানিত হোতা ডেভিড স্ট্রাউসকে (David Strauss) আক্রমণ করেই এ মনোভাবের উপর আক্রমণ চালাতে তিনি সঙ্কল্প করলেন। লিখেছেন: "দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নিয়েই সমাজে আমার প্রবেশ: স্তাঁদালের (Stendhal) কাছে পেয়েছি আমি এ উপদেশ।"

তাঁর 'Thoughts out of Season'-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধ Schopenhauer as Education'-এ অন্ধস্বদেশপ্রেমিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে করেছেন তিনি ভয়ানক আক্রমণ। "রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যত সব নিকৃষ্ট দার্শনিকদের পোষার যে নিয়ম মহৎ দার্শনিকের আবির্ভাবের পথে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেলেন ওয়েগনারের পার্সিপল (Parcipal) বইটি। এর পর তাঁদের মধ্যে আর পত্রালাপও ঘটেনি।

এ সময় ১৮৭৯-তে জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নেই তাঁর শরীর আর মন দুই-ই ভেঙে পড়লো—পেঁছিলেন গিয়ে মৃত্যু-সীমায়। কিছুটা বেপরওয়াভাবে তৈরী হলেন শেষ-যাত্রার জন্য। তাঁর বোনকে বল্লেন: "কথা দাও মৃত্যুর পর আমার বন্ধুদের ছাড়া আর কাকেও আমার লাশের পাশে এসে দাঁড়াতে দেবে না, দেবে না কৌতূহলী জনতাকে ভীড় জমাতে। দেখো কোন পাদ্রী পুরোহিত বা অন্য কেউ এসে যেন আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে, যখন আমি আত্মরক্ষায় অক্ষম, কতকগুলো মিথ্যা-উক্তি উচ্চারণ না করে—আমাকে এক সৎ কাফের হিসেবেই কবরে অবতীর্ণ হতে দিয়ো।" কিন্তু তিনি নিরাময় হয়ে উঠলেন—কাজেই এ বীরোচিত সমাধি মূলতবী রাখতে হলো। এ রকম রোগের ফলেই তাঁর মনে সূর্য আর স্বাস্থ্যের প্রতি, জীবন আর জীবনের হাসি আর নাচ-গানের প্রতি, কারমেনের 'দক্ষিণা সংগীতের' প্রতি ভালোবাসার সঞ্চার হয়েছিল—মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামের ফলে তাঁর সংকল্পও হয়েছিল দৃঢ়, 'হাঁ-বাচক' দৃষ্টিভঙ্গী জেগে ওঠায় তিনি জীবনের তিক্ততা আর যন্ত্রণার মাঝেও খুঁজে পেয়েছিলেন মাধুর্য। হয়তো এর থেকেই স্পিনোজার মতো মানব-ভাগ্যের স্বাভাবিক সীমা-রেখাকে সানন্দে মেনে নেওয়ার একটা সকরুণ চেষ্টা তাঁর মধ্যেও জেগে উঠেছিল। "মহৎ হওয়ার আমার সূত্র হচ্ছে নিয়তি-প্রেম....সব অবস্থায় নিয়তিকে মেনে নেওয়া নয় শুধু, তাকে ভালোবাসাও।" হায়, এ বলা যত সহজ, মানা তত সহজ নয়।

তাঁর পরবর্তী বইগুলির শিরোনাম হচ্ছে—'The Dawn of Day (১৮৮১) আর The Joyful Wisdom (১৮৮২)—এসবে প্রতিফলিত হয়েছে আরোগ্যকালের কৃতজ্ঞতা। পরবর্তী বইগুলির চেয়ে এখানে অধিকতর কোমল আর নম্র সুর উঠেছে ফুটে। এবার একটা বছর বেশ শান্তির সঙ্গে কাটাতে তিনি সক্ষম হলেন—বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত পেনসনে সাদাসিদা ভাবে কেটে যেতে লাগলো তাঁর জীবন। দাম্ভিক দার্শনিকের হৃদয় যেন এবার এক রমণীয় দুর্বলতার আকর্ষণে গলতেও লাগলো—অকস্মাৎ তিনি পড়ে গেলেন প্রেমে। কিন্তু লাউ সালমে (Lou Salome) দিলেন না তাঁর প্রেমের প্রতিদান। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ আর গভীর ছিল যে তা সহজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্ত্বনা পাওয়ার কথা নয়। পল্ রী (Paul Ree) অত নিষ্ঠুর ছিলেন না, নীট্শের দে মাসেটের (De Musset) সঙ্গে তিনি ডক্টর পেগেলোর (Dr. Pagello) অংশই অভিনয় করেছেন। নীটশে হতাশ হয়ে পালালেন—পথে রচনা করলেন নারীর বিরুদ্ধে নানা বচন। আসলে নীট্শে ছিলেন সরল, উৎসাহী, কল্পনা-প্রিয় আর সদয় ছিলেন সারল্যের প্রতি। বিনম্র কোমলতার বিরুদ্ধে তাঁর যে সংগ্রাম তা হচ্ছে যে গুণ তাঁকে এক তিক্ত প্রতারণার শিকারে পরিণত করেছিল আর যে আঘাত তিনি কখনো ভুলতে পারেননি তারই একরকম ভূত-ছাড়ানোরই চেষ্টা।

এখন তিনি যথেষ্ট নির্জনতার সুযোগ পাচ্ছিলেন না : "লোকের সঙ্গে বাস করাই মুশ্‌কিল কারণ মৌন থাকাই কঠিন।" তিনি ইটালী থেকে আপার এঙ্গেডাইনে (Upper Engadine) সিল্স্ মেরিয়ার (Sils-Maria) কাছে আল্‌পসের (Alps) সুউচ্চ ভূমিতে চলে গিয়েছিলেন—নর বা নারী কারো ভালোবাসার আকর্ষণে নয় বরং সেখানে তাঁর প্রার্থনা ছিল যেন মানুষকে অতিক্রম করে যাওয়া হয় তাঁর পক্ষে সম্ভব। সে নির্জন উচ্চতায় তিনি লাভ করেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের প্রেরণা।

বসে আছি ওখানে প্রতীক্ষমান—কিছুরই প্রতীক্ষায় নয়,
উপভোগ করছি ভালোমন্দের অতীত—দেখতে পাচ্ছি
এ আলো, এ ছায়া ; শুধু আছে দিন, হ্রদ, দুপুর
আর অসীম সময়।

বন্ধু, তখন হঠাৎ এক হয়ে গেল দুই,
আমার পাশ দিয়ে যেন চলে গেলো জরোথুস্ত্রো।

এবার "তাঁর হৃদয় সব সীমা ছাড়িয়ে প্লাবিত হয়ে উত্থিত হলো।" জোরোয়াষ্টারে (Zoroaster) খুঁজে পেলেন তিনি এক নতুন শিক্ষক, এক নতুন দেবতা, পেলেন অতিমানবকে (Superman)। সন্ধান পেলেন এক নতুন ধর্মের, যার ঘটে চিরন্তন পুনরাবির্ভাব। এবার তিনি গান করবেন—তাঁর প্রেরণার অত্যুৎসাহে এবার দর্শন উন্নীত হলো কাব্যে। "আমি গান করতে সক্ষম, গান করবই, যদিও শূন্য-গৃহে আমি একা, তবুও নিজেকেই শোনাবো আমার গান।" (কি একাকিত্বেরই না প্রকাশ ঘটেছে এ বাক্যে।) "হে মহানক্ষত্র। যাদের জন্য তোমার আলো তারা যদি তা না পায় তা হলে তোমার আনন্দ কোথায়?....দেখো! অতিমাত্রায়

৩২—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধু সঞ্চয়কারী মৌমাছির মতো আমিও আমার জ্ঞানের বোঝা নিয়ে ক্লান্তবোধ করছি—তা গ্রহণের জন্য প্রসারিত হাত চাই।" তাই ১৮৮৩-তে তিনি লিখলেন 'Thus Spoke Zorathustra' (জরোথুস্ত্রো যা বলেন) আর তা শেষ করলেন "যে পবিত্র মুহূর্তে রিচার্ড ওয়েগনার ভেনিসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন তখনই।" ওয়েগনারের পার্সিপলের এ এক মহৎ উত্তর, কিন্তু পার্সিপল-স্রষ্টা তখন পরলোকে।

এটিই তাঁর সর্বোত্তম রচনা—এ সম্পর্কে তিনি নিজেও ছিলেন সচেতন। পরে এই বই সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "এর স্থান একক আর বিশিষ্ট"। "সব কবিদের সম্বন্ধে একভাবে কথা বলা উচিত নয়, সম্ভবত শক্তির এতো বেশী প্রাচুর্য দিয়ে আর কিছুই রচিত হয়নি। .... প্রতিটি মহৎ অন্তরের সব শক্তি আর শুভ-সাধনা একত্রে পুঞ্জীভূত করেও জরোথুস্ত্রোর মতো একটি আলোচনাও সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না"। কিছুটা অতিরঞ্জন। তবে এটি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ বই তাতে সন্দেহ নেই। তবুও এটাকে ছেপে বের করতে নীট্শকে অনেক দুঃখভোগ করতে হয়েছে। প্রথম খণ্ড প্রকাশে এ কারণে দেরি হলো যে প্রকাশকের প্রেস পাঁচ লক্ষ 'স্তোত্র বই' ছাপতেই রইল দীর্ঘদিন ব্যস্ত, তার পর ছাপা চল্লো য়ুহুদী-বিরোধী পুস্তিকা স্রোত। অর্থাগমের দিক থেকে অত্যন্ত বাজে এ অজুহাতে প্রকাশক শেষ খণ্ড ছাপতেই অস্বীকার করলেন। ফলে লেখককে তা নিজের খরচেই ছাপতে হয়েছিল। বিক্রী হয়েছিল মাত্র চল্লিশ কপি—সাত কপি দেওয়া হয়েছিল উপহার। একজনই মাত্র প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন, বইটির তারিফ করেননি কেউই। কেউ বোধকরি কোনদিন তাঁর মতো এমন নিঃসঙ্গ ছিলেন না।

পারস্যের আসল জোরয়াষ্টারের মত জনতার কাছে প্রচার চালাবার জন্য জরোথুস্ত্রোও ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর ধ্যান-পর্বত থেকে নেমে আসেন কিন্তু জনতা তাঁকে ছেড়ে ছুটে গেলো এক যাদুকরের রজ্জুর উপর দিয়ে হাঁটা দেখতে। কিন্তু যাদুকর হাঁটতে গিয়ে রজ্জুর উপর থেকে পড়ে গেলো আর ঘটলো তার মৃত্যু। জরোথুস্ত্রো ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেলো —"কারণ তুমি এক বিপজ্জনক পেশা গ্রহণ করেছ, তাই তোমাকে আমি নিজের হাতে কবর দেবো।" তিনি প্রচার করতে লাগলেন: "বিপজ্জনক ভাবে জীবনযাপন করো।" শহর প্রতিষ্ঠা করো বিষুভিয়াসের ধারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজানা সমুদ্র লক্ষ্য করে ভাসাও তোমাদের জাহাজ। বাস করো যুদ্ধাবস্থায়।"

আর স্মরণ রেখো অবিশ্বাস করতে। পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় জরোথুস্ত্রোর দেখা হয় এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে—সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন ঈশ্বর সম্পর্কে। সন্ন্যাসী চলে যাওয়ার পর তিনি একা একা নিজের মনের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন: "একি সত্যিই সম্ভব? ঈশ্বরের যে মৃত্যু হয়েছে এ বুড়ো সাধু জঙ্গলে বসে তার কিছুই কি কখনো শোনেননি?"

অবশ্যই ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে, সব ঈশ্বরেরই মৃত্যু হয়েছে।

অনেক আগেই বুড়ো ঈশ্বরদের মৃত্যু হয়েছে। বস্তুত ঐ ছিল ঈশ্বরের পক্ষে শুভ ও আনন্দের মৃত্যু। জীবন-মৃত্যুর অনিশ্চয়তায় বিলম্বিত মৃত্যু তাদের ঘটেনি—যদিও তেমন মিথ্যা রটনা করা হয়েছে। বরং এক সময় তারা হাসতে হাসতেই মৃত্যুবরণ করেছে।

তা ঘটেছে যখন একজন ঈশ্বর স্বয়ংই এমন অ-ঐশ্বরিক কথা বলেছিলেন: "শুধু একটি মাত্র ঈশ্বরই আছে! আমার সামনে তোমাদের আর কোন ঈশ্বরই থাকবে না।"

এভাবে এক ঈর্ষান্বিত কদাকার শ্মশ্রুমণ্ডিত ঈশ্বর নিজেকেই ভুলে বসলেন।

তখন সব ঈশ্বরেরা হাসতে হাসতে, নিজেদের চেয়ারে দুলতে দুলতে বলে উঠলেন: "ঈশ্বর নেই কিন্তু দেবত্বই কি ঈশ্বরেরা থাকার মতো নয়?"

"যাদের কান আছে তারা শোনো।

এ বলেছেন জরোথুস্ত্রো।"

কি উল্লসিত নাস্তিকতা! "কোন দেবতা নেই তা-ই কি দেবত্ব থাকার মতো নয়?" "ঈশ্বরেরা থাকলে কি সৃষ্টি করা সম্ভব হতো?.... যদি ঈশ্বরেরা থাকতেন, ঈশ্বর নেই একথা আমি কি করে বলতে পারতাম। কাজে কাজেই কোন ঈশ্বরই নেই।" "তাঁর শিক্ষা উপভোগের জন্য আমার চেয়ে অধিকতর দেব-অবিশ্বাসী আর কে আছে?" "ভ্রাতৃগণ, আমার আকুল আবেদন, পৃথিবীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন, অপার্থিব আশার কথা যারা শোনায় তাদের কথা মোটেও বিশ্বাস করো না। জেনে বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না জেনে তারা হচ্ছে বিষপ্রদানকারী।" অনেক সাবেক বিদ্রোহী জীবনের প্রয়োজনীয় বেদনাহরণকারী বলে এ মিষ্ট বিষে ফিরে আসেন শেষ কালে। "উচচমানের মানুষেরা" জরোথুস্ত্রোর গুহায় এসে সমবেত হন তাঁর বাণী প্রচারের জন্য নিজেদের তৈরী করার মতলবে—তিনি কিছুক্ষণের জন্য তাদেরে ছেড়ে যান, পরে ফিরে এসে দেখেন তারা এমন একটা গাধাকে ধূপধুনা দিয়ে পূজা করছে যে গাধা "নিজের মতো করেই পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ যতখানি আহাম্মক করে সৃষ্টি করা সম্ভব ততখানি আহাম্মক করে।" এ কিছুমাত্র শিক্ষাপ্রদ নয়। তবুও মূল বইতে লেখা আছে :

"যে-ই ভালো কি মন্দের স্রষ্টা হতে চায়, তাকে সর্বাগ্রে ধ্বংসশীল হতে হবে, ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে সব মূল্যবোধকে।

এভাবে সর্বোচ্চ পাপ হচ্ছে সর্বোচচ মঙ্গলেরই অংশ। কিন্তু তা হচ্ছে সৃষ্টিশীল মঙ্গল। হে জ্ঞানীগণ, যত মন্দই হোক চলুন আমরা সব খুলে বলি। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে চুপ করে থাকা—অকথিত সব সত্যই বিষাক্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের সত্যের আঘাতে যা ভাঙবার তা ভেঙে যাক। এখনো বহু গৃহ নির্মাণ করতে হবে। জরোথুস্ত্রো এই বলেন।"

এ কি অশ্রদ্ধা? কিন্তু জরোথুস্ত্রোর আপত্তি : "কি করে শ্রদ্ধা করতে হয় তা আর কেউ-ই জানে না"। তিনি নিজেকে মনে করেন : "যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তার মধ্যে আমিই সবচেয়ে ধার্মিক।" তিনি মনে বিশ্বাস পেতে উন্মুখ কিন্তু তাঁর সকরুণ অনুতাপ হচ্ছে : "আমার মতো অন্য সবাই, যাদের জন্য পুরোনো ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রতি এক মহাঘৃণায় জর্জরিত—পুরোনো ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে বটে কিন্তু এখনো সূতিকা-গৃহে নতুন কোন ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে না।" এবার তিনি ঘোষণা করছেন নতুন ঈশ্বরের নাম :

"সব ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে, এখন আমরা চাই অতি মানব বেঁচে থাক....

আমি শিক্ষা দিচ্ছি অতি মানবের কথা। মানুষ এমন কিছু যে তাকে অতিক্রম করে যেতেই হবে। তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য তুমি কি করেছ?

মানুষ উদ্দেশ্য বা গন্তব্য নয়, মানুষ এক সেতু তাতেই তার মহত্ত্ব :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের মধ্যে যা ক্ষণস্থায়ী আর যা ধ্বংস তাকেই শুধু ভালোবাসা যায়।

ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্যভাবে বাঁচতে যারা জানে না আমি তাদেরই ভালোবাসি—কারণ তারাই অসীমের যাত্রী।

আমি ভালোবাসি বড় বড় অবজ্ঞাকারীদের, কারণ তারাই বড় পূজারী, অন্য তীরে পৌঁছার প্রবল আকাঙ্ক্ষার তারাই হচ্ছে বাণ।

ধ্বংসের জন্য আর আত্মোৎসর্গের জন্য যারা নক্ষত্রলোকের বাইরে কারণ সন্ধান করে না আমি তাদের ভালোবাসি—কারণ পৃথিবী যাতে একদিন অতি-মানবের বাসোপযোগী হয় সে জন্য এরাই পৃথিবীর কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়....।

মানুষের গন্তব্য নির্দেশের সময় এসেছে। মানুষের জন্য সর্বোচ্চ আশার বীজ বপনের সময় হয়েছে........।

ভ্রাতৃগণ বলুন, মানবতায় যদি উদ্দেশ্যের অভাব দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে না কি মানবতার নিজের মধ্যেই রয়েছে অভাব?

'প্রতিবেশীকে ভালোবাসার চেয়ে দূরতম মানুষকে ভালোবাসা অনেক বেশী উচ্চ স্তরের।' মনে হয় নীট্শে যেন বুঝতে পেরেছিলেন হয়তো প্রত্যেক পাঠকই নিজেকে অতি-মানব মনে করে বসবে তাই এ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যই তিনি স্বীকার করেছেন অতি-মানব এখনো জন্মাননি। বলেছেন—আমরা শুধু তাঁর অগ্রপথিক আর ক্ষেত্র বা ক্ষেত্র-প্রস্তুতকারক হতে পারি। "নিজের ক্ষমতার বাইরে কিছু পেতে চেয়ো না।....হয়ো না নিজের ক্ষমতার বেশী পুণ্যবান, সম্ভাব্যতার বাইরে নিজের কাছেও করো না কোন দাবী।" সুখ আমাদের জন্য নয় সুখ জানা আছে স্রেফ অতি-মানবদের—আমাদের চরম উদ্দেশ্য: কাজ। "বহুদিন থেকে আমি আমার সুখের জন্য চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি, আমি এখন শুধু আমার কাজের চেষ্টাই করে থাকি।"

তাঁর নিজের আদলে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেও নীট্শে যেন খুশী হতে পারেন নি—হতে চান অমর। অতি-মানবের পরে দেখা দিলো চিরন্তন পুনরাবর্তন। সব কিছুরই পুনরাবর্তন ঘটবে পুরোপুরি অবয়বে আর ঘটবে অসংখ্যবার, এমনকি নীট্শেও ফিরে আসবেন, ফিরে আসবে এ জার্মেনি তার রক্তপাত, অস্ত্রশস্ত্র, ভষ্মা আর জীর্ণ বসন নিয়ে। অজ্ঞতা থেকে জরোথুস্ত্রো পর্যন্ত মানব-মনের দীর্ঘ পথ ভ্রমণ ও আসবে ফিরে। এ এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীষণ মতবাদ, শেষ আর এক দুঃসাহসী 'হাঁ-বাচক' জীবন স্বীকৃতি ঃ তা হলে ও কেন তা হবে না ? বাস্তবের সংযোগ সাধন ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত আর কাল নিরবধি। একদিন হয়ত অনিবার্যভাবে জীবন আর বস্তু তাদের আদিরূপেই দেখা দেবে আর সে মারাত্মক পুনরাবৃত্তির ফলে হয়তো সমস্ত ইতিহাসটাই তার ফেলে আসা ভ্রান্ত পথের পাক-খোলা শুরু করবে আবার। কর্মবাদ এ অবস্থায় এনে পৌঁছিয়েছে আমাদের। এ শেষ পাঠ দানে জরোথুস্ত্রো যে ভীত হয়েছিলেন তা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নয়। ভয় পেয়েছিলেন, ভয়ে কেঁপেছিলেন তিনি, স্তব্ধ হয়েছিলেন। তখনই শুনতে পেলেন এ আওয়াজ ঃ "জরোথুস্ত্রো তোমার কি হয়েছে ? তোমার কথা বলে যাও তারপর টুকরো টুকরো হয়ে যাও ভেঙে।"

৫. বীর-নৈতিকতা

জরোথুস্ত্রো নীট্‌শের কাছে হয়ে দাঁড়ালো প্রত্যাদেশ বা দৈব-বাণী —তাঁর পরবর্তী রচনাবলী স্রেফ তারই ভাষ্য। য়ুরোপ তাঁর কবিতার গুণগ্রাহী না হলেও তাঁর গদ্য অন্তত বুঝতে পারতো। নবীসংগীতের পর দার্শনিকের লজিক বা যুক্তি—কি এসে যায় তাতে যদিও দার্শনিক নিজেই লজিকে অবিশ্বাসী ?—এ হচ্ছে স্বচ্ছতারই এক হাতিয়ার যদিও একে বলা যায় না চরম প্রমাণ বলে।

তিনি এবার আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন—নীটশের বন্ধুদের কাছেও জরোথুস্ত্রো মনে হতে লাগলো কিছুটা অদ্ভুত। ওভারবেক (Overbeck) আর বার্কহার্ডের (Burckhard) মতো পণ্ডিতেরা যাঁরা বেস্‌লে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন আর যাঁদের কাছে তাঁর 'The Birth of Tragedy' ছিল খুব প্রিয়, তাঁরাও এক প্রতিভাবান ভাষাতাত্ত্বিকের অবলুপ্তিতে দুঃখ করতে লাগলেন এবং কিছুমাত্র খুশী হলেন না আর এক কবির আবির্ভাবে। তাঁর ভগ্নিও (বোন অতি চমৎকারভাবে স্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন, যে বোন নীট্‌শের এ মতের সত্যতা প্রায় প্রমাণ করেছিলেন) হঠাৎ তাঁকে ছেড়ে এমন এক য়ুহুদী বিরোধীকে বিয়ে করে বসলো যাকে নীট্‌শে দু'চোখে দেখতে পারতেন না, আর চলে গেলেন প্রাগোয়ে (Paraguay) এক সাম্যবাদী উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য। তিনি তাঁর দুর্বল, পাণ্ডুর ভ্রাতাকে অন্তত তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য এখানে এসে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসবাস করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু নীট্‌শে দৈহিক স্বাস্থ্য থেকে মনের জীবনকে অধিকতর মূল্যবান মনে করতেন। কাজেই সংগ্রাম ক্ষেত্র ছেড়ে যেতে তিনি রাজি হলেন না—"এক সাংস্কৃতিক মিউজিয়াম" হিসেবে য়ুরোপ তাঁর কাছে অত্যাবশ্যক। চলতে লাগলেন স্থান-কালের কোন নিয়ম না মেনেই—চেষ্টা করলেন বাস করতে সুইজারল্যাণ্ডে, ভেনিসে, জেনোয়ায়, আর তুরিনে। সেণ্ট্ মার্কের (St. Mark) সিংহমূর্তির চারপাশে পায়রা আর পাখীর ঝাঁকের মধ্যে বসে তিনি লিখতে পছন্দ করতেন—তিনি বলেছেন, "এ পিয়াজ্জা সেন মার্কো (Piazza San Marco) হচ্ছে আমার সর্বাপেক্ষা চমৎকার কর্ম-গৃহ"। কিন্তু হ্যামলেটের উপদেশ মতো তাঁর রুগ্ন চক্ষুর খাতিরে তাঁকে সূর্যালোক থেকে দূরে থাকতে হতো—তাই আবদ্ধ হয়ে থাকতেন অনুত্তাপ অন্ধকার চিলেকোঠায় এবং কাজ করতেন সব দরজা জানালা বন্ধ করে। দৃষ্টি-ক্ষীণতার জন্য এরপর তিনি আর কোন বই লেখেননি, শুধু রচনা করেছেন বচন।

এসব বিচ্ছিন্ন রচনার কিছু কিছু সংকলন করে 'Beyond Good and Evil (১৮৮৬ আর) 'The Geneology of Morals' (১৮৮৭) নামে তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর আশা এ বই পুরোনো নৈতিকতাবোধ ধ্বংস করে অতিমানবের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করবে। ক্ষণিকের জন্য তিনি আবার হয়ে পড়লেন ভাষাতাত্ত্বিক—তাঁর নব-নীতি চালাতে চাইলেন এমন সব শব্দ প্রকরণের সাহায্যে যা ত্রুটি-মুক্ত ছিল না। তিনি বলতেন জার্মেন ভাষায় 'মন্দে'র (Bad) দু'টি প্রতিশব্দ আছে—একটি 'Schlecht' অন্যটি 'Böse'। প্রথমটি উচচশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর উপর প্রয়োগ করতো আর তার অর্থ হচ্ছে 'মামুলী', 'সাধারণ'—দ্বিতীয়টির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ইতর', 'অকর্মণ্য' আর 'মন্দ'। শেষোক্তটি অর্থাৎ 'Böse' নিম্নশ্রেণীই প্রয়োগ করতো উচচ শ্রেণীর প্রতি আর তা বুঝাতো 'অপরিচিত', 'অনিয়মিত', 'বেহিসেবী', 'বিপজ্জনক', 'ক্ষতিকর' আর 'নিষ্ঠুর'। নেপোলিয়ন বস (Bose) ছিলেন। অনেক সরললোক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্নকারী শক্তি বলে ভয় করতো। একটি চীনা প্রবাদ হচ্ছে "মহৎলোক জনসাধারণের জন্য এক দুর্ভাগ্য।" তেমনি 'Schlecht' আর Bose-এর বিপরীত শব্দ হিসেবে gut-এরও দু'টি অর্থ আছে—অভিজাতেরা এ শব্দ ব্যবহার করতো 'শক্তিমান',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাহসী' 'ক্ষমতাশালী' 'জঙ্গী', 'দেব-সম' অর্থে আর সাধারণেরা এ শব্দের দ্বারা বুঝতো 'পরিচিত', 'শান্তিপ্রিয়', 'নিরীহ' আর 'দয়ালু'।

এখানে দেখা যায় মানব ব্যবহারের দুই পরস্পর-বিরোধী মূল্যায়ন—দু'রকম নৈতিকমান আর দৃষ্টিকোণ: প্রভুশ্রেণীর নৈতিকতা আর জনতার নৈতিকতা। প্রথমটি প্রাচীন বা ধ্রুপদী, বিশেষ করে রোমানদের কাছে ছিল স্বীকৃত মানদণ্ড, এমনকি সাধারণ রোমানদের মধ্যেও গুণমানে 'পৌরুষ, সাহস, উদ্যোগ, দুঃসাহস চলতি ছিল। কিন্তু এশিয়া থেকে বিশেষ করে য়ুহুদীদের রাজনৈতিক অধীনতার সময় থেকে দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় মানদণ্ড। অধীনতা জন্ম দেয় নম্রতার, অসহায়তা দেয় পরোপকার বৃত্তির—যার অর্থ সাহায্যের আবেদন। জনতার এ নৈতিকতার ফলে বিপদ আর ক্ষমতা প্রেম নিরাপত্তা আর শান্তির প্রতি ভালোবাসাকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়—তখন শক্তির জায়গা দখল করে ধূর্ততা, গোপন প্রতিহিংসা দখল করে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান, কঠোরতার বদলে দেখা দেয় করুণা, উদ্যোগ হয়ে দাঁড়ায় অনুকরণ, বিবেকের চাবুক অধিকার করে বসে সম্মান-জাত গর্বের। সম্মান হচ্ছে পৌত্তলিক, রোমান, সামন্ত-তান্ত্রিক, আভিজাতিক আর বিবেক হচ্ছে য়ুহুদীয়, খ্রীস্টীয়, বুর্জোয়া, গণ-তান্ত্রিক। এমস্ (Amas) থেকে যিশু পর্যন্ত নবীদের প্রচারণার ফলেই দাস শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী আজ প্রায় বিশ্ব নৈতিকতার স্থান গ্রহণ করেছে—'পৃথিবী' আর 'মাংস' পাপের প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে আর দারিদ্র্য হয়ে পড়েছে পুণ্যের এক প্রমাণ।

যিশু এ মূল্যায়নকে নিয়ে গেছেন চরমে—তাঁর মতে সব মানুষই সমান মূল্যবান আর সকলের রয়েছে সমান অধিকার। তাঁর মতামত থেকেই জন্ম নিয়েছে গণতন্ত্র, উপযোগবাদ আর সমাজতন্ত্রের—উন্নতির ব্যাখ্যা হচ্ছে এখন এ অন্ত্যজ দর্শনের মানদণ্ডে, ক্রমিক ঐকিকরণ, অন্ত্যজীকরণ, অবক্ষয় আর অধঃগামী জীবনের মাপকাঠিতে। এ অবক্ষয়ের চরম স্তর হচ্ছে করুণা, আত্মত্যাগ, পাপী-অপরাধীর প্রতি এক ভাবালু সান্ত্বনা দানের প্রশংসা—এ হচ্ছে "সমাজের মলত্যাগের অক্ষমতা।" সক্রিয় সহানু-ভূতিকেই বিধি-সম্মত মানা যায় কিন্তু করুণা হচ্ছে এক পক্ষাঘাতী মানসিক বিলাস। যার কিছু হওয়ার নয় তেমন অযোগ্য, ত্রুটিপূর্ণ, ভীষণ, নিষ্ক্রীয়-ভাবে রুগ্ন আর অশোধনীয় অপরাধীর জন্য স্রেফ নিজের অনুভূতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপচয় করা। করুণার সঙ্গে মিশে আছে কিছুটা অমার্জিত অনধিকার-চর্চা—'রুগ্নকে দেখতে যাওয়ায়' নিজের প্রতিবেশীর অসহায়তার কল্পনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব চেতনা মনে আসেই।"

এসব "নৈতিকতার" পেছনে ক্ষমতার এক গোপন ইচ্ছা আছেই। ভালোবাসা মানে পাওয়ার কামনা। কোর্টশিপ্ বা প্রাক্-বৈবাহিক অনুরোধ উপরোধ মানে দ্বন্দ্ব আর বিবাহ বা সঙ্গম মানে মালিকানা। কার্মেন (Carmen) যাতে অন্যের 'সম্পত্তি' না হতে পারে এ জন্যে ডনজোস্ (Donjose) তাকে হত্যা করেছিল। "লোকেরা ভাবে প্রেমের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত নিঃস্বার্থপর কারণ অনেক সময় নিজের অসুবিধা করেও তারা অন্যের সুবিধা সন্ধান করছে। কিন্তু এ করা মানে তারা অন্যকে নিজের দখলে পেতে চায়....'সব অনুভূতির মধ্যে প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে অহংবাদী, ফলে বাধা পেলে তা হয়ে ওঠে সবচেয়ে কম উদার ঃ (বেঞ্জামিন কন্স্টেণ্ট)" এমনকি সত্যের প্রতি যে ভালোবাসা তাতেও থাকে অধিকার ইচ্ছা, হয়তো তার প্রথম দখলকার হওয়ার জন্য, হয়তো তার কৌমার্যকে পাওয়ার জন্যই। বিনয় হচ্ছে ক্ষমতা-বাসনার উপর একটুখানি আত্মরক্ষামূলক রং লাগানো। এ ক্ষমতা স্পৃহার সামনে যুক্তি আর নৈতিকতা নেহাৎ অসহায়, বরং এগুলি হয়ে পড়ে তার হাতের হাতিয়ার, তার খেলার উপকরণ "দার্শনিক পদ্ধতিগুলি হচ্ছে উজ্জ্বল মরীচিকা মাত্র"—দীর্ঘকাল ধরে যে সত্যের সন্ধান চলছে আমরা এখানে তা দেখি না দেখি তা আমাদের মনের বাসনা-কামনারই প্রতিবিম্ব। "দার্শনিকরা সবাই এমন এক ভাব ধারণ করেন যেন তাঁদের সত্যিকার মতামত, তাঁদের স্ব-উদ্ভাবিত এক শীতল, নিখুঁত, ঐশ্বরিক উদাসীন যুক্তি শাস্ত্র দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছে......আসলে এ এক পক্ষপাতী প্রস্তাবনা। ভাব বা 'নির্দেশ', যা সাধারণত তাঁদের মনের কামনারই এক বিমূর্ত আর মার্জিত-রূপ একে তাঁরা সমর্থন করতে চান ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে খুঁজে বার করা যুক্তি দিয়ে।"

এসব গুপ্ত কামনা, ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার এ যে স্পন্দন, তা-ই নির্ধারণ করে আমাদের চিন্তা। আমাদের মননশীল ক্রিয়া-কর্মের বৃহত্তর অংশ চলে অচেতনভাবে, যা থেকে যায় আমাদের অনুভূতির বাইরে......সচেতন চিন্তা ......হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল। কারণ ক্ষমতা-বাসনার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজাত বৃত্তি যা চেতনার দ্বারা কিছুমাত্র বিঘ্নিত নয়—"এযাবৎ যত বুদ্ধিরই আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে সহজাত বৃত্তি হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান।" বস্তুত নেহাৎ অকারণে চেতনাকে অতি বেশী মূল্য দেওয়া হয়েছে—"চেতনাকে সহযোগী বা দ্বিতীয় পর্যায়ের ধরা যেতে পারে—প্রায় অনাবশ্যক আর ফালতু, হয়তো বিলুপ্তিই তার বিধিলিপি আর পরিপূর্ণ স্বতঃক্রিয়ায় তার প্রয়োজন হবে নিঃশেষিত।"

শক্তিমান কখনো যুক্তির আড়ালে নিজের বাসনাকে লুকিয়ে রাখে না—তাদের একমাত্র অকপট যুক্তি "আমার ইচ্ছা।" মনিবী আত্মার অবিকৃত তেজের কাছে বাসনাই বাসনার সাফাই—ঐ রকম আত্মায় করুণা বা অনুতাপের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু আধুনিককালে যেখানে য়ুহুদী খ্রীস্টান-গণতন্ত্রী মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে শক্তিমান নিজের শক্তি আর স্বাস্থ্য নিয়ে যেন লজ্জিত আর খোঁজে যুক্তি। আভিজাতিক গুণাবলী আর মূল্যায়নের ঘটছে মৃত্যু। "য়ুরোপ আজ এক নব বৌদ্ধ ধর্মের আক্রমণে বিপন্ন"—এমনকি শোপেনহাওয়ার আর ভ্যেগনারও যেন সকরুণ বৌদ্ধ। "যে মূল্যবোধ ইতর জনতারই উপযুক্ত আজ য়ুরোপের সব রকম নৈতিকতার ভিত্তি হয়েছে তাই।" শক্তিমানকে আর দেওয়া হয় না শক্তি প্রয়োগের সুযোগ—তাদেরেও এখন হতে হয় যতদূর সম্ভব দুর্বল। "যা করার প্রয়োজনীয় শক্তি আমাদের নেই তা না করাই হচ্ছে এখন ভালোমানুষী"। "কানিস্‌বার্গের মহাচীনাম্যন" কাণ্ট কি প্রমাণ করেন নি যে মানুষকে কখনো উপায় হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না? ফলে সবলের যে সহজাত বৃত্তি শিকার করা, যুদ্ধ করা, জয় করা, শাসন করা ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগের অভাবে তা ভিতরমুখী হয়ে আত্ম-ছেদন করতে শুরু করে। এর থেকে জন্ম নেয় বৈরাগ্য আর "বদ বিবেক"। নির্গমনের পথ না পেলে সব সহজাতবৃত্তিই অন্তরমুখী হয়ে পড়ে, এটিই আমি বুঝাতে চেয়েছি মানুষের 'আন্তর্জাতিকতা' বৃদ্ধি কথার দ্বারা। এখানেই যাকে আমরা 'আত্মা' বলছি তার প্রথম রূপ দেখতে পাচ্ছি।

অবক্ষয়ের সূত্র হলো এই যে জনতার উপযোগী গুণাবলী নেতাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয় এবং ভেঙে তাঁদেরও সাধারণ মাটিতে পরিণত করে। "নৈতিক পদ্ধতিকে সর্বাগ্রে শ্রেণী পরম্পরার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করতে হবে, তাদের গৃহীত অনুমানকে পৌঁছে দিতে হবে তাদের বিবেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—যতদিন না তারা পুরোপুরি একথা বুঝাতে পারে যে 'একজনের জন্য যা ভালো অন্যের জন্যও তা সঙ্গত' এমন কথা বলা অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত।" ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা যোগ্যতার প্রয়োজন—সমাজে দুর্বলের 'ভালো' গুণের যেমন প্রয়োজন তেমনি সবলের 'মন্দ' গুণ বা যোগ্যতারও রয়েছে প্রয়োজন। দয়া আর শান্তি যেমন মূল্যবান তেমনি কঠোরতা, হানাহানি, বিপদ, যুদ্ধও মূল্যবান—বিপদ, হানাহানি আর নিষ্ঠুরতার প্রয়োজনের দিনেই যত সব মহৎ মানুষের আবির্ভাব ঘটে। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম বস্তু হচ্ছে সংকল্পের দৃঢ়তা, ক্ষমতা আর অবিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি বা বাসনা—এ প্রবৃত্তি বা বাসনা ছাড়া মানুষ স্রেফ নির্ভেজাল দুধ—কর্মের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সংগ্রাম, নির্বাচন আর ঊর্ধ্বতনের পথে লোভ, ঈর্ষা এমনকি ঘৃণাও অত্যাবশ্যক। বংশগতিতে বৈচিত্র্যের মতোই ভালোর সঙ্গে মন্দের সম্পর্ক—প্রথা বা রেওয়াজের বেলায় যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর নতুনত্বের আমদানি প্রায় খুনী আসামীর মতই যদি 'শৃঙ্খলা' আর পুরোনো প্রথাকে ভেঙে ফেলা না হয় তা হলে কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়। মন্দ বা পাপের যদি কোন উপযোগিতা না থাকতো তা হলে তা কবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। অত্র বেশী ভালো হওয়া ভালো নয়—"মানুষের আরো ভালো আর আরো পাপী হওয়া উচিত।"

পৃথিবীতে অতিমাত্রায় পাপ আর নিষ্ঠুরতা দেখে নীট্‌শে যেন মনে মনে সান্ত্বনা বোধ করেছিলেন—তিনি মনে করেন "প্রাচীনকালের মানুষ নিষ্ঠুরতায় অসীম সুখ আর আনন্দ পেতেন একথা ভেবে ভেবে তিনি নিজেও এক বিকৃত আর নিষ্ঠুর আনন্দ যেন ভোগ করতেন। তাঁর বিশ্বাস বিয়োগান্ত নাটক আর গম্ভীর বিষয়ে আমরা যে আনন্দ পেয়ে থাকি তা হচ্ছে নিষ্ঠুরতারই প্রতীক আর মার্জিত সংস্করণ। জরোথুস্ত্রোর মতে: "মানুষ হচ্ছে নিষ্ঠুরতম প্রাণী।" "বিয়োগান্ত নাটক, ষাঁড়ের লড়াই আর ক্রস-বিদ্ধ করা দেখেও মানুষ যেমন এতকাল খুশী হয়েছে পৃথিবীতে অন্য কিছুতেই মানুষ এত খুশী হয়নি। যখন মানুষ নরক আবিষ্কার করলো ......দেখো, পৃথিবীতে নরকই হচ্ছে তার স্বর্গ",—পরলোকে তার নির্যাতনকারীদের অনন্ত শাস্তি কল্পনা করে সে এখন নিজেও দুঃখ-নির্যাতন সয়ে যেতে পারে।

চরম নীতি-ধর্ম হচ্ছে জৈবিক—জীবনে কি কতখানি মূল্যবান সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবেই সবকিছুর বিচার করতে হবে, আমাদের এখন প্রয়োজন সব মূল্যবোধের শারীরবৃত্তীয় পূর্ণমূল্যায়ন। ব্যক্তি, শ্রেণী অথবা প্রজাতির সত্যিকার পরীক্ষা নির্ভর করে তার শক্তি, যোগ্যতা আর ক্ষমতায়। সব রকম উচ্চতর মূল্যবোধের ধ্বংসের পরও শারীরিক ব্যাপারে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে আমরা অন্তত আংশিক ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে আপোষ করে নিতে পারি। আত্মা এক জীবদেহেরই প্রক্রিয়া। মাথায় এক ফোঁটা রক্ত বেশী বা কম হলে মানুষ যে যন্ত্রণা ভোগ করে তেমন যন্ত্রণা প্রমিথিউস্ শকুনীর হাতেও ভোগ করে নি। নানা খাদ্য মাথায় নানা রকম প্রভাবের সৃষ্টি করে থাকে—ভাতের ফল বৌদ্ধধর্ম আর বিয়ারের ফল জার্মান পরা-বিদ্যা। দর্শন বিশেষের সত্য আর মিথ্যা নির্ভর করে তাতে জীবনের ঊর্ধ্বগতি না অধঃগতির প্রকাশ আর প্রচারণা ঘটেছে তার উপর। ক্ষয়িষ্ণু মানুষ বলে থাকে: "জীবনের কোন মূল্যই নেই", তার বরং বলা উচিত: "আমি নেহাৎ অপদার্থ"। সব বীরোচিত গুণের অবলুপ্তির পর জীবনের আর কিই বা মূল্য থাকে? যে গণতন্ত্রে মহৎ মানুষে কোন বিশ্বাসই নেই তা প্রতিযুগেই ধ্বংস নিয়ে এসেছে এক একটা জাতির ভাগ্যে।

AMARBOI.COM

'যুথবদ্ধ য়ুরোপীয় মানুষ আজকাল মনে করে একমাত্র তারই আছে বেঁচে থাকার অধিকার। তার যেসব গুণ নিয়ে সে গর্ব করে তা হচ্ছে—জনসেবার আগ্রহ, দয়া, শ্রদ্ধা, শিল্প, মিতাচার, বিনয়, প্রশ্রয়, সহানুভূতি, এসব গুণের জন্যই সে নাকি ভদ্র, সহিষ্ণু আর দলের পক্ষে খুব কাজের মানুষ—আর এগুলি নাকি মানুষের বিশেষ গুণ। অবশ্য যখন দেখা যায় কোন নেতা বা মেষ-সর্দারকে কিছুতেই গদিচ্যুত করা যাচ্ছে না তখন চেষ্টার পর চেষ্টা চলে অধিকতর চালাক যুথবদ্ধ মানুষকে একত্রিত করে ক্ষমতা হস্তান্তরের—সব প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনতন্ত্রের এ হচ্ছে মূল কথা। এতদসত্ত্বেও এ অসহনীয় বোঝার হাত থেকে মুক্তির জন্য যুথবদ্ধ য়ুরোপীয়দের মধ্য থেকেও একনায়কত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যাকে পরম আশীর্বাদ আর পরম নজাৎ বলেই গণ্য করা যায়—এ সম্পর্কে শেষ মহাপ্রমাণ নেপোলিয়ন। নেপোলিয়নী প্রভাবের ইতিহাস মানে গোটা শতাব্দীব্যাপী তার যোগ্যতম ব্যক্তিদের মারফৎ যে উচ্চতর আনন্দ অর্জিত হয়েছে তারই ইতিহাস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. অতি-মানব (Superman)

যেমন নৈতিকতা মানে দয়া নয় বরং শক্তি তেমনি মানব প্রচেষ্টার লক্ষ্য সব মানুষের উন্নয়ন নয় বরং উৎকৃষ্ট আর শক্তিমান ব্যক্তির বিকাশ সাধন। "মানবজাতি নয় অতি-মাবনই লক্ষ্য।" কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মানবজাতির উন্নয়নের চেষ্টা করবে না—মানবজাতির উন্নতি হয় না, মানবজাতির অস্তিত্বই নেই—ঐ এক স্রেফ বিমূর্ত কথা। অস্তিত্ব যদি কিছুর থাকে তা হচ্ছে ব্যক্তির এক বিরাট উইঢিপি। সমগ্রের যে চেহারা তা অনেকখানি বিরাট পরীক্ষামূলক কারখানা, যেখানে প্রতি যুগেই কিছু না কিছু সাফল্য অর্জিত হয় বটে কিন্তু বেশীর ভাগই হয় ব্যর্থ। সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্য কখনো জনতার মুখ নয় বরং বিশেষ শ্রেণীর উন্নয়ন। উন্নত শ্রেণীর আবির্ভাব অসম্ভব হলে সমাজ খতম হয়ে যাওয়াই ভালো। সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আর ক্ষমতা বিকাশেরই হাতিয়ার —শ্রেণী ও নিজেই লক্ষ্য নয়। "যন্ত্র রক্ষায় যদি সব মানুষের প্রয়োজন হয় তা হলে যন্ত্রের আবশ্যকতা কোথায়? যন্ত্র বা সামাজিক সংস্থা কি নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে, তা কি সব সুখের উৎস?"

AMARBOI.COM

প্রথমে নীটশে এমনভাবে কথা বলেছেন যে মনে হয়েছিল তিনি যেন এক নতুন শ্রেণীর উৎপত্তিরই আশা করছেন পরে তিনি পেঁৗছেছেন তাঁর অতি-মানবের ধারণায়, মাঝারি জনতার কর্দম থেকেই হবে যার অনিশ্চিত আবির্ভাব। যার অস্তিত্ব পরিকল্পিত প্রজনন ও সযত্ন পালনের উপরই নির্ভরশীল, কিছুতেই নির্ভর করবে না প্রাকৃতিক নির্বাচনের ঝুঁকির উপর। অসাধারণ ব্যক্তির প্রতি জৈবিক প্রক্রিয়ার রয়েছে কিছুটা বিরাগ—প্রকৃতি তার সর্বোত্তর সৃষ্টির প্রতিই হয়ে থাকে নিষ্ঠুরতম। প্রকৃতি যেন গড় এবং মাঝারিকেই ভালোবাসে আর রক্ষা করে—প্রকৃতি বারে বারেই শ্রেণী ও জনতার স্তরে ফিরে যায়। অধিক সংখ্যকরাই প্রভুত্ব করে সর্বোত্তমদের উপর। একমাত্র মানবীয় নির্বাচন, প্রজনন দূরদর্শিতা আর মহৎ শিক্ষার দ্বারাই অতি-মানবের উর্ধ্বতন সম্ভব।

মহৎ মানুষদের প্রেমের খাতিরে বিয়ে করতে দেওয়া এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কি অভাবনীয়, বীরেরা বিয়ে করবে চাকরাণীদের আর প্রতিভা-বানেরা মেয়ে দর্জিদের। শোপেনহাওয়ার ভুল করেছেন, প্রেম আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজনন এক নয়। কেউ যদি প্রেমে পড়ে তাকে তার সারা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া উচিত নয়—প্রেমে পড়ে জ্ঞানী থাকা সম্ভব নয়। প্রেমিক-প্রেমিকার শপথের কোন মূল্য নেই, বিয়ের ব্যাপারে প্রেমকে বে-আইনী ঘোষণা করা উচিত। উত্তম বিয়ে করবে উত্তমকে—প্রেম হচ্ছে ইতর সাধারণের জন্য। শুধু সন্তান উৎপাদনই বিয়ের উদ্দেশ্য নয় বরং উন্নয়নও।

'তুমি তরুণ, সন্তান চাও, চাও বিয়ে। জিজ্ঞাসা করি সত্যই কি তুমি সন্তান চাও? তুমি কি বিজয়ী, আত্ম-সংযমী, নিজের ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তা আর স্ব-গুণের মালিক? নাকি তোমার মুখ দিয়ে পশু বা প্রয়োজন কথা বলছে? নাকি নিঃসঙ্গতা? নাকি নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধ? আমি চাই তোমার জয় আর তোমার স্বাধীনতা সন্তান কামনা করুক। তোমার স্বাধীনতা আর মুক্তি দিয়ে তুমি জীবন্ত স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করো। তোমাকে ছাড়িয়ে তুমি রচনা করো। কিন্তু সর্বাগ্রে তোমার সুগঠিত করা চাই তোমার দেহ আর আত্মাকে। শুধু নিজেকে প্রসারিত করো না—বরং নিজেকে প্রসারিত করো ঊর্ধ্বদিকে। বিয়ে—দুইজনের এমন ইচ্ছাকেই আমি তা বলি যে ইচ্ছা চায় এমন একজনকে সৃষ্টি করতে যে তাদের দুইজন থেকেও বড়। আমি একজনের আর একজনের প্রতি ঐ রকম ইচ্ছা পোষণের জন্য শ্রদ্ধা করাকেই বিয়ে বলে অভিহিত করে থাকি।

সুপ্রজনন ছাড়া মহত্ত্ব অসম্ভব। "শুধু মাত্র বুদ্ধি কাকেও মহৎ করে না বরং বুদ্ধি বা মননকে মহত্ত্ব দানের জন্য সব সময় আরো কিছুর দরকার। তা কি? রক্ত.... (Lords বা Almanac de Gotha নামের আগে ইত্যাদি উপসর্গের কথা আমি বলছি না, এগুলিত স্রেফ গর্দভের লেজুড়) সুপ্রজনন আর বংশগতির পর অতি-মানবের জন্য কঠোর শিক্ষা দ্বিতীয় শর্ত—এখানে আদায় করতে হবে নিখুঁত পূর্ণাঙ্গতা, বাদ দিতে হবে সব রকম প্রশংসা, আরামের ব্যবস্থা থাকবে খুব কম কিন্তু দায়িত্ব থাকবে অনেক, যেখানে দেহকে শিক্ষা দিতে হবে নীরবে দুঃখবরণ আর মনকে দিতে হবে আদেশ দান আর আদেশ পালনের শিক্ষা। চলবে না কোন রকম লাম্পট্য—অনাবশ্যক স্বাধীনতা আর প্রশ্রয়ের ফলে নৈতিক মেরু-দণ্ডকে দুর্বল করে দেওয়া চলবে না এখানে। তবুও এটি এমন এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল হবে যেখানে ছাত্ররা প্রাণভরে হাসতে শিখবে—দার্শনিকদের শ্রেণী-বিভাগ করা হবে হাসতে পারার ক্ষমতানুসারে—"যে উচ্চতম পর্বত লংঘন করে আসে সে সব রকম বিয়োগান্ত নাটক দেখেও হাসতে পারে।" অতি-মানবের শিক্ষায় কোন রকম নৈতিক অম্ল থাকবে না—কামনায় বৈরাগ্য থাকবে বটে, কিন্তু রক্ত মাংসের দাবীকে করা হবে না নিন্দা। "হে সুন্দরী মেয়েরা! নাচতে ভুলো না। কোন খেলোয়াড়ই খেলা ছেড়ে এসে তোমাদের প্রতি কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না......সুন্দর গুলফওয়ালা মেয়েদের কোন শত্রু নেই।" এমন কি অতিমানবেরও দেখছি সুন্দর গুল্ফের রুচি রয়েছে!

এমনভাবে যার জন্ম ও প্রতিপালন ঘটবে সে হবে ভালোমন্দের অতীত। প্রয়োজন হলে তার বস (Boss) বা মনিব হতে আপত্তি নেই, ভালো হওয়ার চেয়ে সে হবে নির্ভীক। "ভালো মানে কি?....সাহসী হওয়াই ভালো হওয়া।" "ভালো মানে কি? মানুষের মধ্যে ক্ষমতার অনুভূতিকে যা বাড়ায়, সংকল্পের ক্ষমতা বা যে কোন রকমের ক্ষমতাই ভালো। মন্দ কি? দুর্বলতা থেকে যার উৎপত্তি তাই মন্দ।" মনে হয় অতি-মানবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে বিপদ আর হানাহানি প্রীতি, অবশ্য পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। তিনি নিজের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেবেন না, সুখ ছেড়ে দেবেন প্রচুরতম সংখ্যকের জন্য। "যার জন্য দূর সমুদ্র-ভ্রমণ প্রয়োজন; জরোথুস্ত্রো তাই পছন্দ করতেন আর চাইতেন না কোন রকম বিপদ ছাড়া দিন কাটাতে।" তাই সব যুদ্ধই ভালো। এমনকি আজকের দিনের নগণ্য আর তুচ্ছ কারণ সত্বেও,—"ভালো যুদ্ধ সব কারণ-কেই পবিত্র করে নেয়।" এমনকি বিপ্লবও ভালো, শুধু বিপ্লবের খাতিরে নয়, কারণ জনগণের কর্তৃত্বের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। তবে বিপ্লব বা হানাহানির সময় ব্যক্তির সুপ্ত মহত্ত্ব বহিঃ-প্রকাশের একটা সুযোগ পায় যা আগে পায়নি কোন রকম সুযোগ আর প্রেরণা। এমন বিশৃঙ্খলার ভিতর থেকেই জন্ম নেয় নৃত্যশীল তারকা, যেমন ফরাসী বিপ্লবের বিশৃঙ্খলার ফলে জন্ম নিয়েছিল নেপোলিয়ন, রেনে-সাঁসের সংগ্রাম আর হট্টগোলের ফলে এমন সব শক্তিমান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল আর এত প্রচুর ভাবে যে য়ুরোপে আজতক্ আর তেমন দেখা যায়নি আর তেমনভাবে জন্ম দিতেও য়ুরোপ আজ অক্ষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি, মননশীলতা আর গর্ববোধ—এই গড়ে তোলে অতি-মানব। কিন্তু এ সবের সমন্বয় ঘটা চাই—প্রবৃত্তি ক্ষমতায় পরিবর্তিত হয় তখনই যখন তা এক মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্বাচিত আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশৃঙ্খল কামনাকে ব্যক্তিত্বের ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে হয় সক্ষম। "যে চিন্তাবিদ বাগানের মালি না হয়ে যদি স্রেফ চারা গাছের মাটি হয় সে এক হতভাগ্য।" কে শুধু আবেগের অনুসরণ করে? নেহাৎ দুর্বল-প্রাণীই তা করে থাকে, সে নিজেকে দমন করতে সক্ষম, 'না' বলার মতো শক্তি তার নেই—সে নিজেই এক বিরোধ আর অবক্ষয়। সর্বোচ্চ কাজ হচ্ছে নিজেকে নিজে শাসনে রাখা। "যে স্রেফ জনতার একজনে পরিণত হতে চায় না তার উচিত নিজের প্রতি কঠোর হওয়া।" বিশেষ কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অপরের উপর কঠোর হতে হয়, তার চেয়েও বেশী কঠোর হতে হয় নিজের উপর। কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে একমাত্র বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর সব কিছুই করতে রাজি তার মধ্যেই রয়েছে মহত্বের সুস্পষ্ট লক্ষণ, এ হচ্ছে অতি মানবের শেষ সূত্র।

এ রকম লোকই আমাদের লক্ষ্য, আমাদের সব শ্রমের ফসল এ যদি মনে করতে পারি তা হলেই আমরা জীবনকে ভালোবাসতে পারবো আর বাস করতে পারবো ঊর্ধ্বগামী জীবন।" আমাদের এমন এক লক্ষ্য থাকা চাই যার জন্য আমরা সবাই একে অন্যকে ভালোবাসতে সক্ষম।" আমাদের মহৎ হওয়া চাই অথবা হওয়া চাই মহত্ত্বের সেবক ও হাতের-যন্ত্র। কি চমৎকার দৃশ্যই না ছিল যখন লক্ষ লক্ষ য়ূরোপীয় বোনাপার্টির পথ রচনায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর জন্য দিয়েছিলেন জীবনা-হুতি, মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁর নাম কীর্তন করতে করতে! সম্ভবত আমরা যারা বুঝাতে সক্ষম তারা যে-মানব আমরা হতে পারি না, অন্তত তার ভবিষ্যৎ বক্তা হতে পারি, পারি তার আগমনের রাস্তাটা তৈরী করে দিতে—দেশ-কাল ভুলে, সব ব্যবধান উপেক্ষা করে এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে আমরা নিশ্চয়ই একযোগে কাজ করতে পারি। এসব গোপন সহায়ক আর মহৎ-প্রিয়দের আওয়াজ শুনতে পেলে নেহাৎ দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকলেও জরোথুস্ত্রো আনন্দে গান গেয়ে উঠবেন।" হে আজকের নিঃসঙ্গ, যারা আছো বিচ্ছিন্ন হয়ে, একদিন তোমরা জাতি হয়ে উঠবে—তোমরা যারা নিজেদের নির্বাচন করেছো, তোমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্য থেকেই একদিন নির্বাচিত জাতির উদ্ভব হবে আর তার থেকে উদ্ভব হবে অতি-মানবের।”

৭. পতন (Decadence)

অতি-মানবে পৌঁছোতে হলে যেতে হবে আভিজাত্যের পথ পার হয়ে। সময় পার হয়ে যাওয়ার আগে ‘নাক গণনার বাতিক’ অর্থাৎ গণতন্ত্র ছাড়তে হবে। সব উচ্চমনা মানুষের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন খ্রীস্টধর্মের বিলুপ্তি। খ্রীস্টের জয়ের সাথে সাথেই গণতন্ত্রের সূচনা—“আদি বা প্রথম খ্রীস্টান গভীরতম সহজাত প্রবৃত্তিতে ছিলেন সবরকম কায়েমী স্বার্থ আর সুযোগ সুবিধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন সম-অধিকারের জন্য। আধুনিককালে হলে তাঁকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হতো।” তোমাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠজন তাঁকে বানাও তোমার চাকর”—একথা হচ্ছে সব রকম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর মানসিক সুস্থতার বিপরীত। সত্যই বাইবেল বা ঐশীবাণী পড়লে রুশ উপন্যাসের কথাই যেন মনে হয়। এ যেন ডস্টয়ভস্কী থেকে একরকম চুরি। একমাত্র নীচ ব্যক্তিদের মধ্যেই এমন ধারণা শিকড় গাড়তে পারে আর পারে এমন যুগে যে যুগের শাসক-দের হয়েছে পতন, তারা যখন শাসন করতে গেছে ভুলে। ‘যখন নীরো (Nero) আর কেরাকেল্লা (Caracalla) সিংহাসনে বসলো তখনই উচ্চমানের লোকের চেয়ে নিম্নমানের লোককে অধিকতর মূল্য দেওয়ার অসম্ভব কাজ ও সম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। যেমন খ্রীস্টধর্মের য়ুরোপ-বিজয়ের ফলে প্রাচীন আভিজাত্যের ধ্বংস হয়েছিল তেমনি টিউটনিক বীর যোদ্ধাদের য়ুরোপ জয়ের ফলে পুরুষে পৌরুষ গুণাবলীর পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল—আর রোপিত হয়েছিল আধুনিক আভিজাত্যের বীজ। এরা “নৈতিকতা”র ভারবাহী ছিল না—তারা “মুক্ত ছিল সবরকম সামাজিক বাধা-নিষেধ থেকে—তাদের বিবেক ছিল বন্য পশুর মতো যে বিবেক ভয়াবহ সব হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নির্যাতন ও দানবীয় উল্লাসে মেতে উঠতো, এক বেপরওয়া উপেক্ষায় এসবকে মেনে নিতো স্রেফ ছাত্র-সুলভ খেয়ালী-পনায় অনুষ্ঠিত বলে।” এসব লোকই শাসন করেছিল জার্মেনী, স্কেন্ডে-নেভিয়া, ফ্রান্স, ইংলেণ্ড, ইটালী আর রাশিয়া।

৩৩—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এক সুশ্রী শিকারী পশুর দল, বিজয়ী আর প্রভুগোষ্ঠী, সামরিক সংগঠনপুষ্ট আর সংগঠনে সক্ষম, বেপরওয়াভাবে তাদের আক্রমণের ভয়াবহ থাবা চালায় তাদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশী নিরীহ জনসাধারণের উপর,....এ পশুর দলই প্রতিষ্ঠা করেছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যখন নিয়ম-কানুন রচনা করতে শুরু করলো তখনই ভেঙে গেলো স্বপ্ন। যে আদেশ দানে সক্ষম, যে স্বভাবতই প্রভু, যে নিষ্ঠুর-স্বভাব আর নিষ্ঠুর কাজের ভিতর দিয়েই ক্ষমতাসীন হয়েছে তার নিয়ম-কানুনের দরকার কোথায়?'

এমন চমৎকার এক শাসকজাতিকে প্রথম নষ্ট করে দিলে ক্যাথলিক ধর্মের রমণী-সুলভ গুণাবলীর উচ্ছ্বাস আর দ্বিতীয়ত নষ্ট করলে 'সংস্কার' (Reformation) আন্দোলনের পবিত্রতা আর ইতরজনোচিত আদর্শ। এদের নষ্টের তৃতীয় কারণ হীনজাতের সঙ্গে আন্তর্বিবাহ। ক্যাথলিক ধর্মাদর্শ যখন ধীরে ধীরে রেনেসাঁসের আভিজাতিক আর অনৈতিক সংস্কৃতিতে মিশে যাচ্ছিল তখনই য়ুহুদীয় কঠোরতা আর গাম্ভীর্যের পুনর্জাগরণের 'সংস্কার' আন্দোলন তার বিনাশ সাধন করে শেষ করে দিলে। "কেউ কি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে—রেনেসাঁস কি ছিল তা কি কেউ বুঝতে পারবে? খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধের আন্তর্মূল্যায়ন, বিপরীত মূল্যবোধের, তথাকথিত 'মহৎ' মূল্যবোধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল সব উপায়, সব বৃত্তি আর সব প্রতিভা।....আমি আমার চোখের সামনে এক আকর্ষণীয় গৌরবময় বর্ণাঢ্য সম্ভাবনার এক যাদুকরী অবস্থা দেখতে পাচ্ছি....দেখতে পাচ্ছি সীজার বর্গিয়াকে (Caesar Borgia) পোপ হিসেবে......আমার কথা বুঝতে পারছেন ত?"

প্রোটেস্টাণ্ট-ধর্ম আর বিয়ার জার্মানদের বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ করে দিয়েছে—এর সঙ্গে এখন যোগ করো ওয়েগনারীয় অপেরা। ফলে—"এখনকার প্রাশিয়ানরা হচ্ছে সংস্কৃতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু।" একজন জার্মেন দেখলেই আমার হজমশক্তি লোপ পায়।" "গিবন যেমন বলেছেন, একটা দুনিয়া ধ্বংস হতে একমাত্র সময়ের—দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, তেমনি জার্মেনিতে ভুল ধারণার বিলুপ্তি ঘটতেও সময়ের—দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।" লুথার চার্চকে পরাজিত করায় যেমন তেমনি জার্মেন কর্তৃক নেপোলিয়নের পরাজয়ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল এক মহাদুর্দিন, তখন থেকেই জার্মেনি দূরে সরিয়ে দিয়েছে তার গ্যেটে, শোপেনহাওয়ার আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাটকের সমন্বয় সাধন করেননি ? "জার্মান প্রাণ-শক্তির ডায়োনিসীয় মূল থেকে এমন এক শক্তির—যার নাম জার্মান সংগীত—উদ্ভব হয়েছে, যা বাখ (Bach) থেকে বিঠোফেন আর বিঠোফেন থেকে ওয়েগনার পর্যন্ত এক বিশাল সূর্যাবর্তন। এর সঙ্গে সক্রেটিয় সংস্কৃতির আদিম অবস্থার কিছুমাত্র মিল নেই।" জার্মান ভাবধারা নীরবে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করেছে ইটালী আর ফ্রান্সের এপোলীয় শিল্পকলাকে। জার্মানদের বোঝা উচিত তাদের সহজাতবৃত্তি এসব অবক্ষয়িত সংস্কৃতি থেকে অনেক বেশী সুস্থ ও সবল—ধর্মের মতো সংগীতেও তাদের আর এক সংস্কার (Reformation) নিয়ে আসা উচিত, শিল্প আর জীবনে আবার সঞ্চারিত করা উচিত লুথারের বেপরওয়া প্রাণশক্তি। কে জানে হয়তো জার্মান-জাতির যুদ্ধ-যন্ত্রণা থেকেই জন্ম নেবে আর এক বীর-যুগের আর সংগীতের প্রাণশক্তি থেকেই হয়তো পুনর্জন্ম ঘটবে ট্র্যাজেডির ?

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে নীট্‌শে বেসলেতে ফিরে এলেন, শরীর তখনো দুর্বল, কিন্তু ভিতরের প্রাণশক্তি উচ্চাশার আগুনে জ্বলছিল তখনো ধিকিধিকি —নিরানন্দকর বক্তৃতা দিয়ে তার অপচয় সাধনে তাঁর মনে জাগলো অনীহা। "আমার সামনে অন্তত পঞ্চাশ বছরের কাজ রয়েছে। আমাকে কর্মের জোয়াল কাঁধেই সময় গুণে চলতে হবে।" ইত্যবসরে যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে—তিনি লিখেছেন: "জার্মান-সাম্রাজ্যই জার্মান প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করছে।" ১৮৭১-এর বিজয় জার্মান আত্মায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এক স্থূল অহমিকা—আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে এর চেয়ে বড় অন্তরায় আর হতে পারে না। নীট্‌শের ভিতরের এক খলস্বভাব প্রত্যেক প্রতিমা বা আদর্শের সামনেই তাঁকে অস্থির করে তুলতো। এ জড় সন্তুষ্টির প্রধান ও সবচেয়ে সম্মানিত হোতা ডেভিড ষ্ট্রাউসকে (David Strauss) আক্রমণ করেই এ মনোভাবের উপর আক্রমণ চালাতে তিনি সঙ্কল্প করলেন। লিখেছেন: "দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নিয়েই সমাজে আমার প্রবেশ: স্তাঁদালের (Stendhal) কাছে পেয়েছি আমি এ উপদেশ।"

তাঁর 'Thoughts out of Season'-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধ Schopenhauer as Education'-এ অন্ধস্বদেশপ্রেমিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে করেছেন তিনি ভয়ানক আক্রমণ। "রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যত সব নিকৃষ্ট দার্শনিকদের পোষার যে নিয়ম মহৎ দার্শনিকের আবির্ভাবের পথে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ে বড় অন্তরায় আর হতে পারে না। এ আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। প্লেটো বা শোপেনহাওয়ারকে পৃষ্ঠপোষকতা করার সাহসই করবে না কোন রাষ্ট্র......রাষ্ট্র সব সময় ওঁদের ভয়ে ভীত।" এই একই আক্রমণ চালিয়েছেন তিনি তাঁর 'The Future of Our Educational Institution' প্রবন্ধে আর 'Use and Abuse of History'তে জার্মান-মননশীলতাকে পুরাতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের খুঁটিনাটিতে মগ্ন রাখার প্রতি হেনেছেন বিদ্রূপ-বাণ। এসব রচনায় তাঁর দু'টি বিশিষ্ট চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে: নীতি আর শাস্ত্রকেও বিবর্তন-মতবাদ অনুসারেই পুনর্গঠন করতে হবে আর জীবনের কাজ অধিকাংশের, ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করলে যাদের দেখা যাবে অত্যন্ত অকর্মন্য তাদের, উন্নয়ন নয় বরং প্রতিভারই উন্নয়ন। উন্নততর ব্যক্তিত্বের বিকাশ আর উন্নয়নই হচ্ছে জীবনের ধর্ম।

এ সব রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহ-উদ্দীপক রচনা হচ্ছে "Richard Wagner in Bayreuth"। এখানে ওয়েগনারকে বলা হয়েছে সীগফ্রীড্ (Siegfried) বলে—"যিনি কখনো জানতেন না ভয় কাকে বলে। তিনিই একমাত্র খাঁটি শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা কারণ সবরকম শিল্পকেই তিনি একত্রে মিশিয়ে এক মহৎ সৌন্দর্যে সমন্বিত করেছেন।" ঐ প্রবন্ধে তিনি আগামী ওয়েগনার উৎসবের মহান গুরুত্ব উপলব্ধির আহ্বান জানিয়েছেন—"বৈরুৎ আমাদের কাছে যুদ্ধদিনের প্রভাতী ধর্মানুষ্ঠানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।" এ এক তরুণ পূজারীর কণ্ঠস্বর, এ কণ্ঠস্বরে যেন নারীসুলভ সুকুমার আত্মশক্তিই ফুটে উঠেছে—এ শক্তিই ওয়েগনারে দেখতে পেয়েছে দৃঢ়-পৌরুষ আর অমিত সাহস, যা পরে তাঁকে সহায়তা করেছে অতিমানবের উপলব্ধিতে পৌঁছুতে। কিন্তু পূজারী নিজেও তো দার্শনিক—ওয়েগনারে তিনি দেখতে পেলেন একরকম একনায়কত্ব-সুলভ অহংবোধ যা যে কোন অভিজাত মনের কাছে নেহাত বিরক্তিকর। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ওয়েগনারের ফ্রান্সের প্রতি আক্রমন নীট্শের মোটেও ভালো লাগেনি (প্যারীও Tannhauser-এর প্রতি কিছুমাত্র সদয় ছিল না) আর ব্রাহ্ম্সের (Brahams) প্রতি ওয়েগনারের ঈর্ষা দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। এ সপ্রশংস প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুও ওয়েগনারের জন্য তেমন ভাবী মঙ্গলের কারণ হয়নি: "পৃথিবী দীর্ঘকাল ধরে প্রাচ্য ভাব-ধারায় প্রভাবিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, এখন মানুষ উন্মুখ হয়ে উঠেছে গ্রীক ভাব-ধারা গ্রহণের জন্য।" কিন্তু নীট্শে এর মধ্যে জেনে গেছেন যে ওয়েগনার একজন অর্ধ সেমিটিক।

তারপর ১৮৭৬-এ বৈরুতই (Bayreuth)) এসে গেলো—এবার রাতের পর রাত এক নাগাড়ে চলতে লাগলো ওয়েগনারের অপেরা, ভিড় জমালো রাজা-বাদশারা, রাজপুত্র আর বাচ্চা রাজকুমারেরা, অলস ধনী আর ওয়েগনারপন্থীরা, স্থান পেলো না দরিদ্র ভক্তরা।

হঠাৎ নীট্শের মনে হলো ওয়েগনার গেয়ারের (Geyer-জনৈক য়ুহুদী অভিনেতা, নীট্শের ধারণা ইনিই ওয়েগনারের জনক) কাছ থেকে অনেক কিছুই যেন নিয়েছেন—'The Ring of the Nibalungs এ যে মঞ্চ-সুলভ আবেদনের প্রাচুর্য দেখা যায় তার কতখানি রঙ্গ-মঞ্চের দান আর সংগীতে সুরের যে কিছুটা অভাব দেখা যায় তার কতটুকু সঞ্চারিত হয়েছে নাটকে?" সিম্ফনীতে ছড়িয়ে পড়া এমন নাটকের কল্পনা আমার ছিল—যে রূপকল্পের জন্য হবে লাইড (Lied—শব্দ বিহীন সুর) বা শুধু সুর থেকেই। কিন্তু অপেরার বৈদেশিক আকর্ষণ ওয়েগনারের পক্ষে এত অদম্য ছিল যে তিনি সে আকর্ষণে অন্যদিকে চলে গেলেন।" নীট্শের পক্ষে সেদিকে যাওয়া সম্ভব হয়নি—তিনি যা কিছু নাটকীয় আর অপরাধধর্মী তার প্রতি ছিলেন বিরূপ। তিনি লিখেছেন: "এখানে অধিক্ষণ থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো, সুদীর্ঘ প্রতিটি সংগীত-সন্ধ্যার জন্য আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্তভাবেই অপেক্ষা করে থাকি....আর আমি সহ্য করতে পারছি না।"

ওয়েগনারের চরম বিজয় মুহূর্তে যখন সবাই তাঁর বন্দনায় উন্মত্ত, ওয়েগনারকে একটি কথাও না বলে নীট্শে হল ছেড়ে পালালেন—পালালেন "যত সব মেয়েলি বিশৃঙ্খল আর অসংলগ্ন ভাববিলাস আর মিথ্যা আদর্শ-বাদিতায় বিরক্ত হয়ে—যা মানুষের বিবেককে করে তোলে মোলায়েম আর যা এখানে সবচেয়ে বীর-আত্মাটিকে জয় করে শেষ করে দিয়েছে।" বিজয়ের পর সুদূর সরাণ্টোতে (Sorrento—দক্ষিণ ইটালির এক স্বাস্থ্য কেন্দ্র) যখন ওয়েগ্নার বিশ্রামরত আর পার্সিপল (Parsipal) নামে এক নতুন অপেরা লেখায় ব্যস্ত তখন সেখানে নীট্শের সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাৎ ঘটলো। এ নতুন অপেরার বিষয়বস্তু হবে খ্রীস্টধর্ম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুণা আর নিষ্কাম প্রেমের সোচ্ছ্বাস প্রশংসা—এমন এক পৃথিবীর ছবি আঁকা হবে এ অপেরায় যার মুক্তিদাতা হচ্ছে 'এক আহাম্মক'। 'খ্রীষ্ট-নামধারী এক নির্ভেজাল আহাম্মক'। একটি কথাও না বলে নীটশে ফিরে গেলেন—এরপর আর কখনো তিনি ওয়েগনারের সঙ্গে আলাপ করেননি। 'যে মহত্ত্ব নিজের প্রতি সরল আর আন্তরিকতায় একীভূত নয় সে মহত্ত্ব মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে মুহূর্তে এরকম অবস্থা আমি দেখতে পাই তখনই লোকটার সব সাফল্য আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে।" তিনি সাধু পার্সিপল থেকে বিদ্রোহী সীগ্‌-ফ্রীড্‌কে বেশী পছন্দ করতেন আর খ্রীস্টীয় শাস্ত্রের যতসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়িয়ে তাতে অনেক বেশী নৈতিক মূল্য আর সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন বলে তিনি ওয়েগনারকে ক্ষমা করতে পারেননি। '**The Case of Wagner**-এ তিনি প্রায় স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গেই লিখেছেন :

"বৌদ্ধ সহজাত বৃত্তির সব রকম শূন্যতার স্তুতি গেয়েছেন ওয়েগনার আর তা গেয়েছেন সংগীতের ছদ্মাবরণে আর স্তুতি গেয়েছেন সব রকম খ্রীস্টানী ও সব ধর্মানুষ্ঠানের আর সব অবক্ষয়ের ....রিচার্ড ওয়েগনার হচ্ছেন এক জরাগ্রস্ত হতাশ রোমান্টিক—হঠাৎ ভেঙে লুটিয়ে পড়েছেন পবিত্র ক্রসের সামনে। এমন কোন জার্মেন কি নেই যে নিজের চোখে এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে নিজের বিবেকে এক সকরুণ দুঃখবোধ করে? আমিই কি একমাত্র লোক তাঁর জন্য দুঃখবোধ করছি?....যদিও আমি হচ্ছি সবচেয়ে বিনষ্ট ওয়েগনারবাদী। ....হ্যাঁ, ওয়েগনারের মতো আমিও যুগের তথা অবক্ষয়েরই সন্তান, তবে আমি এ বিষয়ে সচেতন, আমি তার হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি।"

তিনি নিজেকে যতটুকু মনে করতেন তার অনেক বেশী তিনি এপোলোবাদী ছিলেন—যা কিছু সূক্ষ্ম, সুকোমল আর মার্জিত তা ছিল তাঁর প্রিয়, ডায়োনিসীয় শক্তিমত্তা বা সংগীত, মদ আর প্রেমের নমনীয়তা তাঁর প্রিয় ছিল না মোটেও। ওয়েগনার একবার ফ্রাউ ফরেষ্টার-নীটশকে (**Frau Forester-Nietzsche**) বলেছিলেন : "তোমার ভাই এত বেশী নমনীয় যে তার সঙ্গ রীতিমতো অপ্রীতিকর, একটা ঠাট্টা তামাসা করলেই সে বে-সামাল হয়ে পড়ে তখন আমি আরো বেশী করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ হানতে থাকি তার প্রতি।" নীটশে অনেকখানি প্লেটো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মী ছিলেন—তাঁর ভয় ছিল বেশী শিল্প-কলার চর্চা করতে গিয়ে মানুষ না পাছে কঠোর হতে ভুলে যায়। নিজে খুব কোমল-মনা ছিলেন বলে মনে করতেন সারা দুনিয়াটাই তাঁর মতো—ওটা প্রায় বিপজ্জনকভাবেই খ্রীস্টীয় ধর্মাচার পালনের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে বুঝি। এ কোমল-মনা অধ্যাপকের মনের মতো অত বেশী যুদ্ধ তখন ঘটেনি। তবুও জীবনের শান্ত মুহূর্তে তিনি বুঝতেন নীট্শের মতই ওয়েগনারও ঠিক আছেন—সীগফ্রীডের শক্তির মতোই পার্সিপলের নম্রতারও প্রয়োজন আছে এবং কোন এক নৈসর্গিক নিয়মে এ দুই নিষ্ঠুর বিপরীত একত্রে মিশে হয়তো সৃষ্টিশীল ঐক্যের সমগ্রতা লাভ করবে। "এ নাক্ষত্রিক বন্ধুত্বের চিন্তা তাঁর প্রিয় ছিল—তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান আর ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা যাঁর কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একটা নীরব বন্ধন তিনি এখনো অনুভব করেন। তাঁর শেষ উন্মাদ অবস্থায় যখন একবার চৈতন্য ফিরে এসেছিল তখন বহুকাল আগে মৃত ওয়েগনারের এক ছবি দেখে তিনি আস্তে আস্তে বলে উঠেছিলেন "একেই আমি সবচেয়ে ভালোবাসতাম।"

AMARBOI.COM

৪. জরোথুস্ত্রো-সংগীত

মনে হয় শিল্পকলা তাঁকে নিরাশ করেছে, এবার তিনি আশ্রয় নিলেন বিজ্ঞানে, ডায়োনিসীয় ট্রিবসেন (Tribschen) আর বৈরুতের (Bayreuth) উত্তপ্ত দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের পর বিজ্ঞানের ঠাণ্ডা নির্মল হাওয়া তাঁর মনটাকে পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। আশ্রয় নিলেন দর্শনে যা "তাঁকে এমন স্থানে আশ্রয় দিল যেখানে সব রকম নির্যাতনেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ।" স্পিনোজার মতো তিনি তাঁর প্রবৃত্তিকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন সে সবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। তিনি বলেছেন "আবেগের ও রসায়নের" প্রয়োজন আছে। তাই তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'Human Auto Human' এ (১৮৭৮—৮০) তিনি হয়ে পড়েছেন মনস্তত্ত্ববিদ, অস্ত্রচিকিৎসকের সবরকম নির্মমতার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন মানুষের সুকুমার অনুভূতি আর প্রিয় সব বিশ্বাসকে। আর অত্যন্ত দুঃসাহসের সাথে সবরকম প্রতিক্রিয়া অগ্রাহ্য করে তা উৎসর্গ করেছেন বহুনিন্দিত ভোল্টোয়ারকে। এ বই তিনি ওয়েগনারকেও পাঠিয়েছিলেন আর বিনিময়ে ওয়েগনারের কাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেলেন ওয়েগনারের পার্সিপল (Parcipal) বইটি। এর পর তাঁদের মধ্যে আর পত্রালাপও ঘটেনি।

এ সময় ১৮৭৯-তে জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নেই তাঁর শরীর আর মন দুই-ই ভেঙে পড়লো—পৌঁছলেন গিয়ে মৃত্যু-সীমায়। কিছুটা বেপরওয়াভাবে তৈরী হলেন শেষ-যাত্রার জন্য। তাঁর বোনকে বল্লেন: "কথা দাও মৃত্যুর পর আমার বন্ধুদের ছাড়া আর কাকেও আমার লাশের পাশে এসে দাঁড়াতে দেবে না, দেবে না কৌতূহলী জনতাকে ভীড় জমাতে। দেখো কোন পাদ্রী পুরোহিত বা অন্য কেউ এসে যেন আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে, যখন আমি আত্মরক্ষায় অক্ষম, কতকগুলো মিথ্যা-উক্তি উচ্চারণ না করে—আমাকে এক সৎ কাফের হিসেবেই কবরে অবতীর্ণ হতে দিয়ো।" কিন্তু তিনি নিরাময় হয়ে উঠলেন—কাজেই এ বীরোচিত সমাধি মুলতবী রাখতে হলো। এ রকম রোগের ফলেই তাঁর মনে সূর্য আর স্বাস্থ্যের প্রতি, জীবন আর জীবনের হাসি আর নাচ-গানের প্রতি, কারমেনের 'দক্ষিণা সংগীতের' প্রতি ভালোবাসার সঞ্চার হয়েছিল—মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামের ফলে তাঁর সংকল্পও হয়েছিল দৃঢ়, 'হাঁ-বাচক' দৃষ্টিভঙ্গী জেগে ওঠায় তিনি জীবনের তিক্ততা আর যন্ত্রণার মাঝেও খুঁজে পেয়েছিলেন মাধুর্য। হয়তো এর থেকেই স্পিনোজার মতো মানব-ভাগ্যের স্বাভাবিক সীমা-রেখাকে সানন্দে মেনে নেওয়ার একটা সকরুণ চেষ্টা তাঁর মধ্যেও জেগে উঠেছিল। "মহৎ হওয়ার আমার সূত্র হচ্ছে নিয়তি-প্রেম....সব অবস্থায় নিয়তিকে মেনে নেওয়া নয় শুধু, তাকে ভালোবাসাও।" হায়, এ বলা যত সহজ, মানা তত সহজ নয়।

তাঁর পরবর্তী বইগুলির শিরোনাম হচ্ছে—'The Dawn of Day (১৮৮১) আর The Joyful Wisdom (১৮৮২)—এসবে প্রতিফলিত হয়েছে আরোগ্যকালের কৃতজ্ঞতা। পরবর্তী বইগুলির চেয়ে এখানে অধিকতর কোমল আর নম্র সুর উঠেছে ফুটে। এবার একটা বছর বেশ শান্তির সঙ্গে কাটাতে তিনি সক্ষম হলেন—বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত পেনসনে সাদাসিদা ভাবে কেটে যেতে লাগলো তাঁর জীবন। দাম্ভিক দার্শনিকের হৃদয় যেন এবার এক রমণীয় দুর্বলতার আকর্ষণে গলতেও লাগলো—অকস্মাৎ তিনি পড়ে গেলেন প্রেমে। কিন্তু লাউ সালমে (Lou Salome) দিলেন না তাঁর প্রেমের প্রতিদান। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ আর গভীর ছিল যে তা সহজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিথোবেনদের আর শুরু করেছে 'স্বদেশ-প্রেম'-পূজা—'সবকিছুর উপরে পিতৃভূমি'—আমার আশঙ্কা এখানেই জার্মেন দর্শনের ভরাডুবি।" তবে জার্মেন-চরিত্রে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আর গভীরতা আছে যে তাতে আশা হয় হয়তো তারা য়ুরোপকে উদ্ধার করলেও করতে পারে—ফরাসী বা ইংরেজ থেকে তাদের মধ্যে পৌরুষগুণের আধিক্য রয়েছে। ধৈর্য, অধ্যবসায় আর শ্রমের তারা অধিকারী বলে তাদের মধ্যে পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞান আর সামরিক শৃঙ্খলাও বিরাজ করছে। জার্মেন সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে সারা য়ুরোপের দুশ্চিন্তা দেখে রীতিমতো খুশী হওয়া যায়। জার্মেন সাংগঠনিক শক্তি যদি রুশের কার্যকরী সম্পদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারতো, বস্তুগত আর মানবীয়ভাবে, তা হলেই মহৎ রাজনীতির যুগের আবির্ভাব সম্ভব হতো। "জার্মেন আর শ্লেভ্ জাতির পারস্পরিক উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে য়ুহুদীদের মতো সুচতুর অর্থনীতি-বিদদেরও। তা হলেই আমরা পৃথিবীর মালিক হতে পারবো......আমরা চাই রাশিয়ার সঙ্গে শর্তহীন মিলন।" এ ছাড়া আমাদের জীবন হবে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ আর শ্বাসরোধকারী।

জার্মেনদের মুশ্‌কিল হচ্ছে তাদের মনে এমন কিছু নির্বুদ্ধিতা রয়েছে যা তাদের চরিত্রেরও স্থূলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়—সংস্কৃতির যে দীর্ঘ ঐতিহ্য সারা য়ুরোপে ফরাসীদের করে তুলেছে সবচেয়ে মার্জিত আর সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, জার্মেনিরা তার থেকে বঞ্চিত। "আমি শুধু ফরাসী সংস্কৃতিতেই বিশ্বাসী, এ ছাড়া য়ুরোপে অন্য যা কিছুকেই সংস্কৃতি বলা হয় তা হচ্ছে নেহাৎ ভুল উপলব্ধি—এ আমার বিশ্বাস ও ধারণা।" "যদি কেউ মণ্টেইন (Montaigne) লা রোচেফাউকুল্ড (La Rochefoucould), ... ভাউভেনারগস্ (Vaw-venargues) আর চ্যমফোর্টকে (Chamfort) অধ্যয়ন করে তা হলে অন্য কোন জাতির কোন লেখক গোষ্ঠীর তুলনায় এঁদের কাছে অধিকতর প্রাচীনত্বের সন্ধান পাবে।" ভল্টেয়ার ত "মনের এক মহাপ্রভু" আর টেইন (Taine) হচ্ছেন "প্রথম জীবন্ত ঐতিহাসিক।" এমনকি ফ্লোবার্ট (Floubert), বুরগেট (Bourget), আনাতোল ফ্রান্স (Anatole frence) প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণও চিন্তা আর ভাষার স্বচ্ছতায় অন্যান্য য়ুরোপীয় লেখকদের নাগালের অনেক দূরে—"এসব ফরাসী লেখকদের রচনায় কী অপরিসীম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বচ্ছতা আর সূক্ষ্মতা !" য়ুরোপীয় জীবনের রুচি, অনুভূতি আর ব্যবহারের যে আভিজাত্য তা ফ্রান্সেরই দান—তবে তা হচ্ছে পুরোনো ফ্রান্সের, ষোড়শ আর সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সেরই। বিপ্লব অভিজাত শ্রেণীকে ধ্বংস করে সংস্কৃতির মাধ্যম আর সূতিকাগারকেই ধ্বংস করে দিয়েছে—প্রাচীনের সঙ্গে তুলনায় ফরাসী মনও এখন ক্ষীণ আর পাণ্ডুর হয়ে গেছে। যাই হোক এখনো তাতে কিছু চমৎকার গুণ দেখতে পাওয়া যায়—"জার্মেনির তুলনায় ফ্রান্সে এখনো সব রকম মনস্তাত্ত্বিক আর শৈল্পিক প্রশ্ন অতুলনীয় সূক্ষ্মতা আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখা হয়।......এখন রাজনৈতিক জগতে জার্মেনী যখন বৃহৎশক্তিরূপে স্বীকৃত তখন ফ্রান্স সাংস্কৃতিক জগতে লাভ করেছে নতুন গুরুত্ব।"

য়ুরোপে রাশিয়া হচ্ছে স্বশ্রী পশু। তার অধিবাসীদের "নিয়তিবাদে এমন এক একনিষ্ঠ একগুঁয়ে আর সমর্পিত বিশ্বাস রয়েছে যে তারা আজো আমাদের পশ্চিমীদের উপর বেশ সুবিধা পেয়ে থাকে।" রাশিয়ায় এক দৃঢ় সরকার রয়েছে—অথচ নেই 'আইন পরিষদের স্থবিরতা', দীর্ঘকাল থেকে ওখানে সংকল্প-শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে—এখন তার নির্গমন পথের সন্ধান ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া একদিন য়ুরোপের প্রভু হয়ে বসলেও বিস্মিত হওয়ার কারণ হবে না।" "যে চিন্তাবিদ অন্তরে অন্তরে য়ুরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবে, সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে যে মনে করে আগামী দিনের মহাঅভিনয় আর শক্তির লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয় করবে য়ুহুদী আর রুশীয়রা।" কিন্তু বর্তমানে ইটালীবাসীরা হচ্ছে সবচেয়ে চমৎকার আর সবচেয়ে শক্তিমান—মানব-চারা ইটালীতে বেশ শক্ত হয়েই বেড়ে ওঠে, আলফায়েরির (Alfieri) এ গর্বিত উক্তি মিথ্যা নয়। এমনকি হীনতম ইটালীবাসীতে, পৌরুষ-ব্যঞ্জনা আর আভিজাত্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। "এমনকি বার্লিনের গাড়ীচালক থেকেও দরিদ্র ভেনিসীয় মাঝি দৈহিক গঠনে উত্তম—পরিণামে মানুষ হিসেবেও উত্তম।"

সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে ইংরেজ—তারাই গণতান্ত্রিক বিভ্রান্তির সাহায্যে ফরাসী মনকে বিকৃত করে দিয়েছে : "দোকানদার, খ্রীস্টান, গাভী, নারী, ইংরেজ আর সব গণতান্ত্রিক একরকম, একই দলভুক্ত।" ইংরেজ প্রয়োগ-বাদ আর সাংস্কৃতিক ঔদাসিন্যই হচ্ছে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির রসাতল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র যে দেশে খুন-খারাবি নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে সেখানেই জীবন স্রেফ বেঁচে থাকার সংগ্রাম এ ধারণা কেউ পোষণ করতে পারে। দোকান-দার আর জাহাজদারেরা যে দেশে অসম্ভব লোকসংখ্যার জন্য দিয়ে আভিজাত্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে একমাত্র তেমন দেশেই গণতন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব—এ এক উপহার, গ্রীকদেরই উপহার, আধুনিক বিশ্বের প্রতি ইংলণ্ডের দান। ইংলণ্ডের হাত থেকে কে য়ুরোপকে উদ্ধার করবে আর ইংলণ্ডকে গণতন্ত্রের হাত থেকে?

৮. আভিজাত্য

গণতন্ত্র মানে বিচ্ছিন্নতা—প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অনুমতি দেওয়া যা খুশী তা করার। তার অর্থ সমন্বয় আর আন্তঃনির্ভরতার অভাব, স্বাধীনতা আর বিশৃঙ্খলার কর্তৃত্ব। এ হচ্ছে মাঝারিপনার পূজা আর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ঘৃণা। এ অবস্থায় মহৎ মানুষের আবির্ভাব সম্ভব নয়—নির্বাচনের অশোভনতা আর অমর্যাদার শিকার তিনি কি করে হতে পারেন? তাঁদের সম্ভাবনাও বা কতটুকু? কুকুর যেভাবে নেকড়েকে ঘৃণা করে জনসাধারণও সেভাবে স্বাধীনচেতা মানুষকে, যারা সব বাধা-শৃঙ্খলের শত্রু আর যারা স্তাবক নন, নন 'দলের নিয়মিত সভ্য' তাদের ঘৃণা করে থাকে। এ অবস্থায় অতি-মানবের আবির্ভাব কি করে সম্ভব? যে জাতি তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কাজে লাগায় না, করে নিরুৎসাহ, রাখে তাদের অপরিচিত সে জাতি কি করে বড় হবে? এ রকম সমাজে চরিত্র ভ্রষ্ট হয়, অনুকরণ ঊর্ধ্বমুখী না হয়ে হয়ে পড়ে পার্শ্বমুখী—উচ্চমানের মানুষের বদলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠই হয়ে পড়ে আদর্শ আর অনুকরণীয়। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের প্রতিলিপি, এমনকি নরনারীও প্রায় তাই হয়ে পড়ে—পুরুষ হয়ে পড়ে নারী, আর নারী পুরুষ।

গণতন্ত্র আর খ্রীস্টধর্মের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হচ্ছে নারীয়তা। "এখানে পৌরুষের বালাই নেই তাই নারীরা নিজেরাই পুরুষ হতে চেষ্টা করে। যে নিজেই যথেষ্ট পরিমাণে পুরুষ সে-ই একমাত্র নারীর নারীত্বকে বাঁচাতে পারে।" ইবসেন—যিনি নিজেই 'এক আদর্শ পরিচারিকা'—তিনি সৃষ্টি করেছেন "মুক্তি প্রাপ্তা নারী চরিত্র"। পুরুষের পাঁজর থেকেই নাকি নারীর সৃষ্টি! মানুষের বক্তব্য: 'তা হলে আমার পাঁজরের কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য দারিদ্র্য!" নারী যে আজ তার শক্তি আর সম্মান খুইয়ে বসেছে তার কারণ এ 'মুক্তি'—বুরবঁ (Bourbons) রাজাদের সময় নারীর যে সম্মান ছিল আজ তা কোথায়? নারী আর পুরুষের সাম্য অসম্ভব কারণ উভয়ের দ্বন্দ্ব এক চিরন্তন ব্যাপার। এখানে জয় ছাড়া শান্তি অসম্ভব—একপক্ষ যদি অপরপক্ষকে প্রভু বা কর্তা মেনে নেয় একমাত্র তখনই শান্তি সম্ভব। কোন নারীর সঙ্গে সমতা রক্ষার চেষ্টা করাই বিপজ্জনক—নারী তাতে সন্তুষ্ট থাকবে না কিছুতেই বরং পুরুষ যদি খাঁটি পুরুষ হয় তা হলে সে বশ্যতায় থেকেও থাকবে সন্তুষ্ট। সর্বোপরি নারীর সুখ আর পূর্ণতা মাতৃত্বের উপরই নির্ভরশীল। "নারী রহস্যময়ী, নারী সম্পর্কীয় সবকিছুর একটিমাত্র উত্তর: যার নাম সন্তান ধারণ।" "নারীর জন্য পুরুষ হচ্ছে একটি উপায় মাত্র: সব সময় লক্ষ্য সন্তান। কিন্তু পুরুষের কাছে নারী কি?......এক বিপজ্জনক খেলনা।" "পুরুষকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা উচিত আর নারীকে যোদ্ধা সৃষ্টি করার জন্য বাদ বাকী সব কিছু স্রেফ আহাম্মকী।" তবুও "বলতে হয় নিখুঁত পুরুষের চেয়ে নিখুঁত নারী অনেক উচ্চস্তরের মানুষ আর তা অধিকতর দুর্লভও......নারীর প্রতি যথোপযুক্ত ভদ্র হওয়া উচিত।" বিয়ের ব্যাপারে সংঘর্ষের এক কারণ—এতে নারীর বাসনা চরিতার্থ হয় আর পূর্ণতা পায় বটে কিন্তু পুরুষের বেলায় তা কারণ হয়ে দাঁড়ায় সংকীর্ণতা আর শূন্যতার। পুরুষ যখন কোন নারীর প্রেমে পড়ে তখন সে দুনিয়া বিলিয়ে দিতে চায় আর মেয়েটি বিয়েতে রাজি হলে দিয়ে দেয়ও। সন্তানের জন্য হলেই তাকে দুনিয়া ভুলে যেতে হয়, প্রেমের পর-চিকীর্ষা তখন পারিবারিক আত্ম-কেন্দ্রিকতায় হয় পরিণত। সততা আর নব-নব উদ্যোগ কৌমার্যেরই বিলাস। "উচ্চতর দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিবাহিতদের সকলেই কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখে।......মানব-অস্তিত্বের সামগ্রিক মূল্যায়নকে যিনি নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন তাঁর পক্ষে পরিবারের ভার গ্রহণ, স্ত্রী-পুত্রের জন্য অন্ন-উপার্জন, নিরাপত্তা আর সামাজিক মর্যাদা সন্ধান আমার কাছে এক অসম্ভব কল্পনা বলেই মনে হয়।" সন্তান জন্মের পর অনেক দার্শনিকেরই ঘটেছে মৃত্যু। "আমার দরজার ছিদ্রপথে বাতাস ঢুকে বলে "এসো'। এক ধূর্ত ভঙ্গীতে আমার দরজা খুলে গিয়ে বলে 'যাও'। কিন্তু সন্তান-স্নেহের শৃঙ্খলে বাধা পড়ে আমি পড়ে থাকি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীয়তার সঙ্গেই দেখা দেয় সমাজতন্ত্র আর অরাজকতা—এসবই গণতন্ত্রের শাবক! রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপারে যদি সাম্য ঠিক হয় তবে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সাম্য নয় কেন? কোথাও নেতা থাকবে কেন? কোন কোন সমাজতান্ত্রিক 'জরোথুস্ত্রো'-বইটার প্রশংসা করবে কিন্তু সে প্রশংসা অনাবশ্যক। "কেউ কেউ জীবন সম্পর্কে আমার যে মতবাদ তার সমর্থক ও প্রচারক কিন্তু তারা আবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যও প্রচার করে থাকে......এসব সাম্য বা সম-অধিকারবাদীদের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না। কারণ আমার অন্তরের সুবিচার বলছে: "মানুষ সমান নয়।" আমরা এক সঙ্গে কিছুই পেতে বা অধিকার পেতে চাই না। হে সাম্য প্রচারকগণ! তোমাদের পৌরুষহীন স্বৈরতন্ত্রী উন্মত্ততাই তোমাদের নিজেদের ভিতর থেকেই এসব সাম্যের চীৎকার পাড়ছে।" প্রকৃতি নিজেই সাম্যের বিরোধী—ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত আর প্রজাতিগত বৈপরিত্যই প্রকৃতির প্রিয়। সমাজতন্ত্র জীব-বিজ্ঞানেরও বেলাপ—বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় উচচশ্রেণী নিম্নশ্রেণী, গোষ্ঠী, প্রজাতি বা ব্যক্তিকে ব্যবহার করে থাকে। সব প্রাণীই সুবিধা গ্রহণকারী আর শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে অন্য প্রাণীর উপর নির্ভর করে—বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে খেয়ে ফেলে জীবনের এ তো ইতিহাস। সমাজতন্ত্র মানে ঈর্ষা: "আমাদের যা আছে তারা শুধু তার কিছু ভাগ পেতে চায়।" যাই হোক এ আন্দোলনকে সহজেই বাগে আনা যায়। একে দমনের জন্য দরকার শুধু মাঝে মাঝে প্রভু-ভৃত্যের চোরা-দুয়ারটা খুলে দিয়ে অসন্তুষ্টদের স্বর্গে প্রবেশের অধিকার দেওয়া। নেতাদের ভয় করার কোন কারণ নেই—ভয়ে তারা নীচে পড়ে আছে আর ভাবছে বিপ্লবের দ্বারা তারা বশ্যতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে, যে বশ্যতা হচ্ছে তাদের অযোগ্যতা আর আলস্যের স্বাভাবিক ফল। তবে দাস-শ্রেণীর যা কিছু মহত্ত্ব তা একমাত্র বিদ্রোহের সময়েই দেখা যায়।

তবুও দাসেরা তাদের বর্তমান মনিব, বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে অনেক মহৎ। অর্থবানদের এতখানি পূজা আর ঈর্ষা এ উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির এক বিশেষ দুর্বলতা। এসব ব্যবসায়ীরাও দাস ছাড়া আর কিছু নয়—রুটিনেরই খেলার পুতুল, ব্যস্ততারই শিকার—নতুন কোন চিন্তা করার অবসরই নেই এদের, চিন্তা করাই যেন এদের কাছে নিষিদ্ধ, মানসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ এদের নাগালের বাইরে। এ কারণেই এরা এত অস্থির আর অনবরতই সন্ধান করে ফিরছে "সুখের"। তাদের বড় বড় প্রাসাদে তারা খুঁজে পায় না বাড়ির আনন্দ, তাদের ইতর বিলাসিতায় কোন রুচির পরিচয় নেই, তাদের দাস উল্লিখিত মূল চিত্রের' যে ছবির গ্যালারি, তাদের ইন্দ্রিয়জ আমোদ-প্রমোদ মনকে সজীব বা উদ্দীপিত করার চেয়ে বরং নিস্তেজ করে দেয়। "এসব ফাঁকা লোকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো। তারা ধন সঞ্চয় করে বটে কিন্তু তার ফলে দিন দিন হয়ে পড়ে দরিদ্রতর।" আভিজাত্যের সবরকম বাধা আর সংযম তারা স্বীকার করে নেয় কিন্তু মনের রাজ্যে প্রবেশ করলে যে ক্ষতিপূরণ সাধিত হতো তা আর করে না। "এ ত্বরিৎগতি বানরেরা কিভাবে উপরের দিকে আরোহণ করছে দেখো! এরা একের উপর একে চড়ে বসছে। ফলে নিজেদেরই টেনে নামাচ্ছে কাদায় আর গর্তে......এদের গায়ে দোকানদারী দুর্গন্ধ, দুরাশায় এরা কিলবিল করছে, এদের নিশ্বাসেই ঝরছে পাপ।" এ সব লোকের টাকা থাকার কোন মানে হয় না কারণ সৎ প্রয়োগের দ্বারা অর্থকে তারা কোন মর্যাদাই দিতে জানে না, জানে না কি ভাবে করতে হয় সাহিত্য আর শিল্পের সুচিন্তিত পৃষ্ঠপোষকতা। "একমাত্র মননশীল মানুষই সম্পদের মালিক হওয়া উচিত।" অন্যরা সম্পদকেই লক্ষ্য মনে করে বসে, ফলে উত্তরোত্তর বেপরওয়াভাবে তার সন্ধান করতে থাকে। "জাতি-সমূহের বর্তমান পাগলামি লক্ষ্য করে দেখো, এরা চায় যতদূর সম্ভব শুধু উৎপাদন করা, যতদূর সম্ভব ধনী হওয়া।" শেষে মানুষ পরিণত হয় শিকারী পাখীতেঃ "এরা একে অপরের অপেক্ষায় ওৎপেতে থাকে। মিথ্যার আড়াল দিয়ে একে অপরের থেকে সংগ্রহ করে পণ্য। এ সবকেই ওরা বলে কিনা সৎ প্রতিবেশীপরায়ণতা......সব রকম জঞ্জাল-স্তূপ থেকে-ও এরা কিছু না কিছু লভ্যাংশ পেতে চায়।" "আজকের দিনের বণিকি নৈতিকতা দস্যু-নৈতিকতার এক মার্জিত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়—সস্তার বাজারে কিনে চড়া বাজারে বিক্রয় করা। এসব লোকেরই সোচচার দাবী আমাদের ব্যবসায়ে 'হস্তক্ষেপ করো না', আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও। অথচ এসব লোকের কাজ-কর্মের পরিদর্শন আর এদেরে কর্তৃত্বাধীনে রাখা অধিকতর প্রয়োজন। বিপজ্জনক হলেও এখানে বোধহয় খানিকটা সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে।" যানবাহন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ব্যবসার যত সব শাখাপ্রশাখায় প্রচুর ধনসঞ্চয়ের সুযোগ আছে তার কর্তৃত্ব আমাদের হাতে নিতে হবে, বিশেষ করে অর্থের বাজার। এর উপর ব্যক্তিগত বা বে-সরকারী কোম্পানী মালিকানা রাখা চলবে না। যারা নিঃস্ব তাদের উপর যেমন নজর রাখতে হবে তেমনি নজর রাখতে হবে বড্ডবেশী ধনীদের উপরও কারণ এরা সমাজের বিপদ সংকেত।”

সৈনিকের আসন হলো বুর্জোয়াদের উপরে কিন্তু অভিজাতদের নীচে। যে সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পরিচালিত করে, যেখানে তারা এক বেদনাহর গৌরবের নেশায় সানন্দে প্রাণ দেয়—সে সেনাপতি যে মানব তার মুনাফা-যন্ত্রে মানুষকে নিষ্পেষণ করে তার চেয়ে অনেক মহত্তর। দেখা যায় বেশ আনন্দের সাথে মানুষ কারখানা ছেড়ে এগিয়ে যায় মৃত্যু-ভূমির দিকে। নেপোলিয়ন কসাই ছিলেন না বরং ছিলেন উপকারী। তিনি মানুষকে আর্থিক সংঘর্ষণে মৃত্যুর বদলে দিয়েছেন সামরিক গৌরব মণ্ডিত মৃত্যু। তাঁর মারাত্মক ধ্বজার নীচে মানুষ যে দলে দলে এসে জমায়েত হতো তার কারণ মানুষ আর এক লাখ বোতাম-তৈরীর যে এক অসহ্য নিরানন্দ একঘেঁয়েমী তার থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ঝুঁকি অধিকতর কাম্য মনে করতো। “একদিন নেপোলিয়নকে এ সম্মান দেওয়া হবে যে তিনিই অন্তত: একবারের জন্য ব্যবসায়ী আর নির্বীয্য মানুষের উপরে যোদ্ধা-মানুষকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।” যে সব জাতি দুর্বল, সুখান্বেষী আর ঘৃণার্হ হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য যুদ্ধ এক চমৎকার প্রতিকার —শান্তির সময় মানুষের যে সব বৃত্তি পচে গলে যায় যুদ্ধের সময় তা আবার সতেজ আর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক মেয়েলিভাবের প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ আর সার্বিক সামরিক কর্ম।” যখন কোন সমাজের সহজাত বৃত্তি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ আর বিজয়ের বিরোধী হয়ে পড়ে তখন শুরু হয় তার পতন—তখনই সে সমাজ হয়ে পড়ে গণতন্ত্রের উপযুক্ত ক্ষেত্র আর দোকান-দারদের শাসনের উপযোগী।” যাই হোক আধুনিক যুদ্ধও যে কোন মহৎ কারণে ঘটে তা নয়—বন্দুক-কামানের সাহায্যে বৈষয়িক ঝগড়া নিষ্পত্তির চেয়ে ধর্মীয় আর সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ অনেকটা ভালো।” পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এ সব কোলাহলী সরকারগুলো (য়ূরোপীয় গণতন্ত্রের কথাই বলা হচ্ছে) বিশ্ববাজার নিয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধ আর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।” হয়তো সে মত্ততা থেকেই জন্ম নেবে য়ূরোপীয় ঐক্য—এ মহান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্যের খাতিরে এক বাণিজ্যিক যুদ্ধ ও খুব বেশী মূল্য দেওয়া বলে গণ্য হবে না। কারণ একমাত্র ঐক্যবদ্ধ য়ুরোপ থেকেই এমন এক উচচাঙ্গের আভিজাত্যের উদ্ভব সম্ভব যার দ্বারা য়ুরোপকে যাবে বাঁচানো।

রাজনীতির প্রধান সমস্যা বণিকশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা দেওয়া। যে বনিয়াদী অভিজাতের দেশ-শাসনের শিক্ষা আর দক্ষতা রয়েছে তার মতো উদার ও দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন এরা নয়—এরা অত্যন্ত হ্রস্ব-দৃষ্টি আর সংকীর্ণমনা রাজ-নীতিবিদ। মার্জিত রুচিবানদের রয়েছে দেশ-শাসনের ঐশী অধিকার অর্থাৎ উন্নততর যোগ্যতার অধিকার। সরল সাধারণ মানুষেরও স্থান আছে তবে তা সিংহাসনের উপর নয়। স্বস্থানে এসব সরল মানুষও সুখী আর নেতাদের মতো তার গুণাবলীও সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক: "মাঝারিপনা যে খুব একটা বাধা একথা মনে করা গভীরমনাদের পক্ষে নেহাৎ অসঙ্গত।" শ্রম, মিতব্যয়িতা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিমিতিবোধ, দৃঢ় আস্থা—এসব গুণের চর্চা করে মাঝারি মানুষ নিখুঁত হতে পারে তবে নিখুঁত হবে স্রেফ হাতিয়ার হিসেবে। "উচচ সভ্যতা হচ্ছে পিরামিডের মতো—তা দাঁড়াতে পারে প্রশস্ত ভিতের উপর, তার পূর্বশর্ত হচ্ছে মজবুত আর দৃঢ়ভাবে সংহত মাঝারিপনা।" সবসময় আর সর্বত্র কেউ কেউ হবে নেতা আর কেউ কেউ হবে অনুবর্তী—উচচতর মানুষের মননশীল পরিচালনাধীনে কাজ করতে অধিকাংশ মানুষ বাধ্য হবে আর তাতে তারা থাকবে সন্তুষ্ট।

"জীব-জগতের সর্বত্র আনুগত্যের স্বর আমি শুনতে পাই। সব প্রাণীর মধ্যেই বিরাজ করছে আনুগত্য। দ্বিতীয়তঃ নিজের প্রতি নিজে যে অনুগত থাকতে পারে না সে অপরের আদেশে পরিচালিত হবেই। জীবিত প্রাণীর এও এক স্বভাব। তৃতীয়তঃ আদেশ পালনের চেয়ে আদেশ দান অধিকতর কঠিন। শুধু তা নয় অনুগতদের সব দায়িত্বভারও আদেশদাতাকেই বহন করতে হয়—এ ভার সহজেই তার ভেঙে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সব কর্তৃত্বের মধ্যেই আমি দেখি একটা বিপদ আর সচেষ্টতা বিদ্যমান। যখনই জীবিতপ্রাণী কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিপদের ঝুঁকিও সে মাথায় তুলে নেয়।"

আদর্শ সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত: উৎপাদক (কৃষক, মজুর আর বণিক), আমলা (সৈনিক আর প্রশাসক) আর শাসক। শেষোক্তরা শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন করবে কিন্তু তারা সরকারী পদ গ্রহণ করবে না—দৈনন্দিন সরকার পরিচালনা ত হাতেকলমে কাজ করার ব্যাপার অর্থাৎ দৈহিক শ্রম। শাসকরা সরকারী পদাধিকারী না হয়ে তাদের হওয়া উচিত দার্শনিক রাজনীতিক। তবে তাদের ক্ষমতা সীমিত থাকবে রাষ্ট্রের ধন আর সৈন্যবাহিনী শাসনেই, কিন্তু তাদের নিজের জীবন-যাত্রা হবে অনেকখানি সৈনিকের মতো, পুঁজিপতির মতো নয় কিছুতেই। তারা হবে আবার প্লেটোকল্পিত অভিভাবক। প্লেটোর কথাই সত্য : দার্শনিকরাই সর্বোত্তম মানুষ। তাঁরা শুধু যে মার্জিত-রুচি তা নয় তাঁরা সাহস আর শক্তিরও অধিকারী—একাধারে পণ্ডিত আর সৈন্যাধ্যক্ষ। তাদের মধ্যে সম্মিলিত হবে ভদ্রতা আর সংঘশক্তি : "এসব লোককে নৈতিকতা, শ্রদ্ধা, রেওয়াজ, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি দিয়ে কঠোরভাবে সীমিত রাখতে হবে, তার চেয়েও বেশী পারস্পরিক পর্যবেক্ষণ আর পারস্পরিক ঈর্ষার দ্বারা। অন্যদিকে একে অন্যের প্রতি ব্যবহারের বেলায় বিবেচনা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, বিনয়, গৌরব আর বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী হতে হবে তাদের।" এ আভিজাত্য কি শ্রেণীগত আর তার ক্ষমতা কি উত্তরাধিকার মূলক হবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হবে—সময় সময় অবশ্য নতুন রক্তের প্রবেশাধিকার দিতে হবে। ইংরেজ অভিজাতদের অনুকরণে ধনী ইতর-দের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে আভিজাত্যকে কলুষিত আর দুর্বল করে ফেলার আর কিছুই নেই, এরকম আন্তর্বিবাহই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক সংস্থা—অভিজাত রোমান সিনেটের ধ্বংসের কারণ। "আকস্মিক জন্ম" বলে কিছু নেই, প্রত্যেকটি জন্মই বিয়ের উপর প্রকৃতির রায়, বহু বংশের নির্বাচন আর প্রস্তুতির ফলেই নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ মানুষের আবির্ভাব ঘটে—"প্রত্যেক মানুষ এখন যা তার জন্য তার পূর্বপুরুষ মূল্য দিয়েছে।"

আমাদের দীর্ঘ অভ্যস্ত গণতান্ত্রিক কানে এ সব কি বেসুরো শোনাচ্ছে? কিন্তু "যে সব জাতি এ দর্শন সহ্য করতে নারাজ তাদের ধ্বংস অনিবার্য আর যারা এ দর্শনকে মনে করবে শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদ তারাই লাভ করবে বিশ্বের প্রভু হওয়ার ভাগ্য।" একমাত্র এরকম আভিজাত্যই য়ুরোপকে এক জাতিতে পরিণত করার স্বপ্ন আর সাহস সঞ্চারিত করতে পারবে—খতম করে দিতে পারবে এসব গৃহপালিত জাতীয়তা আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিখণ্ডীকরণ। আমাদের 'সৎ য়ুরোপীয়' হওয়া উচিত, যেমন সৎ য়ুরোপীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন নেপোলিয়ন, গ্যেটে, বিঠোফেন, শোপেনহাওয়ার, স্তাঁদাল (Stendhal) আর হেইনে (Heine)। দীর্ঘকাল আমরা খণ্ড খণ্ড হয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো হয়ে আছি, যা সহজে একত্র হয়ে এক অখণ্ড রূপ গ্রহণ করতে পারতো। এমন স্বাদেশিক সংস্কার আর সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার আবহাওয়ায় কি করে এক মহৎ সংস্কৃতির উদ্ভব সম্ভব? ক্ষুদ্র রাজনীতির দিন গত হয়েছে—এখন দাবী এসেছে বৃহৎ রাজনীতির। কখন নতুন জাতি আর নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটবে? কখন য়ুরোপের হবে নবজন্ম?

"আমার সন্তানদের সম্বন্ধে তুমি কিছুই কি শোননি? আমার বাগান, আমার স্বর্ণ-দ্বীপপুঞ্জ আর আমার সুশ্রী নবজাতির কথা আমাকে শোনাও। তাদের জন্যই আমি ধনী, তাদের জন্যই আমি হয়েছি দরিদ্র......আমি কিনা ত্যাগ স্বীকার করেছি? শুধু একটিমাত্র কাম্যের জন্য আমি কিনা ত্যাগ করতে প্রস্তুত: ঐসব শিশু, ঐ সজীব উদ্যান আর আমার মহত্তম সঙ্কল্প আর মহত্তম আশার ঐ সব জীবন-তরুর জন্য?"

AMARBOI.COM

৯. সমালোচনা

এ এক চমৎকার কাব্য। সম্ভবতঃ দর্শনের চেয়েও এ এক কবিতা। আমরা জানি বহু অসম্ভব উক্তি এখানে স্থান পেয়েছে—নিজেকে সংশোধন আর নিজের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু প্রতি পংক্তিতে তিনি যে বেদনাবোধ করছেন তাও আমাদের নজর এড়ায় না। তাঁর সঙ্গে মতভেদ থাকলেও তাঁকে না ভালোবেসে আমরা পারি না। সময় বিশেষে অতিমাত্রায় ভাবালুতা আর বিভ্রান্তির ফলে আমরা ক্লান্তিবোধ করে থাকি, উপভোগ করে থাকি সংশয় আর প্রত্যাখ্যানের দংশন। এবং তখনই নীট্‌শে নিয়ে আসি এক সঞ্জিবনী শক্তি—দীর্ঘ উৎসব শেষে গির্জার ভিড় পেরিয়ে উন্মুক্ত স্থান আর নির্মল হাওয়ায় বেরিয়ে আসার মতই। "আমার লেখার আবহাওয়ায় যিনি নিশ্বাস নিতে অভ্যস্ত তিনি জানেন এ উচ্চভূমির হাওয়া অত্যন্ত পুষ্টিকর। এর জন্য প্রস্তুতি চাই—না হয় তার মৃত্যুর কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এর।"
কেউ যেন ভুল করে একে শিশু-দুগ্ধের অম্ল মনে করে না বসেন।

আর কি অদ্ভুত রচনা-শৈলী! "জার্মেন ভাষায় যাঁরা লিখেছেন তার মধ্যে হেইনে (Heine) আর আমি হচ্ছি শ্রেষ্ঠতম শিল্পী, আমরা যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তম রচনা রেখে গেলাম যে কোন জার্মেন আমাদের পেছনে বহুদূর অতিক্রম করতে পারবেন।" প্রায় তাই। তিনি বলেছেন: "আমার রচনাশৈলী নৃত্যের তালে চলে।" তাঁর প্রত্যেকটা বাক্যই যেন এক একটা বল্লম। ভাষা কোমল, সতেজ আর অস্থির—রচনাশৈলী অসি-যোদ্ধার, সাধারণের চোখের পক্ষে অতি দ্রুত আর বেজায় উজ্জ্বল। কিন্তু তাঁকে ভালো করে অধ্যয়নের পর বুঝতে পারা যায় এ ঔজ্জ্বল্য আর চাক-চিক্যের কিছুটা কারণ অতিরঞ্জনের ফল, তাঁর স্নায়বিক অহংবোধ আর প্রচলিত সব ধ্যানধারণার প্রতি তাঁর অতি সহজ-বিরুদ্ধতা। সব পুণ্য ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা আর পাপের প্রশংসা এসবও তাঁর রচনাকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়, কলেজীয় ছাত্রের মতোই যে কোন বিষয়ে তাক লাগাতে পারলেই তিনি যেন খুশী হতেন। ধরে নেওয়া যায় নৈতিকতার প্রতি কোন পক্ষপাত না থাকলে যে কেউই হয়তো সহজে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। এভাবে অনড় ধর্মবিশ্বাসের মতো দাবী, এভাবে অসং-শোধিত সাধারণীকরণ, এসব ধর্মপ্রচারণী পুনরাবৃত্তি, অত সব স্ববিরোধিতা, অপরের যেমন নিজের বেলায়ও যা কম নয়—সব মিলে এমন এক মনের উদঘাটন ঘটে যা হারিয়ে বসেছে ভারসাম্য আর হয়তো পৌঁছে গেছে পাগলামির কাছাকাছি অবস্থায়। শেষ পর্যন্ত এত সব ঔজ্জ্বল্যও মাংসের উপর চাবুকের আঘাত বা সোচ্চার আলাপের মতো আমাদের মনে ক্লান্তি নিয়ে আসে আর স্নায়ুকে অবশ করে ছাড়ে। এ সব কঠোর উক্তিতে মনে হয় একরকম টিউটনিক দণ্ডেরই ঘটেছে প্রকাশ, শিল্পের যে প্রথম শর্ত আত্মসংযম তার কোন পরিচয় নেই—পরিণতিবোধ, সঙ্গতি আর বিতর্কমূলক নাগরিকতা ইত্যাদি যে সব গুণ ফরাসীদের মধ্যে দেখে তিনি প্রশংসামুখর ছিলেন তা তাঁর রচনায় অনুস্থিত। তবুও স্বীকার করতে হবে তিনি অত্যন্ত শক্তিমান রচনাশৈলীর অধিকারী ছিলেন—তাঁর আবেগ আর পুনরুক্তিতে আমরা অভিভূত না হয়ে পারি না। নীটশে কিছু প্রমাণ করতে বসেন না, তিনি ঘোষণা করেন, করেন উদঘাটন। যুক্তির চেয়ে কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়েই তিনি আমাদের জয় করে নেন। তিনি যে শুধু আমাদের একটি দর্শন বা একটি কবিতা প্রদান করেন তা নয় তার সঙ্গে তিনি আমাদের দেন এক নতুন বিশ্বাস, এক নতুন আশা, এক নতুন ধর্মও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি যে রোমান্টিক আন্দোলনের সন্তান একথা তাঁর চিন্তা আর রচনাশৈলীতেই প্রকাশ। তাঁর নিজের জিজ্ঞাসা : "একজন দার্শনিকের প্রথম আর শেষ প্রয়োজন কি? নিজের অন্তরে নিজের যুগকে অতিক্রম করে যাওয়া, হওয়া 'কালাতীত'।" এটি পূর্ণাঙ্গতা অর্জনেরই এমন এক নির্দেশ যা তিনি নিজে যত না পালন করেছেন তার চেয়ে লংঘন করেছেন বেশী। তিনি যুগধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাতে পরিপূর্ণ অবগাহন করে। তিনি মোটেও উপলব্ধি করেননি কাণ্টের মন্ময়তা, যাকে শোপেন-হাওয়ার বেশ সততার সঙ্গে "আমার ভাবটাই পৃথিবী"—এ বলে অভিহিত করেছেন। বোঝেন নি কি করে ফিখ্‌টেকে (Fichte) "পরম অহং-এ,' আবার স্টার্নারকে (Stirner) ভারসাম্যহীন ব্যক্তিত্ববাদে পোঁছালো যা শেষ গিয়ে ঠেকলো অতিমানবের নীতিহীনতায়। অতিমানব কিন্তু শোপেনহাওয়ারের "প্রতিভা", কার্লাইলের "বীরপুরুষ" বা ওয়েগনারের "সীগফ্রিড্‌" নয়—তাঁর দৃষ্টি শীলারের কার্ল মূর (Karl Moor) আর গ্যেটের গউজের (Gotz) মতো সন্দিগ্ধ। তরুণ গ্যেটে থেকে নীট্‌শে 'পূর্ণ মানুষ' এ শব্দের অনেক বেশী গ্রহণ করেছিলেন অথচ গ্যেটের শেষজীবনের হিমালয়-সদৃশ শান্ত-গাম্ভীর্যকে নীটশে সহিংসনিন্দা করতেও ছাড়েননি। তাঁর চিঠিগুলি কিন্তু রোমান্টিক আবেগ আর কোমল অনুভূতিতেই পূর্ণ। হেইনের চিঠিতে যেমন "আমি মরছি" এ কথার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় তেমনি নীটশের চিঠিতে বারে বারে পুনরুক্তি ঘটেছে "আমি যন্ত্রণা ভোগ করছি" এ কথার। তিনি নিজেকে "মিষ্টিক আর প্রায় পুরোহিত" বলে অভিহিত করতেন আর তাঁর "The Birth of Tragedy কে অভিহিত করতেন "এক রোমান্টিকের স্বীকারোক্তি" বলে। তিনি ব্রেনডেসকে (Brendes) লিখছেন : "আমার আশঙ্কা, আমি এত বেশী সংযত যে আমার পক্ষে হয়তো পরিবর্তনশীল হওয়া হবে না।" "লেখা যখন কথা বলতে শুরু করে তখন গ্রন্থকারকে চুপ থাকতে হয়"— কিন্তু নীটশে নিজে কখনো আত্মগোপন করেননি বরং প্রতি পৃষ্ঠায় দ্রুত শুরু করে দেন প্রথম পুরুষে কথা বলতে। চিন্তার চেয়ে সহজাত-বৃত্তির, সমাজের চেয়ে ব্যক্তির, 'এপোলীয় আদর্শ' থেকে 'ডায়োনিসীয়' আদর্শের (অর্থাৎ ক্যলামিকের চেয়ে রোমান্টিকের) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখের মতই তাঁর কালের এক সুনির্দিষ্ট পরিচয় বহন করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগীতের ক্ষেত্রে ওয়েগনার যেমন দর্শনের ক্ষেত্রে তেমনি নীটশে তাঁর যুগ-প্রতিনিধি—তাঁরা ছিলেন রোমান্টিক আন্দোলনের চরম পরিণতি, রোমান্টিক ভাবধারার ভরা জোয়ার। সব রকম সামাজিক বাধার হাত থেকে তিনি শোপেনহাওয়ারের 'সঙ্কল্প' আর 'প্রতিভা'কে মুক্তি দিয়েছিলেন যেমন ওয়েগনার ক্যলসিকের বন্ধন ছিড়ে আবেগকে দিয়েছিলেন মুক্তি, তুলে ধরেছিলেন মর্যাদার আসনে। রুশোর ভাবধারার তিনিই ছিলেন শেষ মহান বংশধর।

নীট্‌শের সঙ্গে যে পথ আমরা পার হয়ে এসেছি আবার সে পথে ফিরে যাবো এবং জানাবো আমাদের যা কিছু আপত্তি—যদিও তা নিষ্ফল। শেষ বয়সে অবশ্য তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন '**The Birth of Tragedy**' মৌলিকতার মূলে অনেক অসম্ভব কথার অবদান রয়েছে। উইলামাউফইজ-মলেনড্রটে্র (**Wilamowitz-Moellendroff**) মতো পণ্ডিতেরা বইটাকে ভাষাতত্ত্বের আদালত থেকে হৈসেই বিতাড়িত করেছেন। একিলাসের প্রভাবে ওয়েগনারের আবির্ভাব অনুমান-প্রচেষ্টা মানে স্বৈরতন্ত্রী দেবতার কাছে তরুণ পূজারীর আত্ম বলিদান। কে কবে ভেবেছিল যে 'সংস্কার আন্দোলন' ডায়েনিসীয়' অর্থাৎ বন্য, অনৈতিক, মদমাতাল আর নিষ্ঠুর, আর রেনেসাঁস ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ শান্ত, সংযত, অনুগ্র আর 'এপোলীয়' বলে? কে কবে সন্দেহ করেছিল যে "সক্রেটিয় চিন্তা হচ্ছে অপেরা সংস্কৃতি"? সক্রেটিসের প্রতি আক্রমণটা হচ্ছে নেহাৎ ওয়েগনারীয় যুক্তিবাদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা প্রদর্শনেরই ফল। ডায়েনিসাসের প্রতি উচ্ছ্বাস ও কর্ম-বিমুখের কর্মের প্রতি অতি-ভক্তির (নেপোলিয়নের প্রতি দেবত্বারোপও তাই) পরিচায়ক আর এক লাজুক চিরকুমারের তথ্যের পৌরুষেয় গ্রহণশীলতা ও যৌনতার প্রতি গোপন ঈর্ষা। প্রাক্-সক্রেটিস যুগ যে গ্রীসের সবচেয়ে সুখের দিন ছিল নীটশের এ মত হয়ত সত্য—নিঃসন্দেহ পেলোপনেলিয়ান (**Peloponnesiam**) যুদ্ধ এথেনীয় সংস্কৃতির স্বর্ণযুগের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বুনিয়াদ দুর্বল করে দিয়েছিল। সক্রেটিসকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনে করা এও কিছুটা অদ্ভুত (নীটশে নিজেও কি প্রধানত তাই ছিলেন না?)—দর্শনচর্চার ফলে যত না তার চেয়ে অনেক বেশী যুদ্ধ, দুর্নীতি আর অনৈতিকতার ফলে যে সমাজ ধ্বংস হচ্ছিল, তার পুনরুদ্ধারে সক্রেটিসের যে অবদান তা তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্যই করেননি। একমাত্র এক বিভ্রান্ত অধ্যাপকই হিরাক্লিটাসের (Heraclitus) ধোঁয়াটে আর অন্ধবিশ্বাসের খণ্ডিতরূপকে প্লেটোর বিজ্ঞতা আর সমুন্নত শিল্পের উপরে দিতে পারে স্থান। নীট্শে প্লেটোকে আমল দেননি যেমন তেমনি আমল দেননি তাঁর অন্য মহাজনদেরেও—ঘাতকের কাছে কেউই মহৎ নয়। থ্রেসিমেকাস (Thrasymachus) আর কেলিক্লেসের (Calliclus) নীতিকথা ছাড়া নীট্শের দর্শন আর প্লেটো-সক্রেটেসীয় রাজনীতি ছাড়া তাঁর নিজের রাজনীতিই বা কি? অত সব ভাষাতত্ত্ব সত্ত্বেও নীটশের পক্ষে গ্রীক-আত্মায় প্রবেশ সম্ভব হয়নি, এ শিক্ষা তাঁর কোনদিন হয়নি যে পরিমিতিবোধ আর আত্মজ্ঞানের (যে শিক্ষা বড় বড় দার্শনিকেরা দিয়ে গেছেন আর যা লেখা রয়েছে ডেলফি শিলালিপিতে) বাঁধ অত্যাবশ্যক—প্রবৃত্তি আর কামনার আগুনকে নির্বাপিত না করেও এ বাঁধ দেওয়া যায়। এপোলোর সাহায্যেই ডায়েনিসেসকে রাখতে হয় দমিয়ে। কেউ কেউ নীটশেকে পৌত্তলিক বা প্রকৃতি-পূজারী বলেছেন—কিন্তু তিনি তা ছিলেন না, পেরিক্লিসের মতো গ্রীক বা গ্যেটের মতো জার্মান প্যাগান তিনি নন। যে পরিমিতিবোধ আর সংযম জুগিয়েছিল এদের শক্তি তা তাঁর ছিল না। তিনি লিখেছেন: "যে প্রশান্তি অপরিহার্য শর্ত মানুষকে আমি আবার তা ফিরিয়ে দেবো"—কিন্তু হায়, যার যা নেই তা তিনি অন্যকে কি করে দেবেন।

তাঁর অন্য সব রচনার তুলনায় একমাত্র জরোথুস্ত্রোই সমালোচনার দিক থেকে নিরাপদ, প্রথমত তা দুর্বোধ্য, দ্বিতীয়ত তাতে এমন অক্ষয় গুণ রয়েছে যা ছিদ্রান্বেষীদেরও স্তব্ধ করে দেয়। চিরন্তন পুনরাবৃত্তি কথাটা যদিও 'এপোলীয়', স্পেন্সার আর 'ডায়েনিসীয়' নীট্শের মধ্যেও সমানে দেখা যায়, মনে হয় এ এক অস্বাস্থ্যকর কল্পনা, অমরতাবাদকে বাঁচাবার এ এক শেষ চেষ্টা মাত্র। প্রত্যেক সমালোচকই অহংপ্রচারের দুঃসাহস (জরোথুস্ত্রো "অহংকে অখণ্ড আর পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন আর স্বার্থপরতাকে বলেছেন আশীর্বাদস্বরূপ"—স্টার্নারের প্রতিধ্বনি) আর অতিমানবের প্রস্তুতির জন্য আত্মত্যাগ আর পরোপকারের আবেদনে এক স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এ দর্শন অধ্যয়নের পর কি কেউ নিজেকে অতিমানব না ভেবে সামান্য একজন চাকর ভাবতে যাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈতিক পদ্ধতির আলোচনা হিসেবে তাঁর 'Beyond good and Evil' আর 'Genealogy of Morals'-এ যথেষ্ট উদ্দীপনাময় অতিরঞ্জন স্থান পেয়েছে—মানুষকে আরো সাহসী আর তার নিজের উপর আরো কঠোর হওয়ার প্রয়োজন স্বীকার্য আর অন্য সব নৈতিক দর্শনও সে দাবীই জানিয়েছে, তবে মানুষের আরো নিষ্ঠুর আর আরো বদ্ হওয়ার তেমন কোন জরুরী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নৈতিকতা সবলকে দমিয়ে রাখার দুর্বলের অস্ত্র মনে করারও কোন কারণ নেই। সবলেরা ওতে মোটেও প্রভাবিত হয় না বরং তার ব্যবহারে তারা দিয়ে থাকে বেশ চাতুর্যের পরিচয়। সব নীতিই উপরের থেকে চাপানো, তার উদ্ভব নীচে থেকে কখনো নয়—জনতা গৌরব মর্যাদার অনুকরণ করে থাকে কোন কিছুর প্রশংসা কি নিন্দার দ্বারাই। অতি-বিনয় মাঝে মাঝে দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়া ভালো, প্রবীণ কবির ভাষায় "দীর্ঘকাল ধরে আমরা বড্ড বেশী প্রার্থনা আর মাথা নত করে এসেছি"। কিন্তু আধুনিক চরিত্রে এগুণের তেমন মাত্রাধিক পরিচয় লক্ষ্যগোচর নয়। দর্শনের ব্যাপারে যে ঐতিহাসিকবোধের তিনি এত প্রশংসা করেছেন এখানে তাঁর বেলায় তার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। না হয় বর্বরদের যে নৃশংসতা আর সামরিক শক্তি, প্রাথমিক খ্রীস্টীয় যুগের যে সংস্কৃতি থেকে নীট্‌শে বার বার শক্তি আর প্রেরণা আহরণ করেছেন, নিয়েছেন যাতে আশ্রয় তার ধ্বংসের কারণ হয়েছে যা তার বিষঘ্ন হিসেবেই তিনি বিনয় আর নম্রতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারতেন। এভাবে বেপরওয়া শক্তি আর আন্দোলনের উপর জোর দেওয়া এক বিশৃঙ্খল যুগেরই প্রতিধ্বনি। এ যে 'ক্ষমতার বাসনা'কে সার্বজনীন মনে করা হয়েছে তাতে হিন্দুর স্থৈর্য, চীন দেশীয় মানুষের শান্তি অথবা মধ্যযুগীয় কৃষকের সন্তুষ্ট নিয়মানুবর্তিতার কোন প্রকাশ নেই। আমাদের আদর্শ ক্ষমতা বটে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ পেতে চায় শান্তি আর নিরাপত্তা।

নীট্‌শে সামাজিক বৃত্তির মূল্য আর স্থান মোটেও উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর ধারণা দর্শনের সাহায্যে শুধু অহংবোধ আর ব্যক্তিমুখীন প্রেরণাগুলোকেই সবল করে তুলতে হবে। দেখে অবাক হতে হয় যখন সমগ্র য়ূরোপ এক স্বার্থবাদী যুদ্ধের পঙ্কে ডোবে—যে সাংস্কৃতিক অভ্যাস আর সম্পদের নীট্‌শে ছিলেন ভক্ত, যার আয়ু নির্ভরশীল ছিল সহযোগিতা, সামাজিক উপকরণ আর আত্মসংযমের উপর তা একদম ভুলে

৩৪—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসেছিল। তখন কোথায় ছিল নীট্‌শের চোখ। খ্রীস্টধর্মের প্রধান কাজ মানুষের ভিতরকার স্বাভাবিক বর্বরতাকে সুকোমল বিনয়ের দ্বারা সংযত করা—যাঁরা মনে করেন অহংবোধের সীমা ছাড়িয়ে খ্রীস্টীয় গুণাবলীর বাড়াবাড়ি মানুষকে কলুষিত বা বিকৃত করেছে তাঁরা একবার নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখলে নিশ্চিন্ত বোধ করবেন।

রোগ আর অস্থির-স্বভাবের জন্য নিঃসঙ্গ থেকে তিনি মানুষের আলস্য আর মাঝারিপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছেন আর বাধ্য হয়েছেন সব মহৎ গুণের অধিকারী একমাত্র নিঃসঙ্গ মানুষ এরকম ধারণা পোষণ করতে। শোপেনহাওয়ার চেয়েছিলেন ব্যক্তির বিলয় ঘটুক প্রজাতিতে, এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ফলে নীট্‌শে চেয়েছেন সামাজিক শাসন-মুক্ত এক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির হোক উদ্ভব। প্রেমে নিষ্ফল হয়ে তিনি মেয়েদের বিরুদ্ধে চালিয়েছেন অ-দার্শনিকোচিত তিক্ত আক্রমণ যা পুরুষের পক্ষে অস্বাভাবিক। পিতৃত্ব আর বন্ধুত্ব হারিয়ে তিনি কখনো বুঝতে পারেননি জীবনের সুন্দরতম মুহূর্ত কর্তৃত্ব আর যুদ্ধের দ্বারা লাভ হয় না, লাভ হয় পারস্পরিকতা আর সখ্যতার দ্বারা। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না আর তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল না ব্যাপক—ফলে প্রবীণতায় পৌঁছে তাঁর অর্ধ-সত্যগুলো জ্ঞানে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়নি। হয়ত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে তাঁর নীরস আর বিশৃঙ্খল চিন্তারাশি সুসংগত দর্শনে রূপ নিতে পারতো। যিশু সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করেছেন তা তাঁর বেলায় অধিকতর সত্য: "বড্ড অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, পরিণত বয়সে পৌঁছে তিনি যেসব মত প্রচার করেছেন তা হয়তো প্রত্যাহার করতেন। তাঁকে বাতিল করাও যথেষ্ট মহৎ কাজ।" কিন্তু মৃত্যুর ছিল অন্য পরিকল্পনা।

মনে হয় নীতির চেয়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি অধিকতর খাঁটি ছিল। আভিজাত্য যে আদর্শ সরকার তা কে অস্বীকার করবে? "প্রত্যেক জাতের মধ্যেই......যোগ্যতম, বিজ্ঞতম, বীরোত্তম আর শ্রেষ্ঠতম মানুষ আছেই, সবাই যখন ভালো, কাকে আমরা খুঁজে বের করে আমাদের রাজা করবো? কি উপায়ে তাঁকে আবিষ্কার করবো? দেবতারা কি দয়া করে সে উপায় বা কৌশলটা আমাদের শিখিয়ে দেবেন না? কারণ আমাদের তেমন মানুষের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।" কিন্তু কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বোত্তম? উত্তম কি শুধু বিশেষ বিশেষ পরিবারেই জন্ম নেয়? আমরা কি তাহলে আভিজাত্যের উত্তরাধিকার মেনে নেব? ঐ তো আমাদের ছিলো কিন্তু ফলে ষড়যন্ত্র, শ্রেণীদায়িত্বহীনতা আর অচলতাই হয়েছিল সৃষ্টি। আভিজাত্য ধ্বংস যেমন হয় তেমনি মধ্যবিত্তের সঙ্গে আন্তবিবাহের ফলে বেঁচেও যায়, তা না হলে ইংরেজ আভিজাত্য আজো বেঁচে আছে কি করে? হয়তো মিশ্র-প্রজনন পতনও নিয়ে আসে। আসলে এ জটিল সমস্যার বহুদিক রয়েছে যার সম্বন্ধে নীট্শে প্রচুর 'হ্যাঁ' আর 'না' বর্ষণ করেছেন। উত্তরাধিকার-আভিজাত্য মিলিত-বিশ্ব চায় না, তাদের প্রবণতা সংকীর্ণ জাতীয়তার দিকে—আচার ব্যবহারে তারা হয়তো সার্বজনীন হতেও পারে। জাতীয়তা ছাড়লে তাদের শক্তির মূল উৎস থেকেই তারা বঞ্চিত হবে—তখন চলবে না বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ে কারসাজি করা। হয়ত নীট্শের ধারণা মতো বিশ্বরাষ্ট্র সংস্কৃতির খুব সহায়ক হবে না, বিপুল জনতার গতি খুব মন্থর, জার্মেনি যখন শুধু "ভৌগলিক অভিব্যক্তি" হয়েই ছিল তখনই বোধ হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল অধিকতর ঐক্য, সাম্রাজ্য আর প্রসারের যুগ থেকে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ দরবারগুলোই শিল্প-কলার পৃষ্ঠপোষকতায় পরস্পর প্রতিযোগিতা করে তার বাড়বার সুযোগ দিতো বেশী। গ্যেটেকে কোন সম্রাট পোষণ করেননি তেমনি কোন সম্রাট উদ্ধার করেননি ওয়েগনারকেও।

উত্তরাধিকারী-আভিজাত্যের যুগই সংস্কৃতিরও মহৎ যুগ এ এক সাধারণ ভুল ধারণা। বরং বুর্জোয়া-সম্পদই পেরিক্লিস্ (Pericles), মেডিচি (Medici), এলিজাবেথ আর রোমান্টিক যুগের সাংস্কৃতিক-বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। সাহিত্য আর শিল্পের ক্ষেত্রে যা কিছু মৌলিক সৃষ্টি তা অভিজাত পরিবারের দ্বারা হয়নি, হয়েছে মধ্যবিত্ত-পরিবারের সন্তানদের দ্বারাই। সক্রেটিস ছিলেন এক ধাত্রী তনয়, ভল্টেয়ার ছিলেন এটর্নির সন্তান আর শেক্সপিয়র ত ছিলেন কশাইর ছেলে। যুগের আন্দোলন আর পরিবর্তনই দিয়ে থাকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব-সৃষ্টির প্রেরণা—যে সব যুগে এক নতুন শক্তিমান শ্রেণী ক্ষমতা আর গৌরবের আসন দখল করে তখনই সংস্কৃতি পায় অনুকূল পরিবেশ। রাজনীতির বেলায়ও তাই—আভিজাত্যের বংশগৌরব যার নেই তাকে রাষ্ট্রনীতি থেকে বাদ দেওয়া আত্মহত্যারই শামিল। উত্তম সূত্র হচ্ছেঃ "যেখানেই জন্মুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিভার জন্য সব পদের দরজা খোলা রাখা"—প্রতিভা প্রায় দূর দূরান্তে অজ্ঞাত স্থানেই জন্মগ্রহণ করে থাকে। সব রকম উত্তম ব্যক্তিদের দ্বারাই শাসিত হওয়া উচিত। আভিজাত্য যখন জন্মের উপর নির্ভর না করে যোগ্যতার উপর নির্ভর করে তখনই তা ভালো—উন্মুক্ত আর সকলের জন্য সমান সুযোগ এরকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা যদি আভিজাত্য নির্বাচিত আর প্রতিপালিত হতে থাকে তবে তা শ্রদ্ধেয়।

এসব বিয়োগের পর আর কি অবশিষ্ট থাকে? সমালোচকের অস্বস্তির আরো বহু কারণ থেকে যায়। সম্মানার্থীরা সবাই নীট্‌শেকে বাতিল করে ছেড়েছেন তবুও আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি স্মরণীয় স্তম্ভ হয়েই আছেন আর জার্মেন-গদ্যে আজো তিনি পর্বত-শৃঙ্গ। অবশ্য তিনি যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ভবিষ্যতে অতীতকে মানুষ 'প্রাক্-নীট্‌শে' আর 'উত্তর-নীট্‌শে' এ দুভাগে ভাগ করবে তখন অতিরঞ্জনের অপরাধে তাঁকে অপরাধী করা যায় বই কি। তবে যে সব প্রতিষ্ঠান আর ধ্যান-ধারণা এতকাল স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল সে সব সম্বন্ধে একটা সার্বিক সমালোচনামূলক মনোভাব সৃষ্টিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। গ্রীক-দর্শন আর নাটকের বেলায়ও তিনি খুলে দিয়েছেন এক নতুন বীথিকা, ওয়েগনারের সংগীতে যে রোমান্টিক অবক্ষয়ের বীজ নিহিত রয়েছে তাও সূচনায় তিনিই নির্দেশ করেছেন, মানব-স্বভাবকে তিনি অস্ত্র চিকিৎসকের চাকুর তীক্ষ্ণতা দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন—হয়তো তা হয়েছে তেমনি স্বাস্থ্যপ্রদও। নৈতিকতার এমন সব গোপন শিকড় তিনি উদঘাটন করেছেন যা ইতিপূর্বে কোন আধুনিক চিন্তাবিদই করেননি। আভিজাত্যেরও যে একটা মূল্য আছে, যা এতকাল নীতির রাজ্যে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল তা তিনিই প্রথম প্রচার করলেন। ডারউইনবাদের নৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সততার সঙ্গে চিন্তার প্রয়োজনকেও তিনি অপরিহার্য করে তুলেছেন। তাঁর যুগের সাহিত্যে তিনিই সব চেয়ে মহৎ গদ্যকাব্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। সর্বোপরি মানুষের যে মানুষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন এ বিরাট উপলব্ধিও তাঁর অবদান। তাঁর কথায় যথেষ্ট তিক্ততা আছে সত্য, কিন্তু তাতে এক অসাধারণ সততাও রক্ষিত হয়েছে। আধুনিক মনের মেঘ আর মাকড়সার জাল বিদীর্ণ করে তাঁর চিন্তা বিদ্যুতালোক আর ঝড়ের মতো সব কিছুকে স্বচ্ছ আর নির্মল করে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীট্শে লিখেছেন বলেই য়ুরোপীয় দর্শন আজ অধিকতর স্বচ্ছ আর তাজা হয়ে উঠতে পেরেছে।

১০. উপসংহার

"আমি এমন মানুষকে ভালোবাসি যে নিজেকে ছাড়িয়েও কিছু সৃষ্টি করেন আর তারপর হয়ে যান ধ্বংস।" এ হচ্ছে জরোথুস্ত্রোর উক্তি।

তাঁর চিন্তার তীব্রতাই যে তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ তাতে সন্দেহ নেই। নিজের কালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতেই তিনি মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। "নিজের যুগের নৈতিক ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সব সময় এক ভয়াবহ ব্যাপার—প্রতিশোধ না নিয়ে সে ছাড়ে না—বাইরে থেকে যেমন ভিতর থেকেও নেয় প্রতিশোধ।" শেষের দিকে নীট্শের লেখা অধিকতর তিক্ত হয়ে উঠেছিল। সমানে আক্রমণ চালিয়েছেন তিনি ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেমন ভাব বা আদর্শের বিরুদ্ধেও তেমনি—ওয়েগনার থেকে যিশুখ্রীস্ট কাউকেও ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি লিখেছেন: "তিক্ততা যে অনুপাতে হ্রাস পায় সে অনুপাতেই বাড়ে বিজ্ঞতা" —কিন্তু নিজের কলমকে তিনি পারেন নি আশ্বস্ত করতে। মন ভেঙে পড়ার পর তাঁর হাসিও হয়ে উঠেছিল স্নায়বিক। যে বিষ মনের তলায় তাঁকে ক্ষয় করে দিচ্ছিল তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এসব চিন্তায়: "হয়তো আমি ভালো করেই জানি প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই কেন হাসে, একমাত্র মানুষই এত সব অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে যে হাসি আবিষ্কার করতে সে বাধ্য হয়েছে।" রোগ আর ক্রমবর্ধমান অন্ধতা শারীরিক দিক থেকে তাঁর ভেঙে পড়ার কারণ। তিনি ভুগছিলেন আত্ম-নির্যাতন আর আড়ম্বরের এক রকম পাগলামিতে—তিনি তাঁর এক বই পাঠিয়েছিলেন টেইনেকে (Taine)—আর সঙ্গে লিখে পাঠিয়েছিলেন: এমন চমৎকার বই আর কখনো লেখা হয়নি। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'Ecce Homo'তেও তিনি প্রায় পাগলের মতই আত্ম-প্রশংসা-মুখর হয়েছেন। হায় 'Ecce Homo'তে আমরা আমাদের পরিচিত মানুষটিকেই ভালো করে দেখতে পাই।

হয়তো অন্যের কাছে আর কিছুটা প্রশংসা আর গুণগ্রাহিতা যদি তিনি পেতেন তা হলে ক্ষতিপূরণমূলক যে অহংবোধ তা নীট্শের মধ্যে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতো না, রক্ষা করতে পারতেন নিজের মানসিক স্বাস্থ্য, পরিপ্রেক্ষিতের উপলব্ধিও হতো স্পষ্টতর। কিন্তু কদর এলো অনেক দেরিতে। সবাই যখন তাঁকে অস্বীকার করেছে বা করেছে নিন্দা, তখন টেইনে উদারভাবে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন, ব্রেণ্ডেস্ লিখে পাঠালো তিনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নীট্‌শের 'আভিজাতিক প্রগতিবাদ' সম্বন্ধে অনেকগুলো বক্তৃতা দিচ্ছেন। স্ট্রিণ্ডবার্গ (Strindberg) লিখলেন নীট্‌শের ভাব অবলম্বনে তিনি লিখবেন নাটক। হয়তো সবচেয়ে উত্তম কাজ করে বসলেন এক বেনামা সমজদার, তিনি পাঠালেন চার শ' ডলারের এক চেক্। কিন্তু এসব আলো-কণা যখন এসে পৌঁছলো তখন নীট্‌শে প্রায় অন্ধ — দৃষ্টিশক্তিতে যেমন, অন্তরেও তেমনি। তখন তিনি সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "আমার দিন আসেনি, পরশুই আমার দিন।"

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাস, টুরিনে (Turin) মৃগী রোগের আকারে তাঁর উপর নেমে এলো শেষ আঘাত। তাঁর চিলেকোঠায় একদিন অন্ধের মতো পড়ে গেলেন—পাগলের মতো দ্রুত চিঠি লিখলেন: কসিমা ওয়েগনারকে লিখলেন এ চারটি শব্দ: "এরিয়াডনে, তোমাকে আমি ভালোবাসি।" ব্রেণ্ডেসকে কিছুটা বেশী লিখে সই করলেন: "ক্রস-বিদ্ধ"। বার্কহার্ড আর ওভারবেককে এমন অদ্ভুত চিঠি লিখলেন যে শেষোক্তজন তাঁর সাহায্যার্থে ছুটে এলেন। তিনি এসে দেখলেন নীট্‌শে বাহু দিয়ে পিয়ানোয় হাৎড়াচ্ছেন আর ডায়েনিসীয় উন্মত্ততার সাথে করছেন গান, আর কাঁদছেন।

তাঁরা তাঁকে প্রথমে এক অনাথাশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অনতি-বিলম্বে তাঁর বৃদ্ধা মা এসে তাঁকে দাবী করলেন আর নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে। অদ্ভুত এক দৃশ্য! এ ধার্মিক রমণী নিজ পুত্রের ধর্মত্যাগ কি অসীম ধৈর্য আর তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়েই না এতকাল সহ্য করেছেন— যা কিছু তাঁর প্রিয় সে সবকে আঘাত করেছেন তাঁর পুত্র, তবুও পুত্রকে তিনি কিছুমাত্র কম ভালোবাসতেন না—সেই পুত্রকে আজ তিনি আশ্রয় দিলেন তাঁর দুই বাহুর মধ্যে আর এক পবিত্রাত্মা যিশুমাতার মতো। তিনি মারা গেলেন ১৮৯৭তে—এবার নীট্‌শেকে তাঁর বোন নিজের কাছে ভাইমারে নিয়ে গেলেন। সেখানে ক্রেমারের করা তাঁর একটি প্রস্তর-মূর্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে—এতে ফুটে উঠেছে এককালের এক শক্তিশালী মন কি করে ভেঙে অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে সে করুণ দৃশ্য। তবুও তিনি ওখানে অসুখী ছিলেন না, সুস্থ অবস্থায় যে শান্তি আর নীরবতা তিনি পাননি এবার এখানে তা তাঁর করায়ত্ত—যে প্রকৃতি তাঁকে পাগল করে ছেড়েছে এবার সে প্রকৃতি যেন তাঁর প্রতি হয়েছে সদয়। তাঁকে দেখে দেখে তাঁর বোন একদিন কাঁদছিলেন—নীট্‌শে বুঝতে পারলেন না কেন এ কান্না। জিজ্ঞাসা করলেন: "লিসবেথ্, কেন কাঁদছো? আমরা কি সুখে নেই?" একবার কারা যেন বই সম্বন্ধে আলাপ করছিল, শুনে তাঁর পাণ্ডুরমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চোখে মুখে দেখা দিলো দীপ্তি, বলে উঠলেন: "আহ্, আমিও কিছু ভালো বই লিখেছিলাম"—কেটে গেলো সম্বিৎ ফিরে আসা মুহূর্ত।

মৃত্যু নেমে এলো ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। প্রতিভার জন্য এমন মূল্য কেউ বোধ করি আর দেয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম অধ্যায়

সমকালীন য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ
বার্গসঁ, ক্রোচে আর বার্ট্রাণ্ড রাসেল

১. হেনরী বার্গসঁ (Henry Bergson)

ক. জড়বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আধুনিক দর্শনের ইতিহাস মানে পদার্থ-বিজ্ঞান আর মনোবিদ্যার দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস! চিন্তার সূচনা তার উদ্দেশ্য নিয়েই আর অব্যাহত গতিতে তার চেষ্টা চলে নিজের অতীন্দ্রিয় বাস্তবকে বস্তুগত দৃশ্য আর যান্ত্রিক নিয়ম-কানুনের বৃত্ত-রেখায় নিয়ে আসতে অথবা নিজেকে নিয়েই হতে পারে তার শুরু তখন যুক্তি বা লজিকের অবধারিত প্রয়োজনে সে ভাবতে বাধ্য হবে যে সব কিছুই তার মনেরই রূপ আর সৃষ্টি। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে গণিত আর যন্ত্র-বিদ্যার অগ্রাধিকার, প্রয়োজনের প্রসারের সার্বজনিন চাপের ফলে শিল্প আর পদার্থ-বিদ্যার পারস্পরিক উদ্দীপনা কল্প-বিদ্যার ক্ষেত্রেও নিয়ে এসেছে এক জড়বাদী প্রেরণা ; ফলে সফলতম বিজ্ঞানই হয়ে পড়েছে দর্শনের আদর্শ। নিজের আত্ম-চেতনা থেকে উদ্ভূত হয়ে বহির্মুখী হবে দর্শনের পদচারণা দেকার্তের (Descartes) এ তাগাদা সত্ত্বেও পশ্চিম য়ুরোপের শিল্পায়ন চিন্তাকে চিন্তা-ছাড়া করে নিয়ে গেছে জড়-বস্তুর দিকে।

এ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর চরম প্রকাশ ঘটেছে স্পেন্সারীয় পদ্ধতিতে। যদিও তাঁকে "ডারউইনবাদের দার্শনিক" বলে অভিনন্দিত করা হয় আসলে তাঁর মধ্যে শিল্পায়নেরই প্রকাশ আর প্রতিফলন ঘটেছে বেশী। শিল্পকে তিনি যে গৌরব আর মহিমায় মণ্ডিত করেছেন আমাদের পশ্চাদ-দৃষ্টিতে তা আজ নেহায়েৎ অসম্ভব উক্তি বলেই মনে হচ্ছে। তাঁর মনোভাবই ছিল যন্ত্রবিদ্ আর ইঞ্জিনিয়ারের, মোটেও ছিল না জীবনের গতি বুঝতে সক্ষম জীব-বিদের মত। আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে জীব-বিদ্যা নিয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা। এর ফলেই স্পেন্সারের দর্শনের ঘটেছে দ্রুত অবলুপ্তি। এখন ক্রমবর্ধমান মনোভাব হচ্ছে বস্তুর নির্জীবতার চেয়ে জীবনের গতিতে বিশ্বের রহস্য আর তার সার-সন্ধান। আমাদের যুগে বস্তু নিজেই গ্রহণ করেছে জীবনকে—বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব আর ইলেকট্রন এসব পদার্থবিদ্যায় এনে দিয়েছে এক সজীবতা। কাজেই ইংরেজ চিন্তাবিদদের মনো-বিদ্যাকে পদার্থে পরিণত করার যে সচেতন উচচাকাঙক্ষা তার পরিবর্তে আমাদের গতি এখন জীবন্ত পদার্থ আর বিশুদ্ধ বস্তুর দিকে। আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শোপেনহাওয়ারই জীবনবোধকে শক্তির চেয়েও অধিকতর গুরুত্ব ও সার্বিক করার উপর দিয়েছিলেন জোর—আমাদের কালে বার্গসঁ এ ভাবটাকে গ্রহণ করে তাঁর সততা আর যুক্তিবলে এক সংশয়ী জগতকে প্রায় এ মতাবলম্বী করে তুলতে হয়েছেন সক্ষম।

বার্গসঁ-এর জন্ম ১৮৫৯ এ, প্যারীতে। পিতামাতার দিক থেকে তিনি ফরাসী য়ূহুদী। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন খুব মনোযোগী—পেয়েছেন ছাত্রজীবনের সব পুরস্কার। আধুনিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের অনুসারী হিসেবে তিনি সর্বাগ্রে গণিত আর পদার্থ বিদ্যায় হয়ে উঠেছিলেন বিশেষজ্ঞ, কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভা অনতিবিলম্বে তাঁকে নিয়ে হাজির করলো সব বিজ্ঞানের পেছনে যে পরাবিদ্যা বা তার সমস্যাবলী রয়েছে তার সামনে এবং সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হলেন তিনি দর্শনের দিকে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'Ecole Normale Superiere'-এ ভর্তি হন, সেখান থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভের পর দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন Clevmont Ferrand-এর Lycii নামক কলেজে। ঐখানেই ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর 'Time and Freewill' নামক (যার ফরাসী নাম 'Essai sur les donnecs immediates de la conscience) প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। নীরবে আটবছর কাটিয়ে দেওয়ার পর তাঁর দ্বিতীয় বই (যা সবচেয়ে কঠিন)—'Matiere et Memoire' প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮-তে তিনি তাঁর সাবেক কলেজ "Ecole Normale-এ অধ্যাপক নিযুক্ত হন আর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে নিযুক্ত হন 'College de France-এ এবং ওখানে থেকে যান তাঁর মৃত্যুকাল, ১৯৪১ পর্যন্ত। ১৯০৭-এ তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা Creative Evolution (ফরাসী নাম Le Evolution Creative) তাঁর জন্য নিয়ে এলো আন্তর্জাতিক খ্যাতি। রাতারাতি দার্শনিক জগতে তিনি হয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থাবলী Index 'Expurgatorius'-এ স্থান পাওয়ার পর এবার চরম সাফল্য করায়ত্ত হল তাঁর। ঐ একই বছর তিনি নির্বাচিত হলেন ফরাসী একাডেমির সদস্যও।

আশ্চর্য, যে বার্গসঁর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে জড়বাদকে বাধা দেওয়া সে বার্গসঁ যৌবনে ছিলেন স্পেন্সারের ভক্ত। কিন্তু দেখা যায় অতিবিদ্যা মানুষকে করে তোলে সংশয়বাদী—প্রাথমিক ভক্তরাই হয়ে পড়েন স্বধর্মত্যাগী যেমন প্রাথমিক পাপীরাই হয়ে থাকেন যত সব বুড়ো সাধুসন্ত। যতই তিনি স্পেন্সারকে অধ্যয়ন করলেন ততই বার্গসঁ বস্তু আর জীবন, দেহ আর মন আর প্রাক্তনবাদ আর নির্বাচনের জড়বাদী পদ্ধতির বাতে-ধরা সন্ধিস্থল সম্বন্ধে হয়ে উঠলেন অধিকতর সচেতন। জড়-বস্তু থেকে জীবনের উৎপত্তি এ বিশ্বাস পাস্তুরের (Pasteur) সাধনায় হয়েছে বাতিল প্রমাণিত—শত শত বছরের মতবাদ আর হাজারো নিষ্ফল পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও জড়বাদীরা জীবন-উৎসের সমাধানের নিকটবর্তী হতে হননি সক্ষম। আবার, যদিও চিন্তা আর মস্তিষ্কে যোগাযোগ অনস্বীকার্য কিন্তু যোগাযোগের ধরনটা রয়ে গেছে আজো অস্পষ্ট। যদি মনকে জড়বস্তু আর প্রত্যেকটা মানসক্রিয়াকে নিরপেক্ষ অবস্থারই যান্ত্রিক ফলশ্রুতি মনে করা হয়, তা হলে সচেতনতার মূল্য থাকে কোথায়? তাহলে সৎ আর যুক্তিবাদী হাক্সলী যাকে 'অকারণ দৃশ্যমান' বলেছেন মস্তিষ্কের জড়বাদী যান্ত্রিক ক্রিয়া তাকে পরিহার করতে পারে না কেন? পারে না কেন যে অপ্রয়োজনীয় শিখা স্রেফ মাথার গোলমালেরই ফল তাকে ত্যাগ করতে? মোটকথা স্বাধীন ইচ্ছার চেয়ে প্রাক্তনবাদ কি অধিকতর বোধগম্য? বর্তমান মুহূর্তে যদি কোন জীবন্ত আর সৃজনী নির্বাচনের অস্তিত্ব না থাকে এবং তা যদি সম্পূর্ণই পূর্ববর্তী মুহূর্তের বস্তু আর গতিরই যান্ত্রিক ফল তা হলে সে মুহূর্তটাও তো তার পূর্ববর্তী মুহূর্তেরই যান্ত্রিক ফল এবং তা তার পূর্ববর্তীটার........এভাবে যেতে যেতে আমরা পৌঁছে যাবো প্রাথমিক নীহারিকায় যা পরবর্তী সব ঘটনারই কারণ পরম্পরা—মায় শেক্সপিয়রের নাটকের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি আর তাঁর আত্মদহনও—তা হলে বুঝতে হবে দূর আকাশ আর দূর শূন্যমণ্ডলের পৌরাণিক মেঘমণ্ডলেই রচিত হয়েছে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো আর কিং লয়ারের গুরুগম্ভীর যত সব বাক্যাংশ আর বাক্‌ধারা। বিশ্বাস প্রবণতার কি অদ্ভুত খসড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রকম মতবাদে বিশ্বাস করতে হলে এ অবিশ্বাসী যুগকে বিশ্বাসের অনেক কসরৎ করতে হবে। এ রকম এক বিরাট অদৃষ্টবাদী গাল-গল্প, আর নীহারিকাই ট্রেজিডি রচয়িতা ইত্যাদি কথার সামনে ওল্ড কি নিউ টেস্টামেণ্টের রহস্যময় অলৌকিকতাও আধখানা হয়ে যেতে বাধ্য। এখানে বিদ্রোহের অনেক উপাদান ছিল,—বার্গসঁর পক্ষে এত দ্রুত খ্যাতির উচচশিখরে আরোহণের কারণ যেখানে সন্দেহবাদীরাও সাধু বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন সেখানে বার্গসঁ আমিত্ত সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তাঁর সন্দেহ।

খ. মন আর মস্তিষ্ক

বার্গসঁর মতে স্থানিক ধারণায় আমরা ভাবতে অভ্যস্ত বলে স্বভাবতই আমাদের ঝোঁকটা জড়বাদের দিকেই হয়ে থাকে—আমরা সবাই যেন জ্যামিতিবিদ। কিন্তু স্থানের চেয়ে সময় বা কালের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়, নিঃসন্দেহে জীবনের সার-বস্তু কালের হাতেই বিধৃত। সম্ভবত সব বাস্তবতারও। তবে আমাদের বুঝতে হবে কাল মানে মৌজুদ, উৎপত্তি আর স্থায়িত্ব। "স্থায়িত্ব মানে অতীতের ক্রম অগ্রগতি যা ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের গর্ভে করে অনুপ্রবেশ—অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা ফুলে ফেঁপে ওঠে"—এর অর্থ "অতীতের সবটাই বর্তমানে এসে হয় দীর্ঘায়ত, তাতেই তা অবস্থান করে আর থাকে সক্রিয়।" 'স্থায়িত্ব' মানে অতীতের বেঁচে থাকা—তার কিছুরই সবটা যায় না হারিয়ে। "অবশ্য একথা ঠিক যে আমরা আমাদের অতীতের অতি ক্ষুদ্রাংশ সম্বন্ধেই ভেবে থাকি কিন্তু আমরা যখন কামনা করি, ইচ্ছা করি আর কর্ম করি তখন আমাদের সম্পূর্ণ অতীত নিয়েই করে থাকি।" যেহেতু কাল এক সঞ্চয় বা মৌজুদ বলে ভবিষ্যৎ কখনো অবিকল অতীতের মতো হতে পারে না। কারণ প্রতি পদ-ক্ষেপেই জেগে ওঠে এক নতুন সঞ্চয়, নতুন মৌজুদ। "প্রতি মুহূর্তই শুধু যে নূতন তা নয় বরং অচিন্ত্যনীয়ও···আমরা যতটুকু মনে করি, পরি-বর্তন ঘটে তার চেয়ে আরো অনেক বেশী"—যান্ত্রিক বিজ্ঞানের যে আদর্শ, জ্যামিতিক নিয়মে সবকিছুর আগাম বলতে যাওয়া তা স্রেফ এক মননশীল বিভ্রান্তি। অন্তত—"সচেতন জীবের বেঁচে থাকা মানে পরিবর্তিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া মানে প্রবীণ হওয়া আর প্রবীণ হওয়া মানে নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারংবার অবিরাম সৃষ্টি করে চলা।" এ কি সবকিছুর ব্যাপারে সত্য? সম্ভবত সব বাস্তবতাই কাল আর স্থায়িত্ব, হয়ে ওঠা আর পরিবর্তিত হওয়া। আমাদের মধ্যে স্মৃতিই হচ্ছে স্থায়িত্বের বাহন, কালের হাতের ক্রীড়নক —স্মৃতির সাহায্যে আমাদের অতীতের এমন অনেক কিছুই সক্রিয়ভাবে রক্ষিত হয় যে প্রয়োজনের সময় প্রচুর বিকল্প তা আমাদের সামনে এনে করে হাজির। জীবন যখন পরিধিতে, উত্তরাধিকারে আর স্মৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তখন নির্বাচনক্ষেত্রও হয়ে পড়ে প্রসারিত। সবশেষে সম্ভাব্য সাড়া দেওয়ার বৈচিত্র্য সঞ্চারিত করে মনে সচেতনতা—সচেতনতা মানে সাড়া দেওয়ার মহড়া। "জীবন্ত বস্তুর নির্বাচন ক্ষমতার সঙ্গে তার সচেতনতার রয়েছে আনুপাতিক সম্পর্ক। কর্মের চতুর্দিকে সম্ভাবনার যে এলাকা রয়েছে তাকে এ করে তোলে উজ্জ্বল ও আলোকিত। যা করা হয়েছে ও যা করা যেতে পারে তার ফাঁকটাকে এ করে রাখে পূর্ণ।" এটা অনাবশ্যক কোন লেজুড় নয়—এ হচ্ছে কল্পনার এক সমুজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ, যেখানে চরম নির্বাচনের আগে সব রকম বিকল্প সাড়ার চিত্র নিয়ে করা হয় পরীক্ষা। তা হলে "বাস্তবে, জীবন্ত বস্তু মানে এক কর্মকেন্দ্র, অনেকগুলো আকস্মিক ঘটনার একসঙ্গে পৃথিবী প্রবেশেরই এ হলো প্রতিনিধি। তার মানে সম্ভাব্য কর্মের কিছুটা পরিমাণের পরিচয় এতে পাওয়া যায়।" মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণশীল যন্ত্র নয়—মানুষ পুনঃপরিচালিত শক্তিরই কেন্দ্রবিন্দু, সৃজনী বিবর্তনেরই এক কেন্দ্র।

সচেতনতার এক অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছা—আমরা স্বাধীন একথা বলার অর্থ হচ্ছে আমরা কি করছি না করছি তা আমাদের জানা। 'স্মৃতির প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বর্তমানের সঙ্গে যে সব অতীত উপলব্ধির সাদৃশ্য আছে সে সবকে জাগিয়ে তোলা–যা আগে ঘটেছে আর যা ঘটেছে তার পরে, সেগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া। এভাবে আমরা সক্ষম হই সবচেয়ে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। কিন্তু এ শেষ কথা নয়। অসংখ্য 'স্থায়ীত্ব' মুহূর্তকে একটিমাত্র সহজাত বৃত্তি দিয়ে উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়ে তা আমাদের বস্তুর গতি প্রবাহ তথা প্রয়োজনের স্বরাঘাত থেকে দেয় মুক্তি। যত বেশী এসব মুহূর্তকে স্মৃতি সংহত করতে সক্ষম ততই বস্তুর উপর আমাদের কর্তৃত্ব হয় দৃঢ়তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে বস্তুত স্মৃতিই হয়ে পড়ে জীবন্ত প্রাণীর বস্তুর উপর তার কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের যন্ত্র।' (Matter and Memory)

যদি প্রাক্তনবাদীদের কথা সত্য হয়। যদি প্রত্যেকটা কর্ম পূর্বতন-অস্তিত্বেরই স্বয়ংক্রিয় আর যান্ত্রিক পরিণতি হয় তা হলে সংকল্পমাত্রই এক সহজ ও মসৃণগতিতে রূপান্তরিত হবে কর্মে। অন্যদিকে নির্বাচন এক কঠিন ও সচেষ্ট ব্যাপার, তার জন্য প্রয়োজন সংকল্পের, প্রয়োজন ব্যক্তিত্ব; শক্তিকে অভ্যাস, আলস্য আর সহজাত-ঝোঁকের অশরীরী আকর্ষণ থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরার। নির্বাচন মানে সৃজন আর সৃজন অর্থ শ্রম। মানুষের এ এক দুশ্চিন্তা, তার এ দুশ্চিন্তা তাই পশুর নির্বাচনহীন কঠিন বাঁধা জীবনের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত—পশুরা "অতিমাত্রায় স্থির আর আত্মকেন্দ্রিক।" কিন্তু তাই বলে তোমার কুকুরটার কনফুসীয় শান্তিকে বলা যাবে না দার্শনিক শান্তি, অতল গভীরতার বাহ্যিক শান্তি এ নয়। পশুর সহজাতবৃত্তির স্থির নিশ্চয়তা আর নিয়মানুবর্তিতার নির্বাচনের প্রয়োজনও হয় না আর নির্বাচন করতে সক্ষমও নয় তারা। "পশুর বেলায় আবিষ্কার মানে, রুটিন বিষয়ক রদবদল ছাড়া আর কিছুই না। তার নিজের প্রজাতির অভ্যাসে বাঁধা থেকেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সে নিজের সম্প্রসারণে সক্ষম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুহূর্তের জন্য সে স্বতঃক্রিয়া এড়িয়ে যায়—স্রেফ আর এক স্বতঃক্রিয়া সৃষ্টির সময়। তার কারাগারের দরজা খোলা মাত্রই বন্ধ হয়ে যায়—শৃঙ্খল নিয়ে টানাটানি করে সে শুধু ওটাকে বাড়াতেই পারে। মানুষের সচেতনতা ভেঙে ফেলে সব শৃঙ্খল। মানুষে, শুধু মানুষেই পেতে পারে তা মুক্তি বা স্বাধীনতা।"

তা হলে মন আর মস্তিষ্ক এক নয়। সচেতনতা নির্ভর করে মস্তিষ্কের উপর—মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে পতনও ঘটে তার। অবশ্য পেরেকের সঙ্গে ঝুলন্ত কোটটাও পেরেকের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যায় বলে তাই বলে কোটটা 'অকারণ দৃশ্যমান' তা প্রমাণিত হয় না আর তা পেরেকটার একটা বাহ্যিক অঙ্গাভরণও নয়। মস্তিষ্ক মানে কল্পপদ্ধতি আর প্রতিক্রিয়ার ধরন-ধারণ —সচেতনতা মানে কল্প-স্মৃতিকে নতুন করে স্মরণ করে প্রতিক্রিয়ার নির্বাচন সাধন। "নদী তল থেকে স্রোতের গতিধারা সম্পূর্ণ আলাদা যদিও তার বাঁক-পথ তাকে অনুসরণ করতেই হয়। তেমনি যে জীবদেহকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচেতনতা সজীব করে তোলে সে নিজে তার থেকে আলাদা বটে কিন্তু জীবদেহের সব আপদ-বিপদ তাকেও করতে হয় সহ্য।"

"সময় সময় বলা হয়ে থাকে আমাদের সব রকম সচেতনতার সাক্ষাৎ সম্পর্ক রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে, তা হলে মানতে হয় সচেতনতা মস্তিষ্ক-ওয়ালা প্রাণীরই একচেটিয়া আর তা অস্বীকার করতে হয় মস্তিষ্কহীনদের বেলায়। কিন্তু এ যুক্তি যে ভ্রান্ত তা সহজেই বোধগম্য। তা হলে এওতো বলা যায় যেহেতু আমাদের হজম ক্রিয়ার সঙ্গে উদরের সম্পর্ক রয়েছে, যে সব প্রাণীর উদর আছে তারাই শুধু হজম করতে সক্ষম। কিন্তু এতো সম্পূর্ণ ভুল—কারণ হজমের জন্য উদর বা বিশেষ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন প্রয়োজনই হয় না। এমিবাও (Amoeba) তো হজম করে যদিও তাকে কিছুতেই জৈবনিক কোষের ভর থেকে পৃথক করা যায় না। আসল কথা, জীব-দেহের জটিলতা আর পূর্ণাঙ্গতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক শ্রম-বিভাগও তাতে ঘটে—বিশেষ অঙ্গকে দেওয়া হয় বিশেষ কাজের ভার—এভাবে হজম ক্রিয়া স্থানিক হয়েছে উদরে অথবা হয়ে দাঁড়িয়েছে হজম-যন্ত্রে, একটিমাত্র কাজ করতে হয় বলে তার কাজও হয় এখন ভালো। সে ভাবে মানুষের যে সচেতনতা তা নিঃসন্দেহে মস্তিষ্কের সঙ্গেই সম্পর্কিত কিন্তু তাই বলে সচেতনতার জন্য মস্তিষ্ক অপরিহার্য তা বলা যায় না। পশু-শ্রেণীর যতই নীচের দিকে যাওয়া যায় দেখা যায় তাদের স্নায়ু-কেন্দ্রগুলি সরলীকৃত, একটা থেকে আর একটা আলাদা, অবশেষে তারা হয়ে যায় পুরোপুরি অদৃশ্য আর জীবদেহের সাধারণ ভরে (Mass) এমনভাবে ডুবে যায় যে তার আর পৃথক অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাণী জগতের উচ্চস্তরে যখন দেখা যায় সচেতনতা এক জটিল স্নায়ু কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত তখন একি আমরা মনে করতে পারি না এ স্নায়ু ক্রিয়ার দূর নিম্নবংশগতি পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে সম্পর্ক —সব রকম স্নায়ু উপাদান যখন একাকার হয়েছিল, পৃথকীকরণই ছিল অসম্ভব তখনো সচেতনতার অস্তিত্ব সেখানে ছিলই? তবে তা ছিল বিশৃঙ্খল আর ছড়িয়ে কিন্তু তার কোন অস্তিত্বই ছিল না সে কথা বলা যায় না। তা হলে কল্পনায় অন্তত ধরে নেওয়া যায় প্রত্যেক জীবিত বস্তুই হয়তো সচেতন। নীতিগতভাবে জীবনের সঙ্গে সচেতনতা ও সহ-প্রসারণশীল এ মানা যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা হলেও মন আর চিন্তাকে আমরা বস্তু আর মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবতে যাই কেন? তার কারণ আমাদের মনের যে অংশটাকে আমরা "বুদ্ধি" বলে থাকি তা হচ্ছে গঠনতান্ত্রিক জড়বাদী—তার বিকাশ ঘটেছে বিবর্তনের পথে, পদার্থ আর দেশগত বস্তুকে বুঝতে আর সে সবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়েই, এ থেকেই তার সব উপলব্ধি আর 'আইন-কানুন', আর সর্বত্র যে অদৃষ্টবাদিতা আর আগাম অনুমেয় নিয়মানুবর্তিতা তাও এর ফল। "সংকীর্ণ অর্থে আমাদের বুদ্ধির কাজ আমাদের দেহের সঙ্গে পরিবেশের সামঞ্জস্য বিধান, বাহ্য বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক সাধন—সংক্ষেপে পদার্থ বা জড়বস্তু সম্বন্ধে ভেবে দেখা।" নিরেট আর জড়-বস্তুতেই বুদ্ধি পায় স্বস্তি। অবস্থা পরম্পরা হিসেবে সবকিছু একটা অস্তিত্ব হয়ে উঠছে এ সে দেখতে পায়। কিন্তু সবকিছুর যে যোগসূত্র, স্থায়িত্বের যে ধারা তাদের জীবনটারই বুনিয়াদ তা থেকে যায় তার ধারণার বাইরে।

ছায়া-চিত্রের কথা ভেবে দেখো—আমাদের ক্লান্ত চোখে তা মনে হয় গতি আর কর্মে জীবন্ত, বস্তুত এখানেই যেন বিজ্ঞান আর কারিগরি বিদ্যা জীবনের ধারাবাহিকতা পেরেছে ধরতে। আবার অন্যদিকে বিজ্ঞান আর বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাও জাহির হয়ে পড়েছে এখানে। ছায়া-চিত্র গতিশীল নয়—ওটা গতির চিত্র নয়। ঐ হচ্ছে কতকগুলি তাৎক্ষণিক তোলা ছবি, ছবিগুলি একের পর এক এমন দ্রুত গতিতে তোলা হয়েছে যে সে সবকে আবার যখন অনুরূপ দ্রুত গতিতে পর্দায় ফেলা হয় তখন উৎসাহী দর্শক ধারাবাহিকতার বিভ্রান্তিতেই হয়ে ওঠে খুশী যেমন ওরা খুশী হয়ে উঠতো শৈশবে মুষ্টিযোদ্ধা বীরদের ছোট ছোট ছবি দেখে। তা হলেও এ এক বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই না—চলচিচত্র সত্যিই কতকগুলি ছবিই যাতে সবকিছুই এমন স্থির ও নিশ্চল যে যেন চিরকালের জন্য তা ঘনীভূত হয়ে বেঁধে আছে জমাট।

চলচিচত্রের ক্যামেরা যেমন বাস্তব ঘটনা স্রোতকে নিখুঁতভাবে স্থিতি-শীল ভঙ্গীতে বিভক্ত করে নেয় তেমনি মানব-বুদ্ধি ও অবস্থা-পরম্পরাকে বিধৃত করে কিন্তু জীবনের সঙ্গে গ্রথিত হওয়ার সময় তা হারিয়ে বসে তার ধারাবাহিকতা। আমরা বস্তুটাকে দেখি কিন্তু শক্তিটাকে ফেলি হারিয়ে। আমাদের ধারণা বস্তু কি তা আমরা জানি কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তির সন্ধান পাই তখন আমরা হতভম্ব হয়ে পড়ি, আমাদের সব শ্রেণী-বিভাগ তখন উবে যেতে থাকে। "অধিকতর কঠোরতার খাতিরে গাণিতিক পদ্ধতি থেকে গতির সব রকম ধারণা হয়তো বাদ দেওয়া যায়, কিন্তু এও তো সত্য যে সংখ্যার উৎপত্তিতে গতির আমদানিই আধুনিক গণিতের মূল উৎস"—উনবিংশ শতাব্দীর সব রকম গাণিতিক অগ্রগতি চিরাচরিত স্থানিক জ্যামিতি ছাড়াও কাল আর গতির উপলব্ধির ফলেই ঘটেছে। সমকালীন বিজ্ঞানের সর্বত্র, যেমন ম্যক্ (Mach), পিয়ার্সন (Pearson) আর হেনরি পঁয়কারে (Henri Poincari) দেখা যায়—এ এক অস্বস্তিকর সন্দেহ যে "সত্যিকার বিজ্ঞান স্রেফ অনুমান বা সন্নিকর্ষ, যা বাস্তবের জীবনের চেয়ে বেশী করে ধরে তার জড়-ভাবটাই।

চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বা শারীরিক উপলব্ধির প্রয়োগ করতে যাওয়াই ভুল—করতে গেলে প্রাক্তনবাদ, যান্ত্রিকতা আর জড়বাদের অচলাবস্থায় গিয়ে ঠেকতেই হবে। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে দেখলেও বুঝতে পারা যায় মনের জগতে দৈহিক বিষয়ের আরোপ নেহাৎ অসঙ্গত। এক মাইলকে আমরা সহজে আধ মাইল মনে করে বসি, সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে চিন্তার একটি স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট—শূন্যে বস্তুকণা রূপে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা তাদের উড়ার পথে ও কর্ম সাধনে স্থানের বাধা সীমা টেনে দিয়েছে এ সবের চিত্র কল্পনার সব চেষ্টাই আমাদের ভাব-লোক এড়িয়ে যায়। জীবন এড়িয়ে যায় এসব নিরেট উপলব্ধি কারণ জীবনের সঙ্গে কালের সম্পর্ক যতখানি স্থানের সঙ্গে ততখানি নয়—ওটা কোন অবস্থা নয় বরং একটা পরিবর্তন। ওটা যত না পরিমাণ তার চেয়ে বেশী গুণ। ওটা স্রেফ বস্তু আর গতির নতুন করে বিলি-ব্যবস্থা নয়—ওটা তরল আর অবিরাম সৃষ্টি।

'বাঁকা রেখার অতি সামান্য উপাদানই সরল রেখায় পরিণত হতে সক্ষম। যত ছোট তার সম্ভাবনাও তত বেশী। সীমার দিকে, ইচ্ছা করলে সরল রেখার একটা অংশও তাকে বলা যায়, কারণ একটি বাঁকা রেখা প্রতি বিন্দুতেই তার সরল রেখার প্রান্তের সঙ্গে মিলিত হয়। সে ভাবে "জীবনী শক্তি" ও শারীরিক আর রাসায়নিক শক্তির প্রতিটি বিন্দুর পক্ষেই সরল-রেখার প্রান্ত সীমা, যা বৃত্তকে স্পর্শ করেছে কিন্তু কেটে ছাড়িয়ে যায়নি। আসলে এসব বিন্দু মানে মনেরই দৃষ্টিভঙ্গী শুধু—যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতির ফলে যে বাঁকা রেখার সৃষ্টি হয় তার বিভিন্ন মুহূর্তে এক একটি বিরতি কল্পনা করে বসে। বস্তুত সরল রেখা দিয়ে যেমন বাঁকা রেখা গড়ে ওঠেনি, তেমনি জীবনও গঠিত হয়নি শারীর-রাসায়নিক উপাদানে।

চিন্তা আর বুদ্ধির দ্বারা না হলে তবে কি করে আমরা জীবনের মর্ম আর স্রোতকে ধরবো? কিন্তু বুদ্ধিই কি সব? কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা বন্ধ রেখে আমরা যদি আমাদের ভিতরের সত্তার দিকে তাকিয়ে দেখি—যার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অন্য সবকিছু থেকে বেশী, তা হলে আমরা কি দেখতে পাই? দেখতে পাই মন, বস্তু নয়, দেখতে পাই সময়, স্থান নয়, দেখি কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা নয়—দেখি না যান্ত্রিকতা, দেখি নির্বাচন। জীবনকে আমরা তার সূক্ষ্ম ও অনুপ্রবেশী স্রোত হিসেবেই দেখি—দেখি না "মনের বিশেষ অবস্থা" হিসেবে বা মৃত বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে—প্রাণীবিদ যেমন মৃত ব্যাঙের ঠ্যাং পরীক্ষা করেন অথবা অণুবীক্ষণ দিয়ে করেন অধ্যয়ন আর ভাবেন তিনি এক জীববিজ্ঞানী রত আছেন 'জীবন' অধ্যয়নে? এভাবে সহজ সরল আর ধৈর্যের সঙ্গে নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে তাই সহজাত-বৃত্তি। কোন রকম অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নয় এ —মানব মনের অতি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা এভাবেই সম্ভব। স্পিনোজার একথা সত্য কল্পনামূলক চিন্তা কিছুতেই জ্ঞানের উচ্চতম রূপ নয়—অবশ্য গুজব থেকে যে এ ভালো তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু বস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধির তুলনায় তা কতই না দুর্বল। "মূলের যত কাছাকাছি পৌঁছতে পারা যায় তার চেষ্টাই হচ্ছে সত্যিকার ভূয়োদর্শনজনিত চিকিৎসা —এক রকম মননশীলতার সাহায্যে হৃদয়ের আওয়াজ শুনে নিয়ে জীবনের গভীরতা আর তার আত্মশক্তি অনুভব করাই এর লক্ষ্য। এভাবে আমরা আমাদের ভিতরে জীবনের স্রোত-ধ্বনি 'শুনতে পাই'। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা আমরা বুঝতে পারি মনের উপস্থিতি মননশীল বাগাড়ম্বরের দ্বারা আমরা মনে করে বসি চিন্তা হচ্ছে মাথার ভিতর স্রেফ অণুর নৃত্য! সহজাত-বৃত্তিই যে জীবনের অন্তরলোক অধিকতর সত্যভাবে দেখতে সক্ষম তাতে কোন সন্দেহ আছে কি?

রুশোর মতো আমরা অবশ্য চিন্তাকে এক ব্যাধি বলে মনে করি না আর মনে করিনা বুদ্ধিকে এমন কিছু বিশ্বাসঘাতক বলে যা সব ভদ্র নাগরিকেরই পরিহার করা উচিত। বুদ্ধির যা স্বাভাবিক কাজ, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈশিক ও বস্তুগত তা সে করবেই—জীবন আর মনের যা কিছু দেশগত প্রকাশ ও বস্তুগত দিক তা বুদ্ধি পালন করবেই। সহজাত বৃত্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক জীবন আর মনের অনুভূতির সঙ্গেই সীমিত—তার বাহ্যিকতার সঙ্গে নয় বরং তার অন্তর-সত্তার সঙ্গেই। একথা আমি কখনো বলিনি যে "বুদ্ধির জায়গায় অন্য বিপরীত কিছু স্থাপন" অত্যাবশ্যক অথবা চাইনি সহজাত বৃত্তিকে বুদ্ধির উপরে স্থান দিতে। আমি শুধু এ দেখাতে চেষ্টা করেছি যে যদি আমরা গণিত আর পদার্থ বিজ্ঞানের এলাকাকে জীবন আর সচেতনতায়ও প্রসারিত হতে দিই তা হলে জীবনের এমন এক অর্থপূর্ণ দিকে আমাদের আবেদন করতে হবে যা সোজা আমাদের সত্যিকার বোধগম্যতায় পৌঁছবে আর সহজাত বৃত্তির মত এক গুরুত্বপূর্ণ আবেগের উৎস থেকেই হবে যার জন্য—যদিও সহজাত বৃত্তি আদতে এক সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিকে খণ্ডাতেও আমরা চাই না—আমরা চাই শুধু এক বোধগম্য ভাষারই স্বীকৃতি গ্রহণ করতে—যেহেতু একমাত্র বোধগম্যতারই আছে ভাষা। আমরা যে সব শব্দ ব্যবহার করি তা যদি স্রেফ প্রতীক হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক হয়ে পড়ে তার কোন উপায় নেই—এখনো তা থেকে যে জড়বাদ-গন্ধী ধূম নির্গত হচ্ছে তা হয়তো মূলেরই প্রভাব। তেজ বা শক্তি মানে নিশ্বাস। মন মানে ওজন আর চিন্তা বস্তু নির্দেশক—তবুও এ হচ্ছে স্থূল বাহন যার মাধ্যমে আত্মা নিজেকে করে প্রকাশ। "বলা হবে আমরা আমাদের বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যাই না, কারণ সচেতনতার অন্য সব রূপের উপলব্ধিও আমরা এখনো বুদ্ধি দিয়েই করে থাকি"—এমনকি অন্তর্দৃষ্টি আর সহজাত বৃত্তিও জড়বাদী উপমা। "যদি আমাদের উপলব্ধি আর যুক্তিসঙ্গত চিন্তার পেছনে এমন এক অনির্দিষ্ট নীহারিকাময় কিছু না থাকতো যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এক দীপ্তিমান অঙ্কুর যার নাম দিয়েছি আমরা বুদ্ধি" তা হলে ন্যায়সঙ্গত আপত্তির কারণ থাকতো। নতুন মনোবিদ্যা আমাদের মানস জগতে এমন এক এলাকার সন্ধান দিয়েছে যা বুদ্ধি থেকে অনেক বেশী বিস্তৃত আর প্রসারিত। "অবচেতন মনের অত্যন্ত পবিত্র গভীরতায় সন্ধান চালানো, সচেতনতার নিম্নভূমিতে খেটে যাওয়া—সামনের শতাব্দীতে মনোবিদ্যার এই হবে প্রধান কাজ। তাতে যে বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. সৃষ্টিশীল বিবর্তন (Creative Evolution)

এই নব দিগন্ত খুলে যাওয়ার পর বিবর্তনের এক নতুন রূপ আমাদের সামনে হয়েছে উন্মোচিত—এতকাল ডারউইন আর স্পেন্সারের লেখা পড়ে আমাদের ধারণা জন্মেছিল বিবর্তন মানে সংগ্রামের এক অন্ধ ও নিরানন্দময় যান্ত্রিকতা। বিবর্তনে আমরা এখন স্থায়িত্বকাল, প্রধান শক্তি-সমূহের সঞ্চয়, জীবন আর মনের আবিষ্কার ক্ষমতা, "সম্পূর্ণ নূতনের অবিরাম বিস্তার" ইত্যাদির ধারণা করতে হয়েছি সক্ষম। জেনিংস (Jennings) আর মউপাসের (Maupas) মত সম্প্রতিকালের গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ কেন নিম্নতম প্রাণীদের ব্যবহার সম্বন্ধীয় যান্ত্রিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন তা বোঝার জন্য আমাদের মন এখন তৈরী, আর বুঝতে পারি কেন সমকালীন দৈহিক কোষ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ই.বি. উইলসন (E.B. Wilson) তাঁর দেহ-কোষ সম্বন্ধীয় বইটা এ কথা বলেই শেষ করেছেন: "মনে হয় কোষ নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়ন মোটামুটিভাবে অজৈব জগতের সঙ্গে নিম্নতম জীব-রূপের যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তাকে সংকীর্ণ না করে আরো করে দিয়েছে প্রসারিত। জীব-বিদ্যার সর্বত্র এখন দেখা দিয়েছে ডারউইনবিরোধিতা।

ডারউইনবাদ মানে অনুকূল বৈচিত্র্যের স্বাভাবিক নির্বাচনের ফলে নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ব্যবহার, নতুন জীব আর নতুন প্রজাতির উৎপত্তি মূল সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই তার এখন পোকায় কাটা দশা। এমন মতবাদ থেকে কি করে সহজাত-বৃত্তির উদ্ভব সম্ভব? বরং এসবকে অর্জিত অভ্যাসের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মৌজুদ সঞ্চয় মনে করাই অধিকতর সুবিধাজনক। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সে দরজাও করে দিয়েছে বন্ধ—অবশ্য হয়তো কোন দিন এ দরজা খুলতেও পারে। যদি শুধু জন্মগত ক্ষমতা আর গুণাবলীই চালান করা সম্ভব হয় তা হলে মনে করতে হবে প্রত্যেকটা সহজাত বৃত্তিই এখন যেমন স্বাভাবিক শক্তিতে শক্তিমান জন্মমুহূর্তেও সে রকম শক্তিমানই ছিল, বলা যায়, কর্মের সব বর্ম পরেই প্রবীণ অবস্থায় ঘটেছে তার জন্ম—তা না হলে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সে তার অধিকারীকে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। জন্ম-মুহূর্তে তা যদি দুর্বল থাকতো তা হলে তার বেঁচে থাকার বা অস্তিত্ব রক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র অবলম্বন হতো একমাত্র অর্জিত ক্ষমতা (চলতি মতে) যা উত্তরাধিকারসূত্রে অলভ্য। প্রত্যেকটা মূল-উৎসই যেন এখানে এক অলৌকিক ব্যাপার।

প্রথম সহজাত-বৃত্তির বেলায় যেমন, সব বৈচিত্র্যের বেলায়ও তাই। ভেবে অবাক হতে হয় পরিবর্তন আদিরূপে কি করে নির্বাচনের হাতে তুলে দিল এমন একটা হাতল। চোখের মতো জটিল অঙ্গে এ বাধা আরো বেশী নৈরাশ্যজনক, হয় চক্ষুটা মুহূর্তে পূর্ণাঙ্গ আর সব শক্তি নিয়েই দেখা দিয়েছে (যা জোনার তিমি-মৎস্যের অন্তর্দর্শনের মতোই বিশ্বাস্য।) অথবা অনেক "দৈব" বৈচিত্র্য পরম্পরায় হয়েছে শুরু আর অধিকতর দৈব বা আকস্মিক উর্ধ্বতনের ফলে পূর্ণাঙ্গ চক্ষু হয়েই দিয়েছে দেখা। প্রতিপদেই জটিল সব গঠনরূপের যে যান্ত্রিক উৎপত্তির কথা বলা হয় তাতে শিশু-কাহিনীর পরীর গল্পের সব অবিশ্বাস্যতাই আছে, নেই শুধু তার সৌন্দর্যটুকু।

বিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক উপায়ে একই রকম ফল বা প্রভাব সৃষ্টি বিষয়টাকে করে তুলেছে আরো জটিল। যেমন জীব আর উদ্ভিদ উভয়ের বেলায় প্রজননের জন্য যৌন ব্যাপারের আবিষ্কার— এখানে বিবর্তনের পথ সম্পূর্ণ আলাদা, তবুও একই জটিল "আকস্মিক" উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটছে। অথবা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পোকার দৃষ্টিশক্তির কথাই ধরা যাক—একটি তুলতুলে মেরুদণ্ডহীন অন্যটি মেরুদণ্ডী: "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যতসব বৈচিত্র্য, যা প্রায় সংখ্যায় অগুনতি তা কি করে দুই সম্পূর্ণ আলাদা আর নিরপেক্ষ বিবর্তন ধারায় একই নিয়মে ঘটতে পারে যদি তা শুধুমাত্র আকস্মিক হয়?" তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য:

প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভ্রূণ বিকাশ নিয়মেও দুই নিকট প্রজাতির বেলায় একই রকম পরিণতি ঘটিয়ে থাকে....মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীবের চোখের পশ্চাৎবর্তী ঝিল্লী বা রেটিনা ভ্রূণের প্রাথমিক প্রসারণ-প্রচেষ্টারই ফল....কিন্তু মেরুদণ্ডহীনদের রেটিনার সোজা উদ্ভব ঘটে তার ভ্রূণের বাহ্যিক স্তর বা ত্বক থেকেই।....যদি সমুদ্র-দেবতা ট্রিটনের চোখের স্বচ্ছ লেন্স্ বা দৃষ্টিসহায়ক কাচটা তুলে ফেলা হয় তা হলে চোখের পুত্তলির বৃত্তই (iris) ওটাকে ফের গড়ে তোলে। মূল লেন্স্টা ছিল বহিরঙ্গের সৃষ্টি অথচ চোখের বৃত্তটার (iris) উৎপত্তি ভ্রূণের মান স্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই। তার চেয়েও কৃকলাশের চোখের লেন্স্টা তুলে ফেলে যদি বৃত্তটা রেখে দেওয়া হয় তা হলে বৃত্তের উর্ধ্বাংশ থেকেই লেন্স্টা গড়ে উঠতে থাকে—আর যদি এ উর্ধ্বাংশটাই তুলে ফেলা হয় তা হলে পুনর্গঠন শুরু হয় ভিতরের স্তর থেকেই অর্থাৎ রেটিনার যেটুকু স্থান বাকি আছে তার থেকেই। এভাবে দেখা যায় বিভিন্ন অবস্থায় স্থাপিত অংশগুলো যদিও ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্নভাবে গঠিত তারা একই রকম কর্তব্য সাধনে সক্ষম, এমনকি প্রয়োজন হলে পারে যন্ত্রটার একই অংশগুলি তৈয়ের করে নিতেও।'

তাই স্মৃতিভ্রংশ হলে কি কর্মক্ষমতা হারালে তা আবার নতুন করে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে—হয়তো তা হয়ে ওঠে স্থলাভিষিক্ত কলা (Tissue) থেকেই। বিবর্তন জড় অংশগুলির এক অসহায় যান্ত্রিকতা নয়—তার চেয়েও যে বেশী কিছু তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। জীবন তার যান্ত্রিক দিক থেকেও অনেক বেশী—এ এমন এক শক্তি যা বাড়তে পারে, যা নিজেকে পুনর্গঠন করতে সক্ষম, পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিজের ইচ্ছামতো কিছুটা বদলেও নিতে পারে এ। এসব অসম্ভব সাধনের পেছনে যে কোন বাহ্যিক পরিকল্পনার হাত রয়েছে তা নয়—তা হলে এও তো এক বিপরীত যান্ত্রিকতা, হিন্দু চিন্তাকে ভারতীয় উত্তাপের কাছে সবিনয়ে আত্মসমর্পণের মতো এও তো হয়ে দাঁড়াবে মানুষের উদ্যোগ আর সৃজনী বিবর্তন-ধ্বংসকারী আর এক অদৃষ্টবাদ। "আমাদের এ দুই দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়িয়ে যেতে হবে—যান্ত্রিকতা আর চরম পরিণতি, তলায় মানুষের কর্মের বিবেচনাই মানুষের মনকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে।" প্রথমে আমরা মনে করতাম সবকিছু যে গতিশীল তার কারণ এ জাগতিক খেলায় মানব-ইচ্ছার মতো কিছু একটা যেন ঐসবকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করছে। তারপর আমাদের মনে হলো পৃথিবীটাই একটা যন্ত্র কারণ আমাদের চরিত্র আর দর্শনের উপর আমাদের এ যান্ত্রিক যুগই চালাচ্ছে কর্তৃত্ব। বস্তুতে একটা নক্শা আছে বইকি কিন্তু তা তার ভিতরে, বাইরে নয়—সব অংশের একটা আভ্যন্তরিক উদ্দেশ্য আছে তবে তা সমগ্রের উদ্দেশ্য আর কর্মের দ্বারাই হয় নিয়ন্ত্রিত। জীবন মানে উদ্যোগ গ্রহণ, উপরের দিকে, সামনের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলা: "সব সময় অবিরাম বিশ্বের প্রজনন-প্রেরণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব করা।" এ হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তার আর আকস্মিক দুর্ঘটনার বিপরীত —এখানে সব সময় আত্ম-প্রেরণার ইঙ্গিত রয়েছে বৃদ্ধি বা বিকাশের দিকে। আবার এর বিরুদ্ধে আছে বস্তুর ভাটি-টান, বিরতি, বিশ্রাম আর মৃত্যুর দিকে সবকিছুর মন্থরতা আর শৈথিল্য। প্রতি পদেই জীবনকে তার বাহনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলতে হয়, যদি নব জন্মদানের ফলে মৃত্যুকে তার পক্ষে জয় করা সম্ভবও হয় তা হলেও প্রতিবারই এক একটা রক্ষী-দুর্গ তাকে ছাড়তেই হয়—অবশেষে ধ্বংস আর নিষ্ক্রিয়তার হাতে প্রতিটি ব্যক্তিগত দেহকে করতেই হয় আত্মসমর্পণ। এমনকি দাঁড়ানো মানে বস্তু আর বস্তুর 'আইন-কানুন'কে উপেক্ষা করা—ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো, এগিয়ে চলা, সন্ধান করা, প্রতীক্ষা করা (অবশ্য উদ্ভিদের মত নয়) এসবও প্রতিমুহূর্তের ক্লান্তি আর উদ্যোগেরই ফল। সচেতনতাও হারিয়ে যায় যদি তাকে সহজাত-বৃত্তির স্বয়ংক্রিয় অভ্যাস আর নিদ্রায় মগ্ন হতে দেওয়া হয়।

সূচনায় জীবনও প্রায় পদার্থের মতই নিষ্ক্রিয় ছিল—ছিল প্রায় নিশ্চল হয়ে, যেন গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি এত দুর্বল ছিল যে গতির ঝুঁকি নিতেই ছিল অপারগ। বিকাশের এক মহারাজপথে এ গতিহীন নিশ্চলতাই ছিল যেন জীবনের লক্ষ্য—নুয়ে পড়া লিলি আর সুগম্ভীর ওক্‌বৃক্ষ যেন ছিল 'নিরাপত্তা'-রূপ দেবতার বেদি। কিন্তু উদ্ভিদের এ নিশ্চল জীবন নিয়ে জীবন সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, তাই সব সময় তার গতি হয়েছে নিরাপত্তা থেকে দূরে স্বাধীনতার দিকে—খোল, আঁশ আর মোটা চামড়ার নিরাপত্তার ভার ঝেড়ে ফেলে মানুষ চেয়েছে পাখীর মতো মুক্ত আর সহজ হতে। "তাই ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত গ্রীক সৈন্যের জায়গা নিয়েছে এখন হাল্কা অস্ত্রধারী সৈনিক, বর্মাচ্ছাদিত নাইটকে এখন স্থান ছেড়ে দিতে হয়েছে অশ্বারোহীর অনুকূলে। জীবনের বিবর্তনের ব্যাপারে দেখা গেছে, সমাজ বিবর্তনের মতই ব্যক্তির ভাগ্যের বেলায়ও অধিকতর সাফল্য লাভ ঘটেছে ঐসব লোকের যারা নিয়েছে অধিকতর বিপদের ঝুঁকি।" তাই মানুষ নিজের দেহে আর বেশী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাড়াতে চায়নি বরং তার পরিবর্তে মানুষ বানিয়ে নিয়েছে হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি, যা প্রয়োজন না থাকলে সে রেখে দেয় এক পাশে সরিয়ে, সারাক্ষণ সব যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার এখন বয়ে বেড়ায় না মানুষ। এক সময় বিরাট হস্তী আর বিপুলাকায় বন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশুর মতো বড় বড় দুর্গ সব মানুষ পোষণ করতো—যার রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে মানুষ হারিয়েছে পৃথিবীর কর্তৃত্ব। হাতিয়ার যেমন একদিকে জীবনের সহায়ক তেমনি অন্যদিকে তার বাধারও সৃষ্টি করতে সক্ষম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সহজাত-বৃত্তি ও মনেরই হাতিয়ার—পরিবেশের যে প্রয়োজনে তার উদ্ভব তা তিরোহিত হলে স্থায়ীভাবে সংলগ্ন সব অঙ্গই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সহজাত বৃত্তি তৈরি হয়েই আসে আর সাধারণত পুরোনো আর বাঁধা-ধরা অবস্থায় বেশ স্থির ও সফল সাড়াই দিয়ে থাকে কিন্তু তা জীবকে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ায় না আর দেয় না এমন কোন নমনীয় মনোভাব যাতে মানুষ আধুনিক জীবনের ভাসমান জটিলতার-মোকাবেলা করতে সক্ষম। সহজাত-বৃত্তি হচ্ছে নিরাপত্তার বাহন, আর বুদ্ধি হচ্ছে দুঃসাহসিক স্বাধীনতার যন্ত্র। এ যেন যন্ত্রের অন্ধ আনুগত্যের মতো করেই জীবনকে গ্রহণ করা।

যন্ত্র বা বস্তুর মতো কোন জীবিত প্রাণী যদি কিছু করে বসে তখন আমরা যে হেসে উঠি তাও কত গুরুত্বপূর্ণ—যেমন কোন ভাঁড় যদি অকারণে হুঁচট খেয়ে পড়ে আর ঠেস দেয় অস্তিত্বহীন থামে অথবা আমাদের কোন প্রিয়জন যদি বরফ পথে হঠাৎ পড়ে যায় তখন আমরা আগে হেসে উঠতে চাই, পরে করি প্রশ্ন। এ যে জ্যামিতিক জীবন যাকে স্পিনোজা দৈবের সঙ্গে তালগোল পাকিয়েছেন তা আসলে হাসি-কান্নারই ব্যাপার—ওদের দর্শনে ঐভাবে বর্ণনা করা হাস্যাস্পদ আর লজ্জাকর। বিবর্তনের পথে জীবন হয়েছে তিন পথের পথিক: একপথে জীবন প্রায় উদ্ভিদের নিষ্ক্রিয় জড়তায় নিয়েছিল আশ্রয়। সময় সময় তাতে পেয়েছিল জড় নিরাপত্তা—এভাবে কেটেছে তার হাজার হাজার বছরের ভীরুজীবন। অন্যপথে তার শক্তি আর উদ্যোগ দানা বেঁধেছে সহজাত বৃত্তিতে, যেমন দেখা যায় পিঁপড়ে আর মৌমাছিতে। কিন্তু মেরুদণ্ডী হয়ে ওঠার পরই সে হয়েছে স্বাধীনতার সাহসে সাহসী, সদ্য তৈরী সহজাত-বৃত্তির বাঁধন ছিঁড়ে অমিত দুঃসাহসে এগিয়ে চলেছে সে চিন্তার অসীম বিপদের দিকে। সহজাত-বৃত্তি কিন্তু এখনো বিশ্বের মর্মোপলব্ধি আর বাস্তব-দর্শনের এক গভীর পন্থা হয়েই আছে—কিন্তু বুদ্ধিক্রমেই সাহস আর শক্তিতে বেড়ে চলেছে, বেড়ে গেছে তার পরিধিও। অবশেষে জীবন ন্যস্ত করেছে তার স্বার্থ আর আশাকে এ বুদ্ধির উপরই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ অনবরত সৃষ্টিশীল জীবন—প্রতিটি ব্যক্তি আর প্রজাতিতে চলছে যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আমাদের ধারণা তাই ঈশ্বর—জীবন আর ঈশ্বর এক। এ ঈশ্বর চরম বটে কিন্তু সর্বশক্তিমান নয়—বস্তু সীমায় আবদ্ধ, এক এক পা করে অনেক কষ্টে নিষ্ক্রিয়তাকে তাঁর করতে হয় পরাভূত। এ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বা সর্বদর্শীও নয়। ক্রমে হাৎড়িয়ে হাৎড়িয়েই তাঁকে জ্ঞান, সচেতনতা আর 'অধিকতর আলো'র দিকে যেতে হয় এগিয়ে। "এ ঈশ্বর তৈয়েরি মাল নয়, তিনি অবিরাম জীবন, কর্ম আর স্বাধীনতা। এভাবে সৃষ্টিকে বুঝতে চেষ্টা করলে তা মনে হবে না কিছুমাত্র রহস্যময়—যখন আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি তখন তার অভিজ্ঞতা আমরা নিজের ভিতরই অনুভব করতে পারি"—যখন আমরা সচেতনভাবে নির্বাচন করে নিই আমাদের কাজ আর নিজের জীবনের পরিকল্পনা নিজেই করি। আমাদের সংগ্রাম আর দুঃখভোগ, আমাদের উচ্চাশা আর পরাজয়, আরো উন্নত ও শক্তিমান হয়ে ওঠার আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা—এ সব আমাদের ভিতরকার 'মহাজীবনী' শক্তিরই ধারা ও আওয়াজ, এ মহাপ্রেরণাই আমাদেরে বাড়িয়ে তোলে আর আমাদের এ ভ্রাম্যমাণ গ্রহটাকে করে তোলে অশেষ সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ করে।

AMARBOI.COM

কে জানে, জীবন অবশেষে তার চির-পুরাতন শত্রু জড়-বস্তুর উপর হয়তো তার মহত্তর বিজয় একদিন লাভ করবেই, এমনকি হয়তো সক্ষম হবে মৃত্যুকেও ফাঁকি দিতে। এমনকি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও আমাদের মনটা খোলা রাখা উচিত। কাল সদয় হলে জীবনে সবকিছুই সম্ভব। মাত্র হাজার বছরের এক মুহূর্তে য়ুরোপ আমেরিকার জঙ্গলে মানুষের জীবন আর মন কি অসাধ্য সাধনই না করেছে। এ অবস্থায় জীবনের সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি কি এক চরম বোকামি নয়? "পশুদের স্থান উদ্ভিদের উপরে—মানুষ অতিক্রম করে যায় পশুত্বকে, স্থান আর কালের সীমায় সমস্ত মানবতা যেন এক ধাবমান বিরাট বাহিনী হয়ে আমাদের প্রত্যেকের সামনে, পাশে আর পেছনে থেকে সব বাধাবিঘ্ন হটিয়ে, প্রবল সব অন্তরায় দূর করে, এমন কি সম্ভবত মৃত্যুকেও জয় করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরে অনবরত তাড়না করছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. সমালোচনা

বার্গসঁ বলেছেন : "দর্শনে অপরের মতামত খণ্ডনে যে সময় ব্যয় করা হয় তা প্রায়ই ব্যর্থ। অনেক চিন্তাবিদ যে একে অপরের প্রতি নানা আক্রমণ চালিয়েছেন তার কতটুকুই এখন টিকে আছে? কিছুই না অথবা অতি সামান্যই। প্রত্যেকে যেটুকু সদর্থক সত্যের অবদান রেখে যেতে পারবে সেটুকুই শুধু টিকে থাকবে আর হবে গণ্য। সত্য উক্তি নিজেই ভুল মতামত দূর করতে সক্ষম—ঐ সব চেয়ে উত্তম প্রতিবাদ বা খণ্ডন, এ অবস্থায় কারো মতামত খণ্ডনের জন্য আমাদের কষ্ট স্বীকারের কোন প্রয়োজনই নেই। এ হচ্ছে জ্ঞানের কথা। কোন দর্শনকে "প্রমাণ" বা "অপ্রমাণ" করতে যাওয়া মানে অপর দর্শনকে একটা অকারণ সুযোগ দেওয়া, আগেরটার মতই হয়তো এও আশা আর অভিজ্ঞতার এক ভ্রান্তিশীল মিশ্রণ। অভিজ্ঞতার প্রসার আর আশা-বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই, যে সবকে এতকাল 'মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দিয়েছি তাতেই নিহিত অধিকতর 'সত্য'—সম্ভবত আমাদের যৌবনের চিরন্তন সত্যে অর্থাৎ তখন যে সবকে আমরা চিরন্তন সত্য বলে মনে করতাম তাতে রয়েছে অধিকতর মিথ্যা এও এখন বুঝতে পারছি। বিদ্রোহের পাখায় ভর করে আমরা যখন ঊর্ধ্বগামী হই তখন প্রাকৃতনবাদ আর যান্ত্রিকতা আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠে। ওদের স্বভাবে রয়েছে মনুষ্যদ্বেষী এক শয়তানী বুদ্ধি কিন্তু হঠাৎ যখন পর্বত গোড়ায় মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটে তখন আমরা তাকে অতিক্রম করে নতুন আশা দেখতে চেষ্টা করি। এ দর্শন যুগেরই ব্যাপার। তা সত্ত্বেও....

বার্গসঁ পড়তে গেলে প্রথমেই মুগ্ধ হতে হয় তাঁর অপূর্ব রচনাশৈলী দেখে : নীট্শের অত্যুজ্জ্বল কূটাভাসের অগ্নিকাণ্ড এখানে দেখা যায় না সত্য কিন্তু ফরাসী গদ্যের অসাধারণ স্বচ্ছতার যে ঐতিহ্য তা রক্ষা করার এক অধ্যবসায়ী স্বাক্ষরের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর রচনা। অন্য ভাষার তুলনায় ফরাশীতে ভুল করা কিছু কঠিন—ফরাশীরা অবোধ্যতা কখনো বরদাস্ত করে না আর গল্প-কাহিনীর চেয়ে সত্য আরো স্বচ্ছতর। সময় সময় বার্গসঁতেও যে অবোধ্যতা দেখা যায় তার কারণ কল্পচিত্র, উপমা আর দৃষ্টান্তের ব্যবহারে তিনি ছিলেন বেহিসেবী ও অকৃপণ। রূপকের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর ছিল প্রায় সেমিটিক-সুলভ আকর্ষণ আর সময় সময় সুকৌশলে উদ্ভাবিত উপমা প্রয়োগ করে বসতেন স্বীকৃত প্রমাণের পরিবর্তে। স্বর্ণকার বা জমির দালাল কবি সম্বন্ধে যেমন আমাদের সতর্ক থাকতে হয় তেমনি আমাদের সজাগ থাকতে হবে এ কল্পচিত্র নির্মাতা সম্বন্ধেও—যদিও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করব যে তাঁর 'সৃষ্টিশীল বিবর্তন' তথা Creative Evolution এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক অবদান।

সহজাত-বৃত্তিকে একেবারে রাজাজ্ঞার মতো মনে না করে তিনি যদি আরো ব্যাপক জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধির সমালোচনা করতেন তা হলে দেওয়া হতো অধিকতর বিজ্ঞতার পরিচয়। বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মতই অন্তর্মুখীন সহজাত-বৃত্তি ও ভুলের অধীন—বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরেই প্রত্যেকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সংশোধন হওয়া উচিত। প্রত্যেকের প্রতি আমাদের আস্থাও হবে শুধু ততখানি যতখানি তারা আমাদের কর্মের অগ্রগতির হবে সহায়ক আর সক্ষম হবে তাকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে। জীবন আর বাস্তবতার পরিবর্তনের চেয়ে বুদ্ধি শুধু অবস্থাটুকুই ধরতে সক্ষম এ সম্বন্ধে বার্গসঁর বিশ্বাস ছিল বড্ড বেশী। বার্গসঁর আগেই জেম্‌স্ (James) দেখিয়েছেন, চিন্তা হচ্ছে পরিবর্তনশীল এক ভাব-স্রোত। চিন্তার স্রোত বয়ে যাওয়ার সময় স্মৃতি যে বিন্দুগুলো নির্বাচন করে নেয় তাই ভাব বা Idea আর মানসিক স্রোত-ধারাতেই যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় জীবনের গতি আর উপলব্ধির ধারাবাহিকতা।

এ সবল প্রতিবাদের ফলে মাত্রাধিক বুদ্ধিচর্চা যে বাধা পেয়েছে তা ভালো কিন্তু চিন্তার বদলে সহজাত-বৃত্তিকে বেশী পাত্তা দেওয়া হবে নির্বুদ্ধিতা যেমন নির্বুদ্ধিতা যৌবনের খেয়াল খুশীকে শৈশবের পরীর কাহিনী দিয়ে সংশোধন করতে যাওয়া। পেছনের দিকে না তাকিয়ে সামনে যাতে কোন ভুল না ঘটে তাই আমাদের দেখা উচিত। পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টের জন্য বুদ্ধিই দায়ী একথা শুধু এক দুঃসাহসী পাগলই বলতে পারে। চিন্তার বিরুদ্ধে রুশো, শাতুব্রিঁয়া (Chataubriand) থেকে বার্গসঁ, নীটসে আর জেম্‌স্ যা বলেছেন তাতেই কাজ হয়েছে। যুক্তির দেবীকে সিংহাসনচ্যুতা করতে আমরা খুবই প্রস্তুত যদি না আমাদের সহজাত-বৃত্তিরূপ দেব-মূর্তির বেদীমূলে বাতি জ্বালাতে বলা না হয়। সহজাত বৃত্তির সাহায্যে মানুষ বেঁচে থাকে বটে কিন্তু তার অগ্রগতি সাধিত হয় বুদ্ধির দ্বারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়বাদী যান্ত্রিকতার প্রতি বার্গসঁ যে আক্রমণ চালিয়েছেন তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। আমাদের গবেষণাগারের পণ্ডিতেরা তাঁদের শ্রেণী-বিভাগ নিয়ে খুবই আস্থাশীল হয়ে আছেন আর ভাবছেন সমস্ত বিশ্বটাকেই তাঁদের টেষ্ট-টিউবে নিঙ্‌ড়িয়ে নেওয়ার কথা। জড়বাদ হচ্ছে একরকম ব্যাকরণ—ও শুধু স্বীকার করে নাম-বাচক শব্দ বা বিশেষ্য কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ভাষা, যাতে কর্ম যেমন আছে তেমনি আছে উদ্দেশ্যও, ক্রিয়া যেমন আছে সত্ত্ব বা দ্রব্যবাচক শব্দও আছে, তাতে জীবন আর গতির সঙ্গে বস্তুরও আছে স্থান। কেউ হয়তো অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত ইস্পাতের 'ক্লান্তির' মতো স্রেফ আণবিক স্মৃতি কি তা বুঝলে বুঝতে পারে কিন্তু আণবিক দূরদর্শিতা, আণবিক পরিকল্পনা আর আণবিক আদর্শবাদের বেলায় অবস্থা কি হবে? বার্গসঁ যদি কিছু পরিচ্ছন্ন সংশয়বাদের সাথে এ সব নতুনতর মতবাদের সম্মুখীন হতেন তা হলে তিনি হয়তো কিছুটা কম গঠনশীল হতেন কিন্তু এতখানি জবাবদিহির মোকাবেলা তাঁকে করতে হত না। তাঁর পদ্ধতি রূপ নিতে শুরু করতেই তাঁর সন্দেহ দূর হতে থাকে। তিনি কখনো 'পদার্থ' কি তা জানতে চাননি—আমরা যেভাবে পদার্থকে নির্জীব নিষ্ক্রিয় মনে করি তার চেয়ে তা কম নিষ্ক্রিয়ও তো হতে পারে, জীবনের শত্রু না হয়ে তার মন জামিন থাকলে তা হয়তো জীবনের স্বেচ্ছানুগত ভৃত্যও তো হতে পারে। তিনি মনে করেন বিশ্ব আর আত্ম-শক্তি, দেহ আর আত্মা, বস্তু আর জীবন এরা একে অপরের শত্রু। কিন্তু বস্তু আর দেহ এবং "পৃথিবী" এসব তো স্রেফ উপকরণ যা প্রতীক্ষা করে আছে বুদ্ধি আর সঙ্কল্পের দ্বারা গড়ে ওঠার জন্য। এসবও যে জীবনের রূপ ও মনের সূচনা নয় তা কে জানে? হয়তো হিরোক্লিটাস (Heraclitus) বলতেন: এখানেও দেবতা আছেন।

ডারউইনবাদের প্রতি বার্গসঁর যে সমালোচনা তা তাঁর জীবনী শক্তিরই যেন সাক্ষাৎ পরিণতি। লেমার্ক (Lemark) যে ফরাশী ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি ছিলেন তার বাহক—তিনি বিবর্তনে দেখতে পেয়েছেন উদ্দীপনা আর আকাঙ্ক্ষাকে এক সক্রিয় শক্তি রূপে। স্পেন্সার যে মনে করতেন গতির বিচ্ছিন্নতা আর বস্তুর যান্ত্রিক সমন্বয়ের ফলেই বিবর্তন ঘটে এ মতবাদ বার্গসঁর তেজস্বী মেজাজ মানতেই পারেনি। তাঁর কাছে জীবন এক সৃদর্থক শক্তি, আকাঙ্ক্ষার অবিরাম অনুসরণে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গড়ে তোলারই এ এক চেষ্টা। জীববিদ্যা সম্বন্ধে বার্গসঁর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়, জীব-বিদ্যার সব রকম সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর পরিচয়—এমনকি সাময়িকীর পৃষ্ঠায় সমকালীন বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সব রচনা দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষার অপেক্ষায় পড়ে থাকতো তাও তিনি বাদ দিতেন না। তাঁর পাণ্ডিত্যে ফুটে উঠতো এক শোভন নম্রতা—স্পেন্সারের মতো তাঁর রচনা অমন হস্তী-মার্কা অতিকায় গাম্ভীর্যে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। যাই হোক তাঁর ডারউইন সমালোচনা সফল হয়েছে, বিবর্তন মতবাদ সম্বন্ধে, বিশেষভাবে ডারউইনীয় অনেক লক্ষণই এখন হয়েছে পরিত্যক্ত।

বহু ব্যাপারে বার্গসঁর সঙ্গে ডারউইন যুগের যে সম্পর্ক তার সঙ্গে ভল্টেয়ারের সঙ্গে কান্টের সম্পর্কের সাদৃশ্য রয়েছে। বেকন আর দেকার্তে থেকে যে এক বিরাট ধর্ম-নিরপেক্ষ ঢেউ উঠেছিল, যা ছিল অংশত এক বুদ্ধিজীবীসুলভ নাস্তিক্য, যার পরিণতি দিদারো (Diderot) আর হিউমের সংশয়বাদ—তার বিরুদ্ধে কান্ট অবতীর্ণ হয়েছিলেন সংগ্রামে। তাঁর বক্তব্য অলৌকিক সব সমস্যার ক্ষেত্রে বুদ্ধি কখনো শেষ কথা হতে পারে না। ভল্টেয়ার আর ভল্টেয়ারের অতিরিক্ত ভক্তরা প্রাচীন ধর্মমতকে লক্ষ্য করে যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন ডারউইন অজ্ঞাতে আর স্পেন্সার জ্ঞাতভাবে তার প্রতি শুরু করেছিল পুনরাক্রমণ আর যে যান্ত্রিক জড়বাদ কান্ট আর শোপেনহাওয়ারের আগেই প্রায় হটে গিয়েছিল তা আমাদের শতাব্দীর শুরুতেই আবার পুরোনো বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল মাথা চাড়া দিয়ে। বার্গসঁ তাকে লক্ষ্য করেই চালালো আক্রমণ, কান্টীয় ধরনে জ্ঞানের সমালোচনা করে নেয় অথবা আদর্শবাদীদের মতো বস্তু শুধু মন দিয়েই জানা যায় এ যুক্তি দিয়েও নয় বরং শোপেনহাওয়ারের অনুসরণে—তন্ময় আর মন্ময় জগতে এমন এক উদ্দীপনাময় নীতি আর সক্রিয় অন্তঃশক্তির সন্ধান করে যা হয়তো জীবনের রহস্য আর সূক্ষ্মতাকে আরো বোধগম্য করে তুলতে হবে সক্ষম। এক অতুলনীয় শক্তি আর মনোহর ভাষায় তিনি পেশ করেছেন তাঁর যুক্তি।

বার্গসঁ যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে এত দ্রুত পেঁৗছেছেন তার কারণ তিনি মানব মনের চিরন্তন আশার বাণীই শুনিয়েছেন মানুষকে। মানুষ যখন দেখতে পেলো দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা না হারিয়েও তারা অমরতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ঐশীশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারছে তখন তারা খুশী আর কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলো। বার্গসঁর বক্তৃতা-কক্ষ হয়ে উঠলো যতসব সুন্দরী মহিলাদের বৈঠকখানা—তাঁদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সপক্ষে এমন প্রাঞ্জল বক্তৃতা শুনে তাঁরা হয়ে উঠলেন উৎফুল্ল। আশ্চর্য, এঁদের সঙ্গে এসে জুটেছিল ফরাশী সিণ্ডিকেটের উৎসাহী সদস্যগণও। বার্গসঁর মননশীলতার সমালোচনায় তাঁরা খুঁজে পেলেন তাঁদের "কম চিন্তা বেশী কাজ" এ নীতিরই সাফাই। কিন্তু এমন হঠাৎ জনপ্রিয়তার জন্য এবার তাঁকে দিতে হলো মূল্য—বার্গসঁর সমর্থকদের পরস্পর বিরোধী স্বভাব তাদের মধ্যে নিয়ে এলো বিচ্ছিন্নতা। মনে হলো বার্গসঁর ভাগ্যও বুঝি হবে স্পেন্সারের অনুরূপ—যিনি নিজের খ্যাতির দাফন-ক্রিয়ায় অংশ নিতেই যেন ছিলেন বেঁচে।

তবুও সমকালীন দর্শনে তাঁর অবদানই সবচেয়ে মূল্যবান। বস্তুর প্রতারণামূলক আকস্মিকতা সম্বন্ধে জোরালো মন্তব্যের যেমন ছিল প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ছিল আমাদের মনের পুনর্গঠন কর্ম সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হওয়ার। আমরা প্রায় ভাবতে বসেছিলাম পৃথিবী বুঝি এক তৈরী মাল, আগে থেকে ঠিক করে রাখা এক প্রদর্শনী মাত্র—তাতে আমাদের উদ্যোগ গ্রহণ স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা আর আমাদের সব চেষ্টা যেন দেবতাদের এক শয়তানী ঠাট্টা। বার্গসঁর পরে আমরা বিশ্বকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সব রকম মৌলিক শক্তির এক ক্ষেত্র আর উপকরণ হিসেবেই তাঁর আগে আমরা ছিলাম এক বিরাট মৃতযন্ত্রের স্রেফ চাকা আর আঁটুনি পেরেক। এখন ইচ্ছা করলে আমরা সৃষ্টি-নাটকে আমাদের নিজেদের ভূমিকা লেখায়ও করতে পারি সাহায্য।

২. বেনেদেত্তো ক্রোচে (Benedetto Croce)

ক. ব্যক্তি-পরিচয়

বার্গসঁ থেকে ক্রোচে এক অসম্ভব কালান্তর—কোথাও উভয়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না কোন সমান্তরাল রেখা। বার্গসঁ যেন এক অতীন্দ্রিয়বাদী যিনি এক বিভ্রান্তিকর স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজের কল্পনাকে দেন রূপ। আর ক্রোচে ত সংশয়বাদী—জার্মেন দুর্বোধ্যতাই যেন তাঁর দৈব-লব্ধ শক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার্গসঁ যদিও ধর্ম-মনা, কথা বলেন কিন্তু পাক্কা অভিব্যক্তিবাদীর মতই। ক্রোচে যাজক-বিরোধী, লেখেন কিন্তু আমেরিকান হেগেল-পন্থীদের মতই। বার্গসঁ ফরাসী য়ূহুদী-স্পিনোজা আর লেমার্কের ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী। ক্রোচে ইতালীয় ক্যাথলিক বটে কিন্তু তার পাণ্ডিত্য আর সৌন্দর্য প্রীতি ছাড়া ধর্মের আর কোন ধারই তিনি ধারতেন না।

গত শত বছরের দর্শনের ইতিহাসে ইটালীর আনুপাতিক অনুর্বরতার আংশিক কারণ সম্ভবত তার চিন্তাবিদদের পুরোনো ধর্ম-শাস্ত্রকে ত্যাগ করে পণ্ডিতি দৃষ্টিভঙ্গী আর ধরন–ধারণ আঁকড়ে থাকাই। (আরো বড় কারণ হয়তো শিল্প আর সম্পদের উত্তরাভিযান।) ইটালী এমন এক দেশ যাতে রেনেসাঁস এসেছিল বলা যায় কিন্তু ঘটেনি কোন কালে কোন সংস্কার আন্দোলন (Reformation)। ইটালী সৌন্দর্যের জন্য ধ্বংস হতে প্রস্তুত কিন্তু সত্যের চিন্তা শুরু করলেই হয়ে পড়ে সংশয়বাদী। হয়তো ইটালীবাসীরা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান কারণ তারা বুঝতে পেরেছে সত্য হচ্ছে এক মায়া-মরীচিকা আর সৌন্দর্য যতই মন্ময় (Subjective) হোক না কেন তা হচ্ছে এক প্রাপ্তিযোগ্য সম্পদ আর বাস্তবতা। রেনেসাঁসের শিল্পীরা (একমাত্র ব্যতিক্রম বিষণ্ণ প্রকৃতির প্রায় প্রোটেস্টেন্ট মাইকেলোঞ্জেলো—যাঁর তুলিতে শোনা যেতো সেভোনারোলার (Savonarola) কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি) শাস্ত্র আর নীতি নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতো না, গির্জা তাঁদের প্রতিভা স্বীকার করে আর তাঁদের বিলগুলি নিয়মিত পরিশোধ করে দেয় এতেই তাঁরা খুশী। ইটালীতে এ ধারণা প্রায় অলিখিত আইনে পরিণত হয়েছিল যে সংস্কৃতিমনা লোকেরা কোনদিন গির্জার দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাবে না। যে গির্জা সমস্ত জগতকে কেনোসায় (Canossa) নিয়ে এসেছে আর ইটালীকে বিশ্বের আর্ট গ্যালারিতে পরিণত করার জন্য প্রতিটি ভূখণ্ডের উপর ধার্য করেছে রাজকীয় কর সে গির্জার প্রতি কোন ইটালীবাসী কি বিরূপ হতে পারে?

কাজেই ইটালী অটল থেকে গেলো পুরোনো বিশ্বাসে আর দর্শন ব্যাপারে একুইনাসের (Aquinas) Summed বা সংক্ষিপ্ত-সার নিয়েই রইল সন্তুষ্ট। গিয়ামবেটিস্টা ভিকোর আবির্ভাবের পর তিনি আবার ইটালীর মনকে একটুখানি আলোড়িত করে তুলেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর মনে হলো দর্শনের বুঝি মৃত্যুই ঘটলো এবার। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় রসমিনি (Rasmini) বিদ্রোহের কথা ভেবেছিলেন কিন্তু শেষে তিনিও করে বসলেন আত্মসমর্পণ। সারা ইটালীব্যাপী মানুষ অধিকতর ধর্মহীন হয়ে উঠলো বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর অনুগত হয়ে পড়লো গির্জার প্রতিও।

তার মধ্যে বেনেদেত্তো ক্রোচে হলেন ব্যতিক্রম। একুইলা (Aquila) প্রদেশের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহরে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম—তিনি ছিলেন এক স্বচ্ছল গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের একমাত্র পুত্র। তাঁকে ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রে এতবেশী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে শেষকালে ভার-সাম্য অর্জনের জন্যই যেন তিনি হয়ে পড়েছিলেন নাস্তিক। যে সব দেশে 'সংস্কার আন্দোলন' ঘটেনি সেখানে অবিশ্বাস আর গোঁড়ামির মাঝখানে গড়ে ওঠেনি কোন মধ্যপথ। জীবনের যে সব নির্মম আঘাতের ফলে মানুষের মন বিশ্বাসের পথে ফিরে যায় ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তেমন আঘাত নেমে এলো তাঁর জীবনে। এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষুদ্র ক্যাসামিচিউলা (Casamicciola) শহর—যেখানে তখন ক্রোচেরা বাস করছিলেন, একদিন আলোড়িত হয়ে উঠলো—বেনোদত্তো হারালেন একসঙ্গে পিতা-মাতা আর একমাত্র বোনকে, ভাঙা হাড়গোড় নিয়ে তিনিও চাপা পড়ে রইলেন কয়েক ঘণ্টা। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে তাঁর কয়েক বছরই কেটে গেলো—কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবন আর কাজে প্রমাণ পাওয়া গেলো শরীর ভাঙলেও মন তাঁর ভাঙেনি। রুটিন-বাঁধা শান্তিময় বিশ্রাম অধ্যয়ন তথা পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর মনের অনুরাগ দৃঢ়তর করে তুলেছিল—এ দুর্ঘটনার ফলে তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন তাঁর সামান্য পুঁজি দিয়ে এক চমৎকার লাইব্রেরীর মালিক হতে। দারিদ্র্য বা অধ্যাপনার শাস্তিভোগ না করেও তিনি হয়ে পড়লেন এবার দার্শনিক। "কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি থাকলেই বিজ্ঞতা ভালো"—এই বাইবেলীয় সাবধানী উপদেশ-বাণীর সত্যতা তিনি এবার উপলব্ধি করতে পারলেন।

সারা জীবনই তিনি রয়ে গেছেন ছাত্র—তাঁর একমাত্র প্রিয় ছিল লেখাপড়া আর বিশ্রাম। তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল রাজনীতির সঙ্গে, তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল জনশিক্ষার মন্ত্রী—সম্ভবত এ করা হয়েছিল রাজনীতিবিদদের মন্ত্রী সভার গায়ে একটুখানি দার্শনিক মর্যাদার রং লাগাবার জন্যই। তাঁকে করা হলো ইটালীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিনেটের সদস্য—আর তখনকার ইটালীয় আইন অনুসারে, একবার সিনেটর হওয়া মানে চিরজীবনের জন্য সিনেটর থাকা। (কারণ সিনেটর পদ ছিল তখন আজীবনের জন্য)। একই মানুষ যে একই সঙ্গে সিনেটর আর দার্শনিক হতে পারে—যা প্রাচীন রোমে বিরল ঘটনা না হলেও আমাদের এ যুগে এক অসাধারণ ব্যাপার—তার দৃষ্টান্ত ক্রোচেই স্থাপন করলেন। তাঁর ভূমিকা হয়তো আয়াগোর (Iago) পছন্দ হতো। কিন্তু রাজনীতিকে তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেননি—তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটতো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত লা ক্রিটিক (La Critica) সাময়িকী সম্পাদনায়—যার পৃষ্ঠায় তিনি আর গিয়োভান্নি জেন্টাইল (Giovanni Gentile) মিলে চিন্তা-জগৎ আর বেলে লেটারের (Belles Lettres) করতেন কাব-ব্যবচ্ছেদ।

যখন ১৯১৪-এর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো তখন সামান্য অর্থনৈতিক সমস্যা এত বড় একটা যুদ্ধ ঘটিয়ে য়ুরোপীয় মনের বিকাশের পথে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করবে এ কল্পনায় ক্রোচে রেগে ফেটে পড়লেন। এ এক আত্মঘাতী পাগলামী বলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর প্রতিবাদ জানালেন। যখন ঘটনাস্রোতে ইটালীও মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো তখনো তিনি রইলেন নির্লিপ্ত—ফলে ইংলণ্ডে বার্ট্রাণ্ড রাসেল আর ফ্রান্সে রোমা রোঁলার মতো তিনিও ইটালীতে হারিয়ে বসলেন জনপ্রিয়তা। পরে অবশ্য ইটালী তাঁকে ক্ষমা করেছিল আর দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁকে দেখতে লাগলো তাদের এক নিরপেক্ষ পথনির্দেশক, দার্শনিক আর বন্ধু হিসেবে—তাদের কাছে তিনি হয়ে পড়লেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মতোই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। গিয়োসেপ্পি নেটলি (Giuseppe Natoli) যে মন্তব্য করেছেন: "সমকালীন চিন্তার ক্ষেত্রে বেনোদত্তো ক্রোচের পদ্ধতিই সর্বোচ্চ বিজয়" এমন কথা আজকের দিনে মোটেও বিরল শ্রবণ নয়। এখন তাঁর এ প্রভাবের রহস্য সন্ধান করা যাক।

খ. আত্ম-শক্তির দর্শন

তাঁর প্রথম বই 'Historical Materialism and the Economics of Karl Marx' (১৮৯৫-১৯০০) মূলতঃ অবসর সময়ে লেখা কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ। তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন্টনিয়ো লেবরিয়োলার (Antonio Labriola) দ্বারা—তাঁর নির্দেশেই তিনি প্রবেশ করেছিলেন মার্ক্সের 'কেপিটেলের' (Kapital) গোলকধাঁধায়। তিনি বলেছেন: "মার্ক্সীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমার এ পরিচয় আর যে অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে আমি কিছুকাল ধরে ইটালী আর জার্মেনীর সমাজতান্ত্রিক পত্রিকাগুলি পড়তাম তাতে আমার সমস্ত সত্তাকে এক নবচেতনায় আলোড়িত করে তুলেছিল এবং প্রথমবারের মতো আমার ভিতরে জাগিয়ে তুলেছিল এক রাজনৈতিক উদ্দীপনা, বোধ করতে লাগলাম এক নতুনত্বের স্বাদ। আমার অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো যৌবন অতীত হয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে প্রথম প্রেমে পড়ার মতোই—যেন বুঝতে পারছি নতুন জেগে ওঠা কামনার রহস্যময় গতি-প্রকৃতি।" কিন্তু সমাজ-সংস্কারের সুরা তাঁর মাথায় কিছুতেই প্রবেশ করল না—তিনি অগৌণে মানবজাতির অদ্ভুত সব রাজনীতিকে মনে মনে মেনে নিয়ে এবার দর্শনের বেদীমূলেই নিজেকে করলেন উৎসর্গ।

এ অধ্যয়নের ফলে প্রয়োগ আর মঙ্গল, সৌন্দর্য আর সত্যের মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য আর সমতা রয়েছে এই বোধের উন্নয়ন ঘটলো তাঁর মনে। অবশ্য মার্ক্স আর এঙ্গেল্‌সের মতো অর্থনৈতিক ব্যাপারকে তিনি চরম গুরুত্ব দেননি। তিনি এঁদের প্রশংসা করেছেন এঁদের মতবাদের জন্যে, সে মতবাদ যতই অসম্পূর্ণ হোক, তা এমন এক প্রামাণ্য জগতের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যা এতকাল উপেক্ষিত ও অবহেলিত ছিল। কিন্তু ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভাষ্যই যে পরম রায় এ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন—তাঁর ধারণা এ হচ্ছে শৈল্পিক পরিবেশের কাছে এক ভারসাম্যহীন আত্মসমর্পণ। তিনি জড়বাদকে প্রবীণের উপযোগী দর্শন বা এমনকি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলেও স্বীকার করেননি—তাঁর কাছে মনই আদি ও চরম বাস্তবতা। তাই তিনি যখন তাঁর চিন্তা-পদ্ধতি লিখতে শুরু করেন তখন প্রায় মারমুখো হয়েই যেন তার নাম দিলেন: The Philosophy of the Spirit বা আত্মশক্তির দর্শন।

ক্রোচে ছিলেন আদর্শবাদী—হেগেলের পর কোন দর্শনকেই তিনি স্বীকার করতেন না। সব বাস্তবতাই চিন্তা বা ভাব—আমাদের চিন্তা আর চেতনায় রূপায়িত হওয়ার আগে আমরা কিছুই জানি না। তাই সব দর্শনকেই লজিকে পরিণত করা সম্ভব—আর সত্য মানে আমাদের ভাবরাশির

৩৬—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণ আর নিখুঁত সম্পর্ক। সম্ভবত ক্রোচে এ সিদ্ধান্তটা কিছু বেশীই পছন্দ করতেন—তবে আসলে তিনি হচ্ছেন যুক্তিপন্থী বা লজিকেল। এমনকি তাঁর 'Esthetics' বা নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে বইতেও লজিক সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছেদ জুড়ে দেওয়ার লোভ তিনি সামলাতে পারেননি। অবশ্য এটা সত্য যে মূর্ত সার্বজনীনতার অধ্যয়নকেই তিনি দর্শন আর বিমূর্ত সার্বজনীনতার অধ্যয়নকে বিজ্ঞান বলতেন কিন্তু এ হয়তো পাঠকদের দুর্ভাগ্য যে ক্রোচের মূর্ত সার্বজনীনতা সার্বজনীনভাবেই বিমূর্ত। মোট কথা তিনিও পাণ্ডিত্য ঐতিহ্যেরই ফসল—এমন সব নিগূঢ় বিশিষ্টতা আর শ্রেণী বিভক্তিকরণে তিনি এমন আনন্দ পেতেন যে ফলে বিষয় আর পাঠক উভয়কেই প্রায় তিনি শেষ করেই ছাড়তেন। তিনি সহজেই লজিকের কূটতত্ত্বে পড়তেন নেমে—কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেয়ে মতামত খণ্ডনেই তিনি থাকতেন সদা প্রস্তুত। নীট্‌শে যেমন ইটালীয়ানে পরিণত জার্মেন, তেমনি ক্রোচে হচ্ছেন জার্মেনে পরিণত ইটালীয়ান।

তাঁর প্রথম ট্রিলজীর (Trilogy) যে শিরোনাম—'Filosofia dello spirito—the Logic as the Science of Pure Concept (1905), এর চেয়ে কিছুই অধিকতর জার্মেন বা হেগেলীয় হতে পারে না। ক্রোচের ইচ্ছা ভাবকে যতখানি সম্ভব নির্মল বা স্বচ্ছ করা—তার মানে যতখানি আদর্শভিত্তিক করা সম্ভব ও যতখানি বিমূর্ত আর অপ্রায়োগিক করা যায় তা করা। যে ব্যবহারিক বিষয়-সূচী আর স্বচ্ছতার উদগ্র বাসনা উইলিয়াম জেমস্‌কে দর্শনের কুজ্‌ঝটিকার মাঝখানে আলোক-স্তম্ভ করে তুলেছে তার কোন পরিচয় এখানে নেই। ক্রোচে তাঁর কোন ভাবকেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করেননি বরং তিনি ব্যবহারিক বিষয়কে ভাব, সম্পর্ক আর পদার্থিক শ্রেণী-বিভক্তিকরণেই অধিকতর আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁর বই থেকে সব বিমূর্ত বা পারিভাষিক শব্দগুলি যদি বাদ দেওয়া হতো তা হলে অকারণ স্থূলতায় তারা ভুগতো না।

"খাঁটি ভাব" অর্থে ক্রোচে পরিমাণ, গুণ, বিবর্তন ইত্যাদির মতো সার্বজনীন ভাবকেই বুঝতেন অথবা বুঝাতেন যে কোন চিন্তা যা বাস্তবতার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব। এসব ভাবকে নিয়ে তিনি এমন ভেল্কি দেখাতে অগ্রসর হন যে যেন হেগেলের প্রেতাত্মা তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবতারকে—তিনি যেন দুর্বোধ্যতায় গুরুকেও হারিয়ে দিতে চান। এসবকে "লজিক" বলে অভিহিত করে তিনি যেন পরাবিদ্যার নিন্দা করছেন এ ভেবে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন—আর ভাবতেন পরাবিদ্যার ছোঁওয়া থেকে তিনি একদম মুক্ত। তাঁর ধারণা পরাবিদ্যা হচ্ছে শাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক অধ্যাপকগণ হচ্ছেন মধ্যযুগীয় শাস্ত্রেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ। সুকোমল বিশ্বাসের প্রতি এক কঠোর মনোভাব তিনি মিশিয়ে নিতেন তাঁর আদর্শবাদের সঙ্গে। তিনি ধর্ম মানতেন না—তিনি ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতায় ছিলেন বিশ্বাসী কিন্তু বিশ্বাস করতেন না আত্মার অমরতায়। সৌন্দর্যোপাসনা আর সাংস্কৃতিক জীবনকে তিনি মনে করতেন ধর্মের প্রতিভূ। "তাদের ধর্ম হচ্ছে আদিম মানুষের যত সব বুদ্ধিজাত পৈত্রিক সম্পত্তি আর আমাদের ধর্ম আমাদের বুদ্ধিজাত পৈত্রিক মিরাছ্।....যারা ধর্মকে মানুষের মানস-ক্রিয়া, মানুষের শিল্প-কলা, সমালোচনা আর দর্শনের পাশাপাশি রেখে দিতে চায় তারা ধর্মকে দিয়ে কি করবে তা আমাদের ধারণার অতীত।....দর্শন ধর্মের অস্তিত্বের সব কারণই দূরীভূত করে দেয়। আত্মার বিজ্ঞান হিসেবে ধর্মের প্রতি তার দৃষ্টি হচ্ছে একটা দৃশ্য বা ঘটনা বা এক অস্থায়ী ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি যেমন তাই—এক চিকিৎসার অবস্থা যা পার হয়ে যাওয়া সম্ভব।" অবাক হয়ে ভাবতে হয় এসব কথা পড়ার পর রোমের মুখের উপর লা গিউ-কোণ্ডার (La Gioconda) হাসি কি ভেসে ওঠেনি!

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন এক অপূর্ব দর্শন যা একইসঙ্গে যেমন প্রকৃতিবাদী তেমনি অধ্যাত্মবাদী, অজ্ঞেয়বাদী যেমন তেমনি অ-প্রাক্তন-বাদী, ব্যবহারিক আর আদর্শবাদী, অর্থনৈতিক আর নন্দনতাত্ত্বিক। একথা অবশ্য সত্য যে ক্রোচের আকর্ষণ জীবনের প্রয়োগের দিকের চেয়ে চিন্তার দিকেই বেশী ছিল কিন্তু তাঁর রচনার বিষয়বস্তুতেই প্রমাণিত মনের পণ্ডিতী প্রবণতাকে জয় করতে তাঁর মধ্যে সৎ প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। তিনি 'The Philosophy of the Practical' সম্বন্ধে এক বিরাট বই লিখেছেন যা অংশত হয়ে পড়েছে আর এক লজিক, যদিও ভিন্ন নামে আর অংশত 'স্বাধীন ইচ্ছা'র পুরোনো সমস্যারই এক পরা-বৈজ্ঞানিক আলোচনা। ইতিহাস যে গতিশীল দর্শন—এর সফল উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁর 'On History' নামক গ্রন্থে—আর দেখিয়েছেন যিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহাসিক তিনি মানুষ আর প্রকৃতিকে শুধু চিন্তা আর বিমূর্ত কল্পনার সাহায্যে না দেখিয়ে থাকেন কারণ আর ঘটনা-প্রবাহের বাস্তব ক্ষেত্রে, দেখান যেখানে সে সবের প্রকাশ ঘটছে কর্মে। ক্রোচে ভিচোকে (Vico) ভালোবাসতেন আর তাঁর পূর্ববর্তী এই ইটালীবাসী যে বলতেন —দার্শনিকদের দ্বারাই ইতিহাস লেখা হওয়া উচিত, এমত তিনিও সমর্থন করতেন। নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি অণুবীক্ষণিক পাণ্ডিত্যের সৃষ্টি করে বটে কিন্তু তার ফলে ঐতিহাসিক হারিয়ে বসেন সত্যবোধ কারণ তিনি অতি বেশী ওয়াকিবহাল। যেমন বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকরা যখন প্রমাণ করে ছাড়লেন যে ট্রয় বলে কোন নগরই ছিল না তখন শ্লিমান (Schlimann) একটি নয় সাত সাতটি ট্রয় পুড়িয়ে তবেই ক্ষান্ত হলেন। তাই ক্রোচে মনে করেন অতি-বেশী সমালোচনাপ্রবণ ঐতিহাসিকরা অতীত সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করে থাকেন।

'তরুণ বয়সে আমি যখন গবেষণাকর্মে রত ছিলাম তখন কিছুটা সাহিত্য-জ্ঞানসম্পন্ন এক বন্ধু যে মন্তব্য করেছিলেন তা আমার মনে পড়ছে। তাঁকে আমি প্রাচীন রোমের একটি সমালোচনামূলক ইতিহাস, বলা যায় অতি বেশী সমালোচনামূলক ইতিহাস, পড়তে ধার দিয়েছিলাম। পড়া শেষ করে বইটি ফেরৎ দেওয়ার সময় তিনি বল্লেন—"তিনিই যে সবচেয়ে বড় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত"—এ বই পড়ে গর্ব করার মতো এ বিশ্বাসটুকুই তাঁর মনে জন্মেছে। কারণ অনেক ক্লান্তিকর পরিশ্রমের পর তাঁরা জানতে পেরেছেন তাঁরা কিছুই জানেন না কিন্তু তিনি বিনাশ্রমে, স্রেফ প্রকৃতির মেহেরবাণীর দান হিসেবে, কিছুই পারেন না জানতে।' অতীতের খাঁটি ইতিহাস খুঁজে বার করা যে কঠিন ক্রোচে তা স্বীকার করতেন আর রুশোর ইতিহাসের এ সংজ্ঞা : "ইতিহাস হচ্ছে বহু মিথ্যা থেকে এমন একটিকে বেছে নেওয়ার কৌশল যা দেখাবে সত্যের অধিকতম প্রতিরূপ বলে"—প্রায় তিনি উদ্ধৃতি করতেন। হেগেল বা মার্ক্স বা বাক্‌লের (Buckle) মতবাদীদের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না—এঁরা তাঁদের নিজ নিজ সংস্কারের অনুকূল সিদ্ধান্তের উপযোগী করেই অতীতকে বিকৃত করে এক একটা অনুমান বাক্য দাঁড় করিয়েছেন। ইতিহাসে কোন পূর্ব পরিকল্পনা নেই—কাজেই যে দার্শনিক ইতিহাস লিখতে যাবেন তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষে প্রাকৃতিক পরিকল্পনা সন্ধানে রত হওয়া উচিত নয় বরং তাঁর উচিত কারণ, পরিণতি আর সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনে রত হওয়া। তাঁর এও জানা উচিত অতীতের ঐটুকুই মাত্র মূল্যবান যা গুরুত্বে আর দীপ্তিতে আজো সমকালীন। ইতিহাস সম্বন্ধে নেপোলিয়ন যে বলেছেন, "ইতিহাস হচ্ছে একমাত্র সত্যকার দর্শন আর একমাত্র সত্যকার মনোবিদ্যা"। শেষ পর্যন্ত ইতিহাস হয়তো এ হয়েই দাঁড়াবে অবশ্য যদি ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে প্রকৃতির প্রত্যাদেশ আর মানুষের দর্পণ হিসেবেই লিখতে শুরু করেন।

গ. সৌন্দর্য কি?

ইতিহাস আর সাহিত্য অধ্যয়নের পরই ক্রোচে শুরু করেছেন দর্শন অধ্যয়ন—কাজেই এ খুব স্বাভাবিক যে তাঁর দর্শন চর্চায় সমালোচনা আর নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যাবলী গভীর রেখাপাত করবে। তাঁর সর্বপ্রধান রচনা 'Esthetic' (১৯০২)। বিজ্ঞান আর পরাবিদ্যার চেয়ে তাঁর আকর্ষণ ছিল শিল্পকলার প্রতিই বেশী। বিজ্ঞান আমাদের প্রয়োজন মিটায় কিন্তু শিল্পকলা আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে সৌন্দর্য চেতনা। বিজ্ঞান আমাদের নিয়ে যায় বাস্তব আর ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে ক্রমবর্ধমান বিমূর্ত আর গাণিতিক জগতের দিকে—অবশেষে (যেমন আইনস্টাইনের বেলায়) তা এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে যার কোন ব্যবহারিক গুরুত্বই নেই। কিন্তু কলা-শিল্প সোজা আমাদের বিশেষ ব্যক্তির কাছে এনে হাজির করে আর হাজির করে মূর্ত এক ব্যক্তিতে—দার্শনিক সর্বজনীন সহজাত-বৃত্তি রূপায়িত হয়েছে তেমন অভিনব ঘটনার সামনে। "জ্ঞানের দু'টা দিক তা হয়তো সহজাত-বৃত্তিজাত জ্ঞান অথবা লজিক জাত জ্ঞান; যে জ্ঞান কল্পনার সাহায্যে আয়ত্ত হয়েছে অথবা যা আয়ত্ত হয়েছে বুদ্ধির মারফৎ; ব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান অথবা বিশ্বজনীন জ্ঞান; বিশেষ কোন বস্তুর জ্ঞান অথবা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞান; জ্ঞান হয় কল্প-চিত্রের (Images) অথবা উপলব্ধিরই ফসল।" তাই শিল্পের মূল উৎস নির্ভর করছে কল্প-চিত্র গঠনের শক্তির উপর। "শিল্প এক অভিনবভাবে কল্পনার দ্বারাই শাসিত। কল্প-চিত্র হচ্ছে তার একমাত্র সম্পদ। বস্তুকে তা ভাগ করে না, ঘোষণা করে না তা বাস্তব কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল্পনিক, করে না সীমিত। দেয় না তার কোন সংজ্ঞা—তা শুধু অনুভব করে আর প্রকাশ করে—করে না তার অতিরিক্ত কিছুই।" কল্পনা চিন্তার পূর্ববর্তী আর তার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে মনের শৈল্পিক বা কল্প-চিত্র গঠনী কর্ম-প্রচেষ্টার আবির্ভাব যুক্তি ও উপলব্ধি গঠনী কর্মপ্রচেষ্টার আগেই হওয়া উচিত। যুক্তিপ্রবণ হওয়ার অনেক আগে মানুষ যখন কল্পনা করতে শুরু করে তখনই তার ভিতর শিল্পী-সত্তার ঘটে জাগরণ।

বড় বড় শিল্পীদের এই ধারণা। মাইকেলেঞ্জেলোর মতে: "মানুষ হাত দিয়ে আঁকে না, আঁকে মস্তিষ্কের সাহায্যে", আর লিউনার্দো (Leonardo) লিখেছেন: "মহা প্রতিভাবানেরা যখন বাইরে তেমন কর্মব্যস্ত থাকেন না তখনই তাঁদের মন আবিষ্কার কর্মে সক্রিয় হয়ে ওঠে অধিকতর।" দা ভিঞ্চির (da Vinci) "Last Supper" নামক বিখ্যাত ছবির গল্প অনেকেরই হয়তো জানা আছে—ছবিটার অর্ডার দিয়েছিলেন এক মঠাধ্যক্ষ, তিনি যখন রোজ এসে দেখেন শিল্পী একটা সাদা ক্যানভাসের সামনে দিনের পর দিন শুধু বসেই আছেন, এখনো কোথাও তুলির ছোঁওয়াও লাগেনি। বিরক্ত মঠাধ্যক্ষ বার বার শুধু জানতে চান: কখন তিনি ছবিটা আঁকতে শুরু করবেন? ভদ্রলোককে, তাঁর অজ্ঞাতেই জুডাসের (Judas) মডেল করে নিয়ে শিল্পী তাঁর বিরক্তি প্রকাশের জন্য আচ্ছা প্রতিশোধই নিয়েছিলেন।

শিল্পীর মনের অভ্যন্তরে যে বিষয়-বস্তু রয়েছে তার একটা নিখুঁত রূপ উপলব্ধির জন্য এ রকম অটল প্রচেষ্টায় নিহিত রয়েছে নন্দনতাত্ত্বিক কর্মের সারকথা—এ একরকম সহজাতবৃত্তি, এর জন্য অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টি অনাবশ্যক। প্রয়োজন শুধু পূর্ণদৃষ্টি, পূর্ণ উপলব্ধি আর যথোপযুক্ত কল্পনা-শক্তি। কলা-শিল্পের রহস্য বাহ্যিকতায় নয় বরং ভাবের উপলব্ধিতেই নিহিত। বাহ্যিকতা তো যান্ত্রিক কারিগরি আর হস্ত কৌশলেরই ব্যাপার।

"মনের কথাটা যখন আমাদের দখলে এসে যায়, যখন পরিষ্কার আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোন চিত্র বা মূর্তির উপলব্ধি ঘটে আমাদের মনে, যখন কোন সংগীতের বিষয়বস্তু আমরা খুঁজে পাই আমাদের ভিতর, তখনই প্রকাশের ঘটে জন্ম, তখনই তা পায় পূর্ণতা, তখন অন্যসবকিছু হয়ে পড়ে অনাবশ্যক। তখন মুখ খুললেই তা হয় কথা বা গান⋯এতক্ষণ যা মনে মনে বলেছি এখন তা শুধু উচচরবে বলছি মাত্র। এতক্ষণ ভিতরে যে গান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিল সে গানই এখন উচ্চরবে হচ্ছে নির্গত। আমাদের হাত যদি পিয়ানোর চাবিতে চাপ দেয় অথবা আমরা যদি পেন্সিল বা বাটালটা হাতে নিই—এসবই আমাদের ইচ্ছাকৃত (এসব কাজ ব্যবহারিক দিকেরই অন্তর্গত —নন্দনতাত্ত্বিক কর্ম এগুলি নয়)—যে সব কাজ সংক্ষেপে আর ক্ষীপ্রতার সাথে আমরা আমাদের ভিতরে করে সেরেছি এখন তাই আবার আমরা দ্রুত গতিতে বাস্তবায়িত করছি শুধু।"

সৌন্দর্য কি? এ জটিল প্রশ্নের উত্তর এতেই কি আমরা খুঁজে পাচ্ছি? এখানেও দেখি সেই নানা মুনীর নানা মত। প্রত্যেক প্রেমিক-জনই মনে করেন এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ—তাঁর কথার প্রতিবাদ চলে না। ক্রোচের উত্তর হচ্ছে উপলব্ধ বস্তুর মর্ম বা সার যে মানসিক কল্প-চিত্রে (বা কল্প-চিত্র পরম্পরায়) বিধৃত হয় তাই সৌন্দর্য। ভিতরের কল্প-চিত্রেই সৌন্দর্য নিহিত— যে বাহ্যিক অবয়বে তা রূপ নিয়েছে তাতে নয়। আমরা মনে করি শেক্সপিয়র আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রধানত আঙ্গিক আর প্রকাশ ক্ষমতারই পার্থক্য এবং আমাদের ভাব এত গভীরে নিহিত যে তা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। কিন্তু এ হচ্ছে স্রেফ আমাদের এক ভ্রান্তি-বিলাস: কল্প-চিত্রকে বাহ্যিক রূপায়ণের যে ক্ষমতা তাতে পার্থক্যটা নিহিত নয় পার্থক্যটা নিহিত প্রকাশের বিষয়-বস্তুর আভ্যন্তরীণ কল্প-চিত্র নির্মাণের ক্ষমতার।

যে সৌন্দর্য-বোধ ধ্যান-নির্ভর সৃজন-নির্ভর নয়, তাও আভ্যন্তরীণ প্রকাশ—কোন শিল্পকর্মকে বুঝতে বা তার রস গ্রহণে যে ক্ষমতা তাও নির্ভরশীল যে বাস্তবকে চিত্রিত করা হয়েছে আমাদের সহজাত-বৃত্তি দিয়ে তা দেখার আমাদের যার যতটুকু যোগ্যতা তার উপর—এর জন্য আমাদের নিজেদেরও প্রকাশশীল কল্প-চিত্র নির্মাণের ক্ষমতা থাকা চাই। "কোন সুন্দর শিল্প কর্ম যখন আমরা উপভোগ করতে থাকি তখন সব সময় আমরা নিজেদের সহজাত বৃত্তিরই প্রকাশ করে থাকি।....শেক্সপিয়র পড়তে পড়তে আমি যখন মনে মনে হ্যামলেট বা ওথেলোর কল্প-চিত্র গড়ি তখন তাতে শুধু আমারই সহজাত বৃত্তির ব্যবহার করে থাকি।" সৃজন-রত শিল্পী আর সৌন্দর্য-মুগ্ধ দর্শক উভয়ের মধ্যেই সৌন্দর্য-রহস্য হচ্ছে প্রকাশশীল কল্প-চিত্র। সৌন্দর্য মানে যথোপযুক্ত প্রকাশ। যথোপযুক্ত না হলে যেহেতু তাকে কিছুতেই যথার্থ প্রকাশ বলা যাবে না, তখন সে পুরোনো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নের আমরা শুধু এ সহজ উত্তরটুকুই দিতে পারি ঃ সৌন্দর্য মানে প্রকাশ।

ঘ. সমালোচনা

এ সবই নক্ষত্রহীন আকাশের মতই পরিষ্কার—প্রয়োজনাতিরিক্ত বিজ্ঞতার কোন পরিচয় নেই এখানে। 'The Philosophy of Spirit'-এ স্পিরিট বা তেজের তেমন পরিচয় নেই—সহানুভূতিশীল ব্যাখ্যারও রয়েছে অভাব। 'The Philosophy of Practical' প্রায় অবাস্তব বল্লেই হয়—জীবনের সঙ্গেও নেই তার কোন সম্পর্ক। ইতিহাস আর দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব করে তিনি তাঁর 'On History' নামক বইতে সত্যের একটি মাত্র দিকই ধরতে পেরেছেন কিন্তু ইতিহাসকে শুধু বিশ্লেষণ-ধর্মী না হয়ে সমন্বয়-ধর্মী হতে হবে এবং তা হলেই তা দর্শন হয়ে উঠবে এ বুঝতে না পেরে সত্যের অন্য দিকটা তাঁর নজরেই পড়েনি। ইতিহাসকে খণ্ড খণ্ড করে (পৃথক পৃথক বইতে মানুষের কর্মকে—অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক আর শৈল্পিক ইত্যাদি ভাগে বিচ্ছিন্ন করা নয়) ভাগ না করে, একটা নির্দিষ্ট-কাল-সীমায় মানুষের জীবনের সব দিকের পরিচয়, মানুষের সীমিত শক্তিতে যতখানি সম্ভব, গ্রহণ করতে হবে, অধ্যয়ন করতে হবে সবকিছুর সম্পর্ক, একই অবস্থায় সমপ্রতিক্রিয়া আর তাদের পারস্পরিক বিভিন্ন প্রভাবসহ। তা হলেই পাওয়া যাবে একটা যুগের ছবি, পাওয়া যাবে মানুষের জটিল-জীবনের একটা মূর্তি—দার্শনিকরা লিখলে এমন ইতিহাসই লিখবেন।

তাঁর Esthetic বা নন্দনতত্ত্বের বিচারের ভার অন্যের উপর থাক। অন্ততঃ আমার মতো ছাত্র তা বুঝতে অক্ষম। কল্প-চিত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কি মানুষ শিল্পী হয়ে ওঠে? শিল্পের সার-কথা কি শুধু উপলব্ধিতেই নিহিত, বাহ্যিকতা বা আঙ্গিকের কি কোন মূল্য নেই? আমরা যে সব কথা প্রকাশ্যে বলি তার চেয়ে সুন্দরতর চিন্তা আর অনুভূতি কি কখনো আমাদের মনে জাগেনি? শিল্পীর মনে, অন্তর্নিহিত কল্প-চিত্র কি ছিল তা আমরা কি করে জানবো বা তাঁর যে শিল্পকর্মের আমরা এত প্রশংসা করছি তাতে তাঁর ভাব কতটুকু বিধৃত হয়েছে অথবা কতটুকু খোয়া গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথোপযুক্ত উপলব্ধি 'অভিব্যঞ্জক কায়ামূর্তি' ছাড়া শিল্পী রদ্যার (Rodin) 'হার্লট'কে (Harlot) আমরা সুন্দর বলবো কি করে?—তা কুৎসিত আর অপ্রিয় বিষয়ের উপলব্ধি হলেও? বাস্তবে যে সব বস্তু আমাদের মনে বিরক্তির সঞ্চার করে তারও যদি যথাযথ চিত্রণ ঘটে এরিস্টোটলের মতে তা দেখেও যে আমরা খুশী হই তার কারণ যে শিল্পে ভাব কায়া-মূর্তি নেয় তার প্রতি আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

যে সব দার্শনিকরা শিল্পীদের 'সৌন্দর্য কি' তা বোঝাতে যায় তাদের সম্বন্ধে স্বয়ং শিল্পীদের মনোভাব কি তা জানতে চাওয়া নিশ্চয়ই কৌতূহলের বিষয়, অবশ্য কিছুটা বিরক্তিকরও। জীবিত শিল্পীদের শ্রেষ্ঠজন এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেই নারাজ। তিনি (আনাতোল ফ্রাঁস) লিখেছেন: "বস্তুবিশেষ কেন সুন্দর, আমার বিশ্বাস, তা আমরা কখনো জানতে পারবো না।" কিন্তু এ জ্ঞান-বৃদ্ধের কাছ থেকে আমরা এমন এক পাঠ পেয়েছি, যা সাধারণত বড্ড দেরিতেই আমরা পেয়ে থাকি: "এ যাবৎ কেউই আমাকে সুনিশ্চিতভাবে ঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হয়নি।....সৌন্দর্যের প্রতি আমার যে অনুভূতি ব্যক্তিগতভাবে আমি তারই অনুসরণ করেছি। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর পথ-নির্দেশক মানুষ কোথায় পাবে?....সত্য আর সৌন্দর্যের মধ্যে যদি আমাকে নির্বাচন করতে বলা হয় তা হলে বিনা দ্বিধায় আমি সৌন্দর্যই বেছে নেবো।...পৃথিবীতে সৌন্দর্যের চেয়ে সত্য আর কিছুই নেই।" আশা করি আমাদের নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। হয়তো একদিন আমরা আমাদের আত্মায় এমন শক্তি আর স্বচ্ছতা লাভ করবো যার ফলে কৃষ্ণতম সত্যেও দেখতে পাবো এক দীপ্তিমান সৌন্দর্য।

৩ বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell)

ক. যুক্তিবাদী

এ পরিচ্ছেদের শেষ আলোচনার জন্য আমরা রেখে দিয়েছি আমাদের যুগের সর্ব-কনিষ্ঠ অথচ সবচেয়ে প্রাণবন্ত য়ুরোপীয় চিন্তাবিদকে।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যখন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান তখন তাঁকে দেখাচ্ছিল তাঁর সেদিনকার বিষয়-বস্তু তত্ত্ববিদ্যা'র মতই—লিকলিকে, ফ্যাকাশে আর মরণোন্মুখ, মনে হচ্ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কোন সময় ঘটতে পারে তাঁর মৃত্যু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবে শুরু, এ শান্তি-প্রিয় সুকোমল-মনা দার্শনিকটি সবচেয়ে সুসভ্য মহাদেশকে বর্বরতার শিকার হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং ভোগ করেছিলেন ভয়ানক মর্ম-যাতনা। মনে হয় তিনি যে 'বাহ্যিক জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান' এমন এক দূরবর্তী বিষয়কে আলোচ্য করেছেন তার কারণ তিনি চেয়েছেন নিজেকে নির্মম বাস্তবতা থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে। আবার প্রায় দশ বছর পরে, যখন তাঁর বয়স বায়ান্ন, তখনো তাঁকে হাসিখুশী আর এক বিদ্রোহী উদ্দীপনায় উৎফুল্ল দেখে খুশী হয়েছিলাম। যদিও এর মাঝখানে তাঁর সব আশা ভরসাই ভেঙে হয়ে গেছে চুরমার, সব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে শিথিল-বন্ধন আর ছিন্ন হয়ে গেছে তাঁর এককালের অভিজাত জীবনের নিরাপদ আশ্রয়ের সব সূত্র।

কারণ তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের এক প্রাচীনতম আর খ্যাতনামা রাসেল পরিবারের সন্তান—যে পরিবার বংশানুক্রমে যুগিয়েছে ইংলণ্ডকে বহু রাজনীতিবিদ্। তাঁর পিতামহ লর্ড জন রাসেল ছিলেন এক বিখ্যাত উদার-নৈতিক প্রধানমন্ত্রী—যিনি অবিরাম মুক্ত বাণিজ্য, সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা, য়াহুদী-মুক্তি আর সর্ব রকম স্বাধীনতার জন্য করেছিলেন সংগ্রাম। তাঁর পিতা ভাইকাউণ্ট এম্বারলী (Viscount Amberley) ছিলেন স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী—তিনি পশ্চিম-মুলুকের শাস্ত্রীয় উত্তরাধিকার চাপিয়ে দিয়ে পুত্রের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। দ্বিতীয় আর্ল রাসেলের তিনি বর্তমান উত্তরাধিকারী—কিন্তু এ উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করে তিনি এখন সগৌরবে উপার্জন করছেন নিজের জীবিকা। তাঁর যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের জন্য কেম্ব্রিজ যখন তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করলো তখন সারা বিশ্বকেই তিনি করে নিলেন নিজের বিশ্ববিদ্যালয় আর হয়ে পড়লেন ভ্রাম্যমান সফিস্ট (Sophist), তার প্রায় আদি অর্থেই —অর্থাৎ তিনি হয়ে পড়লেন জ্ঞানের চারণ আর তারপর থেকে বিশ্ব সানন্দে জোগাচ্ছে তাঁর জীবিকা।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দুই মূর্তি : একের মৃত্যু ঘটেছে যুদ্ধের সময়, অন্যের আবির্ভাব ঘটেছে সে শবাধার থেকে গাণিতিক লজিকবাদীর ভস্ম থেকে। জন্ম নিলো প্রায় মিস্টিক্ এক সাম্যবাদী। হয়তো তাঁর মধ্যে এক সূক্ষ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিন্দ্রীয়-প্রবণতা সব সময় ছিল—যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বীজগণিতের পর্বত-প্রমাণ স্তূপে, পরে সমাজতন্ত্রের এমন এক বিকৃত প্রকাশে যার সঙ্গে দর্শনের চেয়ে ধর্মের রয়েছে অধিকতর সাদৃশ্য। তাঁর বইগুলির একটির নাম হচ্ছে "Mysticism and Logic"—এ নাম বেশ অর্থপূর্ণ। এখানে তিনি অতিন্দ্রীয়বাদের যুক্তিহীনতার উপর চালিয়েছেন এক নির্মম আক্রমণ আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এমন গুণ-কীর্তন করেছেন যে তা দেখে লজিকের অতিন্দ্রীয়বাদের কথাই স্মরণ হয়। ইংরেজের পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানমুখিতার সহজ উত্তরাধিকার ছিল রাসেলের, তিনি নিজেই জানতেন যে তাঁর মন তেমন কঠিন নয় তাই চেষ্টা করেছিলেন কঠিন-মনা হতে।

এত বেশী লজিকের উপর জোর দেওয়ার কারণ বোধকরি তাঁর অতিমাত্রায় বিশুদ্ধিকরণ প্রচেষ্টারই ফল আর যার ফলে গণিত হয়ে পড়েছিল তাঁর কাছে এক ঐশী ব্যাপার। ১৯১৪-এ তাঁকে মনে হয়েছিল অত্যন্ত হিম-রক্ত—সাময়িকভাবে উদ্দীপিত এক বিমূর্তভাব আর দুই পা-বিশিষ্ট স্রেফ এক ফরমূলা। বার্গসঁ যে মেধা বা বুদ্ধির সঙ্গে চলচ্চিত্রের উপমা দিয়েছেন তা পড়ার আগে পর্যন্ত তিনি নাকি কোন রকম সিনেমাই দেখেননি। পরে একবার তিনি দেখেছেন বটে তবে তাও যেন এক দার্শনিক কাজেরই অংশ হিসেবে। বার্গসঁর সময় আর গতি সম্বন্ধে যে স্বচ্ছবোধ আর সব বস্তুই যে গতির উদ্দীপনায় জীবন্ত এ অনুভূতি রাসেলকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করেনি—এসব তাঁর কাছে এক চমৎকার কাব্য ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তিনি গণিত ছাড়া অন্য কোন দেবতাই মানতেন না। ক্লাসিক্‌স্ বা প্রাচীন মহৎ সাহিত্যের প্রতিও তাঁর কোন অনুরাগ ছিল না। স্পেন্সারের মতো শিক্ষা-ক্ষেত্রে অধিকতর বিজ্ঞান প্রবর্তনের জন্য তিনি জোর দাবী জানিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখের কারণ অতিন্দ্রীয়বাদ আর অত্যন্ত নিন্দার্হ অস্বচ্ছ যত সব চিন্তা। তাঁর মতে চিন্তায় ঋজুতাই নীতি-ধর্মের প্রথম শর্ত হওয়া উচিত। "আমি বা অন্য কেউ কোন মিথ্যায় বিশ্বাস করার চেয়ে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়াই ভালো....এ হচ্ছে চিন্তার ধর্ম, যার জলন্ত শিখায় পৃথিবীর সব ময়লাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

স্বচ্ছ-চিন্তার প্রতি তাঁর যে তীব্র অনুরাগ তার ফলেই গণিতের প্রতি তাঁর গতি হয়েছে অবধারিত—এ অভিজাত-বিজ্ঞানের নির্লিপ্ত নির্দিষ্টতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আনন্দে প্রায় উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। "একথা অত্যন্ত খাঁটি যে অঙ্ক যে শুধু সত্য তা নয় তাতে চরম সৌন্দর্যও নিহিত—ভাস্কর্যের সৌন্দর্যের মতো তা শান্ত আর কঠিন, আমাদের স্বভাবের দুর্বলতাকে তা চেতিয়ে তোলে না, তাতে নেই সঙ্গীত বা চিত্র-কলার জাঁকজমকের ফাঁদ। তবুও তাতে নির্মল গাম্ভীর্যের কোন অভাব নেই শ্রেষ্ঠতম শিল্প যে কঠোর পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছতে সক্ষম সে পূর্ণাঙ্গতা এরও করায়ত্ত।" তাঁর বিশ্বাস উনবিংশ শতাব্দীর চরম উৎকর্ষ হচ্ছে গণিতের অগ্রগতি, বিশেষত—"গণিতের অসীমতাকে ঘিরে যে সব কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধানই বোধকরি আমাদের যুগের সবচেয়ে গৌরবময় সাফল্য।" গণিতের যে দুর্গটাকে দু' হাজার বছর ধরে পুরোনো জ্যামিতি দখল করেছিল তা মাত্র শত বছরের মধ্যেই একদম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে বিশ্বের সর্ব-প্রাচীন স্কুল-পাঠ্য য়ুক্লিডকেও (Euclid) করে দেওয়া হয়েছে বাতিল। রাসেলের মন্তব্য: "তাঁকে (অর্থাৎ য়ুক্লিডকে) যে এখনো ইংলণ্ডের ছেলেদের পড়ানো হয় তার চেয়ে লজ্জাকর আর কিছুই হতে পারে না।"

স্বতসিদ্ধকে (axioms) প্রত্যাখ্যানই বোধকরি আধুনিক গণিতের সংস্করণের মূল উৎস—যে সব লোক তথাকথিত "স্বত-প্রকাশিত সত্য" মেনে নিতে অনিচ্ছুক আর দাবী জানাতো প্রমাণের রাসেলের সানুরাগ সমর্থন ছিল তাদের প্রতি। দুই সমান্তরাল রেখা কোথাও না কোথাও মিলতে পারে আর অংশের চেয়ে গোটা বড় নাও হতে পারে এ শুনে তিনি প্রায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। জোড় সংখ্যা হচ্ছে সব সংখ্যার অর্ধেক, অথচ মোট সংখ্যারও তা সমান, যেহেতু প্রতি সংখ্যারই রয়েছে তার দ্বিগুণ জোড় সংখ্যা—এসব ধাঁধাঁর সাহায্যে তিনি সরল পাঠকদের প্রায় তাক লাগিয়ে দিতে ভালোবাসতেন। গণিতের যে অসীমতার এতকাল কোন সংজ্ঞা দেওয়াই সম্ভব হয়নি এ হচ্ছে তার মোদ্দা কথা: এ গোটা বা সমগ্রের মধ্যে রয়েছে এমন সব খণ্ড যাতে সমগ্রের সমান সমান সীমা বা দফা রয়েছে। যদি কোন পাঠকের মনে আগ্রহ জাগে তিনি এ স্পর্শজ্য (Tangent) অনুসরণ করতে পারেন।

রাসেলকে যে গণিত আকর্ষণ করেছিল তার প্রধান কারণ গণিতের কঠোর নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ানুগত্য—একমাত্র এখানেই পরম জ্ঞান আর চিরন্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য নিহিত এ তাঁর বিশ্বাস। এসব সাধারণ থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তের উপপাদ্যই হচ্ছে প্লেটোর 'ভাব' আর স্পিনোজার 'চিরন্তন নিয়ম'—বিশ্বের সার-মর্ম। দর্শনের লক্ষ্যও হওয়া চাই এমন, যা সমস্ত অভিজ্ঞতার সামনে এমনি সত্য আর এমনি খাঁটি বর্ণনায় থাকবে সীমিত হয়ে। এ অদ্ভুত বিজ্ঞানবাদীর কথা হচ্ছেঃ "দর্শনের সব প্রস্তাবনা....সাধারণ থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চাই।" এসব প্রস্তাবনার লক্ষ্য বস্তু নয় বরং সম্পর্ক—সার্বজনীন সম্পর্ক। এসব হবে নির্দিষ্ট তথ্য বা ঘটনা-নিরপেক্ষ। পৃথিবীতে যা কিছু বিশেষ তার ধ্বংসের পরেও এ অনুপাত সত্যই থেকে যাবে। যেমনঃ "যদি সব 'ক' 'খ' হয় আর 'ম' যদি 'ক' হয়, তা হলে 'ম' হচ্ছে 'খ'--'ক' যাই হোক এ ঠিক থাকবে। সক্রেটিসের মৃত্যু সম্বন্ধে যে পুরনো অনুমান তাকে এ এক সার্বজনীনতায় আর সিদ্ধান্তে পরিণত করে, সক্রেটিস বা অন্য কারো অস্তিত্ব না থাকলেও এর সত্যতা থেকে যাবে। প্লেটো আর স্পিনোজার একথাও সত্যঃ "সার্বজনীন বিশ্বকে অস্তিত্বের বিশ্বও বলা যায়। অস্তিত্বের বিশ্ব অপরিবর্তনীয়, কঠোর, সুনির্দিষ্ট আর অত্যন্ত আনন্দময় মনে হয় গণিতবিদ, যুক্তিবিজ্ঞানী (Logician) পরাবিজ্ঞান পদ্ধতি নির্মাতা আর যাঁরা জীবন থেকেও পূর্ণতাকে ভালোবাসে তাদের কাছে।" এ নতুন পিথাগোরাসের (Pythagoras) উচ্চাভিলাষ হচ্ছে সব দর্শনকে গণিতে পরিণত করা আর সব সুনির্দিষ্ট বিষয়-বস্তুকে তার থেকে নিয়ে গণিতে (বৃহৎ এক গ্রন্থে) সংহত ও ঘনীভূত করা।

"সিদ্ধান্তকে গাণিতিক নিয়মানুবর্তী করার জন্যই মানুষ যুক্তিকে প্রতীকে পরিণত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছে, যেমন বীজগণিতে। ....খাঁটি গণিতের এক সার্বিক দাবী হচ্ছে এ প্রস্তাবনা যদি কোন বিষয়ে সত্য হয় তা হলে এ রকম অন্য প্রস্তাবনাও ঐ বিষয়ে সত্য হবে। প্রথম প্রস্তাবনাটা সত্য ছিল কিনা সে প্রশ্ন না তোলা আর অন্য যে জিনিসটাকে সত্য বলে কল্পনা করা হয়েছে তার সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ না করা অত্যাবশ্যক।....কাজেই বলা যায় গণিত এমন এক বিষয় যার সম্বন্ধে আমরা আলাপ আলোচনা করি তার কোন জ্ঞানই আমাদের নেই অথবা জানি না আমরা আদৌ সত্য বলছি কিনা।"

সম্ভবত এসব কথা গাণিতিক দর্শনের প্রতি তেমন কোন অবিচার করে না। যাদের পছন্দ তাদের জন্য এ এক চমৎকার খেলা, দাবার মতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি বেশী ত্বরিৎ গতিতে এর দ্বারা যে সময়কে হত্যা করা যায় তাতে সন্দেহ নেই। এ এক নতুন একক বা নিঃসঙ্গ ক্রীড়া—বস্তুর সংক্রামক স্পর্শ বাঁচিয়ে যতদূর সম্ভব দূরে থেকে এ খেলা খেলতে হয়। আশ্চর্য এত সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিরাট আকাশকুসুম রচনার পর হঠাৎ তিনি নেমে এলেন আমাদের এ গ্রহের উপরিতলে আর শুরু করলেন যুদ্ধ, রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র, আর বিপ্লব সম্বন্ধে তীব্র সব যুক্তি প্রয়োগ করতে। কিন্তু তার নিজের 'Principia Mathematica'তে এসব নিষ্কলঙ্ক সূত্রের একটাও তিনি ব্যবহার করেননি। আর কেউ ব্যবহার করেছেন তাও দেখা যায়নি। ব্যবহারিক হতে হলে যুক্তিকে বস্তু-নির্ভর হতে হয় আর প্রতিপদেই রাখতে হয় বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক। সংক্ষিপ্তসার হিসেবেই শুধু বিমূর্তভাবের প্রয়োজন কিন্তু যুক্তির হাতিয়ার হিসেবে তার জন্য প্রয়োজন সচল পরীক্ষা আর অভিজ্ঞতার ভাষ্য। এখানে আমরা এমন এক পণ্ডিতিয়ানার বিপদের সম্মুখীন যার পাশে মধ্যযুগীয় দর্শনের বিরাট সার সংগ্রহকে' প্রয়োগবাদী চিন্তার আদর্শ বা নমুনা বলেই মনে হবে।

এ রকম যাঁর সূচনা তিনি অজ্ঞেয়বাদী না হয়ে পারেন না। খ্রীস্টধর্মে তিনি এমন বহু কিছু দেখতে পেয়েছেন যা প্রকাশ করা যায় না গণিতের ভাষায়—ফলে খ্রীস্টধর্মের নীতি-শিক্ষাটুকু ছাড়া আর বাকি সবটুকুই তিনি প্রত্যাখ্যান করে বসলেন। যে সভ্যতা খ্রীস্টধর্মকে অস্বীকার করলে মানুষকে নির্যাতন করে আর কঠোর আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলে মানুষকে পাঠায় কারাগারে সে সভ্যতার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। এমন স্ববিরোধী বিশ্বে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বই খুঁজে পেলেন না—মনের এক বিশেষ শয়তানী মুহূর্তে স্রেফ এক কৌতুক-প্রিয় মেফিস্টোফেলিসই (Mephistopheles) এমন দুনিয়া বানাতে পারে এ তাঁর ধারণা। স্পেন্সারের মতই তিনি পৃথিবীর ধ্বংসের কথা ভাবতেন —একদিন যে সব মানুষ আর সব প্রজাতির পরাজয় ঘটবে বিষয়-বিরাগীদের মতো এ বিশ্বাসে তিনিও পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে তার ব্যাখ্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। আমরা বিবর্তন আর প্রগতির কথা বলে থাকি—কিন্তু প্রগতি একটা অহংবাদী কথা ছাড়া আর কিছুই না আর বিবর্তন ত এক নীতিহীন ঘটনা-চক্রের আধখানা মাত্র যার শেষ মৃত্যু আর ধ্বংসে। "বলা হয়ে থাকে সর্বনিম্ন প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে দার্শনিক পর্যন্ত জীবের উন্নয়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেছে—আর এ উন্নয়ন নাকি নিঃসন্দেহে অগ্রগতি, এক সম্মুখ পদক্ষেপ। দুর্ভাগ্যবশত এ সব কথা আমাদের শোনান দার্শনিকরা নিজেই, সর্বনিম্ন প্রাণীরা নয়।" "স্বাধীন" মানুষ শিশু-সুলভ আশা আর নরধর্মী দেবতা-দের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—একদিন তার নিজেরও মৃত্যু হবে, সব কিছুরই মৃত্যু হবে এ সব জেনেও তাকে মনের ভিতর সাহসকে অটুট রাখতে হয়। তা সত্ত্বেও তিনি অর্থাৎ স্বাধীন মানুষ আত্মসমর্পণ করবে না, জয় তাঁর না হলেও সংগ্রামের যে আনন্দ তা তিনি উপভোগ করবেন। যে অন্ধশক্তি তাঁর ধ্বংসের কারণ তার হাতে তাঁর পরাজয়ের ছবি যে জ্ঞানের সাহায্যে তিনি আগাম দেখতে পান তাই তাঁকে দিয়ে থাকে সে অন্ধশক্তির উপর প্রাধান্য। যে বাহ্যিক পশু-শক্তি এক লক্ষ্যহীন অধ্যবসায়ের সাথে তাকে জয় করে নেয়, তার তৈরী সব সভ্যতা ও সব ঘর ভেঙে তচনচ করে দেয় সে শক্তিকে সে কখনো পূজা করবে না বরং সে পূজা করবে তার ভিতরের সে সৃজনীশক্তিকে যা পরাজয়ের মুখেও সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং কয়েক শতাব্দীর জন্য হলেও খোদিত আর চিত্রিত সৌন্দর্য গড়ে তোলে আর গড়ে তোলে পার্থেননের (Parthenon) মহিমময় ধ্বংস।

যুদ্ধের আগে এ ছিল বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দর্শন।

খ. সংস্কারক

এর পর পৃথিবীতে নেমে এলো এক বিরাট মত্ততা। বার্ট্রাণ্ড রাসেল যেন এতকাল সমাহিত ছিলেন লজিক, গণিত আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল স্তূপের নীচে—এবার ছাড়া পাওয়া অগ্নিশিখার মতো তিনি ফেটে পড়লেন মুহূর্তে। সারা বিশ্ব এ লিকলিকে ফ্যাকাশে-চেহারার অধ্যাপকের অসীম সাহস আর গভীর মানব-প্রেম দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। সূত্র-রচনার বিশ্রাম-কক্ষ ছেড়ে এবার তিনি বেরিয়ে এলেন আর তাঁর দেশের যত সব শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদদের উপর বইয়ে দিলেন নিন্দার বন্যা—তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ কেড়ে নিয়ে তাঁকে আর এক গেলিলিওর মতো নিঃসঙ্গ করে লণ্ডনের এক সরু গলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করার পরও তিনি তা করা থেকে কিন্তু বিরত হননি। তাঁর এ সব আচরণের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করলেও তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর এ ভাবান্তর দেখে তাঁরা এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে মুহূর্তের জন্য প্রায় অ-বৃটিশসুলভ অসহিষ্ণুতার শিকার হয়ে পড়েছিলেন সবাই। অত্যন্ত অভিজাত ঘরের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এ যুদ্ধ বিরোধী যোদ্ধাকে করা হয়েছিল সমাজচ্যুত। যে দেশ তাঁকে করেছে লালন, যুদ্ধের ঘূর্ণিবায়ুতে যার অস্তিত্বই আজ বিপন্ন তাঁর বিরুদ্ধে সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করা হলো উত্থাপিত।

তাঁর এ বিদ্রোহের পেছনে নিহিত ছিল সব রকম রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রতি তাঁর এক স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। রাসেল যদিও হতে চেয়েছিলেন স্রেফ মূর্তিমান এক অ-দেহী বুদ্ধি কিন্তু আসলে তিনি হচ্ছেন অনুভূতি-পদ্ধতিরই প্রকাশ। যে সব তরুণদের মরতে আর মারতে সগর্বে মার্চ করে যেতে তিনি দেখেছেন তাদের জীবনের মূল্য যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের চেয়ে অনেক বড় এ মত তিনি পোষণ করতেন। এ মহাধ্বংসের কারণ সন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হলেন—মনে করলেন সমাজতন্ত্রেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক এমন এক বিশ্লেষণ যা একই সঙ্গে ব্যাধি আর তার একমাত্র প্রতিকারের মূল কারণ উদ্‌ঘাটনে সক্ষম। মূল কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানা আর প্রতিকার হচ্ছে সাম্যবাদ।

তিনি তাঁর স্বাভাবিক সরস ভাষায় বলেছেন সব সম্পত্তির মূলে রয়েছে চুরি আর হানাহানি, দুনিয়ার চোখের উপরই কিম্বারলি হীরক আর রেণ্ড (Rand) সোনার খনিতে যে ডাকাতি চলছে তাই পরিণত হচ্ছে সম্পদে। "জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজের কোন রকম উপকারই সাধন করে না। বর্তমান ভূমি-মালিকদের প্রতি জীবন ধারণের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়াই এ ব্যবস্থার সমাপ্তি মানুষ হয়তো কালই ঘোষণা করতো যদি সে কিছুমাত্র যুক্তিবাদী হতো।"

ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে রাষ্ট্রের দ্বারাই সংরক্ষিত, যে দস্যুতার দ্বারা সম্পত্তি অর্জিত তাও হয় আইন-পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত আর তাকে বাস্তবায়িত করা হয় অস্ত্র আর যুদ্ধের দ্বারা সেখানে রাষ্ট্র এক মহাপাপ ছাড়া আর কিছুই না। এ অবস্থায় কিছুটা ভালো হয় যদি রাষ্ট্রের অধিকাংশ দায়িত্ব সমবায়সমূহ আর উৎপাদক সমিতিগুলো গ্রহণ করে। আমাদের সমাজ এখন ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিকূল—সব মানুষের ব্যক্তিগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্তাকে এখন তা গুঁড়িয়ে একাকার করে দিচ্ছে। একমাত্র অধিকতর নিরাপত্তা আর নিয়ম-শৃঙ্খলাই আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি আপোষ মনোভাবাপন্ন করে তুলতে পারে।

স্বাধীনতাই হচ্ছে চরম কল্যাণ। কারণ এছাড়া ব্যক্তিত্ব বিকাশ অসম্ভব। জীবন আর জ্ঞান দুই-ই আজ ভয়ানক জটিল হয়ে উঠেছে—একমাত্র স্বাধীন আলাপ-আলোচনার সাহায্যেই আমরা ভুল-চুক আর যত সব কুসংস্কারের ভিতর দিয়ে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত তথা সত্যে পৌঁছতে পারি। মানুষে মানুষে, এমন কি শিক্ষকদের মধ্যেও মতভেদ থাকুক, করুক তর্ক-বিতর্ক—বিচিত্র এসব মতামত থেকেই উদ্ভূত হবে বিশ্বাসের এক বুদ্ধিমন্ত আপেক্ষিকতা যা সহজে বন্দুক উঁচিয়ে মারমুখো হবে না। গোঁড়া বিশ্বাস আর অনড় মতামতই হিংসা-বিদ্বেষ আর যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ। "আধুনিক" মনের কুসংস্কার আর স্নায়ু-বিকারকে বর্ষার জলধারার মতো ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারে একমাত্র চিন্তা আর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।

AMARBOI.COM

নিজেদের যতখানি শিক্ষিত আমরা মনে করি আসলে ততখানি শিক্ষিত আমরা নই। বিশ্বজনীন যে শিক্ষা তা সবেমাত্র আমরা শুরু করেছি—আমাদের চিন্তা আর জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তোলার সময় তা এখনো পায়নি। আমরা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার তৈরী করছি শুধু কিন্তু উপায় আর আঙ্গিকে আমরা এখনো আছি আদিম অবস্থায়। শিক্ষাকে আমরা মনে করি কতকগুলি অনড় অচল জ্ঞানকে সঞ্চারিত করে দেওয়া, অথচ শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত মনের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক অভ্যাস গড়ে তোলা। অজ্ঞ বা নির্বোধের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর নিজের মতামতকে চরম মনে করা। বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিশ্বাসের বেলায় মন্থরগতি আর শোধরিয়ে না নিয়ে সে কখনো কথা বলে না। বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার আরো বর্ধিত হলে আমরা এমন এক মননশীল বিবেক আয়ত্ত করতে সক্ষম হবো যা আমাদের শুধু হাতের কাছের প্রমাণকেই বিশ্বাস করতে শেখাবে আর তার যে ভুল হতে পারে এও সে সহজে মেনে নেবে। এ রকম প্রণালী অবলম্বন করলে, শিক্ষা আমাদের বহু সমস্যারই সমাধান করতে হবে সক্ষম—এমনকি তা আমাদের সন্তানদের সন্তান-সন্ততিকে হয়তো নতুন মানব-মানবীতেও

৩৭—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণত করতে পারবে—নতুন সমাজব্যবস্থার আগে যাদের আবির্ভাব অপরিহার্য। "আমাদের চরিত্রের সহজাত অংশ অত্যন্ত প্রসারণশীল। বিশ্বাস, পার্থিব অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা আর প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তার পরিবর্তন সাধন সম্ভব।" সহজেই দেখা যায় শিক্ষার সাহায্যে মনকে এভাবে গড়ে তোলা যায় যাতে ধন-সম্পদের চেয়ে তা হয়ে ওঠে অধিকতর শিল্পানুরাগী, যেমন রেনেসাঁর যুগে হয়েছিল আর তখনই মন নিতে পারে এ সঙ্কল্প "সঞ্চয়কে কেন্দ্র করে যে সব বাসনা কামনা আর প্রবৃত্তি বেড়ে ওঠে সে সবকে দমিয়ে মনের সব রকম সৃজনী-শক্তিকে বিকশিত করে তোলার।" এ হচ্ছে বেড়ে ওঠা বা বিকাশের প্রধান নীতি—যার অনুসিদ্ধান্ত হবে এক নতুন ও স্বাভাবিক নীতিধর্মের দুই মহৎ নির্দেশ—প্রথমতঃ শ্রদ্ধা-ভক্তির নীতি অর্থাৎ "ব্যক্তি আর সমাজের জীবনী শক্তিকে যথাসম্ভব বাড়িয়ে তোলা" দ্বিতীয়তঃ সহিষ্ণুতার নীতি অর্থাৎ "অন্যের যথাসম্ভব কম ক্ষতিসাধন করে ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের বিকাশ সাধন।"

মানব-চরিত্রের পূর্ণ গঠনের জন্য আমাদের স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের চমৎকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচালিত এবং উপযুক্ত লোক দিয়ে গড়ে তোলা যায় তা হলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকবে না। আর্থিক গৃধ্নুতা আর আন্তর্জাতিক নিষ্ঠুরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এ হচ্ছে একমাত্র পথ—কাগজী আইন-কানুন বা রক্তাক্ত বিপ্লব নয়। মানুষ যে অন্য সব প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পেয়েছে তার কারণ অন্য প্রাণীর তুলনায় সে বেড়ে উঠতে অনেক বেশী সময় নিয়ে থাকে। অতএব সে যদি আরো বেশী সময় নেয় আর নেয় তা বিজ্ঞতার সঙ্গে তা হলে হয়তো সে নিজেকে শাসন করতে আর পূর্ণ গঠন করতে হবে সক্ষম। আমাদের বিদ্যালয়গুলিই য়ুটোপিয়ার সিসিম খোল্।

গ. উপসংহার

অবশ্য এ সবও নিছক আশাবাদ—তবুও হতাশার চেয়ে আশাবাদী হয়ে ভুল করাও ভালো। ধর্ম আর পরা-বিদ্যার আলোচনার সময় যে সব আবেগ আর অতিন্দ্রীয়বাদ রাসেল অত্যন্ত কঠোরভাবে দমিয়ে রেখেছিলেন এবার সামাজিক দর্শনের আলোচনায় তার সবটুকুই নিঃশেষে ঢেলে দিলেন। 'অনুমান' আর স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে যে সংশয়বাদ—তার সম্বন্ধে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীক্ষ্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা গণিত আর লজিকের বেলায় তাঁকে দিয়েছে আত্মতৃপ্তি, তা কিন্তু তিনি প্রয়োগ করেননি তাঁর রাজনীতি আর অর্থনৈতিক মতবাদের বেলায়। সাধারণ থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ আর "জীবন থেকেও পূর্ণাঙ্গতার" প্রতি তাঁর যে অনুরাগ তা তাঁর মনে এমন চমৎকার সব কল্প-চিত্রের প্রেরণা জুগিয়েছে যার সঙ্গে জীবনের ব্যবহারিক সমস্যার চেয়ে এ গদ্যময় জগতে এক কাব্য-মুক্তিরই অধিকতর সাদৃশ্য রয়েছে। ধনের চেয়ে শিল্পের সমাদর বেশী হবে এমন সমাজ কল্পনা নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক। কিন্তু যতদিন শিল্পগত কারণে নয় বরং অর্থনৈতিক কারণে জাতিসমূহের উত্থান-পতন ঘটবে, ঘটবে শ্রেণী নির্বাচন ততদিন সুকোমল শিল্পের চেয়ে অর্থনৈতিক শক্তিই অধিকতর মূল্যবান আর বেঁচে থাকার হাতিয়ার বলে গণ্য হবেই আর হবে অধিকতর প্রশংসিত, পাবেও তা বড় রকমের পুরস্কার। বড়জোর শিল্পকে ধনজাত পুষ্প বলা যায়—কিন্তু ধনের স্থলাভিষিক্ত তা হতে পারে না কিছুতেই। মাইকেলেঞ্জেলোর আগেই আবির্ভূত হয়েছে মেডিচি (Medici)।

রাসেলের অত্যুজ্জ্বল কল্পনায় অধিকতর খুঁৎ সন্ধানের কোন মানে হয় না—তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাই তাঁর কঠোরতম সমালোচক প্রমাণিত হয়েছে। রাশিয়ায় তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তনার যে উদ্যোগ তার মুখোমুখী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানে এ পরীক্ষা যে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছে তা দেখে তিনি নিজেই হারিয়ে বসেছেন নিজের প্রচারিত মতের উপর সব রকম আস্থা। তিনি যাকে উদার দর্শনের এক স্বতঃসিদ্ধ নীতি মনে করেন, দেখতে পেলেন রাশিয়ার সরকার ততটুকু গণতান্ত্রিক ঝুঁকি নিতেও নারাজ। স্বাধীন মতামত ও স্বাধীন সংবাদপত্র ওখানে যেভাবে অস্বীকৃত আর প্রচারণার সব রকম হাতিয়ার যেভাবে সরকারী একনিষ্ঠ কঠোরতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় তা দেখে তিনি এমন রেগে গিয়েছিলেন যে রাশিয়ার জনসাধারণের নিরক্ষরতা দেখে তিনি রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ধারণা সরকারপুষ্ট সংবাদপত্রের যুগে পড়তে জানা সত্য জানার এক বড় অন্তরায়। তিনি দেখে খুব অবাক হলেন যে ভূমি জাতীয়করণের ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা ছেড়ে দিতে মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে—ফলে তাঁর ধারণা এখন মানুষের যে অবস্থা তাতে মানুষ যদি তার জমি আর যে উন্নয়ন সে করবে তা উত্তরাধিকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা সন্তান-সন্ততিদের দিয়ে যেতে না পারে তাহলে সে মোটেও জমি ভালো করে কর্ষণ বা চাষ করবে না। "মনে হয় রাশিয়া বৃহত্তর ফ্রান্স হতে যাচ্ছে—হতে যাচ্ছে চাষী মালিকের এক মহাজাতি। তিরোহিত হয়েছে প্রাচীন সামন্ততন্ত্র।" তিনি যেন বুঝতে লাগলেন—এ যে নাটকীয় ওলট-পালট, বহু ত্যাগ আর বীরত্ব সত্ত্বেও রাশিয়াকে ১৭৮৯-এর বেশী এগিয়ে নিয়ে যায়নি।

মনে হয় তিনি যখন চীন দেশে এক বছরের জন্য অধ্যাপনা করতে গিয়েছিলেন তখন ওখানে তিনি বেশ আরাম বোধ করেছিলেন। দেখতে পেলেন ওখানে যান্ত্রিকতা কম, গতিও মন্থর—যার ফলে আলাপ-আলোচনা করা, জীবনকে চুল-চেরা বিচার করতে গেলে জীবন শান্ত আর স্থিরতা লাভ করে বই কি। সে বিরাট মানব-সমুদ্র আমাদের দার্শনিকের মনে নিয়ে এলো এক নতুন পরিপ্রেক্ষিত। বুঝতে পারলেন য়ূরোপ হচ্ছে এক বৃহত্তর মহাদেশ ও এক প্রাচীনতর, সঞ্চিত গভীরতর সংস্কৃতিরই এক পরীক্ষামূলক ভ্রূণমাত্র। তাঁর সব মতবাদ আর অনুমান জাতিসমূহের এ প্রস্তরীভূত মূর্তির সামনে এবার গলে গিয়ে সামান্য আপেক্ষিকতায় হলো পরিণত। দেখা যায় লিখতে লিখতেই তাঁর মতবাদ শিথিল হয়ে এসেছে:

'আমি এখন বুঝতে পারছি শ্বেত জাতিকে আমি যত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম আসলে তা নয়। য়ূরোপ-আমেরিকা পরস্পর যুদ্ধ করে যদি ধ্বংসও হয় তার মানে মানবজাতির ধ্বংস নয়—এমনকি সভ্যতারও তা সমাপ্তি নয়। তারপরও যথেষ্ট সংখ্যক চীনা মানুষ বেঁচে থাকবে—আমার দেখা সব দেশের মধ্যে নানাদিক থেকে চীন সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু যে সংখ্যার দিক থেকে চীন বৃহত্তম বা সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠতম তা নয়, আমার মনে হয় মননশীলতায়ও চীন সর্বোচ্চ। এমন মুক্ত-মনা, এমন বাস্তব আর অবস্থা যা এবং যেভাবে তার সম্মুখীন হওয়ার এমন সদিচ্ছা তা আর কোন সভ্যতায় আমি দেখিনি—ঘটনা বা অবস্থাকে বিকৃত করে বিশেষ ছাঁচে ফেলার কোন চেষ্টাই এখানে দেখা যায় না।'

ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা, পরে রাশিয়া, আরো পরে ভারত আর চীনে গিয়ে নিজের দর্শনকে অপরিবর্তিত রাখা কিছুটা কঠিন বই কি। বিশ্ব অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছেন তাঁর সূত্রের তুলনায় এ অনেক বড়—সম্ভবত এত বড় আর এত ভারী যে তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার গতি কিছুতেই দ্রুত হতে পারবে না। আর পৃথিবীতে মন আর আকাঙ্ক্ষারও অন্ত নেই। সময় আর জীবনের বৈচিত্র্যে এখন তিনি অনেক কোমল আর "অধিকতর বুড়ো ও বিজ্ঞতর" হয়েছেন—রক্ত-মাংসের সব ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি হয়েছেন অধিকতর সচেতন, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিবর্তনের বাধা-বিঘ্নের জ্ঞান তাঁকে দিয়েছে প্রবীণতার সংযম। সর্বোপরি তিনি এমন মানুষ যাঁকে ভালোবাসা যায়, গভীরতম পরা-বিদ্যা আর সূক্ষ্মতম গণিত আলোচনায় তিনি সক্ষম অথচ সব সময় তাঁর বক্তব্য সহজ সরল ও স্বচ্ছ—এসব তাঁর মনের অকপট আন্তরিকতারই পরিচায়ক। যে চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ তা সাধারণতঃ অনুভূতির উৎস-ধারাকে শুকিয়ে ফেলে কিন্তু তাঁর বেলায় তা হয়নি, তিনি আজো উষ্ণ হৃদয় আর করুণায় উদ্দীপিত —মানুষের প্রতি এক রহস্যময় দরদে তাঁর হৃদয় আজো পূর্ণ। তিনি রাজ-সভাসদ নন কিন্তু নিঃসন্দেহে পণ্ডিত আর ভদ্র--খ্রীষ্ট ধর্মের বুলি যাঁরা আওড়ান তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর খ্রীস্টান তিনি। সুখের বিষয় তিনি আজও সহৃদয় আর প্রাণবন্ত, এখনো তাঁর মধ্যে জীবনের অগ্নি-শিখা সমুজ্জ্বল। কে জানে হয়তো আগামী যুগে হতাশার বহু সিঁড়ি ভেঙে তিনি এমন জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন যার ফলে তাঁর নাম লেখা হবে উচ্চতম "দার্শনিকদের সুনির্মল ভ্রাতৃত্বের" তালিকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ঃ একাদশ

আমেরিকার সমকালীন দার্শনিকগণ

সান্তায়ানা (Santayna), জেমস্‌ (James) আর ডিউঈ (Dewe y)

সকলেরই জানা আমেরিকা একটি নয়, দু'টি—এর একটি হচ্ছে য়ুরোপীয়। পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলিই প্রধানত য়ুরোপীয়--এখানকার প্রাচীন বংশোদ্ভবরা সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে বৈদেশিক আভিজাত্যের দিকে আর সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিকরা পেছনে ফেলে আসা স্বদেশের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের দিকে বারে বারে ফিরে তাকায় সতৃষ্ণ নয়নে। এ য়ুরোপীয় আমেরিকায় চলছে শান্ত ও সংযত এ্যাংলো-সেক্সন আত্মার সঙ্গে সদ্য আগতদের অস্থির আর উদ্যমশীল শক্তির এক সক্রিয় সংঘর্ষ। একদিন হয়তো যে মহাদেশীয় সংস্কৃতি এখানে চারদিক থেকে এক প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে তার কাছে ইংরেজ চিন্তাপ্রণালী আর রীতিনীতির পরাজয় ঘটবেই। কিন্তু এখনো পূর্বাঞ্চলীয় আমেরিকার সাহিত্যে বৃটিশ মন-মেজাজের প্রাধান্যই চলছে, যদিও নীতি-ধর্মের ব্যাপারে সে কর্তৃত্ব আজ অনুপস্থিত। আমাদের আটলান্টিক রাষ্ট্রগুলিতে, শিল্পের ক্ষেত্রে যে রুচি দেখা যায় তা পুরোপুরি ইংলিশ, আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্যও ইংরেজি, আমাদের যেটুকু দর্শন তাও ইংরেজ চিন্তার অনুসারী। এ নতুন ইংলণ্ডেরই ফসল ওয়াশিংটন, আর্ভিং, ইমার্সন এমনকি পো-ও (Poe)। এ নতুন ইংলণ্ডেই, আমেরিকার প্রথম দার্শনিক জোনাথন এডোওয়ার্ডের রচনার মূল উৎস—এ নতুন ইংলণ্ডেই আমেরিকার আধুনিকতম চিন্তাবিদ বিদেশ-জাত জর্জ সান্তায়ানাকে আকৃষ্ট করে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে। সান্তায়ানা যে আমেরিকার দার্শনিক সে স্রেফ ভূগোলের সুবাদে। তিনি য়ুরোপীয়ই—জন্মেছেন তিনি স্পেনে, অজ্ঞাত শৈশবে তাঁকে নিয়ে আসা হয় আমেরিকায় এবং এখন আবার পরিপক্ক বার্ধক্যে তিনি ফিরে গেছেন তাঁর স্বর্গভূমি য়ুরোপে—এখানে কাটানো বছরগুলি যেন ছিল তাঁর শিক্ষানবিশির কাল। প্রাচীন আমেরিকার "শোভন ঐতিহ্যে" সান্তায়ানা এক রকম নিমগ্ন হয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য আমেরিকা হচ্ছে পুরোপুরি আমেরিকা—ইয়াঙ্কি (Yankees) বা হুসিয়ার (Hoosiers) অথবা কাউবয় (Cowboy) যাই হোক, যাদের শিকড় হচ্ছে আমেরিকার মাটিতে; য়ুরোপে নয়—দেশের মাটিতেই গড়ে উঠেছে যাদের জীবনের রীতি-নীতি, ভাব আর আদর্শ। যাদের আত্মায় যেমন কোন স্পর্শ লাগেনি বস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া বা রীচমণ্ডের যত সব ভদ্র আর অভিজাত পরিবারের তেমনি লাগেনি দক্ষিণ বা পূর্ব য়ুরোপের চপল প্রবৃত্তির। আদিম পরিবেশ আর দৈনিক কর্তব্য কর্ম নরনারী নির্বিশেষে তাদের দেহকে গড়ে তোলে কঠোর ও কষ্ট সহিষ্ণু আর মনকে করে তোলে সহজ-সরল আর স্থিরলক্ষ্য। এ আমেরিকারই সন্তান হচ্ছে লিঙ্কন, থোরো, হুইটম্যান আর মার্ক টোয়েন—এ আমেরিকা হচ্ছে 'শক্ত মাথা ব্যবসায়ী', 'বাস্তববাদী' আর 'অশ্ববোধ সম্পন্ন' (Horse sense) মানুষের। এ আমেরিকাই উইলিয়াম জেম্‌সকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে দর্শনে তিনি হয়ে পড়েছিলেন এদের মুখপাত্র—অন্যদিকে তখন তাঁর ভাই হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজ থেকেও অধিকতর ইংরেজ। জন ডিউঈকেও এ আমেরিকাই তুলেছে গড়ে।

কালানুক্রম ভিন্নতর হলেও আমরা সর্বাগ্রে সান্তায়ানা সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাই। কারণ আমাদের প্রধান দার্শনিকদের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম হলেও তিনি হচ্ছেন পুরোনো বৈদেশিক ভাবধারারই প্রতিনিধি। তাঁর চিন্তার সূক্ষ্মতা আর রচনাশৈলীর সৌরভ এমন যে তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় এমন ফুলের সঙ্গে ঘর থেকে সরিয়ে নিলেও যার সৌরভ অনেকক্ষণ ধরে ঘরময় ছড়িয়ে থাকে। হয়তো আমরা আর দ্বিতীয় সান্তায়ানা পাবো না, কারণ এখন থেকে য়ুরোপ নয় আমেরিকার দর্শন আমেরিকাই লিখবে।

১. জর্জ সান্তায়ানা

ক. জীবন-বিষয়ক

সান্তায়ানার জন্ম ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রিদে, আর মৃত্যু ঘটে রোমে ১৯৫২-তে। তাঁকে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয় ১৮৭২-এ আর এখানে ছিলেন তিনি ১৯১২ পর্যন্ত। তিনি ডিগ্রী নেন হার্ভার্ড থেকে —ওখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপনা করেন তাঁর সাতাশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর এক ছাত্রের বর্ণনা :

"ক্লাসে পড়াবার সময় যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে তিনি যেন ছিলেন মূর্তিমান এক নির্লিপ্ত, মধুর আর গম্ভীর শক্তি—যাঁর জন-সদৃশ চেহারায় কোন রেনেসাঁ চিত্রকর হয়তো আঁকবেন এক বিমূর্ত চোখ, পুরোহিত-সুলভ এক হাসি, যাতে ফুটে উঠতো আধখানা সন্তুষ্টি আর আধখানা দুষ্টুমি। যাঁর কণ্ঠের গম্ভীর স্বর একটানা বয়ে যেতো শান্ত উত্থান-পতন আর স্তোত্র পাঠের ভারসাম্য বজায় রেখে। তাঁর ঘণ্টাটায় বিরাজ করতো কবিতার জটিল পূর্ণতা আর তাতে ভবিষ্যদ্বাণীর ঘটতো আমদানি। তিনি তাঁর শ্রোতাদের জন্য বলে যাচ্ছেন বটে কিন্তু তাদের দিকে নেই তাঁর লক্ষ্য—তাদের স্বভাবের গভীরতায় তিনি নাড়া দিচ্ছেন, তাদের মনকে করে তুলছেন বিচলিত—প্রায় দৈববাণীর মতই তাঁর কথায় মিশে থাকতো রহস্য আর ভক্তি। তিনি ছিলেন দূরত্ব আর আকর্ষণের এক সংহত রূপ—গতিশীল অথচ নিজে স্থির আর অনড়।'

যে দেশ নিজে পছন্দ করে নিয়েছিলেন সে দেশ সম্বন্ধে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। অত্যধিক অধ্যয়নের ফলে তাঁর মন হয়ে পড়েছিল কোমল আর তাঁর স্বাভাবিক কবি-আত্মা ছিল বড্ড বেশী অনুভূতিশীল (তিনি প্রথমে কবি ছিলেন পরে হয়েছেন দার্শনিক)—ফলে আমেরিকার নাগরিক-জীবনের মুখর-গতিশীলতা তাঁকে দিতো পীড়া। এক সহজাত তাড়নায় তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন বস্টনে—হয়তো চাইলেন যতখানি সম্ভব য়ুরোপের কাছাকাছি হতে। বস্টন থেকে কেম্ব্রিজ, আর হার্ভার্ড—পরে নির্জন বাস, যেখানে জেমস্ আর রয়সি (Royce) থেকে তাঁর প্রিয় হয়ে উঠলো প্লেটো আর এরিস্টোটল। সহকর্মীদের জনপ্রিয়তায় তাঁর ঠোঁটে দেখা দিতো কিছুটা তিক্ত হাসি—আর নিজে রইলেন প্রেস আর জনতা থেকে দূরে। তবে তিনি জানতেন—এক হিসেবে তিনি ভাগ্যবান কারণ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বোত্তম দর্শন-স্কুলে তিনি পেয়েছিলেন আশ্রয়। "যুক্তির জীবনে এ যেন এক নির্মল প্রভাত—কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন হলেও দীপ্তিমান।"

তাঁর রচিত প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ হচ্ছে 'The Sense of Beauty' (১৮৯৬)—যেটাকে নেহাৎ বস্তুনিষ্ঠ মুনস্টারবার্গ (Munstarberg) পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন্দনতত্ত্বে আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম অবদান বলে মনে করতেন। পাঁচ বছর পরে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হলো তাঁর Interpretations of poetry and Religion—এটি হয়েছে অধিকতর পাঠযোগ্য। তারপর সাত বছর ধরে জেকবের (Jacob) মতো নীরবে তিনি সেবা করে গেছেন তাঁর প্রেমের তথা দর্শনের। এর মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু কবিতা ছাড়া আর কিছুই করেননি প্রকাশ। তিনি রত ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা 'The Life of Reason'-এর প্রস্তুতি কর্মে। এ পাঁচ খণ্ড (Reason in Common Sense, Reason in Society, Reason in Religion, Reason in Art আর Reason in Science) মুহূর্তে সান্তায়ানাকে এমন খ্যাতির উচ্চশিখরে নিয়ে গেলো যে তা পরিধিতে তেমন বহু বিস্তৃত না হলেও গুণে ছিল অনন্য। শান্ত-প্রকৃতির ইমার্সন-সম্পদের উপর এখানে যেন এক স্পেনীয় অভিজাতের আত্মাকে করা হয়েছে বপন—নিউ ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিত্ববাদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় আভিজাত্যের এক চমৎকার মিশ্রণ। সর্বোপরি এখানে পরিচয় মেলে এমন এক আত্মার যা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, যাতে লাগেনি তাঁর যুগের ভাবধারার কোন ছোঁওয়া, যেন প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া থেকে উঠে এসেছেন এক প্যাগান পণ্ডিত, যিনি আমাদের ক্ষুদ্রপদ্ধতির দিকে তাকাচ্ছেন কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে, বরং কিছুটা শ্রেষ্ঠত্বের নজরে—ভেঙে দিতে চাচ্ছেন শান্ত যুক্তি আর নিখুঁত গদ্যে আমাদের যতসব নতুন-পুরাতন স্বপ্নকে। প্লেটোর পরে এতো চমৎকার ভাষায় দর্শন কখনো এমন আর রূপ লাভ করেনি—এখানে শব্দে পাওয়া যায় নতুন স্বাদ, ব্যবহার করা হয়েছে মনোরম বাক্যাংশ, সূক্ষ্মতার সৌরভ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র আর চারিদিকে রয়েছে কৌতুক রসের ছড়াছড়ি। এ রচনাশৈলীতে সমন্বয় ঘটেছে কবির রূপক-অলঙ্কারপ্রাচুর্যের সঙ্গে শিল্পীর খুদিত নৈপুণ্যের। যে মানুষ একই সঙ্গে সৌন্দর্যের আকর্ষণ, আর সত্যের আহ্বান অনুভব করতে পারে তেমন মানুষের সান্নিধ্য লাভ সত্যই শুভকর।

এর পর সান্তায়ানা তাঁর খ্যাতি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন—নিচ্ছিলেন বিশ্রাম। লিখছিলেন সময় সময় কিছু কবিতা আর অপ্রধান কয়েক খণ্ড বই। আশ্চর্য, হার্ভার্ড ছেড়ে ইংলণ্ডে যখন তিনি বাস করতে এলেন আর সবাই যখন ভাবছিলেন তিনি শেষ হয়ে গেছেন, তখন হঠাৎ ১৯২৩-এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি 'Scepticism and Animal Faith' নামে বেশ মোটা এক বই প্রকাশ করে বসলেন আর সানন্দে ঘোষণা করলেন এক নতুন দর্শনের এ শুধু অবতরণিকা—যে দর্শনের নাম হবে "Realms of Being"। ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে নতুন করে এক দূর যাত্রায় রওয়ানা হতে দেখে রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠতে হয়—উৎফুল্ল হয়ে উঠতে হয় এ মানুষকে এমন এক বই লিখতে দেখে যা চিন্তার দীপ্তি আর রচনা-শৈলীর নৈপুণ্যে তাঁর পূর্ব রচনা থেকে কিছুমাত্র খাটো নয়। আমরা তাঁর এ শেষ রচনা দিয়েই আলোচনা শুরু করবো কারণ সান্তায়ানার সব চিন্তার সত্যকার খোলা দরজা হচ্ছে এটি।

খ. সন্দেহবাদ ও প্রাণী-বিশ্বাস

ভূমিকায় তিনি বলেছেন: "এখানে আর এক রকম দর্শনের কথা বলা হচ্ছে। যদি কোন পাঠক এ কথা শুনে হাসতে চান, বিশ্বাস করুন তাঁর সঙ্গে আমিও হাসতে প্রস্তুত।...আমি শুধু ঐসব নীতিগুলিই প্রকাশ করতে চেষ্টা করছি, হাসবার সময় পাঠক যার দিকে নিজে আবেদন জানান।" সান্তায়ানা খুব বিনয়ী (দার্শনিকরা যা কদাচিৎ হয়ে থাকেন) তাই তিনি মনে করেন তাঁর পদ্ধতি ছাড়াও অন্য রকম দর্শন হতে পারে। "কারো যদি অন্য রকম পদ্ধতি ভালো লাগে তাঁকে আমি আমার মতো করে চিন্তা করতে বলি না। যদি পারেন তিনি যেন তাঁর মনের জানালা-টার কাঁচ আরো পরিষ্কার করে নেন—তাঁর মনের সামনে সম্ভাবনার বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্য যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে প্রসার লাভ করে।"

তাঁর এ শেষ গ্রন্থের অবতরণিকা খণ্ডে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে মাকড়সার জাল আধুনিক দর্শনের বিকাশকে জড়িয়ে রুদ্ধ করে রেখেছে তা চেয়েছেন পরিষ্কার করে ফেলতে। যুক্তির জীবন (Life of Reason) বলতে তিনি কি মনে করেন তা বলবার আগে তিনি পেশাদার জ্ঞান-বিজ্ঞানবিদদের কাছে যে সব আঙ্গিকগত উপাদান-উপকরণ খুব প্রিয়, যেমন, মূল-উৎস, বৈধতা আর মানব-যুক্তির সীমাবদ্ধতা তা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তিনি জানেন বিনা সমালোচনায় ঐতিহ্যগত অনুমানকে মেনে নেওয়াই হচ্ছে চিন্তার জগতে সব চেয়ে বড় ফাঁদ। কিছুটা বে-রেওয়াজভাবেই তিনি বলেছেন: "সমালোচনা রীতি-রেওয়াজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহুবদ্ধ হয়ে থাকা আমাকে কিছুটা বিস্মিত করে দেয় বইকি।" প্রায় সব কিছুকে সন্দেহ করতে তিনি প্রস্তুত। যে ইন্দ্রিয়ের পথে পৃথিবী আমাদের কাছে ভেসে আসে তার গুণাবলীতে সিক্ত হয়েই ঘটে তার আগমন—আর অতীত আমাদের কাছে নেমে আসে স্মৃতির পথ বেয়ে, যে স্মৃতি বাসনা-কামনায় হয় প্রতারিত আর রঞ্জিত। মনে হয় একমাত্র মুহূর্তের অভিজ্ঞতা, যেমন এ রঙ, এ রূপ, এ স্বাদ, এ গন্ধ, এ গুণ, এসবই খাঁটি আর সুনিশ্চিত। এ হচ্ছে তাঁর কাছে "বাস্তব" জগৎ আর তার উপলব্ধিতেই নিহিত "সার বস্তুর আবিষ্কার।"

আদর্শবাদ নির্ভুল হতে পারে কিন্তু তার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। আমাদের ভাবের সাহায্যেই আমরা পৃথিবীকে জানি এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু পৃথিবী হাজার হাজার বছর ধরে এমন ব্যবহার করে এসেছে যে যেন আমাদের সম্মিলিত চেতনাই সত্য তখন আমরা সহজে এ রাজাজ্ঞা মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। "প্রাণী-বিশ্বাস" কথাটা হয়তো একটা অতিকথা (Myth) কিন্তু তা হলেও এ এক ভালো অতিকথা। কারণ যে কোন অনুমান-বাক্য থেকে জীবন শ্রেষ্ঠতর। ভাবের মূল উৎস আবিষ্কার করে তিনি তার বৈধতাই ধ্বংস করে দিয়েছেন এ অনুমান করাতেই ঘটেছে হিউমের বিভ্রান্তি: "স্বভাবজ সন্তানকে তিনি মনে করতেন অবৈধ সন্তান। যে ফরাসী মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সব শিশুই কি স্বভাবজ নয়—হিউমের দর্শন এখনো ততটুকু বিজ্ঞতায়ও পৌঁছতে পারেনি।" অভিজ্ঞতার সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহ করার এই যে সংশয়ী কঠোরতা জার্মানরা তাকে প্রায় এক ব্যাধি করে তুলেছেন—প্রায় সে পাগলের মতো যে পাগল হাতে ময়লা না থাকলেও ক্রমাগত হাত ধুয়ে চলে। কিন্তু এসব দার্শনিকরাও "যাঁরা নিজেদের মনের মধ্যেই পৃথিবীর বুনিয়াদের সন্ধান করেন" তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে অর্থাৎ উপলব্ধি ছাড়া বস্তুর অস্তিত্বই বিলুপ্ত—এ মতানুসারে জীবন ধারণ করেন না।

"পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের যে উপলব্ধি তার উৎপাটন করতে আমাদের বলা হয়নি—এমনকি দৈনন্দিন জীবনেও করা হয়নি সে বিশ্বাস ত্যাগের দাবী। আমাদের শুধু উত্তর-উত্তর-পশ্চিম প্রবাহী বা তুরীয় ভাবের আদর্শবাদী হতে হবে, বাতাস যখন দক্ষিণপ্রবাহী হবে তখন আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে হবে বাস্তববাদী।....তর্কের সময় ছাড়া, অন্য সময় যে মতামতে আমার বিশ্বাস নেই, তেমন মতামতকে উৎসাহ দিতে আমি লজ্জিত হবো। যে ভাবের রঙে আমার মন রঞ্জিত তার জন্য ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করতে যাওয়া আমার নিকট অসাধুতা আর কাপুরুষতা বলেই মনে হয়। একমাত্র স্পিনোজা ছাড়া তাই আমার চোখে আধুনিক লেখকদের কেউই দার্শনিক নন।....আমার দূরতম কল্পনায়, যে প্রাণী-বিশ্বাস নিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন কাটে তাকে খোলাখুলিভাবে এক অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে আমি বরং প্রকৃতিকেই গ্রহণ করেছি।"

সান্তায়ানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ এ ভাবে পার হয়ে এসেছেন—প্লেটো আর এরিস্টোটলের যে অভিনব পুনর্গঠন তিনি করেছেন আর যার নাম দিয়েছেন 'The Life of Reason' তাঁর সঙ্গে সে পথে আমরা যতই অগ্রসর হই ততই স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলতে পারি। মনে হয় এ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে নতুন দর্শনের এক অত্যাবশ্যক দীক্ষানুষ্ঠান। এ হচ্ছে এক অস্থায়ী অনুগ্রহ—না হয় দর্শন আজো জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে তার তূণীর ভর্তি করে থাকে যেমন শ্রমিক নেতারাও রাজদরবারে যেতে হলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও পরে থাকে সিল্কের পাজামা। যদি ভবিষ্যতে কোনদিন সত্য সত্যই মধ্যযুগের অবসান ঘটে, তা হলে দর্শন এ সব মেঘলোক থেকে নীচে নেমে আসবে আর মানুষের ব্যবহারিক বিষয় নিয়েই করবে আলোচনা।

গ. বিজ্ঞানে যুক্তিশীলতা (Reason in Science)

যুক্তির জীবন "যে সব ব্যবহারিক চিন্তা আর কর্ম চেতনায় একটা ফলপ্রসূ সার্থকতা লাভ করে তারি নাম।" যুক্তি কখনো সহজাত-বৃত্তির শত্রু নয়—বরং তা হচ্ছে উভয়ের সফল সমন্বয়। এর ফলে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে লাভ করে সচেতনতা—দীপ্তিমান হয়ে ওঠে তার নিজের পথ আর গন্তব্য। এ যেন "প্রবৃত্তি আর ভাবগঠনের মধ্যে এক শুভ পরিণয়—উভয়ের মধ্যে পুরোপুরি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে মানুষ পরিণত হবে পশু বা উন্মাদে। এ দুই দৈত্যের মিলনের ফল হচ্ছে যুক্তিবাদী মানুষ—যে মানুষ গড়ে ওঠে কল্পনা-বিলাসমুক্ত ভাব আর ব্যর্থতাহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ সফল কর্মের দ্বারা। যুক্তি হচ্ছে "মানুষের দ্বারা ঐশীশক্তির অনুকরণ।"

যুক্তির যে জীবন তার ভিৎ হলো বিজ্ঞান, কারণ "বিজ্ঞান হচ্ছে সব রকম বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানের আধার।" যুক্তির অনিশ্চয়তা আর বিজ্ঞানের ভ্রমশীলতা সান্তায়ানার অজানা ছিল না—তিনি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আধুনিক বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছিলেন সে শুধু আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মানুবর্তিতার সংক্ষেপিত বর্ণনা হিসেবেই—বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত 'বিধান' আর সুনিশ্চিত অপরিবর্তনশীলতা রূপে নয়। এভাবে পরিবর্তন সাধনের পরও বিজ্ঞানের উপরই রাখতে হবে আমাদের একমাত্র আস্থা—"বুদ্ধির উপর যে বিশ্বাস....আজো একমাত্র বিশ্বাস, যা ফলের দ্বারা অনুমোদিত।" তাই সান্তায়ানা জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন—সক্রেটিসের মতো তিনিও মনে করতেন আলাপ-আলোচনা ছাড়া মানুষের জীবনই ব্যর্থ। "মানব প্রগতির সব দিককে" আর মানুষের সব কৌতূহল আর ইতিহাসের সব ঘটনাকেই তিনি চাইতেন যুক্তির বিশ্লেষণী আওতায় নিয়ে আসতে।

তা সত্ত্বেও তিনি বিনয়ী। তিনি নতুন কোন দর্শনের প্রবর্তন করতে চাননি। চেয়েছেন শুধু পুরোনো দর্শনকে আমাদের বর্তমান জীবনে প্রয়োগ করতে। তাঁর মতে আদি দার্শনিকরাই শ্রেষ্ঠ—আর সবার উপর শ্রেষ্ঠতম মনে করতেন ডিমোক্রিটাস (Democritus) আর এরিস্টোটলকে। প্রথমজনের সরল ও স্থূল বস্তুবাদ তাঁর প্রিয় ছিল আর দ্বিতীয়জনের শান্ত ও সুস্থ মানসিকতার প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। "মানব-স্বভাব সম্বন্ধে এরিস্টোটলের ধারণা পুরোপুরি নির্ভুল, সব আদর্শ বস্তুরই রয়েছে এক স্বাভাবিক ভিত্তি আর সব স্বাভাবিক বস্তুরই ঘটে আদর্শ উন্নয়ন। তাঁর নীতি পুরোপুরি বিচার আর হজম করলে তা যে চরম পূর্ণতা লাভ করেছে তা বুঝাতে পারা যাবে। যুক্তির জীবন এখানেই খুঁজে পাবে তার এক ক্লাসিক ব্যাখ্যা।" এভাবে ডিমোক্রিটাসের পরমাণু আর এরিস্টোটলের সোনালী মধ্যপথের হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে সান্তায়ানা সমকালীন জীবন-সমস্যার হয়েছেন সম্মুখীন।

"নিসর্গ দর্শনে নিঃসন্দেহে আমি জড়বাদী—হয়তো জীবিত দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র....। কিন্তু জড়বস্তু কি তা আমি জানি বলে দাবী করি না....তা জানার জন্য আমি বিজ্ঞানীদের মুখাপেক্ষী,....তবে জড়-বস্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হোক, নির্ভয়ে আমি তাকে জড়বস্তুই বলে থাকি। যেমন আমি আমার পরিচিত সিমণ্ আর জোনস্‌কে তাদের মনের গোপন খবর না জেনেও তাই বলে ডেকে থাকি।"

সর্বেশ্বরবাদের কল্পনা বিলাসের শিকার তিনি হননি--ও তো স্রেফ নাস্তিকতারই এক ছদ্মবেশ। প্রকৃতিকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করলে তাতে প্রকৃতির কিছুমাত্র মর্যাদা বাড়ে না। "প্রকৃতি শব্দেই যথেষ্ট কবিত্ব রয়েছে, তার উৎপাদন আর শাসন ক্রিয়াকর্মেরও যথোপযুক্ত প্রকাশ ঘটেছে তাতে, আমরা যে বিশ্বের বাসিন্দা তার অশেষ জীবনীশক্তি আর পরিবর্তনশীল শৃঙ্খলারও আভাস রয়েছে ঐ নামে।" এ রকম মার্জিত আর অ-প্রাকৃত রূপে পুরোনো বিশ্বাসকে চিরকাল আঁকড়ে থাকা মানে ডন কুইকসোর মতো অকেজো হাতিয়ার মেরামত করতে যাওয়া। তবুও সান্তায়ানার ভিতরে এটুকু কবিত্ব ছিল যে যার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সব রকম দেবদেবী বিবর্জিত পৃথিবীটা সহসা শীতল আর নিরানন্দকর বাসস্থান হয়ে যাবে। "কেন মানুষের বিবেক পরিণামে প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে অবিসম্বাদিতভাবে বিদ্রোহ করে বসে আর একভাবে না অন্যভাবে অদৃশ্যকে নিয়ে গড়ে ওঠা ধর্মমতে যায় ফিরে?" সম্ভবত—"আদর্শ আর চিরন্তনের সঙ্গে রয়েছে আত্মার সমগোত্রিয়তা"—যা আছে তা নিয়ে আত্মা সন্তুষ্ট থাকে না—আকাঙক্ষা করে উন্নততর জীবনের, মৃত্যুর চিন্তায় তা মুষড়ে পড়ে, এমন এক শক্তির আশায় মন বাঁধে যে শক্তি চারদিকের ঘটনা প্রবাহে হয়তো তাকে দিতে পারবে স্থায়িত্ব। কিন্তু উপসংহারে সান্তায়ানা স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেয়: "আমার বিশ্বাস অমরতা বলে কিছু নেই।.... প্রতি ঢেউ-এ যা ওঠে তা যেমন সমুদ্র তেমনি বিশ্বের শক্তি আর তেজই আমাদের ভিতর ক্রিয়া করে চলেছে। আমাদের ভিতর দিয়েই ঘটে তার নির্গমন—আমরা যতই চীৎকার করি না তা এগিয়েই চলবে। তার এগিয়ে চলা বা গতিশীলতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এটুকুই আমাদের সৌভাগ্য!"

সম্ভবত যান্ত্রিকতা এক বিশ্বজনীন ব্যাপার--যদিও "পদার্থ-বিজ্ঞান পৃথিবীর পৃষ্ঠোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গতি আর জীব-শিশুর উৎসারণ, মানব ব্যাপারও যার অংশমাত্র, তার কোন হদিসই দিতে পারে না"—তবুও মনোবিদ্যার পক্ষে সব চেয়ে উত্তম নিয়ম হচ্ছে মানবাত্মার গভীরতম নিভৃত দেশেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান্ত্রিকতার প্রাধান্য যে রয়েছে তা মেনে নেওয়া। মনোবিদ্যা যখন প্রতিটি মানসিক ঘটনার যান্ত্রিক আর বস্তুগত বুনিয়াদ সন্ধান করতে চায় তখনই তা সাহিত্য ছেড়ে বিজ্ঞানের এলাকায় করে প্রবেশ। এমনকি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে স্পিনোজার যে মহান রচনা তাও স্রেফ "সাহিত্যিক মনোবিদ্যা"—এক দ্বান্দ্বিক সিদ্ধান্তমাত্র কারণ তা প্রতিটি উদ্দীপনা আর আবেগের যান্ত্রিক আর শারীরবৃত্তিয় কারণের কোন সন্ধান করে না। এ যুগের 'প্রত্যক্ষ-বাদী'রা ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন—এখন নির্ভয়ে তাঁদের সে পথ অনুসরণ করা উচিত।

জীবন এত বেশী যান্ত্রিক আর বস্তুগত যে, চেতনা যা শুধু একটা অবস্থা আর প্রক্রিয়া মাত্র কোন রকম বস্তু মোটেও নয়, তার পেছনে কারণগত কোন শক্তি নেই, শক্তি নিহিত উত্তাপে, যার সাহায্যে উদ্দীপনা আর কামনা দেহ আর মস্তিষ্ককে গতিশীল করে তোলে। যে আলো চিন্তা রূপে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তাতে কোন শক্তি নেই। "চিন্তার মূল্য আদর্শ—হেতুগত তার কোন মূল্য নেই" অর্থাৎ চিন্তা কর্মের হাতিয়ার নয় বরং চিত্র-আঁকা অভিজ্ঞতারই এক রঙ্গমঞ্চ আর নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ গ্রহিতা শুধু।

'বিব্রত দেহকে মনই কি শাসনে রাখে আর যে সব শারীরিক অভ্যাসে মিল বা সাদৃশ্য অনিশ্চিত তারই কি নির্দেশ দিয়ে থাকে? অথবা তা কি বরং এক স্বয়ংক্রিয় আভ্যন্তরীণ যন্ত্র নয় যা বাস্তবায়িত করে তোলে অভিনব কর্মকে আর মন তখন এখানে ওখানে উঁকি মেরে দেখে কাজের সময়—কখনো আনন্দ আর সহযোগিতার সঙ্গে আবার কখনো অক্ষম বিদ্রোহের সাথে?....লালাণ্ডে (Lalande) অথবা যেই হোন যিনি দূরবীক্ষণ দিয়ে সারা আকাশ খুঁজেও ঈশ্বরের সন্ধান পাননি তিনি যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্ক খুঁজে দেখতেন তা হলে সেখানেও মানব-মনের সন্ধান পেতেন না।....এমন সব শক্তিতে বিশ্বাস করা মানে যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করা।....মনোবিজ্ঞানীরা যা দেখতে পেয়েছেন তা স্রেফ শারীরিক ঘটনাই।....আত্মা বস্তুগত জীবের অভ্যন্তরে স্রেফ এক চমৎকার ত্বরিৎ সংগঠন মাত্র....স্নায়ু আর কলার এক অত্যদ্ভুত জাল-রচনা, একটা মাত্র বীজ থেকে যা প্রতি প্রজননেই নতুন করে বেড়ে উঠছে।'

এ হাল্কা জড়বাদই কি আমাদের মেনে নিতে হবে? আশ্চর্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্তায়ানার মতো এমন এক সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ আর হাওয়াই কবি এমন এক দর্শনের পাথর গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছেন যে দর্শন শত শত শতাব্দীর চেষ্টায়ও কেন ফুল ফোটে বা শিশু কেন হাসে তার ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে ব্যর্থ। পৃথিবী একটা "সঙ্কর যাকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়"—যার আধখানা বস্তুগত আর আধখানা মানসিক, এসব কথা সত্য হলেও হতে পারে তবে এওতো "এক সচল যন্ত্রের সঙ্গে এক প্রেতাত্মার কুৎসিত সংযোগ"। কিন্তু সান্তায়ানার নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা—তিনিও এক সচলযন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাঁর নিজের স্বয়ংক্রিয়তা সম্বন্ধে ভাবছেন তার পাশে এ রীতিমতো লজিক আর মূর্তিমান প্রাঞ্জলতা। সচেতনতা যদি এতই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে তা হলে এতো ধীরে ধীরে আর এতো কষ্ট স্বীকার করে তার উৎপত্তির কারণ কি, দুনিয়ায় যেখানে অকেজো সব কিছুই দ্রুত বিলীন হয়ে যায় সেখানে তার টিকে থাকার কারণ কি? সচেতনতা বিচারের যেমন তেমনি আনন্দেরও বাহন, তার প্রধান কাজ সাড়ার মহড়া দেওয়া আর প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় সাধন। এর ফলেই আমরা মানুষ। হয়তো ফুল আর তার বীজে, শিশু আর তার হাসিতে পৃথিবীর এমন সব রহস্য নিহিত রয়েছে যা জলে বা স্থলে কোন যন্ত্রেই নেই আর সম্ভবত প্রকৃতিকে মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে চেষ্টা না করে জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কের আলোয় ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক।

AMARBOI.COM

কিন্তু সান্তায়ানা বার্গসঁ পড়েছেন তবে বার্গসঁকে ত্যাগ করেছেন বিরক্ত মনে।

'বার্গসঁ জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেন, তাঁর ধারণা তিনি তার স্বভাবের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক বিশ্লেষণ হচ্ছে জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও। এ সৃজনী উদ্দেশ্যটা কি যার গতি-লাভের জন্য রৌদ্র-বর্ষা অত্যাবশ্যক? এ জীবনই বা কি যা কারো হাতের এক গুলিতেই মুহূর্তে নিভে যায়? আর প্রাণ-শক্তিই বা কি যা তাপমাত্রার একটু পতন হলেই পৃথিবী থেকে হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন?'

সাঁৎ বভ (**Sainte Beuve**) তাঁর স্বদেশীয়দের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—তারা খ্রীস্টধর্ম ছাড়ার পরও থেকে যাবে ক্যাথলিক। রেনান (**Renan**), আনাতোল ফ্রাঁস আর সান্তায়ানারও এ একই বিশ্লেষণ। প্রতারিণী প্রেয়সীর প্রতি যেমন কারো কারো আকর্ষণ থেকে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্তায়ানারও অনুরূপ আকর্ষণ ছিল ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি—"মিথ্যা বলছে জেনেও তাকে আমি বিশ্বাস করি"—এ যেন মনোভাব। হারানো বিশ্বাসের প্রতি তাঁর শোকোচ্ছ্বাস : "জীবনের চেয়েও এ মনোরম ভুলের সঙ্গে মানবাত্মার স্পন্দনের রয়েছে অধিকতর সাদৃশ্য।" অক্সফোর্ডে পুরোনো কতকগুলো শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন :

'আমি এক নির্বাসিত,
শুধু যে বায়ু-তাড়িত নোঙর করা স্থান
যেখানে গুয়াডারেন্না উত্তোলন করে তার রক্তবর্ণ ধ্বজা
সেখান থেকেই যে নির্বাসিত হয়েছি তা নয়; আমি নির্বাসিত
আত্মার রাজ্য, যা স্বর্গীয়, নিশ্চিত, সব আশা-আকাঙ্ক্ষার যা লক্ষ্য
আর যা সর্বোত্তম কল্প-দৃষ্টি তার থেকেও।'

সান্তায়ানার শ্রেষ্ঠতম রচনা 'Reason in Religion'-এর সাফল্যের কারণ এই গোপন ভালোবাসা আর অবিশ্বাস্যে বিশ্বাস স্থাপন। এ গ্রন্থের সংশয়ী পৃষ্ঠাগুলি তিনি পূরণ করেছেন এক সুকোমল বিষণ্ণতা দিয়ে। ক্যাথলিকবাদের সৌন্দর্যে তিনি এখনো যেন খুঁজে পেয়েছেন ভালোবাসার যথেষ্ট কারণ। একথা অবশ্য সত্য যে তিনি "ঐতিহ্যগত গোঁড়ামি, বিশ্বাস অর্থাৎ পৃথিবীটার অস্তিত্ব ভালো হওয়ার কারণ যে তার উদ্দেশ্য মানুষ আর মানুষের আত্মা" এসব কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতেন কিন্তু তিনি নিন্দা করতেন "তরুণ কৌতুক-প্রিয়দের আর পোকায় খাওয়া জীর্ণ রসিকদের সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিকে, যারা ধর্মে বৈজ্ঞানিক অনাগ্রহ খুঁজে পেয়ে খুব জাঁক করতেন। এসব একচক্ষু অন্ধরা কিছুটা দেখে বটে কিন্তু চিন্তার যে অভ্যাস থেকে ঐসব আচারের উৎপত্তি, তাদের মূল অর্থ আর যথার্থ কাজ কি তা মোটেও জানতে চায় না তারা।" এ এক অসাধারণ ব্যাপার—সর্বত্রই মানুষের কোন না কোন ধর্ম রয়েছে, কাজেই ধর্ম না বুঝলে আমরা মানুষকে বুঝবো কি করে? "এসব অধ্যয়ন সংশয়বাদীকেও নর-জীবনের দুঃখ-বেদনা আর রহস্যের মুখোমুখী নিয়ে আসবে। ফলে তারা বুঝতে পারবে ধর্ম কেন এতো গভীরভাবে মানুষকে নাড়া দেয় আর বুঝতে পারবে যে এক হিসেবে তা গভীরভাবে ন্যায় ও সত্যও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুক্রেটিয়াসের মতো সান্তায়ানারও বিশ্বাস ভয়ের থেকেই ঘটেছে যত সব দেব-দেবীর প্রথম আবির্ভাব। 'অলৌকিকতায় বিশ্বাস চরম দুর্ভাগ্যের দিনে মানুষের এক বেপরওয়া বাজি—ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটলে যে সাধারণ জীবনীশক্তি মানুষকে ক্রমে আশ্বস্ত করে তোলে তার মূল-উৎস হওয়ার সম্ভাবনা থেকেও এর অবস্থান যথাসম্ভব দূরে।...সব যদি ভালোয় ভালোয় চলে, তা হলে আমরা গণ্য করবো এসব আমাদেরই কাজ।....যেসবের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি আছে আর আকস্মিক দাবীকে যা দিতে পারে বাধা মানুষ প্রথমে সে-সবকে পৃথক করে দেখতে আর আওড়াতে শেখে। কাজেই কিছুটা শত্রুতার সঙ্গেই মানুষের প্রথম মোকাবেলা ঘটে বাস্তবের সাথে—যা রূপায়িত হয় দুর্বলের প্রতি নিষ্ঠুরতা আর শক্তি-মানের সামনে ভয় আর তোষামোদ রূপে।...ধর্ম, এমন কি উচ্চতম পর্যায়ের গুলোও, দেবতাদের প্রতি যেসব নীচ অভিসন্ধি আরোপ করে তা দেখে দুঃখিত হতে হয় আর এমন এক কঠোর, কঠিন ও তিক্ত অস্তিত্ব থেকে তাদের কল্পনা করা হয়েছে দেখে করুণার উদ্রেক হয়। উত্তম খাদ্য দেওয়া, নাম দেওয়া, প্রশংসা করা, অন্ধভাবে আর নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য দেখানো—এসবকেই ভাবা হয়েছে দেবতাদের কাছে খুব সম্মানার্হ বলে —যার জন্য দরাজ হাতে তাঁরা বর্ষণ করবেন অনুগ্রহ আর শাস্তি। ভয় ছাড়াও মানুষের আছে কল্পনা-শক্তি—অপ্রতিরোধ্যভাবেই মানুষ দৈব-কল্পনা বিলাসী—সব কিছুকে সে ব্যাখ্যা করে নরত্ব আরোপ করে। চায় প্রকৃতিকে মূর্তিমান করে দেখতে, চায় দিতে প্রকৃতির নাট্যরূপ। শূন্য ভরাতে চায় দেব-দেবীর মেঘ সৃষ্টি করে: "রামধনুকে মনে করা হয়....আকাশের বুকে ছলনাময়ী কোন সুন্দরী দেবীর যাত্রাপথের চিহ্ন বলে।" লোকে যে এসব চমৎকার পুরা-কাহিনী আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে তা নয় কিন্তু এসবের কবিত্ব মানুষের গদ্যময় জীবনকে করে তোলে সহনীয়। এসব অতিকথার কবিত্ব প্রবণতা আজ ক্ষীয়মাণ—বিজ্ঞান আজ কল্পনার বিরুদ্ধে এক প্রবল আর সংশয়ী প্রতিক্রিয়া নিয়ে এসেছে। কিন্তু আদিম মানুষের মধ্যে, বিশেষত: নিকট প্রাচ্যে তা আজো অব্যাহতগতি। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে কবিতা আর রূপক অলঙ্কারের কোন অভাব নেই, যে য়ুহুদীরা এসব রচনা করেছে তারা কিন্তু এসবকে আক্ষরিক অর্থে নেয়নি কিন্তু অধিকতর বাস্তববাদী আর অপেক্ষাকৃত কম কল্পনা-প্রবণ য়ুরোপীয়রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন ভুল করে এসব কবিতাকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করে বসলো তখনই জন্মলাভ করলো পাশ্চাত্য শাস্ত্রের। খ্রীস্টধর্ম প্রথমে ছিল গ্রীকশাস্ত্র আর য়ূহুদী নীতিকথার সংমিশ্রণ—এ ছিল এক ভঙ্গুর মিলন, যাতে একে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ ছিল অবধারিত ক্যাথলিকবাদে গ্রীক আর প্যাগান ভাবধারার ঘটেছে প্রাধান্য, আর প্রোটেস্টেন্টবাদে প্রাধান্য ঘটেছে হিব্রু নীতিধর্মের। একে জন্ম দিয়েছে রেনেসাঁর অন্যে রিফরমেশনের।

জার্মানরা, যাদের সান্তায়ানা "উত্তরদেশীয় বর্বর" বলে অভিহিত করেছেন, কখনো সত্যিকারভাবে রোমান খ্রীস্টধর্মকে গ্রহণ করেনি। "দুঃসাহস আর ইজ্জতের এক অ-খ্রীস্টানী নীতিবোধ, আর অ-খ্রীস্টানসুলভ কুসংস্কার, কিংবদন্তী আর আবেগ সব সময় জুগিয়ে এসেছে মধ্যযুগীয় মানুষের মনের খোরাক।" গথিক গির্জাগুলোও বর্বরতার পরিচায়ক আর তা মোটেও রোমান নয়। প্রাচ্যের প্রশান্ত চিন্তার উপর টিউটনদের জঙ্গীভাবটাই উঠেছে মাথাচাড়া দিয়ে আর খ্রীস্টীয় ধর্মকে বদলে ভ্রাতৃত্ব-প্রেমের ধর্মের পরিবর্তে করে তুলেছে বৈশ্য গুণাবলীর এক কঠোর নির্দেশনামা—দরিদ্রের ধর্মকে তোলা হয়েছে ক্ষমতা আর সমৃদ্ধির ধর্ম করে। ঐ যৌবন-দীপ্ত গভীর, আদিম আর কবিত্বময় ধর্মকে টিউটনিক জাতেরাই ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছে খ্রীস্ট-ধর্মে আর স্থলাভিষিক্ত করেছে দুই বিলীয়মান বিশ্বের শেষ দীর্ঘশ্বাসের জায়গায়।

সান্তায়ানার মতে আক্ষরিক অর্থে না নিলে খ্রীস্টধর্ম অত্যন্ত চমৎকার, তার কোন তুলনা হয় না, কিন্তু জার্মানদের ঝোঁক আর দাবী আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার প্রতি। এর পর জার্মানিতে খ্রীস্টীয় গোঁড়ামির ক্ষয় অনিবার্য কারণ কোন কোন পুরোনো ধর্মবিশ্বাসকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া এক রকম অসম্ভব বললেই চলে, যেমন নিরপরাধের অনন্ত নরকবাস অথবা সর্বশক্তিমান করুণাময়ের সৃষ্ট জগতে পাপের অস্তিত্ব ইত্যাদি। ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা-নীতি গ্রহণের ফলে স্বভাবতই জনসাধারণের মধ্যে অজস্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক রকম মৃদু সর্বেশ্বরবাদ আর সর্বেশ্বরবাদ মানে 'কবিত্ব ভাষায় প্রকাশিত প্রকৃতিবাদ' ছাড়া আর কিছুই না। লেসিং আর গেটে, কার্লাইল আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমার্সন—এঁরা হচ্ছেন এ রদবদলের পরিচয়-চিহ্ন। সংক্ষেপে বলা যায়, যিশুর নীতি-শিক্ষা যেহোভার যে জঙ্গীভাব ইতিহাসের এক ক্রূঢ় মুহূর্তে নবী আর খ্রীস্টের শান্তিবাদের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মেও ঢুকে পড়েছিল তাকে একদম ধ্বংস করে দিয়েছে।

সান্তায়ানার যে উত্তরাধিকার আর মনের যে গড়ন তাতে তাঁর পক্ষে প্রোটেস্টেন্টবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সম্ভবই নয়—তাঁর আকর্ষণ যৌবনের বর্ণ-গন্ধের প্রতি। তিনি মধ্যযুগীয়তার চমৎকার সব কিংবদন্তী বর্জন, বিশেষ করে কুমারী মেরিকে প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রোটেসটেন্টদের করেছেন যথেষ্ট ভর্ৎসনা। হেইনের মতোই কুমারী মেরিকে তিনি মনে করেন 'কবিত্বের সুন্দরতম পুষ্প"। এক রসিকজন ঠাট্টা করে বলেছেন, সান্তায়ানার বিশ্বাস কোন ঈশ্বর নেই কিন্তু মেরি হচ্ছেন ঈশ্বরের মা! কুমারী মেরি আর সাধু-সন্তদের ছবিই বর্ধন করে তাঁর গৃহ-শোভা। অন্য ধর্মের সত্য থেকেও তিনি ক্যাথলিকবাদের সৌন্দর্যকে বেশী পছন্দ করতেন— একই কারণে বৈষয়িক শিল্প (Industry) থেকে ললিত-কলাই তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়।

'পুরা-কাহিনী সমালোচনার দুই সুর....প্রথমতঃ, ঐসবকে কুসংস্কার মনে করে ক্রুদ্ধ মনে বিচার করা। দ্বিতীয়তঃ, কবিত্বের এক প্রকাশ মনে করে হাসিমুখে ঐসবের দিকে তাকিয়ে দেখা। ....ধর্ম হচ্ছে মানব-অভিজ্ঞতাকে মানব-কল্পনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা।....ধর্মকে সত্য আর জীবনের প্রতিকী প্রকাশ মনে না করে আক্ষরিকভাবে ভাবা অসম্ভব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না। এ রকম ভাব যিনি পোষণ করেন তিনি এ বিষয়ে ফলপ্রসূ দার্শনিকতার ত্রি-সীমানায়ও প্রবেশ করেননি।...ধর্ম-বিষয় বাদানুবাদের বিষয় হতেই পারে না।....এসব গল্প-কাহিনীতে যে সাধুতা রয়েছে তাকে আমরা সম্মান আর যে কবিত্ব রয়েছে তাকে বরং আমরা বুঝতে চাই!'

যে-সব পুরাকাহিনী জনসাধারণের জীবনে নিয়ে আসে প্রেরণা আর শান্তি সংস্কৃতিবান লোক তাকে কখনো বানচাল করতে চাইবে না—হয়তো তাদের আশাবাদিতার জন্য তিনি তাদের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত হবেন। তবে তিনি বিশ্বাস করবেন না অন্য আর এক জীবনে। "জন্মগ্রহণ করাটাই তো অমরতার জন্য এক অশুভ লক্ষণ।" একমাত্র স্পিনোজা বর্ণিত অমরতাই তাঁর মনকে করে তুলতে পারে কৌতূহলী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্তায়ানা বলেন : "যিনি তাঁর আদর্শ নিয়ে থাকেন আর সমাজে বা শিল্পে তার প্রকাশ করতে সক্ষম তিনি উপভোগ করেন দ্বিগুণ অমরতা। জীবিত অবস্থায় চিরন্তনতা তাঁকে নিমগ্ন করে রেখেছিল—মৃত্যুর পর তাঁর প্রভাবে অন্যরা হন এ নিমগ্নতার শরিক, তাঁর মধ্যে যা ছিল শুভ ও শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে ঐ রকম আদর্শ সমধর্মিতার ফলে, যাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে তিনি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আশা করেন তা সব এদের মধ্যে পুনর্জীবিত হয়ে লাভ করে নিত্যতা। নিজেকে না ভুলিয়ে বা নিজের কাছে কোন রকম প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে তিনি এবার বলতে পারেন—তাঁর সবটুকু মৃত্যুর খোরাকে পরিণত হবে না। কারণ তাঁর সত্তার গড়ন সম্বন্ধে ইতর জনের চেয়ে তিনিই অধিকতর ওয়াকিবহাল। তাঁর নিজের মৃত্যু আর বিশ্বজনীন রদবদলের দর্শক আর তার শ্রোতা পুরোহিত হয়ে সব শক্তিতে যা কিছু আধ্যাত্মিক তার সঙ্গে তিনি নিজেকে দেবেন একাত্ম করে আর সব ভয়কে করবেন জয়। নিজেকে এভাবে উপলব্ধির ফলে তিনি সত্যিকারভাবে অনুভব করবেন আর জানবেন যে তিনি চিরন্তন।"

AMARBOI.COM

৬. সমাজে যুক্তির স্থান (Reason in Society)

অলৌকিক আশা-আশঙ্কার লোভ-ভীতি ছাড়াই যাতে মানুষকে সজ্জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তার উপায় উদ্ভাবনই দর্শনের প্রধান সমস্যা। ভাবগতভাবে দু'বার এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে: সক্রেটিস আর স্পিনোজা উভয়েই পৃথিবীকে দিয়েছেন যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ এক পদ্ধতি, যাকে বলা যায় স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত নীতি-শাস্ত্র। এর যে কোন পদ্ধতিতে যদি মানুষকে গড়ে তোলা যায় তা হলে সবদিকেই হবে মঙ্গল। তবে "সত্যকার যুক্তিবাদী নীতি বা সামাজিক শাসন পৃথিবীতে কখনো ছিলো না, ভবিষ্যতেও কদাচিত আশা করা যায়"—ঐটি আজো রয়ে গেছে দার্শনিকদের এক কল্পনা-বিলাস। নিজের মধ্যেই দার্শনিকের রয়েছে এক আশ্রয়, আত্মার সন্দেহ অন্য জীবনের ছলনাময় যে সুখ-কল্পনা তা স্রেফ এক কবিত্বময় রূপক। সত্যে তাঁর আনন্দ রয়েছে, দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে বা ছেড়ে যেতেও তিনি সমভাবে প্রস্তুত (যদিও হয়তো তাঁর মধ্যে কিছুটা একগুঁয়ে রকমের দীর্ঘায়ু কামনাও দেখা যায়)। বাদ বাকী আমাদের জন্য নৈতিক উন্নয়নের পথ অতীতের মতো ভবিষ্যতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহিত—প্রেম ও গৃহের সদয় ও উদার পরিবেশে যে সব সামাজিক আবেগ অনুভূতির বিকাশ ঘটে তার উপরই এ নির্ভরশীল।

শোপেনহাওয়ার যে বলেছেন প্রেম হচ্ছে ব্যক্তির উপর জাতির এক বিরাট প্রতারণা—এ মিথ্যা নয়, তাঁর মতে "প্রেমের দশভাগের ন'ভাগ হচ্ছে প্রেমিকের মনগড়া, আর এক ভাগ প্রেমপাত্রীর হতেও পারে" আর "প্রেম আত্মটাকে আবার নৈর্ব্যক্তিক অন্ধপ্রবাহে ফেলে গলিয়ে একাকার করে দেয়।" তা সত্ত্বেও প্রেমের প্রতিদানও আছে—তার জন্য চরম ত্যাগে মানুষ পেয়ে থাকে পূর্ণতম আনন্দ। লাপ্লেস (Laplace) নাকি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বলেছেন "বিজ্ঞান অতি তুচ্ছ ব্যাপার, প্রেম ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়।" যাই হোক, কিছুটা কাব্যিক ছলনা সত্ত্বেও রোমান্টিক প্রেমও সাধারণতঃ একটা সম্বন্ধেই পরিণতি লাভ করে—পিতামাতা হওয়া, সন্তান পাওয়া, কৌমার্যের যে-কোন নিরাপত্তা থেকে এসব মানুষের সহজাত-বৃত্তিকে অধিকতর তৃপ্তি দিয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততিই আমাদের অমরতা আর "যখন দেখি আমাদের অমরতা অংশের আধখানাও ভালোভাবে লেখা হয়েছে তখন আমাদের জীবনের অস্পষ্ট পাণ্ডুলিপিটা আমরা স্বেচ্ছায় জলন্ত আগুনে ফেলে দিই।"

AMARBOI.COM

মানব-স্থায়িত্বের রাজপথ হলো পরিবার, তাই আজো তা মানুষের মৌলিক প্রতিষ্ঠান, অন্য সব প্রতিষ্ঠান অকেজো হয়ে গেলেও পরিবার-প্রথাই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম। তবে তা সভ্যতাকে কিছুটা সহজ উচ্চতা পর্যন্তই শুধু নিয়ে যায়—অধিকতর উন্নয়নের জন্য আরো বৃহত্তর ও জটিলতর পদ্ধতির প্রয়োজন, যেখানে সৃজনী কেন্দ্র হিসেবে পরিবারের ভূমিকা নগণ্য, এখানে সভ্যদের আর্থিক সম্পর্কের উপর পারিবারিক কর্তৃত্ব অচল। তখন দেখা যায় তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ক্রমশঃ রাষ্ট্রই দখল করে নিচ্ছে। নীটশের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে দৈত্য বিশেষ—প্রয়োজনাতিরিক্ত বিরাটকায় দৈত্য, কিন্তু এ দৈত্যের কেন্দ্রীভূত নির্যাতন যে অসংখ্য ও নানা ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্যাতন আমাদের জীবনটাকে তিক্ত-বিরক্ত আর সীমিত করে রেখেছিল তার হাত থেকে দেয় মুক্তি। দস্যু-দলপতি যে শান্তভাবে রাজস্ব গ্রহণ করে সে শত শত ছোট দস্যু থেকে অনেক ভালো যারা বিনা খবরদারিতে আর অনির্দিষ্টভাবে মাশুল আদায় করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ জন্যই জন-চিত্তে স্বদেশ প্রেমের কিছুটা স্থান—তারা জানে সরকার পরিচালনের জন্য তারা যে মূল্য দিয়ে থাকে বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যের ব্যয়ের তুলনায় তা অনেক সস্তা। এ ধরনের স্বদেশ-প্রেম ভালোর চেয়ে বেশী মন্দ করে কিনা এ প্রশ্নও সান্তায়ানার মনে জেগেছিল—কারণ যারা পরিবর্তন পন্থী এ ধরনের স্বদেশ-প্রেম তাদের রাষ্ট্রোদ্রোহী বলে অভিহিত করতে চায়। যদি স্বদেশপ্রেম নেহাৎ অন্ধ না হয় তা হলে তা দেশের বাস্তব অবস্থা আর তার অন্তর্নিহিত আদর্শের পার্থক্য দেখে তাতে জড়িত হবেই—ফলে তা দাবী জানাবে পরিবর্তনের আর করবে তার জন্য চেষ্টা। অন্যদিকে স্বজাতি-প্রেম অপরিহার্য। "কোন কোন জাতি যে শ্রেষ্ঠতর তাতে সন্দেহ নেই। জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অধিকতর ও পূর্ণতর সমন্বয়ের ফলে তারা লাভ করেছে জয়, সুযোগ-সুবিধা আর আপেক্ষিক স্থায়িত্ব।" এ কারণে শুধু স্বীকৃত সমতা আর স্থায়িত্ব যে-সব জাতের রয়েছে তার মধ্যে ছাড়া অন্যত্র আন্তর-বিবাহ ভয়ানক ক্ষতিকর। "য়ূহুদী, গ্রীক, রোমান আর ইংরেজ—অন্য জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে যেভাবে মহত্তর শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে অন্য সময় তার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না—দৃঢ়তার সঙ্গে তারা অন্য জাতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় কিন্তু মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের সংস্কৃতিও তারা গ্রহণ করে; কিন্তু যখনই এ নৈকট্য এক হয়ে মিশে যায় তখন ভিতরে ভিতরে এই শ্রেষ্ঠত্ব হয়ে পড়ে দুর্বল ও নেমে আসে পতন।"

রাষ্ট্রের সবচেয়ে ত্রুটি বা পাপ হচ্ছে তার যুদ্ধের যন্ত্রে পরিণত হওয়ার প্রবণতা—দুর্বলতর ভেবে বিশ্বের মুখের উপর উদ্যত মুষ্টি উত্তোলন করা। সান্তায়ানার মতে কখনো কোন জাতি যুদ্ধ জয়ে সক্ষম হয়নি 'যেখানে রাজনৈতিক দল আর সরকার মন্দ'—বলা বাহুল্য সব দেশে, সব যুগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়ে থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের বিশেষ কোন ইতর বিশেষ ঘটে না। "তবে নিজের দেশের বা শত্রুপক্ষের, যে সৈন্যবাহিনীই যুদ্ধে জিতুক, স্থানীয়ভাবে তাদের লুটপাট থেকে কারো রেহাই নেই।....যে-কোন অবস্থায় এসব দেশে সাধারণ নাগরিককে বেশীরভাগ কর-ভার বইতেই হয় আর ভোগ করতে হয় তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী যন্ত্রণা, আর উপেক্ষা। এসব সত্ত্বেও....নির্যাতিত প্রজা ও অন্যান্যদের মতো স্বদেশ-প্রেমের নামে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে আর যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ, এমন সরকারের প্রতি, যে সরকার জনস্বার্থের কিছুমাত্র প্রতিনিধিত্ব করে না, তার প্রতি অন্ধ আনুগত্য যে বিকৃতির পরিচায়ক তা দেখিয়ে দেয় তা হলে তার যে কিছুমাত্র কর্তব্য আর সম্মান-জ্ঞান নেই নির্যাতিত প্রজাটাও সে কথা বলে চেঁচিয়ে ওঠে।"

দার্শনিকের পক্ষে এ অবশ্য কঠোর ভাষা। তবে সান্ত্বনাকে বিনা সংশোধনেই গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময় তিনি ভাবতেন বৃহত্তর রাষ্ট্রের পক্ষে ছোট রাষ্ট্রকে জয় করে আত্মসাৎ করা মানে মানব-জাতির সংগঠন আর শান্তির পথে এক সম্মুখ-পদক্ষেপ—একদিন পৃথিবী যেমন রোমের দ্বারা শাসিত হয়েছিল—প্রথমে তরবারির দ্বারা হলেও, পরে হয়েছিল কথার দ্বারা—তেমনিভাবে যদি সারা পৃথিবী কোন বৃহৎ শক্তি বা শক্তি–সমবায় দ্বারা শাসিত হয় তা হলে তা হবে বিশ্বের জন্য এক মহা-কল্যাণ।

'একদা যে বিশ্বজনীন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, যা নামে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলও—সার্বজনীন শান্তি, সার্বিক যুক্তিবাদী শিল্প আর দার্শনিক উপাসনায়ই এক সাম্রাজ্য, তার উল্লেখ এখন আর কেউ করে না। ....যাকে অন্ধকার যুগ বলা হয় সে যুগেই ঘটেছে আমাদের রাজনৈতিক রীতি-নীতির উদ্ভব, এসবের পেছনে যে রাজনৈতিক মতবাদ ছিল তা আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত, কারণ তার বিশ্বজনীন সাম্রাজ্য আর ক্যাথলিক গির্জার যে মতবাদ তা হচ্ছে তার পূর্ববর্তী যুক্তিবাদী যুগেরই প্রতিধ্বনি যখন কিছু সংখ্যক মানুষ বিশ্ব শাসন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সারা বিশ্বটাকে জরিপ করে একটা ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন।'

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটলেই সম্ভবত: দলীয় বা উপদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছুটা অবসান ঘটবে আর তা হবে অন্তত: কিছুটা "যুদ্ধের বদলে নৈতিকতার" আমদানি আর হয়তো পারস্পরিক অর্থ-বিনিয়োগের ফলে বিশ্বের বাজার নিয়ে যে মারমুখী বাণিজ্যিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাও আসবে কমে। স্পেন্সারের মতো সান্তায়ানা কিন্তু শিল্প ব্যাপারে অত উৎসাহী ছিলেন না—তিনি তার জঙ্গীরূপ আর শান্তির দিক দুই সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। সর্বোপরি তিনি আধুনিক বৃহৎ নগরীর কলকোলাহল থেকে প্রাচীন আভিজাত্যের আবহাওয়াতেই অধিকতর স্বস্তিবোধ করতেন। আমরা অতি বেশী উৎপাদন করে থাকি আর থাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের তৈরী জিনিসে নিমগ্ন হয়ে। ইমার্সনের ভাষায় "বস্তুই পিঠের উপর সওয়ার হয়ে মানবজাতিকে চালাচ্ছে।" "শুধু দার্শনিকদের দ্বারা গঠিত বিশ্বে দৈনিক এক ঘণ্টা কি দু' ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রম খুবই এক কাম্য গুণ—এর ফলে বস্তুগত অভাব যাবে মেটানো।" আমেরিকা থেকে ইংলণ্ড বিজ্ঞতর, অবশ্য অধিকতর উৎপাদনের বাতিক তাদেরও পেয়ে বসেছে, তবুও অন্তত: তার জনসংখ্যার একাংশ শিল্প আর অবসরের মূল্য বোঝে।

তাঁর ধারণা বিশ্বের কাছে যে সভ্যতা সুপরিচিত তা আভিজাত্যেরই ফসল।

'সভ্যতা এযাবৎ সুবিধা-ভোগী কেন্দ্রগুলির প্রসার আর বিমিশ্রণেরই ফল—তার উৎপত্তি জনগণের থেকে আদৌ নয়। তার ভিতর থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু তাদের থেকে ভিন্নতর হয়ে এবং পরে তাদের উপর তা আরোপ করা হয়েছে উপর থেকে।....অধিকাংশ আধুনিক জাতিতে যে শ্রমিক-কৃষকের জনতাকে দেখা যায় স্রেফ তাদেরে নিয়ে যদি কোন রাষ্ট্র গঠিত হয় তা হবে পুরোপুরি এক বর্বর রাষ্ট্র। ঐ রকম রাষ্ট্রে সব রকম উদার মতবাদের ঘটবে বিনাশ—আর স্বদেশপ্রেমের যুক্তিবাদী আর ঐতিহাসিক নির্যাসটুকুও যাবে হারিয়ে। তার আবেগটুকু নিঃসন্দেহে বজায় থাকবে, কারণ জন-চিত্তে সহৃদয়তার কোন অভাব নেই। তারা প্রত্যেকে আবেগ-উদ্দীপনারই অধিকারী কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েই তারা অপারগ কারণ তা সঞ্চয় করার জন্য এমন সব উন্নততর যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ের দরকার যা গড়ে তোলে অভিজাত সমাজ।'

সাম্যের আদর্শ তাঁর পছন্দ নয়, প্লেটোর প্রতিবাদে তিনি বলেন অ-সমানের সমতা ও অসমতা। তবুও আভিজাত্যের কাছে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিক্রি করেননি—তিনি জানতেন ইতিহাসে তার পরীক্ষা হয়ে গেছে, দেখা গেছে তাতে গুণ যতখানি দোষও তার চেয়ে কম নেই। তাতে অনভিজাত প্রতিভার সব ভবিষ্যৎ রুদ্ধ, যে-সব শ্রেষ্ঠত্ব আর গুণাবলীর বিকাশ আর ব্যবহার অভিজাত সমাজের অভিপ্রেত স্রেফ সে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ছাড়া সব কিছুর বিকাশকে আভিজাত্য শুকিয়ে আর চুষে মারে। সংস্কৃতিকে তা যেমন গড়ে তোলে তেমনি তা হয়ে পড়ে নির্যাতনেরও হাতিয়ার—এ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয়র স্বাধীনতার জন্য লক্ষজনকে দিতে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্য। সমাজ-বিশেষের প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের উন্নয়ন আর সামর্থ্যের মাপকাঠি দিয়ে সমাজের বিচার করাই হওয়া উচিত রাজনীতির প্রথম শর্ত, "শুধু একটিমাত্র বিশেষ জীবনের কৃতিত্ব দিয়ে কোন জাতিই স্মরণীয় হওয়ার দাবী করতে পারে না, সমুদ্রের বালু-কণার চেয়ে তা অধিকতর স্মরণীয় নয়।" এদিক থেকে দেখলে আভিজাত্যের চেয়ে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব মানতেই হয়। কিন্তু গণতন্ত্রও ত্রুটিমুক্ত নয়—দুর্নীতি আর অযোগ্যতা তো আছেই তার চেয়েও মন্দ হচ্ছে গণতন্ত্রের নিজস্ব নির্যাতন তথা সমতা বিধানের বাতিক। "ইতর নাম-গোত্রহীন নির্যাতনের চেয়ে ঘৃণ্য নির্যাতন আর হতেই পারে না। এ হচ্ছে সর্বগ্রাসী আর সার্বিক প্রতিরোধকারী, প্রতিটি ফুটনোন্মুখ মহত্ত্বকে নষ্ট করে দেয়, নষ্ট করে দেয় প্রতিভার প্রতিটি অঙ্কুরকে তার সদা-উপস্থিতি আর ভয়ঙ্কর নির্বুদ্ধিতার দ্বারা।"

আধুনিক যুগের বিশৃঙ্খলা আর ব্যস্ততার প্রতি রয়েছে সান্তায়ানার সবচেয়ে বেশী ঘৃণা। প্রাচীন আভিজাত্যের যে বিশ্বাস শুভ যা তা স্বাধীনতা নয় বরং বিজ্ঞতা আর নিজের স্বাভাবিক সীমা মেনে চলায় তার সন্তোষ। এতেই কি মানুষ অধিকতর সুখী ছিল না—সান্তায়ানার মনে এ প্রশ্নও জাগে। চিরকালের ঐতিহ্য থেকে মানুষ জানে—মাত্র গুটি কয়েকই জীবনে জয়ী হয়। কিন্তু এখন গণতন্ত্র সকলের সামনে মুক্তির এক সদর দরজা খুলে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে বাধাবন্ধহীন মুক্ত-শিল্পের ; 'যে যেমনভাবে ধরতে পারার' এক মল্লযুদ্ধ, প্রতিটি মানুষের মন আজ উপরে ওঠার উত্তেজনায় ক্ষতবিক্ষত—কারো মনে নেই সন্তোষ কি তৃপ্তি। শ্রেণীসংগ্রাম চলছে অবাধে, কোন রকম সীমা সংযম না মেনেই। "এ সংগ্রামে যে-ই জয়লাভ করুক (যার ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করে দিয়েছে উদার-নীতি) সেই উদারনীতিকে খতম করে ছাড়বে।" বিপ্লবেরও এ হচ্ছে নেমেসিস বা বৈর-নির্যাতনের দেবী—যে উৎপীড়নকে তারা ধ্বংস করেছে আত্মরক্ষার জন্য সে উৎপীড়নকেই তারা আবার তুলবে জিইয়ে। 'বিপ্লব এক অস্পষ্ট বস্তু। যে-সবের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছে সে-সবকে নতুন করে নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ আর তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শক্তির অনুপাতেই সাধারণত: তার সাফল্য লাভ ঘটে থাকে। সহস্র সংস্কার আন্দোলনের পরও দুনিয়ায় তেমনি দুর্নীতি রয়ে গেছে—কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেক সফল সংস্কারই এক নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে আর এ প্রতিষ্ঠানই জন্ম দিয়েছে নতুন আর তার সহায়ক দুর্নীতির।'

তা হলে কি ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবো আমরা? সম্ভবতঃ কোন রকম সমাজেরই না—কারণ একের সঙ্গে অন্যের তেমন কোন ইতর বিশেষ নেই। যদি বিশেষভাবে চাইতেই হয় তবে টিমোক্রেসী (Timocracy) বা ইজ্জৎ-তন্ত্রই চাওয়া যায়। গুণ আর সম্মানজ্ঞান যাদের আছে তাদের নিয়েই গঠিত হবে এ সরকার, এও অভিজাততন্ত্রই হবে তবে উত্তরাধিকার সূত্রে নয়—রাষ্ট্রের উচ্চতম পদে পৌঁছার সব রকম রাস্তা যোগ্যতানুসারে সব নর-নারীর জন্যই খোলা থাকবে। কিন্তু অযোগ্যতার জন্য এ পথ থাকবে বন্ধ—প্রচুর গণ-সমর্থন থাকলেও। "একমাত্র সুযোগের সমতাই করা হবে পোষণ।" এ রকম সরকারে দুর্নীতির সুযোগ থাকবে অত্যন্ত কম—বিচার-বিবেচনার সাথে উৎসাহ দেওয়ার ফলে বিজ্ঞান আর কলা-শিল্পের ঘটবে সমৃদ্ধি। এ হবে গণতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্রের এমন এক সমন্বয় যার প্রতীক্ষায় আজকের বিশৃঙ্খল রাজনীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্ব হয়ে আছে উদ্গ্রীব। উত্তমরাই শুধু শাসন করবে তবে সকলকেই দিতে হবে উত্তম হওয়ার সমান সুযোগ-সুবিধা। এ অবশ্য, প্লেটোরই পুনরাবির্ভাব—তাঁর রিপাব্লিকে (Republic) তিনি যে দার্শনিক রাজাদের কল্পনা করেছেন যে-কোন দূরদর্শী রাজনৈতিক দর্শনের দিগন্তে তার আবির্ভাব অনিবার্য। যত গভীরভাবেই এ বিষয়ে আমরা চিন্তা করে দেখবো ততই আমরা ফিরে যাবো প্লেটোতে। আমাদের কোন নতুন দর্শনের প্রয়োজন নেই—আমাদের প্রয়োজন প্রাচীনতম আর সর্বোত্তম দর্শন মোতাবেক জীবনযাপনের সাহসটুকু শুধু।

AMARBOI.COM

চ. মন্তব্য

যা কিছু ছিল তাঁর প্রিয় আর অভ্যস্ত সে-সব থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের এক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে সান্তায়ানার গ্রন্থের পাতায় পাতায়—তিনি ছিলেন স্পেনদেশীয় অভিজাত কিন্তু নির্বাসিত হয়েছেন মধ্যবিত্ত আমেরিকায়। সময় সময় তাঁর ভিতর থেকে এক গোপন বিষাদ বেরিয়ে পড়তো। তিনি বলেছেন—"জীবনটা যাপনের অর্থাৎ বেঁচে থাকার উপযুক্ত, এ এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার—এ ছাড়া টানা হতো এক অসম্ভব পরিণতি"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর 'The Life of Reason'-এর প্রথম খণ্ডে তিনি মানব-জীবনের পরিকল্পনা আর অর্থ এবং ইতিহাসকেই দর্শনের আলোচ্য বিষয় বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু শেষ খণ্ডে এসে আশ্চর্য হয়ে জানতে চাচ্ছেন সত্যই জীবনের কোন অর্থ বা পরিকল্পনা আছে কি? অজ্ঞাতসারে তিনি যেন নিজের ট্র্যাজেডিই বর্ণনা করেছেন: "পূর্ণাঙ্গতাতেই রয়েছে ট্র্যাজেডি কারণ যে বিশ্বে পূর্ণাঙ্গতার উত্থান সে বিশ্বই অপূর্ণাঙ্গ।" শেলীর মতই সান্তায়ানাও মাঝারি রকমের গ্রহটাতে মোটেও স্বস্তিবোধ করেননি—তাঁর তীব্র সৌন্দর্য-চেতনা মনে হয় বিশ্বের চারদিকে বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্যে আনন্দ পাওয়ার চেয়ে তাঁর সামনের বস্তুগুলির কদর্যতাতেই পেতো অধিকতর মর্মপীড়া। সময় সময় তিনি হয়ে পড়তেন তিক্ত আর বিদ্রূপাত্মক—প্যাগানবাদের দিল-খোলা বিশুদ্ধ হাসিরও তিনি অধিকারী ছিলেন না, ছিলেন না রেনান বা আনাতোল ফ্রান্সের স্ফুট ক্ষমতাশীল মানবতারও অধিকারী। তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন আর শ্রেষ্ঠতর, ফলে নিঃসঙ্গ। তাঁর জিজ্ঞাসা—"বিজ্ঞতার ভূমিকা কি?" নিজেই উত্তর দিচ্ছেন: "এক চোখ খুলে রেখে স্বপ্ন দেখা, কোন রকম বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে পৃথিবী সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকা, চঞ্চল ও অস্থির সৌন্দর্যকে স্বাগত জানানো আর অস্থির দুঃখকে জানানো সহানুভূতি—এসব কত যে অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী তা মুহূর্তের জন্যও না ভুলে।"

AMARBOI.COM

সম্ভবত: সব সময় এ 'মৃত্যুকে স্মরণ করো' নীতি আনন্দেরই মৃত্যু-ঘণ্টা। বাঁচতে হলে মৃত্যুর চেয়েও জীবনকেই বেশী করতে হয় স্মরণ—আসন্ন ও বাস্তব বস্তুকে যেমন তেমনি দূর ও পরিপূর্ণ আশাকেও সাদরে বরণ করা উচিত। "দূরকল্পী চিন্তা মানে যতখানি সম্ভব চিরন্তনে বাস করা আর নিজের মধ্যে সত্যকে আর সত্যের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করা।" তবে এ হচ্ছে দর্শনকে বড্ড বেশী গুরু-গম্ভীরভাবে গ্রহণ যার যোগ্য দর্শন হয়তো নয়—যে দর্শন মানুষকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছাড়ে তাও যে স্বর্গীয় কুসংস্কার যা মানুষের চোখকে অন্য জগতের স্বপ্নে জড়িয়ে রেখে এ জগতের মদ-মাংস থেকে বঞ্চিত করে তার চেয়ে কম বাঁকা বা অন্যায় নয়। সান্তায়ানার মতে "আশা-ভঙ্গের পরেই আসে বিজ্ঞতা"—তবুও এ হচ্ছে বিজ্ঞতার সূচনামাত্র যেমন দর্শনের সূচনা সন্দেহে। এ লক্ষ্য ও পূর্ণতা নয়। লক্ষ্য সুখ, দর্শন উপায় মাত্র। ওটাকে লক্ষ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করলে আমাদের দশা হবে হিন্দু অতিন্দ্রীয়বাদীর মতো যাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের নাভি-কেন্দ্রে এক-লক্ষ্য হওয়া।

বিশ্ব সম্বন্ধে সান্তায়ানার ধারণা বিশ্ব হচ্ছে এক পদার্থিক যান্ত্রিকতা। মনে হয় কিছুটা তারই ফলে তিনি অপ্রসন্ন মনে আত্মগোপন করেছেন নিজের মধ্যে—পৃথিবী থেকে নিজের জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তিনি এখন তারই সন্ধান করছেন নিজের বুকের তলায়। তিনি অবশ্য এ সম্বন্ধে আপত্তি জানান, বলেন তা নয়। কিন্তু তাঁকে আমরা বিশ্বাস করতে না পারলেও তাঁর অতিবেশী প্রবল আপত্তির সৌন্দর্যে আমরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

মতবাদ কখনো আবেগহীন বস্তু নয়। শুধু একটা মাত্র ভাবকে রূপ দিয়ে যদি সঙ্গীত এমন আবেগ-অনুভূতিময় হতে পারে তা হলে যে স্বপ্ন-কল্পনা আমাদের জানা সবকিছুতে একটা শৃঙ্খলা আর নিয়ম-পদ্ধতি নিয়ে আসতে সক্ষম তা সৌন্দর্য বা ভয়ে কতখানি পূর্ণ-গর্ভা হতে পারে? ....তোমার যদি বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীতে বিশ্বাসের অভ্যাস থাকে অথবা যদি আশা করে থাকো যে পরবর্তী জীবনেও চমৎকার সব দুঃসাহসিক প্রেমাভিযান চালিয়ে যেতে পারবে তা হলে জড়বাদ তোমার সব আশাকে অত্যন্ত নিরানন্দভাবেই তছনছ করে ছাড়বে—আর বছর দু বছর ধরে তোমার শুধু মনে হবে বাঁচার কোন অবলম্বনই তোমার নেই। শীতল জলের সাহায্যে যিনি নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে খ্রীস্ট-ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তাতে শুধু অর্ধ-নিমগ্ন হয়েছেন তাঁর মতো যিনি নন—যাঁর জন্মই ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে তিনি যদি পুরোপুরি জড়বাদী হন, তাঁর অবস্থা হবে হাসিমুখো দার্শনিক ডিমোক্রিটিয়াসের মতো। এমন এক যান্ত্রিকতায় তাঁর আনন্দ যা অসংখ্য চমৎকার সব সুন্দর রূপ গ্রহণে সক্ষম আর তা প্রেরণা জুগিয়ে থাকে বহুবিধ আবেগ-অনুভূতির। এর যে মানবিক গুণপনা তার তুলনা চলে প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘর দেখার সঙ্গে, যেখানে মানুষ বিভিন্ন খাঁচায় দেখতে পায় বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য প্রজাপতি, ফ্লেমিংগোপাখী শামুক; বৃহৎদাকায় ম্যামথ আর গরিলা। ঐ অসংখ্য জীবনেও কোন বেদনা যে ছিল না তা নয় কিন্তু অচিরে তার অবসান ঘটেছে কিন্তু ইত্যবসরে জীবনের কি চমৎকার সমারোহ, বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সংযোগ কি অশেষ আনন্দের আকর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরম সব প্রবৃত্তির কি অনিবার্যতা আর কি বোকামি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত: প্রজাপতিরা যদি কথা বলতে পারতো তা হলে বলতো যাদুঘর হচ্ছে (জড়বাদী দর্শনের মতো) মৃত-বস্তুরই এক প্রদর্শনী বাক্স— পৃথিবীর বাস্তবতা এসব বিয়োগান্ত সংরক্ষণকে যায় এড়িয়ে, আবার আশ্রয় নেয় প্রবৃত্তির বেদনায়, চির-পরিবর্তনশীল আর অশেষ জীবন-প্রবাহে। তাঁর এক পর্যবেক্ষণশীল বন্ধু বলেছেন:

"সান্তায়ানার এক স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে নির্জনতার প্রতি....মনে পড়ে সাউদাম্পটনে নোঙর করা এক সমুদ্রগামী জাহাজের রেলিং ধরে একটি ক্ষুদ্র ইংরেজ জাহাজ থেকে লোক ওঠানামা দেখছিলাম—দেখলাম জাহাজের একপাশে একটিমাত্র লোক নির্লিপ্তভাবে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীদের ধ্বস্তাধ্বস্তি আর ব্যস্ততা উপভোগ করছেন। সবাই উঠে গিয়ে ডেক খালি হলে তিনিও এবার অনুসরণ করলেন তাদের। 'সান্তায়ানা ছাড়া এ আর কে হবেন?' পাশের কে একজন বলে উঠলেন। আমরা সবাই যে-চরিত্র নিজের প্রতি সত্যশীল তেমন এক চরিত্রকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলাম।"

অবশেষে তাঁর দর্শন সম্বন্ধেও একই কথাই বলা যায়—তা সত্যনিষ্ঠ আর নির্ভিক আত্মপ্রকাশের এক নিদর্শন। যদিও কিছুটা গম্ভীর, এ দর্শনেই পরিচয় মেলে এমন এক আত্মার যা পরিণত আর সূক্ষ্ম প্রশান্ত-চিত্তে প্রস্তরমূর্তিবৎ ক্ল্যাসিক গদ্যেই লেখা হয়েছে এ দর্শন। আমরা এ দর্শনের অপ্রধান কোন কোন বিষয় আর বিলীয়মান পৃথিবী সম্বন্ধে তার চাপা সুমিষ্ট প্রতিবাদ পছন্দ না করতে পারি কিন্তু তাতে আমরা দেখতে পাই মুমূর্ষু আর অঙ্কুরিত যুগের এক পরিপূর্ণ প্রকাশ। এ যুগে মানুষ পুরোপুরি বিজ্ঞ আর স্বাধীন হতে পারে না কারণ তারা বিসর্জন দিয়েছে পুরোনো সব ভাব আর নতুন এমন কোন ভাবেরও পায়নি সন্ধান যা তাদের নিয়ে যেতে পারে পরিপূর্ণতার কাছাকাছি।

২. উইলিয়াম জেমস্ (William James)

ক. ব্যক্তিগত

যে দর্শন এই মাত্র আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম তা যে রচনার স্থান ছাড়া আর সব দিকেই য়ুরোপীয় তা নতুন করে বলার বোধকরি কোন প্রয়োজন নেই। সুমার্জিত আর সুকোমল পরিপক্কতা, যা যে-কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনো সংস্কৃতির এক বড় বৈশিষ্ট্য তার সব পরিচয়ই এতে রয়েছে—'Life of Reason'-এর যে-কোন অনুচ্ছেদ দেখে যে কেউ বলতে পারবে এ কখনো আমেরিকার স্থানিক স্বভাবজ কণ্ঠস্বর নয়।

কিন্তু উইলিয়াম জেম্‌সের কথা, কণ্ঠস্বর, এমন কি প্রতিটি বাক্যাংশের ভংগীটি পর্যন্ত, আমেরিকীয়। রাস্তার সাধারণ মানুষেরও সহজবোধ্যতায় নিজের চিন্তাকে নিয়ে আসার জন্য তিনি 'নগদ-মূল্য' (Cash-value), 'ফলাফল' (Results) আর 'লাভ' (Profits) ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রকাশকেও লুফে নিয়ে নিজের রচনায় দিয়েছেন স্থান। তিনি সান্তায়ানা বা হেনরি জেম্‌সের মতো আভিজাতিক বৈশিষ্ট্যের সুরে কথা বলেননি বরং বলেছেন প্রাকৃতজনের সরল ভাষায়, বেশ জোর আর সুনির্দিষ্টতার সাথে। যার ফলে তাঁর 'প্রয়োগবাদী' আর 'সংরক্ষিত শক্তি'র দর্শন রুজ-ভেল্টের 'উদ্যোগী' আর 'ব্যবহারিক' মনের সহযোগী হতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো শাস্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় দিকের প্রতি সাধারণ মানুষের 'সরল মনের' যে আস্থা তাকে তিনি দিয়েছেন ভাষা—যে আস্থা আমেরিকীয় আত্মায় দিয়েছে বাণিজ্যিক আর অর্থকরী বাস্তব-দৃষ্টি আর সে সঙ্গে এক কঠিন অধ্যবসায়ী সাহস যা মরুভূমিকে 'প্রতিশ্রুত ভূমিতে' পরিণত করে তার সঙ্গে পাশাপাশি বিরাজ করে। ১৮৪২-এ নিউইয়র্ক শহরে উইলিয়াম জেম্‌সের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন সুইডেনবর্গীয় (Emanuel Swedenborg —এক সুইডিস ধর্ম-শিক্ষক—তাঁরই অনুসারী) এক অতিন্দ্রিয়বাদী। পিতার অতিন্দ্রীয়বাদ কিন্তু জেমসের ব্যঙ্গ-কৌতুকের কোন ক্ষতির কারণ ঘটায়নি। পুত্রের মধ্যে এ তিনের কোন অভাব ঘটেনি কোনদিন। আমেরিকায় এক বেসরকারী স্কুলে কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তাঁকে আর তাঁর ভাই হেনরিকে (যিনি বয়সে তাঁর থেকে এক বছরের ছোট ছিলেন) ফ্রান্সের বেসরকারী স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে তাঁরা শারকোট (Charcot) আর অন্যান্য মনোবিকার-বিশারদদের রচনার অনুরাগী হয়ে পড়েন—উভয় ভ্রাতা এবার আকৃষ্ট হলেন মনোবিদ্যার দিকে। এক পুরোন বুলির পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়—এবার একজন লিখতে লাগলেন মনো-বিদ্যার মতো করেই উপন্যাস আর অন্যজন উপন্যাসের মতো করেই মনোবিদ্যা। হেনরি তাঁর জীবনের অধিকাংশকাল বিদেশেই কাটিয়েছেন—অবশেষে হয়ে পড়েছিলেন তিনি বৃটিশ নাগরিক। অধিকতর দীর্ঘ সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একটানা পরিচয়ের ফলে তিনি চিন্তায় যে পরিপক্কতা আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর ভাইয়ের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু উইলিয়ম যখন ফিরে এসে আমেরিকায় বসবাস করতে শুরু করলেন, তিনি তখন অন্তরে তরুণ আর সুযোগ-সুবিধা আর আশা-আকাঙ্ক্ষায় সমৃদ্ধ এমন এক জাতির উদ্দীপনায় হলেন উদ্দীপিত—আর যুগ আর দেশের প্রাণশক্তিকে তিনি এভাবে আত্মস্থ করে নিতে সক্ষম হলেন যে অচিরে তিনি জনপ্রিয়তার এমন তুঙ্গ-শৃঙ্গে পেঁৗছে গেলেন যার কোন তুলনাই হয় না—ইতিপূর্বে অন্য কোন আমেরিকাবাসী দার্শনিকের ভাগ্যে জোটেনি এমন জনপ্রিয়তা।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে হার্ভার্ড থেকে তিনি এম.ডি. ডিগ্রী নেন আর ১৮৭২ থেকে ১৯১০ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐখানেই তিনি অধ্যাপনা করে কাটিয়েছেন। প্রথমে পড়িয়েছেন শারীরবিদ্যা আর শারীরবৃত্তি, পরে মনোবিদ্যা, সর্বশেষে দর্শন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'The Principles of Psychology-ই (১৮৯০) তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা—শারীরবিদ্যা, দর্শন আর বিশ্লেষণের এক চমৎকার আর আকর্ষণীয় সংমিশ্রণ এটি, কারণ তখনো জেমসের কাছে মনোবিদ্যা ছিল জননী—পরা-বিদ্যার গর্ভকোষ থেকে চুঁইয়ে-পড়া জল-বিন্দু। তা সত্ত্বেও এটা হয়েছে বিষয়-বস্তুর সব চেয়ে শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষণীয় সংক্ষিপ্তসার। হেনরি তাঁর রচনার কোন কোন পদে যে সূক্ষ্মতা ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাতে উইলিয়াম জেমস্‌কে এমন এক তীব্র অন্তর্দর্শনে সহায়তা করেছে ডেভিড হিউমের অত্যাশ্চর্য স্বচ্ছতার পর যা আর দেখা যায়নি কখনো।

এমন সুস্পষ্ট দীপ্তিময় বিশ্লেষণ-প্রবণতা যে জেমস্‌কে একদিন মনোবিদ্যা থেকে দর্শনে--অবশেষে পরাবিদ্যায় নিয়েই ছাড়বে, তা এক রকম অবধারিত। তাঁর মতে (যদিও তা তাঁর নিজের সুস্পষ্ট প্রবণতা-বিরোধী) পরাবিদ্যা হচ্ছে কোন বিষয়ে স্বচ্ছ চিন্তারই শুধু এক প্রচেষ্টা আর তাঁর স্বাভাবিক সরল-স্বচ্ছতার সঙ্গে দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি এভাবে—দর্শন হচ্ছে "যতদূর সম্ভব ব্যাপক আর পূর্ণাঙ্গতার সঙ্গে কোন বিষয়ে চিন্তা করা।" তাই ১৯০০-এর পর তাঁর সব রচনাই ছিল দর্শন-বিষয়ক। তিনি তাঁর প্রকাশনা শুরু করেন: 'The Will to Believe' (১৮৯৭) দিয়ে; তার পর 'Varieties of Religious Experience'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে এক মূল্যবান গ্রন্থের পর Pragmatism (১৯০৭) তথা প্রয়োগবাদ সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত বইগুলি রচনায় হন অগ্রসর। ১৯০৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'A Plurastic Universe' আর 'The Meaning of Truth' তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে ১৯১১-য় প্রকাশিত হয় তাঁর 'Some Problems of Philosophy' আর ১৯১২-য় প্রকাশিত হয় 'Essays in Radical Empiricism' নামে এক মূল্যবান খণ্ড। এ শেষ গ্রন্থ দিয়েই আমরা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবো কারণ এ প্রবন্ধগুলিতেই জেমস্ তাঁর দর্শনের ভিৎ রচনা করেছেন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে।

খ. প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

তাঁর চিন্তার গতি হচ্ছে বস্তুর দিকে, মনোবিদ্যা দিয়ে আরম্ভ করলেও পরা-বিজ্ঞানীদের মতো হাওয়াই দুর্বোধ্যতার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। চিন্তা বস্তু থেকে যতই বিশিষ্ট হোক না, প্রকৃত বাস্তববাদীর মতো তিনি চিন্তাকে বাহ্যিক আর ঐহিক বাস্তবতার এক দর্পণ বলেই মনে করতেন। অন্যদের এ সম্বন্ধে যে ধারণা তার চেয়ে এ শ্রেষ্ঠতর দর্শন। হিউমের মতো এ শুধু পৃথক পৃথক বস্তু হিসেবে ধারণা ও উপলব্ধি নয় এ উপলব্ধি বস্তুর সম্পর্ক সম্বন্ধেও সবকিছু দেখে শুনে প্রাসঙ্গিকভাবে বস্তুর আকার, স্পর্শ আর গন্ধের মতো প্রসঙ্গ ও ত্বরিৎ উপলব্ধির হয়ে থাকে সহায়ক। কাণ্টের "জ্ঞানের সমস্যা" এ কারণেই অর্থহীন (আমাদের চেতনায় আমরা কি করে অর্থ আর শৃঙ্খলা আরোপ করবো ?)—অর্থ আর শৃঙ্খলা, অন্ততঃ তার নকশা ওখানে আছেই। ইংরেজ চিন্তাবিদদের পুরোনো পরমাণুবাদী মনোবিদ্যার যে ধারণা, চিন্তা হচ্ছে পৃথক পৃথক ভাবেরই এক শ্রেণী-পরম্পরা যা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নেহাৎ যান্ত্রিকভাবে, তা হচ্ছে পদার্থ আর রসায়নের এক বিভ্রান্তিকর নকল। চিন্তা কখনো শ্রেণী-পরম্পরা নয়—ঐ হচ্ছে এক স্রোত, উপলব্ধি বা অনুভূতির এক ধারাবাহিকতা, যাতে রক্তের কণিকার মতো ভাবরাশি ক্ষুদ্র পিণ্ডাকারে চলিষ্ণু। আমাদের আছে "মানসিক অবস্থা" (যদিও এও এক বিভ্রান্তিকর অবস্থানিক কথা) 'যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ভাষার উপসর্গ, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ আর সংযোজক অব্যয়ের এবং যে 'মানসিক অবস্থায় রয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কথার বিশেষ্য ও সর্বনামের প্রতিফলন। আমাদের যেমন রয়েছে 'পক্ষে' 'প্রতি' 'বিরুদ্ধে', 'কারণ', 'পেছনে' আর 'পরে' ইত্যাদির অনুভূতি তেমনি রয়েছে মানুষ আর বস্তুরও অনুভূতি। চিন্তার স্রোতে এসব "অস্থায়ী" উপাদানই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের মানসিক জীবনের সূত্র আর আমাদের দিয়ে থাকে বস্তুর ধারাবাহিকতার কিছুটা ধারণা।

চেতনা কোন অস্তিত্ব নয়, নয় কোন বস্তুও—এ এক প্রবাহ, সম্পর্কের এক পদ্ধতিমাত্র। ঐ একটি কেন্দ্র-বিন্দু যেখানে চিন্তার সম্পর্ক আর পর্যায়ক্রম, ঘটনার পর্যায়ক্রম আর বস্তুর সম্পর্কের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হয় যা হয়ে ওঠে দীপ্তিময়। এ রকম মুহূর্তেই সাক্ষাৎ বাস্তবতা, তখন তা স্রেফ একটা চিন্তায় হঠাৎ-উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা "দৃশ্য" আর থাকে না—কারণ দৃশ্য আর "আবির্ভাবে"র বাইরে আর কিছুই নেই। অভিজ্ঞতা-পদ্ধতি ডিঙিয়ে আত্মায় পৌঁছারও নেই কোন প্রয়োজন, আত্মা তো স্রেফ আমাদের মানসিক জীবনেরই এক যোগফল যেমন সব দৃশ্যের শুধু যোগফলই হচ্ছে 'চরম বাস্তবতা বা বস্তু-সার' আর বিশ্বের সব সম্পর্কের জাল-বুননিরই নাম 'পরম সত্তা' বা Absolute।

উপস্থিত আর যা প্রকৃত ও বাস্তব তার এই একই রকম তাড়নাই জেমস্‌কে নিয়ে গেছে প্রয়োগবাদে। ফরাসী স্বচ্ছতার পাঠশালায় শিক্ষিত জেমস্ জার্মান পরাবিজ্ঞানের দুর্বোধ্য আর পণ্ডিতী পরিভাষাকে করতেন অত্যন্ত ঘৃণা। যখন হ্যারিস (Harris) আর অন্যান্যরা মুমূর্ষু হেগেলীয়-বাদকে আমেরিকায় আমদানি করতে চেয়েছিল তখন জেমস্ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত পরদেশী দেখলে কোয়ারেণ্টাইন অফিসার যেভাবে রুখে দাঁড়ায়, তেমনি রূপে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস জার্মান পরাবিদ্যার সমস্যা আর শর্ত দুই-ই অবাস্তব। তাঁর চারদিকে এমন কিছু অর্থ খুঁজতে লাগলেন যার ফলে এসব বিমূর্ত ভাব যে নেহাৎ অর্থহীন তা প্রত্যেকটি সরল-মনা ব্যক্তিই দেখতে পান।

যে অস্ত্রের সন্ধানে তিনি ছিলেন ব্যাপৃত তা খুঁজে পেলেন ১৮৭৮-এ। 'Popular Science Monthly'-তে প্রকাশিত 'How to Make Our Ideas Clear' সম্পর্কে চার্লস্ পিয়ার্সের (Charles Peirce) লেখা একটি প্রবন্ধের উপর হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো। উক্ত প্রবন্ধে পিয়ার্স বলেছেন: ভাব বিশেষের অর্থ জানতে হলে, বাস্তব কর্ম-ক্ষেত্রে তার কি পরিণতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে তাই আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তা না হলে ঐ নিয়ে বাদানুবাদের কোন অন্ত থাকবে না আর তা হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। জেমস্ সানন্দে এ পথই গ্রহণ করলেন—এ পদ্ধতিতেই তিনি বিচার করে দেখতে লাগলেন পুরোনো পরা-চিন্তার সমস্যা আর তার ভাবগুলোকে। কিন্তু তাঁর বিচারের ছোঁওয়া লাগতে না লাগতেই তা ভেঙে হয়ে গেলো টুকরো টুকরো যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহের স্পর্শে রাসায়নিক মিশ্রণ মুহূর্তে হয়ে যায় বিদীর্ণ। যে সব সমস্যার অর্থ ছিল তা এমন এক স্বচ্ছতা আর বাস্তবতার রূপ নিলো যে যেন প্লেটোর বিখ্যাত মূর্তিতে তা গুহার ছায়া ছেড়ে মধ্যাহ্নের সূর্যালোকিত দীপ্তির মধ্যেই এসে পড়লো।

এ সরল আর পুরোনো-ধরনের পরীক্ষার ফলে জেমস্ খুঁজে পেলেন সত্যের এক নতুন সংজ্ঞা। শুভ আর সৌন্দর্য সম্বন্ধে যেমন এক সময় মনে করা হতো তেমনি সত্যকেও মনে করা হতো বিষয়গত বলেই। এ সবের মতো এখন যদি সত্যকেও মানব-বিচার আর মানব-প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবা হয় তা হলে কেমন হয়? "প্রাকৃতিক বিধানকে" "বিষয়গত" সত্য, চিরন্তন আর অপরিবর্তনীয় বলেই গ্রহণ করা হয়েছে—স্পিনোজা এসবকেই করেছেন তাঁর দর্শনের মূল-ভিত্তি। কিন্তু এসব সত্যও তো অভিজ্ঞতা, সুবিধা আর ব্যবহারিক সাফল্যের সূত্র-গঠন ছাড়া আর কিছুই না। এসব কোন বস্তু বা বিষয়ের নকল নয় বরং সুনির্দিষ্ট পরিণতিরই সঠিক হিসাব। ভাবের 'নগদ মূল্য' হলো সত্য।

'আমাদের চিন্তার পথে সত্য হচ্ছে একমাত্র যুক্তিযুক্ত যেমন আমাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা সঠিক (the right) তাই যুক্তিযুক্ত। যুক্তিযুক্ত যে কোন ধরনের হতে পারে, অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর পুরোপুরি তা যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই। চোখের সামনের সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্তিযুক্ত-ভাবে মোকাবেলা করা হলে, ভবিষ্যতেও যে ঐ রকম সাফল্যের সাথে আরো অভিজ্ঞতার মোকাবেলা করা যাবে তা বলা যায় না।....সত্য হচ্ছে ভালোর এক 'প্রজাতি' বিশেষ, সাধারণতঃ তাকে যে ভালো থেকে পৃথক শ্রেণী বলে ভাবা হয় তা সত্য নয়—ভালোর সঙ্গেই তা সমন্বিত। বিশ্বাসের পথে যাই শুভ প্রমাণিত হয় তারই নাম সত্য।'

" সত্য এক কর্মানুক্রম, 'ভাব বিশেষে নেয় রূপ"--সত্য মানে যাচাই। কোথা থেকে ভাবের উদ্ভব হয়েছে অথবা তার প্রতিপাদ্য বা প্রস্তাব কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব প্রশ্নের পরিবর্তে প্রয়োগবাদ তার ফলাফলই শুধু পরীক্ষা করে দেখে, এ শুধু "জোরটাকে স্থানান্তরিত করে সামনের দিকে তাকাতে চায়", এ হচ্ছে "যাকে প্রাথমিক জিনিস বলা হয় যেমন নীতি, 'শ্রেণীভাগ', অনুষ্ঠিত প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে সরিয়ে দৃষ্টিটাকে শেষ জিনিসের দিকে, ফলাফল, পরিণতি আর বাস্তব ঘটনার দিকে ফেরানোরই একটা মনোভাব।" মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যের জিজ্ঞাসা : বস্তুটা কি—নিজেকে হারিয়ে বসেছে 'বাক-চাতুর্যের' মধ্যে। ডারউইনবাদের জিজ্ঞাসা : এর মূল কি ? নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে নীহারিকাপুঞ্জে। প্রয়োগবাদের জিজ্ঞাসা : এর পরিণতি কি ?—চিন্তার মুখটাকে এ এবার ফিরিয়ে দিয়েছে কর্ম আর ভবিষ্যতের দিকে।

গ. বহুত্ববাদ (Phuralism)

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর প্রকৃতি—দর্শনের এ প্রাচীনতম সমস্যা সম্বন্ধে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। মধ্যযুগীয় পাণ্ডিতি দর্শন ঐশী-শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : "তা এক স্বয়ম্ভূ অস্তিত্ব, সব জন্যের উর্ধ্বে আর অতীত এক সার্বিকতা, এক আর অত্যাবশ্যক, অসীম আর পূর্ণ, সরল আর অপরিবর্তনশীল, অপরিমিত, চিরন্তন আর বুদ্ধিদীপ্ত"। এমন চমৎকার সংজ্ঞায় কোন দেবতা গর্ববোধ করবেন না ? কিন্তু এসবের অর্থ কি ? এতে মানবজাতির জীবনে কি পরিণতি বা তাৎপর্য নিয়ে আসে। ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ আর সর্বশক্তিমান হন তা হলে আমাদের শুধু বলতে হয় পুতুল—সূচনায় তিনি যে ভাগ্য আমাদের জন্য বরাদ্দ করে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার রদবদলের জন্য আমাদের আর কিছুই করার থাকে না। এ রকম সংজ্ঞার লজিকেল বা যুক্তিসঙ্গত অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে অদৃষ্টবাদ আর ক্যালভিনবাদ অর্থাৎ সব কিছু পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট এ মতবাদ। এ পরীক্ষা যান্ত্রিক পূর্ব-নির্ধারিতবাদে প্রয়োগ করলেও একই ফল হবে। আমরা যদি সত্য সত্যই পূর্ব-নির্ধারণবাদে বিশ্বাস করি তা হলে আমরা হয়ে পড়বো হিন্দু অতিন্দ্রীয়বাদী আর তখন আমাদের নিজেদের ছেড়ে দিতে হবে বিরাট এক নিয়তিবাদে যে নিয়তি তখন আমাদের নিয়ে খেলবে পুতুল-খেলা। এ রকম গুরু-গম্ভীর দর্শনে অবশ্য আমাদের আস্থা নেই। এসবে একটা যুক্তিসঙ্গত সরলতা আর পরিমিতি আছে বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানব-বুদ্ধি বার বারই এ দর্শনের প্রস্তাব নিয়ে আসে কিন্তু জীবন তাকে প্রত্যাখ্যান করে প্লাবিত হয়ে বয়ে চলে।

'দর্শন বিশেষ অন্য দিক দিয়ে নির্দোষ হতে পারে কিন্তু এ দু'টার একটা ত্রুটি থাকলেও তা কিছুতেই বিশ্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রথমতঃ তার মূলনীতি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আশা আর প্রিয়তম বাসনা-কামনার পরিপন্থী না হওয়া চাই।....কিন্তু দ্বিতীয়তঃ আর দর্শনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি আমাদের সক্রিয় সহজাত-প্রকৃতির বিরুদ্ধতা থেকেও মানুষের সামনে সংগ্রামের কোন লক্ষ্যবস্তু স্থাপন না করা। যে দর্শনের নীতি আমাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শক্তির অনুপযুক্ত তা অস্বীকার করে বসে বিশ্ব ব্যাপারের সঙ্গে মানব হৃদয়ের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য, এ যেন এক আঘাতে হৃদয়ের সব উদ্দেশ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এ রকম দর্শন দুঃখবাদের চেয়েও অধিকতর একঘরে হয়ে পড়বে।....এ কারণে জড়বাদ কখনো বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত হবে না।'

মানুষ নিজের প্রয়োজন আর মন-মেজাজ মতই দর্শন বিশেষকে গ্রহণ বা বর্জন করে থাকে—"বিষয়গত সত্যের" বিচার করে তা করে না। তারা জিজ্ঞাসা করে না: এ কি যুক্তিসঙ্গত বা লজিকেল? বরং তারা জিজ্ঞাসা করে: আমাদের জীবন আর স্বার্থের সঙ্গে এ দর্শনের বাস্তব সম্পর্ক কি? স্বপক্ষে বিপক্ষে যুক্তি বিষয়টিকে খোলাসা করতে পারে কিন্তু তা কখনো কিছু প্রমাণিত করে না। হুইটম্যানের ভাষায়:

'লজিক আর ধর্মোপদেশ কখনো দেয় না প্রত্যয়।
রাত্রের আর্দ্রতা আমার অন্তরের অভ্যন্তরে করে প্রবেশ....
এবার আমি দর্শন আর ধর্মকে নতুন করে পরীক্ষা করে দেখি।
বক্তৃতা-কক্ষে হয়তো তারা করে অনেক কিছুই প্রমাণিত,
কিন্তু কিছুই প্রমাণিত করে না দূর প্রসারিত মেঘের নীচে,
বিচিত্র স্থল-দৃশ্য আর প্রবহমান নদীর ধারে।'

জানি আমাদের প্রয়োজনই যুক্তি জোগায় কিন্তু আমাদের প্রয়োজন যুক্তির মোটেও ধার ধারে না।

'দর্শনের ইতিহাস অনেকখানি মানব-স্বভাব তথা মন-মেজাজের বিশেষ এক সংঘর্ষেরই ইতিহাস....পেশাদার দার্শনিকের যে রকম মন-মেজাজই হোক না কেন, দর্শন-ব্যাখ্যার বেলায় তিনি তা চেপে রাখতে চেষ্টা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন-মেজাজকে সাধারণতঃ কেউ যুক্তি হিসেবে গ্রাহ্য করে না তাই দার্শনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নৈর্ব্যক্তিকতার দাবী জানান। তবুও তাঁর অধিকতর বিষয়গত প্রতিপাদ্য থেকেও তাঁর মন-মেজাজের প্রবণতাই জুগিয়ে থাকে প্রবলতর পক্ষপাত।'

এ সব মন-মেজাজকে—যা দর্শনকে নির্বাচন আর নিয়ন্ত্রণ করে—কোমল-মনা আর কঠিন মনা এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কোমল-মনারা হয়ে থাকে ধর্ম-প্রিয়, তারা চায় সুনির্দিষ্ট আর অপরিবর্তিত ধর্ম-বিশ্বাস, পেতে চায় সত্যের এক বিশেষ পরিণতি। স্বভাবতই তা নিয়ে যায় স্বকীয় ইচ্ছা, আদর্শবাদ, অদ্বৈতবাদ আর আশাবাদের দিকে। কঠিন-মনারা হয়ে থাকে জড়বাদী, অধার্মিক, প্রয়োগবাদী, সংবেদনবাদী (সংবেদনাকে যাঁরা সব জ্ঞানের মূল মনে করেন), অদৃষ্টবাদী, বহুবাদী, নৈরাশ্যবাদী আর সংশয়ী। অবশ্য দু' দলেই স্ববিরোধিতার ফাঁক যথেষ্ট আর এমন মন-মেজাজের মানুষও আছে যারা কিছুটা মতবাদ এ দল থেকে আর কিছুটা মতবাদ ঐ দল থেকেও নিয়ে থাকেন। এমন লোকও আছেন (উদাহরণতঃ উইলিয়াম জেমসের কথা বলা যায়) যাঁরা বস্তুনিষ্ঠা আর ইন্দ্রিয়-নির্ভরতায় কঠিন-মনা কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজন আর নিয়তিবাদের আতঙ্কের বেলায় তাঁরা 'কোমল-মনা'। এমন কোন দর্শন কি হতে পারে যা এ পরস্পরবিরোধী দাবীর সমন্বয় সাধনে সক্ষম?

জেমসের ধারণা বহুত্ববাদী ঈশ্বর-বিশ্বাসই আমাদেরে এ সমন্বয় দিতে সক্ষম। মেঘলোকে নিঃসঙ্গ বসে থাকা বজ্রধারী অলিম্পিয়ান ঈশ্বরের বদলে তিনি আমাদের উপহার দিচ্ছেন এক সসীম ঈশ্বর—যে ঈশ্বর "এ বিরাট বিশ্বের সব ভাগ্য গঠনকারীদের মধ্যে এক সহায়ক। সমকক্ষদের মধ্যে আর একসমকক্ষ"। বিশ্ব-সৃষ্টি সমাপ্ত আর সামঞ্জস্য-জনক পদ্ধতি নয়—বিপরীত ধারা আর সংঘর্ষমূলক স্বার্থের এ এক যুদ্ধক্ষেত্র, দেখাই যায় এ এক পঙক্তি নয় বরং বহুপঙক্তিরই কাব্য। যে বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যে আমরা বাস ও চলাফেরা করছি তা এক সঙ্গতিশীল ইচ্ছা-শক্তিরই ফলাফল তা বলার কোন মানে হয় না—তার নিজের মধ্যেই পরস্পর বিরোধিতা আর ভাগাভাগির যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। হয়তো প্রাচীনরা আমাদের চেয়ে বিজ্ঞতর ছিলেন—বিশ্বের এ বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের মধ্যে একেশ্বরবাদের চেয়ে বহুদেব বাদই হয়তো অধিকতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য। এ রকম বহুদেববাদ "চিরকালই সাধারণ মানুষের সত্যকার ধর্ম এবং আজো তাই।" জনসাধারণ ঠিক, দার্শনিকরাই আছেন ভুল পথে। দার্শনিকদের এক স্বভাব-ব্যাধি হলো অদ্বৈতবাদ—তাঁরা মনে করেন বটে তাঁরা সত্য-সন্ধানী, সত্যের জন্য তাঁরা ক্ষুধিত, তৃষিত, আসলে তা নয় তাঁরা চান ঐক্য, তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ঐক্যের জন্য। "বিশ্ব এক"—এও এক রকম সংখ্যা-পূজা হয়ে যেতে পারে। "তিন" আর "সাত" সত্য সত্যই পবিত্র সংখ্যা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু বিমূর্তভাবে গ্রহণ করলে 'এক'-কে কেন 'তেতাল্লিশ' বা 'দু'লক্ষ দশ' থেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করা হবে?

এক পঙক্তি থেকে বহু পঙক্তি কাব্য তথা বিশ্বের সুবিধা এ যে—যেখানে উলটো-পালটা স্রোত আর সংঘর্ষরত শক্তিসমূহ সক্রিয় সেখানে আমাদের নিজের শক্তি আর ইচ্ছা হয়তো কাজে আসতে পারে আর সমস্যার সমাধানে হয়তো করতে পারে সহায়তা। এ বিশ্বে কিছুরই অপরিবর্তনীয় ভাবে মীমাংসা হয়ে যায়নি, আর সব কাজেরই রয়েছে মূল্য। অদ্বৈতবাদী জগত আমাদের জন্য মৃত—এ রকম জগতে কোন সর্বশক্তির আধার দেবতা বা আদিম ব্যোম নীহারিকা আমাদের যে ভূমিকা বরাদ্দ করে দিয়েছে তাই আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অভিনয় করে যাই—শত অশ্রু বর্ষণেও বিধি-লিপির এক শব্দও আমরা টলাতে পারি না। সুসম্পন্ন বিশ্বে ব্যক্তিত্ব এক মায়া মরীচিকা—অদ্বৈতবাদী আমাদের এ বলে আশ্বাস দেন যে "বাস্তবে" আমরা সকলে এক কারুকার্যময় বস্তুর এক একটি খণ্ড মাত্র। কিন্তু অসম্পূর্ণ বিশ্বে যে ভূমিকা আমরা অভিনয় করবো তার কিছু পঙক্তি অন্ততঃ আমরা লিখতে পারবো আর যে ভবিষ্যতে আমাদের বাস করতে হবে আমরা সেভাবে, আমাদের পছন্দ মতো তাকেও তুলতে পারবো গড়ে। এরকম বিশ্বেই আমরা হতে পারি স্বাধীন—ঐ হবে ভাগ্যের নয় সুযোগেরই পৃথিবী। সব কিছু "শান্ত নয়"—আমরা যা হই আর যা করি তাতে সব কিছু বদলে যেতে পারে। প্যাসকেল (Pascal) বলেছেন ক্লিয়োপেট্রার নাক যদি এক ইঞ্চি লম্বা বা খাটো হতো তা হলে গোটা ইতিহাসটাই বদলে যেতো।

এরকম স্বাধীন ইচ্ছা বা এরকম বহু পঙক্তিক বিশ্ব বা এরকম সসীম ঈশ্বরের সপক্ষে তত্ত্বীয় প্রমাণের অভাব যেমন, তেমনি অভাব বিরুদ্ধ দর্শনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলায়ও। এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যবহারিক প্রমাণেও তারতম্য ঘটতে পারে—এ অসম্ভব নয় যে কেউ কেউ হয়তো যথেচ্ছ স্বাধীন দর্শনের চেয়ে নিয়তিবাদী দর্শনের সাহায্যেই জীবনে অধিকতর সুফল লাভ করতে সক্ষম। কিন্তু যেখানে প্রমাণ অনির্দিষ্ট সেখানে আমাদের নৈতিক আর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বার্থেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত।

'যদি এমন কোন জীবন থাকে যা সত্যই শ্রেষ্ঠতর আর যদি এমন কোন মতবাদ থাকে যা বিশ্বাস করলে তেমন জীবনযাপনের কাজ হবে সহায়ক, তা হলে তেমন মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের জন্য ভালোই তো, অবশ্য যদি এ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটনাক্রমে আরো উচ্চতর ও প্রাণিক লাভ বা স্বার্থের সংঘর্ষ না ঘটে।'

ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রতি যে অধ্যবসায়ী নিষ্ঠা তাই তো তার বিশ্বজনীন গুরুত্ব আর নৈতিক মূল্যের এক শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। অশেষ বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাস দেখে জেমস্ মুগ্ধ আর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শিল্পীসুলভ সহানুভূতির সঙ্গেই তিনি এগুলোর, এমন কি যেগুলির সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতভেদ রয়েছে, তারও মূল্য দিয়েছেন। প্রত্যেক ধর্মেই তিনি কিছু না কিছু সত্য দেখেছেন—আর মুক্ত মনে প্রত্যেক নব আশার প্রতি তাকাবার জানিয়েছেন দাবী। 'Society for Physical Research' বা মানসিক গবেষণা সমিতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি—এসব এবং এ ধরনের অন্য ব্যাপারগুলিও কেন অধ্যবসায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় হবে না? অবশেষে জেমস্ অন্য একটি জগতের—একটি আধ্যাত্মিক জগতের—বাস্তবায়ন সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। 'আমাদের মানব অভিজ্ঞতাই যে বিশ্বে উচ্চতম চলতি অভিজ্ঞতা এ বিশ্বাস আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছি। বরং আমি বিশ্বাস করি আমাদের পোষা কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে আমাদের সমগ্র মানব-জীবনের যে সম্পর্ক সারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদেরও সে একই রকম সম্পর্ক। আমাদের পোষা জীবগুলি আমাদের লাইব্রেরী আর বৈঠকখানায় বিচরণ করে। তারা এমন সব ঘটনা বা দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করে যার সম্বন্ধে তাদের অণুমাত্রও ধারণা নেই। ইতিহাসের বাঁকে তারা শুধু স্পর্শক মাত্র—তার সূচনা আর শেষ এবং তার রূপ সম্পূর্ণই তাদের পরিধির বাইরে। তেমনি বস্তুর বিস্তৃততর জীবনে আমরা হচ্ছি স্পর্শক।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি কিন্তু দর্শনকে কখনো মৃত্যু-ধ্যান মনে করতেন না—কোন সমস্যাই তাঁর কাছে মূল্যবান বিবেচিত হত না যদি না তা আমাদের পার্থিব জীবনকে পরিচালিত আর উদ্দীপিত করতে সক্ষম। "তিনি আমাদের স্বভাবের দৈর্ঘ্য নিয়ে নয় বরং তার গুণপনা নিয়েই নিজেকে মসগুল রাখতেন।" নিজের অধ্যয়ন-কক্ষের চেয়ে তিনি জীবনের প্রবাহের সঙ্গে মিশেই সময় কাটাতেন বেশী—মানবকল্যাণের জন্য তিনি শত রকম কর্মে থাকতেন ব্যস্ত, সব সময় কাকেও না কাকেও তিনি সাহায্য করতেন, তাঁর সাহস সংক্রমিত করে দিয়ে মানুষকে উৰ্ধ্বারোহী করে তুলতেন। তাঁর বিশ্বাস প্রতি মানুষেই রয়েছে এমন "সঞ্চিত শক্তি" যা সময় সময় অবস্থার ধাত্রীপনায় বিকশিত করে তোলা যায় আর ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি অহরহ তিনি এসব সম্পদকে পুরোপুরি ব্যবহারের দোহাই দিয়ে দিতেন উপদেশ। যুদ্ধে মানবশক্তির অপচয় দেখে তিনি মর্মাহত হতেন আর আবেদন জানাতেন যুদ্ধে আর কর্তৃত্বের এ যে মহা-আবেগ-উদ্দীপনা এসবকে "প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে" প্রয়োগের জন্য। তাঁর জিজ্ঞাসা ধনী গরীব নির্বিশেষে সবাই নিজের জীবনের দুই বছর কেন রাষ্ট্রকে দান করবে না—অন্যকে মারার জন্য নয় বরং প্লেগকে জয় করার জন্য, জলাভূমির জল নিকাশন, মরুভূমিতে জল-সেচন, খাল কাটা আর যুদ্ধের দ্রুত ধ্বংসের ফলে যে সবের নির্মাণ শ্লথগতি আর বেদনাকর হয়ে পড়েছে তার নির্মাণে গণতান্ত্রিকভাবে দৈহিক আর সামাজিক কারিগরি সরবরাহ করার জন্য?

সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল কিন্তু ব্যক্তি আর প্রতিভার প্রতি তার যে অনীহা তা তিনি পছন্দ করতেন না। টেইনের (Taine) সূত্র—যা সব রকম সাংস্কৃতিক প্রকাশকে "গোষ্ঠী, পরিবেশ আর কালে" সীমিত করে দিয়েছে তাতে ব্যক্তির স্থান নেই বলে তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। একমাত্র ব্যক্তিরই যা কিছু মূল্য, অন্য সবকিছু উপায়মাত্র, এমনকি দর্শনও। কাজেই আমাদের একদিকে এমন এক রাষ্ট্রের প্রয়োজন যে রাষ্ট্র বুঝাতে পারবে সে হচ্ছে ব্যক্তিগত নরনারীর স্বার্থের রক্ষক আর সেবক অন্যদিকে চাই এমন এক দর্শন আর বিশ্বাস যা "বিশ্বকে একটা পদ্ধতি হিসেবে না দিয়ে দেবে এক দুঃসাহসিক অভিযান হিসেবে" আর বিশ্বকে এমনভাবে তুলে ধরবে যাতে বহু পরাজয় আছে সত্য কিন্তু এমন বিজয়ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে যা জয় করে নেওয়ার প্রতীক্ষায়। তা হলেই মানুষের সর্বশক্তির ঘটবে উদ্বোধন।

'এ উপকূলে সমাধিস্থ ভগ্ন-জাহাজের এক নাবিক—
আদেশ দিচ্ছে তোমাকে পাল ওড়াও ভাসাও তরী।
আমরা হারিয়ে যাওয়ার পরও বহু যাত্রীভরা দুঃসাহসী পোত
প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের প্রতিকূলে গেছে এগিয়ে।'

(গ্রীক কাব্য সংকলন)

ঘ. মন্তব্য

এ দর্শনের নতুন আর পুরোনো উপাদান সম্বন্ধে পাঠককে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আধুনিককালে বিজ্ঞান আর ধর্মের যে সংগ্রাম চলছে এ তারই অংশমাত্র। কান্ট আর বার্গসঁর মতো বিশ্বজনীন যান্ত্রিক জড়বাদ থেকে ধর্ম-বিশ্বাসকে বাঁচাবার এ আর এক চেষ্টা। কান্টের "ব্যবহারিক যুক্তি", শোপেনহাওয়ারের ইচ্ছা-শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, আর ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন ধারণা—এ সবেই নিহিত প্রয়োগ-বাদের মূল-উৎস, আর নিহিত উপযোগবাদে (যার কাছে সব ভালোর একমাত্র মাপকাঠি ব্যবহার উপযোগিতা), ইংরেজ দার্শনিকদের পরীক্ষা-লব্ধ আর আরোহী ঐতিহ্যে, সর্বশেষে আমেরিকার পরিবেশ আর প্রাকৃতিক দৃশ্যে।

অনেকে সত্যই দেখিয়েছেন যে, ভাবের মূলস্তরে না হলেও, ভঙ্গীতে জেমসের চিন্তা বিশেষভাবে আমেরিকান চিন্তার এক অদ্বিতীয় নিদর্শন। গতি আর সঞ্চয়ের প্রতি আমেরিকানসুলভ মোহ তাঁর চিন্তা আর রচনা-শৈলীর পালে লাগিয়েছে হাওয়া—দিয়েছে তাতে লঘুতা, এমনকি হাওয়াই গতিশীলতা। হুনেকারের (Huneker) মতে এ হচ্ছে "সংকীর্ণ-মনাদের দর্শন"—সত্যই এতে পাওয়া যায় এক দোকানদারী গন্ধ। জেমস ঈশ্বর সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলেন যেন ঈশ্বর এক পণ্যদ্রব্য, বিজ্ঞাপনের যত সব আশাবাদী কলা-কৌশল প্রয়োগ করে যাকে বিক্রয় করতে জড়বাদী ক্রেতাদের কাছে। আর এমনভাবে তিনি আমাদের বিশ্বাস করতে পরামর্শ দেন যেন দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগের সুপারিশই তিনি করছেন, যাতে কিছু হারাবার ভয় নেই বরং রয়েছে (অন্য) জগৎ জয়ের সম্ভাবনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যেন য়ুরোপীয় পরাবিদ্যা আর য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তরুণ আমেরিকার আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়া।

সত্যের এ নতুন পরীক্ষাও এক পুরোনো ব্যাপার। আমাদের এ সৎ দার্শনিকটিও তাঁর প্রয়োগবাদ সম্বন্ধে সবিনয়ে বলেছেন: "পুরোনো চিন্তা-ধারারই এ এক নতুন নাম।" নতুন পরীক্ষা মানে যদি হয় অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যা টিকে গেছে তাই সত্য—তা হলে তা মানতে আপত্তি নেই। যদি বলা হয় যে ব্যক্তিগত উপযোগিতাই সত্যের কষ্টি-পাথর তা হলে উত্তরে বলতে হবে: না তা নয়। ব্যক্তিগত উপযোগিতা স্রেফ ব্যক্তিগত উপযোগিতাই—কিন্তু বিশ্বজনীন স্থায়ী উপযোগিতাই হচ্ছে সত্যের উপাদান। কোন কোন প্রয়োগবাদী যখন একদা উপযোগী ছিল (এখন যা অপ্রমাণিত) বলে বিশ্বাস বিশেষকে সত্য বলে অভিহিত করেন তখন তাঁরা স্রেফ পণ্ডিতি আহাম্মকীরই পরিচয় দিয়ে থাকেন—ঐ এক উপযোগী ভুল, সত্য নয়। আমার উক্তি হিসেবেই শুধু প্রয়োগবাদকে নির্ভুল বলা যায়।

দর্শনকে যে মাকড়সার জাল ঘিরে ধরেছে জেমস্ চেয়েছিলেন সে জালটাকে সরিয়ে ফেলতে—আদর্শ আর তত্ত্বের প্রতি পুরোনো ইংরেজ মনোভাবকে তিনি চেয়েছিলেন নতুন আর কিছুটা অভিনবভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি শুধু বেকনের কাজটাই করে যাচ্ছিলেন অর্থাৎ দর্শনকে তিনি পুনরায় অপরিহার্য বস্তু জগতের দিকে ফেরাতে চেয়েছিলেন। সত্য সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব বা মতের চেয়েও তিনি বেশী স্মরণীয় হয়ে থাকতেন তাঁর এ প্রয়োগবাদী ঝোঁক আর এ নতুন বাস্তবতার জন্য। সম্ভবতঃ দার্শনিকের চেয়ে মনো-বিজ্ঞানী হিসেবেই তিনি হবেন অধিকতর সম্মানের অধিকারী। পুরোনো সমস্যার কোন সমাধানই তিনি দিতে পারেননি একথা তাঁর অজানা ছিল না—তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেছেন: আর একটি অনুমান ও আর একটি বিশ্বাসই মাত্র তিনি প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর ডেস্কের ওপর একটি কাগজ পড়েছিল, তাতে তিনি তাঁর শেষ কথা, সম্ভবতঃ সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এ কথা কয়টিই লিখে রেখেছিলেন: "কোথাও কোন শেষ সিদ্ধান্ত নেই। এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এ সিদ্ধান্তই আমরা শুধু নিতে পারি। জানাবার মতো কোন ভাগ্য-ফল নেই, নেই দেওয়ার মতো কোন উপদেশও। বিদায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. জন ডিউঈ (John Dewey)

ক. শিক্ষা

বস্তুতঃ প্রয়োগবাদ কখনো 'পুরোপুরি' আমেরিকার দর্শন নয়—নতুন ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রগুলির দক্ষিণ আর পশ্চিমে যে বৃহত্তর আমেরিকা পড়ে আছে এ দর্শন তার আত্মাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এ দর্শন বড়ড বেশী নীতি-বাদী—এতে ফুটে উঠেছে লেখকের সাধু সাত্ত্বিক পরিবারে জন্মেরই ইঙ্গিত। এ দর্শন একদিকে ব্যবহারিক ফলাফল আর মোটা বাস্তবতার কথা বলে অন্যদিকে আশায় উদ্দীপিত হয়ে মুহূর্তে দুনিয়া ছেড়ে এক লাফে চড়ে বসে স্বর্গে। পরাবিদ্যা আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এক সুস্থ প্রতিক্রিয়ায় এর শুরু দেখে এর থেকে প্রকৃতি আর সমাজ সম্বন্ধে একটা দর্শনের আবির্ভাব অনেকেই প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু এর সমাপ্তি ঘটেছে প্রতিটি প্রিয় বিশ্বাসের প্রতি এক মানসিক ইজ্জতের আবেদনে। পারলৌকিক জীবনের জটিল সব সমস্যাকে ধর্মের আর জ্ঞান-প্রকৃতির সূক্ষ্ম দুরূহতাকে মনো-বিদ্যার হাতে ছেড়ে দিয়ে দর্শনকে সর্বতোভাবে ব্রতী হতে হবে মানব-উদ্দেশ্যকে আলোকোজ্জ্বল আর মানব-জীবনে সমন্বয় সাধনে এবং তাকে উন্নত করে তোলার কাজে।

AMARBOI.COM

এ কর্তব্য সাধনের উপযোগী করে তাঁকে গড়ে তোলার জন্য আর সচেতন ও ওয়াকিফহাল আমেরিকার আত্মার অভিব্যক্তির যোগ্য দর্শন রচনার কাজে অবস্থার দিক থেকে সবরকম আনুকূল্য তিনি পেয়েছেন। তাঁর জন্ম এফেট্ বা "ক্লান্ত ঈস্টে" (ভার্মন্ট, বার্লিংটনে, ১৮৫৯এ), স্কুলের লেখাপড়াও করেছেন ওখানে, নতুন অভিযানে বের হওয়ার আগে পুরাতন সংস্কৃতিকে আত্মসাতের সুযোগ তিনি ওখানেই পেয়েছেন এভাবে। অচিরে গ্রীলির (Greeley) পরামর্শে তিনি চলে যান পশ্চিমে, দর্শনের শিক্ষকতা করেন মিন্নেসোটা (Minnesota—১৮৮৮-৯), মিসিগান (Michigan ১৮৮৯-৯৪), সিকাগো (Chicago—১৮৯৪—১৯০৪) ইত্যাদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। পরে ফিরে আসেন 'পূর্বদেশে', যোগ দেন কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে—কিছুকাল পরে হলেন বিভাগীয় অধ্যক্ষ। প্রথম বিশ বছরের জীবনে, ভার্মণ্ট পরিবেশ এমন এক স্থূল সরল-জীবনে তাঁকে অভ্যস্ত করে তুলেছিল যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের পরও সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে অব্যাহত ছিল। তারপর 'মধ্য পশ্চিমে' (Middle West) বিশ বছর কাটিয়ে যে বিশাল আমেরিকাকে তিনি দেখার সুযোগ পেলেন তার সম্বন্ধে পূর্বদেশীয়দের মনে কোন ধারণাই নেই। তিনি তার সীমা আর শক্তি দুই-ই দেখলেন—পরে যখন তাঁর নিজের দর্শন লিখতে শুরু করেন তখন তিনি তাঁর ছাত্র আর পাঠকদের সামনে, আমেরিকার 'প্রদেশগুলির' কৃত্রিম আর ভাসাভাসা কুসংস্কারের অন্তরালে যে সরল ও গভীর প্রকৃতিবাদ (Naturalism) রয়েছে তারই ব্যাখ্যা তুলে ধরলেন। তিনি লিখলেন দর্শন আর হুইটম্যান লিখলেন কাব্য—নতুন ইংরেজ রাষ্ট্রের (New English State) শুধু নয় বরং সমগ্র মহাদেশেরই।

শিকাগোর 'স্কুল অব এডুকেশনে' তিনি যে কাজ করেছেন তার ফলেই ডিউঈ সর্বপ্রথম বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। সেখানেই তিনি পরিচয় দেন তাঁর চিন্তার সুদৃঢ় পরীক্ষামূলক প্রবণতার—১৯৫২য় যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে তখনো শিক্ষার ক্ষেত্রে সব রকম নতুন আন্দোলনের প্রতি তাঁর মন ছিল উন্মুক্ত—"আগামী দিনের স্কুলের "প্রতি তাঁর আগ্রহ তখনো কিছুমাত্র হয়নি ম্লান। সম্ভবতঃ 'গণতন্ত্র আর শিক্ষাই' (Democracy and Education) তাঁর প্রধান রচনা, এখানে তিনি তাঁর দর্শনের বিচিত্র ধারাকে এক বিশেষ বিন্দুতে নিয়ে এসেছেন আর সে সবকে কেন্দ্রীভূত করেছেন দেশে এক উন্নতর বংশ গড়ে তোলার কাজে। প্রগতিশীল সব শিক্ষকই তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেছেন—আমেরিকায় বোধ করি এমন কোন স্কুল নেই যা তাঁর দ্বারা হয়নি প্রভাবিত। পৃথিবীর স্কুলগুলির পুনর্গঠনে সর্বত্র তিনি গ্রহণ করেছেন এক সক্রিয় অংশ, দু'বছর ধরে তিনি চীনদেশের শিক্ষকদের সামনে শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে দিয়েছেন বক্তৃতা আর তুরস্কের জাতীয় বিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠন সম্বন্ধে এক বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেছেন তুরস্ক সরকারের কাছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্পেন্সারের অধিকতর বিজ্ঞান আর কম সাহিত্য এ দাবীর সমর্থনে ডিউঈ যোগ করেছেন বিজ্ঞান যেন স্রেফ কেতাবী-শিক্ষা না হয় এ দাবী, প্রয়োজনীয় পেশার বাস্তবক্ষেত্র থেকেই যেন ছাত্ররা এ জ্ঞান আহরণের পায় সুযোগ। তথাকথিত 'উদার' শিক্ষার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, 'উদার' কথাটা মূলে "স্বাধীন মানুষ" তথা যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো হাতে কলমে কাজ করে না তাদের সংস্কৃতিকেই বুঝাতো। স্বভাবতই এ রকম শিক্ষা এক অবসরভোগী অভিজাত শ্রেণীরই উপযুক্ত ছিল—শৈল্পিক আর গণতান্ত্রিক জীবনে এমন শিক্ষা অচল। এখন আমরা প্রায় সবাই য়ুরোপ-আমেরিকার শিল্প-যোজনেরই অংশীদার হয়ে পড়েছি—অতএব আমাদের সব শিক্ষা এখন কেতাবী না হয়ে পেশাগত বা পেশার মারফৎ হওয়া উচিত। পণ্ডিতি সংস্কৃতি হঠাৎ-নবাবিরই উপযুক্ত—পেশাগত ভ্রাতৃত্ব মানুষকে করে তোলে গণতন্ত্রমুখী। শিল্পায়ত সমাজে স্কুল হওয়া চাই ক্ষুদ্রাকারের কারখানা আর ক্ষুদ্রায়তন সমাজ—অভ্যাস, পরীক্ষা আর ভুলের মারফৎ শিক্ষা দেওয়া উচিত, শিক্ষা দেওয়া উচিত অর্থনৈতিক আর সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য যে সব শিল্পকলা আর শাসন প্রয়োজন সে সব। সর্বোপরি চাই শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি—শিক্ষা প্রবীণতার প্রস্তুতি ক্ষেত্র নয় (এ থেকে সাবালক হলেই শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার এ অদ্ভুত মতের হয়েছিল উদয়)। শিক্ষা মানে মনের ক্রমোন্নয়ন আর জীবনের ক্রমবিকাশ ও দীপন। এক কথায় স্কুল শুধু আমাদের মানসিক বিকাশের হাতিয়ারই দিতে পারে—বাকিটা নির্ভর করে আমাদের অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ আর ব্যাখ্যা করার উপর। স্কুল ত্যাগের পরই শুরু হয় সত্যকার শিক্ষা—মৃত্যুর আগে তা বন্ধ হওয়ার কোন কারণও নেই।

AMARBOI.COM

খ. প্রয়োগ যান্ত্রিকতা (Instrumentalism)

ডিউঈর এক বড় বৈশিষ্ট্য বিবর্তন মতবাদকে বিনা দ্বিধায় খোলাখুলি-ভাবে সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া। তাঁর ধারণা বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিম্নতর স্তর থেকেই দেহ আর মন অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে। প্রতি ক্ষেত্রে ডারউইনবাদ দিয়েই তিনি করেছেন শুরু।

'দেকার্তের (Descartes) মতে "যে বস্তুকে মুহূর্তে স্বসম্পূর্ণ আর পূর্ণাঙ্গ হয়ে গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয় তার চেয়ে যা ধীরে ধীরে ক্রমে একটা অস্তিত্ব গ্রহণ করে তার স্বভাব উপলব্ধিই অধিকতর সহজ। আধুনিক বিশ্ব তাকে যে লজিক এখন থেকে শাসন করবে তার সম্বন্ধে খুবই সচেতন—ডারউইনের 'Origin of Species'ই হলো সাম্প্রতিককালের এক বৈজ্ঞানিক সাফল্য।....গেলিলিয়ো যেমন বলে-ছিলেন 'তবুও পৃথিবী ঘুরছে', তেমনি ডারউইন যখন প্রজাতির কথা বললেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনিও তখন জন্ম আর পরীক্ষামূলক চিন্তাকে চিরকালের জন্য জিজ্ঞাসা আর ব্যাখ্যার গবেষণা পদ্ধতির ছাড়পত্র দিয়েছিলেন।'

অলৌকিক কারণ দিয়ে এখন আর বস্তুর ব্যাখ্যা নয় বরং পরিবেশে তার স্থান আর কর্ম দিয়েই খুঁজতে হবে তার ব্যাখ্যা। ডিউঈ খোলা-খুলিভাবেই স্বভাব-বাদী--তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেছেন: "সাধারণভাবে বিশ্বকে আদর্শায়িত আর তার উপর নিজের যুক্তি আরোপ করা মানে যে সব বস্তুর সঙ্গে বিশেষভাবে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে তাকে আয়ত্ত করতে আমরা অক্ষম এ মেনে নেওয়া।" তিনি শোপেনহাওয়ারের ইচ্ছাশক্তি বা বার্গসঁর প্রাণশক্তি কোনটাকেই বিশ্বাস করতেন না—তাঁর মতে ওসব থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে তার পূজা করার কোন মানে হয় না। কারণ এসব বিশ্ব-শক্তি মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে আর যা কিছুকে শ্রদ্ধা করে সব সময় যে তার ধ্বংসের কারণ হয় তা নয়। ঐশী-শক্তি এসব নির্লিপ্ত নিসর্গ-শক্তিতে বিরাজ করে না—বিরাজ করে আমাদের অন্তরে। "বস্তুর দূরতম প্রান্ত থেকে বুদ্ধির ঘটেছে অবতরণ, অচল গতিশীলতা আর চরম মঙ্গল হিসেবেই যেখান থেকে তার কার্য পরিচালিত, যাতে মানুষের গতিশীল কর্ম-প্রবাহে সে নিতে পারে আসন।"

বিশ্বের প্রতিই আমাদের হতে হবে বিশ্বস্ত।

সৎ দৃষ্টবাদীর মতো আর বেকন, হবস্, স্পেন্সার আর মিলের বংশধর হিসেবে ডিউঈ পরাবিদ্যাকে শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি আর ছদ্মাবরণ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দর্শনের এক বিপদ তার সমস্যাকে সব সময় ধর্মের সমস্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা। "প্লেটো পড়ার পরই দর্শনের যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ভিত্তি আর লক্ষ্য রয়েছে তার কিছুটা ধারণা করতে আমি সক্ষম হলাম—স্বীকৃতি পাওয়া গেলো দর্শনের যা সমস্যা, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার সংগঠনের সমস্যাও তাই। কিন্তু অচিরে তা নিজেকে হারিয়ে ফেললো অন্য জগতের স্বপ্নে।" জার্মেন দর্শনে দেখা যায় ধর্মীয় সমস্যার স্বার্থে দার্শনিক বিকাশের ধারা বিপথগামী হয়ে পড়েছে কিন্তু ইংরেজ দর্শনে অলৌকিকতার উপর প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক স্বার্থ। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ধর্মীয় একনায়কত্ব আর সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের আদর্শবাদের সঙ্গে প্রগতিশীল গণতন্ত্রের উদার ধর্ম-মতের সংবেদবাদের সংগ্রাম ছিল অব্যাহত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি—কাজেই আমরা এখনো পুরোপুরি মধ্যযুগ পার হয়ে আসিনি, প্রতিক্ষেত্রে স্বভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেই শুধু আধুনিক যুগের সূচনা সম্ভব। এর অর্থ এ নয় যে মনকে জড় বস্তুতে পরিণত করতে হবে—বরং মন আর জীবনকে বুঝতে হবে ধর্মীয় দিক থেকে নয় জীব-বিদ্যার দিক থেকেই, বুঝতে হবে তা বিশেষ পরিবেশে ন্যস্ত একযন্ত্র বা জীব, তার উপর ঘটে ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, তা রূপায়িত হয় আর করে রূপায়িত। "সচেতনতার অবস্থা" অধ্যয়ন না করে আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত সাড়া দেওয়ার রকম-সকম। "মস্তিষ্ক পৃথিবীকে জানার যন্ত্র নয় বরং মুখ্যতঃ এক বিশেষ ধরনের ব্যবহারেরই যন্ত্র।" চিন্তা পুনঃ অভিযোজনেরই এক হাতিয়ার—দাঁত আর অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই তাও এক অঙ্গ। ভাব মানে কাল্পনিক সংযোগ সমন্বয়নের এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু এ কিছুমাত্র নিষ্ক্রিয় সমন্বয়ন নয়, নয় স্পেন্সারীয় অভিযোজন। "পরিবেশের সঙ্গে পরিপূর্ণ অভিযোজন মানে মৃত্যু। প্রত্যেক সাড়ার গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো পরিবেশের উপর কর্তৃত্বের বাসনা।" বাহ্যিক জগতকে আমরা কিভাবে জানতে পারবো তা দর্শনের সমস্যা নয় বরং কিভাবে তাকে আমাদের কর্তৃত্বে এনে নতুন করে গড়তে পারবো আর কোন লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাই জানা। চেতনা আর জ্ঞানের বিশ্লেষণের জন্য দর্শন নয় (ঐ সব মনোবিদ্যার কাজ) বরং জ্ঞান আর বাসনা-কামনার সমন্বয় আর সংশ্লেষণের জন্যই দর্শন।

চিন্তাকে বুঝতে হলে কোন বিশেষ অবস্থায় তার উৎপত্তি তা অবলোকন করতে হবে। আমরা বুঝতে পারি যুক্তির সূচনা প্রতিজ্ঞায় (**Premises**) নয় বরং কঠিনের মোকাবেলায়—পরে তার উপলব্ধি ঘটে প্রকল্প হিসেবে যা হয়ে দাঁড়ায় সিদ্ধান্ত, এর জন্য তার প্রতিজ্ঞা-সন্ধান, অবশেষে তা প্রকল্পকে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামনে করে হাজির। "চিন্তার প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তব ঘটনার, সন্ধান, ব্যাপক আর পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের আর পর্যবেক্ষণের সম্মুখীন হওয়া।" এখানে অতিন্দ্রীয়বাদের স্থান অতি সামান্যই।

আর চিন্তা সামাজিক ব্যাপার, শুধু যে বিশেষ অবস্থায় এর উৎপত্তি ঘটে তা নয় বরং উৎপত্তি ঘটে এক সাংস্কৃতিক সমাজেই। সমাজ যতখানি ব্যক্তির সৃষ্টি ততখানি সমাজের সৃষ্টি। আচার-বিচার, ব্যবহার, অভ্যাস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা আর ঐতিহ্যগত ভাবরাশির এক বিরাট জাল প্রতিটি নবজাতকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—যে মানুষের মাঝখানে তার জন্ম তার মতো করে তাকে গড়ে তোলার জন্য ওৎ পেতে থাকে। এ সামাজিক উত্তরাধিকার এতো দ্রুতগতিতে আর এতো ব্যাপকভাবে তার কাজ চালিয়ে যায় যে অনেকে তাকে দৈহিক বা জৈবিক উত্তরাধিকার বলেই ভুল করে বসে। এমনকি স্পেন্সার পর্যন্ত কান্টীয় শ্রেণী-ভাগ বা অভ্যাস আর চিন্তা প্রণালীকে ব্যক্তির সহজাত বলে বিশ্বাস করতেন কিন্তু খুব সম্ভব বয়স্কদের থেকে শিশুমনে যে সামাজিক অনুপ্রবেশ ঘটে এসব তারই ফসল। বস্তুতঃ সহজাত বৃত্তির ভূমিকা কিছুটা অতিরঞ্জিত করে আঁকা হয়েছে আর প্রাথমিক শিক্ষাটাকে আঁকা হয়েছে খাটো করে। সামাজিক শিক্ষার ফলে প্রবল সহজাত-প্রবৃত্তি, যেমন যৌনাকর্ষণ আর যুযুৎসা আজ অনেকখানি পরিবর্তিত আর দমিত। কাজেই এমন কোন কারণ নেই যে অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তি যেমন কর্তৃত্ব আর সঞ্চয় মোহ ইত্যাদিও ঐভাবে সামাজিক শিক্ষা আর প্রভাবের দ্বারা পরিবর্তিত করা যাবে না। মানব-স্বভাব অপরিবর্তনীয় আর পরিবেশ সবশক্তির আধার এসব ধারণা আমাদের ভুলে যেতে হবে। পরিবর্তন বা বিকাশের জানা-শোনা কোন সীমা নেই, সম্ভবতঃ আমাদের চিন্তায় ছাড়া অসম্ভব বলেও নেই কিছু।

AMARBOI.COM

গ. বিজ্ঞান আর রাজনীতি

ডিউঈর কাছে সব চেয়ে অনুপম আর শ্রদ্ধেয় ছিল বিকাশ—একারণেই এ ছিল তাঁর আপেক্ষিক আর বিশেষ ধারণা, কোন চরম 'শুভকে' তিনি তাঁর নৈতিক মানদণ্ড করেননি। 'জীবনে বেঁচে থাকার লক্ষ্য নিখুঁত পরিপূর্ণতা নয় বরং নিজেকে পরিপূর্ণ, প্রবীণ আর মার্জিত করে তোলার অশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া....এককালে যতই ভালো থাকুক কিন্তু যে এখন অপকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে কম ভালো হওয়ার দিকে নেমে, মন্দ মানুষ বলতে তাকেই আমি বুঝি। আর সৎলোক হচ্ছে সে, যে আগে যতই নৈতিকতার দিক থেকে অযোগ্য থাকুক না কেন এখন এগিয়ে যাচ্ছে অধিকতর ভালো হওয়ার দিকে। এরকম ধারণা যাঁর তিনি নিজেকে বিচারের সময় হয়ে থাকেন কঠোর আর অন্যের বেলায় সদয়।'

ভালো হওয়া মানে নিরীহ আর অনুগত হওয়া নয়—যোগ্যতা ছাড়া

৪০—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৎগুণ নেহাৎ পঙ্গু, বুদ্ধি না থাকলে পৃথিবীর সব গুণপনাও আমাদের বাঁচাতে পারবে না। অজ্ঞতা কখনো সুখকর নয়—অজ্ঞতা মানে দাসত্ব আর অচেতনতা, একমাত্র বুদ্ধিই আমাদের ভাগ্য গঠনে হতে পারে আমাদের অংশীদার। ইচ্ছার স্বাধীনতা কারণগত ক্রম-পরম্পরার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না—এ হচ্ছে জ্ঞানের সাহায্যে আচার-আচরণকে সুদীপ্ত করে তোলা। "যে অনুপাতে নিজের কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার সেই অনুপাতেই তিনি নিজের চিন্তা বা নিজের কর্মে হতে পারেন স্বাধীন। সম্ভবতঃ এখানেই রয়েছে যে কোন স্বাধীনতার চাবিকাঠি।" শেষ পর্যন্ত চিন্তার উপরই রাখতে হবে আমাদের আস্থা, সহজাত-বৃত্তির উপর নয়। আমাদের চারদিকে বাণিজ্য-শিল্প ক্রমবর্ধমান যে কৃত্রিম পরিবেশ গড়ে তুলেছে আর যে জটিল সমস্যা-জালে আমরা আজ জড়িত হয়ে পড়েছি তাতে সহজাত-বৃত্তি কি করে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবে?

AMARBOI.COM

"সাময়িকভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মানসিক-বিদ্যা থেকে অনেক বেশী অগ্রসর। সম্ভাব্য মঙ্গল সাধনের উপযোগী যথেষ্ট প্রাকৃতিক যান্ত্রিকতা এখন আমাদের করায়ত্ত কিন্তু আমরা অবস্থার এমন জ্ঞান এখনো আয়ত্ত করতে পারিনি যার সাহায্যে সম্ভাব্য মূল্যবোধ আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হতে পারে। তাই এখনো আমরা অভ্যাস, দৈব আর শক্তির করুণার মুখাপেক্ষী....প্রকৃতির উপর আমাদের অসম্ভব আধিপত্য আর প্রকৃতিকে মানুষের ব্যবহার আর আরামের জন্য প্রয়োগে আমাদের যে পরিমাণ যোগ্যতা বৃদ্ধি ঘটেছে সে তুলনায় লক্ষ্যের বাস্তব উপলব্ধি আর মূল্যবোধ উপভোগ আমাদের কাছে রয়ে গেছে দুরূহ ও অনিশ্চিত। সময় সময় মনে হয় আমরা যেন পড়েছি এক স্ববিরোধিতার খপ্পরে, যতই আমরা উপায়ের সংখ্যা-বৃদ্ধি করে চলেছি, ততই সে সবের সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে হয়ে পড়ছি অনিশ্চিত। কাজেই কোন কার্লাইল বা কোন রাস্কিন যদি আমাদের সমগ্র শৈল্পিক সভ্যতাকে নিষিদ্ধ করার দাবী জানান আর কোন টলস্টয় যদি মরুভূতে প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করেন তাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু অবস্থার দিকে ধৈর্য সহকারে আর সামগ্রিক ভাবে দেখার একমাত্র উপায় হচ্ছে একথা মনে রাখা যে সব সমস্যার সেরা সমস্যা হচ্ছে বিজ্ঞানের বিকাশ সাধন আর জীবনে তার প্রয়োগ।....

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা হলে নীতিকথা আর দর্শনের প্রত্যাবর্তন ঘটবে তাদের প্রথম প্রেমে—বিজ্ঞতার প্রতি ভালোবাসাই মঙ্গলের প্রথম ধাত্রী। কিন্তু তা ফিরে আসে সক্রেটিসীয় নীতিতে, সন্ধান আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসংখ্য বিশেষ সব পদ্ধতিতে সুসজ্জিত হয়ে। এখন সুসংহত জ্ঞানরাশির সাহায্যে আর যেসব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্প, আইন আর শিক্ষা যে ভাবে গড়ে উঠেছে তাতে নরনারী নির্বিশেষে সবাই এখন অর্জিত মূল্যবোধ নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী আত্মসাতের সুযোগ গ্রহণে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে।"

গণতন্ত্রের বেলায় দার্শনিকদের মধ্যে ডিউঈ একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন গণতন্ত্র—যদিও তার দোষত্রুটি তাঁর অজানা ছিলো না। রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া, শ্রেণীর নীতি আর ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় একমাত্র তখনই এ সম্ভব। নির্দিষ্ট শ্রেণী নির্দিষ্ট প্রজাতিতেই সম্ভব—প্রজাতির রূপান্তর তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে শ্রেণীসমূহের তারল্যের তথ্য অনির্দিষ্টতারও আবির্ভাব। গণতন্ত্র থেকে আভিজাত্য আর রাজতন্ত্র অধিকতর দক্ষ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সে সব অধিকতর বিপজ্জনকও। রাষ্ট্রের প্রতি ডিউঈর কোন আস্থা ছিল না, তাঁর পছন্দ ছিলো বহুত্ববাদী ব্যবস্থা যাতে যতদূর সম্ভব স্বেচ্ছামূলক সংঘ দ্বারাই সমাজের কাজ হবে সাধিত। তিনি বহুরকম সংগঠন, দল, পৌর সংস্থা, শ্রমিক সংঘ ইত্যাদিতে একই কর্ম সাধনে ব্যক্তিত্বের আপোষ-রফা দেখতে পেতেন। কারণ এসবের :

'গুরুত্ব যতই বাড়বে, ততই রাষ্ট্র অধিকতরভাবে এ সবের নিয়ন্তা আর সমন্বয়কারী হয়ে উঠবে—নির্দেশ করে দেবে তাদের কর্ম-সীমা, রোধ করবে আর মীমাংসা করে দেবে বিবাদ।....তদুপরি স্বেচ্ছামূলক সংঘগুলির.... রাজনৈতিক সীমা রেখায়ও নেই ঐক্যমত। গণিতবিদ, রসায়নবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সমিতিসমূহ, বণিকসংঘ, শ্রমিক সংগঠন, গির্জা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক, কারণ তারা বিশ্বজনীন স্বার্থেরই প্রতিনিধি। এভাবে গড়ে উঠলে আন্তর্জাতিকতা শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকবে না, হবে বাস্তবায়িত, শুধু খেয়ালী বা আবেগী আদর্শ না হয়ে হবে এক শক্তিতে পরিণত। তবুও বিচ্ছিন্ন জাতীয় সার্বভৌমত্বের ঐতিহ্যগত মতবাদ এসবকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। এ মতবাদ বা অনড় বিশ্বাসই আন্তর্জাতিক মন গড়ে ওঠার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে এক প্রবলতম বাধা—একমাত্র আন্তর্জাতিক মনই আধুনিককালের শ্রম, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প আর ধর্মের গতিশীল শক্তির সঙ্গে সমন্বিত হতে সক্ষম।'

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি আর মনোভাব এমন চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে তা যদি আমরা আমাদের সামাজিক সমস্যার বেলায়ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হই একমাত্র তখনই রাজনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব। আমরা এখনো রাজনৈতিক দর্শনের পরাবিদ্যা স্তরেই রয়ে গেছি। আমরা একে অপরের কথা লক্ষ্য করে যত সব বিমূর্ত ভাব ছুঁড়ে মারছি—যুদ্ধ শেষে দেখা যায় কিছুই জেতা যায়নি। সামগ্রিক সব ভাব দিয়ে আর ব্যক্তিত্ববাদ বা ব্যবস্থা, গণতন্ত্র বা রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র ইত্যাদি আরো বহু কিছুকে চমৎকার সামান্যীকরণের দ্বারা আমরা সামাজিক দুর্নীতি কিছুতেই দূর করতে পারবো না। সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের সাহায্যে প্রতিটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে—বিশ্বজনীন তত্ত্ব এখানে হালে পানি পাবে না। তত্ত্বকথা কীট-মুখের সূচের মতোই। সফল প্রগতিশীল জীবনকে নির্ভর করতে হবে পরীক্ষা আর ভুলের উপর।

'পরীক্ষামূলক মনোভাব....সামগ্রিক দাবী-দাওয়ার স্থলে বিস্তৃত বিশ্লেষণকে দেয় স্থান, ব্যক্তিগত প্রবণতাজাত বিশ্বাসের বদলে স্থান দেয় সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানকে আর অস্পষ্ট আর অনির্দিষ্ট বৃহদাকার মতামতের পরিবর্তে জোগান দেয় ছোট ছোট বাস্তব ঘটনাকে। নৈতিকতা, রাজনীতি, শিক্ষা—সমাজ-বিজ্ঞানের এসব ক্ষেত্রে চিন্তা এখনো বিপরীত পথেই ধাবিত, এখানেই শৃঙ্খলা আর স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ববাদ আর সমাজতন্ত্র, সংস্কৃতি আর উপযোগিতা, স্বতঃস্ফূর্ততা আর শাসন, বাস্তবতা আর ঐতিহ্যের তত্ত্বগত বিরুদ্ধতা আজো বিদ্যমান। এক সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই একই রকম 'সামগ্রিক' আধিপত্য ছিল—সেখানেও তখন মানসিক স্বচ্ছতার বিপক্ষে আবেগী আবেদনের ছিল প্রাধান্য। কিন্তু পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীরই মৃত্যু ঘটেছে সেখানে। এখন একমাত্র করণীয় যে কোন গোলমেলে বিশৃঙ্খল বিষয়-বস্তুকে খণ্ড খণ্ড ভাবে আক্রমণ করে পরিষ্কার করে নেওয়া, পরীক্ষা-পূর্ববর্তী ধারণাগুলির কোন একটিরও জয় হয়েছে এমন কোন ঘটনা বা বিষয় আমার জানা নেই। ঐসব ধারণা সবই আজ নিশ্চিহ্ন, কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিষ্কৃত অবস্থার সঙ্গে তাদের অসামঞ্জস্য ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে—ফলে সে সব হয়ে পড়েছে অর্থহীন আর অনাকর্ষণীয় বা অসার্থক।'

মানব-জ্ঞানকে আমাদের সামাজিক বিরুদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হওয়া উচিত দর্শনের কাজ আর ভূমিকা। দর্শন আজো ভীরু অনুচার মতো যতো সব সেকেলে সমস্যা আর ভাব আঁকড়ে ধরে আছে--আর "আধুনিক জীবনের যত সব বাধা-বিঘ্ন তা নিয়ে ভাববার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে সাহিত্য আর রাজনীতির উপর।" বিজ্ঞানকে দেখে দর্শন আজ পলাতক, দর্শনের এলাকা ছেড়ে বিজ্ঞান আজ একে একে উৎপাদন-ক্ষেত্রের দিকেই গেছে ছুটে। দর্শনের দশা আজ এক পরিত্যাক্তা গায়ের মতই নিঃসঙ্গ আর শীতার্ত—যে মার নেই আজ কোন জীবনী-শক্তি আর যার স্তনগুলি এখন প্রায় শূন্য। এক ভীরু পদক্ষেপে দর্শন আজ তার সত্যিকার কর্মক্ষেত্র মানুষ আর মানুষের পার্থিব জীবন ছেড়ে তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক ভাঙা-কোণায় গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে আর যে আইন ভাঙা নড়বরে ঘরে বাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সে আইন কখন তাকেও ঘর-ছাড়া করে ছাড়ে সে ভয়ে প্রতিমুহূর্তে থাকে সন্ত্রস্ত। কিন্তু এসব পুরোনো সমস্যা আজ আমাদের জন্য অর্থহীন। "আমরা এখন ঐসবের সমাধান করি না, ঐগুলিকে আমরা এখন যাই ডিঙিয়ে।" সামাজিক সংঘর্ষের উত্তাপ আর জীবন্ত পরিবর্তনের সামনে তারা সব যায় উবে। অন্য সব কিছুর মতো দর্শনকেও পার্থিব হতে হবে, দাঁড়াতে হবে মাটির উপরই আর জীবনকে আলোকোজ্জ্বল করেই অর্জন করতে হবে নিজের জীবিকা।

'যে সব গভীর-মনা লোক দর্শনের পেশাগত ব্যাপারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে অক্ষম তাঁদের অনেকেই জানতে চান নবতর শৈল্পিক, রাজনৈতিক আর বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের জন্য তাঁদের মননশীল উত্তরাধিকারের কতটুকু বর্জন আর কি কি সংশোধনের প্রয়োজন।..... নিজ নিজ কালের সামাজিক আর নৈতিক সংঘর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবরাশিকে স্বচ্ছ আর পরিচ্ছন্ন করে তোলাই হবে ভবিষ্যত দর্শনের দায়িত্ব। মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব, এসব সংঘর্ষের মোকাবিলার জন্য তেমন একটি হাতিয়ার তৈয়ার করাই হবে দর্শনের লক্ষ্য।....জীবনের পরস্পর-বিরোধী কারণসমূহের সমন্বয় সাধনের উপযোগী এক উদার ও দূরদর্শী মত বা তত্ত্বই দর্শন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শন যদি এভাবে গৃহীত হয় তা হলে একদিন এমন দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটবে যিনি হবেন সর্বতোভাবে রাজা বা শাসক হওয়ার যোগ্য।

উপসংহার

পাঠক মনে মনে এ তিন দর্শনের সংক্ষিপ্ত-সার যাচাই করে দেখলে আমরা যে কালানুক্রম রক্ষা না করে কেন জেম্‌স্ আর ডিউঈর আগে সান্তায়ানার আলোচনা করেছি তার কারণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে এখন ভালো করে বুঝতে পারা যাবে আমাদের সবচেয়ে বাক্‌পটু আর সূক্ষ্ম জীবিত চিন্তাবিদদের প্রায় সকলেই য়ুরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী। উইলিয়াম জেম্‌স্ যদিও নানাভাবে ঐ সংস্কৃতির সঙ্গেই যুক্ত তবুও তাঁর চিন্তায় তিনি অন্ততঃ পূর্ব আমেরিকার প্রাণ-ধারা ধরতে সক্ষম হয়েছেন আর তাঁর রচনাশৈলীতে ধরা পড়েছে সমগ্র আমেরিকার জীবন-গতি। আর জন ডিউঈ গড়ে উঠেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের সম-প্রভাবে—তিনি তাঁর দেশের জনসাধারণের বাস্তববাদী আর গণতান্ত্রিক মন-মেজাজকেই দিয়েছেন দার্শনিক রূপ। এখন দেখা যাচ্ছে য়ুরোপীয় চিন্তার উপর আমাদের প্রাচীন নির্ভরতা অনেক কমে এসেছে, আমরা এখন দর্শন, সাহিত্য আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের নিজের মতো করেই কাজ করতে শুরু করেছি। অবশ্য এ শুধু সূচনা, কারণ আমরা এখনো তরুণ, আমাদের য়ুরোপীয় পিতৃ-পুরুষের সহায়তা ছাড়া নিজেরা এখনো পুরোপুরি হাঁটতে শিখিনি। নিজেদের ছাড়িয়ে যাওয়া যদি আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয় আর যদি সময় সময় নিজেদের কৃত্রিমতা ও প্রাদেশিকতা, নিজেদের সংকীর্ণতা আর গোঁড়ামী, নিজেদের অপরিপক্ক মনের অসহিষ্ণুতা, আর সব রকম নতুনত্ব আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে নিজেদের ভীরুমনের আক্রমণ দেখে মনে হতাশা জাগে, তা হলে আমাদের স্মরণ করা উচিত প্রতিষ্ঠা থেকে শেক্সপিয়র পর্যন্ত আট শ' বছর দরকার হয়েছে ইংলণ্ডের আর প্রতিষ্ঠা থেকে মন্টেইনি (Montaigne) পর্যন্ত ফ্রান্সেরও প্রয়োজন হয়েছে আট শ' বছর। আমরা য়ুরোপ থেকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছি আর বাঁচা আর অনুকরণের জন্য নির্বাচন করেছি উদ্যোগী ব্যক্তিত্ববাদী আর সঞ্চয়ী অভিযাত্রীদের—আকর্ষণ করিনি, ডেকে আনিনি ভাবুক আর শিল্প-মনাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যাবৎ আমাদের বিশাল সব জঙ্গল পরিষ্কার করে নিয়ে ভূমিজ সম্পদ সন্ধানেই আমাদের প্রয়োগ করতে হয়েছে সব শক্তি। তাই আমরা নিজেদের দেশীয় সাহিত্য আর পরিপক্ক কোন দর্শন আজো সৃষ্টি করতে পারিনি।

কিন্তু আমরা হয়েছি এখন সম্পদের মালিক—সম্পদ হচ্ছে সব রকম কলা-শিল্পের পূর্বাভাস। প্রত্যেক দেশেই শত শত বছরের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে যেখানে বিলাস আর অবসরের উপকরণ সঞ্চিত হয়েছে সেখানেই উর্বর, জলসিক্ত ভূমিতে উদ্ভিদের জন্মের মতোই স্বাভাবিক নিয়মে সংস্কৃতিরও উদ্ভব। সম্পদশালী হওয়াই প্রথম শর্ত—দর্শন করার আগে জাতিকে করতে হয় বাঁচার সংস্থান। অবশ্য একথা সত্য যে অন্য জাতির তুলনায় আমরা বেশ কিছুটা দ্রুত বেড়ে উঠেছি—আমাদের আত্মিক বিশৃঙ্খলার কারণও উন্নয়নের এ গতিশীলতা। সাবালক বা বয়ঃপ্রাপ্তির পর হঠাৎ বৃদ্ধি আর নতুন অভিজ্ঞতায় বেসামাল আর ভারসাম্যহারা তরুণের মতোই এখন আমাদের অবস্থা। কিন্তু অচিরে আমরা প্রবীণতায় পেঁৗছে যাবো—আমাদের মনের সঙ্গে দেহের আর সম্পদের সঙ্গে সংস্কৃতির মণি-কাঞ্চন সংযোগ তখন ঘটবেই। হয়তো শেক্সপিয়র থেকেও মহত্তর আত্মা আর প্লেটোর চেয়েও বৃহত্তর মন আছে—যা এখনো আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। সম্পদের মতো স্বাধীনতাকেও যখন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখবো তখন আমাদের ভাগ্যেও লাভ হবে রেনেসাঁ।

———

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~